সূচীপত্র।

মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।

৮ম খণ্ড।] ১২৯১। [১ম সংখ্যা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সার মর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চতুর্থ দিন।

বিনোদ। আজি কিসের কথা বলিবে?

গোপী। আজিকার সর্ব্বপ্রধান কথা জাতিভেদ। কি উদ্দেশ্যে জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং জাতিভেদ হইতে কি কি ফল সমুদ্ভূত হইতেছে অদ্য কৃষ্ণ তাহার ব্যাখ্যা করিবেন। কৃষ্ণের প্রথম কথাটি কিঞ্চিৎ কৌতুকাবহ। কৃষ্ণ বলিতেছেন—"আমিই জাতিভেদের কর্ত্তা কিন্তু আমাকে জাতিভেদের কর্ত্তা বলিয়া মনে করিও না।"

বিনোদ। কৃষ্ণ, বোধ হয়, হেগেল প্রণীত দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। হেগেলের মতেও যিনি কর্ত্তা তিনিই অকর্ত্তা। কিন্তু তথাপি Warburton is greater than Pope। এবং কৃষ্ণের ভাষ্যকার কৃষ্ণ অপেক্ষা বিচক্ষণ।

গোপী। আমি আজি কালির কৃতবিদ্য যুবক দিগের মধ্যে এক আশ্চর্য্য বিশ্বাস দেখিতেছি। সংস্কৃতে কিংবা বাঙ্গালায় যদি কোন কঠিন তত্ত্বের আলোচনা থাকে, তাহা হইলে ইংরেজীওয়ালা বাঙ্গালিরা অল্পমাত্র মস্তিষ্কের বিলোড়ন না করিয়াই সিদ্ধান্ত করেন যে ঐ ঐ তত্ত্বগুলি ভ্রমাত্মক। কিন্তু ঐ সমস্ত তত্ত্বই আবার যদি কোন ইংরেজী পুস্তকে বাহির হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কৃতবিদ্য মহাশয়েরা তৎক্ষণাৎ উহার সমর্থনের জন্য স্বর্গ মর্ত্ত্য বিচলিত করিয়া ফেলেন। ইংরেজী তত্ত্ব বুঝিবার জন্য যেরূপ অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন হইয়া থাকে, সংস্কৃতের তত্ত্বগুলি বুঝিবার জন্যও সেইরূপই হওয়া সম্ভব। কিন্তু যদি তোমার মত লোকেও সংস্কৃতের

জন্য অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে কাতর হয়, তাহা হইলে আর কাহাকে লইয়া শাস্ত্রালোচনা করা যাইতে পারে ?

বিনোদ। তুমি মনে করিও না, যে ভয় দেখাইয়া বা কাতরোক্তি প্রয়োগ করিয়া আমাকে তর্কে নিরস্ত করিবে। যতক্ষণ না তুমি কৃষ্ণের উক্তিটিকে অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপাদন করিবে, ততক্ষণ আমি উহাকে ভ্রান্ত বলিয়া উপহাস করিব।

গোপী। যাহার মনে ভক্তি ও বিশ্বাস নাই, সে জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। সে যাহা হউক এক্ষণে কৃষ্ণ কি বলিতেছেন, শ্রবণকর। কৃষ্ণ বলিলেন—"আমি কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদের প্রথা প্রবর্ত্তিত করি নাই। অর্থাৎ এমন কোন সময় হয় নাই যখন আমি সমস্ত হিন্দুদিগকে একত্রিত করিয়া কতকগুলিকে ব্রাহ্মণ কতকগুলিকে ক্ষত্রির প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলাম। তবে আমি হিন্দুসমাজে অথবা হিন্দুদের মধ্যে যে শক্তি নিহিত করিয়াছিলাম, সেই শক্তিপ্রভাবেই কাল সহকারে সমাজ মধ্যে চারিটি বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল। অতএব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমি জাতিভেদের কর্ত্তা নহি বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে আমিই এই শ্রেণীবিভাগের কর্ত্তা।"

বিনোদ। এই ত বেশ বুঝিলাম। এইরূপে বুঝাইয়া দিলেই ত চলিত। আমার উপর বৃথা এত গুলি বাক্য ব্যয় করিলে কেন ?

গোপী। তুমি উপহাস করিয়াছিলে বলিয়া আমি ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়াছিলাম। উপহাস সত্যানুসন্ধানের প্রধান অন্তরায়। সে যাহা হউক, কৃষ্ণ জাতিভেদের যেরূপ কারণ ব্যাখ্যা করিলেন তুমি কি তাহা স্বীকার করিয়া লইলে ?

বিনোদ। না।

গোপী। কেন ?

বিনোদ। আমার বিশ্বাস যে ব্রাহ্মণেরাই এই জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু কৃষ্ণ যাহা বলিলেন তাহার অর্থ আমি বুঝিয়াছি।

গোপী। ব্রাহ্মণেরাই যে জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ইহা প্রায় সকল ঐতিহাসিকেরাই বলিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা ভ্রমাত্মক বিশ্বাস আর হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে আমার নিজের কথা তোমার নিকটে অসার বলিয়া বোধ হইবে। এজন্য আমি স্পেনসার হইতে দুই চারিটি বচন তোমার জন্য উদ্ধৃত করিতেছি।

"You need but to look at the changes going on around, or observe social organisation in its leading peculiarities to see that these are neither supernatural, nor are determined by the wills of individual men, as by implication historians commonly teach ; but are consequent on general natural causes. The one case of the division of labour suffices to show this." Spencer's Essays Vol. I. p 385

ফলতঃ ব্রাহ্মণেরা জাতিভেদ প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছে বলিলে এক অতি অসম্ভব কথা বলা হয়।

বিনোদ। কেন?

গোপী। যে দিন ব্রাহ্মণেরা ঐ প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তন করেন, সেই দিনের কথা মানস চক্ষে ভাবিয়া দেখ দেখি। মনে কর এক বিস্তৃত প্রান্তরে পঞ্চাশৎ সহস্র লোক সমবেত হইয়াছে। এখন রাজা বা রাজসভাসদ্‌গণ কিরূপে ইহাদের শ্রেণী বিভাগ করিবেন? মনে কর রাজা বলিলেন—"তোমাদের মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ হইতে ইচ্ছা কর তাহারা আমার ডানি দিকে উপবেশন কর।" ভাবিয়া দেখ দেখি কয় জন ব্রাহ্মণ হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবে? তাহার পর মনে কর রাজা বা রাজদূত বলিলেন—" যে যে শূদ্র হইতে ইচ্ছা কর, তাহারা আমার বামদিকে আইস। " এখন ভাবিয়া দেখ দেখি কয়জন শূদ্র হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে? ভাবিয়া দেখ দেখি কয় জন স্বেচ্ছায় উচ্চ শ্রেণী পরিত্যাগ করিয়া নিম্ন শ্রেণীতে পরিগণিত হইবে? আর যদি তুমি বল পূর্ব্বক সমান পদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে কাহাকেও বা উচ্চ শ্রেণীতে কাহাকেও বা নিম্ন শ্রেণীতে পরিগণিত করাও, তাহা হইলে তোমার ঐ স্বকৃত বিভাগ কয় দিন সমাজে বলবান্ থাকিবে? এ সম্বন্ধে স্পেন্‌সার যাহা বলেন তাহাও শ্রবণ কর।

"The failure of Cromwell, permanently to establish a new social condition, and the rapid revival of suppressed institutions and practices after his death, show how powerless is a monarch to change the type of the society which he governs. He may retard, he may disturb, or he may aid the natural process of organisation ; but the general course of this process is beyond his control."

Spencer's Essays Vol. I. p 387–388

বিনোদ। তোমার ন্যায় বাগ্‌বিশারদ ব্যক্তি আমি দেখি নাই। তুমি কি ভুলিয়া গেলে যে রোমে রাজারা সেন্‌সার্ নিযুক্ত করিয়া প্রজাদের শ্রেণী বা জাতি নির্দ্দেশ করিতেন। সেন্‌সারের কথায় এক ব্যক্তি নিজ শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে অবনীত বা উন্নীত হইতে পারিত। ইহাতেই ত বুঝা-যাইতেছে যে, রাজার ইচ্ছায় প্রজাদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ হইয়া যাইত।

গোপী। আমি সেন্‌সার্‌দিগের কথা ভুলি নাই। কিন্তু সেন্‌সারেরা জাতিভেদের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। রোমের প্রথম রাজা রমুলসের সময়ে সেন্‌সার পদ ছিল না। রোমের পঞ্চম রাজা সারবিয়স্ টলিয়সের সময় সেন্‌সার পদের প্রথম সৃষ্টি হয়। যদি সেন্‌সারেরা জাতিভেদের স্রষ্টা হইতেন, তাহা হইলে রমুলসের সময় হইতেই উহাদের অস্তিত্বও দেখা যাইত। তদ্ভিন্ন সেন্‌সারের কার্য্যপ্রণালী দেখিলেও তাঁহাদিগকে শ্রেণীবিভাগের স্রষ্টা বলিয়া বোধ হয় না। সেন্‌সারগণ রো-

মের অধিবাসীদিগকে তাহাদের নাম, জাতি, ব্যবসায়, সম্পত্তি, গোত্র প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। তাঁহারা নিজেই যদি শ্রেণী বিভাগের কর্ত্তা হইলেন, তাহা হইলে এরূপ প্রশ্ন কখনই তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন না। ফলতঃ পূর্ব্ব হইতেই সামাজিক নিয়ম বলে, রোমের সমাজ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। সেন্সারেরা ঐ সমস্ত শ্রেণী গুলিকে বিধিবদ্ধ করিয়া স্বতন্ত্র পুস্তকে লিখিয়া রাখিতেন। অন্য অন্য সমাজেও ঐরূপে প্রথমে আপনা হইতেই শ্রেণীবিভাগ সংগঠিত হয়। পরে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা ও শ্রেণী বা ব্যবসায়গত অসুবিধা দূরীকরণার্থে ঐ শ্রেণীগুলি ভিন্ন পুস্তকে লিখিত ও বিধিবদ্ধ করিতে হয়। হিন্দুসমাজেও কালসহকারে ও সমাজ-নিয়ম বলে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী সংগঠিত হইয়াছিল। শ্রুতি, স্মৃতি, প্রভৃতি পুস্তকে সেই শ্রেণী গুলি সুশৃঙ্খলরূপে বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

বিনোদ। তোমার সঙ্গে কথায় কেহ আঁটিতে পারিবে না। এত কাল ধরিয়া লোকে ব্রাহ্মণকে জাতিভেদের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। তুমি আজি আবার কোথা হইতে তাহার এক বিপরীত অর্থ করিয়া বসিলে।

গোপী। ইংরেজেরা এদেশের বিন্দুবিসর্গের সংবাদ না রাখিয়াই ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তাঁহাদের ইতিহাস ভ্রমাত্মক হইবারই কথা। কিন্তু সর্ব্বত্রই সংস্কৃত শাস্ত্রে দেখিবে যে ব্রহ্মা অর্থাৎ জগদীশ্বর অথবা সমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই জাতিভেদের সৃষ্টি করেন। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "ময়া সৃষ্টং"। ফলতঃ ব্রাহ্মণেরা জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়াছেন কোন শাস্ত্রেই এ অদ্ভুত মতের উল্লেখ দেখিতে পাইবে না।

বিনোদ। তুমি বলিতেছ যে স্বাভাবিক নিয়মবলেই হিন্দুসমাজে জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু যে স্বাভাবিক নিয়মে ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রবর্ত্তিত হইল সেই স্বাভাবিক নিয়মে ইংলণ্ডে জাতিভেদ বা শ্রেণীবিভাগ হইল না কেন?

গোপী। ইংলণ্ডেও যে শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে ও হইতেছে স্পেন্সার তাহার সাক্ষী। স্পেন্সার বলিতেছেন—

"Some men have become manufacturers, others have remained cultivators of soil. In Lancashire, millions have devoted themselves to the making of cotton-fabrics. In Yorkshire another million lives by producing woollens; and the pottery of Sheffield, the hardware of Birmingham, severally occupy their hundreds of thousands. These are large facts in the structure of English Society; but we can ascribe them neither to miracle, nor to legislation."

Essays Vol I. P 385.

এইরূপে ইজিপ্ত, পারস্য, গ্রীশ, রোম,

সকল দেশেই জাতিভেদের অস্তিত্ব ও প্রভাব দেখিবে। কোন এক সমাজের আদ্যন্ত বিবেচনা করিলে তিনটি অবস্থা দেখিতে পাইবে। প্রথম বাল্যাবস্থা। এ অবস্থায় মনুষ্যে মনুষ্যে বড় প্রভেদ থাকে না, সকলেই একই প্রকার কার্য্যে আপনাদিগকে নিয়োজিত রাখে। দ্বিতীয় যৌবনাবস্থা। এই অবস্থায় সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উদ্ভূত হইয়া অর্থাৎ সমাজস্থ ব্যক্তিগণ নানা শ্রেণীতে বা নানা জাতিতে বিভক্ত হইয়া সমাজের বলাধান ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। তৃতীয় বৃদ্ধাবস্থা। এই অবস্থায় এক একটি করিয়া সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্খলিত হয়। প্রথমে চক্ষু, পরে কর্ণ, পরে দন্ত, পরে হস্তপদাদি সমস্ত শিথিল হইয়া আইসে এবং সমাজ তখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যতদিন জাতিভেদ প্রবল থাকে, ততদিন সমাজের বিনাশ নাই। কিন্তু যখন শ্রেণীবিভাগ নষ্ট হয়, সকল মনুষ্য একই প্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে যায়, তখনই সমাজের উচ্ছেদ দশা উপস্থিত হয়। এই জন্য প্রাচীন পণ্ডিতেরা ‘ একাকার ’ হওয়াকে এত ভয় করিতেন। যে দিন হিন্দুসমাজে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য না করিয়া সকলেই উকীল ডাক্তর ও বেতনভোগী ভৃত্য হইবার ইচ্ছা করিবে সেই দিন জানিও হিন্দুসমাজের অন্তিমদশা উপস্থিত হইয়াছে।

"......Last scene of all
That ends this strange eventful
history,
Is second childishness and mere
oblivion,
Sans teeth, sans eyes, sans taste,
sans everything."

হিন্দুসমাজে, অন্ততঃ বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে বোধ হয় সেই দিন উপস্থিত হইয়াছে।

বিনোদ। তোমার মতগুলি বড় ভয়ঙ্কর। শুনিলে হৃৎকম্প হয়। কিন্তু আমি তোমার মতে বিশ্বাস করি না। আমার দৃঢ় সংস্কার এই যে জাতিভেদ প্রথা হিন্দুসমাজের প্রধান ও দুরপনেয় কলঙ্ক।

গোপী। কি আশ্চর্য্য! শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা তোমার মনে যে সংস্কার দৃঢ়ীভূত করিয়াছেন, স্পেন্‌সারের ন্যায় জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতেও সে সংস্কার দূর করিতে পারিলেন না। এই সমস্ত দেখিয়াও যে বলে, পাদ্রীরা আমাদের দেশে কিছু করিতে পারে নাই, সে ভ্রান্ত।

বিনোদ। কিন্তু স্পেন্‌সার কোথায় বলিয়াছেন যে জাতিভেদ থাকিলে সমাজের উন্নতি হয়, কিংবা জাতিভেদ না থাকিলে সমাজের অবনতি হয়?

গোপী। স্পেন্‌সারের সোশিয়লজি নামক পুস্তক পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে তোমার কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিবে না। আপাততঃ স্পেন্‌সার হইতে দুইটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। বোধ হয় তাহার দ্বারাই তোমার সন্দেহ অনেক পরিমাণে দূরীকৃত হইবে।

"Social progress is supposed to consist in the produce of a greater

quantity and variety of the articles required for satisfying men's wants; in the increasing security of person and property; in widening freedom of action; whereas, rightly understood, social progress consists in those changes in the structure of social organism which have entailed these consequences."

বিনোদ। তুমি স্পেন্সার, স্পেন্সার করিয়া পাগল করিলে। কিন্তু তোমাকে একটা মোটা কথা জিজ্ঞাসা করি। যদি জাতিভেদ সমাজের উন্নতির কারণ হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশে জাতিভেদ সত্বেও এত অনিষ্ট হইল কেন?

গোপী। বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু অনিবার্য্য। মনুষ্য সহস্র উপায় অবলম্বন করিয়াও সমাজকে বার্দ্ধক্য বা মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না। ঐ যে সম্মুখে পুষ্পপত্র শোভিত বৃক্ষটি দেখিতেছ, কালসহকারে উহাও বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। ফলতঃ সংসারস্থ সমস্ত বস্তুরই উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও বিনাশ হইয়া থাকে। সংসারের কর্ত্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। যখন সমস্ত বস্তুই এই তিন জন কর্ত্তার অধীনে উৎপন্ন, বর্দ্ধিত ও বিনষ্ট হইবে, তখন হিন্দুসমাজও যে নিজ সহস্র চেষ্টা সত্বেও কালসহকারে জীর্ণ, শীর্ণ, স্থবির ও চলৎশক্তি হীন হইবে,তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? জাতিভেদ আছে বলিয়া হিন্দুসমাজের অবনতি হইয়াছে তাহা নহে, জাতিভেদ সত্বেও হিন্দুসমাজের অবনতি হইয়াছে বলাই যুক্তিসঙ্গত।

"The boast of heraldy, the pomp of power
And all that beauty, all that wealth e'r gave
Await alike the inevitable hour
The path of glory lead but to the grave."

সংস্কৃতেও এরূপ শ্লোকের অভাব নাই। কিন্তু আমি এতক্ষণ কেবল তোমার কথার উত্তর দিয়াছি মাত্র। জাতিভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার কি কি ধারণা তাহা স্পষ্টরূপে সামুল বর্ণনা করি নাই। এক্ষণে আমার ধারণাগুলি কিঞ্চিৎ অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

আমার প্রথম ধারণা এই যে ব্রাহ্মণেরা জাতিভেদের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। কালসহকারে হিন্দুসমাজের কলেবর ও আয়তন বর্দ্ধিত হইলে হিন্দুগণ স্বাভাবিক নিয়মবলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ সমস্ত ব্যবসায়ের মধ্যে যেগুলি অর্থকর অনেকেই সেই পথে যাইতে লাগিল। এইরূপে সমাজস্থ ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ যতদিন কৃষিকার্য্যে অর্থাগমের সুবিধা থাকে,ততদিন সকলেই আসিয়া কৃষক হয়, আবার এত অধিক লোক কৃষক হইলে উহাতে লাভ অধিক থাকে না। তখন আবার কৃষকদের মধ্যে কতকগুলি লোক

বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করে। এইরূপে যুদ্ধের সময় কৃষকদের বিনাশ হইয়া গেলে কে কৃষিকার্য্য করিবে তাহার নির্ণয় হয় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় শ্রেণীবদ্ধ না থাকাতে এইরূপ নানাবিধ অসুবিধা হইতে লাগিল। অন্য অন্য দেশেও এইরূপ অসুবিধা হইয়া থাকে। সর্ব্বদেশেই এঅসুবিধার সময়ে এক শ্রেণীর লোকে বলবান্ হইয়া অন্য অন্য শ্রেণীদিগকে পরাজিত করিয়া রাখে। যখন যুদ্ধজীবিগণ বলবান্ হয়, তখন শ্রমজীবীদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। আবার যখন শ্রমজীবিগণ বলবান্ হয় তখন যুদ্ধজীবীদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। হিন্দুসমাজেও, বোধ হয়, অনেক বার এইরূপে এক শ্রেণীর উন্নতি ও অন্য অন্য শ্রেণীর অবনতি হইয়াছিল। এইরূপে বহুবার বহু প্রকার অসুবিধা ভোগ করিয়া হিন্দুসমাজ দেখিল যে শ্রেণী বা জাতির স্পষ্ট নির্দ্দেশ ও সীমা না থাকিলে সকল শ্রেণীরই অবনতি ও অসুবিধা হয়। এ জন্য সকলের সম্মতি ক্রমে সর্ব্বপ্রকার শ্রেণীর মধ্যে সুবিধা ও অসুবিধার অংশ সমানরূপে বণ্টন করিয়া দিয়া সমাজ মধ্যে চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রচার করা হইল।

বিনোদ। বোধ হয়, তোমার সামূল বর্ণনা শেষ হইয়াছে?

গোপী। না। এখন ও শেষ হয় নাই। কিন্তু তোমার কি বক্তব্য আছে বল?

বিনোদ। আমার বক্তব্য এই যে, যে বলে ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের মধ্যে সুবিধা ও অসুবিধার অংশ সমানরূপে বণ্টন করা হইয়াছে,তাহার ন্যায় পক্ষপাতী লোক আর নাই।

গোপী। কিন্তু যে আমার কথা না শুনিয়া আমাকে পক্ষপাতী বলে. তাহাকে অসহিষ্ণু বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সেই যাহা হউক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহাদের সুবিধা ও অসুবিধার বিষয় বিবেচনা করা যাউক।

প্রথমে ব্রাহ্মণ। ইহাঁর সুবিধা কি কি? শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, সকলের নিকট পূজা ও সম্মাননা গ্রহণ। শাস্ত্রপাঠে অধিকার। ইহাঁর অসুবিধা কিকি? অহরহঃ মানসিক পরিশ্রম। দারিদ্র্য। সাংসারিক ও শারীরিক সকল প্রকার সুখে বিতৃষ্ণা। একবেলা ভোজন। পঞ্চাশের পর অরণ্যবাস।

তাহার পরে ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের সুবিধা কি কি? রাজ্য ভোগ। ঐশ্বর্য্য বিলাস। শাস্ত্রে অধিকার। ক্ষত্রিয়ের অসুবিধা কি কি? সর্ব্বদা প্রাণ হানির আশঙ্কা। রাজকার্য্যের জন্য সর্ব্বদা মস্তিষ্ক সঞ্চালনা চিন্তা। পঞ্চাশের পর অরণ্যবাস।

তাহার পরে বৈশ্য। বৈশ্যের সুবিধা কি কি? ঐশ্বর্য্য, বিলাস। শাস্ত্রে অধিকার। পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ হইতে সর্ব্বদা দূরে অবস্থান। পঞ্চাশের পরে অরণ্যবাস।

তাহার পরে শূদ্র। শূদ্রের সুবিধা কি কি? নির্ভাবনা। গ্রাসাচ্ছাদন সম্বন্ধে ভাবনা রাহিত্য। চিরকাল গৃহস্থাশ্রমের অধিকার। মানসিক সচ্ছন্দতা। ক্ষত্রিয়ও বৈ-

শ্যের জীবনে নানাবিধ দুর্ঘটনা সম্ভব পর। ক্ষত্রিয় যুদ্ধে পরাজিত হইতে পারেন। বৈশ্য বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন। কিন্তু শূদ্রের জীবনে এরূপ দুর্ব্বিপাক একবারেই অসম্ভব। চিরকাল পরিবার মধ্যে অবস্থান। শূদ্রের অসুবিধা কি কি? দারিদ্র্য। অন্যের সেবা। শারীরিক পরিশ্রম। একটি তালিকা করিয়া এই চারি বর্ণের সুবিধা অসুবিধা দেখাইতেছি।

বর্ণ	শারীরিক সুখ	মানসিক সুখ	সমষ্টি
ব্রাহ্মণ	০	২	২
ক্ষত্রিয়	১	১	২
বৈশ্য	১	১	২
শূদ্র	০	২	২

ইহাদের মধ্যে শূদ্র সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ ভ্রম হইয়া থাকিতে পারিবে। কিন্তু শূদ্র ভিন্ন অন্য তিন বর্ণের সুবিধা ও অসুবিধা যে সমান সমান অংশে বণ্টিত হইয়াছিল ইহা আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি।

বিনোদ। শূদ্রের উপর অত্যাচার হইত বলিয়াই ত লোকে জাতিভেদের এত নিন্দা করে। যদি সেই খানেই তোমার ভ্রম রহিয়া গেল, তাহা হইলে ত বিশ্ মোল্লায় গলৎ রহিয়া গেল।

গোপী। শূদ্রদের উপর অত্যাচার কিছুমাত্র ছিল না। তবে আমি শূদ্রদের অবস্থা ভালরূপ জানি না বলিয়া তোমাকে উহাদের সুবিধা ও অসুবিধা ভাল রূপে দেখাইতে পারিলাম না। তথাপি যাহা দেখাইয়াছি তাহা দ্বারা বোধ হয় তুমি স্বীকার করিবে যে শূদ্রদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল না।

বিনোদ। শূদ্রদের উপর কিছুমাত্র অত্যাচার ছিল না? ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রাণহত্যা করিলে তাহার দণ্ড প্রায়শ্চিত্ত। আর শূদ্র ব্রাহ্মণের ছায়াস্পর্শ করিলে কঠোর রূপে দণ্ডিত হইত। ইহাকে যদি তুমি অত্যাচার না বল, তাহা হইলে এতৎসম্বন্ধে তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

গোপী। ব্রাহ্মণ নিরামিষাশী, দরিদ্র, ধর্ম্মপরায়ণ, শাস্ত্রব্যবসায়ী, পণ্ডিত। শূদ্র বলিষ্ঠ, তেজস্বী, সাহসী ও বলদর্পে দর্পিত। এস্থলে ব্রাহ্মণ দুর্ব্বল ও শূদ্র বলীয়ান্। হিন্দুসংহিতা বলবানের সাহায্য না করিয়া দুর্ব্বলের সাহায্য করিয়াছিল ইহাতে অত্যাচার কি? ব্রাহ্মণ চিরকাল শাস্ত্রচিন্তা করিত। চিরকাল যাগ যজ্ঞ হোম প্রভৃতি দেবার্চ্চনায় নিযুক্ত থাকিত। চিরকাল ইন্দ্রিয় সংযমে সচেষ্ট থাকিত। অন্যদিকে শূদ্রেরা অসাধারণ শারীরিক বলে সর্ব্বদা বলীয়ান্ ও উন্মত্ত থাকিত। ব্রাহ্মণ শূদ্রের অপমান বা অনিষ্টাচরণ করিবে ইহা সম্ভব পর ছিল না। কিন্তু শূদ্র ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার করিবে পদে পদে এরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারিত।

বিনোদ। ব্রাহ্মণেরা যে শূদ্রের উপর অত্যাচার করিতেন ইহা কি তুমি তবে অস্বীকার কর?

গোপী। যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণের প্রথম সূত্রপাত হইল, যখন প্রথম সংহিতাকারগণ স্পষ্টরূপে এই

চারি বর্ণের কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্দ্দেশ করিলেন, তখন কোন শ্রেণীর উপর অত্যাচার ছিল না। কিন্তু যখন বিদেশীয় বিজাতীয় বিধর্ম্মী মুসলমানগণ হিন্দুস্থান জয় করিয়া হিন্দুধর্ম্মের উপর সর্ব্বসাধারণের অনাস্থা ও অভক্তি জন্মাইল, যখন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সকলের নিকট সম্মাননা বা শ্রদ্ধাপ্রাপ্তি হইতেও বঞ্চিত হইল, যখন মুসলমানগণের কঠোর অস্ত্রাঘাতে ক্ষত্রিয়-কুল একরূপ নিঃশেষিত হইল, যখন শূদ্রগণ বিধর্ম্মী রাজার আশ্রয়ে ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষাও অধিকতর সম্মানার্হ ও বৈশ্যগণ অপেক্ষাও ধনবান্ হইল, যখন হিন্দুসমাজের বন্ধনরজ্জু সমস্ত শিথিল হইয়া গেল, যখন ব্রাহ্মণগণ মুষ্টিভিক্ষা হইতেও বঞ্চিত হইল, তখন ব্রাহ্মণগণ শূদ্রবৎ আচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অন্য অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম, সদাচার, সুনীতি কথার কথা হইল। ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,শূদ্র নিজ নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সকলেই ধনান্বেষণে ব্যস্ত হইল। তখন চারিবর্ণের মধ্যে পূর্ব্ব সৌহার্দ্দের বিনাশ হইল। তখন ব্রাহ্মণ বৈধ ও অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়া শূদ্রদের অমঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। শূদ্রেরা ধনগর্ব্বে স্ফীত হইয়া ব্রাহ্মণদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিল। সামাজিক জীবনের উপর জাতিভেদের কোন প্রভুত্ব রহিল না। ব্রাহ্মণেরা দেবদেবীর দোহাই দিয়া কোনরূপে জাতিভেদের বাহ্য আকার সমস্ত বজায় রাখিলেন। জাতিভেদের আন্তরিক জীবন বিনষ্ট হইল।

বিনোদ। তোমার সকল কথায় আমি সায় দিতে পারি না। তবে আমি তোমার নিকট হইতে অনেক নূতন কথা শিখিলাম। এক্ষণে তুমি অন্য কথা বল।

গোপী। বিষয়টি প্রয়োজনীয় ও গুরুতর বলিয়া তোমার নিকট আমার নিজের অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। এক্ষণে কৃষ্ণ জাতিভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ কর। কৃষ্ণ বলিতেছেন—"মনুষ্যেরা স্বভাবতঃ ত্রিগুণাত্মক। সেই তিনটি গুণের নাম সত্ব, রজঃ ও তমঃ। দয়া, স্নেহ, মমতা, পরোপকার প্রভৃতি কার্য্য সত্বগুণের ফল। আত্মোন্নতি, উচ্চাভিলাষ, সৎকীর্ত্তি, প্রশংসালিপ্সা, প্রভৃতি কার্য্য রজোগুণের ফল। পরদ্রোহ, পরাপকার, প্রভৃতিদ্বারা আত্মোন্নতি,হিংসা, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি কার্য্য তমোগুণের ফল। সত্বগুণে লোক সকল পরোপকারের জন্য সর্ব্বদা স্বার্থ বিসর্জ্জন করেন। রজোগুণে লোক সকল সদুপায় দ্বারা আত্মোন্নতির প্রয়াস পান। তমোগুণে লোক সকল অসদুপায় দ্বারা আত্মোন্নতির প্রয়াস পাইয়া থাকেন। সত্বগুণের কার্য্যমালা পুণ্যময়। রজোগুণের কার্য্যমালা পুণ্যময় না হইলেও পাপদ্বারা কলঙ্কিত হয় না। তমোগুণের কার্য্যমালা পাপদ্বারা কলঙ্কিত। এই তিনগুণের মধ্যে সত্বগুণ ও তমোগুণ একত্র অবস্থান করিতে পারে না। আলোক ও অন্ধকার,পাপ ও পুণ্য, পরোপকার ও পরাপকার একত্র থাকিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত তিনটি স্বাভাবিক গুণ সম্বন্ধে মনুষ্যদিগকে

প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ যাঁহাদের মধ্যে সত্বগুণ প্রধান। ইহাঁদের রজঃ ও তমঃ গুণ থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ যাঁহাদের মধ্যে রজোগুণ প্রধান। ইহাঁদের মধ্যে আবার দুইটি শ্রেণী থাকিতে পারে। যাঁহাদের মনে রজোগুণ অধিক পরিমাণে ও সত্বগুণ অল্পপরিমাণে কার্য্য করে, এবং যাঁহাদের মনে রজোগুণ অধিক পরিমাণেও তমোগুণ অল্পপরিমাণে কার্য্য করে। এতদ্ভিন্ন অন্য কতকগুলি লোক আছেন যাঁহাদের মনে তমোগুণ-প্রাধান। ইহাঁদের মনে সত্বগুণ ও রজোগুণ থাকিতে পারে না। এইরূপে মনুষ্যদিগকে চারিটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা সত্বপ্রধান, রজঃসত্বময়, রজোতমোময়, তমঃপ্রধান। এই চারি প্রকারের লোকে স্বভাবতঃ চারি প্রকারের কার্য্য বা ব্যবসায় অবলম্বন করিবে। সত্বপ্রধান ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণে বিমণ্ডিত হইয়া যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যে আপনাদিগকে ব্যাপৃত করিবে। যাহারা রজঃসত্বপ্রধান তাঁহারা শৌর্য্যবীর্য্যাদি গুণে বিভূষিত হইয়া প্রজারক্ষা, যজন, দান, অধ্যয়ন প্রভৃতি কার্য্যে আপনাদিগকে নিযুক্ত রাখিবে। যাহারা রজস্তমঃপ্রধান তাহারা বুদ্ধি, বিবেচনা, অধ্যবসায়, তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রভৃতি গুণে বিমণ্ডিত হইয়া কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্য অবলম্বন করিবে। আর যাহারা তমোগুণপ্রধান তাহারা ক্রোধ, হিংসা, লোভ প্রভৃতি স্বভাবের হীনতা বশতঃ অন্য সকল ব্যবসায় অবলম্বনে অসমর্থ হইয়া অন্যের প্রভুত্বে থাকিবে। এইরূপে মনুষ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন গুণ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম অবলম্বন করিবে। এবং ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইবে। যাঁহারা সত্বগুণপ্রধান, তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হইবেন, যাঁহারা সত্বরজোগুণপ্রধান তাঁহারা ক্ষত্রিয়, যাঁহারা রজস্তমোগুণপ্রধান তাঁহারা বৈশ্য হইবেন, যাঁহারা তমঃপ্রধান তাঁহারা শূদ্র হইবেন। মনুষ্যদের মধ্যে আমি ভিন্ন ভিন্ন গুণ দিয়াছিলাম বলিয়া তাহারা ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। এবং ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল বলিয়া এক্ষণে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে।”

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালার ইতিহাস। *

(তৃতীয়খণ্ডের একটি অধ্যায়।)

মালিক ইজওয়াদ্দিন তুগ্রল তুগনখাঁ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মালিক তুগ্রল তুগন খাঁ তুরুক জাতি হইতে সমুৎপন্ন। তিনি সুন্দর ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের নিবাসস্থান করাখিতা। তিনি সদাশয়, বিনয়ী, ভদ্র, ধার্ম্মিক ও দয়ালু ছিলেন বলিয়া মিনহাজ লিখিয়া গিয়াছেন। তদানীন্তন রাজপুরুষ দিগের মধ্যে কেহই তাঁহার ন্যায় লোকপ্রিয় ছিলেন না।

সুলতান ইয়াল্‌তামাস তাহাকে ক্রয় করিয়া "সকি খাস" † পদে নিযুক্ত করেন। ঐ পদে কিছুকাল থাকিয়া তৎপর তিনি "সর দোয়াতদার" কার্য্য প্রাপ্ত হন। ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালে তিনি সম্রাটের রত্নখচিত 'কলমদান' হাড়াইয়া ফেলেন। তজ্জন্য সুলতান তাঁহার প্রতি কঠিন দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে (বোধ হয়) তাঁহাকে নির্দ্দোষী জানিয়া এক বহুমূল্য খেলাত প্রদান পূর্ব্বক রন্ধনশালার অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। তৎপর তিনি সুলতানের অশ্বশালার অধ্যক্ষের (আমির-ই-আথুর) পদ প্রাপ্ত হন। ৬৩০ হিঃ অব্দে তিনি বাদাউনের জায়গীরদার বা শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। যৎকালে মালিক সয়েফ-উদ্দিন (যুয়েঘনতাত) লক্ষ্মণাবতীর শাসন ভার প্রাপ্ত হন, সেই সময় তুগন খাঁ বিহারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৬৩১ হিঃ অব্দে সয়েফ্ উদ্দিনের মৃত্যু হইলে তুগন খাঁ তাঁহার কার্য্য প্রাপ্ত হন।

কথিত হইয়াছে মুসলমানদিগের অধিকৃত বঙ্গাংশ লক্ষ্মণাবতী নামে খ্যাত ছিল। তাহার পশ্চিমাংশ (রাঢ় প্রদেশ) লক্ষ্মণাবতী-লক্ষণৌর ও পূর্ব্বাংশ (বারেন্দ্র) লক্ষ্মণাবতী দেবকোট। এই সময়ে তুরুকজা-

*আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন কোন পাঠক কেবল ভৌগোলিক তত্ত্ব পাঠ করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। সেই দিবস "বঙ্গবাসী" সম্পাদক হাত কলমে সেই বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এই সকল পাঠকদিগের জন্য মধ্যে মধ্যে এইরূপ দুই একটি অধ্যায় প্রকাশ করিব।

† খাস পেয়ালাবাহক।

তীয় ইবেক ওরখাঁ লক্ষণৌরের জায়গীর-দারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সুলতান ইয়াল্‌তামাসের মৃত্যুর পর উক্ত জায়গীর-দার তুগনখাঁর প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণাবতীর প্রান্তবর্ত্তী বষণকোট কেল্লা অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। তুগন খাঁ সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ওর খাঁর বধকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ইহাদ্বারা সমগ্র লক্ষ্মণাবতী তুগন খাঁর করতলস্থ হইল।

সুলতান রজিয়াত সিংহাসন আরোহণ করিলে মালিক তুগন খাঁ সম্রাজ্ঞী সমক্ষে স্বীয় পদোচিত উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। রাজ্ঞী রজিয়াত তাহার প্রতিদান স্বরূপ চন্দ্রাতপ প্রভৃতি খেলাত প্রদান করিয়া তাহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তৎপর যখন সুলতান মুইজ-উদ্দিন বেরহাম সাহ সিংহাসন অধিকার করেন, তৎকালে তুগন খাঁ উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া সুলতান হইতে সম্মানসূচক চিহ্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিহার নগরীতে রাজকোষাধ্যক্ষ মৌবারক ৬৪০ হিঃ সালে যে মসজিদ নির্ম্মাণ করেন, তাহার দ্বারস্থ প্রস্তর ফলক পাঠ দ্বারা অনুমিত হয় যে, সেই প্রদেশও তুগ্রল তগন খাঁর রাজতন্ত্রের অধীন ছিল। ঐ প্রস্তর লিপিতে তাঁহাকে 'রাজা' বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। *

সুলতান আলা উদ্দিন মসুদ সাহের রাজ্যকালে তাহার খাস মন্ত্রিগণ অযোধ্যা, করা, মাণিকপুর ও উর্ণাদেশ প্রভৃতি অধিকার করিবার জন্য সম্রাটকে উত্তেজিত করে। সম্ভবতঃ তৎসম্বন্ধীয় কোন কার্য্যোপলক্ষে মালিক তুগন খাঁ মাণিকপুরে গমন করিয়াছিলেন। ৬৪০ হিঃ অব্দে তবকত ই নেছরি প্রণেতা মিনহাজ ই সেরাজ, জোর জানি দিল্লী হইতে অযোধ্যায় আগমন করেন। করা মাণিকপুরে মালিক তুগনখাঁর সহিত ঐতিহাসিক পণ্ডিত মিনহাজের সাক্ষাৎ হয়। তৎপর যখন তুগন খাঁ লক্ষ্মণাবতীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন মিনহাজ তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন।

যে মিনহাজ সেরাজের নাম আমরা বারংবার উল্লেখ করিয়াছি। মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের নবদ্বীপ বিজয় হইতে তুগন খাঁর শাসনকাল পর্য্যন্ত লক্ষ্মণাবতীর প্রকৃত ইতিহাস যে ব্যক্তি লিখিয়া গিয়াছেন। মহম্মদ বখতিয়ারের নবদ্বীপ বিজয়ের প্রায় ৪০ বৎসর পর তিনি লক্ষ্মণাবতী নগরীতে প্রথম উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার বিখ্যাত ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যদিচ আমরা তাঁহার ইতিহাসের উপযুক্ত মূল্য অস্বীকার করিতেছি না, তত্রাচ আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে মিনহাজ যাহাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহাদের বাচনিক গল্প ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন,

* মুসলমান শাসিত বাঙ্গালার যে সমস্ত প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে উল্লিখিত প্রস্তরলিপিই সর্ব্ব-প্রাচীন। ইহার প্রতিলিপি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে প্রকাশিত হইয়াছে।

আমরা তাহাদের প্রতি সপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলাম না। মহম্মদ বখতিয়ারের যে দুই একজন সহচরের সহিত তৎকালে মিনহাজের সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহারা সে সময় প্রায় ৭০।৭৫ বৎসরের প্রাচীন। সুতরাং সে সময় অবশ্যই তাহাদের বাহুবল অন্তর্হিত হইয়া বাক্যবল বৃদ্ধি হইয়াছিল। গল্পনবিস বৃদ্ধগণ নব্য বীরমণ্ডলীতে সম্মান লাভ জন্য অবশ্যই তাহাদের যৌবনকালের ঘটনা সমূহকে অতিরঞ্জিত করিয়া মিনহাজকে উপহার দিয়াছিলেন। যদিচ স্বজাতিপক্ষপাত ইতিহাস লেখকদিগের একটি সংক্রামক রোগ, তথাপি মিনহাজ তাহার সমসাময়িক ঘটনা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা প্রকৃত ও বিশুদ্ধ ইতিহাস বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি।

৬৪১ হিং অব্দে জাজনগরের রায় লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের প্রান্তবর্ত্তী স্থান লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। তাহার অন্যায় কার্য্যের প্রতিবিধান জন্য তুগন খাঁ ঐ সনের সাওয়াল মাসে জাজনগরের প্রতিকূলে যাত্রা করেন। মিনহাজ এই যুদ্ধ যাত্রায় তুগন খাঁর সহিত গমন করিয়াছিলেন। জাজনগর ও লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের সীমাস্থিত কতাসন নামক স্থানে মুসলমান সৈন্য উপস্থিত হইল (জিকাদা মাসের ৬ই তারিখ)। জাজনগরপতি তথায় উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং সেই দিবসই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রমে মুসলমান সৈন্য দুইটি পরিখা অতিক্রম করিলে, হিন্দু সৈন্য পলাইতে আরম্ভ করিল। মুসলমান গণ দুই প্রহর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া আহারাদির জন্য বস্ত্রাবাস মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, এই সময় ২৫০ জন হিন্দু বীর মুসলমান সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। বহু সংখ্যক যবন সৈন্য হিন্দুর হস্তে পরলোক গমন করিল। মালিক তুগন খাঁ কতিপয় অনুচরের সহিত পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। অদ্য আমাদিগকে এই সংবাদ জ্ঞাত করাইবার জন্য তবকত ই নেছরি প্রণেতাও প্রাণরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যে মিনহাজ হিন্দুদিগের প্রতি প্রতিছত্রে "কাফের" শব্দ প্রয়োগ করিতে বিরত হন নাই। তিনিও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, দিবা দুই প্রহরের সময় ২৫০ জন হিন্দুবীর বৃহৎ একদল মুসলমান সৈন্য খণ্ড খণ্ড করিয়া বিজয়ী পতাকায় পরিশোভিত হইয়াছিলেন। মিনহাজ স্বয়ং দর্শন করিয়া জাতীয় অবমাননা ও শত্রুর বিজয় বৃত্তান্ত যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা অবশ্যই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে।

মালিক তুগন খাঁ লক্ষ্মণাবতীতে উপস্থিত হইয়া আসারি সরিফ উল মুলককে সুলতান আলাউদ্দিন মসুদ সাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। সুলতান অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা তামুর খাঁ কি'রাণকে বৃহৎ একদল সৈন্যসহ জাজনগরবাসী হিন্দু (কাফের) দিগের, দণ্ডবিধান জন্য লক্ষ্মণাবতীতে প্রেরণ করেন।

৬৪২ হিং সালে জাজনগরের রায় তুগন

খাঁর অন্যায় আচারণের প্রতিবিধান জন্য লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করেন। ১৩ই সাওয়াল জাজনগরের রাজা লক্ষ্মণাবতী রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, হিন্দুরাজ প্রথমতঃ লক্ষণৌর নগরী অবরোধ করিয়া তথাকার জায়গীরদার ফকির উল মুলক করিমদ্দিন লাঘারিকে প্রেতপুরে প্রেরণ করিলেন। তৎপর জাজনগরপতি লক্ষ্মণাবতী অবরোধ ও লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন।

প্রাচীন মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ বারংবার বঙ্গপ্রান্তবর্ত্তী জাজনগর রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা তাহাদের লিখিত বিষয়ের মর্ম্মালোচনা করিয়া প্রবন্ধান্তরে নির্ণয় করিয়াছি যে "পূর্ব্ব ভারতের ভৌগোলিক তত্ত্ব বিশেষ রূপে অবগত হইবার পূর্ব্বে মুসলমান ইতিহাসলেখকগণ অধিকাংশ স্থলে উড়িষ্যা, কোনও স্থানে ত্রিপুরাকে জাজনগর নামে পরিচিত করিয়াছেন।" * তুগনের দর্পচূর্ণকারী, লক্ষ্মণাবতী বিজয়ী এই হিন্দুবীর কে তাহার পরিচয় পাঠকদিগকে না দিয়া নিরস্ত থাকা আমাদের কোন মতেই সঙ্গত বোধ হইতেছে না।

জাজনগরপতি লক্ষ্মণাবতী বা গৌড় নগরীতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ লক্ষণৌর নগরে উপস্থিত হন। সুতরাং আমাদের দেখা উচিত লক্ষণৌর লক্ষ্মণাবতীর কোন্ দিকে অবস্থিত ছিল। কারণ যদি আমরা দেখাইতে পারি যে লক্ষণৌর নগর বঙ্গদেশের পশ্চিম প্রান্তে স্থাপিত ছিল, তাহা হইলে অবশ্যই এস্থলে ত্রিপুরার পরিবর্ত্তে উড়িষ্যার প্রাচীন রাজধানী যাজপুর কে জাজনগর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

আমরা ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে দেখাইয়াছি যে মহম্মদ বখতিয়ারের অধিকৃত লক্ষ্মণাবতীর পশ্চিমাংশের পশ্চিম প্রান্তে লক্ষণৌর নামক স্থান ছিল। তাহার সহিত লক্ষ্মণাবতী শব্দ যোগ করিয়া রাঢ় প্রদেশকে লক্ষ্মণাবতীলক্ষণৌর আখ্যা প্রদান করা হয়। এই লক্ষৌর নগর যে রাঢ় প্রদেশের অন্তর্গত তাহা মিনহাজ স্বয়ং স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, † সুতরাং তৎসম্বন্ধে ষ্টুয়ার্ট হণ্টার প্রভৃতি নব্য লেখকদিগের নিকট প্রমাণ ভিক্ষা করিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

এই যুদ্ধ ঘটনার প্রায় ৭ বৎসর পূর্ব্বে ১১৫৮ শকাব্দে নরসিংহ দেব (প্রকাশ্য লাঙ্গুলীয়া নরসিংহ) উড়িষ্যার সিংহাসন আরোহণ করেন। উড়িয়াগণ বলে বানরের ন্যায় তাঁহার একটি ক্ষুদ্র লাঙ্গুল ছিল, এজন্য তিনি "লাঙ্গুলীয়া নরসিংহ" নামে

---

* "জাজনগর রাজ্য" ভারতী সপ্তম ভাগ, ১৪, ১৫ পৃষ্ঠা।

† The territory of Lakshanawati has two wings on either side of the river Gang. The western side they call Ral (Rarh), and the city of Lakhanor lies on that side.

Raverty's Translation of Tabakat—I—Nasiri. page 585.

খ্যাত হইয়াছিলেন। এই প্রাতঃস্মরণীয় বীরপুরুষ কর্ত্তৃক কোণার্কের জগদ্বিখ্যাত সূর্য্যমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।* "বংশাবলীর" মতে নৃসিংহ দেব অষ্টাদশ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। সুতরাং ১১৬৫—৬৬ শকাব্দে লক্ষ্মণাবতীর মুসলমানদিগের সহিত উড়িয়াদের যদি কোন কলহ হইয়া থাকে, তবে তাহা তাঁহার শাসনকালেই হইয়াছিল। যখন আমরা দেখিতে পাই জাজনগরপতি রাঢ় দেশের পশ্চিম দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন, তখন অবশ্যই এস্থলে জাজনগরের রায়কে "জাজপুর" বা উড়িষ্যাপতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। উৎকল দেশীয় ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের এই বিজয় বৃত্তান্তের কোন উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু নৃসিংহ দেব যে একজন অসাধারণ বীরপুরুষ ছিলেন এবং তিনি বারংবার পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সমূহ আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন, ইহা তাহারা লিখিতে ত্রুটি করেন নাই।

মেজর ষ্টুয়ার্ট লক্ষ্মণাবতী বিজেতা এই হিন্দুবীরকে উড়িষ্যা-পতি লিখিয়াছেন। † খ্যাতনামা হণ্টার সাহেব ইতিহাসের উপর রং চড়াইয়া ষ্টুয়ার্টের মতানুসরণ করিয়াছেন ‡। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছত্রে ছত্রে হণ্টারের পদানুসরণ করিয়াছেন।

জাতীয় পক্ষপাতান্ধ ফেরেস্তা এই ঘটনা লইয়া এক চমৎকার কাণ্ড করিয়াছেন। হিন্দুর হস্তে মুসলমানের পরাজয় বৃত্তান্ত লিখিতে তাহার লেখনী উঠিল না। তিনি লক্ষ্মণাবতী বিজয়ী হিন্দুকুলধুরন্ধর নৃসিংহ দেবকে তাতার জাতীয় জঙ্গিস খাঁ লিখিয়া গিয়াছেন।*

---

* খণ্ড গিরির গিরিগহ্বর ক্ষোদিত গ্রহাদি, ভুবনেশ্বরের মন্দির ও জগন্নাথের মন্দিরে প্রাচীন উড়িয়া শিল্পীদিগের শিল্পনৈপুণ্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষী স্বরূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু কোণার্কের (প্রকাশ্য কোণারক) সূর্য্যমন্দির,—যাহা জগদ্বিখ্যাত ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট ছিল, এক্ষণ কেবল তাহার ভাগ্নাবশেষ মাত্র দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। আবুলফাজেল তাঁহার আইন আকবরিতে লিখিয়াছেন যে, এই বিখ্যাত সূর্য্যমন্দির নির্ম্মাণ করিতে উড়িষ্যা দেশের দ্বাদশ বৎসরের রাজস্ব ব্যয় হইয়াছিল। শিব সান্ত্রা নামে এক ব্যক্তি রাজা নৃসিংহের মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে এই মন্দির নির্ম্মিত হয়, এজন্য সাধারণ লোকে অদ্যাপি ইহাকে "শিবাই সান্ত্রার দেউল" বলিয়া থাকে। শিব সান্ত্রার এই দেউল নির্ম্মাণ সম্বন্ধে আমরা অনেক গল্প উড়িষ্যা দেশে শ্রবণ করিয়াছি।

† Stewart History of Bengal. p. 62.

‡ Hunter's Orissa, Vol. II. page 4,

* খ্যাতনামা টমাস সাহেব তাহার "The Initial Coinage of Bengal" সন্দর্ভের দ্বিতীয় খণ্ডে ফেরেস্তার মতানুসরণ করিয়াছেন। উড়িষ্যার ইতিহাস লেখক ট্রালি সাহেব উল্লিখিত জাজনগরকে উ-

যে দিবস বীরকেশরী নৃসিংহ দেব তুগন খাঁর যথাসর্ব্বস্ব লইয়া প্রস্থান করিলেন, তাহার পর দিবস সম্রাটের প্রেরিত সেনাদল আসিয়া লক্ষ্মণাবতীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। হিন্দুগণ তখন চলিয়া গিয়াছে, তামুর খাঁ কাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন, যাহার সাহায্যার্থ তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন অগত্যা সেই তুগন খাঁর প্রতিকূলেই তাহার বাহুবল পরিচালিত হইল। তুগন খাঁকে অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বহিষ্কৃত করিয়া লক্ষ্মণাবতীর রাজতক্ত অধিকার করেন, ইহাই তামুর খাঁর ইচ্ছা। জাজনগরপতির সহিত কলহ করিয়া তুগন খাঁ নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তামুর খাঁর সহিত কলহ করিবার শক্তি তৎকালে তাঁহার ছিল না। অগত্যা তিনি ঐতিহাসিক পণ্ডিত মিনহাজকে মধ্যস্থ করিয়া তামুর খাঁর নিকট প্রেরণ করিলেন। তদ্দ্বারা ইহা সাব্যস্ত হইল যে, 'তামুর খাঁ লক্ষ্মণাবতীর রাজতক্ত অধিকার করিবেন এবং তুগন খাঁ তাঁহার পরিবার বর্গ ও ধন সম্পত্তি লইয়া দিল্লীতে চলিয়া যাইবেন। তদনুসারে তুগন খাঁ তামুর খাঁকে লক্ষ্মণাবতী সমর্পণ করিয়া দিল্লী গমন করিলেন। তবকত ই নেছারি লেখক মিনহাজ দুই বৎসরকাল লক্ষ্মণাবতীতে বাস করিয়া সেই প্রদেশে মুসলমান শাসন কালের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করত তুগন খাঁর সহিত প্রস্থান করিলেন।

৬৪৩ হিঃ সালের ১৪ই সাফর সোমবার তুগন খাঁ দিল্লীতে উপস্থিত হন। তাহার একমাস পরে সুলতান তাঁহাকে অযোধ্যার জায়গীরদারের পদে নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

তৎপর ৬৪৪হিঃ সালে যখন সুলতান মহম্মদসাহ সিংহাসন আরোহণ করেন, সেই সময় তুগন খাঁ অযোধ্যায় গমন করিয়াছিলেন। তথায় অল্পদিন পরেই তিনি পরলোক গমন করেন। (২৯ সাওয়াল ৬৪৪ হিঃ সাল) ।

শ্রী—সিংহ।

ডিষ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। Asiatic Researches Vol V page 274.

দুর্গাদাস।

এই মহাপুরুষ মরুস্থলী-প্রবাহিত লুনী নদীর তীরস্থিত দ্রোণারা ও গঙ্গানি নামক জনপদদ্বয়ের সামন্তরাজ ছিলেন। বীরাগ্রগণ্য রাজপুত-জাতির জ্ঞানগরিমা ও শৌর্য্যবীর্য্যের উচ্চতম আদর্শ এই রাঠোর-বীরপুরুষ মহাপরাক্রান্ত হিন্দুবিদ্বেষী সম্রাট্ আরঙ্গীবের নিদারুণ উৎপীড়ন হইতে স্বকীয় ভুজবীর্য্য ও বুদ্ধিকৌশলে স্বদেশের উদ্ধারসাধন করিয়া জগতে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই বুদ্ধিকৌশলে দুরন্ত মুসলমানগণ যোধপুরের অদীনপরাক্রম সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ যশোবন্তসিংহের বিধবা রাজ্ঞীর ও তদীয় অপোগণ্ড রাজকুমার দ্বয়ের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই। যতদিন পৃথিবীতে বীরত্ব, প্রভুভক্তি ও স্বদেশহিতৈষিতার সম্মান থাকিবে, যতদিন অমানুষিক সাহসিকতা, পৌরুষকার, ন্যায়পরায়ণতা ও পরিণামদর্শিতার সম্মান থাকিবে, ততদিন বীরকেশরী দুর্গাদাস বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় থাকিয়া সহৃদয় ব্যক্তির ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইতে থাকিবেন সন্দেহ নাই। এই রাঠোর বীর-কেশরীকে ভারতের একাধীশ্বর প্রবল পরাক্রান্ত মোগলসম্রাট্ আরঙ্গীব কীদৃশ ভয় করিতেন তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। পাঠকবর্গের কৌতুহল পরিতৃপ্তির জন্য আমরা মহামতি টড্সাহেব প্রণীত "রাজস্থানের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে তাহা অনুবাদিত করিয়া দিলাম। বলা বাহুল্য যে উক্ত গ্রন্থ ও এল্ফিন্ষ্টোন প্রণীত ভারতেতিহাসই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। সংক্ষিপ্ততা ও অসম্পূর্ণতা পাঠকবর্গ নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন।

দিল্লীশ্বরের প্রধানতমশত্রু মহারাষ্ট্রপতি মহারাজ শিবজী ও রাঠোর বীর মহামতি দুর্গাদাসের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কনের ভার জনৈক চিত্রকরের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। শিবজী শয্যোপরি উপবিষ্ট ছিলেন। দুর্গাদাস অশ্বারূঢ় হইয়া হস্তস্থিত বর্ষাগ্রভাগে আহার্য্য ভুট্টানির্ম্মিত রোটিকা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতেছিলেন। চিত্রদ্বয় অবলোকনমাত্র সম্রাট্ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "সম্ভবতঃ ইহাকে (শিবজী) কালক্রমে মদীয় করকবলে আনয়ন করিতে পারিব, কিন্তু এই কুকুর (দুর্গাদাস) আমারই সর্ব্বনাশের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে।"

১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে অদীনপরাক্রম মহারাজ যশোবন্তসিংহ পুণ্যসলিল সিন্ধুনদের পরপারবর্ত্তী আটকে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি ৪২ বৎসর পর্য্যন্ত মাড়োয়ারের সিংহাসনে সমাসীন থাকিয়া উহা সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে সম্রাট্ আরঙ্গীব কর্ত্তৃক তিনি নববিজিত কাবুলের শাসন-ক-

র্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যুবরাজ পৃথ্বী-সিংহ দুরাত্মা সম্রাটের চাতুর্য্যে অকালে কালকব- লিত হইয়াছিলেন। রাণী চন্দ্রাবতী ও অন্য সাতজন রাজপ্রণয়িনী মহারাজের নিদারুণ মৃত্যুসংবাদে ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে চিতারো- হণ করিলেন। প্রভুভক্ত উদয়সিংহ অন্তঃ- স্বত্বা অপরা রাজমহিষীকে প্রিয়পতিদেবের চিতাধিরোহণ হইতে বল প্রয়োগপূর্ব্বক নি- বারণ করিতে বাধ্য হইলেন। সমস্ত মা- ড়োয়ার গভীরশোকে নিমজ্জিত হইল। যথাসময়ে মহারাণী মাড়োয়ারের ভাবী অধিপতিকে প্রসব করিয়া সমস্ত রাঠোর- জাতির আনন্দবর্দ্ধন করিলেন। তাঁহাদের নিরাশাচ্ছাদিত হৃদয়ে নূতন আশা সঞ্চারিত হইল। প্রসবক্লেশাবসানের পর সম্রাটের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই মহারাণী স্বীয় অপোগণ্ড পুত্র ও স্বজনানুচর সমভি- ব্যাহারে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে আটকের দুর্গস্থিত সম্রাট্‌সেনাগণ তাঁহার পথরোধ করিলে, তদীয় আনুযাত্রি- কবর্গ বল প্রকাশপূর্ব্বক সিন্ধুনদোত্তরণে অ- কৃতকার্য্য হইয়া, অরক্ষিত স্থানান্তরে সিন্ধু- নদোত্তরণ করিলেন। তাঁহারা দিল্লীতে পৌঁছিলে ধূর্ত্ত সম্রাট্ মাড়োয়ারের ভাবী মহারাজকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে শূরোত্তম রাঠোরসামন্তগণের প্রতি আদেশ প্রচার করিলেন। সমস্ত মাড়োয়ার সাম- ন্তবর্গের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিবেন ব- লিয়া তাঁহাদিগকে লোভ প্রদর্শন করিতেও ক্রটি করিলেন না। সাম্রাজ্যপ্রাপ্তিবাসনা যাঁহাকে পূজ্যতম পিতৃদেবকে কারারুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, রাজ্যভোগ যাঁহাকে ভ্রাতৃবধের দুরপনেয় কলঙ্কে নিম- জ্জিত করিয়াছিল, অবিশ্বাস, ধূর্ত্ততা ও নৃশং- সতা যাঁহার রাজ্যশাসনের মূলমন্ত্র ছিল, তিনি রাজপুতের রাজভক্তি ও স্বদেশবৎস- লতার মাহাত্ম্য বুঝিতে যে অক্ষম হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? মহানুভব রা- জপুতসামন্তগণ ক্রোধোৎফুল্ললোচনে "বাহু- বলেই আমরা স্বদেশ ও স্বীয় প্রভুকে রক্ষা করিব" সগর্ব্বে এই শূরোচিত উক্তি করিয়া অনতিবিলম্বে সম্রাট্‌সভা পরিত্যাগ করি- লেন। সম্রাট্‌সৈনিকেরা অবিলম্বে তাঁহা- দের বাসস্থান অবরোধ করিল। এই বি- পদে রাজপুতবীরপুরুষেরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় না হইয়া বীরকেশরী দুর্গাদাসকে তাঁহাদের অধিনেতৃত্বপদে বরণ করিলেন। তিনি বন্ধুবর্গ সমীপে মিষ্টান্নপ্রেরণ ব্যপদেশে সমাতৃক শিশু মহারাজকে জনৈক সুবিশ্বস্ত মুসলমান অনুচর দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট নিরা- পদ স্থানে অনতিবিলম্বে প্রেরণ করিয়া, স্বদেশের সম্মানরক্ষার্থ যুদ্ধে বাহুবীর্য্য প্র- দর্শন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। দুরন্ত মুসলমানদিগের অপবিত্র হস্তে কলঙ্কিত হওয়ার আশঙ্কায় শূরবালা রাজপুত রমণীগণ বারুদপূর্ণ একটি গৃহে একত্রিত হইয়া অসঙ্কুচিত হৃদয়ে প্রচণ্ডহু- তাশনমুখে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। এই রোমহর্ষণ অগ্নিকাণ্ডানুষ্ঠানের পর রাজপুত বীরপুরুষেরা মুসলমানদিগের সম্মুখীন হইয়া ভীষণযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৭৩৬ সংবতের ৭ ই শ্রাবণ এই ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘ-

টিত হয়। * যত দিন পৃথিবীতে মানবজাতি বিদ্যমান থাকিবে, ততকাল এই অসীম-পরাক্রম রাঠোর-বীরপুরুষ ও অদ্ভুতকর্ম্মা রাঠোরবীরাঙ্গনাগণের কীর্ত্তিকলাপ জগতের ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইবে না। যত কাল পৃথিবীতে শৌর্য্য বীর্য্য ও স্বদেশহিতৈষণার সম্মান থাকিবে, ততকাল ইহাঁরা সহৃদয়বর্গের ভক্তি ও প্রীতির পবিত্র পুষ্পাঞ্জলি পাইতে থাকিবেন সন্দেহ নাই।

যে বিশ্বস্ত মুসলমানের হস্তে শিশুরাজা সমর্পিত হইয়াছিলেন, তিনি উত্তরকালে প্রচুর সম্মান ও ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া স্বকীয় অসাধারণ প্রভুভক্তির নিমিত্ত পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। তদীয় বংশধরেরা এখনও সেই ভূসম্পত্তি উপভোগ করিয়া আসিতেছেন। মুসলমান জাতীয় একজন (সম্রাট্ আরঙ্গীব) রাজপুতদিগের দুর্দ্দশার একশেষ করিয়া স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতা ও নীচাশয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া অতীতসাক্ষী ইতিহাসের পবিত্রদেহ কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। তজ্জাতীয় অপর একজন বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

* ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মিষ্টান্নপ্রেরণ ব্যাপদেশে মহারাজ শিবজী সপুত্র পলায়ন করেন।

মহামতি এলফিন্‌ষ্টোন সাহেব প্রণীত ইতিহাসের ১৮৫৭ সনের চতুর্থ সংস্করণের পুস্তকের ৫৬১—৬২ পৃষ্ঠায় উক্ত ঘটনার সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিবরণ দৃষ্ট হয়।

শূরশ্রেষ্ঠ দুর্গাদাস হতাবশিষ্ট রাজপুতগণ সমভিব্যাহারে নানা বিঘ্নবিপদ অতিক্রম করিয়া নির্দ্দিষ্টস্থানে রাজকুমারের সহিত সম্মিলিত হইলেন। দুর্গাদাস কয়েকজন সুবিশ্বস্ত বন্ধু সমভিব্যাহারে মহারাজ যশোবন্ত সিংহের একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারীকে জনমানববিরহিত আবুপর্ব্বতের শিখরস্থিত জনৈক তাপসের আশ্রমে রাখিয়া আসিলেন। এইরূপে তাপসাশ্রমে স্বকীয় জন্মমর্য্যাদানভিজ্ঞ ভাবী মাড়োয়ারাধিপতি অজ্ঞাতবাসে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। এদিকে মাড়োয়ারের ভূতপূর্ব্ব অধিপতি পুরিহর রাজপুতগণ শিশু মহারাজ অজিতসিংহের অজ্ঞাতবাস ও অপ্রাপ্তবয়স্কতা রূপ সুযোগে প্রাচীন-রাজপাট মন্দোরনগরী অধিকার করিলেন, মহারাজ যশোবন্ত সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র রতন সিংহ ধূর্ত্ত সম্রাট্ কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া রাজধানী যোধপুরগ্রহণে প্রয়াসী হইলেন। প্রভুভক্ত বীরপ্রবর রাঠোরগণ পুরিহরদিগকে মন্দোরনগরী হইতে বিদূরিত করিয়া দিলেন। রতনসিংহও তদীয় আবাসদুর্গ নাগোরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

রাজপুত জাতির উচ্ছেদমানসে সম্রাট্ বহুসৈন্য সমভিব্যাহারে আজমীরে উপস্থিত হইয়া সপ্ততিসহস্র সেনাসহ টাইবর খাঁ নামক জনৈক সুদক্ষ সেনাপতিকে মাড়োয়ারে প্রেরণ করিলেন। নিষ্ঠুর মুসলমানগণের রোমহর্ষণ অত্যাচারে রাজপুতগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। শ্যা-

মল শস্য পরিশোভিত প্রদেশ সমূহ অনুর্ব্বরতায় পরিণত হইল। পবিত্র সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বিধর্ম্মীদিগের পাদদলিত হইতে লাগিল। অত্যাচার ও অরাজকতা সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

চিতোর, উদয়পুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরী সমূহ ক্রমে মুসলমানদিগের হস্তগত হইতে লাগিল। ইতি মধ্যে সুচতুর দুর্গাদাস ঝালোর আক্রমণ করিয়া বিধর্ম্মী শত্রুদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। বিপন্ন সেনানায়ক বেহারীর সাহায্যার্থে সম্রাট মোকর খাঁকে ঝালোরে প্রেরণ করিলেন। দুর্গাদাস নগরবাসীদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া ঝালোরের অবরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সসৈন্যে যোধপুরে উপনীত হইলেন। অবশেষে রাঠোর বীরপুরুষদিগকে অর্ব্বলীপর্ব্বতমালার নিভৃত প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। তথায় থাকিয়া তাঁহারা সুযোগানুসারে অতর্কিতভাবে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত ও সন্ত্রস্ত করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বেই সুচতুর সম্রাট্ মাড়োয়ারের বিরুদ্ধে স্বকীয় সমস্ত অসংখ্য সৈন্য পরিচালন মানসে মেওয়ারের মহারাণার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই মাড়োয়ারের অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজ অজিতসিংহকে আশ্রয় প্রদানাপরাধে মহারাণা সম্রাটের বিরাগভাজন হইয়া উঠিলেন। যুবরাজ ভীমসিংহ মেওয়ারের সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া গড়োয়ার নামক স্থানে ইন্দ্রভাণ ও দুর্গাদাসের রাঠোর সেনা সহ সম্মিলিত হইলেন। সম্রাট্ স্বকীয় প্রিয়তম পুত্র আকবর ও টাইবর খাঁ নামক সুদক্ষ সেনাপতিকে অদীন পরাক্রম রাজপুত সেনাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। নদোলের ভীষণযুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মী বীরকেশরী রাজপুতদিগের পক্ষাবলম্বন করিলেন। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে শীতকালে এই ঘোরতর যুদ্ধ হয়।

এই অসম সমরে স্বদেশহিতৈষী প্রভুপরায়ণ রাজপুতগণের অদ্ভুত রণনৈপুণ্য, সাহসিকতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা দর্শনে মোগল সেনানায়ক মহানুভব আকবরের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি পিতার নিষ্ঠুর রাজনীতির অবৈধতা ও অযৌক্তিকতা স্পষ্টহৃদয়ঙ্গম করিয়া একান্ত দুঃখাভিভূত হইলেন। দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁহার সদয় হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পিতৃভক্তি শিথিল করিয়া দিল। পিতৃদ্রোহী হইয়া রাজপুতবীরগণের সহিত সম্মিলিত হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পিতৃদেবকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া স্বয়ং দিল্লীশ্বর হইয়া পিত্রানুসরিত উপায়াবলম্বনে অভিলাষী হইলেন। টাইবর খাঁর নিকট মনোগত অভিপ্রায় অনতিবিলম্বে ব্যক্ত করিয়া নানাবিধ প্ররোচনায় মোগলসেনাপতিকে স্বপক্ষে আনয়ন করিলেন। অবিলম্বে রাজপুতসেনানায়ক শূরশ্রেষ্ঠ দুর্গাদাসের শিবিরে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। দুর্গাদাস সমাগত রাজপুতসামন্তগণকে সন্ধির প্রস্তাব অবগত করাইলে কেহ কেহ ইহা সম্রাট তনয়ের

প্রতারণা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা মহানুভব দুর্গাদাসের নিঃস্বার্থপরতায় সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন। দুর্গাদাস সমবেত সামন্তবর্গকে সন্ধির যৌক্তিকতা বুঝাইয়া দিলেন। সম্রাটসুতের প্রস্তাবে অসম্মতি তাঁহাদের ভয়বিহ্বলতা বলিয়া পরিগণিত হইবে অনুমান করিয়া সামন্তগণ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন।

অনতিবিলম্বে যুবরাজ আকবর সম্মিলিত ও সৌহার্দ্দপাশবদ্ধ হিন্দু মুসলমানগণ কর্ত্তৃক সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। রাজশ্রী নবাভিষিক্ত সম্রাট্‌মস্তক পরিশোভিত করিল। যুবরাজ আকবর ও রাজপুত বীরগণের সম্মিলনে আরঙ্গীবের সিংহাসন টলটলায়মান হইল। অগৌণে এই সংবাদ আজমীরে সম্রাট্‌শিবিরে পৌঁছিল। অবিচলিত চিত্তে সম্রাট্ কৌশলে দুর্দ্ধর্ষ রাজপুতদিগকে বিদ্রোহী যুবরাজের পক্ষ হইতে বিযুক্ত করিবার উপায়নির্দ্ধারণে ব্যস্ত হইলেন। তৎকালে তিনি নিঃসহায় হইয়াছিলেন, তাঁহার অধীনে কোনও সেনা ছিল না। কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিকী ধূর্ত্ততা, চাতুরী ও কৌশল স্বীয় অকৃতজ্ঞ সেনাগণের ন্যায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। এই অভূতপূর্ব্ব বিপদে অবশেষে তাহাদেরই আশ্রয় অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি বিপন্মুক্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যুবরাজ আকবর বহুসংখ্যক সৈনিক সমভিব্যাহারে আজমীরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ইন্দ্রিয় ভোগবিলাসে প্রমত্ত হইয়া নবাভিষিক্ত পিতৃদ্রোহী সম্রাট্ টাইবরখাঁর হস্তে সমস্ত কার্য্যভার সমর্পণ করিলেন। ধূর্ত্ত সম্রাট্ টাইবর খাঁকে বহু প্রলোভনে হস্তগত করিলেন। বিশ্বাসঘাতক টাইবর একদা নিশীথে স্বসৈন্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্রাট্‌শিবিরে যাইয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে রাঠোরদিগকে লিখিলেন "পিতাপুত্রে সম্মিলিত হইয়াছেন, আপনারা অবিলম্বে স্বদেশে প্রস্থান না করিলে বড় বিপদে নিপতিত হইবেন।" এই লিপি স্বনামাঙ্কিত মোহরে পরিশোভিত করিয়া জনৈক অনুগত ভৃত্যকে ফকীরবেশে রাজপুতশিবিরে প্রেরণ করিলেন এবং অনতিবিলম্বে স্বকীয় বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশ্রুত ফলোপভোগজন্য সম্রাট্‌সদনে উপস্থিত হইলেন। সম্রাটকে তদীয় আদেশ প্রতিপালনের কথা জ্ঞাপন করিবার পূর্ব্বেই সম্রাটের স্বহস্তস্থিত গদাঘাতে স্বকীয় ঘৃণিত জীবন উৎসর্গ করিয়া টাইবর স্বীয় ঘোরতম বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

গভীর নিশীথে দূত রাঠোরশিবিরে উপনীত হইয়া বিশ্বাসঘাতক মোগলসেনানীর লিপি প্রদান পুরঃসর তাঁহার মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিল। তথায় তুমুল গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। রাজপুত-বীরগণ অশ্বারোহণে স্ব স্ব শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয়ানুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইয়া বিংশতি মাইল দূরে গমন করিয়া শিবিরসন্নিবেশ করিলেন। অবিলম্বে বিলাসমগ্ন আকবরের সৈন্যমধ্যে এই সংবাদ প্রচারিত হইল। অচিরে মোগলসেনাগণ তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নপর হ-

ইল। পরদিবস কিঞ্চিদ্দূরে সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে কুমার আকবর ভয়াতুর সন্দিগ্ধচিত্তে রাজপুতমিত্রবর্গের সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রকৃত ঘটনাবর্ণনপূর্ব্বক সপরিবারে তাঁহাদিগের শরণাপন্ন হইলেন। এই বিপদসঙ্কুলসময়ে নিরাশ্রয় সম্রাট্‌কুমারের সাহায্য প্রদানের ঔচিত্যানৌচিত্য নির্দ্ধারণার্থ রাজপুতসামন্তগণ সমবেত হইলেন। বীরশ্রেষ্ঠ আশ্রিতবৎসল মহামতি দুর্গাদাসেরই প্ররোচনায় পিতৃকোপানলে নিপতিত নিরাশ্রয় বিপন্ন সম্রাট্‌তনয় সপরিবারে চিরাতিথের রাজপুতগণের আশ্রয়প্রাপ্ত হইলেন।

বিশ্বস্ত ও প্রভুপরায়ণ অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে অদীনপরাক্রম সুকৌশলময় দুর্গাদাস সম্রাট্‌তনয়কে সঙ্গে লইয়া মাড়োয়ারের পশ্চিমপ্রান্তে উপনীত হইলেন। তিনি মনে ভাবিয়াছিলেন যে, ক্রুদ্ধ সম্রাট্ লুনী নদীর সমীপবর্ত্তী বিভীষিকাময়ী মরুস্থলীর মধ্য দিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিবেন। কিন্তু সুচতুর সম্রাট্ তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবিত না হইয়া নানা কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি মহানুভব রাজপুতসেনানায়ক দুর্গাদাসকে বশীভূত করার মানসে উৎকোচ প্রেরণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই সম্রাট্‌প্রেরিত রাশীভূত অর্থ * দুর্দ্দশাপন্ন সম্রাট্‌কুমারের অভাবমোচনার্থ প্রদান করিয়া স্বকীয় মহনীয় নিঃস্বার্থপরতার উৎকর্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক জগৎ চমকিত ও বিস্ময়মুগ্ধ করিলেন। বিস্ময়মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ আকবর-প্রদত্ত অর্থের কিয়দংশ দুর্গাদাসের প্রভুভক্ত অনুচরবর্গের মধ্যে বিভাজিত করিয়া দিলেন। এই উপায়ে সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য্য হইয়া সম্রাট্ পিতৃদ্রোহী পুত্রের অনুসরণার্থ একদল সেনা প্রেরণ করিলেন। দুর্গদাস প্রতিহিংসাপরায়ণ নির্ম্মমহৃদয় সম্রাটের হস্ত হইতে শরণাপন্ন সম্রাট্‌তনয়কে রক্ষা করিতে সংকল্পারূঢ় হইয়া সহস্রানুচর সমভিব্যাহারে কুমার আকবরসহ দাক্ষিণাত্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সম্রাট্‌সেনা ঝালোর পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। ক্রোধোন্মত্ত সম্রাট্ যুবরাজ আজিমকে রাঠোরগণের উচ্ছেদসাধনোদ্দেশে এবং পিতৃদ্রোহী কুমারকে ধৃত করার জন্য প্রেরণ করিলেন। দক্ষিণপার্শ্বে গুজরাট ও বামপার্শ্বে চাপন রাখিয়া কুমার আকবর সমভিব্যাহারে দুর্গাদাস নর্ম্মদাতীরে উপনীত হইলেন। তদীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা বীরকেশরী সোনিং তাঁহার অনুপস্থিতিকালে মহারাজ অজিতসিংহের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত রহিলেন।

১৭৪৪ সংবতের ১০ই ভাদ্র দুর্গাদাস দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পোকর্ণনামক স্থানে মহারাজ অজিতসিংহ ও তদীয় প্রভুপরায়ণ অনুচরবর্গের সহিত সম্মিলিতহইলেন। এই লোমহর্ষণ যুদ্ধপরম্পরা দুর্গাদাসের জীবনীর সহিত অসংস্পৃষ্ট বিধায়, তাহা বর্ণনে বিরত রহিলাম। নিতান্ত দুঃখের বিষয় অতঃপর বীরকেশরী দুর্গাদাসের ধারাবাহিক

* মেওয়ারের কবিবর্ণিত ইতিহাসানুসারে ৮০,০০০, টড্ সাহেবের মতে ৮,০০০ স্বর্ণমুদ্রা।

জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতে পারিলাম না। যাহা কিছু সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে বিদায় হইলাম।

সংবৎ ১৭৪৭ অব্দে দুর্গাদাস আজমীরের তদানীন্তন মোগলশাসনকর্ত্তা স্নেফি খাঁকে আক্রমণ করিতে সংকল্পারূঢ় হইয়া তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। মোগলশাসনকর্ত্তা পরাভূত হইয়া আজমীরের দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। এই সংবাদ শ্রবণে সম্রাট্ সেফি খাঁকে লিখিলেন যে, যদি তিনি দুর্গাদাসকে পরাজিত ও দূরীভূত করিতে পারেন, তবে তাঁহাকে স্বীয় অমাত্যবর্গের মধ্যে অধিকতর সম্মানিত করিবেন। যদি তাহা না পারেন, তবে তাঁহাকে স্ত্রীপরিধেয় হস্তভূষণ পাঠাইয়া দিবেন এবং অনতিবিলম্বে যোধপুরের শাসনকর্ত্তা সুজেত খাঁকে তৎপদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

পরবৎসর মেওয়ারের মহারাণা জয়সিংহের প্রাধান্য সংস্থাপন মানসে দুর্গাদাস সসৈন্যে পিতৃদ্রোহী যুবরাজ অমরসিংহের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন।

এত কাল পর্য্যন্ত সম্রাট্পৌত্রী আকবরতনয়া দুর্গাদাসের তত্ত্বাবধায়কতায় সসম্মানে সংরক্ষিতা হইতেছিলেন। ১৭৪৯ সংবতাব্দে তিনি সম্রাট্সদনে প্রেরিতা হইলে, সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, মহারাজ অজিতসিংহ যোধপুর পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। স্বদেশবৎসল মহানুভব দুর্গাদাস পাঁচহাজারী মন্সবদারের পদগ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া, ঝালোরাদি প্রদেশচতুষ্টয় মাড়োয়ারভুক্ত করিয়া লইলেন। ১৭৫৭ সংবতাব্দে মহারাজ অজিতসিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় হস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

পাঠক একবার এই ত্রিংশৎবর্ষীয়যুদ্ধাবসানে এই অমিতপরাক্রম রাঠোর-বীরকেশরীর চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন। দুর্গাদাস রাজপুতজাতীয় সমস্ত গুণগ্রামের একাধার ছিলেন। তিনি ধূর্ত্ত সম্রাটের অশেষবিধ প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যসম্পাদনে বিমুখ হন নাই। সম্রাট্ তাঁহাকে স্ববশে আনয়ন আশয়ে তৎসমীপে প্রভূত অর্থ প্রেরণ করিলেন, তিনি তাহা স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া অম্লানচিত্তে দুর্গত সম্রাট্কুমারকে প্রদান করিলেন। সম্রাট্-সভায় যে সম্মান লাভ করিবার জন্য মেওয়ারের সূর্য্যবংশোদ্ভব মহারাণা ও হরবংশীয় বুন্দীরাজগণ ভিন্নবীরধাত্রী রাজপুতনার সমস্ত রাজন্যবর্গ মোগল কুলতিলক সম্রাট্ আকবরের সময় হইতে স্বদেশের স্বাধীনতা এবং স্বজাতির গৌরব অশঙ্কুচিতচিত্তে উৎসর্গীকৃত করিয়া আসিতেছিলেন; যে পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজপুতরাজগণের ও প্রধানসামন্তবর্গের সমশ্রেণীস্থ হইতে পারিতেন, সেই লোভনীয় ও বহুসম্মানপ্রদ পদগ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি পার্থিব সম্মান তুচ্ছ করিলেন, কারণ সম্রাট্প্রদত্ত কোনও পদ তদুপযোগী ছিল না। ধন্য বীরপ্রসবিনী মাড়োয়ার! ধন্য প্রভুপরায়ণ ও স্বদেশ-

বৎসল দুর্গাদাস! তাঁহার বীর-শ্রেষ্ঠ ভ্রাতা সোনিং নির্দ্দয়রূপে মুসলমানদিগের হস্তে নিহত হইলেন। কিন্তু সেই ভ্রাতৃহন্তারককে করকবলিত এবং সক্ষমতাধীনে পাইয়াও তাঁহার বা তজ্জাতীয় কাহারও উপর কোন রূপ অত্যাচার ও নির্দ্দয়তা প্রদর্শন করিয়া স্বকীয় বিমল যশঃপ্রভা কলঙ্কিত করেন নাই। বিপন্নকে আশ্রয়দান রাজপুতদিগের কুলধর্ম্ম। পিতৃদ্রোহী কুমার আকবরকে আশ্রয় দিয়া পিতৃকোপানল হইতে তাঁহাকে রক্ষা করত নিরাপদে মহারাষ্ট্রীয়দের আশ্রয়ে রাখিয়া ছিলেন। কুমারের সমস্ত পরিবারের প্রতি সদয় ব্যবহার ও যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। অতি শৈশবাবস্থায় মহারাজ অজিতসিংহের ছয় বৎসর অজ্ঞাতবাস, তদভিভাবক দুর্গাদাসের অটল প্রভুভক্তি, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও অপ্রতিহত শাসন প্রভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি অনুষ্ঠিত সৎকার্য্যের জন্য অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার কার্য্যপরম্পরা আবহমানকাল পর্য্যন্ত রাজপুতগণের আদর্শস্থল হইয়া থাকিবে। ধবলাশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় বর্ষীয়ান্ তেজস্বী ও শৌর্য্য বীর্য্যবান্ দ্রোণারাপতির প্রতিমূর্ত্তি রাজপুতনার গৃহে গৃহে সম্মানিত হইবে।

মহারাজ অজিতসিংহের দুরপনেয় কলঙ্কের উল্লেখ করিয়া আমরা ক্ষুব্ধচিত্তে প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। তাঁহার শৈশবের রক্ষাকর্ত্তা, যৌবনের শিক্ষক ও পরিচালক বীরকেশরী দুর্গাদাস কোন অজ্ঞাত কারণে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া 'রাজন্যবর্গে বিশ্বাস স্থাপন অনুচিত' এই চিরপ্রচলিত প্রবাদবাক্যের সত্যতা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। যিনি পুনঃ স্বার্থ ত্যাগের উচ্চতম আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, যিনি স্বীয় প্রজ্ঞা, সাহস, প্রভুভক্তি, ন্যায়পরায়ণতা, স্বদেশবৎসলতা ও শৌর্য্য বীর্য্যে ভারতের একাধীশ্বর প্রবলপরাক্রান্ত আরঙ্গীবের বিদ্বেষানল হইতে স্বদেশের রক্ষা সাধন করিয়া বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয় হইয়াছেন, যিনি স্বদেশের ঘৃণিত অধীনতাপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া মোগলসম্রাজ্যবিধ্বংসের সূত্রপাত করিয়া যান, কোন সময়ে কি কারণে সেই অমিতবল মহাপুরুষকে দেশ-বহিষ্কৃত করিয়া মহারাজ অজিতসিংহ আপনাকে কলঙ্কিত করিয়াছিলেন তাহা জানাযায় নাই। কারণ প্রভুভক্ত রাজপুত কবি মহারাজের নিন্দাবাদ প্রচারিত করিয়া স্বীয় হস্ত কলুষিত না করত সত্যের অপলাপ করিয়া গিয়াছেন। সাময়িক কবি এই মাত্র লিখিয়াছেন—"দুর্গা দেশ ছে কর্‌জিয়া গোলা গঙ্গানি" দুর্গাদাস দেশ বহিষ্কৃত হইলে গঙ্গানিনামা গ্রাম জনৈক রাজানুচরদাস প্রাপ্ত হইল। দুর্গাদাস স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া স্বীয় বিশ্বস্তানুচর সমভিব্যাহারে উদয়পুরের মহারাণার আশ্রয় প্রাপ্তির আশয়ে তথায় উপস্থিত হইয়া 'পেশোলা' হ্রদতটে শিবির সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভরণপোষণার্থ মহারাণা দৈনিক পাঁচ শত টাকা প্রদান করিতেন। দিল্লীশ্বর বাহাদুর সাহা মহারাণাকে পিতৃশত্রু দুর্গা-

দাসের প্রত্যর্পণ জন্য লিখিলে তিনি এই গর্হিত ও অনাতিথেয় কার্য্য সম্পাদনে অস্বীকৃত হইয়া স্বকীয় মহানুভবতার পরিচয় প্রদান করিলেন।

বীরপ্রবর দুর্গাদাসের জীবনীর সহিত অজিতসিংহের রাজত্বসময়ের ঘটনাবলী ঘনিষ্টসূত্রে সম্বদ্ধ। তজ্জন্য পাঠবর্গকে মহামতি টডের অমূল্য গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, মহারাণা অজিতসিংহ অসময়ে স্বকীয় নরাধম পুত্র অভয়সিংহের হস্তে নিহত হইয়া স্বীয় অকৃতজ্ঞতারূপ ঘোরপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।

শ্রীঃ—

অগ্নিকুল।

(সপ্তম খণ্ড ৫৪৫ পৃষ্ঠার পর।)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পাশ্চাত্য পোপের ন্যায় ভারতের ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বগ্রাসী ক্ষমতাবান্ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন,—সংসারে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট তাহা তাঁহাদের হস্তগত ছিল। তপস্যা, জ্ঞানানুশীলন, বেদপাঠে অপরের অধিকার ছিল না,—আর সকল মনুষ্য পশুবৎ তাঁহাদের করধৃত রজ্জুতে চালিত হইত। এই সকল স্বার্থপরতা ও একদেশ ভাব ধ্বংস করিয়া সকল মানব সমাজকে স্বাধীন ও সাধুপন্ন করিবার জন্যই শাক্যবংশে এক নরসিংহ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার সাধনাসিদ্ধ বাসনা পূর্ণ হইয়াছিল। বিশ্বব্যাপী প্রেমাধার তিনি সকলের সম্মুখে খুলিয়া দিয়াছিলেন, নিরীশ্বর হইয়াও সুনীতি গুণে এবং নিকৃষ্টবর্ণ হইয়াও বৈদিক ক্রিয়া না করিয়া মানব যে স্বয়ং দেবতা হইতে পারে, তিনি স্বীয় জীবনে তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।—স্বাধীনতা, মুক্তি, বিশ্বময় প্রেম, জগন্ময় শ্রদ্ধা, সর্ব্বত্বে একত্ব, একত্বে-সর্ব্বত্ব ও সর্ব্বে অভিন্নত্ব ইহাই তাঁহার নীতিসার হইয়াছিল। ফলতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম নিরীশ্বরতা দোষ-দুষ্ট হইয়াই তাঁহার পবিত্র নীতিসার সাধুহস্তে অমৃত ও অসাধুহস্তে বিষস্বরূপ হইয়াছে। জগতের উপকার করিতে গিয়া চৈতন্য যেমন কতকগুলিন ভিক্ষুক ও কুক্রিয়ারত কুৎসিত নরনারী রাখিয়া গিয়াছেন, শাক্যসিংহও সেইরূপ কতকগুলি লোভী, স্বার্থপর ও অপরিণামদর্শী শিষ্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং তাহারা "জগতের আমি"—না হইয়া "জগৎ আমার" এই ভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পারশনাথ এখন ত্রয়োবিংশ বুধনামে অভিহিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম পুনরুত্থান করিতেছিলেন। শাক্যসিংহ রাজপুত্র হইয়াও চির-

চরিত্র ভাবে আপন মহান্ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন,—ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য তাঁহার পবিত্র দারিদ্রের কাছে পুরীষবৎ ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য হইয়াছিল। কিন্তু পারশনাথ সেরূপ দরিদ্র নহেন। শাক্যসিংহের দারিদ্র্য প্রয়োজনাভাবজন্য—পারশনাথের দারিদ্র্য বাহ্য সৌষ্ঠবজন্য। খৃষ্ট দরিদ্রের বেশে যে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন পারশনাথও তদ্রূপ করিতেছিলেন। খৃষ্ট মৃত্তিকায় বসিয়া বিচার করিতেন, দণ্ড দিতেন, ধর্ম্মভাবে পরের শস্যাগার লুঠ করিতে হুকুম দিতেন, পারশনাথও তাহাই করিতেন। তথাপি পারশে ও খৃষ্টে কিছু ব্যবধান দৃষ্ট হইবে। খৃষ্ট জনের * স্ফুলিঙ্গে ফুৎকার দিয়া আগুন করিতেছিলেন, পারশনাথ শাক্য সিংহের প্রচণ্ড অনলকুণ্ডে ইন্ধন যোগাইতেছিলেন। ইহা করিতে গিয়া তিনি শাল তমাল তরু হইতে শিশু চন্দন প্রভৃতির বংশনাশ করিতে কদাচ কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

এই জন্যই, পাঠক স্মরণ করিয়া দেখিবেন,—ইহাঁর শিষ্য বা সৈন্যবর্গ পৌত্তলিকতার নাশ অবধি অনশনব্রতধারী যোগরত মুনিঋষিকে উৎপাত এবং অপমান করিতেও ক্ষান্ত নহে। এই অত্যাচার সহিতে না পারিয়াই নির্ব্বিকার হিন্দুধর্ম্ম আবার বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিল।

আজি পারশনাথ একাকী বসিয়া আছেন। গৃহখানি প্রস্তরনির্ম্মিত, চারিদিগে চারিটি দরজা আছে। গৃহের পশ্চাতে উত্তর দিগে একটি ফুলবাগান। দক্ষিণে আর খানা বড় গৃহ। পূর্ব্বে একটি প্রাচীর, প্রাচীরের ওদিগে আরো অনেক গৃহ আছে পশ্চিমে অন্তঃপুর। পারশনাথের গৃহসজ্জিত নহে। একখানি কম্বলে মাখিয়া মোড়া। মধ্যদেশে একখানি ক্ষুদ্র শ্বেত কম্বল। তাহার পশ্চাতে একটি লৌহদণ্ড প্রোথিত, ঐ লৌহদণ্ডে সর্প লাঞ্ছিত একটি হরিদ্বর্ণের ক্ষুদ্র পতাকা। পারশনাথ ঐ ক্ষুদ্র শ্বেত কম্বলে বসিয়া আছেন। মূর্ত্তি সুন্দর ও দেহ হৃষ্ট পুষ্ট, বয়েস প্রায় তিনকুড়ি হইয়াছে—ইহাঁকে দেখিলে ভক্তি অপেক্ষা ভয়ই বেশী হয়। পরিধানে সামান্য সূত্রবস্ত্র, মস্তক ও শ্মশ্রু মণ্ডিত। বাম বাহুতে সুবর্ণ গ্রথিত পঞ্চরত্ন সর্পাকারে নিবদ্ধ।

পারশনাথের নিকট সহসা কেহ আসিতে পারে না—যাহাকে প্রয়োজন বোধ করেন তাহাকে ডাকিয়া আনান। তজ্জন্য কেবল বারান্দায় একটি বালক বসিয়া থাকে। পারশনাথ ভাবিতেছেন—"নিরীহ মুনিরাও অস্ত্রধারণ করিল, সম্মুখ যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইল—আমার নিশান অর্ব্বুদাচল হইতে উৎক্ষেপণ করিল!!! দেখা যাউক আজকার যুদ্ধে কি হয়। অর্ব্বুদ অতি উচ্চ পর্ব্বত, কেবল উচ্চ নহে, হিন্দুদের অতি শ্রদ্ধার স্থান, ঐ খানে একটি বৌদ্ধমন্দির গড়িতে পারিলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। ঐ মন্দিরে শত শত অনাথ বালক নীতি শাস্ত্র পাঠ করিয়া প্রচারক শ্রেণীর অঙ্গপুষ্ট করিতে পারিবে"। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যেমন উত্তর দিগে মুখ ফিরাইয়াছেন—অমনি এক অচিন্তনীয় ও অপূর্ব্বদর্শন রূপ

* John the Baptist.

তাঁহার সম্মুখে দেখিতে পাইলেন।—দে-খিয়া বিস্মিত হইলেন। এ তবে কি ভীষণ রূপ? কখনও নয়। ভীষণরূপে কি নির্ভীক পারশনাথের ভয় ও বিস্ময় হইতে পারে?—এ মনোহর রূপ, এরূপ মানব সংসারে দুর্লভ।—এ ক্ষুদ্র বালিকারূপ,এ লাবণ্যসমষ্টি এ দুর্লভ-কোমলতাময় বালতনু। এ স্বভাবের সাধের ধন, এ ভালবাসার মহৌষধি।—বালার সুকোমল কটী বেড়া মৃগছাল, সুদীর্ঘ কেশজাল মুক্ত। নবীন যৌবন প্রভা অনাবৃত। পারশনাথ তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিলেন,কিন্তু কথা ফুটিলনা—রূপরাশি এক চমক হাসিয়া পালাইল।—ধরিতে চাহিলেন,পারিলেন না—দরজায় মাতা ঠেকিয়া বেদনা পাইলেন,—সেই মাতা আবার উঠাইয়া আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। পরে বাগান ও চারি দিগে তালাস করিয়া দেখিলেন।—দেখিলে কি হইবে, তাহার সন্ধান পাইলেন না। ইহাতে আরো বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া আসিয়া বসিলেন—এক একবার তাঁহার সন্দেহ হইতে লাগিল। "এ বুঝি দেবরূপ—তবে কি হিন্দুধর্ম্ম যথার্থ?—অর্ব্বুদের দেবস্থান ধ্বংস করিয়াছি বলিয়াই কি তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমায় দেখা দিলেন? না কি এ ইন্দ্রজাল?" এইরূপ নানা কথা তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। আবার এক একবার এরূপ চিত্তদুর্ব্বলতা ভাবিয়া আপনা আপনি লজ্জিত হইতে লাগিলেন—ইহা প্রকাশ করাও লজ্জার কারণ মনে করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন এ কিছু নহে, মস্তিষ্কের বিকার মাত্র। আবার তিনি অন্য ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন। শূন্যে সৌধমালা গড়িতে লাগিলেন। এমন সময় সহসা "জয় পারশনাথের জয়" ধ্বনি গগণ গহন কান্তার কাঁপাইয়া উঠিল। তিনি চমকিত হইলেন—আশা হইল, আহ্লাদ হইল। আদেশবহ বালককে বলিলেন, "সংবাদ আনিতে বল।" বালক উঠিয়া যাইবে,—এমন সময় যুদ্ধবেশে একজন যুবা পুরুষ আসিয়া বলিল, "প্রভুকে আমার প্রণাম বল।" বালক পারশ নাথের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল "সূর্য্যনাথ জীউ প্রণাম জানাইয়াছেন।" পারশনাথ সূর্য্যনাথকে আসিতে না বলিয়া ব্যস্ত চিত্তে আপনি বাহিরে গেলেন। সূর্য্যনাথ যুদ্ধের পর দ্রুতবেগে অশ্ব ছাড়িয়া আসিয়া অতিক্লান্ত হইয়া বারেন্দায় বসিয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং পারশনাথকে দেখিয়া ব্যস্ততা সহকারে দাঁড়াইলেন। পারশনাথ তাহার শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন, "সংবাদ কেমন?"—সূর্য্যনাথ বলিলেন—"আমরা জয়লাভ করিয়াছি—হিন্দুদের প্রধান সেনানায়ক এবং অনেক লোক বন্দী করিয়া আনিয়াছি।" পারশ নাথ বলিলেন—"পুত্র! তুমি দীর্ঘায়ু হইয়া পবিত্র ধর্ম্ম বিস্তার কর, তুমি আমার দক্ষিণহস্ত।" এই বলিয়া সস্নেহে তাহার মস্তকে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"রক্তপাত জীবনাশ ত ইহাতে অধিক হয় নাই? নিষ্ঠুর বীরত্ব ত দেখাও নাই? নারীগণের উপরত অত্যাচার হয় নাই? বৃদ্ধ ও নিরস্ত্র ত তোমাদের

থর্গমুখে যায় নাই? সত্য বলিও তবে আমি এ বিজয়ে সন্তুষ্ট হইব।" সূর্য্যনাথ বলিলেন "আপনার আদেশ পালনে যতদূর সাবধানতা অবলম্বিত হইতে পারে তাহাই হইয়াছে—নচেৎ যত লোক বন্দী হইয়াছে ইহার অর্দ্ধেক নষ্ট হইত।" পারশ নাথ বলিলেন— "যাও তুমি বিশ্রাম কর যাইয়া?" সূর্য্যনাথ বিদায় হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

পারশনাথের অন্তঃপুরের এক প্রকোষ্টে দুইটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। একটির ষড়ত্রিংশ বৎসর বয়েস হইয়াছে, আর একটি এয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বৎসরের বালিকা।বয়োধিকা বালিকাটিকে চুল বান্ধিয়া দিয়া গহনা পরাইতেছেন। বালিকা গহনা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছে। বয়োধিকার নাম কুঙ্কুম সুন্দরী,—ইনি অতিরূপবতী কিন্তু স্থূল এবং থর্ব্বাকারজন্য রূপ সম্পূর্ণরূপে ইহাঁর শরীরে বিকাশ পায় নাই। তবে স্বরূপ বিকাশ প্রাপ্ত না হউক, ইহাঁর শরীরে স্নেহ,দয়া,উদারতা,প্রসন্নতা ও নির্ম্মলতা প্রভৃতির অপূর্ব্ব ছায়া সর্ব্বদা পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলেই বুঝা যায়। কুঙ্কুম সুন্দরী পারশনাথের স্ত্রী। ইহাঁর প্রধান দোষ, ইনি পারশনাথের স্ত্রী হইয়াও অতি বিলাসপ্রিয়। ইহাঁকে দেখিলে রাজরাজেশ্বরীকেও তুচ্ছ বোধ হয়। ইহাঁর কর্ণে হীরক দোলক, কণ্ঠে রত্নকণ্ঠি, হাতে হীরক খচিত বলয়, কটী দেশে সুবর্ণ মেখলা, পদে স্বর্ণ নূপুর। বহুমূল্য বানারসীর ঘাগরী ও ওড়না। শরীর কুঙ্কুম চুয়া চন্দনে সর্ব্বদা সিক্ত। অধর সুগন্ধ তাম্বুলে রাগযুক্ত, নয়নে কজ্জল, হস্ত ও পদতল অলক্তক-রঞ্জিত। পাঠক হয় ত আমাদের উপর রাগ করিবেন, বলিবেন স্বামী স্ত্রীতে এতদূর বৈষম্য কি শোভা পায়? শোভা পাইবে না কেন?—কুঙ্কুম সুন্দরী রাজার কুমারী, পিতা তাঁহার বসন ভূষণ সতত যোগান, পারশ নাথ তাঁহাতে দৈববসে অনাশক্ত, তাই বলিয়া তিনি নির্দ্দয় নহেন। কুঙ্কুম রাজকন্যা, সেই ভাবেই চলুন ক্ষতি কি, এই বিবেচনায় কথনও তিনি তাঁহার বিলাসিতার ভর্ৎসনা করেন না, বা বাধা দেন না। তবে কি কুঙ্কুম সুন্দরীর বুদ্ধি নাই যে তিনি বুঝিতে পারেন না তাঁহার স্বামী কি ভাবে চলেন?—বুঝিতে পারেন, বুঝিয়া দরিদ্রভাবে চলিয়া দেখিয়াছেন, পারশের হৃদয় অটল। তাই আবার বিলাসী হইয়াছেন। ভাবিয়াছেন স্বামিসুখে বঞ্চিত হইয়াছি, বাহ্য সুখে বঞ্চিত হইব না। এটি ভাল বুঝিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। যাহা হউক আজি কুঙ্কুম স্বর্ণখচিত মখমল আসনে বসিয়া, আপন গহনার অনুরূপ আর এক প্রস্ত গহনা বালিকাকে পরাইতেছেন। বালিকা হীরক দুল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এ ফুলের নাম কি?" কুঙ্কুম হাসিয়া বলিলেন "হীরার দোলক।" বালিকা অঙ্গুলী সঙ্কেতে বাগান লক্ষ্য করিয়া বলিল "এ ফুল ত ওখানে দেখি নাই—এত ফল নয়।" বালিকার বিস্ময়মুগ্ধ শশধর বদনে একটি চুম্বন

দিয়া কুঙ্কুম বলিলেন ,"এতে ফল ফুল দুই আছে।"

"গাছ কোথায় আমি গাছ দেখিব" বলিয়া বালিকা ব্যস্ত হইল। কুঙ্কুম বলিলেন, আগে তোমার কাণে পরাইয়া দি, তবে চল গাছ দেখিগে।

বালিকা আবার সেই সরলতাপূর্ণ ভাবে বলিল 'গাছ আর ফুল আছে ?'

কুঙ্কুম তাহার কর্ণে ফুল পরাইতে পরাইতে বলিলেন 'আছে।' ইহাতে বালিকা কাণ হইতে দুল টান দিয়া ফেলাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া বলিল 'এ ফুলে বাস নেই, আমি নূতন ফুল কাণে দিব চল এস তবে।' বহু মূল্য হীরক দোলক পাষাণে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ইহা দেখিয়া কুঙ্কুম স্তম্ভিত, বিস্মিত ও রুষ্ট হইয়া তাহার প্রতি চাহিলেন। বালিকা তাঁহার ক্রোধভাব বুঝিতে পারিয়া মলিনা হইয়া কাতরে বলিল 'আমায় মেরো না আমি তোমাকে মা বলে ডাকিব।'

কুঙ্কুম বালিকাকে কতবার শিখাইয়াছেন যে, 'আমাকে মা বলিয়া ডাক।' বালিকা মা বলিতে চায় না, বলে 'আমার কি মা নাই ?' কুঙ্কুম বলেন 'তুমি যারে মা বল তিনি তোমার পালিত মা, আমি তোমার আপন মা, তুমি হারাইয়াছিলে, এখন সেই হারানিধি পাইয়াছি, মা বলিয়া আমার প্রাণ শীতল কর।' বালিকা বলে 'তবে বাবার কাছে থাক না কেন ?' কুঙ্কুম বলেন,'তোমার বাবা এখানে থাকেন, তুমি যাঁকে বাবা বলিয়াছ তিনি তোমার যথার্থ বাবা নহেন।" বালিকা কখন কান্দিয়া বলে 'আমার বাবা মা তারাই।' কখন বা উঠিয়া পালায়। কিন্তু সেই বালিকা আজ আপনি মা বলিতে চাহিল। ইহাতে কুঙ্কুমের সকল ক্রোধ দূর হইল, তিনি একটা কেন দশটা হীরার দুল ভাঙ্গিলেও সহিতে পারিতেন। তাড়াতাড়ি বালিকাকে ক্রোড়ে টানিয়া হাসিয়া বলিলেন, আমারে ডাক দি কিন্? বালিকা তাঁহার গলা ধরিয়া বলিল 'মা'। কুঙ্কুম তাহার গণ্ডে একটি চুম্বন দিয়া বলিলেন 'আর দুই বার'। বালিকা মধুরস্বরে ডাকিল,— 'মা—ও মা।'

কুঙ্কুম, 'আর ত ভুলিবে না মা ?'

বালিকা, 'না, মা।'

এই সময়ে কি ভাবিয়া কুঙ্কুমের নয়নে জল আসিল। বালিকা আঁচলে তাহা মুছিয়া বলিল 'মা তবে আর কাঁদিবে কেন?' কুঙ্কুম চিন্তার বেগে তাহা শুনিতে পাইলেন না। বালিকা অবসর পাইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া প্রস্থান করিল। কিছুকাল পরে তাহার চেতনা হইল, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, 'ময়না সূর্য্যনাথ এখনও কি আসেন নাই ?' ময়না, পরিচারিকার নাম। সে বলিল 'আসিয়াছেন কি না দেখিব কি ?' কুঙ্কুম ঘাড় নাড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন 'না কায নাই'। ময়না অন্য কার্য্যে চলিয়া গেল, কুঙ্কুম অসময়ে যাইয়া শুইয়া পড়িলেন। কিছুকাল পরে সূর্য্যনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পদশব্দ শুনিয়া কুঙ্কুম বাহির হইলেন। সূর্য্য-

নাথ তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি তাহাকে বসিতে বলিলেন। সূর্য্যনাথ বসিলেন না, তাঁহার চক্ষু চঞ্চল ভাবে ইতি উতি করিতে লাগিল। কুঙ্কুম একটু হাসিলেন, সেই হাস্য দেখিয়া সূর্য্যনাথের ভাব পরিবর্ত্ত হইল। সূর্য্যনাথ একদৃষ্টে কুঙ্কুমের পায়ের দিগে চাহিয়া সম্ভ্রমমিশ্র গম্ভীর শব্দে বলিলেন, 'দেবি! আজ আমরা যুদ্ধে জয়ী হইয়াছি, হিন্দু সৈন্যের অধিনায়ক বন্দী হইয়াছেন। কুঙ্কুম শ্লেষ ভাবে বলিলেন, "ভাল করিয়াছ 'অহিংসা পরমধর্ম্ম' এ বচনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছ! কয় সের নর-রুধির পানে এক এক জন বৌদ্ধের মনে শান্তি হইয়া থাকে, আর কত শত নরমুণ্ডচ্ছেদনে এক এক জন বৌদ্ধের নির্ব্বাণ লাভ হইতে পারে আগে তাই বল"। সূর্য্যনাথ একটু ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহার স্বরও একটু উচ্চ হইল। বলিলেন, 'বৌদ্ধ গ্লানিকর কথা মুখে আনা কি আপনি সঙ্গত মনে করেন। শত ব্যক্তির মৃত্যুতে যদি পৃথিবীর উপকার করিতে পারা যায়, তবে তাহাও উচিত, আমরা ইচ্ছা করিয়া যুদ্ধ করি না।' কুঙ্কুমও ক্রুদ্ধ হইলেন—তিনি বলিলেন 'পৃথিবীর কি উপকার হইবে, যে শস্য শত জনে খাও তাই দশ জনে ভুরীভোজন করিবে এই উপকার!'

সূর্য্যনাথ বলিলেন, 'তা নয়, জগৎ নিরীশ্বর হউক, নিঃস্বার্থ হউক, এক স্নেহডোরে সকলে সংযত হউক, সকলের চিত্ত স্বাধীন হউক, দাসত্ব ভাব সকল হৃদয় হইতে দূর হউক, জগৎ শুদ্ধ ভাই ও ভগিনী সম্বন্ধ হউক, দয়া মায়া স্নেহ দান পরোপকারময় জগৎ হউক—ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য, আপনি ঘৃণার ভাবে কথা বলিবেন না।'

কুঙ্কুম সুন্দরী এবারে অধিক রাগিলেন, অভিমান, ক্রোধ ও দুঃখে তাঁহার লোচন বাষ্পাকুল হইল, সূর্য্যনাথের প্রতি খরতর দৃষ্টি করিয়া বলিতে লাগিলেন—সূর্য্যনাথ মিথ্যা বলিও না তোমাদের উদ্দেশ্য ভয়ঙ্কর, তোমরা নিষ্ঠুর, বিবাহবন্ধন ছেদন করা, বলপূর্ব্বক স্ত্রীগণকে ব্যভিচারিণী করা, অন্যের সুখের কণ্টক হওয়া, স্বাধীনতা কাড়িয়া লওয়া, লোকের শান্তি নষ্ট করা, লোকের জীবন ধ্বংস করা, আমি দেখিতেছি এই তোমাদের উদ্দেশ্য, এই তোমাদের প্রিয়কার্য্য।

সূর্য্যনাথ কিছু নম্র হইলেন, তাঁহার বদনে পরদুঃখকাতরতার চিহ্ন লক্ষিত হইল—ধীরে বলিলেন, 'আপনার কথঞ্চিৎ মানসিক যাতনার জন্য এত গুলি অশ্রাব্য কথা বলা সঙ্গত নহে। আপনার চিত্ত সবল থাকিলে কখনও এরূপ বলিতেন না।'

"সূর্য্যনাথ! নির্ব্বোধ! আমার চিত্তে বল নাই, আমি সহিতে পারি না এই কথা তুমি আমাকে আজ শিখাইবে!! তবে শুন আজ লজ্জা ত্যাগ করিয়া মুখরা হইব—আগুন জ্বলিল ত ভাল করিয়া জ্বালাইব—বল সূর্য্যনাথ, এ রূপ, এ যৌবন কিসের জন্য, যৌবনাবধি স্বামীর নিকট থাকিয়াও বিধবা, আমি—আমি মা নামের কাঙ্গালিনী, আমি বনের পাখীটিকে ধরিয়া শিখাই,—আমারে মা বল, আমি কি মা হইতে পারিতাম না?

সামান্য ইন্দ্রিয় সুখের কথা আমি বলি না, —সে তুচ্ছকথা, আর তুচ্ছ না হইলেই বা কি হয়, মনে করিয়া দেখ যাহার ইন্দ্রিয়-বেগ নাই, সেই জন্য সঙ্গিসঙ্গিনীরও প্রয়োজন নাই—তাহার কি মহত্ত্ব বল ? যে হৃদয় দুর্দ্দমনীয় বেগ সহিয়া সহিয়া নিরন্তর ক্ষত হইতেছে, তথাপি পরাভব মানিতেছে না, সেই মহৎ। আবার কি বলিবে আমার চিত্তে বল নাই ?—বল না থাকিলে আজ তোমার প্রভুর কুলে কালী পড়িত।—সূর্য্যনাথ মনে করিয়া দেখ লজ্জা পাইবে—আজ নয় প্রায় ছয় বৎসর হইল তোমার চিত্ত কিরূপ ছিল—আমার চিত্ত সবল না হইলে, আজ কি তুমি জিতেন্দ্রিয় বলিয়া গৌরব করিতে পারিতে ? কিন্তু তদবধি তুমি আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইয়াছ—আমার দোষানুসন্ধান কর, কিন্তু আমি নিষ্ঠুরা হই নাই, আমি কি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া আছি কেহই বুঝিতে পারিবে না।”

এই বলিয়া সূর্য্যনাথের হাত ধরিয়া গৃহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, সূর্য্যনাথ গুণের নৌকার মত সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। গৃহমধ্যে যাইয়া কুঙ্কুম সুন্দরী বক্ষের বস্ত্র খুলিয়া একটি ক্ষতচিহ্ন দেখাইয়া বলিলেন, সূর্য্যনাথ যেদিন তুমি আমার নিষ্ঠুর জবাব শুনিয়া বিবেকী হইয়া গেলে সেই দিন আত্মগ্লানিতে এই করিয়াছিলাম, শরীর শিথিল, হস্ত দুর্ব্বল ছিল বলিয়া মরিতে পারি নাই।

সূর্য্যনাথ প্রথমতঃ সিহরিয়া উঠিলেন, পরে মধুর বচনে বলিলেন, ‘দেবি! আত্মার সে মলিনতা অপনীত হইয়াছে, আশা করি আপনারও সেইপ্রণয় এখন পবিত্র স্নেহরূপে পরিণত হইয়াছে ; আপনি মা নামের দুঃখিনী আমি আপনাকে মা বলিয়া ডাকিব। ঝড় ও বৃষ্টি হইয়া প্রকৃতি পরিষ্কার হইলে, যেমন গগণ উচ্চ হয়, এই কথা শুনিয়া আগে অশ্রুজল, তৎপর উষ্ণশ্বাস প্রবাহ বহিয়া কুঙ্কুম সুন্দরীর হৃদয় উচ্চ হইল। তিনি বলিলেন, আজ হইতে আমি তোমার মা হইলাম। সূর্য্যনাথ নীরবে প্রস্থান করিলেন। সূর্য্য গমন করিলে কুঙ্কুম মনে মনে বলিলেন, সূর্য্যনাথ আসিয়াই চঞ্চল লোচনে যাহা খুজিতে ছিল তাহা আমি বুঝিয়াছি, দেখিব তাহাই ঠিক্ কি না।

দশম পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যনাথ যাহাকে দেখিবার জন্য নানা ছলনায় কুঙ্কুমসুন্দরীর নিকট সর্ব্বদা আসেন তাহাকে দেখিতে না পাইয়া বাটীর পশ্চিমদিকে গেলেন। দ্বার খোলা রহিয়াছে দেখিয়া আপনিও সেই দ্বার দিয়া চলিলেন। সেই দ্বার দিয়া কিছু দূর চলিলেই সমতল ক্ষেত্র ছাড়িয়া পর্ব্বতশৃঙ্গলে আরোহণ করা যায়। নীচে উপরে ছোট ছোট বড় বড় অনেক গাছ। মধ্যে মধ্যে আলোকলতা ও মাধবীলতার ঝোপ। কোথাও বা বনফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, কোন খানে ফল পাকিয়া রহিয়াছে। পাখীরা ঝাকে ঝাকে আনন্দে উড়িয়া উড়িয়া সকল ফলের স্বাদ লইতেছে। আর মৃগগণের জন্য উচ্ছিষ্ট করিয়া কত ফল ধরাতলে ফেলাইতেছে।

অপরিণামদর্শী ভ্রমরেরা ফুল হৃদয়ে ডুব দিয়া অজ্ঞান হইয়া মধুপান করিতেছে। কোন কোনটা স্থান না পাইয়া ক্রোধে গম গম গুণ গুণ রে রে ভোঁ ভোঁ প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ করিয়া একবার এখানে একবার ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অক্লান্ত অধ্যবসায়শীল ও উদ্যমপূর্ণ কর্ম্মঠ মধুমাছির দল অর্দ্ধস্ফুটিত ফুলদল হইতে সদ্য অমৃত ব্যস্ততা সহকারে সঞ্চয় করিতেছে। এরূপ প্রাকৃতিক মাধুর্য্য তথা সর্ব্বদা বিরাজিত। ইহার কিছুতেই সূর্য্যনাথের মন আকৃষ্ট হইল না। তিনিও স্থানভ্রষ্ট ভ্রমরগুলির মত এদিগ ওদিগ করিতে লাগিলেন।

বালিকাটি কোথায় গেল ?—

বালিকা প্রাকৃতিক দৃশ্যপ্রিয়—তাহার কারণও আছে। সুতরাং সুযোগ উপস্থিত হইলেই সে এইখানে বেড়াইতে আইসে, আজিও কুঙ্কুম সুন্দরীকে অন্যমনা দেখিয়া এখানেই আসিয়াছে—দ্বার এই জন্য খোলা রহিয়াছে। আর বালিকা যে এখানে আসিয়া থাকে তাহা সূর্য্যনাথের অজ্ঞাত নহে। এইজন্য তিনিও অবশেষে এখানে আসিয়াছেন। বালিকা নূতন মায়ের নিকট হইতে আসিয়া ধীরে ধীরে পর্ব্বতারোহণ করিল, দূরের নদীগুলিকে রূপার তারের মত ও অর্ব্বুদ, অর্ব্বলী প্রভৃতি পর্ব্বতকে বড় বড় ছোট ছোট মঠের মত দেখিয়া তাহার মন আরও একটু উচ্চ, প্রশস্ত ও আনন্দিত হইল।—তাহার মন নাচিয়া উঠিল, মনে মনে বলিল—"ঐ না অর্ব্বুদ, আমাদের অর্ব্বুদ সকল থেকে উচু, সোজা গেলে ত, যাওয়া যায় যাইনা কেন ? অর্ব্বুদে যাইতে পারিলে—বাবাকে পাইব, তাহা হইলে মাকেও পাইব। মা, বাবা,—তাঁরাই কি তবে মা বাবা, না এঁরা মা, বাবা। আমার দুই মা দুই বাবা দুই মাই ভাল বাসে, সে মা হতে এ মা ভাল বাসে, আবার এ মা হতেও সে মা ভাল বাসে, আমি ত দুই জনকেই ভাল বাসি,—সে মাকে কান্দাইতেছি—আবার কি এমাকেও কান্দাইব—যাই, না, যাব না। গেলে সূর্য্যনাথ আমায় খুজিয়া বেড়াইবে—সূর্য্যনাথ যে কত ভাল বাসে,—আবার অন্নও ত খুব ভালবাসে,—তবে কে বেশী ভালবাসে—সূর্য্য নাথ,—না, ভালবাসে অন্নু, না না দুই জনেই ভালবাসে।—আমি কারে বেশী ভালবাসি,—দুই জনকেই—কি জানি, সকলেই ভাল বাসে—আমি এলো মেলো, হইয়াছি—বুঝিতে পারি না। থাক—যাই দেখি কতদূর যাইতে পারা যায়।—এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে বালিকা পর্ব্বত শৃঙ্গল দিয়া চলিতে লাগিল—কিছু দূর গেলেই সন্ধ্যা হইল।—হঠাৎ বালিকার মনেও একটু ভয় হইল—এমন সময় কে তাহার ওড়না ধরিয়া টানিল। বালিকা অমনি ফিরিল। অমনি একটি স্ত্রীলোক অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। স্ত্রীলোকটির বয়েস অনুমান সাইত্রিশ কি আটত্রিশ বৎসর, শরীর এমন শীর্ণ যেন এই মাত্র শ্মসান হইতে একটি সব উঠিয়া আসিয়াছে। তাহার নয়নের তারকাদ্বয় বিবর মধ্যে প্রোথিত

তাহা হইতে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে, ভ্রূ এবং নয়ন পল্লবের রোমাবলি এবং মস্তকের চুল কদম্বকেশরের মত ঊর্দ্ধমুখ, এবং কণ্টকবৎ দণ্ডায়মান। পরিধান জীর্ণ বসন। বালিকা বিস্মিত ও ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল 'তুই কে?' স্ত্রীলোকটি আবার ভয়ঙ্কর হাসি হাসিয়া—তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া ভাল করিয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হইল, বালিকা দেখিল তাহার দৃষ্টি ভীষণ ও অমানুসিক এবং তাহার মস্তক ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। ভয় পাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল 'তুই কি চাস, তুই কে?' স্ত্রীলোকটি উত্তর না দিয়া বিকট শব্দে কান্দিয়া উঠিল—সেই সঙ্গে তাহার মূর্ত্তি আরো ভীতিকর হইল, তাহার চক্ষু আরো উজ্জ্বল হইল, ললাটে নীলিম শিরারাজি প্রকটিত হইল—দন্তে দন্তে ঘর্ষিত হইয়া কট্ মট্ শব্দ হইতে লাগিল—বালিকা চমকিয়া দুই পদ সরিয়া দাঁড়াইল। ভয়ঙ্কর স্ত্রীলোক—লম্ফ দিয়া তাহার কণ্ঠ ধরিল, বালিকা চীৎকার করিল, স্বর ফুটিল না, অবশেষে মূর্চ্ছিত হইয়া তাহার হস্তে ঝুলিয়া পড়িল। উন্মাদিনী তাহাকে মাটীতে শোয়াইয়া বলিতে লাগিল—"আমার সোণার যাদু ঘুমাও আর তুমি যাবে, দেখি কে নেয়?—মায়েরে বুকে করে রাখিব—আমরা দুঃখিনী, আহা হা! আমার দুঃখিনীর ধনকে অসতী করেছে—ও এই বুঝি তারা কাপড় দিয়েছে—ছি—ছি—পাপ—ওকাপড় ফেলে দিই আমার যাদুমণির কি কাপড় নেই, এত ফুল রয়েছে কি কত্তে? ফুলের কাপড় পরাব।" এই বলিয়া বালিকার বহুমূল্য ওড়না ও ঘাগরী প্রভৃতি টানিয়া তাহার শরীর হইতে মোচন করিল। তৎপর তাহা আপনি পরিয়া তাহার সেই জীর্ণ বসন খানি দিয়া বালিকার কুসুমিত অঙ্গ ঢাকিল।—আর দৌড়িয়া দৌড়িয়া রাশি রাশি ফুল ও পল্লব ছিঁড়িয়া তাহার শরীরের উপর চাঁপাইতে লাগিল। এই সকল ব্যাপার নির্ব্বাহ হইয়া গেলে বালার শরদেন্দুনিভানন উন্মুক্ত করিয়া একধ্যানে চাহিয়া রহিল, আর এক একবার কান্দিতে ও হাসিস্তে, হাসিতেও কান্দিতে লাগিল। এ হাসি কান্না শুদ্ধ প্লুতস্বর নহে—ইহাতে শব্দও আছে "পাগলের প্রলাপ" পাঠক ইহার ভাবার্থ বুঝিতে চেষ্টা করিবেন না। যথা—

পবনা উড়াল মেঘ নাচিল সাগর।
আমি কেন না নাচিব পরিয়া ঘাগর॥
চাঁদ ছুটে পড়েছেরে মাটীর উপর।
জলেতে ভাসিয়া যায় গঙ্গার মকর॥
আকাশের চাঁদ যদি পাইনুরে হাতে।
গাঁথিতে দিবনা তায় মকরার মাতে॥
শিবের কপাল হ'তে খসেছরে চাঁদ।
রাহুয়া জঠরে পড়ে পেতেছিল ফাঁদ॥
সে ফাঁদ কাটিয়া চাঁদ তোরে নিনু কোলে।
চাপুক আকাশ পিঠে ছাড়িব না ম'লে॥
চাঁদের গতরে চাপাদিনু গন্ধরাজ।
আপনি পরিনু তার পাপ পেসয়াজ॥
অশূর পশুর মাতে থু থু করি দান।
ভাঙ্গিব পাঁজর হাড় করি খান খান॥
দাঁতে কাটি গলা তার খাইব রুধির।

পেট ফাড়ি নারী ভূরী করিব বাহির ॥
গালপাতি চিবাইব দন্তপাতি তার।
আবার আসিলে নিতে বাছারে আমার ॥

এদিকে সূর্য্যনাথ বালিকার অন্বেষণে ঘুরিয়া ফিরিয়া এই খানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বেই উন্মাদিনীর প্রলাপ তাহার শ্রবণগত হইয়াছিল। তিনি উন্মাদিনীকে সেই বালিকা মনে করিয়া বলিলেন ' একি সত্যবতি, তুমি এতদূর আসিয়াছ তোমার ভয় নাই ?" এই কথা শুনিবা মাত্র শিকার-সম্মুখস্থ ভীষণা ব্যাঘ্রীর মত পাগলিনী উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার প্রতি ঘূর্ণায়মান রক্ত-চক্ষু স্থাপন করিয়া বলিল, 'আবার আবার, তবে তোর রক্তপান করি।' সূর্য্যনাথ বিস্মিত হইলেন, সত্যবতীর বসন বিশৃঙ্খল ভাবে পরিহিত অথচ সত্যবতী নহে। ভীষণ রূপ কর্কশশব্দ উন্মাদ প্রলাপ একি !! মনে করিলেন তাহার দৃষ্টিভ্রম ও শ্রুতিভ্রম হইয়া থাকিবে। কিন্তু সহজেই সে বিশ্বাস ঘুচিল —উন্মাদিনী দন্ত কটমট করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া বলিল ' আবার আমার বাছারে নিতে আসিয়াছিস।' সূর্য্যনাথ ভয়ে বিস্ময়ে এবং বেদনায় স্ববলে তাহাকে ছাড়াইলেন। উন্মাদিনী ক্ষীণা, সূর্য্যনাথ মহাবীর, সুতরাং উন্মাদিনী দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া গড়াইয়া একটা গর্ত্তে পড়িয়া গেল। সত্যবতীর মূর্চ্ছা শীতল সমীরে ও ফুল পল্লবের শিশিরে ভঙ্গ হইয়াছিল, তবে যে এতক্ষণ নির্জ্জীব ভাবে পড়িয়াছিল সে কেবল ভয়ে। এবারে কাতরে ডাকিয়া বলিল 'সূর্য্যনাথ আবার প্রাণ বাচাও।' সূর্য্যনাথ এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল, বালিকা আবার বলিল আমার কাপড় কাড়িয়া লইয়াছে। ফুল ও পাতা ফেলিয়া উঠিতে পারি না। সূর্য্যনাথ তাহার অবস্থা দেখিতে পাইয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বালার হাত ধরিয়া বলিলেন ' তোমার সূর্য্যনাথ আসিয়াছে ভয় কি উঠ।' এই বলিয়া আপন উষ্ণীষ মোচন করিয়া তাহাকে পরিধান করিতে দিলেন, সত্যবতী পরিয়া দাঁড়াইলেন। সূর্য্যনাথ বলিলেন, ' সত্য উন্মাদিনী কে ? ' সত্যবতী বলিল, ' আমি চিনি না, ভূত।' সূর্য্যনাথ একটু হাসিয়া তাহাকে লইয়া চলিলেন। অনেক দূর যাইয়া দেখিতে পাইলেন, উন্মাদিনী তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। সূর্য্যনাথ তাড়াতাড়ি আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

হিন্দুদিগের অবনতি।

(সপ্তম খণ্ড, ৫৬২ পৃষ্ঠার পর।)

সামাজিক রীতি মনুষ্যের চরিত্রের উপর কিরূপ কার্য্য করিতে পারে, পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাহা আলোচনা করিয়াছি। চরিত্রকে স্বাভাবিক উপায়ে বিকাশ পাইতে না দিলে এবং অনুপযোগী রীতি নীতির শাসনে উহাকে সংযমিত রাখিলে, স্বস্থানভ্রষ্ট উদ্ভিদের ন্যায় উহা যে ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে, বোধ হয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। হিন্দুসমাজ পরাধীন হইয়াছে পর, দুই প্রকারে ইহার দুর্গতি হইয়াছে। প্রথমতঃ সময়ের পরিবর্ত্তনে যে সকল পুরাতন ব্যবস্থা অনুপযোগী হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কোন নূতন সংস্কার হয় নাই; ২য়তঃ, পক্ষান্তরে যে সকল ব্যবস্থার জন্য সমাজ উপযুক্ত হয় নাই, সেই সমস্ত ব্যবস্থা প্রণীত ও প্রচারিত হইয়া সমাজকে ভারগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। উহার অভ্যন্তরে যেমন কুসংস্কাররাশি কাষ্ঠকীটের ন্যায় সর্ব্বস্ব হরণ করিতেছে, বাহিরে তেমন অনুপযোগী ব্যবস্থারূপ দুর্ব্বিষহ ভার উহাকে নিষ্পেষণ করিয়া যাহা কিছু রক্ষণীয় ছিল, তাহাও তাড়াইয়া দিতেছে। হিন্দুসমাজ সংস্কারাভাবে এবং কুব্যবস্থার শাসনে কি ভাবে অধঃপতিত হইয়াছে ও অদ্যাপি হইতেছে, তাহা ক্রমে আলোচনা করিব। আমাদের ইহা বলা উদ্দেশ্য নহে যে, হিন্দুসমাজের অধঃপাত সমস্তই ব্যবস্থামূলক এবং উহাতে সামাজিকগণের ব্যক্তিগত কোন অপরাধ নাই। কিন্তু ব্যবস্থা ঐ অধঃপাতের জন্য কি পরিমাণ দায়ী, তাহাই এস্থলে আমাদের দ্রষ্টব্য।

ভারতবর্ষে চিরকালই রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং আছে। হিন্দুর পর মুসলমান এবং মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা হইয়াছে; কোন রাজত্ব সময়েই সাক্ষাৎভাবে জনসাধারণ রাজ্যশাসন বিষয়ে অধিকার পায় নাই। কিন্তু তথাপি ইহা নিশ্চয় যে হিন্দুরাজ্যে সামাজিক চরিত্র যেরূপ উৎকৃষ্ট ছিল, মুসলমান রাজ্যে তাহা হইতে অধিক অপকৃষ্ট হইয়াছে, এবং মুসলমান রাজ্যে যাহা ছিল, ইংরেজরাজ্যে ততোধিক অপকৃষ্টতা লাভ করিয়াছে। হিন্দুরাজ্যের শাসনপ্রণালী বর্ত্তমান সময়ের বিবেচনায় যদিও সম্যক্ পরিপক্ক ছিলনা, এবং যদিও তাৎকালীন ব্যবহার বিজ্ঞান (Jurisprudence) জাতিভেদ দ্বারা কলুষিত হইয়া থাকুক, তথাপি উহা যে তদানীন্তন সমাজের জন্য নিতান্তই উপযোগী ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। এবং বোধ হয় এই বহুযুগের পরিবর্ত্তনের পরও যদি সেই প্রথা ঈষৎ ব্য-

তিক্রম সহকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তবে উহা বর্ত্তমান প্রথা অপেক্ষা সহস্রগুণে সমাজের হিতসাধন করিতে পারে। যদি সেই প্রথাই কালসহকারে পরিবর্দ্ধিত ও সংস্কৃত হইতে থাকিত, তবে উহা জনসাধারণের চরিত্রবিকাশে যে একান্তই ফলবতী হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে প্রথা দ্বিসহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া সমাজে বদ্ধমূল হইয়াছিল, এবং যাহা সামাজিকগণের চরিত্রকে কোন এক নির্দ্দিষ্ট ভাবে গঠন করিতেছিল, বিজয়ীর অন্ধপৌরুষ তাহা চূর্ণীকৃত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ অপরিচিত নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিল।

হিন্দুদিগের শাসন প্রণালীর সহিত মুসলমানদিগের শাসন প্রণালীর কিয়ৎপরিমাণ সাদৃশ্য ছিল; কিন্তু ইংরেজদিগের শাসনপ্রণালী এই উভয় হইতেই এতদূর বিভিন্ন যে সামাজিকগণ আর পূর্ব্বপ্রকৃতি রক্ষা করিয়া উহার সহিত তাহাদের জীবনের সম্বন্ধ স্থির রাখিতে পারিতেছে না। হিন্দুদিগের সমাজ যখন পূর্ণ বিকশিত হইয়াছিল, তখন তাহাদের ত্রিবিধ শাসন-কেন্দ্র ছিল ;—রাজধানী, নগর ও গ্রাম। এই ত্রিবিধ কেন্দ্রের মধ্যে গ্রামই সর্ব্বপ্রধান ছিল, কারণ অধিকাংশ শাসন কার্য্যই গ্রামে সম্পাদিত হইত। নগরে ও রাজধানীতে গ্রামের শাসন কার্য্য অল্পই ন্যস্ত ছিল। রাজধানীতে রাজা স্বয়ং সাতটি কি আটটি মন্ত্রী লইয়া সন্ধি বিগ্রহাদি, সৈনিকদিগের ও বিচারকের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ এবং কোষাধ্যক্ষতা করিতেন।* যে সকল মোকদ্দমার বিচার গ্রামে কিংবা নগরে হইতে পারিত না, অথবা অর্থি-প্রত্যর্থীরা যে সকল মোকদ্দমার রাজধানীতে বিচার অভিলাষ করিত, কেবল সেই সকল বিচারই রাজধানীতে হইত। এই বিচারকার্য্য এবং সাধারণ পর্য্যবেক্ষণ ব্যতীত রাজধানীর সহিত গ্রাম কিংবা নগরের আর কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু রাজধানীর সহিত গ্রামের যে সম্পর্ক ছিল, নগরের সহিত তাহা অপেক্ষাও ন্যূন ছিল। প্রত্যেক নগরেই এক এক জন নগরাধিপ থাকিত।† বর্ত্তমান ভাষাতে ইহাকে টাউন মেজিষ্ট্রেট বলা যাইতে পারে। এই নগরাধিপ নগরের সমস্তকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। গ্রামের সহিত নগরের এই মাত্র সম্পর্ক ছিল যে

---

* অমাত্যে দণ্ড আয়ত্তো দণ্ডে বৈনয়িকী ক্রিয়া।
নৃপতৌ কোষরাষ্ট্রে চ দূতে সন্ধিবিপর্য্যয়ৌ॥
মনু ৭ম, ৬৫।

দণ্ড অর্থাৎ সৈনিকবিভাগ সেনাপতির অধীনে, সন্ধি প্রভৃতি দূতের অধীনে, এবং ধনাগার ও গ্রাম্যশাসন রাজার অধীনে থাকিবে।

† নগরে নগরে চৈব কুর্য্যাৎ সর্ব্বার্থচিন্তকম্।
উচ্চৈঃস্থানং ঘোররূপং নক্ষত্রাণামিব গ্রহং॥
মনু ৭ম, ১২১।

প্রতিনগরমেকৈকম্.........
.........নগরাধিপতিং কুর্য্যাৎ।
ঐ শ্লোকের কল্লুকভট্টকৃত টীকা।

নগরাধিপ সময়ে সময়ে সেনা (Police) সমভিব্যাহারে ভ্রমণে (tour) বহির্গত হইয়া গ্রাম সমূহের শাসন কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিত, * এবং কোন স্থানে কোন বিশৃ-ঙ্খলা বা অত্যাচার দেখিলে তাহা রাজার গোচরে আনয়ন করিত।†

গ্রাম সমূহে কি প্রণালীতে কার্য্য চ-লিবে, এতৎসম্বন্ধে গ্রামিকদিগের মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত না হইলে নগরাধিপ কিংবা রাজা কেহই তৎপ্রতি কোন বিশেষ আদেশ প্রদান করিতেন না। গ্রামিকগণ প্রচলিত রীতি অনুসারে সমস্ত কার্য্য নি-র্ব্বাহ করিত। যদি কোন গ্রামাধিপতি প্রচলিত রীতির ব্যতায় করিতে চাহিত, তবে গ্রামবাসিগণ তাহা অনুমোদন না করিয়া ইচ্ছা হইলে রাজার গোচর করিতে পারিত, এবং রাজা যেরূপ ভাল বুঝিতেন, সেইরূপ প্রতিবিধান করিতেন।

গ্রাম্য শাসনের জন্য শ্রেণী-পরম্পরায় রাজ-নিয়োজিত বহু কর্ম্মচারী ছিল। নগর, রাজধানী ও রাজধানীর সমূহ শাসনাধীন ‡ স্থান ব্যতিরেকে রাজার সমগ্র রাজ্য কতক-গুলি গ্রামে বিভক্ত ছিল। বর্ত্তমান গ্রাম দ্বারায় তখনকার গ্রামের কোন ধারণা করা দুষ্কর হইবে। এক্ষণে দুই গ্রামের মধ্যবর্ত্তী সীমা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু তৎকালে প্রত্যেক গ্রামের সীমা অতি স্পষ্টরূপে নি-র্ণীত ছিল। প্রত্যেক গ্রামের চতুর্দ্দিকে কিয়ৎপরিমাণ ভূমি গবাদি বিচরণজন্য স-ম্পূর্ণ পৃথক্ রূপে রাখা হইত; উহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বত্ব ছিল না; গ্রামস্থ সক-লেই ইচ্ছামত আপনাদের গবাদি যাবতীয় পশু উহাতে চরাইতে পারিত ¶। দুই গ্রামের মধ্যবর্ত্তী সীমা সাধারণতঃ পয়ঃ-প্রণালী দ্বারা নির্ণীত হইত; যদি পয়ঃ-প্রণালী না থাকিত, তবে গ্রামের চতুর্দ্দিকে বড় বড় স্থায়ী বৃক্ষ দ্বারা বেড়ার ন্যায় ক-

---

* স তাননুপরিক্রমেৎ সর্ব্বানেব সদা স্বয়ং
তেষাং বৃত্তং পরিণয়েৎ সম্যগ্রাষ্ট্রেষু তচ্চরৈঃ॥

উক্ত নগরাধিপতি স্বকার্য্যশাসনের জন্য পূর্ব্বোক্ত গ্রামাধিপতি প্রভৃতির নিকট সেনা সমভিব্যাহারে উহাদিগের কার্য্যদর্শ-নার্থ যাইবেন, এবং রাজা নগরাধিপতি, গ্রামাধিপতি সকলের চেষ্টিত বিষয় অবগত হইবেন। মনু ৭ম, ১২২।

† বর্ত্তমান মিউনিসিপালিটির সহিত যেমন টাউনের বাহিরের কোন সম্পর্ক নাই, নগরের সহিতও গ্রামের সেই প্রকার কোন সম্পর্ক ছিল না।

‡ Original jurisdiction.

¶ ধনুঃ শতং পরীহারো গ্রামস্য স্যাৎ সমন্ততঃ।
শম্যাপাতা স্ত্রয়োবাপি ত্রিগুণোনগরস্যতু॥
মনু, ৮ম, ২৩৭।

গ্রামের চতুর্দ্দিকে অনুপ্তশস্য চারিশত হস্ত ভূমি গবাদি চারণার্থ রাখিবে অথবা যষ্টিত্রয় পরিমিত স্থান রাখিবে। বহুজন সমাকীর্ণ নগরে ইহার তিনগুণ স্থান রা-খিবে। ইংলণ্ডে এইরূপ স্থানকে Common বলে।

রিয়া দেওয়া হইত *। এইরূপে এক গ্রামের সহিত অন্য গ্রামের ভূমি নিয়া কোন বিবাদ হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প ছিল। প্রত্যেক গ্রামের উল্লিখিত পশ্বাদি-চরণ স্থান ব্যতিরেকে যে সকল উর্ব্বর স্থান অবশিষ্ট থাকিত, তাহা গ্রামবাসিগণ আপনাদের মধ্যে স্ব স্ব প্রয়োজন ও সমর্থানুযায়ী বণ্টন করিয়া নিত, এবং প্রত্যেকের ভূমি গুপ্ত ও প্রকাশ্য চিহ্ন দ্বারা সীমাবদ্ধ হইত। এক গ্রামের ভূমি, ভিন্ন গ্রামের লোকেরা ক্রয় করিতে পাইত না। গ্রামের বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলার এক প্রধান কারণ এই যে, প্রায় প্রত্যেক গ্রামের অভ্যন্তরেই পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকের স্বত্বাধীন ভূমি থাকে, সুতরাং কোন গ্রামেই গ্রামবাসীদের তাবৎ ভূমির উপর কর্ত্তৃত্ব থাকে না। কিন্তু তৎকালে সীমাবদ্ধ প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসীরাই স্ব স্ব গ্রামস্থ তাবৎ ভূমির উপর সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল; যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে উহা বণ্টন করিতে পারিত,—অন্য গ্রামস্থ কাহারও উহাতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার ছিল না। †

উল্লিখিত সীমাবদ্ধ প্রত্যেক গ্রামের এক একজন গ্রামাধিপতি নিযুক্ত হইত। গ্রামের মধ্যে যে ব্যক্তি ধন ও মানে গরীয়ান্, সচ্চরিত্র এবং গ্রাম্যলোকদের বিশ্বস্ত, রাজা তাহাকেই গ্রামাধিপতি নিয়োগ করিতেন। এইরূপ দশ গ্রামের একজন, বিশ গ্রামের একজন, শত গ্রামের একজন, এবং সহস্র গ্রামের একজন, অধিপতি নিযুক্ত হইত ‡। এই সহস্র গ্রাম অদ্যাপি কোন কোনস্থানে "সরকার" নামে পরিচিত হইয়া অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে §, এবং শতগ্রাম পরগণা-

বিষ্ণুস্মৃতিতে রাজধর্ম্মপর্য্যায়ে লিখিত আছে "তত্র স্ব স্ব গ্রামাধিপান্ কুর্য্যাৎ। দশাধ্যক্ষান্। শতাধ্যক্ষান্। দেশাধ্যক্ষাংশ্চ"। ২০। এতদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে, মনুসংহিতার পর, এবং বিষ্ণুস্মৃতির পূর্ব্বে বিংশগ্রামসমষ্টি, এবং বিংশগ্রামাধিপতির পদ, লোপ পাইয়াছিল। ইহাও দৃষ্ট হইবে যে, মনু যাহাকে 'সহস্রগ্রাম' বলিয়া লিখিয়াছেন, বিষ্ণুস্মৃতিতে তাহাই 'দেশ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বোধ হয় যে বিষ্ণুস্মৃতির সময়ে সমগ্র রাজ্য কতকগুলি দেশে বিভক্ত ছিল, এবং দেশ কতকগুলি শতগ্রামসমষ্টিতে বিভক্ত ছিল। বলা বাহুল্য যে, উল্লিখিত দেশ, শতগ্রাম ও দশগ্রাম এবং Saxons দিগের County, hundreds এবং tithings একই কথা।

---

* সীমাং প্রতি সমুৎপন্নে বিবাদে গ্রামযোর্দ্বয়োঃ।
জৈষ্ঠমাসে নয়েৎ সীমাং সুপ্রকাশেষু সেতুষু॥
সীমাবৃক্ষাংশ্চ কুর্ব্বীত ন্যগ্রোধাশ্বত্থকিংশুকান্।
শাল্মলীন্ শালতালাংশ্চ ক্ষীরিণশ্চৈব পাদপান্॥
মনু, ৮ম অঃ, ২৪৫—৪৬।

† Elphinstone's History of India. page 72,

‡ গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশগ্রামপতিং তথা
বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেবচ॥
মনু; ৭ম, ১১৫।

§ Elphinstone's History of India, page 270, note 1.

রূপ ধারণ করিয়া অদ্যাপি অস্মদ্দেশে উহার পূর্ব্ব অস্তিত্ব বিজ্ঞাপন করিতেছে *। বিশ গ্রামসমষ্টি ও দশ গ্রামসমষ্টি কোন কোন স্থান.ব্যতিরেকে সর্ব্বত্রই বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু গ্রামের গঠন দাক্ষিণাত্যে ও অধিকাংশ হিন্দুরাজ্যে অদ্যাপি পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। দশ গ্রাম, বিশ গ্রাম, শত গ্রাম ও সহস্র গ্রামের অধিপতিগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন শাসম কার্য্য করিতেন না। গ্রামাধিপতিই সমস্ত শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। সে দশ বার জন কর্ম্মচারীর সাহায্যে গ্রামবাসিদিগের মধ্যে ভূমি বণ্টন করিত, রাজস্ব আদায় করিত, শান্তিরক্ষা করিত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবাদের মীমাংসা করিত †। অর্থাৎ সে Collector, Police এবং arbitrator এই তিনেরই কার্য্য করিত, যদিও সে রাজ-নিয়োজিত হউক, তথাপি সে কখনও গ্রামবাসিদিগের প্রতি অবৈধাচরণ করিতে সাহস পাইত না। যদি সে অত্যাচার করিতে কখনও প্রবৃত্ত হইত, গ্রামবাসিগণ অমনি বৃক্ষচ্ছায়ায় কিংবা কাহারও গৃহে সংমিলিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে আরম্ভ করিত ‡। যদি সে প্রচলিত রীতির অধিক কর সংস্থাপিত করিতে চেষ্টা পাইত,গ্রামবাসিগণ সংমিলিত হইয়া রাজস্ব আদায় বন্ধ করিয়া দিত, কিম্বা অন্যপ্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে সকলে মিলিয়া তাহাকে অপাংক্তেয় করিত, অথবা অন্যপ্রকারে শাসন করিত। গ্রামাধিপতি আপনার পুত্র কলত্র সহ সমস্ত গ্রামবাসীর মধ্যে বাস্তব্য করিয়া কখনই তাহাদের প্রতিকূলাচরণ করিতে সাহসী হইত না। গ্রামবাসিগণ রাজার নিকট গ্রামাধিপতিদিগের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ করিলে রাজা শাস্ত্রানুসারে তাহাকে সর্ব্বস্বহরণ পূর্ব্বক গ্রামহইতে বহিষ্কৃত করিয়া

---

* Elphinstone's History of India p, 97.

† গ্রামাধিপতি, দশী অথবা দশগ্রামাধিপতির অধীনে, দশী বিংশীর অধীনে, বিংশী শতগ্রামাধিপতির অধীনে, এবং শতগ্রামাধিপ সহস্রগ্রামাধিপের অধীনে ছিল। গ্রামে চৌর্য্যাদি কোন দোষ ঘটিলে যদি নিয়মশাসনকর্ত্তা তাহা নিবারণ করিতে না পারিত, তবে সে উর্দ্ধতন শাসনকর্ত্তাকে জানাইত, এবং যাহা দ্বারা উহার মীমাংসা হইতে পারিত, সেই উহা মীমাংসা করিত। যথা ;—

গ্রামে দোষান্ সমুৎপন্নান্ গ্রামিকঃশনৈঃ স্বয়ং।
শংসেদ্গ্রামদশেশায় দশেশোবিংশতীশিনং ॥
বিংশতীশস্তু তৎসর্ব্বং শতেশায় নিবেদয়েৎ।
শংসেদ্গ্রামশতেশস্তু সহস্রপতয়ে স্বয়ং ॥

মনু, ৭ম, ১১৬, ১১৭।

তথা বিষ্ণুস্মৃতি "গ্রামদোষাণাং গ্রামাধ্যক্ষঃ পরীহারং কুর্য্যাৎ। অশক্তো দশগ্রামাধ্যক্ষায় নিবেদয়েৎ। সোঽপ্যশক্তঃ শতাধ্যক্ষায়। সোঽপ্যশক্তো দেশাধ্যক্ষায়। দেশাধ্যক্ষাপি সর্ব্বাত্মনা দোষমুচ্ছিন্দ্যাৎ।"

‡ Wheeler's Ancient History of India, Vol I, page 597.

দিতে বাধ্য হইতেন * ; কিন্তু যদি কোন রাজা আলস্য কিংবা স্বার্থপরবশ হইয়া তাহাদের অভিযোগে শাস্ত্রানুসারে কর্ণ প্রদান না করিত, তবে প্রজাগণ প্রতিবেশী শত্রুরাজাকে আহ্বান করিয়া তাহার শরণাপন্ন হইত। পূর্ব্বে প্রায় সর্ব্বদাই রাজায় রাজায় যুদ্ধ বিগ্রহাদি হইত, এক রাজা সিংহাসন-চ্যুত হইতেন, অপর রাজা উহা অধিরোহণ করিতেন, কিন্তু প্রজামণ্ডলী গ্রাম্য শাসনে চিরকালই সুখে শান্তিতে বাস্তব্য করিত। রাজধানীর রণঢক্কা কখনও গ্রামবাসীর নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারিত না, এবং যে পর্য্যন্ত তাহাদের শস্য শ্যামল ক্ষেত্রে সেনাপতঙ্গ নিপতিত না হইত, সেই পর্য্যন্ত সিংহাসন-বিপ্লবের প্রতি তাহাদের নেত্র উন্মীলিত হইত না। ইহাতে একদিকে যেমন গ্রামে শান্তি ও সুখ বিরাজ করিত বটে, কিন্তু আর একদিকে প্রজাদিগের অন্তঃকরণে স্বদেশ হিতৈষিতা উদ্দীপ্ত হইতে পারিত না। রাজধানীর কার্য্য কলাপ এবং রাজার প্রতি তাহাদের সম্পূর্ণ বৈরাগ্য ভাব ছিল; তাহারা এইমাত্র জানিত যে, যে রাজা তাহাদের গ্রাম্যশাসন অক্ষুণ্ণ রাখিবে, সেই রাজার অধীনেই তাহারা সুখে থাকিতে পারিবে; তবে যদি কোন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাজা সিংহাসন আক্রমণ করিত, তাহা হইলেই তাহাদের স্বদেশানুরাগ উদ্দীপ্ত হইত, এবং তাহারা প্রাণপণে রাজার সহায়তা করিতে অগ্রসর হইত।

অনেকে এইরূপ বলিয়া থাকেন যে হিন্দুগণ এতাদৃশ কঠিন রাজশাসনে বাস্তব্য করিত যে, তাহারা কস্মিন্ কালেও স্বদেশের চিন্তা কিংবা স্বদেশের মঙ্গলকামনা করিতনা, এবং পরকীয় আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা করিবার জন্য কখনও তাহাদের স্বার্থ পরিত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি জন্মিত না। যাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাঁহারা হিন্দুস্থানের রাজনৈতিক অবস্থা এবং ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থায় কি প্রভেদ, তাহা বিচার করিয়া দেখুন। ইউরোপে যে কারণে স্বদেশের প্রতি অনুরাগ জন্মে, হিন্দুস্থানে পূর্ব্বে সে কারণ বর্ত্তমান ছিল না। মনে কর, এক ইউরোপের মহাদেশ উনিশ কি বিশটি রাজ্যে বিভক্ত। ইহাদের প্রত্যেকের জাতি স্বতন্ত্র, ব্যবহার স্বতন্ত্র, আকৃতি স্বতন্ত্র, এবং রাজশাসন প্রথা স্বতন্ত্র। যদি ফরাসি দেশ জার্ম্মেণির কর কবলে পতিত হয়, ফরাসিদের দুর্দ্দশার ইয়ত্তা থাকিবেনা। ফরাসি জাতিকে জার্ম্মেণজাতির নিকট হেয় থাকিতে হইবে, প্রত্যেক জর্ম্মেণ সমগ্র ফরাসীজাতির উপর আপনাকে প্রভু মনে করিবে। ফ্রান্সের চিরপ্রিয় শাসন প্রণালী চূর্ণীকৃত হইবে, এবং জর্ম্মেণির অনভ্যস্ত শাসন প্রণালী তাহার স্থান অধিকার করিবে। রাজ্যের যাহা কিছু সুখ সম্মান,

* মনু স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে রাজনিয়োজিত কর্ম্মচারিগণ প্রায়ই প্রজার প্রতি অত্যাচারী হয়। রাজা এইরূপ কর্ম্মচারীকে সর্ব্বস্বাপহরণ পূর্ব্বক নির্ব্বাসন করিবেন। আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের যদি এই দৃষ্টিটুকু থাকিত, তবে দেশে এত অত্যাচার কখনই থাকিতে পারিত না।

সমস্তই জর্ম্মণের আয়ত্তাধীন হইবে, ফরাসী সমস্ত হারাইয়া পথের ভিখারী বনিবে। দেশে যেখানে ধন, যেখানে সম্মান, যেখানে সুখ ও শান্তি, সেই সমস্ত স্থানেই জর্ম্মণ বিরাজ করিবে, আর যাহা জর্ম্মণের উচ্ছিষ্ট এবং অস্পৃশ্য, তাহাই ফরাসীর সম্বল হইবে। ফরাসী গৃহকাটারি খানি ব্যবহার করিতেও জর্ম্মণের অনুমতির অপেক্ষা করিবে, আর সামান্য জর্ম্মণও নির্ভীক হৃদয়ে সম্মানিত ফরাসীকে হত্যা করিয়া নিষ্কৃতি পাইবে। পঙ্গপালের ন্যায় সমস্ত দেশে জর্ম্মণ ছাইয়া পড়িবে, আর পদাঘাত, লাঞ্ছনা ও অবমাননার ভয়ে ফরাসী কুটীর পরিত্যাগ করিতেও সাহসী হইবে না। যেখানে পরকীয় আক্রমণে এত দুর্গতির সম্ভাবনা, সেখানে স্বদেশের প্রতি কাহার অনুরাগ না হইয়া পারে? যেখানে সিংহাসন বিপ্লবের নামই দাসত্ব ও পরাধীনতা, সেখানে সিংহাসনের জন্য প্রজার কেন না অনুরাগ থাকিবে? কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা স্বতন্ত্র প্রকার ছিল। ভারতবর্ষ ইউরোপের ন্যায় কতকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎরাজ্যে বিভক্ত ছিল বটে; কিন্তু উহার সকল রাজাই প্রায় হিন্দু ছিল। প্রজা যেরূপ রাজকৃত নিয়মে আবদ্ধ হয়, রাজাগণও সেইরূপ ধর্ম্মশাসনে আপনাদিগকে আবদ্ধ মনে করিত; এবং যেহেতু অধিকাংশ রাজাই এক ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, সুতরাং হিন্দু-অধিকৃত তাবৎ ভারতবর্ষেই প্রায় একরূপ রাজ্য শাসন প্রণালী বর্ত্তমান ছিল। রাজগণ আপনাদের অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছানুসারে কোন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেন না, রাজ্যের প্রচলিত রীতি, এবং প্রজাবর্গের সাধারণ মতকেই ব্যবস্থা মানিয়া লইয়া তদনুযায়ি শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। শাস্ত্রে স্পষ্ট অনুজ্ঞা আছে যে, রাজা যখন কোন নূতন দেশ বিজয় করিবেন, তখন তিনি তদ্দেশের রীতি নীতি সমস্তই রক্ষা করিয়া চলিবেন। * যে কোন রাজাই সিংহাসন অধিকার করিতেন, তিনিই উপরোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিতেন, কখনও উহার ব্যত্যয় করিতেন না। ভিন্ন রাজার অধীন হইলেও ভিন্ন জাতির অধীন হইয়াছি বলিয়া প্রজাগণ মনে করিত না, এবং বিজেতৃ রাজার স্বদেশীয় প্রজাগণ কেহই আপনাকে বিজিত জাতির উপর প্রভু বলিয়া গর্ব্ব করিত না, অথবা বিজিত রাজ্যের উপর পঙ্গপালের ন্যায় ছাইয়া পড়িয়া বিজিতদিগকে সমস্ত সুখ সম্মান হইতে বঞ্চিত করিত না। কোন রাজা কোন নূতন দেশ জয় করিলে উভয় দেশস্থ প্রজাবর্গের প্রতিই রাজা এক প্রকার ব্যবহার করিতেন, জিত প্রজাদিগের ব্যয়ে স্বকীয় প্রজাদিগের সুখবর্দ্ধন করিতে প্রয়াস পাইতেন না। অনেক সময়েই রাজাদিগের দেশবিজয় নামে মাত্র ছিল, কারণ যে দেশ পরাজিত হইত, সে দেশের রাজা সিংহাসনচ্যুত হইতেন না, কখনও কখনও কিঞ্চিন্মাত্র কর প্রদান

* যস্মিন্‌দেশে য আচারো ব্যবহারঃ কুলস্থিতিঃ।
তথৈব পরিপাল্যোঽসৌ যদাবশমুপাগতঃ॥
যাজ্ঞবল্ক্য ১ম অঃ ৩৪৩।

করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজার ন্যায় সুখে থাকিতে পারিতেন, কখনও বা বিনা করে কেবল মাত্র অধীনতা স্বীকার করিয়াই নিষ্কৃতি পাইতেন। বস্তুতঃ তখন স্বাধীনতা ও পরাধীনতা শব্দ রাজার সম্পর্কেই খাটিত, প্রজার সম্পর্কে নহে। যদি রাজা কাহাকেও কর না দিতেন, তবে তিনি স্বাধীন নামে অভিহিত হইতেন, যদি তিনি কাহাকেও কর দিতেন, তবে তিনি সেই করপ্রাপক রাজার অধীন বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু কি করপ্রাপক কি করদাতা উভয় রাজার অধীনস্থ প্রজাবর্গই এক অবস্থায় থাকিত। স্বাধীন রাজার প্রজারা অধীন রাজার প্রজা হইতে আপনাদিগকে কোন বিষয়ে অধিক স্বাধীন কিংবা সৌভাগ্যশালী মনে করিত না। প্রজাগণ তাহাদের গ্রাম্যশাসনে প্রত্যেক রাজার অধীনেই পরমসুখে ও শান্তিতে বাস্তব্য করিত। রাজধানীর বিপ্লব ঝটিকা কোন দিনও তাহাদের গ্রাম্যসমিতির গাত্রস্পর্শ করিতে পাইত না, এবং যে পর্য্যন্ত তাহাদের ধর্ম্ম ও গ্রাম্যশাসন নিরাপদে থাকিত, সে পর্য্যন্ত রাজকীয় বিপ্লবে তাহাদের কোন আশঙ্কা ছিল না। এই জন্যই বলিয়াছি যে, গ্রাম্যশাসন যেমন একদিকে প্রজাবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের রক্ষাদুর্গ ছিল, তেমন আর একদিকে উহা স্বদেশানুরাগ উদ্দীপনের পরিপন্থি ছিল। এই জন্যই তখন স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলিয়া চীৎকার শ্রুত নাই, এবং এই জন্যই সংস্কৃত কাব্যাদিতে স্বদেশানুরাগের গীতি কিংবা চিত্র স্থান লাভ করে নাই। কিন্তু যখন বহুশতাব্দীর শান্তির পরে মুসলমানগণ ভারতবর্ষে অবতরণ পূর্ব্বক হিন্দুগণের রাজ্য ও ধর্ম্ম উভয়ই যুগপৎ আক্রমণ করিল, কে বলিবে তখন হিন্দুহৃদয়ে স্বদেশানুরাগের প্রতপ্ত শোণিত প্রবাহিত হয় নাই? যাহার এইরূপ বলিতে প্রবৃত্তি হয়, সে রাজপুতবীরকেশরীগণের জীবনচরিত পাঠ করুক। (ক্রমশঃ)

একচেঞ্জ।

ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের একচেঞ্জ লইয়া আজি কএক বৎসর পর্য্যন্ত রাজনৈতিকমণ্ডলে ঘোর আন্দোলন চলিতেছে, কিন্তু এই একচেঞ্জ কিরূপ ব্যাপার, অস্মদ্দেশীয় সাধারণের মধ্যে অনেকেই তাহা অবগত নহেন। ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের একচেঞ্জের অবস্থা পরিবর্ত্তন হওয়াতে ভারতবাসীর প্রভূত ক্ষতি হইতেছে, এবং ভারতীয় ধনাগারের কোটী কোটী টাকা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এই প্রশ্নটির জটিলতায় সাধারণকে ইহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ করে নাই, সুতরাং সাধারণের মধ্যে এসম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হইতে দেখা যায় না। আমরা এ প্রশ্নটি যতদূর সহজ ভাষায় পারি, বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বোধ হয়, সকলেই ইহা অবগত আছেন যে, ইংলণ্ডে যত কারবার, প্রায় সমস্তই স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা হয়, এবং ভারতবর্ষে যত

কারবার, প্রায় সমস্তই রৌপ্যমুদ্রা দ্বারা হয়। ভারতবর্ষীয় কোন অধমর্ণ যদি ইংলণ্ডীয় কোন উত্তমর্ণের দেনা পরিশোধ করিতে চাহে, তবে ইংলণ্ডীয় উত্তমর্ণ তাহা ভারতবর্ষীয় রৌপ্য মুদ্রায় গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন না, ভারতবর্ষীয় অধমর্ণকে স্বদেশীয় মুদ্রা দ্বারা ইংলণ্ডীয় স্বর্ণমুদ্রা ক্রয় করিয়া পাঠাইতে হয়। সেই প্রকার ভারতবর্ষীয় কোন মহাজন ইংলণ্ডীয় স্বর্ণমুদ্রায় কোন পাওনা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন না, ভারতবর্ষীয় রৌপ্যমুদ্রা ক্রয় করিয়া তাহার দেনা পরিশোধ করিতে হয়। ভারতবর্ষে যে সকল ইংরেজ কায কর্ম্ম করেন, তাঁহারা এখানে ভারতবর্ষীয় রৌপ্যমুদ্রায় বেতন প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁহাদিগকে স্বদেশে অর্থ পাঠাইতে হইলে, ইংলণ্ডীয় স্বর্ণমুদ্রা ক্রয় করিয়া পাঠাইতে হয়, কারণ ভারতবর্ষীয় রৌপ্য মুদ্রা ইংলণ্ডে কেহ গ্রহণ করিতে চাহে না। এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে ষ্টেট্ সেক্রেটরীর নিকট যত অর্থ পাঠান আবশ্যক, তাহাও ইংলণ্ডীয় মুদ্রায় পাঠান হইয়া থাকে।

এই উভয় দেশীয় মুদ্রার পরস্পর সম্বন্ধকে একচেঞ্জ কহে। কএক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় রৌপ্য মুদ্রার ১০টি দ্বারা ইংলণ্ডীয় স্বর্ণমুদ্রা ১টি ক্রয় করা যাইত; অর্থাৎ তখন ১পাউণ্ডের দাম ১০টাকা ছিল। যদি বিলাতের কাহারও নিকট ১ পাউণ্ড ধারিতাম, তবে তাহা পরিশোধ করিতে আমাদের ১০টি টাকা মাত্র লাগিত। ১৮৭০ সন পর্য্যন্ত এই সম্বন্ধ এক ভাবেই চলিতেছিল। ১৮৭১ সন হইতে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। ঐ সন হইতে রৌপ্যের মূল্য কমিয়া যাইতে আরম্ভ করে, সুতরাং স্বর্ণের তুলনায় টাকারও মূল্য সঙ্গে সঙ্গে কমিতে থাকে। ১৮৭১ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এক্চেঞ্জের অবস্থা অথবা ইংলণ্ডীয় পাউণ্ডের মূল্য নিম্নলিখিত প্রকার চলিতেছে;—

১৮৭১—৭২……টাকা ১০।৶০
১৮৭২—৭৩…… „ ১০৶৮ গণ্ডা
১৮৭৩—৭৪…… „ ১০।৶০
১৮৭৪—৭৫…… „ ১০৸৵১১৸
১৮৭৫—৭৬…… „ ১০৸ ১১॥
১৮৭৬—৭৭…… „ ১১‌৲১১ গণ্ডা
১৮৭৭—৭৮…… „ ১১৵১২ গণ্ডা
১৮৭৮—৭৯…… „ ১১।৵১৭ গণ্ডা
১৮৭৯—৮০…… „ ১২।১৮॥
১৮৮০—৮১…… „ ১১৸৶৪।
১৮৮১—৮২…… „ ১২৲
১৮৮২—৮৩…… „ ১২৲
১৮৮৩—৮৪…… „ ১২৵৮॥ *

রৌপ্যের মূল্য এই প্রকার কমিয়া যাওয়াতে এবং সুতরাং একচেঞ্জের অবস্থা পরিবর্ত্তন হওয়াতে ভারতবাসীদিগের প্রভূত ক্ষতি হইতেছে, কেন না ভারতবর্ষকে যেখানে পূর্ব্বে ১০টাকা পাঠাইতে হইত, এক্ষণে সেই স্থানে তাহাকে ১২৲টাকা কিংবা ততোধিক পাঠাইতে হইতেছে। যথা মনে কর, ইংলণ্ডে বসিয়া যাঁহারা পেন্সন পাইতেছেন, তাঁহারা পূর্ব্বেও যত পাউণ্ড পেন্সন

*সেক্রেটরী অব ষ্টেট্ প্রত্যেক বৎসরের প্রথমে যে একচেঞ্জ নির্দ্দিষ্ট করিয়া পাঠান, তাহাই এখানে লিখিত হইল।

পাইতেন, এখনও তাঁহাদিগকে তত পাউণ্ডই দিতে হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বে যাহাকে ১০০পাউণ্ড পেন্‌সন্ দিতে ১০০০টাকা মাত্র পাঠাইতে হইত, এক্ষণে তাহাকে সেই ১০০ পাউণ্ড দিতে ১২০০ টাকারও অধিক পাঠাইতে হইতেছে। সুতরাং এই ২০০ টাকা আমাদের অনর্থক দণ্ড হইল। একচেঞ্জের এবংবিধ পরিবর্ত্তনের দরুণ বৎসর বৎসর ভারতবর্ষের ধনাগার হইতে কি পরিমাণ টাকা নষ্ট হইতেছে তাহার একটা মোটা মোটি তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

সন	একচেঞ্জের দরুণ ক্ষতি
১৮৭০—৭১	২৪,৩১,৩৩০ টাকা
১৮৭১—৭২	৩৯,৫৯,৬৫০ ”
১৮৭২—৭৩	৪৬,৩৬,৭৩৩ ”
১৮৭৩—৭৪	৫৯,১৩,৬২০ ”
১৮৭৪—৭৫	৫০,২৫,৪৩০ ”
১৮৭৫—৭৬	১,০৩,৪৩, ৫৭০ ”
১৮৭৬—৭৭	২,১২,৯৯,৬২০ ”
১৮৭৭—৭৮	১,০৯,২০,৩৯০ ”
১৮৭৮—৭৯	২,৫০,৩০,০০০ ”
১৮৭৯—৮০	২,৯২,৬৪,০৩০ ”
১৮৮০—৮১	২,৭১,৬৮,০৯০ ”
১৮৮১—৮২	৩,৫৫,৬৭,০[illegible]
১৮৮২—৮৩	৩,০৮,১৪,৩৩০ ”
মোট	২১,২৩,৭৭,৭৯০ টাকা

দরিদ্র ভারতবর্ষের পক্ষে ১৮৭০ সন হইতে ১৮৮২ সন পর্য্যন্ত ১৩ বৎসরে ২১।০ কোটি টাকা এইরূপ জলে যাওয়া সামান্য দুঃখের কথা নহে। এক্ষণ যে প্রকার একচেঞ্জের অবস্থা, তাহার উন্নতি না হইলে, এক্ষণ হইতে এই উপলক্ষে বৎসর বৎসর তিন কোটী কিংবা তদধিক টাকা নষ্ট হইতে থাকিবে; এবং প্রত্যেক ২০ বৎসরে এক এক বৎসরের রাজস্ব শুষিয়া যাইবে! একচেঞ্জের অবস্থা অধিকতর প্রতিকূল হইলে বিপত্তির কথা। ইংলণ্ডে যদি আমরা আরও টাকা কর্জ্জ করি, তাহা হইলেও আমাদিগকে এই কারণে অধিকতর ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে; কারণ সুদ বাবদে আমাদিগকে যত অধিক অর্থ ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে হইবে, ততই আমাদিগের একচেঞ্জের দরুণ অধিক দণ্ড পড়িবে।

নিম্নলিখিত কারণে ভারতবর্ষে রৌপ্যের মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

১। ইউরোপ ও আফ্রিকার যেসকল দেশ রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহার করিত, তাহাদের অনেকে রৌপ্য ছাড়িয়া স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করিয়াছে। রৌপ্য, মুদ্রা-নির্ম্মাণ ব্যতীত অন্য প্রয়োজনে অল্পই ব্যবহৃত হয়, সুতরাং ঐসকল দেশ রৌপ্য-মুদ্রা ছাড়িয়া দেওয়াতে বহু রৌপ্য অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, এবং এই কারণেই রৌপ্যের মূল্য কমিয়া গিয়াছে। অনেক পূর্ব্ব হইতেই গ্রেট ব্রিটেন, ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্, পর্টুগাল, এবং ব্রেজিলে স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তদিতর অন্যান্য প্রায় সমস্ত দেশেই রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল; কএক বৎসর হইল, জর্ম্মণি, হলণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন এবং ডেনমার্ক রৌপ্য মুদ্রা ছাড়িয়া স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলন আরম্ভ করিয়াছে। রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি,

ইটালী, স্পেন, তুরুষ্ক এবং ভারতবর্ষ অদ্যাপি রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহার করিতেছে। ফ্রান্সে উভয় মুদ্রারই প্রচলন আছে।

২। কালিফর্ণিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে প্রভূত রৌপ্য উৎপন্ন হওয়াতে রৌপ্যের বাজার সস্তা হইয়া পড়িয়াছে।

৩। ক্রিমিয়া সমর এবং আমেরিকার অন্তর্ব্বিদ্রোহ সময়ে, রুসিয়া ও আমেরিকা হইতে ইংলণ্ড যে সমস্ত পণ্য আমদানি করিত, তাহা ভারতবর্ষ হইতে আমদানি করিয়াছে। সুতরাং তদ্দরুণ ভারতবর্ষে বহু রৌপ্যের আমদানি হইয়াছে। রৌপ্যের আধিক্য হওয়াতে রৌপ্যের বাজার পড়িয়া গিয়াছে।

৪। কানপুর বিদ্রোহ, বঙ্গের দুর্ভিক্ষ এবং রেলওয়ে নির্ম্মাণ উপলক্ষে ভারতবর্ষ বহু রৌপ্য বিদেশ হইতে কর্জ্জ করিয়াছে। এই আমদানির দরুণ রৌপ্যের মূল্য লাঘব হইয়াছে। *

সরজন ষ্ট্রেচি বলেন '১৮৭২ সনের নবেম্বর মাস হইতে রৌপ্যের মূল্য কমিতে আরম্ভ হইয়াছে, ঐ তারিখের পূর্ব্বে ২২বৎসর যাবৎ লণ্ডনে ১ আউন্স (প্রায় ২⅙ তোলা) রূপার (Silver) দাম কোন দিনও ৬০ পেন্সের ন্যূন হয় নাই, এবং ইহার পূর্ব্বে আরও ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত উহার মূল্য ৫৯ পেন্সের নীচে নামে নাই। ১৮৭৩ সনে, উহার গড় মূল্য ৫৯.২২ পেন্স, এবং সর্ব্ব নিম্ন মূল্য ৫৭$\frac{5}{16}$ পেন্স হয়। ১৮৭৪ সনে গড়মূল্য ৫৮.৩৭ পেন্স এবং সর্ব্ব নিম্ন মূল্য ৫৭$\frac{1}{4}$ পেন্স; ১৮৭৫ সনে গড়মূল্য ৫৬.৭৬ পেন্স এবং সর্ব্বনিম্ন মূল্য ৫৫$\frac{1}{2}$ পেন্স; ১৮৭৬ সনে গড়মূল্য ৫৩.৮ পেন্স এবং সর্ব্বনিম্ন মূল্য ৪৭ পেন্স ছিল।' রৌপ্যের মূল্য এই প্রকার ক্রমে ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। সম্প্রতি ইহার গড়মূল্য প্রায় ৫১ পেন্‌স হইয়াছে।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের কিরূপ সম্বন্ধ পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, পাঠকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৮৭৬ সনের ষ্টেটিষ্টিকেল রিপোর্টার হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

'পূর্ব্বকালে রৌপ্য হইতে স্বর্ণ ১৩$\frac{1}{2}$ গুণ মূল্যবান্ ছিল; পাশ্চাত্য রোমরাজ্যের পতন সময়ে রৌপ্যের মূল্য স্বর্ণের $\frac{১}{১৪\frac{১}{২}}$ ভাগ হয়। মধ্যযুগে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রৌপ্যের মূল্য স্বর্ণের ১৬ ভাগের একভাগ হয়। কিন্তু আমেরিকা আবিষ্কারের পর স্বর্ণের মূল্য কমিয়া যায় এবং রৌপ্যের ১০$\frac{1}{2}$ হইতে ১১ গুণ মাত্র হয়। ১৬শ শতাব্দী এবং ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এই সম্বন্ধ স্থির থাকে। তৎপর আবার স্বর্ণের মূল্য বাড়িতে থাকে, এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রৌপ্যের ১৫ গুণ হয়। ১৮শ শতাব্দীতে কখনও ১৫ গুণের কিছু উপরে উঠিয়াছে, কখনও কিছু নীচে নামিয়াছে। ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে উহা ১৫$\frac{1}{2}$ গুণ ছিল।

'১৮৫০ সন পর্য্যন্ত রৌপ্যের মূল্য স্বর্ণের

* ১৮৭৭ সনের ১৫ ই মার্চ্চ তারিখের সার জন ষ্ট্রেচি কর্তৃক লিখিত রাজস্ব সম্বন্ধীয় মিনিট দেখ।

ষোড়শাংশের নীচে নামে নাই। ১৮৫০ হইতে ১৮৫২ সন পর্য্যন্ত ফরাসী গবর্ণমেণ্টের মুদ্রানির্ম্মাণ এবং রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন জন্য রৌপ্যের মূল্য কিছু বাড়িয়া স্বর্ণের পঞ্চদশ ভাগ হইয়াছে। ১৮৫৯ সন হইতে রৌপ্যের মূল্য অলক্ষিতভাবে কমিতে থাকে; অবশেষে ১৮৭৩ সনে এই হ্রাস স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ঐ সনে রৌপ্যের মূল্য স্বর্ণের ১/১৫.৯৮ ভাগ, এবং ১৮৭৫ সনের শেষভাগে ১/১৬.৮ ভাগ মাত্র হয়।' এক্ষণে রৌপ্যেরমূল্য স্বর্ণের প্রায় ১/১৮.৬ ভাগ হইয়া পড়িয়াছে।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের আপেক্ষিক মূল্য, এবং একচেঞ্জের অবস্থা কিরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাও সাধারণতঃ সহজ ভাষার বুঝান যাইতেছে। স্বর্ণের মূল্য বহু বৎসর ধরিয়াই ঠিক চলিয়া আসিতেছে;—এক আউন্স স্বর্ণের মূল্য প্রায় ৩৪/৫ পাউণ্ড। সুতরাং যখন রূপার দাম প্রতি আউন্স ৬০পেন্স ছিল, তখন রৌপ্যের মূল্য কাযেই স্বর্ণের ১/১৫ ভাগ ছিল। এক্ষণ এক আউন্স রৌপ্য প্রায় ৫১ পেন্স, সুতরাং রৌপ্যের মূল্য স্বর্ণের প্রায় ১/১৮.৬ ভাগ হইয়াছে। টাকার মূল্য অথবা একচেঞ্জের অবস্থাও এইরূপ সহজে গণনা করা যাইতে পারে। প্রত্যেক টাকায় ১৮০ গ্রেণ রূপা থাকে *। এবং টাকা প্রস্তুত করাইবার জন্য টাকশালে প্রায় ৩.৮৬ গ্রেণ রূপা বায়না দিতে হয়। † অর্থাৎ প্রায় ১৮৩.৮৬ গ্রেণ রূপা টাকশালে দিলে একটি টাকা পাওয়া যায়। ‡ অতএব লণ্ডনে ১৮৩.৮৬ গ্রেণ রূপার যে মূল্য টাকার ও সেই মূল্যই হইবে।

যে রূপায় টাকা তৈয়ার হয়, সম্প্রতি লণ্ডনে তাহার ১ আউন্সের মূল্য প্রায় ৫১ ৪/৫ পেন্স, সুতরাং ১৮৩.৮৬ গ্রেণ রূপার মূল্য ১ শিলিং ৭ ৪/৫ পেন্স। অতএব এক্ষণে টাকার মূল্যও লণ্ডনে ১ শিলিং ৭ ৪/৫ পেন্স হইবে। ইহাকেই ব্যবসায়ীর ভাষায় এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, লণ্ডনের সহিত ভারতবর্ষের এক্‌চেঞ্জের অবস্থা ১ শিলিং ৭ ৪/৫ পেন্স।

লণ্ডনের সহিত ভারতবর্ষের এক্‌চেঞ্জের প্রকৃত অবস্থা যদিও ১ শিলিং ৭৷০ পেন্স হউক, তথাপি বাণিজ্য ব্যবসায়ের কারবার এতদনুযায়ী চলে না। কারবারে সামান্য ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। অর্থাৎ যদিও ১টাকার মূল্য ইংলণ্ডীয় মুদ্রায় ১শিলিং ৭পেন্স হউক, তথাপি ইংলণ্ডের কোন ব্যক্তিকে ভারতবর্ষে একটি টাকার হুণ্ডি পাঠাইতে হইলে কারবারের ভাবগতিক বুঝিয়া হয়ত কোন সময় তাহাকে প্রকৃতমূল্য হইতে

---

* এই রূপা কষ্টিমতে নির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ standard silver, ইহাতে খাটি (pure) রূপা ১৬৫ গ্রেণ এবং খাদ (alloy) ১৫ গ্রেণ।

† টাকা প্রস্তুত করাইবার জন্য শতকরা ২ টাকা মাসুল (seignorage) দিতে হয়, এবং ইহা ব্যতিরেকেও রূপা গলাইবার এবং পরীক্ষা করাইবার জন্য স্বতন্ত্র কিঞ্চিৎ মাসুল ধরা হইয়া থাকে।

‡ ১৮০,০০০ গ্রেণ রূপা (Standard silver) দিলে, ৯৭৯ টাকার এক খানি প্রমেশারি নোট পাওয়া যায়। See Sec. 11, Act III of 1871.

কিঞ্চিৎ অধিক, হয়ত কোন সময়ে কিঞ্চিৎ ন্যূন দিতে হয়। যখন তাহাকে প্রকৃত মূল্য দিতে হয়, তখন একচেঞ্জ সমাবস্থায় (at par) আছে এরূপ বলাযায়। যখন কিছু বেশী দিতে হয়, তখন একচেঞ্জ তাহার দেশের প্রতিকূল (against) এবং যখন কিছু কম দিতে হয়, তখন অনুকূল (favor- able) আছে এইরূপ বলা হইয়া থাকে। প্রকৃত মূল্য হইতে যে অঙ্ক বেশী দিতে হয় তাহাকে প্রিমিয়াম কহে এবং হুণ্ডি সকল প্রিমিয়ামে বিক্রয় হইতেছে (selling at a premium,) এইরূপ কহা যায়। আবার প্রকৃত মূল্য হইতে যে অঙ্ক কম দিতে হয়, তাহাকে ডিস্কাউণ্ট কহে, এবং হুণ্ডি সকল ডিস্কাউণ্টে বিক্রয় হইতেছে (Selling at a discount) এইরূপ বলা গিয়া থাকে।

বিল কেন সময়ে সময়ে প্রিমিয়ামে ও ডিস্কাউণ্টে বিক্রয় হয়, তাহা অর্থ ব্যবহার শাস্ত্রের যে কোন গ্রন্থ পাঠ করিলেই জানা যাইবে। সুতরাং তাহা এখানে উল্লেখ করা অনাবশ্যক। লণ্ডন হইতে ভারত- বর্ষে নিম্নলিখিত উপায়ে অর্থ প্রেরিত হয়।

নগদ মুদ্রা
কৌন্সিল ড্রেফ্‌ট (Council draft)
টেলিগ্রাফ (Telegraphic Transpers)
বেঙ্কবিল (Bank Bill)
বরাত চিঠি (Private Bill)

বিলাত হইতে ভারতবর্ষে পাঠাইবার জন্য অনেক মুদ্রা বিলাতের বেঙ্কে জমা হয়, আবার ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে পাঠা- ইবার জন্য অনেক মুদ্রা ভারতবর্ষীয় বেঙ্ক- সমূহে জমা হয়। বিলাতের বেঙ্কে যে মুদ্রা জমা হয়, তাহার পরিমাণ ভারতব- র্ষীয় বেঙ্কে জমা হওয়া মুদ্রা হইতে অনেক বেশী ; সুতরাং এই উভয় দেশীয় বেঙ্ক পরস্পরের লেনা দেনা কাটা কাটি করিয়াও বিলাতের বেঙ্ককে ভারতবর্ষে বহু নগদ মুদ্রা পাঠাইতে হয়। এই নগদ মুদ্রা ক- তক স্বর্ণে, কতক রৌপ্যে পাঠান হইয়া থাকে, এবং ইহার অধিকাংশ ভারতবর্ষীয় টাকশালে প্রেরিত হইয়া ভারতবর্ষীয় মুদ্রায় পরিণত হয়।

কাউন্সিল ড্রেফ্‌ট, বেঙ্কবিল ও বরাত চিঠির বিশেষ বিবরণ গত ১২৮৯ সনের মাঘ ও ফাল্গুণ মাসের বান্ধবে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরু- ল্লেখ করিব না। যাহাদের অতি শীঘ্র অর্থ পাঠাইবার প্রয়োজন হয়, তাহারা টেলি- গ্রাফ যোগে পাঠাইয়া থাকেন।

উক্ত কাউন্সিল ড্রেফ্‌ট এবং বেঙ্কবিল প্রভৃতি প্রকৃত একচেঞ্জের অবস্থা হইতে কেন ঈষৎ অধিক মূল্যে বিক্রীত হয় তাহার কারণ সংক্ষেপে লিখিতেছি। মনে কর ল- ণ্ডন বেঙ্ক ও বেঙ্গল বেঙ্কে কারবার চলি- তেছে। বৎসরের প্রথমে লণ্ডন বেঙ্ক অনু- মান করিল যে এ বৎসর ২০ কোটী টাকার হুণ্ডি বেঙ্গল বেঙ্ক হইতে আসিতে পারে, সুতরাং বেঙ্গল বেঙ্কের উপরও ২০ কোটী টাকার হুণ্ডি করা চাই ; কারণ তাহা হইলে উভয় বেঙ্কেই লেনা দেনা সমান হইবে, কাহাকেও কাহারও নিকট নগদ মুদ্রা পা- ঠাইতে হইবে না। অতএব লণ্ডন বেঙ্ক

মোট ২০ কোটী টাকা মূল্যের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত করিয়া রাখিল। ভারতবর্ষে যাহাদিগকে অর্থ পাঠাইতে হয়, তাহারা ঐ বিল ক্রয় করিয়া নেয়। অর্থাৎ মনেকর বিলাতের জনকে ভারতবর্ষের রামদাসের নিকট একটি টাকা পাঠাইতে হইবে, ধর যেন ১টি টাকার প্রকৃত মূল্য ১ শিলিং ৭ ৯/১০ পেন্স; অতএব জন লণ্ডন বেঙ্কে ১ শিলিং ৭ ৯/১০ পেন্‌স জমা করিয়া দিয়া ১টি টাকার একখানি হুণ্ডি ক্রয় করিল, এবং ঐ হুণ্ডি ডাকযোগে রামদাসের নিকট পাঠাইয়া দিল; রামদাস উহা বেঙ্গল বেঙ্কে দিয়া ১টি টাকা লইয়া গেল। কিন্তু মনে কর কএক দিবস পরে লণ্ডন বেঙ্ক দেখিতে পাইল যে ভারতবর্ষের উপর যে হুণ্ডি তৈয়ার আছে, তাহার যথেষ্ট কাট্‌তি হইতেছে; এবং এই পরিমাণে কাট্‌তি হইলে তৈয়ারি বিলে কুলাইবে না। স্নতরাং লণ্ডন বেঙ্ক উক্ত বিলের মূল্য চড়াইতে আরম্ভ করিল, কেন না মূল্য চড়াইলে খরিদদার কমিবে, এবং যদি বেঙ্গল বেঙ্কের সহিত দেনা পরিষ্কার জন্য বেঙ্গলবেঙ্কে নগদ মুদ্রা পাঠাইতে হয়, তবে সেই পাঠানের ব্যয়ও কুলান যাইবে? যেথানে ১ শিলিং ৭ ৯/১০ পেন্‌স দিলেই ১টি টাকার হুণ্ডি পাওয়া যাইত,সেখানে হয়ত এখন ১ শিলিং৮ পেন্‌স না দিলে হুণ্ডি পাওয়া যাইবে না। অতএব এস্থলে যদিও প্রকৃত একচেঞ্জের অবস্থা ১ শিলিং ৭ পেন্‌স হউক,তথাপি বেঙ্ক বিলের একচেঞ্জের অবস্থা ১ শিলিং ৮ পেন্স হইল। অনেক সময়ে এই সমস্ত হুণ্ডির মূল্য এত বাড়িয়া পড়ে যে শেষে লোকে হুণ্ডি ক্রয় না করিয়া নগদ মুদ্রা পাঠানই স্নবিধা বোধ করে। কারণ মনে কর যেন পাউণ্ডের প্রকৃত মূল্য ১২ টাকা; এক্ষণের লণ্ডনের যদি কোন ব্যক্তিকে ভারতবর্ষের কাহারও নিকট ১২০০ টাকা পাঠাইতে হয়, তবে হয়ত সে ৫ পাউণ্ড প্রিমিয়াম না দিলে অর্থাৎ ১০৫ পাউণ্ড না দিলে ১২০০ টাকার একথান হুণ্ডি ক্রয় করিতে পাইবে না। কিন্তু সে যদি লণ্ডনে রৌপ্য ক্রয় করিয়া জাহাজে পাঠাইয়া দেয়, তবে হয়ত জাহাজ ভাড়া এবং ভারতবর্ষীয় টাকশালে ঐ রৌপ্য দ্বারা ভারতবর্ষীয় মুদ্রা নির্ম্মাণ করাইবার ব্যয় প্রভৃতি ধরিয়াও তাহার ১০৪ পাউণ্ডের অধিক লাগে না। এ অবস্থায় সে লণ্ডন বেঙ্কের হুণ্ডি ক্রয় না করিয়া রৌপ্য ক্রয় করিয়াই পাঠাইয়া থাকে। কাউন্‌সিল ড্রেফ্‌ট প্রভৃতি সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযুজ্য হয়। কাউন্‌সিল ড্রেফ্‌টের মূল্যে এবং বেঙ্কবিলের মূল্যে হয়ত প্রভেদ দৃষ্ট হইবে। কারণ যেটার যে পরিমাণ কাট্‌তি,সেইটার সেই পরিমাণ মূল। ইংলিশমেন প্রভৃতি পত্রিকার money market স্তম্ভের প্রতি দৃষ্টি করিলেই কোন্ কাগজ কিরূপ মূল্যে বিক্রীত হয় তাহার দৈনিক ও সাপ্তাহিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

একচেঞ্জ সম্পর্কে আরও অনেক কথা বলিবার আছে, ক্রমে বলা যাইবে।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার সার মর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চতুর্থ দিন।

বিনোদ। জাতিভেদ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণ কি জন্য ভগবদ্‌গীতায় জাতিভেদ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের অবতরণ করিলেন তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।

গোপী। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য পালন করিতে শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য কার্য্য গুলির নির্দ্ধারণ কিরূপে হইবে? কর্ত্তব্য কার্য্যের নির্দ্ধারণ করা অতীব কঠিন। এজন্য কৃষ্ণ বলিতেছেন—'হে অর্জ্জুন! তোমার কর্ত্তব্য কার্য্যের নির্দ্ধারণ আমি পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছি। আমি জাতিভেদ প্রথা দ্বারা প্রত্যেক মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের সুবিধা করিয়া রাখিয়াছি। তুমি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় বর্ণের যাহা যাহা কর্ত্তব্য কার্য্য, তোমারও সেই সমস্তই কর্ত্তব্য কার্য্য। ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করিলেই তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য করা হইবে।'

বিনোদ। যদি এ কালে এই রূপে সমাজের গঠনকর্ত্তৃগণ স্পষ্টভাবে সামাজিক ব্যক্তিসমূহের কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে অধুনাতন সামাজিক বিশৃঙ্খলতা অনেক দূরীভূত হইতে পারিত। সকলেই নিজ বুদ্ধি দ্বারা নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইতে পারিবে এরূপ বিশ্বাস ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

গোপী। সে যাহা হউক, এক্ষণে গীতার কথা আলোচনা করা যাউক। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের পথ পরিস্কৃত করিয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে সাধারণের যে সমস্ত কুসংস্কার আছে একে একে তাহার নিরাকরণ করিতেছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন 'সমস্ত কর্ম্ম তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। যথা কর্ম্ম, নিষ্কর্ম্ম, কুকর্ম্ম। লোকে সাধারণতঃ এই তিনটি শ্রেণীর বিভেদ বুঝিতে পারে না। যখন কোন মনুষ্য ভূমিতে জানু পাতিয়া ঈশ্বরারাধনা করে, তখন লোকে মনে করে যে, ঐ ব্যক্তি কর্ম্ম করিতেছে। কিন্তু হয়ত উহা নিষ্কর্ম্ম বা কুকর্ম্ম মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য। আবার যখন কোনব্যক্তি নিশ্চিন্ত ভাবে অলসের ন্যায় উপবিষ্ট থাকে, তখন লোকে মনে করে যে ঐ ব্যক্তি নিষ্কর্ম্মা। কিন্তু হয়ত, তৎকালে ঐ ব্যক্তি চিন্তা দ্বারা নিজকর্ম্ম সম্বন্ধে সুচারু প্রণালীর উদ্ভাবন করিতেছে। লোকে সাধারণতঃ মনে করে যে শরীর

চালনা না করিলেই নিষ্কর্ম্মা হইতে হয় এবং শরীর চালনা দ্বারাই কর্ম্মী হওয়া যায়, এবং যে ব্যক্তি কোনরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করে, সেই কুকর্ম্মী। এই সাধারণ বিশ্বাসটি ভ্রমাত্মক। যে ব্যক্তি স্থলবিশেষে কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মের মধ্যে কর্ম্ম দেখিতে পান, সেই ব্যক্তিই যথার্থ কর্ম্মের দুরবগাহ তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন '।

বিনোদ। কৃষ্ণ বড় সুন্দর কথা বলিয়াছেন। যখন কোন সভাতে বক্তা বাহু উত্তোলন করিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বহুল সঞ্চালন করতঃ, মানবকণ্ঠ হইতে সিংহশাদ্দূলবৎ গর্জ্জন নিষ্কাশিত করিতে থাকেন তখন সকলেই মনে করেন, যে বক্তা বুঝি বড় এক কর্ম্ম করিতেছেন। কিন্তু হয়ত, বক্তা কিছুই করিতেছেন না। যখন কোন কবি মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে 'চরণ' 'মরণ' 'শরণ' 'লবণ' 'যবন' 'চ্যবন' প্রভৃতি মিত্রাক্ষরের অন্বেষণ করেন তখন কবি মনে করেন, যেন তিনি বড় একটা কর্ম্ম করিতেছেন। কিন্তু হয়ত তিনি, কিছুই করিতেছেন না। আবার যখন শিশু সূতিকাগৃহে আপনার ক্ষুদ্র হস্তপাদগুলি ইতস্ততঃ সঞ্চালন করেন, তখন লোকে মনে করে যে শিশু খেলা করিতেছে। কিন্তু সেই সময়েই শিশু ভবিষ্যৎ জ্ঞানভাণ্ডারের আয়োজন করিতেছে। যখন—

গোপী। আর কেন? যথেষ্ট হইয়াছে। তুমি কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মের মধ্যে কর্ম্ম দেখিয়াছ। এক্ষণে অন্য কথা শ্রবণ কর। কৃষ্ণ বলিতেছেন 'যিনি নিষ্কাম, যিনি নিত্যতৃপ্ত, যিনি নিরাশ্রয়, যিনি যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্ট, যিনি মৎসর-শূন্য, যিনি দ্বন্দ্বশূন্য, যাঁহার সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়েই তুল্যজ্ঞান, সেই পণ্ডিত ব্যক্তি কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলেও তাঁহাকে কর্ম্মী বলা যায় না। কারণ তাঁহার শরীর কর্ম্ম করিতেছে মাত্র, তাঁহার মন নিষ্কর্ম্মা রহিয়াছে।'

বিনোদ। বুঝিয়াছি। অন্য কথা বল।

গোপী। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'পৃথিবীতে লোকে নানা উদ্দেশ্যে নানাবিধ যজ্ঞ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বা ব্রহ্মযজ্ঞ সাধন করেন। ব্রহ্মাই ইহাঁদের দেবতা, ব্রহ্মাই হোতা, ব্রহ্মাই ইহাঁদের হবি, ব্রহ্মাই ইহাঁদের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ইহাঁরা একমনে তদ্গতপ্রাণ হইয়া ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা চিত্তবৃত্তি রোধ করিয়া এইরূপ উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন। কেহ কেহ বা দৈবসাহায্য প্রাপ্তির জন্য যজ্ঞ করিয়া থাকেন। কেহ বা জ্ঞান লাভাশয়ে যজ্ঞ করিয়া থাকেন। কেহ বা ইন্দ্রিয় সংযমোদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত যজ্ঞ করিলে মুক্ত হওয়া যায়, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে যজ্ঞের উদ্দেশ্য জ্ঞান সেই যজ্ঞ ফলান্বেষী দ্রব্যযজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ। তুমি জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা কর। অর্থাৎ তুমি কর্ম্ম করিতে থাক। কর্ম্ম করিতে করিতেই তোমার জ্ঞানোন্মেষ হইবে। 'সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।' এই জ্ঞানলাভের সাহায্যের জন্য তুমি গুরুচর্য্যা করিতে থাক। গুরুকে প্রণিপাত কর,

গুরুর সেবা কর, গুরুর প্রতি প্রশ্ন কর, এই তিন উপায় দ্বারা, (কর্ম্ম করিতে করিতে) তুমি জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে।'

বিনোদ। 'নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম আচরণ কর, তাহাদ্বারাই তুমি জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে,' কৃষ্ণ একথা বারংবার বলিতেছেন কেন?

গোপী। বারংবার না বলিলে কোন তত্ত্ব হৃদয় মধ্যে গ্রথিত হয় না। কৃষ্ণ জ্ঞানমাহাত্ম্য সম্বন্ধে আরও যাহা বলিলেন তাহা শ্রবণ কর।

কৃষ্ণ বলিলেন—'কর্ম্ম করিতে করিতে যখন তুমি জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে, তখন তোমার কর্ম্মানুষ্ঠান কালীন সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইবে।

যদি তুমি কর্ম্মানুষ্ঠান কালে সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর পাপাচরণও করিয়া থাক, তাহা হইলেও তুমি জ্ঞান তরণীদ্বারা ঐ পাপ সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। জ্ঞানরূপ অগ্নিতে তোমার সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। তুমি আমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।'

বিনোদ। আজি অনেক কথা হইয়াছে। এখানেই ক্ষান্ত হওয়া যাউক।

গোপী। সে কথাই ভাল।

পঞ্চম দিন।

গোপী। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে কৃষ্ণ! যদি গুরূপদেশ, গুরুসেবা, পরিপ্রশ্ন প্রভৃতি দ্বারাও জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত উপায়ে জ্ঞানলাভ করার বাধা কি? জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা জ্ঞানলাভ ও কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা জ্ঞানলাভ এ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ?' ইহাতে কৃষ্ণ উত্তর করিলেন—'যদি কেহ সম্যক্‌রূপে জ্ঞানচর্চ্চা করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞানদ্বারাই মুক্তিলাভ হইবে। এবং যদি কেহ যথাবিধি নিষ্কামচিত্তে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তিনিও মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না জন্মিলে সম্যক্ প্রকারে জ্ঞানালোচনা করা যায় না। এজন্য সর্ব্বসাধারণের পক্ষে অগ্রে কর্ম্মানুষ্ঠানই বিহিত। কর্ম্মানুষ্ঠান কালে গুরুর নিকট সদুপদেশ গ্রহণ করিয়া মানসিক উন্নতি জন্মাইবার কোন নিষেধ নাই। তুমি নিষ্কাম চিত্তে ও কর্ত্তব্যজ্ঞানে কর্ম্মানুষ্ঠান কর। এবং তৎসঙ্গে গুরূপদেশমালাও গ্রহণ কর। এইরূপে তুমি অচিরেই সম্যক্ জ্ঞানলাভের অধিকারী হইবে।

বিনোদ। কৃষ্ণ এই কথা আরো অনেকবার বলিয়াছেন। কিন্তু আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। কৃষ্ণের মতে জ্ঞানই কি মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য?

গোপী। বোধ হয় না, জ্ঞানলাভ হইলে মনুষ্যের কি কি উপকার হয়, কৃষ্ণ তাহা অনেক বার বলিয়াছেন। কৃষ্ণ পঞ্চম অধ্যায়েও বলিতেছেন, কর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ জ্ঞানলাভ করিলে মনুষ্যের আত্মা বিশুদ্ধ হয়। তিনি শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের উপর আধিপত্য সংস্থাপন করেন, তিনি সর্ব্বপ্রা-

ণীর উপর আত্মনির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন; তিনি কার্য্য করিয়াও কার্য্যে লিপ্ত হন না। জ্ঞানলাভ হইলে মনুষ্য সকল প্রকার কার্য্য করিয়াও মনে করে সে কিছুই করে নাই। সে মনে করে যে তাহার ইন্দ্রিয় সকল ইন্দ্রিয়োপযোগি কার্য্য করিতেছে, কিন্তু সে নিজে নিশ্চেষ্ট আছে। পদ্মপত্রে যেমন জলকণা প্রবেশ করিতে পারে না, পাপ সেইরূপ ঐ মনুষ্যের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পায় না। তাঁহারা যখন যে কার্য্য করেন সে সমস্তই আত্মশুদ্ধির আশয়ে করিয়া থাকেন। তাঁহারা চিরকাল পরমসুখে অতিবাহন করিয়া থাকেন।'

বিনোদ। তাহা হইলে তোমার বিবেচনায় কৃষ্ণের মতে শান্তি বা উপরতিই (Quietism) মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য।

গোপী। হাঁ। আমার বিশ্বাস ঐরূপই বটে। যে ব্যক্তি নিষ্কাম চিত্তে কৃষ্ণপ্রীতিকামনায় সর্ব্বদা নিজ জাতি ধর্ম্মানুসরণরূপ কর্ত্তব্যপালন করেন,তিনি বৃদ্ধাবস্থায় শান্তি ও প্রসাদ সুখ ভোগ করেন, ইহা বোধ হয় কৃষ্ণের অভিপ্রায়। সে যাহাহউক, কৃষ্ণ ইহার পরেই একটি গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'কোন কোন লোক বলে যে মনুষ্য ঈশ্বর হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায়। তাহারা বলে যে ঈশ্বরই কর্ত্তা,ঈশ্বরই কর্ম্ম ও ঈশ্বরই কর্ম্মফল। ঈশ্বরই পাপ ও ঈশ্বরই পুণ্য। কিন্তু এই মতটি ভ্রমাত্মক। ঈশ্বর লোককে কর্ত্তৃরূপে নিয়োজিত করেন না। ঈশ্বর লোকের জন্য কর্ম্মমালা সৃজন করেন না। ঈশ্বর কর্ম্মফলের সংযোগ করেন না। ঈশ্বর কাহারও পাপ নিজমস্তকে গ্রহণ করেন না। ঈশ্বর কাহারও পুণ্যের অংশও গ্রহণ করেন না। স্ব স্ব স্বভাববশতঃ মনুষ্য কখনও বা কর্ত্তা ও কখনও বা কর্ম্মস্থলীয় হয়। স্বভাব বশতঃই মনুষ্য নিজকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে। নিজ স্বভাব বশতঃ মনুষ্য কখনও বা পাপ পথে কখনও বা পুণ্য পথে আকৃষ্ট হয়। যাহারা অজ্ঞান তাহারাই নিজকৃত কর্ম্ম পুণ্য পাপ প্রভৃতিকে ঈশ্বরকৃত বলিয়া আখ্যা দেয়।'

বিনোদ। এস্থলে দেখা যাইতেছে যে কৃষ্ণ Predestination অথবা নিযুক্তি বাদের বিরোধী। কিন্তু তাহা হইলে সংস্কৃতে যে একটি সাধারণ শ্লোক আছে

'জানামি ধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'

তাহার অর্থ কি?

গোপী। এই শ্লোকটিতে নৈতিক উপদেশ নাই। ইহা পাপীর অনুতাপব্যঞ্জক খেদ। পাপী বলিতেছে—'হায় হায়! কি পরিতাপের বিষয়! ধর্ম্ম জানিয়াও ধর্ম্মে আমার প্রবৃত্তি হইল না। অধর্ম্ম জানিয়াও পাপে আমার নিবৃত্তি হইল না। হে হৃষীকেশ অদ্যাবধি তুমি আমাকে যে পথে চালিত করিবে, আমি সেই পথেই চলিব।'

বিনোদ। বোধ হয়, এই অর্থই প্রকৃত। কারণ শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও পাপ পথে চালিত করেন ইহা ধার্ম্মিকে মুখেও আনিতে

পারে না। কিন্তু নিযুক্তিবাদের কথা গীতায় আসিল কেন?

গোপী। কৃষ্ণ বলিতেছেন—"যাহারা কর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ জ্ঞানলাভ করে তাহারা নিযুক্তিবাদরূপ মহাভ্রমে নিপতিত হয় না। তাহারা বুঝিতে পারে যে 'স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে' অর্থাৎ স্বভাব হইতেই সমস্ত ঘটনা সম্ভাবিত হইতেছে।"

বিনোদ। বুঝিলাম। এক্ষণে অন্য কথা বল।

গোপী। পঞ্চম অধ্যায়ে আর অন্য কথা বড় নাই। যাহারা বহুকাল নিষ্কামচিত্তে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া জ্ঞানলাভ করেন তাঁহারা আরও কি কি মানসিক গুণে বিমণ্ডিত হন, কৃষ্ণ তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন 'জ্ঞানলাভ করিলে, মনুষ্যের মনে ব্রহ্মজ্ঞান আদিত্যের ন্যায় প্রকাশিত হয়, ঈশ্বরই তাঁহাদের বুদ্ধি, ঈশ্বরই তাঁহাদের আত্মা, নিষ্ঠও আশ্রয় স্বরূপ হন। তাঁহারা নিষ্পাপ হইয়া মোক্ষধামে গমন করেন। তাঁহারা সকল জীবকে সমভাবে দর্শন করেন। তাঁহারা সিদ্ধকাম হইলে সন্তুষ্ট ও বিফলকাম হইলে উদ্বিগ্ন হন না। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মেতে চিত্ত সমাধান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বাহ্যসুখ অবহেলা করিয়া ঈশ্বর সুখে ভাসমান হইতে থাকেন। ইত্যাদি'

ষষ্ঠদিন।

গোপী। কৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন য বহুকাল নিষ্কামচিত্তে নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্য সময়ে সর্ব্বসংকল্প পরিত্যাগ করিয়া যোগী পদবীতে আরোহণ করিতে পারে। কিন্তু প্রথম হইতে তপশ্চরণ করিলে অনেকেই যোগী পদবীতে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না। তপশ্চরণ করিলে প্রকৃত যোগ সম্বন্ধে কিরূপ ব্যাঘাত হয়, কৃষ্ণ এস্থলে তাহা বলিতেছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'তপশ্চরণে আত্মার অবসাদ হয়। কঠোর শাসনদ্বারা ক্রমশঃ আত্মার ক্ষমতা সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু আত্মার এইরূপ অবসাদ হইতে দেওয়া উচিত নহে। আত্মা আমাদের পরম বন্ধু। ইহাঁর সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। অর্থাৎ ইহাঁকে ইহার স্বপথে স্বাধীনভাবে যাইতে দেওয়া উচিত। যিনি আত্মাকে শত্রু বলিয়া মনে করেন, যিনি সর্ব্বদা সকল বিষয়ে আত্মাকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, সর্ব্বশেষে আত্মাও তাঁহার পরম শত্রু হইয়া উঠেন। এজন্য আত্মাকে মিত্রভাবে কর্ম্মদ্বারা সৎপথে আনয়নকরা উচিত। কঠোর আত্মসংযমদ্বারা আত্মার ক্ষমতা সমস্ত বিনাশ করা উচিত নহে।'

বিনোদ। কৃষ্ণের যুক্তিটি বড় সুন্দর বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু আমি এখনও ইহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই।

গোপী। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'আত্মার দুইরূপ প্রবৃত্তি। সৎপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি। যাহারা তপঃশীল তাঁহারা কুপ্রবৃত্তি গুলির দমন করিতে গিয়া সৎপ্রবৃত্তি গুলি পর্য্যন্ত

বিনাশ করিয়া ফেলেন। তপশ্চরণে সমস্ত আত্মার অবসাদ হয়, অর্থাৎ আত্মার কুপ্রবৃত্তির সহিত সৎপ্রবৃত্তির বিনাশ হইয়া যায়। কিন্তু সংসারে থাকিয়া কর্ম্ম করিলে, ক্রমে ক্রমে আত্মার সৎপ্রবৃত্তি গুলির পরিপুষ্টি ও কুপ্রবৃত্তি গুলির বিনাশ হইতে পারে। এজন্য কর্ম্ম করাই উচিত। তপস্যা করা উচিত নহে।'

বিনোদ। বুঝিয়াছি। অন্যকথা বল।

গোপী। যদি কৃষ্ণের যুক্তিটি বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে ইহাও বুঝিবে যে আত্মসংযমপ্রবণ বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা নিষ্কামকর্ম্মপ্রবণ হিন্দুধর্ম্ম অন্ততঃ দুই এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। বৌদ্ধ আত্মাকে শত্রুজ্ঞান করেন। হিন্দু আত্মার সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করেন।

বিনোদ। এস্থলে হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও উচ্চতর ভূমিতে দণ্ডায়মান সন্দেহ নাই। তুমি অন্য কথা বল।

গোপী। যিনি বহুকাল সংসারাশ্রমে বাস করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে প্রকৃত যোগপদবীতে আরূঢ় হন, অর্থাৎ যিনি জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা, কূটস্থ (নির্ব্বিকার), সমলোষ্ট্রকাঞ্চন হইয়া সুহৃৎ, মিত্র, অসাধু প্রভৃতিকে সমান জ্ঞান করেন, সেই যোগারূঢ় ব্যক্তির কর্ত্তব্য কার্য্য কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করিতেছেন—'যোগারূঢ় ব্যক্তি জনশূন্য স্থানে নিরন্তর অবস্থান করিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত থাকিবেন। তিনি অতিভোজন বা উপবাস দ্বারা, অতিনিদ্রা বা অনিদ্রা দ্বারা আত্মাকে ক্লিশিত করিবেন না। এই রূপে সর্ব্বদা একমনে ঈশ্বরচিন্তা করিলে ঐ যোগারূঢ় ব্যক্তি এই পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তুতে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।' কৃষ্ণ যোগীর এইরূপ গুণকীর্ত্তন করিলে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে মধুসূদন! মনুষ্যের মন সর্ব্বদাই চঞ্চল। সে এই চঞ্চলতাকে কিরূপে পরাজিত করিবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।' কৃষ্ণ বলিলেন—'অভ্যাস দ্বারা মনুষ্য চঞ্চলতাকে পরাজিত করিতে পারিবে।' তাহাতে অর্জ্জুন পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে কৃষ্ণ! যদি কোন ব্যক্তি কিয়ৎকাল যোগাভ্যাস করিয়া পরে তাহা হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে তাহার অন্তিমে কি দশা হয়? সে কি ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হয়?' কৃষ্ণ বলিলেন 'না। তাহার ইহকাল বা পরকাল কিছুই বিনষ্ট হয় না। সে বহুজন্মে ক্রমশঃ অল্পে অল্পে আত্মার উন্নতি করিয়া অবশেষে আত্মার উপর আধিপত্য সংস্থাপন করিতে পারে।'

বিনোদ। কৃষ্ণের শেষ কথাটি ভাল করিয়া বুঝিলাম না।

গোপী। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'মনে কর কোন ব্যক্তি এই জন্মে আত্মজয় করিতে ষোল আনা অপারগ। ঐ ব্যক্তি চেষ্টা করিয়া পর জন্মে বার আনা মাত্র অপারগ হইবে। তাহার পর জন্মে ঐ ব্যক্তির আট আনা মাত্র অপারগতা থাকিবে। এই রূপে ক্রমে ক্রমে উহার সমস্ত অপারগতা দূরীভূত হইবে।'

বিনোদ। তাহা ত বুঝিলাম। কিন্তু এরূপ উক্তির তাৎপর্য্য কি?

গোপী। তাৎপর্য্য এই যে, কাহারও নিরাশ বা ঈশ্বরদ্রোহী হইবার প্রয়োজন নাই। যে চেষ্টা করিয়া এজন্মে আত্মসংযম করিতে পারিল না, সে পরজন্মের আশা করুক। এই জন্মেই সমস্ত ফুরাইয়া যাইবে এরূপ ভাবিবার প্রয়োজন নাই।

বিনোদ। বুঝিলাম। এক্ষণে অন্য কথা বল।

গোপী। পরে কৃষ্ণ বলিলেন—'যাঁহারা শুদ্ধ তপশ্চরণ করিয়া মোক্ষলাভের আশয় করেন, তাঁহারা সর্ব্ব নিকৃষ্ট মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যাঁহারা শুদ্ধ জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া মোক্ষলাভের আশয় করেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত তপস্বীদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যাঁহারা কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মোক্ষ লাভের আশায় করেন, তাঁহারা জ্ঞানান্বেষীদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যাঁহারা বহুকাল নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া পরে ঈশ্বরচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করেন, সেই যোগীরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান অধিকার করেন।'

সপ্তমদিন।

গোপী। কৃষ্ণ পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে ঈশ্বর চিন্তা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর কি তাহা না জানিলে ঈশ্বর চিন্তা হইবে কি রূপে? এজন্য কৃষ্ণ ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন, কৃষ্ণ বলিতেছেন—'ক্ষিতি অপ্‌তেজঃ প্রভৃতি পঞ্চভূত ঈশ্বর। যে হৃদয়ে ঐ পঞ্চভূতের অনুভব হয় সেই হৃদয় ও ঈশ্বর। যে বুদ্ধি দ্বারা ঐ পঞ্চভূতের সম্যক্ উপলব্ধি হয় সে বুদ্ধিও ঈশ্বর। যে অহঙ্কার (Subject-consciousness or self-consciousness) দ্বারা ঐ বুদ্ধির উপলব্ধি হয়, সেই অহঙ্কার ও ঈশ্বর। যে শক্তি দ্বারা সমস্ত সংসার জীবিত রহিয়াছে সেই শক্তিও ও ঈশ্বর। ঈশ্বর এই সংসারের সৃষ্টিকর্ত্তা, ঈশ্বর এই সংসারের বিনাশকর্ত্তা। দ্রব্যের মধ্যে যে সমস্ত রূপরস গন্ধ প্রভৃতি গুণ দেখিতে পাও তাহাও ঈশ্বর। মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধি, তেজ, সত্ব রজ, তমঃ প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ দেখিতে পাও সে সমস্তও ঈশ্বর। ফলতঃ যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরে এই নিখিল সংসার গ্রথিত রহিয়াছে। 'ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব।'

বিনোদ। বেস্ কথা। কিন্তু ইহাদ্বারা ঈশ্বরের উপলব্ধি করা অর্জ্জুনের পক্ষে সহজ হইয়াছিল কিনা সন্দেহের বিষয়।

গোপী। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমি এক্ষণে তোমার সহিত কোনরূপ তর্ক করিব না। কেবল এই মাত্র বলিব যে সকলে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারে না। কৃষ্ণ নিজেই অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—"যাহারা দুষ্কর্ম্মকারী, যাহারা মায়াচ্ছন্ন, যাহারা জ্ঞানহীন সেই সকল অসুরভাবাপন্ন নরাধমগণ ঈশ্বরকে জানিতে পারে না।"

বিনোদ। তাহা হইলে তোমার মতে আমি দুষ্কর্ম্মকারী, মায়াচ্ছন্ন, জ্ঞানহীন, অসুর ভাবাপন্ন ও নরাধম।

গোপী। রাগ করিও না। কলিকালে তুমি আমি সকলেই, ব্রাড্‌লা হইতে গ্লাড-

ষ্টোন পর্য্যন্ত সকলেই অসুরভাবাপন্ন। আমরা যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারিব না ইহা কৃষ্ণ আগেই বুঝিয়াছিলেন।

বিনোদ। যে ধর্ম্মে অসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিকে সুরভাবাপন্ন না করা যায় সে ধর্ম্মের প্রয়োজন কি?

গোপী। কৃষ্ণ ত পূর্ব্বেই বলিয়াছেন 'স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।' সে যাহা হউক, কিরূপ লোকে ঈশ্বর ভজনা করিয়া থাকে এক্ষণে তাহা শ্রবণ কর। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'চারি প্রকার লোকে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকে। বিপদে পতিত হইলে লোকে সহস্র অবিশ্বাস সত্ত্বেও ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে। কেহ কেহ বা তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া, ঈশ্বরারাধনা করিয়া, ঈশ্বরের নিকট জ্ঞানলাভের প্রয়াস করে। কেহ কেহ বা অর্থ লোভে ঈশ্বরের আরাধনা করে। কেহ কেহ বা সংসারে থাকিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া অবশেষে যোগীর ন্যায় ঈশ্বর সেবায় নিরত হয়। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকট যে বস্তুর প্রার্থনা করে, সে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকট হইতে তাহাই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যিনি কর্ম্ম করিতে করিতে জ্ঞানী হইয়া অবশেষে যোগাভ্যাস করেন, সেই ব্যক্তিই ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হইয়া থাকেন।'

বিনোদ। কেন?

গোপী। যে বিপন্ন হইয়া ঈশ্বর সেবা করে, সে বিপৎশেষে ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায়। যে তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া ঈশ্বর সেবা করে, সে আত্মাকে সকল সময়ে স্ববশে রাখিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন সে কখনও বা জ্ঞানপ্রভাবে কখনও বা তর্কের অনুরোধে অবমাননাও করিয়া ফেলে। যে ব্যক্তি অর্থলোলুপ, তাহার আত্মা নীচবর্ত্মানুসরণ করিয়া, অবশেষে নিজেই নীচ পথগামী হইয়া পড়ে। কিন্তু যিনি সংসারে নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া জ্ঞানালোকে হৃদয়কে আলোকিত করিয়াছেন, তাঁহার ভক্তি ঈশ্বরের প্রতি অচল অটল ভাবে চিরকাল বিরাজমান থাকে।

বিনোদ। কৃষ্ণ প্রথমে কর্ত্তব্যপালন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। এক্ষণে ঈশ্বর চিন্তা করিতে বলিতেছেন। মধ্যে একবার শান্তির কথাও হইয়া গিয়াছে। এই সকল মতের সামঞ্জস্য অথবা আনুপূর্ব্বিকতা কোথায়?

গোপী। যতদিন তোমার শরীর সবল রহিল, যতদিন তোমার ইন্দ্রিয় সকল সতেজ রহিল, ততদিন তুমি তোমার জাতিধর্ম্ম সমস্ত নিষ্কামচিত্তে সম্পাদন কর। এইরূপে কার্য্য করিতে করিতে তোমার হৃদয়ে জ্ঞান ও শান্তি উভয়ের যুগপৎ অভ্যুদয় হইবে। পরে যখন বৃদ্ধ বয়সে তোমার ইন্দ্রিয়গণ নিস্তেজ হইবে, যখন হৃদয়ের শোণিত ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে ধমনী মধ্যে চলিতে থাকিবে, তখন ঈশ্বর চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিবে।

বিনোদ। যখন শান্তি ও জ্ঞান উভয়ই লাভ করা হইয়াছে, তখন আর ঈশ্বর চিন্তার প্রয়োজন কি?

গোপী। শান্তি ও জ্ঞান দ্বারা হৃদয়ে

সুখের পত্তনভূমি প্রস্তুত করা হইয়াছে মাত্র। ঈশ্বর-চিন্তাদ্বারা ঐ পত্তন-ভূমির উপর সুরম্য হর্ম্ম্য উত্তোলিত করা হইবে। যে ব্যক্তি শান্তির সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া জ্ঞানচক্ষে এ সংসারের প্রত্যেক কার্য্যে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করেন তাঁহার হৃদয়ে কি সুখ একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। জলে, স্থলে, পর্ব্বতে, ধূলিকণায়, আকাশে, সমুদ্রে, বৃক্ষে, কীটপতঙ্গ, পশু পক্ষী, মনুষ্য এবং মনুষ্যহৃদয়ে সেই বিশ্বনিয়ন্তার কৌশল যিনি বুঝিতে পারেন, তাঁহার হৃদয়ে কি অপরিমিত সুখ ভাবিয়া দেখ দেখি। সর্ব্বত্র কি সুন্দর নিয়মমালা বিরাজিত রহিয়াছে। কি অভাবনীয় শক্তি চতুর্দ্দিকে কার্য্য করিতেছে। ভগবদ্গীতায় ঈশ্বরকে একস্থানস্থিত মনুষ্যোচিত গুণমালান্বিত বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই। কেবল এই মাত্র বলা হইয়াছে যে ঈশ্বর মণিমালার সূত্রের ন্যায় সর্ব্বত্র অদৃশ্যভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন। যে ব্যক্তি সাংসারিক কার্য্যমালার নিয়ম ও শক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও ভক্তিরসাপ্লুত হইয়াছে সেই ব্যক্তির জন্ম সার্থক। অর্থের আশায়, সম্পদের আশায়, জ্ঞানের আশায় যে ঈশ্বরকে স্মরণ করে সে অসার। কিন্তু যে ব্যক্তি জ্ঞানচক্ষে ঈশ্বরের কার্য্যমালায় অদ্ভুত নিয়ম ও অচিন্ত শক্তির বিকাশ দেখিতে পান এবং ঐ বিকাশ দেখিয়া হৃদয়কে ভক্তিরসে সিক্ত করেন তাঁহার জীবন ধন্য।

বিনোদ। সাংসারিক কার্য্যমালায় নিয়ম ও শক্তি দেখাযায় বটে। ঐ নিয়ম ও শক্তির বিকাশ দেখিয়া মনে বিস্ময়ের ভাব উপস্থিত হয়, সত্য। কিন্তু উহা দেখিয়া ভক্তির উদয় হইবে কেন ?

গোপী। তুমি দেখিবে যে ঐ নিয়ম মঙ্গলময়, দেখিবে ঐ শক্তি হিতদায়িনী। তুমি দেখিবে ঐ নিয়ম, ঐ শক্তি অহরহঃ অনিষ্টের বিনাশ ও ইষ্টের সৌষ্ঠবতা সম্পাদন করিতেছে। এই বিষয়ে তুমি 'Suley' প্রণীত "Natural Religion" পাঠ করিও। পরে দেখিবে ভক্তির উদয় হয় কি না।

বিনোদ। তোমার নিকট আমার আর একটি প্রশ্ন আছে। যে তত্ত্বজিজ্ঞাসু সে সাংসারিক কার্য্যে নিয়ম ও শক্তির বিকাশ দেখিতে পাইবে না ; কিন্তু যে কর্ম্মী সে উভয়ের বিকাশ দেখিতে পাইবে, এ কিরূপ কথা ?

গোপী। যে তত্ত্বজিজ্ঞাসু তাহার হৃদয় হইতে সন্দেহের মূল উৎপাটিত হয় না। তাহার হৃদয়ে সন্দেহ রক্তবীজের ন্যায় পুনঃ পুনঃ বিনষ্ট হইয়া পুনঃ পুনঃ নবীন মূর্ত্তি ধারণ করে। কিন্তু যে কর্ম্ম করে তাহার সন্দেহ কার্য্যমালার ঘাত-প্রতিঘাতে সমূলে উৎপাটিত হয়। তদ্ভিন্ন কর্ম্ম করিতে করিতে প্রতিদিন সংসারের কার্য্য যেরূপ সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়, জিজ্ঞাসু ব্যক্তি সেইরূপ দেখিতে পায় না।

বিনোদ। বুঝিয়াছি।

অষ্টমদিন।

গোপী। কৃষ্ণ বলিলেন—"হে অর্জ্জুন!

যে আমাকে নিয়ত ধ্যান করে সে 'ব্রহ্ম' 'অধ্যাত্ম' 'কর্ম্ম' সকলই জানিতে পারে। যে আমাকে 'সাধিভূত', 'সাধিদৈব' ও 'সাধিযজ্ঞ' বলিয়া জানে, সে 'মৃত্যুকালেও' আমাকে ভুলিতে পারে না।" ইহাতে অর্জুন উত্তর করিলেন 'হে বাসুদেব! ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, সাধিভূত, সাধিদৈব, সাধিযজ্ঞ এই সকল কথার অর্থ কি?" তাহাতে

কৃষ্ণ বলিলেন—

(১) যিনি জগতের মূল-কারণ তিনিই ব্রহ্ম।

(২) জীবের সেই স্বভাব যাহা আত্মাকেও অতিক্রম করিয়া বাস করে, যে স্বভাবের কর্ত্তৃত্বে আত্মা পর্য্যন্ত নিয়মিত ও পরিচালিত হয়, সেই স্বভাবের নাম 'অধ্যাত্ম।'

(৩) যাহা দ্বারা নিত্য নিত্য প্রাণিগণের উৎপত্তি হইতেছে তাহাই কর্ম্ম।

(৪) যে মূর্ত্তিতে বা যেরূপে ঈশ্বর সর্ব্ব প্রাণীকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, যে শক্তি প্রভাবে প্রাণিগণ প্রাণবান্ হইয়া রহিয়াছে, সেই মূর্ত্তি ও সেই শক্তির নাম সাধিভূত।

(৫) যে মূর্ত্তিতে ঈশ্বর সর্ব্বদেবতার প্রধান দেবতা হইয়া বিরাজ করিতেছেন সেই মূর্ত্তির নাম সাধিদৈব।

(৬) যে মূর্ত্তিতে ঈশ্বর মনুষ্যের কার্য্যমালার মূলে কারণভাবে অবস্থিতি করিতেছেন সেই মূর্ত্তির নাম সাধিযজ্ঞ।

বিনোদ। কর্ম্মের লক্ষণটি ভাল করিয়া বুঝিলাম না।

গোপী। কৃষ্ণ পূর্ব্বে এক স্থলে বলিয়াছিলেন কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘহইতে জল, জল হইতে প্রাণীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। এ স্থলে কৃষ্ণ বলিতেছেন প্রাণিগণের উৎপত্তির কারণীভূত যে সমস্ত অনুষ্ঠান তাহাই কর্ম্ম। যাহা দ্বারা প্রাণীর উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় না, তাহাকে নিষ্কর্ম্ম বা বিকর্ম্ম বলিতে পার। যাহা দ্বারা প্রাণীর উৎপত্তির ব্যাঘাত বা বিনাশ হয়, তাহাকে কুকর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

বিনোদ। তোমার নিকট আর একটি জিজ্ঞাস্য আছে। কৃষ্ণ একবার বলিলেন যে তিনি 'সাধিভূত' অর্থাৎ তিনি সকল প্রাণীর প্রাণ-স্বরূপ। কৃষ্ণ আবার বলিলেন যে তিনি 'সাধিযজ্ঞ' অর্থাৎ তিনি মনুষ্যের কার্য্যমালার মূলীভূত কারণ। কিন্তু মনুষ্য যখন প্রাণীর অন্তর্ভূত তখন মনুষ্যের কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন কি? যিনি "সাধিভূত" তিনিই 'সাধিযজ্ঞ।' ইহা বিশেষ করিয়া বলার লাভ কি?

(ক্রমশঃ।)

অগ্নিকুল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মানবে লোক বিশেষের প্রতি আপন জীবন-সুখ নির্ভর করে, তাহার অভাবে সংসার শোক-অন্ধ, জীবনে আঁধার দেখিতে থাকে। অতুল যে দিন ভীমদণ্ডের মুখে শুনিতে পাইল দৈত্য সেনাপতি গায়ত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে তাহার সংসারের আশা ভরসা বৃথা হইল। বল, উৎসাহ, স্ফূর্ত্তি, সকলই তাহা হইতে পৃথক্ হইতে লাগিল। কোমলপ্রাণ গায়ত্রী, স্নেহের প্রতিমা, দয়ার আধার, সৌন্দর্য্যের চূড়া, লাবণ্যের উৎস, সারল্যের প্রতিকৃতি, সুকণ্ঠের বীণা, মাধুরিগতির মরাল, প্রীতির রত্নাসন,—তাহার হইয়াও হইল না, দস্যুতে অপহরণ করিল। ইহা তাহার একান্ত অসহ্য হইল। একএক বার মনে হইতে লাগিল দস্যু দল নির্ম্মূল করিব, আমার গায়ত্রীধন কাড়িয়া আনিব, না হয় দৈত্য হস্তে প্রাণ দিব। আবার ভয়ানক নৈরাশ্য তাহাকে ব্যাকুল করিয়া বলিতে লাগিল, গায়ত্রী বালিকা, সরলা, কোমলমতী, স্নেহ-প্রিয়,সুখ-প্রিয়,সৌন্দর্য্য-প্রিয়,ঐশ্বর্য্য-প্রিয়,সে তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছে। নূতন ভালবাসায় গলিয়া গিয়াছে। তাহার বিবাহ হইয়াছে, সুখে খাইতেছে, পরিতেছে, কুটির-বাসিনী অট্টালিকাবিহারিণী হইয়াছে, তাহার কি কৃষ্ণা,জীন পরিহিত নবীন সন্ন্যাসী অতুলের কথা মনে আছে?—অতুল মনে করিতে লাগিল, জীবন-ভার কাহার জন্য বহন করিব, কাহাকে রক্ষার জন্য আর শর-সরাসন ধারণ করিব, কাহাকে আর আহ্লাদ করিব, কাহাকে আর ভাল বাসিব, কাহাকে আর ভৎর্সনা করিব, আমার শক্তি দেখিয়া আর কে খুষী হইবে, মৃগয়া দেখিয়া আর কে বিস্মিত হইবে, কে আর ছায়ার মত আমার পাছে পাছে বন জঙ্গলে ফিরিবে—কে আর আমায় পরিশ্রান্ত দেখিলে বনফল কুরাইয়া ক্ষুদ্র কোমল করে মুখে তুলিয়া দিবে, কে অলক্ষে আসিয়া আমার স্কন্ধে উঠিবে, কে কর পল্লবে আমার চক্ষু ধরিয়া উচ্চ হাসি হাসিবে, কে আমার গলে বন ফুলের মালা গাঁথিয়া পরাইয়া দিবে, কে আমার মাতার সপুষ্প কোড়ক পল্লবে, মুকুট বানাইয়া পরাইয়া দিবে? কে আর শুক পাখীর মত আমার কাছে বসিয়া পড়িবে?

আবার ভাবিতে লাগিল—আমি কি বলিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইব? কি বলিয়া গায়-

ত্রীর মাতাকে শান্তনা করিব—কি বলিয়া গুরুদেব বৃহস্পতির অশ্রুপূর্ণ লোচন দেখিব—তাঁহারা ত আশা করিয়া আছেন, গায়ত্রী আসিবে, অতুল তাহাকে আনিতেছে—আমি গেলে যে সে আশা নির্ম্মূল হইবে;—আমি কি বলিয়া যাইয়া দাঁড়াইব। এইরূপ ভাবিয়া ভাবিয়া অতুলের মতিচ্ছন্ন উপস্থিত হইল। অতুল স্থির করিল আর আশ্রমে যাইবে না। প্রবাদ আছে অর্ব্বুদাচলে নির্ঝরিণী-কূলে আশা দেবী সতত বিরাজ-মানা; গভীর রজনীতে তথায় যাইয়া আত্মবলিদানে দুঃখময় সংসার হইতে অবসৃত হইবে।

* * * * * * * * *

অর্ব্বুদের মূলদেশে একটি ক্ষীণ প্রস্রবণ নিরন্তর কুলু কুলু শব্দ করিয়া পড়িয়া বহিয়া যাইতেছে। দুই দিগে ক্ষুদ্র শৈলশৃঙ্গ, মধ্য স্থান কিঞ্চিৎ নিম্ন. সুতরাং উহা একটি ক্ষুদ্র নদীর আকার ধারণ করিয়াছে। নদীর পূর্ব্বভাগ পরিষ্কৃত, পশ্চিম ভাগ লতা গুল্ম ও বৃক্ষাদিতে সুশ্যামল। তন্মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পাষাণ-মন্দির। এই মন্দিরে সিংহবাহিনী আশাপূর্ণার মূর্ত্তি সংস্থাপিতা। কথিত আছে, গভীর রজনীতে এ মন্দিরের নিকট গেলে দেবগণের অদ্ভুত লীলা এবং সময় সময় আশাপূর্ণা দেবীকে দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে। নদীর পূর্ব্বতীরে শবদাহ হইয়া থাকে। সুতরাং শ্মশানে অযুতকোটী প্রেতাত্মা বিচরণ করে। —রজনীতে এই ভীষণ শ্মশান দিয়া আশাপূর্ণার মন্দিরে যাইতে কেহই. সাহস করে না। অতুল আজি সেই সাহস করিল। শ্মশানক্ষেত্রে নদীতীরে বসিয়া মন্দিরবাসিনী মহামায়ার নাম করিতে করিতে জীবলীলা সংবরণ করিতে তাহার বাসনা।

গভীর রজনী, গভীর নিঃশব্দ, মেঘাবরিত সুধাংশু প্রকৃতিতে ভস্ম মাখাইয়া দিয়াছেন। কেবল নদীর কুলু কুলু ধ্বনি, নির্ব্বাত নিস্পন্দ। গগণ তারকাশূন্য। মেঘ তাহা গ্রাস করিয়া জগতিতলে তাহার বীজ ক্ষেপণ করিয়াছে। বীজ গুলিন কোথায়ও বিরল,কোথায়ও বা অবিরল, কোথায়ও বা উচ্চে, কোথায়ও নীচে, বৃক্ষে,গুল্মে, পর্ব্বত শরীরে এবং নদীতীরে ও দূর্ব্বাদলে, বালুভূমে ও শূন্যে জ্বলিতেছে। শুদ্ধ জ্বলিতেছে না, একবার নিভি'তছে আবার জ্বলিতেছে, কখনও বা মুহুর্মুহুঃ মিটিমিটি করিতেছে,—শ্মশানে বায়ুবিহারী নর-প্রেতাত্মা বিচরণ করে, নক্ষত্রের. প্রেতাত্মা গগণ হইতে তথায় আসিয়া জুটিবে আশ্চর্য্য কি ? প্রকৃতি আজ নক্ষত্র পরিহার করিয়া খদ্যোত-ভূষণা। অতুল নিঃশঙ্কায় শ্মশান ক্ষেত্র দিয়া নদী তীরে উপস্থিত হইল। তাহার বোধ হইল অল্প দিন মধ্যে তাহার অস্থিনিচয় ধবলিত হইয়া কঙ্কাল সমষ্টির অঙ্গ পুষ্ট করিবে। এই জন্যই যেন ভীষণ শ্মশান ক্ষেত্রের কঙ্কালগণ তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া উঠিতেছে। সে হাসিতে আলেয়া জ্বলিতেছে। কি ভয়ঙ্কর হাস্য, এ যে অনলোদ্গারি হৃদয়-বিদারি হাস্য। অতুল তথাপি নির্ভয়। নির্ভয়ে যাইয়া নদীতীরে বসিল। বসিয়া মন্দিরের

দিগে চাহিয়া বলিতে লাগিল ‘ আশা-পূর্ণে নিষ্ঠুরে, আমি চলিলাম, আমার আশা পূর্ণ হইল না,—শেষ মিনতি এই আত্ম-হত্যা পাপভার হইতে যেন নিষ্কৃতি পাই। সকলই তোমার ইচ্ছা। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী তুমি। অদৃষ্ট লিপি তোমার হাতেই লিখিত হয়। পাপ পুণ্য পরিমাপক যন্ত্র তোমারই হস্তে। নরদেহে নৈরাশ করিলে, পরলোকে যেন অপ্রসন্না হইও না। এই সময় আকাশে মৃদুল গম্ভীর শব্দ হইল। বায়ু মেঘাবরণ সরাইয়া দিল। অমনি গগণে তারা ফুটিল, চাঁদ হাসিল, জগৎ মুহূর্ত্তে সুধা বিধৌত হইল। অতুল একবার অতৃপ্ত লোচনে চারিদিগ চাহিয়া দেখিল; তাহার পর তূণীর হইতে একটি সুতীক্ষ্ণ এবং বিস্তার-ফলক-বিশিষ্ট শর বাছিয়া ধনুকে যোজনা করিয়া বলিল ‘ গায়ত্রি, তোমার জন্য অতুল আজি প্রাণ দিতেছে। তথাপি তুমি সুখে থাকিও ’। এইরূপ কাতরোক্তি করিয়া অতুল কয়েক বিন্দু চক্ষুজল ফেলাইল। অবশেষে তীর দ্বারা আপন কণ্ঠ লক্ষ্য করিয়া চক্ষু মুদিত করিল। অমনি কে গম্ভীর শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল—‘কর কি’ ‘ কর কি? ’ সেই জলদ গম্ভীর শব্দ অভ্রভেদী অর্ব্বুদ ঘোরনাদে প্রতিধ্বনিত করিয়া আবার বলিল ‘কর কি’ ‘ কর কি?’ তাহার পর, বিপিনে, শ্মশানে, পাহাড়ে সেই শব্দ ঘুরিয়া শত মুখে উচ্চারিত হইল ‘ কর কি ? ’ অতুল বিষম বিস্মিত হইয়া ধনুর্বাণ ফেলাইয়া চারি দিগে চাহিল। কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তখন কে আবার সেই তীব্র কণ্ঠে সেই ক্রোধ-কম্পিত স্বরে শত ধিক্কার দিয়া গাহিতে লাগিল।

ছি-ছি সাবধান, সাবধান।
রাখ অস্ত্র, বধোনা পরাণ ॥
চাহ যদি কল্যাণ, চাহ যদি ঋষি-মান,
চাহ যদি মাতৃ প্রাণ, দিওনা দিওনা তবে
নিজ শির বলিদান ॥

সপ্তজন্ম আরাধনে, বসেছ মানবাসনে। লক্ষজন্ম যোগে তপে, উঠেছ ব্রাহ্মণে,এমন অমূল্য প্রাণে সামান্য নারীর জন্য অযশে ত্যজনা কভু হইয়া পাষাণ।

সাবধান—সাবধান।

অতুল সাহসী এবং ভয়শূন্য, তথাপি এই ঘটনায় সামান্য বিস্মিত হইল না। এ ভয়ঙ্কর স্থানে এ গভীর নিশিথ কালে কে তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেছে, কে তাহার গুঢ়তম কথাইবা জানিল, কি উপায়ে জানিল, এ কি ভৌতিক না দৈবী ব্যাপার, প্রভৃতি বিষয় মনে মনে চিন্তা করিয়া অবশেষে শর শরাসন ভূমিতলে ফেলিয়া চীৎকার করিয়া বলিল,‘কে তুমি এ গভীর নিশিথে আমার সহিত কথা কহিতেছ, যদি প্রেতাত্মা হও স্পষ্ট বল, দেবতা হইলে আমায় দেখা দাও, নচেৎ আমি কাহারও কথা শুনিব না।’ এই বলিয়া পুনরায় তীর ধনু হস্তে লইল। এমন সময় একটি ছায়া মূর্ত্তি ধীরে ধীরে তরাগ-তীরে আবির্ভূত হইল। ছায়া রূপ দেখিয়া অতুল শিহরিল, পরে মনে মনে ভাবিল তাহার বুঝি দৃষ্টি-ভ্রম হইয়াছে। এমন সময় ঐ ছায়ারূপ

ঈষৎ দোলিত হইয়া নিকটবর্ত্তী হইল। মেঘাপসারিত শরচ্চন্দ্রমার ন্যায় ঐ প্রভান্বিত ছায়া মূর্ত্তি সর্ব্বতোভাবে পরিস্ফুট হইল। অতুল বিস্ফারিত নয়ন-দ্বয়ে চাহিয়া দেখিল এক অসামান্যা যুবতী স্পন্দরহিত ভাবে চিত্রবৎ দণ্ডায়মানা। মনোহর বদন, ঘোর-তিমির-নিন্দিত নিবিড় কেশদাম জঙ্ঘা পর্য্যন্ত লম্বিত। সুদীর্ঘ ক্ষীণকোমল বপু। শুভ্র বসন পরিহিতা। বিশাল বঙ্কিম নয়ন, সুতীক্ষ্ণ নাসিকা। শরসংযোজিত কার্ম্মুক ভ্রূ। রূপ মনোহর এবং ভীতিব্যঞ্জক। ঐ বিশালনয়নে কুটীল দৃষ্টি-স্রোতঃ ছুটিতেছে। অমল পদ্মাভ ললাট রেখাকৃত। নাসাপুট স্ফীত। অধর মুক্তা-নিন্দিত দন্তে দংশিত। স্নেহে ক্রোধ মিশাইলে যে রাসায়নিক গুণ ধারণ করে, সেই ভাব, সেই রাগ, সেই কোমল কর্কশতা, সেই মধুর তিক্ত ভাব ললনার বদনে,বপুতে বিভাসিত। অতুলের হৃদয় ভক্তিরসে আর্দ্র হইল। করযোরে বলিল, তবে কি তুমি আশাদেবী? এখনও কি তবে আমার আশা-প্রদীপ নির্ব্বাণ হয় নাই? তুমি কে সত্য বল। মূর্ত্তির রোষভাব দূর হইল। বদন প্রসন্ন হইল, হাসিয়া বলিল, কণ্ঠবীণা বাজিয়া উঠিল—

যে হই সে হই আমি
মরো না তুমি।
প্রণয়েতে নাশিপ্রাণ
কলঙ্কে ডুবায়ে মান
জনম ভূমি।
শুনহে শুনহে যুবা
কায না সাধিয়ে কেবা
দেয় গো তোমার মত
হায়, অমূল জীবন
নিলাজ তুমি॥

অতুলের শীতল শোণিত আবার উষ্ণ হইল। মনে মনে ভাবিল সত্যই ত। সামান্য বালিকার জন্য প্রাণ দিব কেন? ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিব, বীরের ন্যায় প্রাণ দিব। সাহসে নির্ভর করিয়া, প্রকাশ্যে বলিল আমি মরিব না; কপালে যা থাক দৈত্যবধে নিমগ্ন হইব। কৃতকার্য্য হই বা না হই, বীরের ন্যায় দেহপাত করিব। অমনি কলকণ্ঠ আবার নিনাদিত হইল।

আশীর্ব্বাদ করি বীর—
বাসনা পুরিবে তব।
অক্ষয় যশ ঘোষিবে
অসাধ্য হবে সম্ভব।
দুর্দ্দিন হবে সুদিন—
প্রসন্ন হইবে দেব।
তোমা হ'তে অরিদল—
দলিত হইবে সব॥

অতুলের শরীর রোমাঞ্চিত এবং পুলকিত হইল। অতুল নতজানু হইয়া চক্ষু মুদিত করিয়া বলিতে লাগিল হে দেবি, হে প্রসন্নময়ি, হে বরদে, আমা হইতে তবে কি এই অসাধ্য ব্যাপার নিশ্চয়ই সুসাধ্য হইবে? আমাকে কি যথার্থই তুমি অভয় দান করিতেছ? না এ সকল মিথ্যা, আমি মস্তিষ্কহীন হইয়া বিকারগ্রস্ত হইয়াছি। দয়াময়ি, আমি কি জাগ্রত-না স্বপ্ন দেখিতেছি—যদি এস্বপ্ন হয় তবে যেন ইহ জন্মে আর জাগ্রত

হই না। হেনকালে তাহার ললাটে কোমল স্পর্শানুভূতি হইল। অতুল চাহিয়া দেখিতে পাইল—সেই অমলশুভ্রবসনা শীতল সৌদামিনী জিনি মনোহর রূপচ্ছটা। সেই খরতরলাবণ্যতরঙ্গায়িত মোহন শরীর। সেই মেঘহীন-সুদূর-গগণ-প্রভান্বিত-সহস্র-ভুজঙ্গ-শিশু-সমাকুল-আজঙ্ঘা-প্রলম্বিত-অতৈল-সংপৃক্ত-কুন্তল-জাল শোভিতা রমণী। সেই সুপক্ক বিম্বাধর। অর্দ্ধেন্দু ললাট, গভীর-নীল-নলিনী-নয়ন-পরিশোভিত-অমিয়-বদনা, নিকটে দাঁড়াইয়া। চাঁদের কিরণে রূপের ছটা বিকীরণ করিতেছে। বালার আধ ভয়, আধ লজ্জা, আধ সাহস, আধ স্নেহ, আধ উগ্র, আধ স্নিগ্ধ, আধ কঠিন, আধ কোমল, আধ মৃদু, আধ গাঢ়, ভাব ময় বদনে আধ হাসির উদয় হইয়াছে। হাসির সুধাময় রাগ চিবুকে নয়নে রঞ্জিত হইয়াছে।

অতুল স্তম্ভিত হইয়া তাহার দিগে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া রহিল। মনে মনে বলিল "আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি।" বাক্য বালকের আধ আধ ভাষার ন্যায় অস্ফুট উচ্চারিত হইল, আবির্ভূতা মূর্ত্তি হাসিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। অতুল বিলোড়িত মস্তিষ্ক হইয়া মস্তক জানুদ্বয়োপরি স্থাপন করিল। আবির্ভূতা সুন্দরী পুনঃ তাহার ক্ষরিতস্বেদ বিশাল ললাটে সুকুমার অঙ্গুলস্পর্শ করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—

এরূপে কিরূপে বল, সাধিবে আপন কাজ?
বিশাল বিরাটদেহে দিওনা ভয়েরি সাজ।
নিহার, আপন দশা, আপনি পাইবে লাজ।
মোহ বিস্ময় ছাড়িয়ে, সাহসে হৃদি বাঁধিয়ে
আপন অদৃষ্টাকাশে বিরাজ বিরাজ॥

এই কয়েকটি মৃদু কথায় যেন অতুলের ধমনীতে তাড়িতবেগ প্রদান করিল। অতুল মৃত্তিকা হইতে ধনু-শর হাতে লইয়া রমণীর চরণপ্রান্তে পড়িয়া বলিল,—আমার কি এত পূণ্য, এত সৌভাগ্য যে ভগবতী মহেশ্বরী স্বয়ং এদাসের নিকট আবির্ভূতা হইয়াছেন।—রমণী সঙ্কুচিতভাবে সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং অবিলম্বে বজ্রগম্ভীরনাদে বলিলেন—

প্রসন্ন হবে না দেবী শুন হে যুবা।
কেবল চরণে ধরি করিলে সেবা॥
আগে কর কার্য্য তাঁর,
তবে সে হবে বিচার—
নতুবা প্রসন্ন ওহে, কভু না হইবে শিবা॥

অতুল সলজ্জ দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইল চাঁদের আলো নিবিয়া গিয়াছে। দেবমূর্ত্তি ঘন ঘোরে মিশিয়া গিয়াছে। অদূরস্থিত ক্ষুদ্র পর্ব্বতশৃঙ্খলের অর্দ্ধপথে তাহার অমল ধবলিত বসন ও ছায়াতুল্য শরীর দেখা যাইতেছে। অতুল মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল এখন কি করিব?—রমণী যেন তাহা বুঝিতে পারিল। ক্ষণপরে তাঁহার কোমল স্বর আবার শ্রুতিগোচর হইল।

পরিহর চিন্তা ভয় ওহে বীরবর!
যদ্যপি বাসনা হয়—মম সঙ্গ ধর॥

অতুল নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল। ছায়ামূর্ত্তি তাহার অগ্রে অগ্রে চলিল। পথ দুর্গম, কোথাও অতি উচ্চ কোথাও বা

অতি নিম্ন পর্ব্বত শৃঙ্খল এবং ভগ্ন পাষাণ। রমণী অবলীলাক্রমে এই পথে যাইতে লাগিলেন—অচ্ছলের অতি কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্য যে, যেখানে তাহার পদ স্খলিত হইতে লাগিল, সেই খানেই রমণীর হস্ত তাহার অবলম্বন স্বরূপ হইতে লাগিল। কোমল বাহুর অমিত শক্তি তাহার বিশাল নিরবলম্ব দেহকে নাশোন্মুখ পতন হইতে পুনঃ পুনঃ রক্ষা করিতে লাগিল।

এইরূপ অনেকক্ষণ চলিয়া এক পর্ব্বত খোদিত গৃহদ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।—দ্বার অমনি মুক্ত হইল। অচ্ছল গৃহে প্রবেশ করিল, বিশাল আলোকরাশিতে তাহার চক্ষু ঝলসিয়া উঠিল।

পর্ব্বতখোদিত গৃহাভ্যন্তর দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান; বিংশতি হস্ত পরিমিত। দেয়ালে খোদিত পৌরাণিক চিত্র। চিত্রগুলিন সুন্দর এবং ভাবশুদ্ধ। সর্ব্বাপেক্ষা তিনটি চিত্র অতি চমৎকার। এবং এই তিনটিই অন্যান্য চিত্র হইতে বৃহত্তর। প্রথম চিত্র ভয়ঙ্করা ভৈরবী মূর্ত্তি। ত্রিনয়নে ত্রি-স্রোত-অগ্নি ছুটিতেছে। মস্তকের আবিল কেশগুচ্ছ পতাকার ন্যায় পশ্চাতে উড়িতেছে। উগ্রচণ্ডী দানবদলনে ধাবিতা। চরণ অস্থির, দেহ বদন বিষম ক্রোধপূর্ণ, বামহস্তে শোণিতাপ্লুত ছিন্ন মুণ্ড, দক্ষিণ হস্তে প্রলম্বিত অসি। অগ্রে অগ্রে অসুরগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে।

দ্বিতীয় আলেখ্য—ছিন্ন-শির রাবণ রাজা রামচরণে পতিত। প্রগাঢ় শান্তমূর্ত্তি, মোহন বদন, মহাবীর রামচন্দ্র দাঁড়াইয়া আছেন, ভ্রাতৃগত জীবন কুমার লক্ষ্মণ স্বয়ং তাঁহাকে বাতাস করিতেছেন। স্বর্গ হইতে অমরবৃন্দ নির্ভীক অন্তঃকরণে তাঁহার মস্তকে পুষ্পপল্লব বর্ষণ করিতেছে।

তৃতীয় আলেখ্য—রাবণকুমার বীরচূড়ামণি মেঘনাদ যোগাসনে চক্ষু মুদিয়া শক্তির উপাসনা করিতেছেন। শক্তি সহাস্যবদনে ও স্নেহপূর্ণ নয়নে সেবকের ধ্যাননিবিষ্ট বিপুল দেহ চাহিয়া দেখিতেছেন। শক্তির প্রসন্ন বদন দেখিয়া চারিদিগে ইন্দ্র, দিক্‌পাল প্রভৃতি সংখ্যাতীত দেবগণ শঙ্কিতমনে দাঁড়াইয়া আছেন।

গৃহমধ্যে খোদিত প্রস্তরবেদী। বেদীর উপর এক ভীমকায় সিংহ পড়িয়া একটা শবলেহন করিতেছে, দুর্গতিনাশিনী মহামায়ার দিব্য মূর্ত্তি তদুপরি সংস্থিত। দেবী এক হস্তে অভয় প্রকাশ করিতেছেন। অন্য হস্তে অভয় বিধায়ক ভীম কুঠার। সম্মুখে দীপাধারে দুইটি প্রকাণ্ড বর্ত্তিকা জলিতেছে। দগ্ধ ধূপ ও হোমের দগ্ধ হবির পবিত্র গন্ধ এখনও গৃহপূর্ণ রাখিয়াছে। চন্দন-চর্চ্চিত পল্লব-শোভিত মৃণ্ময় ঘট বেদীর অর্চ্চনীয় শোভা বিকাশ করিতেছে।

সসিংহ বিচিত্র মূর্ত্তি শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত। রাফেল বা আন্‌জেলো ইহার নির্ম্মাতা হইলেও গৌরব করিতে পারিতেন। কোন্ কালে আর্য্যশিল্পী ইহা গঠন করিয়াছিলেন তাহার নিশ্চয় নাই, এবং কে ইহার স্থাপক বা নির্ম্মাতা তাহারও নাম নাই। জলের স্রোতের মত কত বর্ষ কত যুগ কত

কাল ইহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে কে বলিতে পারে?—তথাপি যশোলিপ্সু শিল্পকারের অমিত যশোরাশি এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তির পাষাণ দেহ অস্মৃতিকাল পূর্ব্ব হইতে উদ্গীরণ করিয়া আসিতেছে।

শ্মশান, অন্ধকার, পর্ব্বত শৃঙ্খল, দুর্গম পথ, ছায়া-মূর্ত্তির আবির্ভাব, তৎপর দেব-মন্দির-প্রজ্জ্বলিত আলোক, বিচিত্র আলেখ্য ও বিচিত্র মূর্ত্তি,এদিকে আত্মহত্যা, ওদিকে দৈববলে আত্মরক্ষা, নিরুৎসাহে উৎসাহ। দুর্ব্বলতায় অভয়, ও দৈববলে দোলিত বিশ্বাসে দৃঢ়তা এবং রণোন্মাদ ভাব। যুগপৎ এই দৃশ্য এই ঘটনা এবং মানসিক পরিবর্ত্তনে অহুল একবারে আপনা ভুলিল। বিস্ময় ও প্রগাঢ় ভক্তি-রসে একবারে আদ্র হইল। তাহার আবার ভ্রম হইতে লাগিল। আবার স্বপ্ন বলিয়া বিশ্বাস হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল আমায় কে আনিল, কোথায় আসিলাম, কেন আসিলাম। সে শুভ্র-বসনা রমণী কোথায়। তিনি কি দেবতা, নাকি ও পৈশাচিক ব্যাপার। না না এ পবিত্র স্থানে—এ দেবগৃহে—এ যজ্ঞ-স্থলে কি প্রেত পিশাচ বাস করিতে পারে? এই সময়ে তাহার দৃষ্টি আবার আশাপূর্ণার বিবিচিত্র মূর্ত্তির উপর পড়িল। আবার প্রজ্জ্বলিত দীপশিখাদ্বয় তাহার চক্ষে পড়িল। আবার যজ্ঞীয় হবি গন্ধ তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল, তাহার বোধ হইতে লাগিল যেন আশাপূর্ণা তাহাকে দেখিয়া হাসিতেছেন। সিংহ সব লেহন ত্যাগ করিয়া তাহার দিগে চাহিয়াছে, আলেখ্য চিত্রগুলিনও তাহাকে দেখিতেছে। অহুল তখন সাষ্টাঙ্গে ভূমিতে পড়িয়া অশ্রুলোচনে গদ্ গদ্ স্বরে বলিতে লাগিল 'মা মহামায়া, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। বরদে, এই বর দাও, দৈত্যকুল নির্ম্মূল হউক। সনাতন ধর্ম্ম সংরক্ষিত হউক। আমি দৈত্য রণে ভাসিলাম। ভবানী, এ মহাসাগরে তুমিই একমাত্র ভরসা, এক মাত্র আশ্রয়-ভেলক। মহামায়ে, যদি কূল দাও, যদি আর্য্যধর্ম্ম তোমার আশীর্ব্বাদে রক্ষা করিতে পারি, তবে আর এক দিন এদাস তোমায় পূজিতে আসিবে, আমার জীবনে আর প্রয়োজন নাই। একমাত্র প্রয়োজন, সে প্রয়োজন সাধন করিতে যাইতেছি। ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণ দিয়া স্বর্গে যাইব। মা তুমিই ত আমায় মাতোয়ারা করিয়াছ ; এ উন্মাদ একাই যুদ্ধে যাইতেছে, যেপর্য্যন্ত জীবন থাকিবে, পৃষ্ঠদান করিব না। এই সময় আবার সুললিত কলকণ্ঠ নিনাদিত হইল।

ধন্য হে অহুল তুমি—
আর্য্যকুল চূড়ামণি।
নিভয়ে যেওগো রণে
পাবে শিবারে সঙ্গিনী॥

ললিত সুতানে অমনি বৃক্ষের পাখীগণ জাগরিত হইল। শতশত পাখী উহাতে গলা মিশাইয়া কলধ্বনি করিয়া উঠিল। অহুল 'আহা কি শুনিলাম' বলিয়া মস্তক উত্তোলন করিল। গৃহ অন্ধকার, কে প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়াছে। আবার মস্তক পাষাণে স্থাপন করিল। পাষাণ কে সুকো-

মল করিল? এত পাষাণ নহে, ষোড়শীর কোমল জঙ্ঘা। অতুল তাড়াতাড়ি উঠিবার চেষ্টা করিতেই আবার একখানি কমনীয় কোমল স্নিগ্ধহস্ত তাহার ললাটদেশ স্পর্শ করিল। বৈদ্যুতিক বলে তখনই তাহার চেতনা শূন্য হইল। নবনীতে বজ্র শলিত করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যে তেজ সেই অগ্নি সেই বিদ্যুত। একে অপরকে জন্মায়। বিস্ময়, ভক্তি, মোহ প্রভৃতির তাড়নায় অতুলের দৈহিক পরমাণু ভীম বেগে উদ্বেলিত হইতেছিল। রমণীর কোমল কর-সংস্পর্শে সেই উদ্বেলীকৃত তাপ প্রশমিত হইয়া রসায়ন গুণে বিদ্যুতে পরিণত হইল। সেই বিদ্যুত—যুবার শিরাতে স্নায়ুতে চমকিয়া মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া তুলিল। যুবা হতচেতন বা অর্দ্ধ নিদ্রিত হইয়া পড়িয়া রহিল। চেতনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হইলে মস্তিষ্কের ক্রিয়া সম্পূর্ণ বিরাম সম্ভব নহে। এই জন্যই চেতনা কালীন মানসিক বা চিন্তালিখিত চিত্র গুলিন বিশৃঙ্খল রূপে জীবের অর্দ্ধ বিলুপ্ত জ্ঞান-পটে আধ আধ উদয় হইয়া থাকে।

অতুল স্বপ্ন দেখিত লাগিল। গায়ত্রী তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া বলিতেছে "অতুল, তুমি মরিওনা আমি আসিয়াছি।" অতুল তাহাকে ধরিতে চাহিল—বালিকা হাসিয়া সরিয়া গেল। যেস্থান দিয়া চলিয়া গেল তথায় একটী ক্ষুদ্র জলস্রোত কুলনাদে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অতুল জলে ঝাঁপ দিল, জল স্ফটিক হইল। স্ফটিকে চিত্রের ছায়া পড়িল। ক্রমে তাহা পরিস্ফুট ও বড় হইল। শুদ্ধ বড় নহে, জীবন বিশিষ্ট হইল, অতুল ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিল। দৌড়িতে পা[illegible] না—পা ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। গায়ত্রী হাত ধরিয়া উঠাইতে লাগিল। আর একটি যুবা আসিয়া উপস্থিত হইল। গায়ত্রী তাহার সঙ্গে মিলিল, অতুল ডাকিল, সে শুনিলনা। নূতন যুবকের হাত ধরিয়া নাচিতে নাচিতে যাইতে লাগিল। অতুল ক্রোধ করিয়া যুবার গায় তীর মারিল। তীর ঊর্দ্ধে যাইয়া চন্দ্রে বিদ্ধ হইল—অর্দ্ধচন্দ্র খসিয়া পড়িল। তারকার দল হাসিয়া উঠিল। চাঁদ গলিয়া গেল। সাগর হইল, তরঙ্গ উঠিল। সে চাঁদের তরঙ্গে গায়ত্রী ভাসিল—অতুল সাঁতার দিয়া তাহাকে ধরিল। গায়ত্রী গলিয়া চাঁদের সাগরে মিশিল। তাহাতে হীরার পাতা ভাসিল, সোণার কমল ফুটিল। কমলোপরি—এক দিব্য সুকুমারী বসিয়া করি শিশু লইয়া খেলা করিতে লাগিল। পাতায় তিলোত্তমা উর্ব্বশী নৃত্য আরম্ভ করিল। অতুল সেই পত্র ধরিয়া নৃত্য দেখিতে লাগিল। পাতা ও কমল বৃন্ত বৃদ্ধি পাইয়া গগণের চাঁদে মিশাইল—অতুল তাই ধরিয়া উচ্চে উড়িল। চাঁদের রাজ্য সুন্দর। চাঁদের বাড়ী, চাঁদের ঘর, চাঁদের মাঠ, চাঁদের ঘাট, চাঁদের লোক, চাঁদের খাট, চাঁদের বিছানা, চাঁদের বালিস—চাঁদের বাগান, চাঁদের ফুল,

সেই খানে চাঁদের গায়ত্রী দাড়াইয়া চাঁদের হাসি হাসিতেছে। তার দুই দিকে চাঁদের দীপ জ্বলিল। জ্যোতির অসহ্য আলোকে অতুল চক্ষু মুদ্রিত করিল, গায়ত্রী তাহাকে মাথা ধরিয়া শয়ন করাইলেন। ভবানীর সিংহ আসিয়া তাহার গা চাটিতে লাগিল। ভবানী সিংহপৃষ্ঠে বসিয়া গাহিতে লাগিলেন—

"উঠ মোহমুগ্ধ হে বীরবর
হের, জগতে ছুটিছে ভানুকর।"

হঠাৎ অতুলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তথাপি ঐ স্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। কে সুমধুর ভৈরব ঝঙ্কারে গাহিতেছে—

১। উঠ মোহমুগ্ধ হে বীববর,
হের, জগতে ছুটিছে ভানুকর॥
অর্ব্বুদশিখরে শুন পাবক হুঙ্কার।
সহস্র আহুতি ভক্ষি গরজি গভীর॥
সহস্র জিহ্বা টঙ্কারি ডাকে যত বীর।
আসিয়া তোমরা সবে ধরম উদ্ধার॥
২। অসুর সাগর-স্রোত, বিদরি ধরম ব্রত
ভাসি যায় নাশিয়া সংসার।
বল মহিধর বিক্রমে স্থাপয়ি ফিরাও
সে স্রোত অতলে ঘোরে—
অথবা উদ্যমে হ'য়ে জহ্নুমুনি—
মহা গণ্ডুষেতে জ্বলন্ত পিপাসা নিবার।
উঠ,যাও,ধাও—এখনি মিনতি আমার।

প্রতিধ্বনি নিঃশব্দ হইবার পূর্ব্বেই অতুল দাঁড়াইয়া চারিদিকে অবলোকন করিল। কোথাও কেহ নাই!! দেখিতে দেখিতে পশ্চিম দিকের একটি ক্ষুদ্রদ্বার খুলিয়া গেল। ঐ দ্বার দিয়া একস্তর পাষাণ সোপান দৃষ্ট হইল। সোপানোপরি সূর্য্যকিরণ আসিয়া পড়িয়াছে। তদুপরি এক সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছে। অতুলের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িলে সন্ন্যাসী তাহাকে অঙ্গুলী সঙ্কেতে ডাকিল। অতুল বিস্মিত হইয়া তাহার নিকট গমন করিলেন।

সন্ন্যাসীর বদন অতি কমনীয়। এমুখ নারীর হইলে তিনি অসামান্যা সুবদনা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। দেহ ক্ষীণ ও কোমল হইলেও তাহা সাহস এবং স্ফূর্ত্তি পূর্ণ। রুক্ষ ও ভস্মিত কেশকলাপ ললাটোপরি বিন্যস্ত। হস্ত, পদ, বদন, ভস্মমাখা, দেহ গৈরিক বসনে আবৃত। বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর হইতে অধিক বলিয়া কদাপি অনুমিত হইতে পারে না। অতুল প্রথম সময় এমন স্থানে এই নবীন এবং রূপবান সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আরো বিস্মিত হইল। চতুর সন্ন্যাসী তাহার বদন পাঠ করিয়া হাসিয়া, ঊর্দ্ধে দেখাইল। অতুল চাহিয়া দেখিল অনন্ত সোপান। সন্ন্যাসী তাঁহাকে উঠিতে সঙ্কেত করিয়া আপনি উঠিতে লাগিল। অতুল তীব্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—এ পথে কোথায় যাইব, সন্ন্যাসী কথা বলিল না, কেবল ভ্রুকুটি করিয়া তাহার প্রতি এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিল এবং হস্ত সঞ্চালন করিল যে অতুল আর বাক্য ব্যয় না করিয়া ভীত ও মুগ্ধ হইয়া তাহার অনুগমন করিতে লাগিল। ইহাকেই বশীকরণ কহে *।

এইরূপে কিয়দ্দূর চলিলে উভয় পার্শ্বের পর্ব্বত প্রাচীর ক্রমে উচ্চ হইয়া পরিশেষে

* Mesmerism.

তাহাদিগকে অন্ধকারময় বিপুল বিবর মধ্যে নিক্ষেপ করিল। অতুল বুঝিল এ পর্ব্বত হৃদয়-খোদিত গুপ্তপথ। কিন্তু সোপানশ্রেণী প্রশস্ত, অক্ষুণ্ণ ও সম,—সুতরাং অন্ধকারেও তাহাদের পদ স্খলিত হইল না। আর কিছুদূর গেলে হোমাগ্নির হুহুঙ্কার শব্দ ও মুনিগণের মন্ত্রপাঠ-জনিত অস্ফুট শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল।

আর একটু উঠিতেই দগ্ধঘৃত ও দগ্ধসমিত চন্দন বেল-পত্র তাহার নাসিকায় আসিতে লাগিল, এবং মুনিগণ যে একতানে, সমস্বরে গলা মিলাইয়া গাহিতেছেন—

"অগ্নির্বৃত্রানি জঙ্ঘনদ্ দ্রবিণস্যুর্বিপন্যয়া স সিদ্ধঃ শুক্র আহুতঃ"॥

তাহা স্পষ্টরূপে শ্রুতিগোচর হইল। এবং ঊর্দ্ধে অনলশিখা দৃষ্ট হইল। অতুল দ্রুত-বেগে সেই দিকে চলিল—অমনি কোমল-হস্তে কে তাহাকে ধরিল। অতুল চাহিয়া দেখিতে পাইল আবার সেই শুভ্রবসনা সুকুমারী ললনা। সে বিভূতি-ভূষিত সন্ন্যাসী কোথায় গেল!!!—অতুল জাগ্রত কি স্বপ্ন দেখিতেছে—আবার তাহার সন্দেহ হইল। রমণী এক জোড়া পট্টবস্ত্র বাহির করিয়া বলিল—এই বস্ত্র পরিধান করিয়া নির্ভয়ে যাইয়া অনল কুণ্ডে উঠ।

অতুল ব্যগ্র হইয়া বলিল আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আপনি কে বলুন?

রমণী বলিল, নির্ব্বোধ প্রশ্ন করিও না। যাহা করিতে বলি কর।

অতুল বলিল—অগ্নিকুণ্ডে কিরূপে যাইব? রমণী ক্রোধকম্পিত তীব্রবাক্যে বলিল—যে ব্রাহ্মণকুমার, যে সতীর পুত্র, যে দৈত্যদমনক্ষম ও যে আশাপূর্ণার আদেশে জীবনদানে ও পালনে পরাঙ্মুখ নহে, তাহার শরীর হোমাগ্নির সহস্রজিহ্বায়ও দগ্ধ করিতে পারিবে না।—ঐ শুন—আবার শুন।*

* এই উপন্যাস শীঘ্রই যন্ত্রস্থ হইবে; সুতরাং ইহার অবশিষ্টাংশ আর বান্ধবে প্রকাশিত হইবে না। পাঠেচ্ছুগণ ৯ নং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট কলিকাতা ঠিকানায় শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র গুপ্তের নিকটে তত্ত্ব লইবেন। বাঃ সঃ

আমি কি নাস্তিক ?

(পেচকানুগতস্য পেচক শিষ্যস্য শ্রীপেচকানন্দ দেবশর্ম্মণঃ বিজ্ঞপ্তিরিয়ং)

পাঠককে পূর্ব্বেই অবগত করাইতেছি যে, আমি এক্ষণে যথাবিহিতরূপে পেচক-ধর্ম্মে* দীক্ষিত হইয়াছি। যখন পেচকবরের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন আমি পেচকরাজকে ঘৃণা করিতাম। পরে পেচকবরের বুদ্ধিমত্তা ও বাক্‌চাতুরীতে বিমুগ্ধ হইয়া আমি এক্ষণে পেচকধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি।

বলা বাহুল্য যে, পেচকধর্ম্মের প্রভাবে আমার হৃদয়ে জ্ঞান ও নীতি নিত্য নিত্য নব নব ভাবে বিকশিত হইতেছে। আমার ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি দর্শনে পেচকবর পরম পুলকিত হইয়া আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন—'বৎস! তুমি একাধারে নানাবিধ গুণ সঞ্চয় করিতেছ। বালকের চাঞ্চল্য ও অনিষ্টবাসনা, যুবার আত্মগরিমা ও স্বার্থপরতা, এবং বৃদ্ধের চাতুরী ও অভিজ্ঞতা, এবম্বিধ নানা গুণে তুমি নিজ হৃদয়কন্দরকে অলঙ্কৃত করিয়াছ। অথচ তুমি না বালক, না যুবা, না বৃদ্ধ। কারণ তোমাতে বালকের সরলতা, যুবার স্ফূর্ত্তি ও বৃদ্ধোচিত সহিষ্ণুতা কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলতঃ ভাবিয়া দেখিলে তুমি অদ্ভুত অথবা 'দিগন্ত' অথবা 'আদ্যন্ত' অথবা 'আদ্যোপান্ত' সম্মিলনের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আমি পেচকবরের প্রশংসাপত্র সযত্নে হৃদয়ে খোদিত করিয়া রাখিয়াছি।

আমি একদা রবিবারে সন্ধ্যাকালে অস্তাচলচূড়াবলম্বী ভগবান্ মরীচিমালীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আছি, এমন সময়ে আমার পশ্চাদ্দিকস্থ মস্‌জিদ হইতে 'আল্লা হু আক্‌বর্‌র্' * ইত্যাকার শব্দ সকরুণ স্বরে উচ্চারিত হইতে লাগিল। আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম মুসলমানগণ শুভ্রবস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া দলে দলে নিজ ধর্ম্মমন্দিরে উপাসনার্থ আগমন করিতেছে। আমি অনন্য মনে মুসলমানদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছি, এমত সময়ে আমার বামদিকে শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ করতাল প্রভৃতি বাজিয়া উঠিল। আমি বাম দিকে নয়ন প্রত্যাখ্যান করিয়া দেখিলাম, অবগুণ্ঠনবতী হিন্দু রমণীগণ স্ব স্ব শিশু সন্তান ক্রোড়ে লইয়া দেবমন্দিরে গমন করিতেছে। আমি এক মনে হিন্দু রমণীগণকে অবলোকন করিতেছি, এমন সময়ে আমার দক্ষিণভাগস্থ গির্জাঘর হইতে আহ্বান-সূচক ঢং ঢং শব্দ

* যাহাকে ইংরাজীতে Pessimism বলে।

* এই শব্দ শ্রবণে মুসলমানেরা আপন আপন ধর্ম্মগৃহে আগমন করে।

সমুত্থিত হইতে লাগিল। আমি দক্ষিণ-দিকে নয়ন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলাম সাক্ষাৎ দেবাবতার স্বরূপ শ্বেতাঙ্গগণ পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে চিত্র বিচিত্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া য়ীশুখ্রীষ্টের ভজনালয়ে গমন করিতেছেন। আমি এক মনে সাহেব সাহেবী দেখিতেছি, এমন সময়ে আমার সম্মুখে ব্রাহ্মমন্দির হইতে 'ওঁ সত্যংজ্ঞান মনন্তং' প্রভৃতি ঈশ্বরস্তোত্র গম্ভীরস্বরে নির্ঘোষিত হইয়া উঠিল।

চারিদিকে এই সমস্ত দেখিয়া আমি কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলাম। ভাবিলাম যেন আমার অগ্নি-পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে,যেন আমার চারিদিকে চারি প্রবল অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মনে একটু আশঙ্কা হইল। আমি ভীতচিত্তে, ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে, অস্ফুটস্বরে আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলাম 'আমি কি নাস্তিক?'

কিয়ৎক্ষণ পরে আমি আপনাকে আপনি বলিতে লাগিলাম 'আমি নাস্তিক তাহাতে সন্দেহ কি? আমি দেবদেবীকে প্রণাম করি না, ব্রাহ্মসমাজে যাই না, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য, বুদ্ধ ইহাঁদের কাহাকেও অবতার বলিয়া স্বীকার করি না, আমি নাস্তিক বই আর কি? আমি পরকাল মানি না, স্বর্গ নরক মানি না, ঈশ্বরকে পাপপুণ্যের বিচারকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করি না; ঈশ্বর সুখ দুঃখের বিধাতা আমি ইহা বিশ্বাস করি না। অন্য কথা দূরে থাকুক ঈশ্বরকে জগৎস্রষ্টা বলা বিধেয় কি না, সে বিষয়েও আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। আমি যে নাস্তিক তাহাতে আর সংশয় কি?

মনে মনে একটু দুঃখ হইল। একবার যেন আপনা হইতে বলিয়া ফেলিলাম 'আমার অদৃষ্টে এই ছিল'? কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবিতে লাগিলাম—'কি কুক্ষণেই ক্লাইব পলাশির যুদ্ধ জয় করিয়াছিল। কি কুক্ষণেই ইংরেজ এদেশে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। কি কুক্ষণেই মেকলে পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি ত্রিশ বৎসরের মধ্যে হিন্দুসন্তানমাত্রকেই স্বধর্ম্মদ্রোহী করিবেন। কি কুক্ষণেই মেকলের অভিমত শিক্ষাপ্রণালী এদেশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এবং কি কুক্ষণেই ঐ শিক্ষাপ্রণালীদ্বারা আমার চরিত্র নীতি ধর্ম্ম প্রভৃতি সংগঠিত হইয়াছিল।'

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আবার মনে হইল—'কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মেকলে যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহা সফল হইল না। মেকলে মনে করিয়াছিলেন যে হিন্দুসন্তানগণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। কিন্তু তিনি পৌত্তলিকতার বিনাশ করিতে গিয়া হিন্দুসন্তানের হৃদয় হইতে ব্রাহ্মতা খ্রীষ্টানতা মুসলমানতা প্রভৃতি সকল প্রকার 'তা'ই উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়াছেন। মেকলে আশাতিরিক্ত ফল পাইলেন, অথচ যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহা পাইলেন না। কি আশ্চর্য্য! অথবা আশ্চর্য্যই বা কি? কথায় আছে—

"ছুটিলে হাতের শর

না চিনে আপন পর।'

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ভাবিলাম— 'অথবা ইহাতে দুঃখ তাপের বিষয়ই বা কি? মেকলেকেই বা নিন্দা করি কেন? আপনার প্রতিই বা অসন্তুষ্ট হই কেন? ভালইত হইয়াছে। আমরা অসত্য হইতে সত্যে গিয়াছি। আমরা অন্ধকার হইতে আলোকে যাইতেছি। যদি সকল প্রকার 'তা' অসত্য হয়, তাহা হইলে 'তা' পরিত্যাগ করিয়া ভালই হইয়াছে।'

তথাপি যেন মনে হইল যে সকল প্রকার 'তা' পরিত্যাগ করা ভাল হয় নাই। আবার মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম 'জাতিমাত্রেই অসভ্য অবস্থায় অত্যন্ত ধার্ম্মিক থাকে। পরে যতই সভ্যতার বিস্তার হইতে থাকে ততই ধর্ম্মের হ্রাস হয়। সভ্যতার অদ্বিতীয় অবস্থায় জাতিগণ দার্শনিক হয়। পরে সভ্যতার তৃতীয় অবস্থায় মনুষ্যগণ প্রমাণবাদী হইয়া উঠে। হয়ত হিন্দুজাতি পাশ্চত্য সভ্যতার আলোকে 'ধার্ম্মিক' ও 'দার্শনিক' অবস্থা অতিক্রম করিয়া একেবারে 'প্রামাণিক' অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে। ইহাত শুভসংবাদ। ইহাতে ক্ষোভ হইবে কেন?'

কিন্তু তথাপি যেন কেমন ক্ষোভ হইতে লাগিল। তখন মনে মনে ভাবিলাম— "যে কেহ বুদ্ধিমান সেই নাস্তিক। যাহারা নির্ব্বোধ, কেবল তাহারাই আস্তিক। বিলাতে হক্সলি, টিণ্ডেল, মিল, স্পেন্সার নাস্তিক। আমাদের দেশেও যে কয় জন কৃষ্ণবিষ্ণু আছেন তাঁহাদের অধিকাংশই নাস্তিক। শুনা যায় দ্বারি মিত্রি নাস্তিক ছিলেন। শুনা যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় নাকি নাস্তিক। তবেই দেখা যাইতেছে যে, বুদ্ধিমান হইলেই প্রায়ই নাস্তিক হইতে হয়। ইহা ভিন্ন আরও দেখা যায় প্রায় অনেক স্ত্রীলোকও (যাঁহারা শিক্ষাদ্রি শিখরস্বরূপ কথামালা পর্য্যন্ত অধিরোহণ করিয়াছেন) নাস্তিক। এরূপ স্থলে আমি নাস্তিক একথা বলিতে আমার দুঃখ বা ভয় হয় কেন?"

কিন্তু তথাপি যেন কেমন দুঃখ হইতে লাগিল। আমার চারিদিকে চারি প্রবল অগ্নি জ্বলিতেছে, আমি উহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র পতঙ্গের ন্যায় উত্তাপিত হইতেছি এবং ভাবিতেছি কি পাপে আমার এ গতি হইল, এমন সময়ে আমার গুরুদেব বৃদ্ধ পেচকরাজ বিকট হাস্য করিতে করিতে কোটর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আমি গুরুদেবের বদনমণ্ডল প্রফুল্ল দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম, এবং যথারীতি গুরুদেবের পাদবন্দনাদি করিয়া তাঁহাকে বলিলাম "গুরুদেব! আপনার নিকট আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে। আমি সম্পূর্ণ রূপে নাস্তিকতার লক্ষণে উপলক্ষিত। কিন্তু তথাপি 'আমি নাস্তিক' ইহা আমি নিজের নিকটেও স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হই কেন?" পেচক-প্রধান হাস্য করিতে করিতে সংস্কৃত আশ্রয় করিয়া বলিলেন— 'লোকভয়াৎ ঈশ্বরভয়াদ্বা' আমি বলিলাম 'পেচকপ্রবর! আমার হৃদয়ে দুই ভয়ের কোন ভয়ই স্থান পায় না। যেখানে আমি

সর্ব্বসমক্ষে আপনাকে পেচকশিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে পারিয়াছি, তখন আমি লোকভয় ও ঈশ্বরভয় উভয় ভয়কেই পরাজিত করিয়াছি।' তাহাতে পেচকবর উত্তর করিলেন—' তবে বোধ হয়, তোমার হৃদয় হইতে এখনও সমস্ত কুসংস্কার তিরোহিত হয় নাই। তুমি পাপ পুণ্যের প্রভেদ স্বীকার কর?' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— ' হে দিবান্ধ! পাপ পুণ্যের প্রভেদ স্বীকার করা কি কুসংস্কার বিশেষ?' পেচকবর বলিলেন—' উহা দুর্দ্দমনীয় কুসংস্কার। এই কুসংস্কারের অসারতা তুমি সহজেই বুঝিতে পারিবে। ষোড়শ শতাব্দীতে বিধর্ম্মীদিগকে জীবিতাবস্থায় অগ্নিসাৎ করা পুণ্য কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টান পাদ্রীরা অসভ্যবিনাশ করাকে পাপের কার্য্য বলিয়া মনে করেন না। অনেকে পরদার পাপ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু মর্ম্মনদের মধ্যে উহা পাপ নহে। প্রাচীন হিন্দুরা স্থলবিশেষে মিথ্যাকথাকে পাপ বলিতেন না। আমেরিকার একজন লেখক বলেন যে, পরমেশ্বর আমাদের পাপের জন্য দায়ী। জর্ম্মনির একজন লেখক বলেন পাপও যা, পুণ্যও তা। ফিলমার নামে একজন ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তা বলেন যাহা ব্যক্তিসম্বন্ধে পাপ, তাহা সমাজ সম্বন্ধে পুণ্য। আর একজন ইংরাজ রাজনীতিবিৎ বলেন নীতি বা পুণ্য একরূপ অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম পদার্থ, যাহার অস্তিত্বই অনিশ্চিত। যখন পাপ কি পুণ্য কি তাহাই জানা গেল না, তখন পাপ পুণ্যের প্রভেদ করিবে কিরূপে?' আমি স্তম্ভিত ও ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ' হে দিবাভীত! পাপ পুণ্যের প্রভেদ না থাকিলে সমাজ চলিবে কিরূপে?' তাহাতে পেচকবর উত্তর করিলেন—' সমাজ আর একটি কুসংস্কার। মনুষ্য স্বস্ব প্রধান। যেখানে পাঁচজন মনুষ্য একত্রিত হয়, সেখানেই নিশ্চয় জানিও তাহাদের একটা কু অভিসন্ধি আছে। যদি কেহ ঈশ্বর থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার চক্ষে সমাজ ঘৃণ্য পদার্থ মাত্র। সমাজে কাহারও কোন উপকার করিতে পারে না। সমাজ অপকারসাধনপক্ষে বিশেষ ক্ষমতাবান।' আমি অধিকতর বিস্ময়ান্বিত ও চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—' হে নিশাচর! সমাজ, পাপ পুণ্য প্রভৃতি আপনার নিকটে কুসংস্কার। আপনার মতে সুসংস্কার কি কি তাহার ব্যাখ্যা করিয়া চরিতার্থ করুন।' পেচকবর বলিলেন— ' এ সংসার যাতনাময়। ইহাতে যে ব্যক্তি ছলে বলে কলে কৌশলে কোনরূপে আত্মযাতনার হ্রাস করিতে পারে, অর্থাৎ নিজের দেহ মনকে কোনরূপে কথঞ্চিৎ পরিমাণে সুখী করিতে পারে সেই বুদ্ধিমান্। আর যে ব্যক্তি ধর্ম্ম নীতি সমাজ পাপ পুণ্য কুসংস্কার দ্বারায় আপনাকে ও অন্যকে ক্লিশিত করে সেই ব্যক্তি নির্ব্বোধ। যদি বুদ্ধিমান্ হইতে চাও, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কুসংস্কার সমূহ পরিত্যাগ করিয়া আত্মসুখ সাধনে যত্নবান হও।'

আমি উত্তর করিলাম—'হে নিশাটন! সমাজ পাপ পুণ্য প্রভৃতি যে কুসংস্কার তাহা

আমি সুন্দর রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। আমার হৃদয়ে অন্য অন্য যে সমস্ত কুসংস্কার আছে বলিয়া আপনি বিবেচনা করেন, এক্ষণে সেই সমস্তও আমার নিকটে বিবৃত করুন।' পেচকবর বলিলেন—'তুমি কি এই সংসারকে নিয়মাধীন বলিয়া বিশ্বাস কর?' আমি বলিলাম—'হে পেচকর্ষভ! আমি আপনার প্রশ্নটী ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।' তখন পেচকবর বলিতে লাগিলেন—'এমন অনেক কুসংস্কারাবিষ্ট ব্যক্তি আছেন যাঁহারা মনে করেন যে পৃথিবীস্থ যাবতীয় বস্তুই নিয়ম অথবা ব্যবস্থা অথবা শৃঙ্খলা দ্বারা নিবদ্ধ। তাঁহারা ভাবেন যে নিয়ম অনুসারে বৃক্ষে পুষ্প পত্র প্রস্ফুটিত হয়, নিয়ম অনুসারে মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে, এমন কি নিয়ম দ্বারা মনুষ্য-হৃদয়ের গুণ দোষ উৎপন্ন, বর্দ্ধিত বা বিনষ্ট হইতেছে। তুমি কি এইরূপ কোন বিশ্বব্যাপী নিয়মে বিশ্বাস কর?' আমি বলিলাম—'করি।' পেচকবর উত্তর করিলেন—'তুমি এই কুসংস্কার পরিত্যাগ কর। পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখিতেছ, তৎসমুদায়ই অকস্মাৎ বা দৈবাৎ হইতেছে। নিয়ম কিছুই নাই। মনুষ্য এমনই মূর্খ যে সে এই ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ও অনিয়মের মধ্যে নিয়ম দেখিতে পায়। তাহাকেই নিয়ম বলা যাইতে পারে, যাহা দ্বারা পৃথিবীর সকল অংশ সুরক্ষিত ও সুবিন্যস্ত হয়। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে পৃথিবীর অংশ সকল পরস্পর পরস্পরের সহিত নিয়ত সংগ্রাম করিতেছে তখন কিরূপে বলা যাইবে যে সংসারে নিয়ম আছে। সংস্কৃতে বলে 'কিঞ্চ দৈবাৎ পরং বলং।' দৈব অর্থে নিয়ম-বিরহিত দেবেচ্ছা-সম্ভূত আকস্মিক ঘটনা। যে সংসারে সদ্যোজাত শিশু কালগ্রাসে পতিত হয় ও অশীতি-পর বৃদ্ধ বাঁচিয়া থাকে, সে সংসারে নিয়ম কোথায়? যে সংসারে নীরো রাজসিংহাসনে পরম সুখ ভোগ করে, আর যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশদণ্ডে প্রাণত্যাগ করেন, সে সংসারে নিয়ম কোথায়?' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'হে পেচক পুঙ্গব! আপনি কি অস্বীকার করেন যে এমন কতকগুলি কার্য্য আছে যাহা নিয়মধীন?' পেচকবর বলিলেন—'যে জগতে কোটী কোটী আকস্মিক কার্য্য হইতেছে, সে জগতে যে দুই পাঁচ শত কার্য্য নিয়মাধীন হইবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি? সংস্কৃতে আছে

"আবাল্যাৎ অসতী সতী সুরপুরং কুন্তী সমারোহয়ৎ
হা সীতা পতিদেবতা গমদধো কালস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"হে ঘুক! সমাজ, পাপ পুণ্য, নিয়ম এসমস্তই কুসংস্কার। কিন্তু এসমস্ত ভিন্ন আমার হৃদয়ে আর কোনও রূপ কুসংস্কার আছে কি না?" পেচকবর বলিলেন—"থাকিতে পারে। তুমি কি বিশ্বাস কর যে, এ সংসারে সমস্ত মঙ্গলময়?" আমি বলিলাম—'করি।' তাহাতে পেচকবর উত্তর করিলেন—"এ সংসারে সমস্তই অমঙ্গলপূর্ণ। যখন জন্ম হইলেই মৃত্যু সুনিশ্চিত, তখন সংসারে

মঙ্গল কোথায় ?'' আমি বলিলাম—'সংসারস্থ জীবগণ মধ্যে মধ্যে অমঙ্গলে পতিত হইতেছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্ত সংসার ক্রমাগত উন্নতির পথে মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতেছে।' পেচকবর উত্তর করিলেন—''তাহাই বা কিরূপে বলিব ? যখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে কাল ক্রমে পৃথিবী, চন্দ্রের ন্যায় জীবন শূন্য হইবে, যখন স্পষ্ট অনুমান করা যাইতেছে যে সৌর জগৎ সমস্তই কাল সহকারে চন্দ্রের ন্যায় প্রাণ শূন্য হইবে, তখন কিরূপে বলা যায় জগৎ মঙ্গলময় ? আবার ইহা ভিন্ন অন্য দিকে প্রাণীর দুঃখকষ্ট প্রভৃতি বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে যে জগৎ অমঙ্গল পূর্ণ।' আমি পেচক-রাজের ব্যাখ্যা সমস্ত শুনিয়া নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলাম। পেচকরাজ তখন আমাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—''হৃদয় হইতে পাপ পুণ্য, সমাজ, সংসারনিয়ম, উন্নতি, প্রভৃতি কুসংস্কার সমূলে উৎপাটিত কর। তাহা হইলেই তোমার আপনাকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বা ক্ষোভ কিছুই হইবে না।" পেচকবর আমাকে এই সদুপদেশ প্রদান করিয়া কোটরে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীনীঃ—

প্রাচীন ভারত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যদিও কোন কোন স্মৃতিগ্রন্থে বাল্যবিবাহের আভাস পাওয়া যায় এবং অনেক গ্রন্থে ইহা অবশ্যকরণীয় বলিয়াও ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, যথা ;—

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাম্বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥
মনু ৯। ৯৪

তথাপি উপরোক্ত কন্যারত্নগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, তাঁহাদের স্বাধীনতা ছিল ; কিন্তু মনু স্ত্রীস্বাধীনতার একান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাহা হইলেও তদানীন্তন স্ত্রীগণের যে কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা ছিল ইহা স্বীকার করিতেই হইবে ; কেন না আমরা স্পষ্টতই দেখিতে পাই যে, সুভদ্রা কি রুক্মিণী সারথ্য কর্ম্মে নিয়োজিতা আছেন, আর তাঁহাদের পতিগণ রথী হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। স্মৃতিকারগণের বাল্যবিবাহ-বিষয়ক ব্যবস্থা যে সকল সময়ে মান্য হইত তাহা বলা যায় না ; যদি তাহা হইত তাহা হইলে আমরা গন্ধর্ব্ববিবাহের নাম পর্য্যন্তও শুনিতে পাইতাম না। বিশেষতঃ বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আমরা প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রেও বি-

ধান ও তাহার বিষময় ফল সন্দর্শন করি, যথা ;—

"উনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং, যদ্যবিত্তে পুমাম্ গর্ভং কুক্ষিস্থ স বিপদ্যতে। জাতোবা ন চীরং জীবেৎ, জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।" অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি বৎসর প্রাপ্ত হয় নাই এমন পুরুষকর্তৃক যদি ষোড়শবর্ষের ন্যূনবয়স্কা স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার হয়, তাহা হইলে সেই গর্ভস্থ সন্তান গর্ভেই মরিবে, অথবা যদি জীবিত ভূমিষ্ঠ হয় তবে সে বহুদিন জীবিত থাকিবে না ; যদি তাহাও হয়, তবে সে দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইবে। এই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বাল্যবিবাহ কখনই পূর্ব্বতন আর্য্যসমাজে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই ; ইহা অবনতির সময় হইতেই সমাজে লব্ধ-প্রবেশ হইয়াছে। মহারাজ দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বনে কুমারী অবস্থায় দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন ; ইহাতে উপলব্ধি হইতেছে যে, কালিদাসীয় সমাজে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে ; তবে তখনও তাহা সর্ব্বদেশব্যাপী হয় নাই। ইহা আবার বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজে যেরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে এমন ভারতবর্ষের অন্য কুত্রাপি নহে ; গুজরাটবাসীরা আজিও ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে কন্যার বিবাহ দেয় না ; পশ্চিমাঞ্চলীয় ব্রাহ্মণ,রাজপুতাদির মধ্যেও ইহা এতাদৃশ বলবতী নহে, সুতরাং দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে এ বিষয়ে আমরাই অগ্রে অধঃপাতে গিয়াছি।

বিবাহ পুরুষগণের দশবিধ সংস্কারের অন্যবিধ, কিন্তু ইহাই স্ত্রীগণের একমাত্র বৈদিক সংস্কার ; মনু লিখিয়াছেন,—

বৈবাহিকো বিধিঃস্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌবাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥

অর্থাৎ স্ত্রীগণের বিবাহই উপনয়ন,পতিসেবা গুরুকুলে বাসতুল্য এবং গৃহকর্ম্ম সায়ংপ্রাতর্হোমাদি-সদৃশ। ভগবান মনু বিবাহের আট প্রকার নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া যে উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, পত্নী নির্ব্বাচন সময়ে সে ঔদার্য্য সম্যক্‌রূপে রক্ষা করেন নাই ; তিনি কতকগুলি কন্যাকে বিবাহ করিতে একরূপ নিষেধ করিয়াছেন। স্ত্রীনির্ব্বাচন সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন :—

নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীং।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাং॥
নক্ষত্রবৃক্ষ-নদী-নাম্নীং নান্ত্যপর্ব্বত-নামিকাং।
ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণনামিকাং॥
অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীং।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গী মুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ং॥

অর্থাৎ কপিলা, স্থূলা, রুগ্না,অলোমিকা, অতিলোমা, বহু পরুষভাষিণী,পিঙ্গলা এবং নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত, পক্ষী, সর্প, ও

ভীষণ-নাম-বিশিষ্টা কন্যাকে বিবাহ করিবে না; সম্পূর্ণ অঙ্গবিশিষ্টা, সৌম্যনাম্নী, হংস-বারণ-গামিনী, পরিমিতলোম, কেশ দন্ত বিশিষ্টা কৃশাঙ্গীকে বিবাহ করিবে। সকল সময়ে এই নিয়ম প্রতিপালিত হইত কি না বলা যায় না; হইলে অনেক স্ত্রীকে অবিবাহিতা অবস্থায় থাকিতে হইত সন্দেহ নাই।

বহুবিবাহ। পূর্ব্বতন আর্য্যঋষিরা যে একাধিক দার পরিগ্রহ করিতেন না, তাহা ব্যবস্থাপকগণের ব্যবস্থা ও নানা ইতিহাস পুরাণাদিতে অবগত হওয়া যায়; আমরা, কোথাও ব্রাহ্মণ একাধিক দার পরিগ্রহ করিয়াছেন, দেখি নাই; তবে ক্ষত্রিয়গণ তদ্বিষয়ে শাস্ত্রকারগণের ব্যবস্থায় সম্যক আস্থা প্রদর্শন করিতেন না বলিয়াই বোধ হয়; কেননা দেখিয়াছি পূর্ব্বতন রাজগণ সুন্দরী ললনা দর্শন করিলেই তাহাকে প্রায় বিবাহ করিতেন; সুতরাং অধিকাংশ হিন্দুরাজই বহুপত্নীক হইয়া পড়িতেন; ইহার বিষময় ফলও অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এবং কবিগণ সেই গরলময় ফল তাঁহাদের রসপূর্ণ লেখনীদ্বারা সুবর্ণ অক্ষরে; অক্ষয় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া পরবর্ত্তী লোকগণকে তাহা হইতে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন; উদাহরণ স্বরূপ আমরা কেবল রামায়ণ এবং বিষ্ণুপুরাণের ধ্রুবোপাখ্যান উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে বহুবিবাহ সম্বন্ধে আমরা এই প্রকার নিয়ম দেখিতে পাই;—

মদ্যপাঽসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলাচ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা ব্যাধিবেত্তব্যা হিংস্রাঽর্থঘ্নী চ সর্ব্বদা॥
বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমেতু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রী-জননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥

অর্থাৎ স্ত্রী মদ্যপায়িনী, দুশ্চরিত্রা, প্রতিকূলা, ব্যাধিযুক্তা, হিংস্রা ও অর্থনাশিনী হইলে পতি ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিতে পারেন; আর স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে আট, মৃতবৎসা হইলে দশ, কন্যামাত্র প্রসব করিলে একাদশ বৎসর অপেক্ষা করিয়া এবং অপ্রিয়বাদিনী হইলে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিবে। তিনি আরও বলিয়াছেন, "স্ত্রী ব্যাধিগ্রস্থা হইয়াও যদি সুশীলা হন এবং পতিহিত চিন্তায় অনুরাগিণী থাকেন, তাহা হইলে পতি তাহার অনুমতি লইয়া অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করিবে, কিন্তু কদাচ প্রথমাকে অবজ্ঞা করা হইবে না।" মনু এই রূপ কারণ ব্যতীত দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণের একান্ত প্রতিবাদী; তিনি বলিয়াছেন যদি দ্বিজ কামোদ্দীপ্ত হইয়া অন্য কন্যা বিবাহ করেন, তাহা হইলে তিনি অনেক নিকৃষ্ট বর্ণ উৎপাদন জনিত অপরাধে অপরাধী। বিশেষ কারণ ব্যতীত একাধিক দার গ্রহণ তাঁহার মতে অতি নিষিদ্ধ। কিন্তু হিন্দুরাজগণ এ নিয়ম সর্ব্বথা প্রতিপালন করিতেন না; না করিলেও ইদানীন্তন রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের ন্যায় তাঁহারা অযথা বহুবিবাহ করিয়া শতসহস্র জীবন্মৃতা রমণীর অভিসম্পাতের পাত্র হইতেন না ও তাঁহারা একাধিক সুকুমার মতি ললনাগণকে পরম কষ্টে নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় জীবনের অসা-

রতা প্রতিপাদন করিতেন না। মনু বলিয়াছেন 'বৃদ্ধ পিতা, মাতা, সাধ্বী স্ত্রী ও শিশু পুত্রগণকে যত্ন পূর্ব্বক পালন করিবে; যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যার প্রতি, এবং ভার্য্যা স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট, সে পরিবারে সুখের সীমা নাই, তথায় সৌভাগ্য অবিরত বৃদ্ধি পায়; সন্তানোৎপাদন নিমিত্ত স্ত্রী বহু কল্যাণ-পাত্রী; তাহারা গৃহের দীপ্তি স্বরূপ; স্ত্রী শ্রীতে (লক্ষ্মী) কিছুই পার্থক্য নাই।' শাস্ত্রের এই সকল সুধাময় উপদেশ দর্শন করিয়া আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছে যে একজনের বহুপত্নী হইলেও তাহারা কখন কোন কষ্ট প্রাপ্ত হইত না—সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতেন; ইদানীন্তন বহুপত্নীক কুলীনগণের স্ত্রীর ন্যায় তদানীন্তন সপত্নীদিগকে বৃথা কষ্টে দিবসযামিনী অতিবাহিত করিতে হইত না।

পুত্রত্ব। পুত্রত্ব সম্বন্ধে বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজে এক্ষণে দায়ভাগকার জীমূত বাহনের মত চলিতেছে, জীমূত বাহনের মতে পুত্র দুই প্রকার; প্রথম ঔরস পুত্র, দ্বিতীয় দত্তক। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুসমাজে আর দশপ্রকার পুত্রের ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়, ভগবান মনু দ্বাদশ প্রকার পুত্রের পুত্রত্ব সম্পাদন করিয়াছেন। লোকের যতপ্রকার পুত্র হওয়ার সম্ভব, মনু তৎসমস্তকেই পুত্রত্ব দিয়াছেন; যে মনু কোন লোক কোন প্রকারে স্ত্রী গমন করিলে তাহাও বিবাহ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, সেই মনু সেই ঔদার্য্য বশতঃই পুত্র সম্বন্ধেও যে সেইরূপ উদারভাব অবলম্বন করিয়া স্বীয় প্রগাঢ় বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির পরিচয় প্রদান করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? এ পর্য্যন্ত চৈতন্য ও মহম্মদ ভিন্ন অন্য কোন ব্যবস্থাপকই মনুর এই সুগভীর মর্ম্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন নাই। মনুর এই গভীর মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াই অনেকে প্রকৃতির স্রোতঃ বলপূর্ব্বক অবরুদ্ধ করিতে গিয়া প্রবল বেগে প্রতিহত হন। প্রকৃতির স্রোত অবরোধ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে, মনু ইহা বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন এবং এই জন্যই সেই প্রবল স্রোতের অনুসরণ ক্রমে তিনি ঔরস ব্যতীত অন্য একাদশ প্রকার পুত্রের ব্যবস্থা দিয়াছেন; যথা, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ, কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ন্দত্ত ও পারশব। আমরা এক্ষণে এই দ্বাদশ প্রকার পুত্রের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছি;—

স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যং।
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতম্॥
যস্তল্পজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা।
স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তায়াং সপুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃতঃ॥
মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃ পুত্রমাপদি।
সদৃশং প্রীতি সংযুক্তং সজ্ঞেয়ো দত্রিমঃ সুতঃ॥
সদৃশন্তু প্রকুর্য্যাদ্ যং গুণদোষবিচক্ষণম্।
পুত্রং পুত্রগুণৈর্যুক্তং সবিজ্ঞেয়শ্চ কৃত্রিমঃ॥
উৎপদ্যতে গৃহে যস্য নচ জ্ঞায়তে কস্য সঃ।
স গৃহে গূঢ় উৎপন্ন স্তস্য স্যাৎ যস্য তল্পজঃ॥
মাতা পিতৃভ্যামুৎসৃষ্টং তয়োরন্যতরেণ বা।
যং পুত্রং প্রতিগৃহ্নীয়াদপবিদ্ধঃ স উচ্যতে॥

পিতৃবেশ্মনি কন্যাতু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ।
তং কানীনং বদেন্নাম্না বোঢ়ুঃ কন্যাসমুদ্ভবং॥
যা গর্ভিণী সংস্ক্রিয়তে জ্ঞাতাঽজ্ঞাতাপি বা সতী।
বোঢ়ুঃ স গর্ভো ভবতি সহোঢ় ইতি চোচ্যতে॥
ক্রীণীয়াদ্ যস্ত্বপত্যার্থং মাতাপিত্রোর্যমন্তিকাৎ।
সক্রীতকঃ সুতস্তস্য সদৃশোঽসদৃশোঽপিবা॥
যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবাবা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা সপৌনর্ভব উচ্যতে॥
মাতাপিতৃবিহীনো যস্ত্যক্তো বা স্যাদকারণাৎ।
আত্মানং স্পর্শয়েদ্ যস্মৈ স্বয়ন্দত্তস্তু স স্মৃতঃ॥
যং ব্রাহ্মণস্তু শূদ্রায়াং কামাদুৎপাদয়েৎ সুতম্।
স পারয়ন্নেব শব স্তস্মাৎ পারশবঃস্মৃতঃ॥
ক্ষেত্রজাদীন্ সুতানেতান্ একাদশ যথোদিতান্।
পুত্রপ্রতিনিধীনাহুঃ ক্রিয়ালোপাৎ মনীষিণঃ॥

অর্থাৎ স্বামী স্বীয় পরিণীতা স্বজাতীয়া ভার্য্যাতে স্বয়ং যে পুত্র উৎপাদন করেন সেই তাঁহার ঔরস পুত্র ও প্রধান। অপুত্র মৃত, নপুংসক বা ব্যাধিত ব্যক্তির ভার্য্যা নিয়োগধর্ম্মানুসারে গুরুজন কর্তৃক আদিষ্টা হইয়া অন্য কর্তৃক যে পুত্র উৎপাদন করে সেই পুত্র ক্ষেত্রীর ক্ষেত্রজ পুত্র। আপৎকালে মাতা পিতা আপন পুত্রকে স্বজাতীয় অপুত্রক ব্যক্তিকে দান করিলে সেই পুত্র গৃহীতার দত্রিম বা দত্তক পুত্র হয়। গুণদোষ বিচারক্ষম ব্যক্তি পুত্রোচিত গুণবিশিষ্ট স্বজাতীয় কোন ব্যক্তিকে পুত্র রূপে গ্রহণ করিলে, সেই পুত্র তাহার কৃত্রিম পুত্র বলিয়া গণ্য। গৃহে পুত্র উৎপন্ন হইল কিন্তু কাহার ঔরসে তাহা জানা গেলনা, এমন পুত্র যাহার ভার্য্যার গর্ভে জন্মিল, তাহা তাহার গূঢ়োৎপন্ন পুত্র বলিয়া অভিহিত। কোন কারণ বশতঃ মাতা পিতা উভয়েই যে পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিম্বা উহাদের মধ্যে একের মৃত্যু হইলে অন্য কর্তৃক পরিত্যক্ত পুত্রকে স্বজাতীয় অন্য কোন ব্যক্তি গ্রহণ করিলে সেই তাহার অপবিদ্ধ পুত্র বলিয়া গণনীয়। কন্যা অবিবাহিতা অবস্থায় পিতৃগৃহে থাকিয়া যে পুত্র উৎপাদন করেন, সেই কন্যা বিবাহ হইলে, তাহার প্রথম গর্ভজাত সেই সন্তান পরিণেতার কানীন পুত্র হইবে। জ্ঞাতগর্ভা কি অজ্ঞাতগর্ভা কন্যাকে যে বিবাহ করে, সেই গর্ভে উৎপন্ন পুত্র পরিণেতার সহোঢ় পুত্র বলিয়া গৃহীত। অপত্য নিমিত্ত, কাহারও মাতা পিতার নিকট হইতে মূল্য দিয়া তাহাদের পুত্র ক্রয় করিলে সেই পুত্র ক্রেতার নিকট ক্রীত পুত্র হইবে। পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা বা বিধবা স্ত্রী আপন ইচ্ছা ক্রমে পুনর্ভূ অর্থাৎ অন্য কর্তৃক বিবাহিতা হইয়া যে পুত্র উৎপাদন করে সেই পুত্র দ্বিতীয় বিবাহকর্ত্তার পৌনর্ভব পুত্র বলিয়া কথিত। মাতৃ-পিতৃ বিহীন কিম্বা অকারণে পিতা মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত পুত্র স্বজাতীয় অন্য ব্যক্তিকে আত্মসমর্পণ করিলে সেই পুত্র গৃহীতার স্বয়ংদত্ত পুত্র হইবে। যে ব্রাহ্মণ

কামাতুর হইয়া শূদ্রাতে পুত্রোৎপাদন করে সেই পুত্র সমর্থ হইয়াও পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের অনধিকারী প্রযুক্ত মৃত তুল্য, এই জন্য ঐ পুত্র ব্রাহ্মণের পারশব পুত্র বলিয়া আখ্যাত। ক্ষেত্রজ প্রভৃতি যে একাদশ প্রকার পুত্রের কথা বলা হইল,—তাহারা ঔরস পুত্রের প্রতিনিধি, অর্থাৎ ঔরষপুত্রের অভাবে পিতার ক্রিয়াদি লোপ জন্য ইহারা উহার প্রতিনিধি হইয়া কার্য্যাদি করিতে সমর্থ। মহর্ষি মনু এইরূপে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের পুত্রত্ব সম্পাদন করিয়া দুর্নিবার ভ্রূণ হত্যার পাপ হইতে সমাজকে রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু অধুনাতন সমাজে এই সকল পুত্রের নাম পর্য্যন্তও অশ্রুত; কিন্তু প্রকৃতির স্রোত নিবারণ করে কাহার সাধ্য? তাই আজি বঙ্গদেশে প্রায় নিত্য নিত্য ভ্রূণহত্যার সংখ্যা অবিরাম বৃদ্ধি পাইয়া কলুষিত সমাজকে আরও কলুষিত করিতেছে।

শাস্ত্রকারগণের মতে মনু সত্যকালের, গৌতম ত্রেতার, শংখ লিখিত দ্বাপরের এবং পরাশর কলিযুগের ধর্ম্ম-ব্যবস্থাপক। অর্থাৎ ঐ ঐ যুগে উহাদের প্রণীত সংহিতা চলিয়াছে ও চলিতেছে।

> কৃতেতু মানবাধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
> দ্বাপরে শংখলিখিতাঃ কলৌপারাশরঃ স্মৃতাঃ॥

কিন্তু তাই বলিয়া যে উহারা সকলে অন্যান্য যুগের ধর্ম্ম জানিতেন না তাহা নহে; প্রত্যুত উহারা সকল যুগেরই ব্যবস্থা দিয়াছেন; তবে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ঋষির মত সমধিক আদৃত হইয়াছে মাত্র। তাঁহারা যে সকল যুগেরই ধর্ম্মপরিজ্ঞাত ছিলেন তাহা ভাষ্যকারগণের লিখন দৃষ্টেও বিলক্ষণ অবগত হওয়া যায়; তাঁহারা বলিয়াছেন;—

'সন্তি যদ্যপি মন্বাদয়ঃ কলিধর্ম্মাভিজ্ঞাঃ।'

অর্থাৎ মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ যদিও কলিযুগের ধর্ম্মাভিজ্ঞ ছিলেন, ইহাতে জানা যাইতেছে যে, তাঁহারা সকল যুগেরই ধর্ম্ম অবগত ছিলেন ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। পরাশরও সকল যুগেরই ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন,তবে কলিযুগে তাঁহার প্রাধান্য হইবার কারণ আমরা তাঁহার ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

> পরাশরগ্রহণং কলিযুগাভিপ্রায়কং।
> সর্ব্বেষ্বেব কল্পেষু পরাশরঃ স্মৃতঃ॥
> কলিযুগধর্ম্মপক্ষপাতিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তেষ্বপি।
> কলিবিষয়েষু পরাশরঃ প্রাধান্যেনাদরণীয়ঃ॥

অর্থাৎ পরাশর সকল কালেরই ধর্ম্ম কহিয়াছেন; তবে কলিকালের কিছু অধিক, সেই জন্য কলিযুগের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে তাঁহারই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে এই মহর্ষি পুত্রত্ব সম্বন্ধে কি প্রকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন দেখা আবশ্যক; তিনি বলিয়াছেন;—

> ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুতঃ।
> দদ্যান্মাতা পিতা বা যং সপুত্রো দত্তকো ভবেৎ॥

অর্থাৎ ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক ও কৃত্রিম,পুত্র

এই চারি প্রকার; কিন্তু এই ক্ষেত্রজ পুত্র সম্বন্ধে নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়। দত্তক মীমাংসাগ্রন্থ ঐ স্থলের ক্ষেত্রজ পদটিকে ঔরস শব্দের বিশেষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে; তাহা হইলে ইহার মতে পুত্র তিন প্রকার, ঔরস, দত্তক ও কৃত্রিম। কিন্তু এই যুগে আমরা অনেক ক্ষেত্রজ পুত্রের দর্শন লাভ করি; কলির প্রথম রাজা যুধিষ্ঠির ও তদীয় ভ্রাতা ভীমার্জ্জুন, নকুল, সহদেব সকলেই ক্ষেত্রজ পুত্র; পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রও এইরূপ। এই সকল দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে, কলিতেও ক্ষেত্রজ পুত্র, পুত্র বলিয়া গণ্য হইত; পরাশর লিখিত ক্ষেত্রজ শব্দ ঔরস শব্দের বিশেষণ নহে; তবে পরবর্ত্তী ভাষ্যকারগণ দেশাচার মত ইহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন মাত্র।

কিন্তু এস্থলে যদি কেহ বলেন যুধিষ্ঠিরাদি কলিযুগের নহেন,—তাঁহাদের জন্ম দ্বাপরে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন শ্রীকৃষ্ণ যে দিন মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই কলিযুগের আরম্ভ;—

যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগং ইতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ॥

কিম্বা আদিত্য পুরাণের

"দত্তৌরসে তরেষাঞ্চ পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।"

পুত্রত্ব সম্বন্ধে এই বচন উল্লেখ করিয়া কলিযুগে ক্ষেত্রজ পুত্র নাই বলেন; তাহা হইলেও আমরা বলিব কলিযুগের অনেক দিন পর্য্যন্ত ক্ষেত্রজ পুত্র, পুত্র বলিয়া গণ্য হইয়াছে। আমরা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতেও ক্ষেত্রজ পুত্র দর্শন করিয়াছি; যে বল্লাল সেন কুলীনগণের মর্য্যাদা স্থাপন করিয়া তদানীন্তন সকলেরই বরেণ্য হইয়াছিলেন; যিনি "দানসাগর" প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা—যাঁহার নাম আজি পর্য্যন্তও ধ্বনিত—যিনি মহারাজ চক্রবর্ত্তী বলিয়া অভিহিত, সেই বল্লাল সেন ক্ষেত্রজ পুত্র। তাঁহার সম্বন্ধে পঞ্জিকাকারগণ এই কথা লিখিয়াছেন, যথা;—

আদিশূরের বংশ ধ্বংস সেন বংশ তাজা।
বিজয়সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন
রাজা॥

ইহাতেই বিলক্ষণ জানা যায় ক্ষেত্রজ পুত্র বহু দিন পর্য্যন্ত পুত্রস্থলীয় ছিল; তবে ইদানীং ইহা সমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। যাহা হউক এ সম্বন্ধে আর অধিক লিখিয়া প্রস্তাব দীর্ঘ করিতে ইচ্ছা করি না।

এক্ষণে দেখা যাউক মনু যে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পিতৃধনের উত্তরাধিকারী এবং শ্রাদ্ধাধিকারী ছিলেন কি না? উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে মনু এই প্রকার লিখিয়াছেন;—

পুত্রান্ দ্বাদশযানাহ নৃণাং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
তেষাং ষড়্বন্ধু দায়াদাঃ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ॥
ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ।
গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদবান্ধবাশ্চ ষট্॥
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীত পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ন্দত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ।
এক এবৌরসঃ পুত্রঃ পিত্রস্য বস্তুনঃ প্রভুঃ।
শেষানামনৃশংস্যার্থং প্রদদ্যাত্তু প্রজীবনং॥

ষষ্ঠন্তু ক্ষেত্রজস্যাংশং প্রদদ্যাৎ পৈতৃকাৎ ধনাৎ
ঔরসো বিভজন্ দায়ং পিত্র্যং পঞ্চমমেববা ॥
ঔরসক্ষেত্রজৌ পুত্রৌ পিতৃ-রিকৃথস্য ভাগিনৌ।
দশাপরেতু ক্রমশো গোত্ররিকৃথাংশ-ভাগিনঃ ॥
শ্রেয়সঃ শ্রেয়সোভাবে পাপীয়ান্ রিকৃথমর্হতি।
বহবশ্চেত্তু সদৃশাঃ সর্ব্বে রিকৃথস্য ভাগিনঃ ॥

অর্থাৎ মনু যে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের বিধান করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম ছয়জন বান্ধব অর্থাৎ অপুত্রক পিতৃব্য প্রভৃতিরও ধনাধিকারী; আর শেষ ছয়জন অবান্ধব অর্থাৎ অন্যের ধনাধিকারী নহে, কেবল পিতৃ, পিতামহাদির ধনাধিকারী মাত্র। ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্ত, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন এবং অপবিদ্ধ এই ছয় সন্তান বান্ধব বলিয়া গণ্য। এবং কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ন্দত্ত এবং শৌদ্র বা পারশব এই ছয় পুত্র অবান্ধব। ইহাদের মধ্যে ঔরস পুত্রই সর্ব্বাগ্রে পিতৃধনের অধিকারী, এবং তিনিই অন্য একাদশ ভ্রাতাকে পিতৃধন হইতে গ্রাসাচ্ছাদন দিবেন; ঔরস পুত্র পিতৃধন ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বয়ং পাঁচ ভাগ লইবেন এবং অন্যভাগ তাঁহার ক্ষেত্রজ ভ্রাতাকে দিবেন; কিন্তু ক্ষেত্রজ পুত্র বিদ্যাদি গুণসংযুক্ত হইলে তিনিই পিতৃধন পাঁচভাগ করিয়া স্বয়ং চারিভাগ ও ঔরস ভ্রাতাকে অন্যভাগ দিবেন; এইরূপে প্রধানতঃ ঔরস ও ক্ষেত্রজ পুত্রই পিতৃবিত্তাধিকারী; তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব উৎকৃষ্ট পুত্রের অভাবে পর পর দশজন ক্রমে ক্রমে পিতার ধনাধিকারী ও শ্রাদ্ধাধিকারী হইবেন। উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে মহর্ষি মনুর এই মত; কিন্তু দায়ভাগ বা মিতাক্ষরার মতে ঔরস পুত্রই কেবল পিতৃসম্পত্তির অধিকারী, বা ঔরস পুত্রের ধনাধিকারই এক্ষণে সাধারণ্যে প্রচলিত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

নায়ক ও নায়িকা।

আমি আজি আমার জীবনের একটি দুঃখপূর্ণ কাহিনী আপনাদিগকে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি পাঠশালায় ও স্কুলে কিছুকাল বাঙ্গালা লেখা পড়া চলনসই শিখিয়া কিঞ্চিৎ ইংরেজী অভ্যাস করিয়াছিলাম, এবং বিবিধ নাটক, উপন্যাস ও ইতিহাস পাঠ দ্বারা জ্ঞানের সীমা সুদুর বিস্তৃত করিয়া, কিরূপে আমার সঞ্চিত শক্তিদ্বারা স্বদেশের উপকার করিতে পারি, এই বিষয় ভাবিতেছিলাম। গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, খগোল একে একে আমার মানসক্ষেত্রের উপর দিয়া

গড়াইয়া যাইতে লাগিল। দেখিলাম ইহার কিছুদ্বারাই আমি স্বদেশের উপকার করিতে পারিব না, কেন না এসকল বিষয়ে পাঠকদিগেরও আগ্রহ নাই, আমার নিজেরও শক্তি নাই। ইতিহাস মনে আসিতে একটু থামিলাম; কিন্তু সাহস হইল না; কারণ দেখিলাম যে ইতিহাস লিখিতে অত্যন্ত সতেজ কল্পনা আবশ্যক করে। একবার সমালোচকের আসনের দিকে দৃষ্টি করিলাম—আসন বেশ সুদৃঢ়, ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা নাই। ভাবিলাম এই আসন অধিকার করিব। পৃথিবীর কোন কার্য্য না করিয়া, কোন কার্য্যের সহিত যোগ না দিয়া, যদি কেবল পরকীয় কার্য্যের সমালোচনা দ্বারা জীবনের সার্থকতা করিতে পারি, কেন না করিব? অহিফেনসেবীর ন্যায় পৃথিবীতে সুখী কে? আমি যদি মোরগের লড়াইক্ষেত্রখানিতেও না যাইয়া নেপোলিয়নকে কাপুরুষ বলিতে পারি,এবং কেরাণীগিরিটিও না করিয়া লাঠ সাহেবকে বর্ব্বর বলিয়া গালি দিতে পারি, তবে এ সুখের ব্যবসায় ছাড়িব কেন? মনে মনে বলিতে লাগিলাম "আহা দেশীয় সংবাদ-পত্রগুলি কি সুখের চাকরী করে! তাহারা বাঙ্গালার সীমা জন্মাবধি অতিক্রম না করিয়াও আফগান সমরের কত ভ্রমই প্রদর্শন করিতেছে, দেশের কত আয় কত ব্যয়, কত আমদানি কত রপ্তানি, কিছুই না জানিয়াও রাজস্বসচিবকে কতই সদুপদেশ প্রদান করিতেছে, ইতিহাসের একখানি ক্ষুদ্র পাতা না উল্টাইয়াও কত ষ্টেট্.সেক্রেটরীর মস্তক চর্ব্বণ করিতেছে! আমিও ইহাদেরই ব্যবসায় অবলম্বন করিব।" কিন্তু দেখিলাম যে, ইহাদিগের আসন সুদৃঢ় হইলেও নিরাপদ নহে। কারণ যদি সত্য কথা বলিতে চাও, পদে পদে তোমাকে অভিশাপ গ্রহণ করিতে হইবে। আমি অভিশাপের বড় ভয় করি; সুতরাং সমালোচককে নমস্কার করিয়া একবার বীণাদেবীর আরাধনায় মন দিলাম। কিন্তু প্রথমেই মহা জঞ্জাল। তাড়িতসংবাদের আট কথার মত পয়ারের চৌদ্দ অক্ষরে কিছুতেই আমি মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারি না। এইরূপ বহুচেষ্টা করিয়াও যখন দেখিলাম যে একটি সুন্দর শব্দ যোটে ত ভাব যোটে না, আবার ভাব যোটে ত শব্দ যোটেনা; তখন ভাবিলাম যে মূলধনও নষ্ট হইবে, পরিশ্রমও নষ্ট হইবে, অথচ গ্রাহক যুটিবেনা, আমার এমন ব্যবসায়ে কায নাই। অবশেষে উপন্যাস লেখা সুস্থির করিলাম। আজি কালি এই ব্যবসায়ের বড় আদর। গ্রাহকও মিলে, পয়সাও মিলে। বাঙ্গালীর হোটেলে ভস্ম রাঁধিয়া থুইলেও যেমন তাহা খাইবার লোক যোটে, বাঙ্গালীর বাজারে দুরিত দুর্গন্ধময় মৎস্য আসিলেও যেমন তাহা কিনিবার লোক যোটে, বাঙ্গালীর মুদ্রাযন্ত্র হইতে সেইরূপ যে কোন আস্বাদের উপন্যাস বাহির হইলেই তাহা পড়িবার লোক যুটিয়া থাকে। অনেক বন্ধুর পরামর্শ গ্রহণ করিলাম, তাহারা একবাক্যে বলিল "উত্তম সঙ্কল্প করিয়াছ; এ ব্যবসায়ে অস্মদ্দেশে

কেহ কখন দেউলিয়া বলে নাই।" আমি তাঁহাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমার কাব্যের জন্য উপকরণ সংগ্রহে বহির্গত হইলাম। প্রথম প্রশ্ন এই যে মাজরা স্থল রাখি কোথায়? রাজপুতানায় না বাঙ্গালায়?

এই উভয়ে স্থানেরই দোষও আছে· গুণও আছে। বাঙ্গালা মুলুকে মাজরা রাখিলে এই এক অসুবিধা হয় যে, যদি মুসলমানের সহিত লড়াই বাধে, তবে ভীমসিং জগতসিং প্রতাপসিং কাহাকেও পাইব না। অতদূর হইতে তাহাদিগকে বাঙ্গালায় আনয়ন করা দুষ্কর হইবে। রাজপুতানায় রাখিলেও এই এক অসুবিধা হয় যে সে দেশের রীতি নীতি আমি কিছুই জানি না। আমি যদি বাঙ্গালীর বাসর ঘর রাজপুতানায় লইয়া যাই, হয়ত সমস্ত রাজপুত আমার উপর ক্ষেপিয়া উঠিবে। আর বাঙ্গালীরাও হয়ত আমার উপর এই বলিয়া চটিবে যে, "তোমার নায়ক নায়িকা বিদেশী; উহাদের সহিত আমাদিগের কোন সহানুভূতি নাই।" এইরূপ অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিলাম যে, বাঙ্গালায়ই মাজরা রাখিব, বরং মুসলমানের সঙ্গে লড়াই বাধাইব না। দ্বিতীয় প্রশ্ন নায়ক নায়িকা নির্ব্বাচন। একটা অবিবাহিতা নায়িকা কোথায় পাই? ১৩ বৎসর বয়সের নীচের নায়িকা দিয়া আমি কি মাথা মুণ্ড করিতে পারি? অথচ সমস্ত বঙ্গদেশ খুজিয়াও ইহার অধিক-বয়স্কা অবিবাহিতা নায়িকা পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। ১২। ১৩ বৎসরের শিশু দিয়া প্রেমের কথা বলাইতে ও প্রণয়ের প্রস্তাব করাইতে আমার কোন মতেই হৃদয় সরিতেছে না। মেয়েগুলো বড় হইলে হয়ত আমাকে গালি দিয়া বলিবে, "ঠাকুরদাদা, আমাদের ঐ অল্প বয়সে মাথা খাওয়া কি তোমার পক্ষে উচিত ছিল?" আমি তখন কি উত্তর দিব? আমাকে এক গ্রন্থকার বলিলেন "ঐ চাটুর্য্যের বাড়ী যেয়ে দেখ, চাটুর্য্যের মেয়ে কুমুদিনী হরবিলাসের সঙ্গে বিয়ে বোসবার জন্য ফোঁপ'য়ে ফোঁপায়ে কাঁদ্‌ছে। তার ভগ্নী বিমলা আর তার ভাইবৌ প্রমদা সেই বিয়ে ঘটাবার জন্য চিঠি লিখ্‌ছে, আরও কি কি ষড়যন্ত্র করছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কুমুদিনীর বয়স কি?" গ্রন্থকার বলিল "সবে মাত্র বার।" শুনিয়া আমি আহ্লাদে ও আশায় নৃত্য করিতে করিতে চাটুর্য্যের বাড়ীর দিকে দৌড়িলাম। মনে মনে বলিতে লাগিলাম, যাহা হউক ভাবিয়াছিলাম বঙ্গদেশে এত অল্প বয়সের প্রণয়লোলুপা বালিকা পাওয়া যাইবে না; এক্ষণে তাহা যুটিল; গোটা দুই চিঠি লেখায় মজবুৎ মেয়েও পাওয়া গেল। এক্ষণে গুটি দুই স্কুল কি কলেজের ছোকড়া পাইলেই আমার মনস্কাম সিদ্ধ হয়। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু সেখানে যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। গ্রন্থকার মহাভ্রম করিয়া গিয়াছেন। কুমুদিনীর শ্বশুর বাড়ী হইতে কুমুদি-

নীকে নেওয়ার জন্য লোক আসিয়াছে, কুমুদিনী যাইতে একান্ত অনিচ্ছুক, তাই কাঁদিতেছে। বিমলা প্রমদাকে বলিতেছে "তুই ভাই কুমুদের স্বামীর কাছে একখানা চিঠি লিখে দে যে কুমুদের অসুখ, আমরা তাহাকে যাইতে দিলাম না, আপনিই এইখানে আসিবেন।" প্রমদা বলিতেছে "আমি ভাই কোন দিন পরপুরুষের কাছে চিঠি লিখি নাই। সাধ থাকে তুই লেখ।" বিমলা উত্তর করিতেছে "আমিত লিখিতেই জানি না, তবে বাবাকে যাইয়া সমস্ত অবস্থা জানাই, আর তাঁহাকে দিয়া চিঠি লিখাই।" আমি এইরূপ ভাব গতিক দেখিয়া নিরাশ হৃদয়ে চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী হইতে চলিয়া আসিলাম। যে বাড়ীতে প্রণয়ের কথা হইতেছে শুনিতে পাই, সেই খানেই এইরূপ দৌড়াদৌড়ি করিয়া যাই, কিন্তু যাইয়া দেখি কোন কোন স্থলে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণই অসত্য; আর যেখানে সত্য, সেই খানেও মেয়েগুল বিবাহিতা, বয়স কাহারোই ১৫ বৎসরের নীচে নাই। একজন বলিল- 'ব্রাহ্মণ কুলীনদের বাড়ী যাও।' আমি ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম 'কখনই যাইব না।' যেকারণে রাজপুত্রনায় যাইতে আমার আপত্তি, ব্রাহ্মণ কুলীনদের বাড়ীতে যাইতেও আমার সেই কারণে আপত্তি। এই বিস্তীর্ণ বঙ্গদেশের মধ্যে তাহারা অতি সামান্য এক সম্প্রদায়; তাহাদের অবস্থার সহিত আর কাহারও অবস্থার সাদৃশ্য নাই। যে চিত্রের মূল বঙ্গদেশে সাধারণের গৃহে থাকার সম্ভাবনা নাই, আমি সে চিত্র কখনই অঙ্কন করিব না। ইহা আমার সঙ্কল্প ও অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ। আর সেই ব্রাহ্মণ কুলীনদের বাড়ীতেই বা কি? সমাজের দায়ে কাহারও গৃহে অধিক বয়স্কের অবিবাহিতা কন্যা থাকে বটে, কিন্তু তাহারা নায়িকা হইবার অনুপযুক্ত। সমাজের ভয়ে তাহারা সর্ব্বদা জড় সর, ঘর খানির বাহির হয় না, পাছে নিন্দুকের জিহ্বা শত কথা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের নামে রটায়। ঘাটের পথে কোন প্রতিবেশী যুবকের সঙ্গে কথা বলিলে হয়ত পোলিষ পিনাল কোডের ৪৯৮ ধারার অপরাধে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হইবে। যতদিন বিবাহ কপালে না যোটে, ততদিন তাহারা লজ্জায় ও ভয়ে আধমৃত হইয়া কোন রূপে গৃহ খানির মাঝে দিন কাটায়। তাহাদিগকে দিয়া আমি কি করিব? যদি অবিবাহিতা প্রণয়-লোলুপা এবং কোর্টশিপের উপযুক্তা কন্যা বঙ্গীয় সমাজে না মিলে, বরং উপন্যাস নাই লিখিব। সাধে কি আমাদের দেশীয় লোক অকর্ম্মণ্য হয়। এদেশে কার্য্যক্ষেত্র নাই। বল বাপু তুমি দশ বছরের সময় তোমার মেয়েটিকে বিবাহ না দিলে কি অনিষ্ট হইত? যদি সে তোমার কথার অবাধ্য হইয়া স্বেচ্ছাচারী হইত, তখন তাহাকে শাসন করিলেই চলিত। দ্রৌপদী যে একটা সৃষ্টি ছাড়া কাণ্ড করিয়া পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে বিবাহ বসিয়াছিল, তাহাতে তাহার পিতা মাতার কি অনিষ্ট হইয়াছিল?

কিন্তু সেই উপলক্ষ করিয়া ব্যাসদেব তাঁহার মহাভারতরূপ অদ্বিতীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন। এখন যে সেইরূপ লোক দেখিতে পাওয়া না, তাহার অর্থ এই যে কার্য্য ক্ষেত্র নাই। আমার উপন্যাস লেখায় যে বেশী উপকরণ লাগিত তাহা নয়, কিন্তু যাহা লাগিত তাহাও এ পোড়া দেশে পাওয়ার যো নাই। ২৪ কি ২৫ বৎসরের একটি অবিবাহিত সুন্দর যুবা, আর ১৫ কি ১৬ বৎসরের একটি সুন্দরী অবিবাহিতা বালিকা পাইলেই কার্য্য আরম্ভ করা যায়। তার পর গোটা দুই বাচাল, ইচরে পোক্ত, চিঠি লেখায় অভিজ্ঞ মেয়ে চাই, তাহারা বিবাহিত হইলেও ক্ষতি নাই, না হইলেও ক্ষতি নাই। ইহার পরে প্রয়োজন হইলে একটা সন্নাসীকেও যোটাইয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এ পোড়া দেশে ইহার একটাও মনোমত পাওয়া যায় না। একবার ভাবিলাম একটি বিবাহিতা কুলকন্যাকে লাজ ভয়ের শাসন ভাঙ্গিয়া কুল হইতে বাহির করিয়া লইয়া আসি, এবং তাহার পশ্চাৎ একটি বা ততোধিক যুবা পুরুষ যুটাইয়া দেই। ইহাতে রসভাষী, প্রেমালাপী এবং যুবতী নায়িকা পাওয়া যাইত বটে, কিন্তু এইরূপ নিষ্ঠুর এবং গর্হিত কার্য্য করিতে কোন রূপেই প্রবৃত্তি জন্মিল না।

আমি কোন রূপেই উপায় কল্পনা করিতে সমর্থ না হইয়া এক বন্ধুর নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম। বন্ধু বলিলেন ‘অন্যান্য গ্রন্থকার যেরূপ নির্ব্বাহ করে, তুমিও সেইরূপ কর না কেন?’ আমি বলিলাম ‘তাঁহাদের শক্তি অনন্ত, আমার তাহা নাই। তাঁহারা কোথা হইতে ১৫। ১৬ বৎসরের অবিবাহিতা যুবতী ধরিয়া আনেন, আমি তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। আমিত বঙ্গসমাজ সমস্ত ঘুরিয়াও এইরূপা যুবতী পাইলাম না। অনেকে আবার ১২। ১৩ বৎসরের বালিকা এবং ১৭। ১৮ বৎসরের কলেজের ছোকড়া দিয়াই কার্য্য উদ্ধার করেন। শুধু তাহাই নহে, তাহারা ঐ ১২। ১৩বৎসরের বালিকা দ্বারা প্রথম প্রণয়ের প্রস্তাব করান, নায়ক দ্বারা সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করান, এবং অবশেষে অনেক কাঁদাকাটি ও দীর্ঘনিশ্বাসের পর একখানা চিঠি লিখাইয়া রাখিয়া এক গ্লাস জলে কি একটু ঔষধ মিশাইয়া খাওয়াইয়া দেন, তাঁহাদের শক্তি অনন্ত, আমি তাহা কোথায় পাইব?’

একবার বিবাহিতা নায়িকার কথা মনে ভাবিলাম। কিন্তু দেখিলাম যে বিবাহিতা নায়িকাদ্বারা উপন্যাস প্রস্তুত করা যার পর নাই বিড়ম্বনা। কারণ প্রায় উপন্যাসেরই শেষ বিবাহে, ইহার আরম্ভ বিবাহে। ইহাতে কোর্টশিপ করান যায় না, এবং একজনের প্রতি অনুরাগ সত্বে দ্বিতীয়ের সঙ্গে বিবাহের উদ্যোগও দেখান যায় না। ইহার একমাত্র বর্ণিত বিষয় সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং অবশেষে মনোমিলন। কার্য্যক্ষেত্র একান্ত সঙ্কীর্ণ, সুতরাং ইহাতে আর কত চাতুর্য্য দেখান সম্ভব?

আমি এইরূপ নায়িকা অনুসন্ধানে অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে সঙ্কল্প করিলাম

যে, বিনা নায়িকায়ই নাটক লিখিব, যদি মনের মত নায়ক পাই। নায়ক সম্পর্কে বয়সের গোল বাধে না, এই একটু সুবিধা। কিন্তু বঙ্গদেশে উপযুক্ত নায়ক পাওয়াও সামান্য চেষ্টার কার্য্য নহে। নায়িকার ন্যায় নায়কের বসিয়া বসিয়া কাঁদিলে, দু-চারি খানি চিঠি লিখিলে, দুই এক খানি নভেল পড়িলে,আর দুচারিটি প্রেমের কথা কহিলে, শুধু চলে না,—নায়কের কার্য্য করা আবশ্যক। সাধু হউক কি অসাধু হউক, জড়পিণ্ডের মত তাহার বসিয়া থাকিলে চলে না। আমাদের দেশে নায়ক থাক্, নাটকের উপযুক্ত পুরুষ পাওয়াই কঠিন। এবিষয়ে অন্যান্য গ্রন্থকার অপেক্ষা বঙ্কিম বাবু কিঞ্চিৎ অধিক ভাগ্যবান। তাঁহার প্রতাপ রায়, হেমচন্দ্র আর জীবানন্দ উপযুক্ত নায়ক বটে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি ইহাঁদের জাতীয়ত্ব রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহারা যেখানে নায়িকার সংসর্গে আসিয়াছে, সেই খানেই বাঙ্গালী স্বভাব পরিত্যাগ করিয়াছে। যে নভেলে প্রতাপ রায় কি জীবানন্দ থাকে, সে নভেলে আর নায়িকার প্রয়োজন কি ? স্ত্রীলোক-মাতোয়ারা বাঙ্গালী বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসে কেবল স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হয় ; কিন্তু বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসে যদি কোথাও প্রকৃত নায়কত্ব থাকে, যদি কোথাও প্রকৃতির সহিত সাদৃশ্য থাকে,তবে সে তাঁহার পুরুষে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে প্রতাপ রায় জীবানন্দ যে কালের লোক, সে কাল এখন নাই। বঙ্গের সেই এক কাল গিয়াছে ; তখন বঙ্গে রিচার্ড কুর্ডিলিয়ন না থাকিলেও বহু রবিনহুড্ ও ও আইভানহো ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শান্তিরূপ অসি আমাদের দেশের বীর ও নায়ককুলকে নির্ম্মূল করিয়াছে। এখন আমি নায়ক কোথায় পাইব ? আমি পক্ক কদলীবর্ণ, স্নিগ্ধশরীর, বিশালনয়ন অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবার তাম্বুলরাগে মুখ রঞ্জিত করিয়া, হস্তে সুচিক্কণ বেত্রযষ্টি দিয়া, মস্তকে সুস্পষ্ট সীমন্ত আঁকিয়া এবং লম্বাকোচা ও বিশিষ্ট ইস্ত্রি করা শার্ট ও উত্তরীয় পরাইয়া ইডেন গার্ডেনে ছাড়িয়া দিতে পারি বটে ; কিন্তু সে হয় ত ফুলবাবু বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবে, কিম্বা সাহেবের মালির সঙ্গে বেশ ঘুসাঘুসি করিয়াও আসিতে পারিবে,কিন্তু সে আমার উপন্যাসে নায়ক হইবার যোগ্য হইবে কি ? আমি হয়ত কলেজের কোন চোখা বালককে বার্ক কিম্বা শেরিডান হস্তে সভায় ছাড়িয়া দিয়া আসিলে সে বক্তৃতার নিনাদে গগণ মাতাইতে পারিবে, কিন্তু সে আমার উপন্যাসের নায়ক হইবার উপযুক্ত হইবে কি ? বঙ্গে কি এইরূপ যুবক আছে যে,অধ্যবসায়, সাহস, মহত্ব, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির কোন একটি গুণেও সমাজের আদর্শ অথবা প্রকৃত হৃদয়বতী গুণগ্রাহিণী রমণীর সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? যদি তাহা না পারিল, তবে তাহাদিগকে দিয়া উপন্যাস সাজাইলে লাভ হইবে কি ? আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, আমিও অন্যান্য গ্রন্থকারের ন্যায় কোন একটি

কালেজের যুবককে দ্বাদশবর্ষীয়া সুন্দরী বালিকার একটি সুমিষ্ট হাসি অথবা অপাঙ্গ ভঙ্গি দেখাইয়া নিকটস্থ উদ্যানে অথবা নদীতীরে এক মাস নিরাশার কান্না কাঁদাইতে পারি,—সেই উদ্যানে পাপিয়া ডাকিবে, যুবকের হৃদয় তাহার সঙ্গে আরও উথলিয়া উঠিবে, সেই নদী কলকলরবে বহিয়া যাইবে, যুবক তাহার স্রোতের সঙ্গে আপনার হৃদয়ের গরল ঢালিয়া দিবে। ইহাতে আমি কোন গ্রন্থকার হইতে অক্ষম নহি। কিন্তু ইহাতে লাভ হইবে কি? কাঁদিয়া কাটিয়া ত সংসার চলিবে না। যে শক্তিপুঞ্জ সংসারকে চালাইতেছে, তাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে, এইরূপ যুবকের প্রয়োজন; কিন্তু এইরূপ যুবক বঙ্গদেশে কোথায়?

আমাদের দেশের উপন্যাসগুলি পড়িয়া পড়িয়া আমার বিরক্তির একশেষ বোধ হইয়াছে। তাঁহারা আমাদের সমাজের যে চিত্র অঙ্কন করেন, তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, তাহার সঙ্গে প্রকৃত সমাজের কোন সংস্রব নাই। তাঁহাদের সকলেরই প্রায় এক কথা। গ্রন্থকার টানিয়া খিচিয়া হয়ত নায়িকার বয়স ১৪ বৎসর করিলেন। সেই ১৪ বৎসর বয়স্কা নায়িকা নলিনী বিরহবেদনায় দিন দিন শুষ্ক হইতেছে, প্রায় শয্যাত্যাগ করিয়া উঠে না; হাতে কিন্তু একখানা লীলাবতী অথবা মৃণালিনী থাকিবেই। পরিবারস্থ সকলে বিষম চিন্তিত; কেহই কারণ জানে না। একমাত্র ১৩ বৎসর বয়স্কা কুসুমলতা জানে; সে আসিয়া নৎ নাড়িয়া নলিনীকে কত শান্তনা করিতেছে, কত ষড়যন্ত্র করিতেছে, কত আশা দিতেছে। কুসুমলতা ১৬ বৎসর বয়স্কা প্রমদাকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া ৩০ বৎসরের প্রৌঢ়া রমণীর ন্যায় দুইজনে কতই উপায় কল্পনা করিতেছে, কতই কৌশল ঠাহরাইতেছে, নিজ নিজ স্বামীকে কতই পরামর্শ দিতেছে, কতই চিঠি লিখিতেছে, স্থূল কথা অন্তঃপুরের যতটুকু বুদ্ধি সকল টুকুই মেয়ে কয়টি বিলিবাট করিয়া নিতেছে। আর যোগেশ,—যাহার জন্য নলিনী বিরহজ্বালায় অস্থির,—সে নদী তীরে বসিয়া বসিয়া নিরাশার কান্না কাঁদিতেছে, অথবা নিকটবর্ত্তী কালিমন্দিরে প্রাণত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। সেই স্থানে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। অবশেষে তাহাদ্বারা পূর্ব্বকথিত কুসুমলতা ও প্রমদা নাম্নী বালিকাদ্বয়ের ষড়যন্ত্রের সাহায্যে উভয়ের মিলন। বল, বঙ্গদেশের কোন্ ভদ্র লোকের পরিবারে এরূপ প্রকৃতিবিশিষ্টা বালিকা থাকা সম্ভব? এই অস্বাভাবিক উপন্যাসে তথাপি যদি একটি কাযের কথা থাকিত তাহা হইলেও ইহার আদর করিতাম। নায়ক নায়িকার প্রেমের যেরূপ বিকাশ প্রদর্শিত হয়, সংসারে প্রেমভিন্ন আরও যে শতবিধ কার্য্য রহিয়াছে, যদি তাহারও সেইরূপ বিকাশ দেখিতাম, তাহা হইলে দুঃখের বিষয় ছিল না। একেত আমাদের দেশে নায়ক না-

য়িকার উপযুক্ত পুরুষ রমণী নাই, তাহাতে যদি আবার গ্রন্থকারগণ তাহাদিগকে প্রেমের সরোবরে ডুবাইয়া রাখেন, তবে বলিব যে তাঁহারা বঙ্গীয় যুবককে আমোদের নামে গরল প্রদান করিতেছেন। আমি কখনই তাঁহাদের পথের পথিক হইব না।

আমার এইক্ষণে উপায় কি? আমার উপন্যাস লেখাও হইল না, কারণ আমি মনোমত নায়কও পাইলাম না, নায়িকাও পাইলাম না। ষোড়শবর্ষীয় বালকের সহিত দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার পরিণয় হইয়া গেলে বালক বালিকা দুইটি প্রাণী একটি নির্জন ঘরে বসিয়া কিরূপ প্রেমের আলাপ ও প্রেমের ব্যবহার করিতে পারে, আপনারা অনুমতি দিলে তাহা আমি বিশেষ রূপে বিন্যাস করিয়া বলিতে পারিতাম। কিন্তু আপনারা সে অনুমতি দিবেন কি? অশিক্ষিত ব্যক্তিরা শিশু-দম্পতীর প্রেমে সরলতা ও সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়, এবং তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য এক শ্রেণীস্থ গ্রন্থকার উক্ত প্রেমকে অধিকতর বিলাসিতায় রঞ্জিত করিয়া চিত্রিত করেন। কিন্তু বিজ্ঞেরা এবম্বিধ প্রেমে অসারতা ও ভবিষ্যত প্রমাদ দেখিয়া দুঃখিত হন, এবং তাঁহাদের মতে উহা এইরূপ ভাবে চিত্রিত হওয়া উচিত, যেন উহার প্রতি দৃষ্টি করিলে সুখ ও আমোদ অনুভব না হইয়া গভীর দুঃখ, গভীর আতঙ্ক ও গভীর ঘৃণার উদ্রেক হয়। আমি এই সকল কারণে উপন্যাস লেখার সঙ্কল্পও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম; আমি এক্ষণে কি উপায়ে আমার সঞ্চিত শক্তিদ্বারা স্বদেশের মঙ্গল করিতে পারি, আপনারা তাহা বলিয়া দিন।

শ্রীশা—

হিন্দুদিগের অবনতি।

জমীদার ও প্রজা।

আমরা পূর্ব্বে যে গ্রাম্য শাসন প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছি তাহাই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইহা বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে ঐ প্রণালী অবলম্বিত হইতে পারে না। গ্রামের অবস্থা এক্ষণে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; সুতরাং এক্ষণকার অবস্থা দ্বারা তখনকার অবস্থার অনুমান করা অত্যন্ত অসঙ্গত। পূর্ব্বে গ্রামের যেরূপ সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহা নাই, এক্ষণে গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগের তাবত গ্রামের উপর আধিপত্য না থাকাতে এবং প্রত্যেক গ্রামেই পার্শ্ববর্ত্তী লোকসমূহের আধিপত্য প্রবেশ করাতে অস্মদ্দেশীয় গ্রাম্যশাসনে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। মুসলমান-প্রতিষ্ঠিত জমীদারী শাসনপ্রণা-

লীতে হয় ত কোন কোন গ্রামবাসীর গ্রামে অঙ্গুলি-প্রমাণ ভূমির উপরও স্বত্বাধিকার নাই, এবং হয় ত কোন গ্রাম সমস্তই ভিন্ন-গ্রামবাসী এক জমীদারের স্বত্বাধীন ; হয়ত বা কোন গ্রাম ভিন্ন গ্রামবাসী বহু জমীদারের স্বত্বাধীন। এরূপ অবস্থায় পূর্ব্বকালের গ্রাম্যশাসন প্রথা যে অব্যাহত থাকিতে পারে না, সহজেই তাহা অনুমিত হইবে। তথনও যে জমীদারের ন্যায় একশ্রেণীস্থ ভূস্বামী ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। কিন্তু ইহাদের স্বত্ব স্বগ্রামবহির্ভূত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্বকালের ভূস্বামিত্ব নিয়া বর্ত্তমান রেণ্টবিল উপলক্ষে অত্যন্ত মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। এক পক্ষ বলেন যে, তখন জমীদার না থাকিলেও তৎক্ষমতাবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি ছিলেন, এক গ্রাম কিংবা বহুগ্রাম ব্যাপিয়া তাহার অধিকার ছিল, গ্রামবাসিগণ তাহার প্রজাভাবাপন্ন হইয়া থাকিত, এবং তদধিকারস্থ ভূমির উপর সর্ব্বতোভাবে তাহার স্বামিত্ব ছিল ;—রাজা তাহার নিকট নির্দ্দিষ্ট কর প্রাপ্ত হইতেন মাত্র। অপর পক্ষ বলেন যে, তখন গ্রামে জমীদার কিংবা তদ্‌ভাবাপন্ন কোন ব্যক্তিই ছিল না। প্রত্যেক প্রজাই ভূস্বামী ছিল,—তাহারা আপনার ভূমি আপনারা চাষ করিত, রাজাকে নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিত মাত্র। বস্তুতঃ ভূস্বামী যে একশ্রেণীস্থ লোক ছিল, তাহা কোন পক্ষই অস্বীকার করে না। একপক্ষ বলেন, সেই ভূস্বামীই মুসলমান সময়ে জমীদার নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। অপর পক্ষ বলেন প্রজারা প্রত্যেকেই ভূস্বামী ছিল, রাজা এবং উল্লিখিত প্রজাদিগের মধ্যে কোন দ্বিতীয় ভূস্বামী ছিল না। পুরাতন গ্রন্থাদিতেও এই ভূস্বামিশ্রেণীর অস্তিত্বের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি ভূস্বামিত্বের অর্থ এই হয় যে, যাহার ভূমি সে তাহা দান, বিক্রয় কিংবা দায়সংযোগ করিতে পারিবে, তাহার উত্তরাধিগণ তাহা প্রাপ্ত হইবে, এবং সে অপরের নিকট উহা পত্তন করিতে পারিবে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে রাজার নিম্নেই অন্য এক শ্রেণীস্থ ভূস্বামী ছিল। ভূসম্পত্তি উত্তরাধিকারীদিগের প্রতি বর্ত্তিবার জন্য শাস্ত্রে বিশেষ বিধান রহিয়াছে। তাহা দান এবং বিক্রয় করিবারও ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট আছে। রাজা ষষ্ঠাংশ মাত্র কর গ্রহণ করিতে পারিতেন ; কিন্তু তিনি কাহাকেও উৎখাত করিতে পরিতেন না। এই সমস্ত নিয়ম ভূস্বামিত্বের অস্তিত্ব অবিসংবাদিত রূপে প্রমাণ করে। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে ভূস্বামী কে ছিল? প্রজাবর্গ, না রাজা ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী অন্য কেহ? যাহারা মধ্যবর্ত্তী ভূস্বামিত্ব স্বীকার করেন, তাহারা সাধারণতঃ গ্রামাধিপতিদিগের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।* পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে গ্রামাধিপতিগণ করসংগ্রহ এবং শান্তি রক্ষা করিতেন, এবং

* গ্রামাধিপতিদ্বারা আমি এস্থলে গ্রাম্য শাসনের তাবৎ কর্ম্মচারিগণকে অর্থাৎ গ্রামাধ্যক্ষ, দশী, বিংশী, শতগ্রামাধ্যক্ষ, দেশাধ্যক্ষ প্রভৃতি সকলকেই লক্ষ করিতেছি।

এই সকল কার্য্য দৃষ্টে তাহাদিগকে জমীদার বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্তু বাস্তব তাহা নহে। গ্রামাধিপতি ও জমীদারে প্রভেদ এই যে জমীদার রাজাকে নির্দ্দিষ্ট কর দিয়া প্রজার উপর ইচ্ছামত কর বসাইতে পারেন, এবং ইচ্ছামত প্রজাকে উৎখাত করিতে পারেন; কিন্তু গ্রামাধিপতিগণ বেতন স্বরূপে কিয়ৎপরিমাণ ভূমি মাত্র প্রাপ্ত হইয়া প্রজাদিগের নিকট কর সংগ্রহ করিতেন; * কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছামত প্রজার উপর কর বসাইতে কিংবা ইচ্ছামত প্রজাকে উৎখাত করিতে পারিতেন না। তাঁহাদের পদের সহিত বর্ত্তমান কলেক্টরদিগের পদের অনেক সাদৃশ্য ছিল; প্রভেদ এই যে বর্ত্তমান কলেক্টরগণ নগদ টাকায় বেতন গ্রহণ করেন, গ্রামাধিপতিগণ ভূমি দ্বারায় তাহা গ্রহণ করিতেন। এই বেতন স্বরূপ প্রাপ্ত ভূমির উপর গ্রামাধিপতিগণ জমীদারের ন্যায় ক্ষমতাবিশিষ্ট ছিল; কিন্তু তদতিরিক্ত স্থানের উপর তাহাদের ক্ষমতা কলেক্টর দিগের সমান। রাজার ইচ্ছা ব্যতিরেকে তাহাদের পদ উত্তরাধিকারিদিগের প্রতি বর্ত্তিত বলিয়া কোথাও প্রমাণ নাই। বরং ইহাই প্রমাণ আছে যে তাহাদের পদ রাজার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত, এবং তাহারা অসদাচারী হইলে রাজা তাহাদিগকে পদচ্যুত করিতেন। সুতরাং পূর্ব্বকালীন গ্রামাধিপতিগণকে জমীদার বলিয়া ভ্রম করা অত্যন্ত অজ্ঞতার কার্য্য। পক্ষান্তরে যাহারা মধ্যবর্ত্তী ভূম্যধিকারী অস্বীকার করিয়া সকল প্রজাদিগকেই ভূস্বামী বলিতে চাহেন, তাহারাও সর্ব্বতোভাবে ভ্রমপরিশূন্য নহেন। গ্রামাধিপতিগণ যদি ভূস্বামী না হইল, তবে প্রজাগণই যে ভূস্বামী ছিল, ইহাতে কোন সংশয় নাই। কিন্তু সকল প্রজাই যে ভূস্বামী ছিল, তাহা নহে। এইরূপ হইতেপারে যে, যখন গ্রামে প্রথম বসতি হয়, তখন গ্রামিকগণ প্রত্যেকেই গ্রাম্যভূমির এক এক অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে আর এক শ্রেণীস্থ প্রজার উৎপত্তি হয়। ইহাদের নিজের কোন ভূমিতে স্বামিত্ব ছিল না; ইহারা ভূস্বামী প্রজাদিগের অধীনে ভূমি পত্তন নিয়া চাষ করিত, এবং উৎপন্ন শস্যের কিয়দংশ ভূস্বা-

---

* যানি রাজপ্রদেয়ানি প্রত্যহং গ্রামবাসিভিঃ।
অন্নপানেন্ধনাদীনি গ্রামিকস্তান্যবাপ্নুয়াৎ॥ ১১৮

দশীকুলন্তুভুঞ্জীত বিংশীপঞ্চকুলানিচ।
গ্রামং গ্রামশতাধ্যক্ষঃ সহস্রাধিপতিঃ পুরং॥ ১১৯

মনু ৭ম অঃ।

গ্রামবাসিগণ অন্ন, জল ইন্ধনাদি রাজাকে প্রত্যহ যাহা দেয় তাহা গ্রামিক বৃত্তিস্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। দশী কুলভূমি (অর্থাৎ ছয়টি গরুতে যতখানি ভূমি চাষ করিতে পারে তত ভূমি) প্রাপ্ত হইবে। বিংশী পঞ্চকুল ভূমি, শত-গ্রামাধ্যক্ষ একখানি গ্রাম এবং সহস্রগ্রামাধ্যক্ষ একটি নগর প্রাপ্ত হইবে। ইহাতেই বোধ হয় যে গ্রামাধিপতিগণ বেতন প্রাপ্ত কর্ম্মচারী মাত্র ছিলেন।

মীকে প্রদান করিত। ' এই সকল প্রজার পক্ষে ভূস্বামী প্রজাগণ জমীদার স্বরূপ ছিলেন। ইহাদের করের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ছিল না; এবং ইহারা ভূস্বামীর ইচ্ছানুসারে উৎখাত হইতে পারিত। এই উভয় শ্রেণীর প্রজার পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ করিবার জন্য কোন কোন স্মৃতিশাস্ত্রে বিধি দৃষ্ট হয়। আপস্তম্ব বলেন যে "যদি কোন ব্যক্তি ভূমি নিয়া তাহা চাষ না করে, এবং সেই ভূমিতে শস্য না হয়, তাহা হইলে যত শস্য উৎপন্ন হইতে পারিত, রাজা ঐ ব্যক্তি হইতে লওয়াইয়া ভূস্বামীকে তাহা দেওয়াইবেন" *। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, ' যে ব্যক্তি অপরের ভূমি চাষ দিয়া তাহা সম্পূর্ণ না করে, ঐ ভূমিতে যত শস্য উৎপন্ন হইতে পারিত, তাহার তাহা ভূস্বামীকে দিতে হইবে। ভূস্বামী ভূমি অন্যকে দিয়া চাষ করাইবেন। '†

পরাশর ব্রাহ্মণদিগের কৃষিকার্য্য সম্পর্কে যে বিধি দিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেও বোধ হয় যে তৎকালে এক শ্রেণীস্থ প্রজা-ভূস্বামী ছিল।‡ তাঁহার মতে ব্রাহ্মণগণ কৃষিকার্য্য করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহারা নিজে হলকর্ষণ না করিয়া অন্য লোক দ্বারা করাইতেন। ইহা নিশ্চয় যে, ব্রাহ্মণ যদি কৃষক ছিলেন, তবে তিনি বর্ত্তমান কৃষকের ন্যায় কখনও ইচ্ছাধীন প্রজা ছিলেন না, অবশ্য তাঁহার ভূমিতে স্বামিত্ব ছিল। কিন্তু তিনি যে অত্যন্ত বৃহৎ প্রজা ছিলেন না, তাহারও প্রমাণ এই যে তিনি কৃষিকার্য্যের জন্য ন্যায়তঃ মাত্র আটটি গরু রাখিতে পারিতেন, সুতরাং আটটি গরুতে যত ভূমি চাষ করিতে পারে তিনি তদধিক ভূমি ভোগ করিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য কৃষক প্রজায় এই মাত্র প্রভেদ ছিল যে, ব্রাহ্মণের কোন রাজস্ব দিতে হইত না, অন্যান্যের তাহা দিতে হইত।§ পরাশর ইহাও বলিয়াছেন যে ' প্রজাগণ রাজার ষষ্ঠাংশ এবং গ্রামাধিপের ভাগ প্রদান করিলে আর পাপে লিপ্ত হইবে না। ইহাতে বোধ হয় যে প্রজাগণ কখনও উৎখাত হইত না, এবং তাহারা রাজাকেই রাজস্ব দিত, গ্রামাধিপতিকে বৃত্তিস্বরূপে একটি ভাগ দিত মাত্র। ইহা প্রজাদিগের ভূস্বামিত্বের বিশিষ্ট পরিচায়ক।

প্রজাদিগের এই স্বত্ব কালে ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছিল। রাজশাসন যতই শিথিল হইতে লাগিল, গ্রামাধিপতিদিগের পদ তাহাদের গুণের উপর নির্ভর না করিয়া ক্রমে তাহাদের বংশ-সম্পত্তিতে পরিণত হইল। রাজা গ্রামাধিপতিগণের

---

* আপস্তম্ব প্রশ্ন২, পটল ১১ খণ্ড ৮—২৮১।

† যাজ্ঞবল্ক্য, ২য় অঃ, ১৬১।

‡সংপ্রবক্ষ্যাম্যহংভূয়ঃপারাশর্য্যপ্রচোদিতঃ।
ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃকৃষিকর্ম্মাণিকারয়েৎ॥
হল মষ্ট গবং ধর্ম্মং •••••• ইত্যাদি।
পরাশরসংহিতা ২য় অঃ

§ব্রাহ্মণস্তু কৃষিং কুর্ব্বন্ বাহয়েদ্দিচ্ছয়া-ধরাম্।
ন কিঞ্চিৎকস্যচিদ্দদ্যাৎ স সর্ব্বস্যপ্রভুর্যতঃ॥
বৃহৎ পরাশরসংহিতা ৩য় অধ্যায়।

নিকটে তন্নির্দ্দিষ্ট কর প্রাপ্ত হইলে প্রজারা কিরূপ সুখ-স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে, তৎপ্রতি কোন মনোযোগ করিত না ; সুতরাং গ্রামাধিপতিগণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রজার উপর অত্যাচার করিতে কিছু কিছু সুযোগ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ভূস্বামি-প্রজার সংখ্যাও দিনে দিনে কমিতে লাগিল, কারণ প্রত্যেক ভূস্বামীর ভূমি হয়ত তিন চারি কি তদধিক পুরুষে এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইল যে তাহাতে একটি লোকেরও উদর সংস্থান হওয়া অসম্ভব; সুতরাং অনেকে আপনাপন স্বামিত্ব অন্যের নিকট এবং সম্ভবতঃ গ্রামাধিপতিদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া অন্য কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিল, কিংবা অপরগ্রামে ভূমি পত্তন করিয়া তাহা চাষ করিতে লাগিল। এই রূপে প্রজার ভূস্বামিত্ব ক্রমে ক্রমেই স্খলিত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল, ভূস্বামি-প্রজাগণ অস্থায়ী প্রজায় পরিণত হইল এবং গ্রামাধিপতিগণ তাবত ভূমির উপর নামতঃ এবং কার্য্যতঃ ভূস্বামী হইয়া উঠিল। হিন্দু শাসনে যে পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছিল, মুসলমান-শাসন প্রারব্ধ হইলে তাহা দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল ; এবং কয়েক শতাব্দীর পর যখন আকবর সম্রাট্ স্বরাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে উচ্চতন গ্রামাধিপতিগণ মহাপ্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহারা বৃত্তিপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তে প্রকৃত ভূস্বামী হইয়া উঠিয়াছে, এবং প্রজারা ভূস্বামীপদ-চ্যুত হইয়া উক্ত গ্রামাধিপগণের ইচ্ছাধীন প্রজায় পরিণত হইয়াছে। তিনি ইহাও দেখিলেন যে, এইক্ষণে গ্রামাধিপতিগণের স্বত্ব অস্বীকার করা অত্যন্ত দুষ্কর হইবে এবং অস্বীকার করিলে রাজস্ব আদায়ের সুশৃঙ্খলা ও দেশে শান্তি থাকিবে না। ইহা দেখিয়াই তিনি বর্ত্তমান জমিদারী প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন এবং সহস্র গ্রাম, শত গ্রাম, দশগ্রাম ও গ্রাম প্রভৃতি নামের পরিবর্ত্তে সরকার, পরগণা, চাকলা, মৌজা প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়া জমীদার তালুকদার প্রভৃতি শ্রেণী নির্দ্দেশ করিয়া দেন। আকবরসাহ পূর্ব্ববর্ত্তী রীতির বিরুদ্ধে উক্ত প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন নাই, পূর্ব্ব রাজ-শাসনের শৈথিল্যে যে নূতন রীতি ধীরে ধীরে প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, তিনি তাহা বিধিদ্বারা অনুমোদন করিয়াছেন মাত্র। অতএব যাঁহারা এইরূপ বলেন যে, জমীদারগণও মুসলমান রাজত্ব সময়ে রাজস্ব সংগ্রাহক কর্ম্মচারী মাত্র ছিল, তাঁহাদের কথা ন্যায্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

সুতরাং ভূস্বামীদিগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই যে পুরাকালে গ্রামে এক শ্রেণীস্থ প্রজা-ভূস্বামি ছিল, গ্রামাধিপতিগণ তাহাদের শাসন কার্য্যের জন্য কর্ম্মচারী রূপে নিযুক্ত ছিল, ক্রমে প্রজাদিগের ভূস্বামিত্ব গ্রামাধিপতিগণের হস্তে গড়াইয়া পড়ে, গ্রামাধিপতিগণই ভূস্বামী হইয়া দাঁড়ায়, এবং অবশেষে তাহারাই মুসলমান-রাজ্যের মধ্যযুগে জমীদার-আখ্যা প্রাপ্ত হয়। জমীদারগণ সর্ব্বতোভাবে ভূস্বামী

ছিল, ভূস্বামিত্বের যে যে লক্ষণ তাহার সকলই তাহাদিগের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। সম্রাট্ রীতি-রক্ষার্থ তাহাদিগকে সনদ দিতেন। ইংলণ্ডে যেমন প্রত্যেক বেরণকেই স্বপদে অভিষিক্ত হইবার সময় "Oath of allegiance" গ্রহণ করিতে হইত, অস্মদ্দেশেও কোন জমীদারের মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারীকে বশ্যতা স্বীকারার্থ সম্রাট্ হইতে সেই প্রকার সনদ লইতে হইত। শ্রীশাঃ—

সংক্ষিপ্তসমালোচন।

১। "শিক্ষাদান-প্রণালী। প্রাথমিক ও মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণের ব্যবহার নিমিত্ত অধ্যাপনার নিয়ম। শ্রীদীননাথ সেন কর্তৃক প্রণীত।"—যাঁহারা মনুষ্য-সমাজকে নীতি-বিষয়ে শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা দুইটি বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারেন। তাঁহাদের এক শ্রেণী কল্পনার ভক্ত, আর এক শ্রেণী কর্ম্ম ফলে অনুরক্ত। বাবু দীননাথ সেন এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে আদরের আসন পাইবার যোগ্য ব্যক্তি। যাহা অতীন্দ্রিয়, অপ্রত্যক্ষ এবং সুতরাং অলৌকিক, তিনি সে সকল তত্ত্ব লইয়া আলোচনা না করিয়া এই গ্রন্থে মানবজীবনের নিত্যপ্রয়োজনের উপযোগী কার্য্যগত শিক্ষাবিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন, এবং একথা অক্ষুব্ধচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, তিনি তাঁহার অভীষ্ট বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার লেখা প্রাঞ্জল, অথচ প্রগাঢ়, এবং তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন সমস্তই প্রমাণসিদ্ধ ও পরীক্ষিত। এইরূপ সারগর্ভ পুস্তক যে শিক্ষা-সমাজে বিশেষরূপে সমাদৃত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। শিক্ষাদানের প্রণালী বিষয়ে বাঙ্গালায় এইরূপ আর একখানি পুস্তক আছে কি না, তাহা আমরা জানি না।

২। "বঙ্গভাষার ব্যাকরণ শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।"—গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন যে, 'বাঙ্গালায় ব্যাকরণের আর অভাব নাই। অন্যান্য গ্রন্থাদির সংখ্যা যেমন প্রচুর, ব্যাকরণের সংখ্যাও তদনুরূপ।' একথা বিশিষ্টরূপ আলোচনা করিয়াও বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কে কালীপদ বাবু এইরূপ বৃহৎ এক পুস্তক লিখিয়া কেন ক্লিষ্ট হইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। বাঙ্গালা ব্যাকরণের যে সকল কথা, প্রায় সকল ব্যাকরণেই আছে এই পুস্তকে তাহার অতিরিক্ত কোন নূতন কথা আমরা দেখিতে পাইলাম না, এবং যে সকল পুরাতন কথা সকল ব্যাকরণেই থাকা উচিত তাহারও অনেকটাই এই ব্যাকরণে দৃষ্ট হইল না। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিগত বিংশতি বৎসরে নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালা ব্যাকরণে

সেই পরিবর্ত্তের রীতি-প্রকৃতি ভালরূপে প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক। কালীপদ বাবুর ব্যাকরণে তাহার কিছুই হইয়াছে বলিয়া বলা যাইতে পারে না।

৩। "The Gipsy Girl. বেদিয়া বালিকা। (ঐতিহাসিক উপন্যাস।) শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত সঙ্কলিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত।"—যাহারা এদেশে সুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত, তাহাদিগের অনেকেই শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষদিগের অলৌকিক মহিমায় বালকবালিকাগণের পাঠোপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ণে বিরত। এমন স্থলে বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের মত বিচক্ষণ ব্যক্তি যে ঘৃণা লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বালক বালিকার জন্য গ্রন্থ প্রণয়নে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা অতি বড় সুখের কথা। তাঁহার এই 'বেদিয়া বালিকা' যেমন সুপাঠ্য, তেমনি সুখপাঠ্য। বাঙ্গালায় নূতন লেখা যত সহজ, অনুবাদ সকল সময়েই ঠিক্ তত সহজ নহে। অনুবাদের প্রয়োজন-শাসনে এই পুস্তকের ভাষা কোন কোন স্থলে একটু কঠিন হইয়া থাকিলেও নীতি ও রুচি বিষয়ে ইহাতে অনেক উপাদেয় কথা আছে। সুতরাং ইহা অল্পবয়স্কদিগের শিক্ষার জন্য সর্ব্বতোভাবে সুন্দর হইয়াছে।

৪। "কৃষক বালা। অভিনব গীতি কাব্য। ইংলণ্ড-গমন-প্রয়াসি ভিক্ষার্থি-বিরচিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'গোচারণের মাঠের' পর যেসকল ব্যক্তি সংযুক্ত বর্ণ-শূন্য কবিতা লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এই গীতিকাব্য-রচয়িতার ন্যায় আর কেহ এইরূপ সুললিত কবিতা লিখিতে পারিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। এই পুস্তকের সকলগুলি কবিতাই ভ্রমর-গুঞ্জনের ন্যায় মধুর, এবং অনাঘ্রাত কুসুমের ন্যায় পবিত্র। আমরা নিতান্ত প্রলুব্ধ হইয়াই ইহার কতিপয় স্তবক নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এইরূপ কবিতা গৃহে গৃহে নিত্য পঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১

"অতি দূরতম, মালাবার দেশ,—
ভারত-সাগর কূলে।
অমরা জিনিয়া, সুষমা যাহার,
নেহালি নয়ন ভুলে॥
পূরবে অচল, ঘাটগিরি নাম,
অগণিত শৈল শাখা।
শত বন-রাজি, বিরাজিত তায়,
হরিত মাধুরী মাখা॥

২

"নাচিয়া সাগর, পরিছে উরসে,
চারু গাঁথা পোত মালা।
ভেটিবারে তায়, শৈল কোল ছাড়ি,
ধাইছে গিরিজা বালা॥
ঋতু কালাকাল, না বিচারি হেথা,
মেদিনী মধুরে হাসে।
নিদাঘ বরষা, শরত সরসি,
কমল কুমুদ ভাসে॥

৩

"অমরা অমরা,' কে দেখেছে কবে?

অথচ সবাই বলে।
বুঝি বা অমরা, হবে কোন দেশ,
অতুলন ধরাতলে॥
ভূধর সাগর, শোভমান যথা,
যে দেশে বিরাজে নদী।
কে জানে অমরা, কোথায় আবার,
সে দেশে না হবে যদি ?'

* * * *

" অচলে যেমন হিম গিরিবর,
অহি-কুল চূড়া বাসুকী যেমন ;
কৃষক নগরে আছিল তেমনি,
দেবিদাস নামে কৃষক সুজন।
সরল, সদয়, সুধীর সুরূপ,
দেবিদাস সম ছিল না তথায়,
ছিল না তথায় কৃষক তেমতি,
কৃষিবিষয়িণী ভাবি গণনায়॥

২

"গাড়ি, ঘোড়া, হাতী, ছিল না দেবীর,
ছিল না তাহার হীরা মতি হার,
তবুও সে ধনী, আছিল যেহেতু,
জীবিকা সাধন সকলি তাহার।
কৃষক জীবনে যে কিছু বিভব,
মহিষ, গবয়, জোয়াল লাঙ্গল ;
মই, কাচি, ছুরী, কুঠার, কোদালী,
ক্ষেত খোলা ভুঁই আছিল সকল।

৩

"দেউল, দালান, দেউড়ী, দেয়াল ;
আসবাব ছটা ছিল না দেবীর,
আছিল তাহার বাগান, গোয়াল,
শয়ন আগার রশুই কুটীর।
সারি সারি গোলা, পূরিত তাহাতে,
যব, ছোলা, গম, মশূর, মটর ;
থানে থানে সার, পোয়াল বিচালি,
চাষার কি ধন চাহি এর পর ?

৪

"পুথি, পাঠশালা গুরু মহাশয়,
জনমেও চখে হয় নি পতিত,
রসনার আগে তথাপি তাহার,
তেরিজ, বিয়োগ ; মানস গণিত।
অবসর কালে সাঁজের বেলায়,
বসিলে ঘেরিয়া কৃষক সকলে ;
সুখে রামায়ণ ভারতের কথা ;
আ'ড়াইত দেবী কাহিনীর ছলে।"

অনুমানে বোধ হইতেছে যে গ্রন্থকার এই গ্রন্থ বিক্রয়ের অর্থদ্বারা বিলাত যাইবার পাথেয় সংগ্রহ করিতেছেন। কিন্তু বোধ হয় বঙ্গ সাহিত্যে ও বঙ্গ-সমাজে সে সৌভাগ্যের দিন এখনও অনেক দূরে রহিয়াছে।

৫। " নীতিকবিতা। প্রথমভাগ। শ্রীমণ্ডলাবল্ল কর্ত্তৃক প্রণীত।" অধুনা শিশুদিগকে নীতিশিক্ষা দিবার নিমিত্ত যে সকল পুস্তক প্রণীত হইতেছে, আমাদের বিবেচনায় তন্মধ্যে এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি সমাদৃত হইবার যোগ্য। ইহার ভাষা সরল ও শ্রুতিসুখকর, এবং স্থানে স্থানে কবিত্বেরও আভাস আছে। আমরা এই পুস্তকখানিকে পাঠশালায় নিম্নশ্রেণীসমূহে প্রচলিত দেখিলে সুখী হইব। নিম্নে কএকটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।—

"ওহে শিশুগণ, হয়ে সযতন,

বিনয় অভ্যাস কর।
আগ্রহ সহিতে, অহিত চিত্তেতে,
কুটিলতা পরিহর॥
বিনয়ে যেমন, হয় হে সাধন,
প্রয়োজন নানা মত।
বিহনে বিনয়, কভু নাহি হয়,
কার্য্য সিদ্ধি সেই মত॥
প্রভাতে যেমন, উদিলে তপন,
তিমির বিনাশ হয়।
শশী বিলোকনে, চকোরের মনে,
যেইরূপ সুখোদয়॥
বিনয় ভাস্কর, প্রকাশিলে কর,
মানবের হৃদাকাশে।
মূঢ়তা তিমির, হইয়া অস্থির,
অমনি পলায় ত্রাসে॥"

৬। 'পাক্ষিক সমালোচক। সাহিত্য, সমাজ, শিল্প, বিজ্ঞান, অর্থব্যবহার, রাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক পাক্ষিক পত্র ও সমালোচন।" এই পত্রের প্রথম সংখ্যাতে আর্য্যদর্শন ও ভারতী প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে বান্ধবেরও সমালোচন হইয়াছে, সুতরাং আমরা ইহার সমালোচক হইতে পারি কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতে পারে। যদি সমালোচকের সমালোচনা করা অসঙ্গত না হয়, তবে বলিতে পারি যে ইহা একখানি ভাল সাহিত্যপত্র। ইহাতে যে সকল প্রবন্ধ প্রকটিত হইতেছে, তাহা সাধারণতঃ সুচিন্তিত ও সুরচিত, এবং ইহাদ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের উপকারের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ইহার গদ্য প্রবন্ধগুলি যেরূপ প্রশংসার্হ, পদ্য প্রবন্ধগুলি সেরূপ নহে। পাক্ষিক সমালোচক দীর্ঘজীবী হইয়া সমাজে উহার কার্য্য করুক, ইহাই আমাদিগের প্রার্থয়িতব্য।

৭। "কুসুমমালা। মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। বৈশাখ, ১২৯১।" এই খানিও সাহিত্য বিষয়ের একখানি সাময়িক সন্দর্ভ। ইহাতে "চন্দ্রা" নামে একটি উপন্যাস ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। ইহার প্রবন্ধগুলি অপেক্ষা ঐ উপন্যাস অংশটি আমাদের নিকট প্রীতিকর ও মনোহর বোধ হইল। উদ্দেশ্য ও লিখনপ্রণালী বিষয়ে পাক্ষিক সমালোচকের সহিত ইহার অনেক প্রভেদ।

৮। "টৈগেলা ছাত্রসম্মিলনী সভার তৃতীয় বর্ষের কার্য্যবিবরণ। (১২৮৯—৯০)" এই সভাটি আজি তিন বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এবং কার্য্যবিবরণ পাঠে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হইল যে সভা অশেষ বাধা বিঘ্ন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, উজান জলে সাঁতার দিয়া, দেশের কল্যাণকর অনেক বিষয়ে এই অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। এইরূপ হিতকরী সভা দেশহিতৈষী সমস্ত লোকের নিকট হইতেই আদর, উৎসাহ এবং অন্য প্রকারে উপকার পাইবার যোগ্য।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাঙ্গালায় বাণিজ্য

অন্তর্বাণিজ্য।

হিন্দু ও মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশ বাণিজ্যের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিল। যখন মুসলমানগণ ভারতবর্ষে পদার্পণ করে নাই, তখনই বাঙ্গালার বণিকগণ বিস্তীর্ণ অর্ণব পোতে পণ্য সজ্জিত করিয়া সিংহল, জাবা, সুমাত্রা ও পূর্ব্ব উপদ্বীপ সমূহে যাতায়াত করিত; এবং স্থল পথে বিপুল সার্থসমূহ উষ্ট্রপৃষ্ঠে পণ্য বোঝাই দিয়া মগধ, তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যার্থ বহির্গত হইত। মুসলমানদিগের সময়ে এই বাণিজ্যের অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হয়। মুসলমানগণ আপনারা অত্যধিক বাণিজ্যপ্রিয় না হইলেও, বণিকদিগকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন, এবং ভূস্বামীগণকে সময়ে সময়ে বিলুণ্ঠন ও শোষণ করিলেও বণিকদিগকে সর্ব্বপ্রকার আশ্রয় প্রদান করিতেন। মুসলমান-রাজত্ব-সময়ে বাঙ্গালার সহিত ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত সমৃদ্ধ নগরেরই সাক্ষাৎ ভাবে বাণিজ্য ছিল, এবং তুরস্ক, পারস্য, আরব, আর্ম্মেনিয়া প্রভৃতি রাজ্যের সহিত সলাভ বাণিজ্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সজীব বাণিজ্যবলে বাঙ্গালা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল, এবং ইহার প্রজাগণ তাৎকালীন শাসন-প্রণালীর অবশ্যম্ভাবী অত্যাচার সত্ত্বেও পরমসুখে ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আগমনে এই সুখের রাজ্য ছারখার হইয়া যায়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেও পর্ত্তুগিজ, ফরাসী ও ওলন্দাজগণ এদেশে বাণিজ্য করিতেছিল, এবং তাহাদের বাণিজ্যে বাঙ্গালার সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল। বাণিজ্যের যে নিয়ম সকল দেশে ও সকল সময়ে প্রচলিত আছে, তাহারাও সেই নিয়মেই বাণিজ্য করিত। তাহারা স্বদেশ হইতে পণ্য ও মুদ্রা আনয়ন করিয়া তদ্বিনিময়ে উপযুক্ত মূল্যে এদেশজাত পণ্য ক্রয় করিত, এবং অর্ণবপোতে তাহা বোঝাই দিয়া ইউরোপের প্রধান প্রধান বাণিজ্য বন্দরে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও প্রথমে এদেশে আগমন করিয়া অন্যান্য জাতির ন্যায় প্রচলিত নিয়মানুসারে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারাও কেবল মাত্র ইউরোপে রপ্তানি করিবার নিমিত্ত এদেশীয় পণ্য ক্রয় করিত, এদেশের অন্তর্বাণিজ্যে তাহারা কিম্বা তাহা-

দের কোন ভৃত্যবর্গ লিপ্ত হইত না। তা-[illegible] বাণিজ্যে দেশীয় বণিকগণের স্থল-[illegible] জলপথ বাণিজ্যের কোনরূপ বি[illegible] হইত না। যেসকল স্থানে দে[illegible]গণ যাতায়াত করিত না, সেই স[illegible]নেই প্রায় ইউরোপীয়গণ বাণিজ্য করিত। সুতরাং ইউরোপীয় বণিকগণের আগমনে এদেশের এই মঙ্গল হইয়াছিল যে, যেসমস্ত দূরবর্ত্তী প্রদেশের সহিত পূর্ব্বে বাঙ্গালার বাণিজ্য চলিত না, এইক্ষণে তাঁ-হাদের সহিতও বাণিজ্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইল। ইউরোপীয় বণিকগণের প্রসাদাৎ বাঙ্গালার উৎপন্ন দ্রব্যাদি পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিচিত হইল, এবং পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই অর্থ বাঙ্গালার কোষাগারে আ-সিতে লাগিল।

ইউরোপীয় বণিকগণ স্বদেশ হইতে যে পণ্য আনিয়া এদেশে বিক্রয় করিত, সেই বিক্রয় মূল্য দ্বারা, ইউরোপীয় রপ্তানির জন্য যে পণ্য ক্রয় করিতে হইত তাহা কুলা-ইত না বলিয়া, স্বদেশ হইতে তাহাদিগকে নগদ মুদ্রা আনিতে হইত। এইরূপ প্রত্যেক বৎসর বিভিন্ন দেশ হইতে যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা বাঙ্গালায় আনীত হইত, ডাউ সাহেব তৎকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার নি-ম্নলিখিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। *

ওলন্দাজগণ ......,.....৩০,০০,০০০৲ টাকা
ইংরেজ................. ১০,৩৬,০০০৲
ফরাশী, দিনামার ও
পর্ত্তুগিজ .... ২০,০০,০০০৲
আরব, পারস্ত, তুরস্ক,
জর্জ্জিয়া, আরমেনিয়া
আসিয়ামাইনর প্রভৃতি৩০,০০,০০০৲
ব্রহ্ম, মালয়, চীন, ও
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ...১২,০০,০০০৲
হিন্দুস্থান ও আসাম ... ২০,০০,০০০৲
করমণ্ডল ও মালাবারের
উপকূল বাণিজ্য ১২,৮০,০০০৲

মোট ১,৪৩,১৬,০০০৲ †

উল্লিখিত হিসাব দৃষ্টে উপলব্ধি হইবে যে যত দেশের সাহিত বাঙ্গালার বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল, প্রত্যেক দেশের উপর বাঙ্গা-লার দায়ধারা ছিল, অর্থাৎ প্রত্যেক দেশে-রই Balance of trade বাঙ্গালার অনুকূলে ছিল। বিদেশবাণিজ্যের দরুণ বিভিন্ন দেশ হইতে প্রতি বৎসর ১,৪৩,১৬,০০০৲ টাকা বাঙ্গালা প্রদেশ মুনাফা করিত। বাঙ্গালা হইতে বাণিজ্যের দরুণ কোন মুদ্রা বিদেশে যাইত না; কেবল রাজস্ব স্বরূপে দিল্লীর সম্রাটকে বৎসর বৎসর ১

* ডাউ হিসাব পাউণ্ডে হিসাব ধরি-য়াছেন,আমরা তাহা টাকায় প্রদর্শন করি-লাম। তখন টাকার মূল্য ২৷৷০ শিলিং ছিল, এক্ষণে উহা কমিতে কমিতে ১ শিলিং ৮ পেন্স, মাত্র হইয়াছে। অর্থাৎ তখন ১ পা-উণ্ডের দাম ৮ টাকা ছিল, এক্ষণ ১২ টাকা হইয়াছে।

† বার্ক অনুমান করেন যে শুদ্ধ এক ইউরোপ হইতে যে মুদ্রা বাঙ্গালায় আসিত তাহারই পরিমাণ ১১০ কোটির অধিক হইবে।

কোটী করিয়া টাকা দিতে হইত। সুতরাং

বাঙ্গালায় আনীত মুদ্রা...	১,৪৩,৬০,০০০টাঃ
বাঙ্গালা হইতে দিল্লীতে প্রেরিত মুদ্রা	১,০০,০০,০০০ টাঃ
অবশিষ্ট	৪৩,৬০০০০ টাঃ

দেখা যাইতেছে যে বাঙ্গালা হইতে যেমন বৎসর বৎসর ১ কোটি করিয়া টাকা দিল্লীতে পাঠাইতে হইত, তেমন বাণিজ্যের দরুণ ১,৪৩,৬০,০০০ টাকা প্রতি বৎসর বাঙ্গালায় আনীত হইত। এবং এই উভয় টাকা কাটাকাটি করিয়াও বাঙ্গালা প্রদেশের ধন সমষ্টিতে প্রতি বৎসর ৪৩,৬০,০,০০ টাঃ করিয়া বৃদ্ধি পাইত।

১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রচলিত নিয়মানুসারে বাণিজ্য করিতে থাকে। ঐ সন হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়া বাঙ্গালার বাণিজ্যশ্রী বিনাশ করিয়া ফেলে। উক্ত সনে দিল্লীশ্বর ফিরোকসিয়রের কন্যা কোন এক উৎকট ব্যাধিতে পীড়িত হন, এবং দেশীয় চিকিৎসকগণ অপারগ হইলে হেমিল্টন নামক একজন ইংরেজ বৈদ্য চিকিৎসা করিয়া সম্রাটকন্যাকে রোগমুক্ত করেন। হেমিল্টন পুরস্কার স্বরূপে অন্যান্য অনুগ্রহের মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য এই এক অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন যে, কোম্পানীর যেসকল মাল এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইবে,সেই সকল মালের উপর কোন শুল্ক গ্রহণ করা হইবে না। দিল্লীশ্বর এই মর্ম্মে উক্ত প্রার্থনা মঞ্জুর করেন যে, কোম্পানীর যে সকল মালের সঙ্গে কোম্পানীর অধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত দস্তক থাকিবে তাহার উপর শুল্ক গ্রহণ করা হইবে না, এবং বাঙ্গালার নবাবের উপরও উক্ত মর্ম্মে এক পরওয়ানা জারি হয়। সম্রাটের সহিত কোম্পানীর এইরূপ চুক্তি হইল যে কোম্পানীর অধ্যক্ষ কেবল রপ্তানি ও আমদানী মালের জন্য দস্তক স্বাক্ষর করিবেন। শুল্কের দারোগা সেই দস্তক দেখিলেই মাল ছাড়িয়া দিবেন। এই অনুগ্রহ লাভেরপর ইউরোপের অন্যান্য বণিকগণ হইতে ইংরেজদিগের বাণিজ্য-বিষয়ে বিশেষ সুবিধা হইল। ওলন্দাজ ফরাসী প্রভৃতি বণিকদিগকে তাহাদিগের পণ্যাদির নিমিত্ত শত করা প্রায় ৮। ৯ টাকা শুল্ক দিতে হইত। ইংরেজগণ সেই শুল্ক হইতে অব্যাহতি পাওয়াতে তাহারা ইউরোপের অন্যান্য বণিক হইতে অল্প মূল্যে এদেশে জিনিস বিক্রয় করিতে পারিত, এবং এদেশে জিনিস ক্রয় করিয়া অল্পব্যয়ে তাহা ইউরোপে রপ্তানি করিতে পারিত। কিন্তু এই অনুগ্রহ লাভের ফল যদি ইহাতেই নিবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে আমাদিগের বেশী কিছু আসিত যাইত না। সম্ভবতঃ কালে ক্রমে ক্রমে ইউরোপের অন্যান্য জাতির বাণিজ্য ইংরেজ কোম্পানীর হস্তে গড়াইয়া পড়িত, এই মাত্র। কোম্পানীর অধ্যক্ষ যদি সততার সহিত এই অনুগ্রহের ব্যবহার করিত, তাহা হইলেও আমাদের অনিষ্টের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কোম্পানী শুদ্ধ আমদানী ও রপ্তা-

নির কার্য্য করিত ; শুদ্ধ সেই আমদানী ও রপ্তানির মালের উপর শুল্ক রহিত হইলে দেশীয় বণিকগণের কোনপ্রকার ক্ষতি কিংবা অসুবিধা হইত না। কারণ কোম্পানী যেসকল মাল আমদানী করিত, ও যেসকল স্থানে রপ্তানী করিত, দেশীয় বণিকগণ সেই সকল মাল আমদানী করিত না, এবং সেই সকল স্থানে বাণিজ্য করিত না। কিন্তু কোম্পানীর অধ্যক্ষ অনুগ্রহ প্রাপ্তির কিয়ৎকাল পর হইতেই প্রতারণা ও প্রবঞ্চনাদ্বারা উহার অসদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ নিজেরা কোম্পানীর নাম দিয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাহাদের পণ্যও কোম্পানীর অধ্যক্ষের দস্তক দেখাইয়া বিনা শুল্কে যথায় ইচ্ছা তথায় নীত হইতে লাগিল। কোম্পানীর ভৃত্যগণ এই চাতুরী অবলম্বন করিয়া দেশীয় বণিকগণের সমগ্র বাণিজ্য একেবারে গ্রাস করিয়া বসিল। কোম্পানীর অধ্যক্ষ ভৃত্যদিগের এবম্বিধ কার্য্যে অসন্তোষ প্রকাশ করা দূরে থাকুক, সে নিজেও ঐ বাণিজ্যে যোগ প্রদান করিল, এবং কোম্পানীর নামে দস্তক স্বাক্ষর করিয়া ভৃত্যদিগের পণ্য দ্রব্যও শুল্ক হইতে মুক্ত করিতে লাগিল। যদিও সম্রাটের সহিত কোম্পানীর এই প্রকার চুক্তি ছিল যে, কোম্পানীর অধ্যক্ষ কেবল কোম্পানীর রপ্তানি ও আমদানির মালের জন্য দস্তক স্বাক্ষর করিবেন ; কিন্তু অধ্যক্ষ নিতান্ত অসাধুতা অবলম্বন করিয়া ভৃত্যবর্গের পণ্যের জন্যও দস্তক স্বাক্ষর করিতে লাগিলেন। ভৃত্যগণ এই সুবিধা পাইয়া বাঙ্গালার তাবৎ অন্তর্বাণিজ্য দখল করিয়া বসিল ; এবং জল পথে দেশীয় বণিকগণ যেসকল স্থানে বাণিজ্য করিত, সেই সমস্ত স্থানেও তাহারা বাণিজ্য খুলিতে লাগিল। দেশীয় বণিকগণ তাহাদের পণ্যের জন্য শুল্ক প্রদান করিত ; কোম্পানীর ভৃত্যগণ কোম্পানীর দস্তক দেখাইয়া শুল্ক হইতে অব্যাহতি পাইত। কাজেই দেশীয় বণিকগণ কোম্পানীর ভৃত্যগণের সহিত বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন প্রকারেই টিকিতে পারিত না।

নবাব জাফরখান দেখিলেন যে যদি কোম্পানীর ভৃত্যগণ শুল্ক হইতে অব্যাহতি পাইয়া অন্তর্বাণিজ্য করিতে পারে, তাহা হইলে দেশীয় বাণিজ্য একেবারে বিলুপ্ত হইবে, এবং দেশীয় বণিকগণের সর্ব্বনাশ হইবে। এই জন্য তিনি আদেশ করিলেন যে অন্তর্বাণিজ্যের জন্য যে সকল পণ্য বাহিত হইবে, তাহা কোম্পানীর অধ্যক্ষের দস্তক প্রদর্শিত হইলেও ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না, এবং তাহার উপর প্রচলিত হারে শুল্ক গৃহীত হইবে। যে সকল পণ্য জলপথে বাহিত হইত, তাহার কোন্‌গুলি কোম্পানীর কোন্‌গুলি কোম্পানীর ভৃত্যের তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর বলিয়া উক্ত পণ্য সম্পর্কে নবাব কোন আদেশ প্রচার করা উচিত মনে করিলেন না। এই আদেশের পর কোম্পানীর ভৃত্যগণ অন্তর্বাণিজ্য এক প্রকার পরিত্যাগ করিল, এবং যেহেতু জল বাণিজ্যে এক্ষণও তাহারা কো-

ম্পানীর অধ্যক্ষের দস্তক দেখাইয়া শুল্ক এড়াইতে পারিত, সুতরাং তাহারা তাহাদের তাবত মনোযোগ জলবাণিজ্যের উপর নিক্ষেপ করিল। ফল হইল এই যে পূর্ব্বে যেসকল পণ্য হিন্দু ও মুসলমান বণিকগণ দ্বারা দেশীয় অর্ণবপোতে বিদেশে রপ্তানি হইত, এক্ষণে তাহা ইংরেজদিগের অর্ণবপোতে ইংরেজ বণিকদ্বারা রপ্তানি হইতে আরম্ভ হইল। দেশীয় বণিকগণের জলপথে বাণিজ্য এই প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। বাঙ্গালার বাণিজ্যের অধঃপাতের এই সূত্রপাত হইল।

যখন ইংরেজগণের বাঙ্গালায় অবস্থান অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিত, তখনই যদি ইহারা বাঙ্গালার অর্থ এই প্রকার শোষণ করিতে পারিয়াছিল, তবে যখন তাহারা কার্য্যতঃ বাঙ্গালার প্রভু হইল, তখন সেই শক্তি আরও কতদুর বর্দ্ধিত হইয়াছিল, সহজেই তাহা অনুমিত হইবে। বস্তুতঃ পলাসীযুদ্ধের পর কোম্পানী বাঙ্গালার সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা হইলে, কোম্পানির ভৃত্যবর্গের উৎপীড়ন ও অত্যাচারের আর অবধি রহিল না। অহিফেন-খোর, বিশ্বাসঘাতক মিরজাফর কোম্পানীর নিশ্বাস-বায়ুতে টলমল করিত, প্রজাদিগকে রক্ষার জন্য কোম্পানীর ভৃত্যদিগের বিরুদ্ধে মুখব্যাদান করিতেও কোন প্রকারে তাহার সাহস জন্মিত না। বরং রাজসিংহাসনে বসিবার লোভে সে কোম্পানীকে বার্ষিক যে ৫ লক্ষ করিয়া টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, নিজের বিলাসিতা হইতে উদ্বর্ত্ত করিয়া তাহা পরিশোধে অক্ষম হওয়াতে ঐ টাকার জন্য প্রজার উপর অশেষবিধ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। একদিকে নবাবের অত্যাচারে কৃষক ও জমীদার ব্যাকুল, অপরদিগে কোম্পানির ভৃত্যবর্গের অত্যাচারে বণিকগণ ব্যতিব্যস্ত। এই সময়ে বঙ্গের অবস্থা অনুমান করা যত সহজ, বর্ণনা করা তত সহজ নহে। এই দুরবস্থায়ও মিরজাফরের চৈতন্য হওয়া দূরে থাকুক, ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন অযোধ্যার সুবাদার ও মহারাষ্ট্রীয়গণ বাঙ্গালা আক্রমণ করিবার উপক্রম করে, তখন মিরজাফর ইংরেজদিগের সাহায্য লাভের জন্য কোম্পানিকে সোরার একচেটিয়া ব্যবসায় করিতে অনুমতি দিলেন। ইউরোপে যে সকল পণ্য রপ্তানি হইত, তন্মধ্যে সোরা একটী প্রধান পণ্য ছিল। উহা তাবত বাঙ্গালায় জন্মাইত, এবং বহুদেশীয় বণিক উহা উৎপাদন ও বিক্রয়দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কোম্পানি ইহার একচেটিয়া গ্রহণ করিলে, এই উপলক্ষে বহু লোকের সর্ব্বনাশ হইল। শুধু তাহাই নহে; মিরজাফরের পরবর্ত্তী নবাব মির কাসেমের এক ভৃত্য নবাবের নিজ ব্যবহারের জন্য কোম্পানির অনুমতি ব্যতিরেকে কিয়ৎপরিমাণ সোরা ক্রয় করিয়াছিল। কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ অমনি তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় লইয়া গেল। সেই ভৃত্য প্রকৃত অপরাধী কিনা, যে নবাব একচেটিয়া দেওয়া না দেওয়ার কর্ত্তা, তাঁহার উহাতে কোন

স্বত্ব আছে কি না, কেহই তাহার অনুসন্ধান করিল না, কেহ বলিতে লাগিল উহাকে বেত লাগাও, কেহ বলিতে লাগিল উহার কাণ কাটিয়া দাও। অবশেষে এই প্রকার অনেক তর্ক বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত হইল যে, দেশীয় আইনের সম্মান রক্ষা করিয়া, শাস্তির জন্য উহাকে নবাবের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া যাউক। এইরূপ কোম্পানীর ব্যবসায়ের দরুণ পদে পদে অত্যাচার হইতে লাগিল। কিন্তু কোম্পানীর নিজ ব্যবসায়ে প্রজার উপর যত না অত্যাচার হইত, কোম্পানীর ভৃত্যদিগের ব্যবসায়ে তাহার শতগুণ অত্যাচার হইত। পূর্ব্বে তাহারা কোম্পানীর অধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত দস্তক দেখাইয়া শুল্ক হইতে অব্যাহতি পাইত। কিন্তু বঙ্গে কোম্পানীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, সেই আধিপত্যই দস্তকের কার্য্য করিত। ইংরেজগণ বাণিজ্যের জন্য মফঃস্বলের স্থানে স্থানে কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া থাকিত, এবং প্রত্যেক কুঠিতেই সিপাহী ও লাঠিয়াল নিযুক্ত থাকিত। সাহেবের দেওয়ান, গোমস্তা কিম্বা সরকার পণ্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পণ্য পাঠাইতে হইলে একজন বা ততোধিক সিপাহীর জিম্বায় পাঠান হইত। যদি কোন শুল্কের দারোগা দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ পণ্য বহনে বাধা দিয়া শুল্ক দাবি করিত, তাহা হইলে অমনি সাহেব সিপাহী ও লাঠিয়াল পাঠাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনিত, এবং হয় প্রহার না হয় অন্ধকূপে কয়েদ রাখিয়া তাহার দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রদান করিত। শুধু তাহাই নহে, সাহেবের গোমস্তাগণ তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী মূল্যে জিনিস ক্রয় করিত, এবং ইচ্ছানুযায়ী মূল্যে জিনিস বিক্রয় করিত। মনুষ্যজীবনের যে সকল জিনিশ অবশ্য প্রয়োজনীয়, সাহেবগণ তাহারই ব্যবসায় করিত। ধান, চাউল, তৈল, লবণ, পান, শুপারি, মৎস্য, চুন, তামাক, বাঁশ, বেত, খর প্রভৃতি বাঙ্গালির নিত্য ব্যবহার্য্য সমস্ত জিনিসই সাহেবদিগের একচেটিয়ার ন্যায় হইয়াছিল; কারণ দেশীয় বণিকগণ বাজারে ঐ সকল জিনিন ক্রয় বিক্রয় করিতে সাহস পাইত না; সাহেবগণ ইচ্ছানুযায়ী মূল্যে ক্রয় বিক্রয় করিত। সাহেবদিগের এই বাণিজ্যে বাঙ্গালীর কিরূপ সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা অনাবশ্যক। এ দেশের কৃষক এবং নিম্নশ্রেণীস্থ অপরাপর সমস্ত ব্যক্তিগণই ঐ সকল জিনিসাদিতে বাণিজ্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; সেই বাণিজ্য লোপ হইয়া যাওয়াতে নিম্নশ্রেণীর আয়ের পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইল; আবার ঐ সকল জিনিস সাহেবগণ ইচ্ছানুযায়ী মূল্যে বিক্রয় করিতেন, স্থতরাং উহা ক্রয় করিতেও অল্প লোকেরই সামর্থ্য হইত। ব্যবসায়ীগণ ইংরেজ-ভয়ে বাজারে যাওয়া বন্ধ করিয়া, ঘরে বসিয়া ক্রয় বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ইংরেজের প্রাণে ইহাও সহ্য হইল না। ইংরেজ উৎপন্নকারীকে কিঞ্চিৎ দাদন দিয়া সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের উপরই স্বত্ব দাবি করিতে

লাগিল। মনে কর কোন ইংরেজ তৈলীকে কিঞ্চিৎ অগ্রিম টাকা দিয়া তাহার সঙ্গে এইরূপ চুক্তি করিল যে ৫টাকা মণ দরে তাহাকে এক বৎসরে ১০০ মণ তৈল যোগাইতে হইবে। হয়ত তখন তৈল ১০টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছিল। হয়ত এক বৎসরে ৫০ মণের অধিক তৈল জন্মান অসম্ভব। কিন্তু চুক্তি অস্বীকার করিবে কাহার সাধ্য? অস্বীকার করিলে তাহাকে প্রহার করিয়া, কয়েদ করিয়া, তৈজসপত্র বিক্রয় করিয়া, এবং স্ত্রীপুত্র তাড়াইয়া দিয়া তাহার ভিটায় সর্ষপ বুনিয়া দিত। তৈলী চুক্তি গ্রহণ করিল, সে বৎসরে এত মণ তৈল দিবে, এ তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য সমস্ত বৎসর তাহাকে অর্দ্ধাহারী হইয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া ইংরেজের খাটনী খাটিতে হইত। যে পর্য্যন্ত চুক্তির তৈল ইংরেজকে না বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত উহার এক ছটাকও কাহার নিকট বিক্রয় করিবার যো নাই। এবং যে হেতু চুক্তির পরিমাণ তৈল এক বৎসরে উৎপন্ন করিয়া দিতে সে অক্ষম সুতরাং গৃহে বসিয়া কোন দিনও কাহার নিকট কিছু বিক্রয় করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। এইরূপে ধান, চাউল, লবণ, তামাক, পান, শুপারি, মৎস্য, বাঁস, বেঁত প্রভৃতি যাহা কিছু দেশে উৎপন্ন হইত সমস্তই অর্দ্ধমূল্যে ইংরেজের কুঠিতে প্রবেশ করিত। এবং সেইখান হইতে ত্রিগুণ মূল্যে যাহার শক্তি থাকিত সে তাহা ক্রয় করিয়া নিত; যাহার শক্তি না থাকিত সে অনাহারে মরিয়া যাইত। এইরূপ কোম্পানীর ভৃত্যগণ অন্তর্বাণিজ্যদ্বারা দেশীয় বাণিজ্য একেবারে বিলুপ্ত করিল, লোকসমূহকে অনাহারে মারিতে লাগিল, এবং যাহার ঘরে যাহা ছিল, সর্ব্বস্ব শোষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে ইংরেজগণ এইরূপ অত্যাচার করিত, দেশে কি রাজা ছিল না? বস্তুতঃ দেশের অবস্থা তখন এই ছিল যে, ইংরেজগণই প্রকৃত রাজা, অথচ রাজার দায়িত্ব তাহাদিগের ছিল না। নবাবের নিযুক্ত বিচারকগণ ইংরেজের বিচার করিত পারিত না; কোন ইংরেজ কলিকাতার সীমার মধ্যে অপরাধ করিলে মেয়র কোর্টে তাহার বিচার হইত বটে; কিন্তু কলিকাতার বাহিরে অপরাধ করিলে ভারতবর্ষে তাহার বিচার হইতে পারিত না। যদি ইংরেজের নামে কাহারও মোকদ্দমা চালাইবার ইচ্ছা হইত, তবে তাহাকে ইংলণ্ডে বিচারের ব্যয় বহন করিতে হইত। এ অবস্থায় কোন ইংরেজের বিরুদ্ধেই কেহ মোকদ্দমা করিতে সাহসী হইত না; নীরবে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিত। ইংরেজের দেশীয় কর্ম্মচারী গণের বিচার নবাবের বিচারালয়েই হইতে পারিত বটে, কিন্তু ইংরেজের ভয়ে কোন বিচারকই তাহাদিগকে দণ্ড করিতে সাহস পাইত না। ইংরেজ তাহার কর্ম্মচারীকে কোন বিচারক দণ্ডিত করিয়াছে শুনিলে হয়ত সেই বিচারককে গ্রেপ্তার করিয়া আনিত, এবং তাহার চতুর্গুণ দণ্ড

করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিত। ইংরেজ কোন গ্রামে পদার্পণ করিলে সে গ্রামে লোক থাকিত না; ইংরেজের গোমস্তা কোন বাজারে গেলে, সে বাজার শূন্য হইয়া যাইত। প্রত্যেক ইংরেজ এক একটি প্রবল রাজা ছিল, কে তাহাদের ইচ্ছার প্রতিরোধ করে?

মিরকাশেম নবাবের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া দেশের এই দুরবস্থা দৃষ্টে মর্ম্মাহত হইলেন। যে দিকে দৃষ্টি করেন, কেবল ইংরেজের অত্যাচার ও প্রজাদিগের হাহাকার। বাণিজ্য ব্যবসায় বন্ধ, সুতরাং শুল্ক আদায় হয় না; প্রজাগণ অন্নাভাবে ক্লিষ্ট, সুতরাং রাজস্ব তহশীল হয় না, তাঁহার রাজকোষ শূন্য, অথচ কোম্পানীর নিকট তাহার যে দেনা আছে, তাহার পুনঃ পুনঃ দাবিতে ব্যতিব্যস্ত। তিনি দেখিতে পাইলেন যে কোম্পানীর অন্তর্বাণিজ্যই এই সমস্ত বিশৃঙ্খলার মূলীভূত কারণ। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ্চ তিনি কোম্পানীর গবর্ণরের নিকট নিম্ন লিখিত মর্ম্মে একখানি চিঠি লিখেন:—

"কলিকাতার কুঠি হইতে কাশিমবাজার, পাটনা এবং ঢাকা পর্য্যন্ত ইংরেজগণ তাহাদের গোমস্তা কেরাণী এবং দালাল লইয়া প্রত্যেক জিলায় তহশীলদার জমীদার ও ফৌজদারের কার্য্য করিতেছে; এবং কোম্পানীর নিশান তুলিয়া দিয়া আমার কর্ম্মচারীগণকে কোন কর্ম্ম করিতে দিতেছে না। এতদ্ব্যতিরেকে, তাহাদিগের গোমস্তাগণ, প্রত্যেক জিলায়, প্রত্যেক গ্রামে ও বাজারে তৈল, মৎস্য, খর, বাঁশ, চাল, ধান, শুপারি ও অন্যান্য জিনিসের বাণিজ্য করিতেছে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই কোম্পানীর এক এক দস্তক হাতে করিয়া নিজকে নিজে স্বয়ং কোম্পানী মনে করিতেছে।

ঐ সনের ২৫শে মে, নবাব বাখরগঞ্জ জিলার এক কর্ম্মচারী হইতে নিম্ন-লিখিত পত্র খানি প্রাপ্ত হনঃ—

"এই স্থানের অবস্থা যেরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আমার কর্ত্তব্য বিষয়ে হুজুরের আদেশ পুনরায় গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমি এখানে এই হুকুম লইয়া আসিয়াছিলাম যে যদি কোন ইউরোপীয় কোন অন্যায় কার্য্য করে, তবে তাহার কোন ওজর আপত্তি না শুনিয়া তাহাকে একেবারে কলিকাতা চালান করিব। এই হুকুমের করাকরি সত্ত্বেও আমি সাহেবদিগের গোমস্তাগণকে নানারূপ প্রবোধ দিয়া ন্যায়ানুযায়ী কার্য্য করাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই। এমন কি, ঐ গোমস্তাগণ আমার কথা শুনা দূরে থাকুক, উহারা আমার নামে তাহাদের স্বস্ব মনিবের নিকট এই বলিয়া দোষারূপ করিয়াছে যে, আমি উহাদিগকে কার্য্যে বাধা জন্মাই এবং উহাদিগের সহিত অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করিব। সাহেবগণ তাহাদের গোমস্তার কথা শুনিয়া আমাকে এই বলিয়া ধমকাইয়া চিঠি লিখিয়াছে যে আমি যদি উহাদিগের কার্য্যে

বাধা জন্মাই, তাহা হইলে তাহারা এইরূপ উপায় অবলম্বন করিবে যাহাতে আমাকে পশ্চাতে অনুতাপ করিতে হইবে। তাহারা শুধু এই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। তাহাদের গোমস্তাগণ সমস্ত জিলায় এইরূপ রটাইয়া দিয়াছে যে আমি যদি তাহাদিগকে প্রতিবন্ধক দেই তবে তাহারা আমাকে আচ্ছা জব্দ করিবে। আমি এই কথার বিশিষ্ট প্রমাণ দিতে পারিব। আমি কিসে তাহাদের প্রতিবন্ধক জন্মাইয়াছি, এক্ষণে তাহা নিবেদন করিতেছি। এই জেলায় পূর্ব্বে জমকাল বাণিজ্য ছিল, কিন্তু নিম্নলিখিত কারণে সেই বাণিজ্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। কোন সাহেব তাহার গোমস্তাকে কোন জিনিস খরিদ কিম্বা বিক্রয় করিতে পাঠাইলেন। গোমস্তা অমনি প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট জোর করিয়া জিনিস বিক্রয় বা ক্রয় আরম্ভ করিল। যদি গোমস্তার ইচ্ছানুযায়ী মূল্যে ক্রয় কিম্বা বিক্রয় করিতে কেহ অপারগ হয়, গোমস্তা অমনি তাহাকে ধরিয়া প্রহার করে, কিম্বা কয়েদ করিয়া রাখে। গোমস্তা শুধু ইচ্ছানুযায়ী জিনিস ক্রয় করিয়া সন্তুষ্ট হয় না। সে যে জিনিসের বাণিজ্য করিতে আসিয়াছে, সেই জিনিসে অন্য কাহাকেও সে বাণিজ্য করিতে দিবে না; এবং যদি কোন গ্রাম্য লোক ভুলক্রমেও সেই জিনিস ক্রয় বিক্রয় করে, গোমস্তা অমনি তাহাকে ধরিয়া প্রহার করিতে থাকে, কিম্বা কয়েদ করিয়া রাখে। আবার যে জিনিস ক্রয় করিল, তজ্জন্য সে অন্য হইতে অনেক কম মূল্য দিয়াই মনে করিল যে বিক্রেতাকে যথেষ্ট দেওয়া হইয়াছে। অনেককে মূল্য দেওয়াই হয় না। এবং আমি যদি ইহার উপর কোন কথা বলিতে যাই, অমনি আমার উপর তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ হয়; এইরূপ প্রত্যহ অত্যাচার হওয়াতে লোকসমূহ জেলা ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছে। পূর্ব্বে সরকারি কাছারীতে বিচার হইত, এইক্ষণে প্রত্যেক গোমস্তাই এক এক বিচারক। তাহারা জমীদারদিগকেও দণ্ড প্রহার করে, এবং অনিষ্টের ছল করিয়া তাহাদিগেরও অর্থ শোষণ করিয়া থাকে।"

মিরকাশেম দেখিলেন যে এইরূপ অবস্থায় রাজ্য করা অপেক্ষা না করাও ভাল। তিনি কোম্পানীর গবর্ণরের নিকট পুনঃ পুনঃ চিঠি লিখিতে লিখিতে অবশেষে গবর্ণর ভান্সিটার্ট তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়ে অনেক তর্ক বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত হইল যে, কোম্পানীর ভৃত্যগণ নিজনামে যে বাণিজ্য করিবে, তজ্জন্য প্রচলিত নিয়মানুযায়ী তাহারা নবাবকে শুল্ক প্রদান করিবে। এই শুল্কের হার শত করা ৯ টাকা ধার্য্য হইল। মিরকাশেম বলিল যদ্যপি কোম্পানীর ভৃত্যগণ এই শুল্ক দিতে অস্বীকৃত, তবে তিনি আপন প্রজাদিগের নিকটও শুল্ক গ্রহণ করিবেন না; কারণ ইহাতে রাজস্বের ক্ষতি হইলেও প্রজাগণ বাণিজ্য বিষয়ে সমান অধিকার ও সুবিধা লাভ করিতে পারিবে। এইরূপ যুক্তি এবং এইরূপ স-

ক্ষম যদিও নবাবের মহত্তের পরিচয় দেউক, তথাপি ইহা কার্য্যে পরিণত হইলেও যে বিশেষ ফল হইত তাহা বোধ হয় না। যদি দেশীয় বণিকগণ বাণিজ্য করিতে পারিত, তবে শুল্ক উঠাইয়া দিলে তাহারা ইংরেজ বণিকের সমকক্ষ ভাবে ব্যবসায় চালাইতে সক্ষম হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংরেজের দৌরাত্মে দেশীয় বণিকগণ একেবারেই বাণিজ্য করিতে যাইত না। সুতরাং শুল্ক থাকিলেও যে কথা, না থাকিলেও প্রায় সেই কথাই ছিল। সে যাহাহউক ভান্সিটার্ট নবাবের সহিত যে চুক্তি করিয়া গেলেন, তাঁহার কৌন্সিলের মেম্বরগণ তাহার কথা শুনিয়া তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা বলিতে লাগিল, 'আমরা যদি নবাবকে কোন শুল্ক দেই তবে তাহা অনুগ্রহ করিয়া দিব, আমাদের উপর তাঁহার কোন দাবি খাটিবে না। আমরা তাঁহাকে একমাত্র লবণের উপর শতকরা ২॥০ টাকা শুল্ক দিব ; অন্য কোন জিনিসের উপর শুল্ক দিব না। আমরা লবণের উপর যে শতকরা ২॥০ টাকা শুল্কদিব, নবাব তৎপরিবর্ত্তে এই নিয়মে আবদ্ধ হইবেন যে আমাদের কোন কর্ম্মচারী কোন অপরাধ করিলে তাঁহার নিযুক্ত বিচারক তাহার বিচার করিতে পাইবে না, আমরা তাহার বিচার করিব।' নবাব এই আশ্চর্য্যজনক প্রস্তাবে কোন মতেই স্বীকৃত হইলেন না। তিনি ভান্সিটার্টের চুক্তি অনুসারে ইংরেজ বণিকের নিকট শতকরা ৯ টাকা শুল্ক গ্রহণ করিবার জন্য পরওয়ানা জারি করিলেন। ইংরেজ বণিকগণ তাহা দিতে অস্বীকৃত হইল। বেগতিক দেখিয়া নবাব আপন প্রজাদিগের প্রতি শুল্ক রহিত করিয়া দিলেন। কৌন্সিলের মেম্বরগণের এক্ষণে আর ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। তাহারা বিবিধ ভয় প্রদর্শন করিয়া নবাবকে লিখিল যে "আপনি আপনার প্রজার প্রতি কোন প্রকার শুল্ক রহিত করিতে পারিবেন না।" কে কবে এইরূপ স্বার্থপূর্ণ প্রস্তাব শ্রবণ করিয়াছে ? কেই বা ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে ? অথচ এই প্রস্তাবে নবাব কাশিমআলি সম্মত হইল না বলিয়াই তাঁহাকে বঙ্গের সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে হয়। উভয়পক্ষে ঘোরতর মনোবিবাদ উপস্থিত হইল। কোম্পানী বৃদ্ধ মিরজাফরের সঙ্গে পুনরায় ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিল। হতজ্ঞান মিরজাফর রাজ্যলোভে উন্মত্ত, পূর্ব্ব রাজত্বের লাঞ্ছনায় তাঁহাকে কিছুই শিক্ষা দেয় নাই। সে বিনা বাক্যব্যয়ে কোম্পানীর তাবৎ প্রস্তাবে সম্মত হইল। "কোম্পানীর ভৃত্যগণ একমাত্র লবণের উপর শতকরা ২॥০ টাকা শুল্ক দিবে, অন্য কোন জিনিসের উপর শুল্ক দিবে না। নবাবের নিজ প্রজাদিগের উপর পূর্ব্বপ্রচলিত শুল্ক বজায় থাকিবে, তাহা রহিত কিম্বা হ্রাস হইতে পারিবে না।" অবশেষে মির কাশেম সিংহাসন রক্ষা করিবার জন্য একবার প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখিলেন ; বক্সার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাঙ্গালা হইতে পলায়ন করিলেন। কোম্পানী জড়পিণ্ড মিরজাফ-

রকে ধরাধরি করিয়া সেই সিংহাসনে বসাইল।

১৭৬৫ সনে ক্লাইব দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং কোম্পানী বাঙ্গালার দেওয়ানী প্রাপ্ত হয়। বাঙ্গালার প্রজাদিগের দুরবস্থা ও কোম্পানীর ভৃত্যদিগের অত্যাচার কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের কর্ণে প্রবেশ করিতে অবশিষ্ট রহে নাই। তাহারা ক্লাইবকে স্পষ্ট উপদেশ দিয়া প্রেরণ করিল যে ক্লাইব ভারতবর্ষে আসিয়াই যেন ভৃত্যগণের অন্তর্বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু তিনি নিজে লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া উক্ত সনেই লবণের এক ইজারা গ্রহণ করেন। ডিরেক্টরগণ কোম্পানীর কলিকাতাস্থ কৌন্সিলের নিকট বিশেষ তাড়া দিয়া এক চিঠি লিখেন যে কোম্পানীর ভৃত্যগণ যেন কোন প্রকারেও অন্তর্বাণিজ্যে লিপ্ত না হয়। কিন্তু কৌন্সিলের মেম্বরগণ নিজেরাই উক্ত বাণিজ্যের লাভালাভের অংশী ছিল, সুতরাং উক্ত আদেশ প্রতিপালন করিতে সহসা তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মিল না। অথচ ডিরেক্টরগণের স্পষ্ট আদেশ কিরূপেই বা তাঁহারা লঙ্ঘন করেন? অবশেষে অনেক চিন্তার পর ১৭৬৫ সনের ১০ই আগষ্ট এক সভা হইয়া স্থিরীকৃত হয় যে, কোম্পানীর ভৃত্যগণ আর স্বনামে কোন বাণিজ্য করিবে না; কিন্তু তাহাদের ইহাতে যে ক্ষতি হইবে, সেই ক্ষতি পূরণের জন্য লবণ, সুপারি ও তামাক এই তিন দ্রব্য ১ বৎসরের নিমিত্ত একচেটিয়া হইবে; কোম্পানীর উর্দ্ধতন ভৃত্যগণ এই একচেটিয়ার লাভ প্রাপ্ত হইবেন। এই একচেটিয়া ব্যবসায়ের পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত চারিজন সভ্যের এক কমিটি থাকিবে। মোট যত মুনাফা হইবে, কোম্পানী তাহা হইতে ১০ লক্ষ টাকা পাইবেন। বাকী মুনাফা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া নিম্নলিখিত হারে কোম্পানীর ভৃত্যগণ প্রাপ্ত হইবেন:—

প্রথম ভাগে মোট ৩৫ অংশ—তন্মধ্যে গবর্ণর ৪, কৌন্সিলের ২য় মেম্বর ৩, জেনেরাল ৩, কৌন্সিলের ১০ জন মেম্বরের প্রত্যেকে ২, এবং কর্ণেলদ্বয়ের প্রত্যেকে ২ অংশ; দ্বিতীয় ভাগে মোট ১২ অংশ; তাহা পাদরী, ১৪ জন উপরস্থ বণিক এবং ২ জন লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল সর্ব্বশুদ্ধ ১৮ জনের মধ্যে সমভাগে বিভক্তব্য। তৃতীয়ভাগে মোট ৯ অংশ, তাহা নিম্নশ্রেণীস্থ ২৭ জনকর্ম্মচারীর মধ্যে সমভাগে বিভক্তব্য।

উক্ত সভায় ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে, চুক্তিদ্বারা সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করা হইবে, এবং উহা দেশীয় দোকানদারদিগের নিকট নির্দ্দিষ্ট এবং অপরিবর্ত্তিত হারে বিক্রীত হইবে। কিন্তু দেশীয় বণিকগণ ইংরেজদের নিকট হইতে যে দরে ক্রয় করে, তাহার অনেক বেশী দরে তাহারা বিক্রয় করিতেছে দেখিয়া ইংরেজদিগের লোভ সম্বরণ হইলনা। দেশীয় দোকানদারগণ অপরিমিত মূল্যে জিনিস বিক্রয় করিয়া ক্রেতৃবর্গের অসুবিধা জন্মাইতেছে, এই অপরাধ তাহাদের উপর চাপাইয়া তাহারা যে মুনাফা করিয়াছিল, কোম্পানীর ভৃত্যগণ তাহা জব্দ করিল। ধন্য বণিকের ন্যায়পরতা!

যখন পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট এক বৎসর গত হইল, তখন কোম্পানীর ভৃত্যগণ দেখিতে পাইল যে একচেটিয়ায় যথেষ্ট লাভ হইতেছে; সুতরাং আর এক বৎসরের জন্য একচেটিয়া বজায় রাখা স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু ডিরেক্টরগণ পুনঃ পুনঃ কৌন্সিলের নিকট ব্যবসায় উঠাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত লিখিতে লাগিলেন। মেম্বরগণ তাহাতে ভ্রুক্ষেপও না করিয়া তাঁহাদের সঙ্কল্প অনুসারে লোকের নিকট দাদন করিতে লাগিলেন, এবং ডিরেক্টরগণকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন যে ভৃত্যগণের ব্যবসায়ে কোম্পানীর কিম্বা দেশীয়গণের কাহারই কোন অনিষ্ট হইতেছে না। ডিরেক্টরগণ ইহাতে আশ্বস্ত হইলেন না, এবার কৌন্সিলের নিকট ভয় প্রদর্শন করিয়া লিখিলেন যে যদি ভৃত্যগণ ব্যবসায় পরিত্যাগ না করে, তবে তাহারা কোম্পানীর সহিত চুক্তি ভঙ্গ অপরাধে আইনতঃ দণ্ডিত হইবে। এই ভয় প্রদর্শনের পরেও ভৃত্যগণ দাদনাদির টাকা উঠাইবার ছলনায় আর এক বৎসরকাল একচেটিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। অবশেষে ডিরেক্টরগণ মুখের কথা কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্যোগ করিলে ১৭৬৮ সনের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে একচেটিয়া কমিটি ভঙ্গ হয়।

শ্রীশাঃ—

অগ্নিকুল।*

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বেলা অর্দ্ধ প্রহর হইয়াছে। বৌদ্ধ সেনা-নিবাসের একটী গৃহে তিনজন লোক বসিয়া আছে। গৃহ সুন্দর নহে, কিন্তু দৃঢ় ও সুরক্ষিত। এই প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহে একটী মাত্র দ্বার এবং অতি উচ্চে দুইটী-ক্ষুদ্রাকার গবাক্ষ। মাঝিয়ায় একখানি ক্ষুদ্র কম্বল বিস্তৃত, তদুপরি একটি যুবা পুরুষ এবং তাহা হইতে কিছু দূরে আর দুইটী লোক উপবিষ্ট।

যুবার চক্ষুদ্বয় বৃহৎ এবং অত্যুজ্জ্বল। ললাট প্রশস্ত না হইলেও স্ফীত এবং উহার মধ্য দেশে একটী স্থূল শিরা প্রকটিত। দেহ ক্ষীণ সত্বেও দৃঢ় এবং অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ও কর্ম্মঠ বলিয়া অনুভূত হয়। শ্মশ্রু ঈষদঙ্কুরিত হইয়াছে। বর্ণ শ্বেত চন্দনে ঈষৎ-কুঙ্কুম রাগ মিশাইলে যেমন দেখায়। দেহ, মধ্যমাকার। গৈরিক বসন পরিধানে, শরীরে মৃগচর্ম্মরচিত বর্ম্ম।

যুবার বদনে ক্রোধ এবং ঘৃণার ভাব

* এই উপন্যাস শীঘ্রই যন্ত্রস্থ হইবে বলিয়া আমরা গতবারে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম। কিন্তু, ইহা বান্ধবে প্রকাশিত হয়, গ্রাহকবর্গের অনেকে এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করাতে আমরা লেখকের সহিত তদনুযায়ী বন্দোবস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছি। সুতরাং ইহা পূর্ব্বমত নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। বাঃ সঃ।

উদিত হইয়াছে। যুবা পুনঃ পুনঃ দন্তে নিম্নৌষ্ঠ দংশন করিতেছেন। তাঁহার চক্ষু দুইটি, ঘূর্ণায়মান অগ্নি-গোলক সদৃশ, ঘুরিতেছে।

নিকটে যে দুইটি লোক বসিয়া আছে, ইহারা উভয়েই স্থূলকায় এবং ইহাদিগের বসন ভূষণাদি সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ। একজনের বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, আর একজন পঞ্চবিংশ বৎসরের অনুমিত হয়। বয়স্ক শুদ্ধ শুভ্র ধুতি এবং উত্তরীয়-ধারী। যুবা বর্ম্ম-চর্ম্ম-ধারী, হস্তে সুদীর্ঘ বর্ষা। একজন প্রচারক আর একজন সৈনিক পুরুষ।

কম্বলাসন পরিয়া যে যুবা বসিয়া আছেন তাঁহার নাম শৃঙ্গধর। পাঠক ইহাঁর পরিচয় অন্য পরিচ্ছেদে পাইয়াছেন। ইনি এখন বৌদ্ধ গণের বন্দী। পরেশ নাথের আদেশে বন্দীগণের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয় না। এবং বৌদ্ধ প্রচারক সর্ব্বদা তাহাদিগের নিকট থাকিয়া তাহাদিগকে বৌদ্ধ করিবার যত্ন করিয়া থাকেন। এই জন্যই আজি শৃঙ্গধরের নিকট বৌদ্ধ প্রচারক বসিয়া আছেন। এখনও পরস্পর কথা বার্ত্তা আরম্ভ হয় নাই। প্রচারক অনেক ক্ষণ নীরবে থাকিয়া অবশেষ বলিলেন,—"আমি আপনার নিকট আসিয়াছি।" শৃঙ্গধর তাঁহার প্রতি ঘৃণার ভাবে দৃষ্টি করিয়া পুনরায় অধোবদন হইলেন। প্রচারক আবার বলিলেন, আমি আপনার উপকার করিতে আসিয়াছি।"

"আমার উপকার করিতে—বৌদ্ধ অভিধানে উপকারের অর্থ কি জানি না।" এই বলিয়া শৃঙ্গধর শ্লেষভাবে একটু হাসিলেন। প্রচারক বলিল—"ইচ্ছা করিলে আমি আপনাকে মুক্ত করিতে পারি।"

শৃঙ্গধর। সেরূপ ইচ্ছা করিলে আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হইব।

প্রচারক। আপনার, মুক্তি এক প্রকার আপনার হাতেই—

শৃঙ্গ। কেমন?

প্রচারক। শুদ্ধ মুক্ত নহে, বিপুল সুখসম্পদেরও অধিকারী হইতে পারেন।

শৃঙ্গ। সুখ কি আপনারা জানেন?—আমরা পার্থিব সম্পদ ভোগকে সুখকর মনে করি না।

প্রচারক। সুখই জীবের লক্ষ্য,—দুঃখ পরিহার করিয়া সুখ গ্রহণ করিতে হইবে।

শৃঙ্গ। অসম্ভব!—দুঃখ অপরিহার্য্য। দুঃখ বর্জ্জন করিতে হইলেও অধিকতর দুঃখ সহিতে হয়, ইহকালে কেবল দুঃখ বর্জ্জন করিবার জন্যই কঠোর ব্রত ধারণ করিতে হইবে—তবে মানব পরকালে, সেই অনন্ত ধামে, অক্ষয় অনন্ত ও বিমল সুখের অধিকারী হইতে পারিবে।

প্রচা। (হাস্যপূর্ব্বক) পরকাল বলিয়া ইহকালের সুখকে যে তুচ্ছ জ্ঞান করে—তাহা হইতে দুরদৃষ্ট আর কে আছে?—ইহকালে দুঃখই করিতে হইবে, আর সেই দুঃখলব্ধ সুখ পরকালে ভোগ করিতে হইবে ইহাই যদি প্রকৃতির উদ্দেশ্য, তবে এত ভোগ বিলাসের দ্রব্য জগতে সজ্জিত রহিয়াছে কেন? এবং তাহা ভোগজন্য

লালসা হয় কেন?—লালসানিবৃত্তি এবং অভাবপূরণ যদি ইহ লোকেই করিতে পাইলাম তবে পর কালের জন্য অপেক্ষা করা কেন?

শৃঙ্গধর বিরক্ত হইলেন। ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন—পশু মানবে এক করিবেন না—নাস্তিকতা পরিত্যাগ করিয়া এখন কাযের কথা বলুন—আপনি এ কারাগারে, বন্দী সমীপে কি জন্য আসিয়াছেন।

প্রচা। আপনার মঙ্গলের জন্য।

শৃঙ্গ। আমার মঙ্গল চাহিলে নাস্তিকতার কথা, আমার সাক্ষাতে মুখে আনিবেন না।

প্রচা। আপনি যুবক, রূপবান এবং বলবান, আপনি কারামুক্ত হইয়া সুখী হন, আমার এই ইচ্ছা। আমি তাহার উপায়ও স্থির করিয়াছি।

শৃঙ্গ। কি উপায় স্থির করিয়াছেন?

প্রচা। পরেশনাথ পরম দয়ালু, সর্ব্বগুণে মানবশ্রেষ্ঠ, কুমারী হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত যে কেহ নতশিরে একবাক্যে তাঁহার আদেশ পালন করিয়া থাকে। সহস্র সুধার অসি হইতে তাহার দয়া মহা তীক্ষ্ণ, সেই দয়াময়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দেখুন কেমন সুখ।

শৃঙ্গধর গম্ভীর গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, কি, ঘোর নাস্তিক, ধর্ম্মবিরোধী ও ঈশ্বরবিরোধী কুকুরের আশ্রয় গ্রহণ করিব।

ইহা শুনিয়া বৌদ্ধসৈনিক ক্রোধে হস্তস্থিত বর্ষা শৃঙ্গধরের প্রতি উঠাইয়া বলিল, "বন্দি কাহার কাছে কি বলিতেছ?"

প্রচারক সৈনিককে নিবৃত্ত হইতে ইঙ্গিত করিয়া অধিকতর ধীরতা ও মৃদুতার সহিত বলিলেন বিরোধী এবং শত্রুর প্রতি স্বভাবতঃই এরূপ কথা মুখে আসিয়া পড়ে। কিন্তু মঙ্গলময় পরেশনাথের সাক্ষাত হইলে তাঁহার মূর্ত্তিদর্শনে সৌজন্যে এবং সদাচারে আপনিও তাঁহাকে ভক্তি করিবেন। শৃঙ্গধর কিছু বলিলেন না, নীরবে প্রচারকের মুখ দৃষ্টি করিয়া ধরাবনত হইলেন।

প্রচারক পুনরায় আরম্ভ করিলেন, আপনি বলবান, রণকৌশলী, রণোন্মাদগ্রস্ত, যদি বাসনা হয়, পরেশনাথের অযুত সৈন্যের অধিনায়কও একদিন আপনি হইতে পারেন।

শৃঙ্গধর এবারে একটু হাসিয়া বলিলেন, 'মহাশয়! তবে শুনুন, হিমালয় তুল্য সহস্র স্তূপ সুবর্ণ এবং বর্ষার বারিধারার ন্যায় অসংখ্য অগণ্য সৈন্যদলের অধিপতি করিলেও আমার মন তিলেকের জন্য আর্য্যধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবে না নিশ্চয় জানিবেন। আপনি যত কেন প্ররোচনার কথা বলুন না, উহাতে আমার কর্ণ বধির। শশকে সিংহে মিত্রভাব সম্ভবনীয় হইলেও আমাতে নাস্তিকে অসম্ভব। আমি দয়া কিম্বা বিচারপ্রার্থী নহি, বন্দী শত্রু, এবং বিরোধী, সুতরাং বন্দীর যাহা এখানে হইয়া থাকে আমার প্রতি তাহাই হউক।

প্রচারক বলিলেন, বন্দী এবং বিরোধী হইলেও অগাধজ্ঞান পরেশনাথ তাহাকে

শক্র মনে করেন না। ব্যক্তিগত শক্রতা কাহাকে বলে তিনি জানেন না। আপনাকে যেরূপ জ্ঞানবান এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখিতেছি, আপনাকে সদাশয় পরেশনাথ দেখিলেই মিত্রভাবে গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার একমাত্র মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান সহায় স্বরূপ মনে করিবেন।

শৃঙ্গধর শুনিয়া একটু ঘৃণার ভাবে হাসিয়া বলিলেন, আমার শরীরে কি অধর্ম্ম ও নাস্তিকতার ছায়া পড়িয়াছে? না আমাকে দেখিয়া লোকের উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া উপলব্ধি হয়? যাহাহউক পরেশনাথ আমাকে মিত্রভাবে গ্রহণ করিলেও তাঁহার প্রতি বিজাতীয় শক্রভাব আমার হৃদয় হইতে কদাচ দূর হইবে না।

প্রচারকের বদন রঞ্জিত হইল, শরীর ক্রোধের তাড়িতে কম্পিত করিল, তথাপি সুগাঢ় সহিষ্ণুতায় উহার বেগ রোধ করিলেন, এবং মুহূর্ত্তকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, আপনি স্বভাবে ধীরতাভ্রষ্ট হইয়াছেন বলিয়া আমি দুঃখিত নহি। কিন্তু জানেন না সেই মহাভাগ পরেশনাথ কেমন মহৎ। তাহার জ্ঞান কত বিস্তৃত, বিদ্যা কত প্রগাঢ়, উদ্দেশ্য কত মহৎ। চিত্ত কত উচ্চ এবং পবিত্রতা কত বিশুদ্ধ?

শৃঙ্গধর প্রচারকের শরীরে ক্রোধের উদয়াস্ত লক্ষ্য করিয়া কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং বৌদ্ধ প্রচারকের এতদূর কহিবার শক্তি আছে মনে করিয়া কিছু লজ্জিতও হইলেন। কিন্তু তথাপি উগ্রতামিশ্র অহঙ্কারভরে দম্ভ করিয়া বলিলেন, জ্ঞাননিষ্ঠা, সত্যধর্ম্ম, পরম পবিত্রতা, বিবিধ বিদ্যা, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির জন্য সমস্ত পৃথিবী ব্রাহ্মণের নিকট চিরঋণী। আজিও এসকল অসাধারণ জ্ঞানে গুণে ব্রাহ্মণ সকলের শীর্ষস্থানীয়। আপনার মুখে নাস্তিক কিম্বা ততোধিক চার্ব্বাক পরেশনাথের পবিত্রতার কথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক আপনাদের চার্ব্বাক-শ্রেষ্ঠের উদ্দেশ্যটি কি তাহাই শুনিতে কৌতূহল হইতেছে।

প্রচারক মনে মনে অধিকতর বিরক্ত হইয়া চক্ষুর রোমাবলি উৎপাটন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অসুখজনক ঘটনা হইলেই এরূপ করিবার রীতি আছে। বিশ পঁচিশ গাছি লোম উৎপাটিত হইলে তাঁহার বিরক্তি দূরীত হইল। পরে ধীরে ধীরে মিষ্ট করিয়া বলিতে লাগিলেন, তবে শ্রবণ করুন।

জগতে পবিত্রভাব বিস্তার করাই আমাদিগের মহাপুরুষের একমাত্র উদ্দেশ্য। ধর্ম্মের ভানে যে কৃত্রিম বিশুদ্ধতার সৃষ্টি পৌত্তলিকগণের মধ্যে অস্থায়িরূপে সঞ্জাত হইয়া থাকে এ তাহা নহে। বাহ্য পবিত্রতাকে পবিত্রতা আমরা বলি না। চিত্তের উৎকর্ষ, সমাজের উৎকর্ষ, এবং সমস্ত মানব-জীবনের উৎকর্ষ সাধন করাই প্রধান ধর্ম্ম। নৈতিক বিশুদ্ধতা ব্যতীত ইহা লাভ করিবার আর উপায় নাই। নীতি যদি ঈশ্বর সেবা পর্য্যন্তেই পর্য্যবসিত

হইল, তবে শুদ্ধ চিরাভ্যস্ত কতকগুলিন বৃথা কথা বকিয়া গাছ, পট বা ঘট পূজা করিলে কি ফল ? চিরকাল মানবের অপকার করিয়া জীবের পীড়া দিয়া কেবল মাত্র একটি স্তোত্র পাঠে বা গঙ্গাস্নানে কি হইবে ? এইরূপে মানব-সমাজ নীতিচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হইতেছে। এই-পতনোন্মুখ মানব-সমাজকে কর্ত্তব্য পথে ধাবিত করাই পরেশনাথের মুখ্য উদ্দেশ্য। ধর্ম্মে (ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ক্রিয়া কলাপে) লোক অধিকতর কুক্রিয়াশক্ত ও ব্যভিচারী হইয়া উঠে, এবং কতিপয় বৃথা আচার ব্যবহারে কুসংস্কারী হয়। কিন্তু নৈতিক পবিত্রতাই মানবকে প্রকৃত মানবীয় পথে চালাইতে পারে। আপনাদের ধর্ম্মনীতি বলিবে, "দেবতা ও ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা কর ?" আমরা বলিব জগতের মানবকেই শ্রদ্ধা ও পূজা কর। আপনারা বলিবেন, "গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা করিও না"। আমরা বলিব, "জীব হত্যা করিও না"। এই দুটী সাধারণ উদাহরণেই বুঝিতে পারিবেন মানবে নৈতিক বিশুদ্ধতা থাকিলে সে মানব কত উচ্চ হইতে পারে। আমাদের শাক্যমুনি কোন বিজন বিপিনে একটী আহারাভাবে জীর্ণা শীর্ণা,অচলা বাঘিনীকে দুইটী ক্ষুধার্ত্ত শাবক সহ পতিত দেখিয়া, করুণা-পূর্ণ-হৃদয়ে, স্বয়ং তাহার মুখে আত্মসমর্পণ করেন। বাঘিনী তাঁহাকে বধ করিতে অশক্ত হইলে, তিনি দুঃখিত মনে ফিরিয়া আসিয়া আপন বাম হস্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া পুনরায় ব্যাঘ্রসমীপে উপস্থিত হইলেন। বাঘিনী শাক্যসিংহের খণ্ডীকৃত হস্ত পাইয়া আহ্লাদে শাবক দুইটীকে খাওয়াইল এবং অবশিষ্ট আপনি খাইয়া ধীরে উঠিয়া প্রস্থান করিল। প্রবীণহৃদয় শাক্য ইহাতে এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তাঁহার নির্ব্বাণকাল নিকটবর্ত্তী হইলে দুই তিনবার বলিয়াছিলেন "আমার বাম হস্ত প্রকৃত সৎকার্য্যে ক্ষিপ্ত হইয়াছে। অপর অঙ্গগুলি অকর্ম্মণ্য রহিয়া গেল"। পরেশনাথ জগতকে এই শাক্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। আপনার তুল্য সুবিচক্ষণ লোক এরূপ উদ্দেশ্যের পক্ষপাতী অবশ্যই হইবেন।

শৃঙ্গধর তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, শাক্যমুনি অলোকচেতা,আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু শোণিতপিপাসু—নিরীহ মুনি-হন্তা পরেশনাথের যাহাই কেন উদ্দেশ্য হউক না, তাহা শুদ্ধ দস্যুভাবপূর্ণ। পরেশনাথ স্বদলবলে অচিরে নরকগামী হউন।

"যথার্থই পরেশনাথ নরকগামী হইয়াছেন—কিন্তু নরককে সুন্দর ভবন করিতে হইবে"।—এই বলিয়া হাস্য করিতে করিতে এক ব্যক্তি গুপ্তদ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

প্রচারক এবং সৈনিক তাঁহার দর্শনমাত্র অভিবাদন করিয়া সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইল। তাহার সৌম্য মূর্ত্তি ক্ষণেকের জন্য শৃঙ্গধরের মনকেও শ্রদ্ধাবনত করিল। তিনি দেখিয়াই ভাবিলেন, আগন্তুক পরেশনাথ হইবেন। সুতরাং তিনিও দাঁড়াইলেন। এমন সময় নেপথ্যে হাস্যধ্বনি এবং তদ্

সঙ্গে ভৈরবগীতিনিনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল,—পরেশনাথের ভ্রূ স্ফীত হইল, বদন গম্ভীর হইল, তিনি তাড়িৎগতি কারাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। প্রচারক তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধ-সেনানিবাসস্থ সুবৃহৎ প্রাঙ্গণের এক দেশে কতকগুলি বৌদ্ধ সৈন্য এবং অপর লোক, এক বৃদ্ধকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে,—বৃদ্ধ হস্ত তুলিয়া নৃত্য করিতেছে ও গাইতেছে—

শার্দ্দূলছাল স্খলিত—পিন্ধন।
অর্দ্ধ-উলঙ্গিত কটি বন্ধন।
ললাট হুতাশন প্রজ্জ্বলন।
ভীষণ তারকা ভানু ঘূর্ণন।
সহস্র কড়কানাদ হাসন।
সহস্র ঢক্কা-রোষ পরিভাষণ।
দুর্জ্জয় জ্বলন্ত উদ্দীপন—
পূর্ণ হৃদয়, পূর্ণ সাহস কে রে?

(কোরষ)

ভুবন—
নাশন—
সজ্জন—
পালন—
রক্ষণ—
বিধান কারণ যে রে।

ভীম মুরতি ভৈরব।
দৈত্য কুল-সম্ভব।
অহো, সংহার সংহার।
হো হো, বিদার—বিদার।
তীব্র বাক্, ভীম দাপ্।
শিরে সাপ, ইন্দ্র চাপ্—
ধারি,ধাইছে ঘোর দাপটে কে রে?

(কোরষ)

ভুবন—
নাশন—
সজ্জন—
পালন—
রক্ষণ—
বিধান কারণ যে রে।

এমন সময় পরেশনাথের আগমন ঘোষিত হইল। বৃথা অমোদ রত বৌদ্ধগণ ভীত ও লজ্জিত হইয়া নির্ব্বাক ও স্তব্ধভাবে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। কেহ কেহ বা সুবিধা পাইয়া লুকাইতে লাগিল। জনারণ্য ছিন্ন ভিন্ন হইল। কিন্তু বৃদ্ধের নৃত্য গীত থামিল না। দুইজন সৈনিক পুরুষ, প্রভুর আদেশে তাহাকে বারণ করিতে অগ্রসর হইল, তাহারা ফল লাভে বঞ্চিত হইয়া বৃদ্ধের পদাঘাত সহ্য করিল। পরেশনাথ বৃদ্ধের ব্যবহার দেখিয়া উন্মাদ মনে করিলেন। বলিলেন—'এ উন্মাদগ্রস্ত বৃদ্ধকে কিছু খাদ্য দিয়া নিবৃত্ত কর'?

আদেশমাত্র দুইজন লোক আহার্য্য আনিতে চলিল।

বৃদ্ধ,পরেশনাথের কথা শুনিবামাত্র নৃত্য গীতে বিরত হইল। তাহার শেতরেখাকৃত ললাট সহস্র রেখাকৃত হইল। নয়নতারকায় অগ্নি ছুটিল—লোলিত শরীর দৃঢ় হইল, পলিত কেশ কদম্বকেশর হইল। সুদীর্ঘ শরীর-ধনু ভ্রষ্টগুণ হইল। উন্মাদ পলকের

মধ্যে 'জয় হর হর শঙ্কর' বলিয়া গর্জ্জন করিয়া পরেশনাথের বক্ষে দক্ষিণ হস্তস্থ ত্রিশূলের আঘাত করিল। পরেশনাথ সরিয়া না গেলে উহা সাংঘাতিক হইত। সুতরাং ত্রিশূল-ফলক তাঁহার বক্ষে না লাগিয়া বাম বাহুমূলে বিদ্ধ হইল। পরেশনাথের পার্শ্বস্থ দুইজন বৌদ্ধ সৈনিক অমনি মহাবলে বৃদ্ধকে ধৃত করিল। সেনা নিবাসে 'সর্ব্বনাশ হইল, সর্ব্বনাশ হইল' বলিয়া শব্দ উত্থিত হইল।

পরেশনাথ যেমনই ধীরপ্রকৃতি, তেমনই এক এক সময়ে অসহিষ্ণু। তিনি ত্রিশূল-ফলক বাহু হইতে খসাইয়া সেই ত্রিশূল বৃদ্ধের উপর লক্ষ্য করিলেন। বৌদ্ধ প্রচারক অমনি তাহা ধরিয়া বলিলেন, "কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন"। পরেশনাথ ত্রিশূল ত্যাগ করিয়া গম্ভীরস্বরে প্রচারককে বলিলেন, "এ বৃদ্ধ উন্মাদ নহে, পৌত্তলিক গণের গুপ্তচর। ইহার গান শুনিয়া পূর্ব্বেই আমার সন্দেহ হইয়াছিল।' বৃদ্ধ অমনি গম্ভীরস্বরে বলিল 'আমি দেবদূত, নাস্তিক দৈত্যগণের পরম শত্রু।"

পরেশনাথ বৃদ্ধের কথায় কর্ণপাত না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার প্রহরার সময় এব্যক্তি সেনা নিবাসে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে লইয়া আইস? আদেশ মাত্র দুইজন সৈনিক পুরুষ প্রহরিকে আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রহরী আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সেই ভীমদণ্ড।

পরেশনাথ তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন—

কেমন তুমি এ ব্যক্তিকে আসিতে দিয়াছিলে?

ভীম। "আজ্ঞে হাঁ" বলিয়া নীরব হইল।

পরেশনাথ প্রচারককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বন্দি? —পৌত্তলিক সেনাপতি?'

প্রচারক। 'কারাগৃহে'।

পরেশ। উন্মত্তরক্তময় যুবার কোন পরিবর্ত্তন দেখিতেছ?

প্রচারক। পরিবর্ত্তন অসম্ভব, যুবা অটল, অচল, দৃঢ়। উপদেশ, লোভ, ভয়, কিছুই তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতেপারে না।

পরেশনাথ ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিলেন, 'যাও এখনই তাহাকে লইয়া আইস?' সৈনিক পুরুষেরা আজ্ঞামাত্র যাইয়া শৃঙ্গধরকে লইয়া আসিল।

শৃঙ্গধর উপস্থিত হইলে, পরেশনাথ তাহাকে বলিলেন, তোমার জীবন মরণ এখন আমার আয়ত্তাধীন, বল পৌত্তলিকতা ছাড়িয়া বৌদ্ধ হইবে কি না?'

শৃঙ্গধর বলিলেন, 'দৈত্যপতি, আমি মরণের ভয় করি না। আপনি কেন দস্যু ভাব ত্যাগ করিয়া সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম গ্রহণ করুন না?' বৃদ্ধ অমনি 'সাধু সাধু' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পরেশনাথ ক্রুদ্ধ হইয়া সহকারী সেনাধিনায়ককে বলিলেন, 'বেদম্ন! এই উন্মাদগ্রস্ত যুবার, প্রহরীর এবং এই বৃদ্ধের প্রাণ দণ্ডের আদেশ করিতেছি, তুমি জল্লাদ ডাকিয়া এখনই ইহাদিগের মস্তক ছেদন করাইবে"। এই বলিয়া তাড়িৎবেগে আপন বাস ভবনে গমন করিলেন। সকলে নিরুত্তর নির্ব্বাক এবং ভীত হইয়া এ উহার মুখপানে দৃষ্টি করিতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বেদঘ্ন পরেশনাথের একান্ত আজ্ঞাবহ। প্রভুর আজ্ঞা ভাল হউক, মন্দ হউক তিনি কিছুমাত্র বিবেচনা করেন না। সুতরাং পরেশনাথের আজ্ঞামাত্র তিনি তিন ব্যক্তির বধের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

ভীম কুঠার হস্তে ঘাতক-পুরুষ উপস্থিত হইল। বেদঘ্ন তাহাকে গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 'এক্ এক্ আঘাতে এই তিন ব্যক্তির মস্তক ছেদন কর। একের প্রতি একাধিক আঘাত করিলে গুরুদণ্ড পাইবে।' ঘাতক এই কথা শুনিয়া গর্ব্বিতভাবে একবার তাহার কুঠার ও আর একবার বধ্য ত্রয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া মৃদু হাস্যে বলিল—"এ কুঠারে হাতির মাতাও এক কোবে নামাইতে পারা যায়।"

বেদঘ্ন—অধিক বিলম্ব না করিয়া বধ্যগণের প্রতি কাতরদৃষ্টি করিয়া বলিলেন—"আমি আদেশ পালন করিতেছি সুতরাং আমি ক্ষমার্হ।"

বৃদ্ধ,—"কি নরাধম প্রেতের দাস তুই ক্ষমার্হ !!"—বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল।

শৃঙ্গধর, অতি প্রশান্ত ভাবে, এবং ধীর ভাবে বলিলেন,—"আদেশ-পালক, তুমি ক্ষমাযোগ্য,—তুমি নির্দ্দোষী,—আশা করি আমাদিগের বধকার্য্য সম্পন্ন হইলে তুমি তোমার প্রভুকে বলিবে যে আমরা নির্ভয়ে নিশ্চিন্তায় পরমপিতা সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে মরিয়াছি।"

বেদঘ্ন—বধ-আজ্ঞা প্রচার করিয়া মৌন ভাবে প্রস্থান করিলেন। হন্তা বধ্য এবং অষ্টজন অস্ত্রধারী প্রহরী তথায় রহিল।

প্রধান প্রহরী ভীমদণ্ডের নামোচ্চারণ করিয়া বলিল—প্রস্তুত হও। ভীমের বজ্রসম বিপুল দেহ কাঁপিয়া উঠিল। শরীর রক্তহীন হইল, চক্ষু বিস্ফারিত ও নিমেষশূন্য হইল—আর সে ভীম, ভীম রহিল না যেন অগ্রেই সে মরিয়াছে।

তাহাকে দেখিয়া প্রশস্ত হৃদয় শৃঙ্গধরের দুঃখ হইল, এবং এরূপ বলবান সৈনিক মৃত্যু ভয়ে কাঁপিতেছে দেখিয়া তাঁহার অধর প্রান্তে, এমন বিষম সময়েও একটু হাসির আলো দেখা দিল। ডাকিয়া বলিলেন, "নর ঘাতক,—আমি প্রস্তুত আছি, অগ্রে আমায় বধ কর।"

"ঋষিযুবার এরূপ উদারতায়—নরঘাতকের ব্রজমুষ্টিও ক্ষণেকের জন্য শিথিল হইল। বৌদ্ধ প্রহরীনিচয় মুগ্ধ হইল। এবং উন্মাদরূপী সেই বৃদ্ধ রোদন করিয়া বলিল।"—

"ভাই, শৃঙ্গধর ধন্য তুমি—কিন্তু ভাই—আমাকে অগ্রে মরিতে দাও, আমিবৃদ্ধ।"

শৃঙ্গধর হাসিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর দাদা মরিবার ভয়ই বা কি আর তজ্জন্য অগ্র পশ্চাতই বা কি—তবে দুঃখ এই,এই নরাধমদিগকে স্বহস্তে নির্ম্মূল করিতে পারিলাম না"—এই বলিতে বলিতে নতজানু হইয়া মস্তক অবনত করিলেন এবং ভীতিশূন্য গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "ঘাতক শীঘ্র তোমার কার্য্য কর।"

হতোসাহ ঘাতকের করাল কুঠার ধীরে ধীরে উর্দ্ধে উঠিল। বৌদ্ধগণ নয়ন মুদ্রিত করিল। ভীম, মুর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পড়িল। বৃদ্ধ, বিনায়ক ঋষি, উর্দ্ধমুখে ঈশ্বর স্মরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

* * * * *

ঘাতক বিকট শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। সকলে দেখিয়া অবাক, ভীত ও বিস্মিত হইল। এক ভয়ঙ্করী, কঙ্কালাবশিষ্ট-মূর্ত্তি, দীর্ঘদেহা নারী ঘাতকের পশ্চাদ্দেশ হইতে কুঠার দণ্ড দুই হস্তে ধরিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে এরূপ দংশন করিতেছে যে, ঘাতক চীৎকার করিয়াই জ্ঞানশূন্য হইতেছে। দেখিতে দেখিতে নারী কুঠার হস্তে করিয়া তাড়িৎগতি দূরস্থিত গহনে অদৃশ্য হইল। এরূপ অচিন্তনীয় ঘটনায় বৌদ্ধগণ ভীত হইল এবং একে অপরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল।

এদিকে শৃঙ্গধর নতজানু ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। তিনিও বিস্মিত হইলেন—তাঁহার স্কন্ধ অক্ষত অথচ ঘাতক রুধিরার্দ্র পৃষ্ঠে ধরাবনত। সকলের মুখেই বিস্ময় ও ভয়ের চিহ্ন। ঘাতকের শাণিত কুঠারই বা কোথায়!! আবার এদিকে বৃদ্ধ বিনায়ক ঋষি যোড় করে স্বরসংযোগে সর্ব্বমঙ্গলা শিবানীর স্তুতি পাঠ করিতেছেন।

বুঝেছি
ওমা দাঁড়াও একবার?
তুমি—
গঙ্গারূপে ধূর্জ্জটি জটে
পুণ্যরূপে জাহ্নবী তটে
প্রীতিরূপে হৃদয়পটে
লক্ষ্মীরূপে নৃপতি মুকুটে
শক্তিরূপে দেহ-বিরাটে
জ্ঞানরূপে সাধুললাটে
বিহার—বিহার।

এখন—
বায়ুরূপে আসিয়ে
চণ্ডীরূপে ত্রাসিয়ে
ভীমারূপে দণ্ডিয়ে
স্নেহরূপে তুষিয়ে
দাসে দয়া করিয়ে
উদ্ধার—উদ্ধার।

রাখিলে নাম
করিলে দয়া।
ভুবন মাতঃ
তুমি অভয়া।
যশঃ ধবলা
দৈত্য বিজয়া
ভকত বৎসলা
অপার—অপার।

কি পুণ্য করিনু শত্রু কারাগারে।
দেখা দিলে মাগো আসিয়ে দাসেরে।
কি হেরিনু আহা, হেরিব কি আর।
ঘুচিবে কি তারা দৈত্য পাপভার—
—পাইব কি আর চরণ তোমার?
পাই যদি বল সঙ্কট মাঝারে,
হৃদয় পাতিয়ে সঙ্কট-পাহাড়
বহিব সে ভার—সেভার।

গান সমাপ্ত করিয়া বিনায়ক দম্ভভরে বলিলেন—"শৃঙ্গধর, দেবী আমাদের প্রতি প্রসন্না। আমরা নিশ্চয়ই এই অরাতিনি-

কর ধ্বংস করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। চামুণ্ডার সংহারমূর্ত্তি দেখিয়াই ইহা বুঝিতেছি”।

শৃঙ্গধর কথার উত্তর দিলেন না, কেবল স্ফুটলোচনে স্থিরভাবে একবার তাহার দিকে চাহিলেন। চাহনির অর্থ “চুপ করুন”। বিনায়ক বুঝিতে পারিয়া চুপ করিলেন। এই ঘটনার অল্প পরে একজন বৌদ্ধসৈনিক সেনাপতির নিকট চলিল। সহকারী সেনাপতি বেদঘ্নের আদেশ হইল—“আর কালবিলম্ব না করিয়া দ্বিতীয় ঘাতকদ্বারা উহাদের প্রাণ দণ্ডিত হউক। এবং বধ্যভূমিতে ঘাতকের চতুষ্পার্শ্বে একবারে কয়েক জন সেনা যেন সাবধানে দাঁড়াইয়া থাকে”।

আদেশ কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। পুনরায় একদল নূতন সৈন্য এবং নূতন ঘাতক উপস্থিত হইল। শৃঙ্গধর নতজানু হইয়া বলিলেন, “অগ্রে আমাকে বধ করিতে হইবে। তোমরা দয়া করিয়া কিছুকাল অপেক্ষা কর, আমি গুরুদেবের নাম স্মরণ করিয়া লই”।

এমন সময় কে আসিয়া ঘাতকের পৃষ্ঠে যষ্টি স্পর্শ করিয়া বলিল—“ক্ষান্ত হও” ঘাতক সরিয়া দাঁড়াইল। বৌদ্ধগণ সম্ভ্রম জানাইল। আগন্তুক শৃঙ্গধরকে সম্ভ্রমে তুলিয়া বলিলেন “বীরবর, শত্রুকর্ত্তৃক জীবন লাভ হইল মনে করিয়া লজ্জিত হইবেন না। আমি জীবিত থাকিতে আপনার প্রাণদণ্ড হইবে না”।

শৃঙ্গধর বিস্মিতলোচনে চাহিয়া দেখিলেন,—সেই রূপবান্ বীরশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ সেনাপতি—সূর্য্যনাথ, যাহার অসীম বীর্য্যে হিন্দুসেনা চমকিত হইয়াছিল এবং তিনি স্বয়ং বন্দি হইয়াছিলেন। শৃঙ্গধর কি বলিবেন তাহার বাক্য স্ফুরিত হইল না। চাহিয়া রহিলেন।

সূর্য্যনাথের দর্শন মাত্র ভীমের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—সূর্য্যনাথ তাহার কাতরদৃষ্টি দেখিয়া তাহাকেও বলিলেন—“কাপুরুষ ভয় নাই, প্রাণ যাইবে না”।

এই সময়ে একজন সৈনিক বলিল “দ্বিতীয় সেনাপতির আদেশ হইয়াছে এখনই এই তিন ব্যক্তির মস্তক ছেদন করিতে হইবে”।

সূর্য্যনাথ গম্ভীর শব্দে বলিলেন “আমি নিষেধ করিতেছি”।

সৈনিক পুনরায় বলিল—“এ দ্বিতীয় সেনাপতির আদেশ নহে, প্রভুর আদেশই এইরূপ হইয়াছে”।

সূর্য্যনাথ ভ্রুকুটি করিয়া বলিলেন, ‘আমি প্রভুর নিকট শুনিব, পরে যেরূপ হয় করা যাইবে’।

সৈ। ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিব?

সূ। ছাড়িবার বিলম্ব আছে।

সৈ। কারাগৃহে রাখিব?

সূ। কারাগৃহে রাখিবে, কারাযন্ত্রণায় রাখিবে না। সম্ভ্রমে ও যত্নে রাখিবে।

সৈ। ভীমের কি হইবে?

সূ। কারাগৃহ, ভীম অপরাধী, বিচার হইবে।

এই বলিয়া সূর্য্যনাথ প্রস্থান করিলেন। সূর্য্যনাথ গমন করিলে তাঁহার আদেশ পালিত হইল।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালী।

প্রথম প্রস্তাব।

সন্তানের মানসিক শিক্ষা।

কি প্রকারে সন্তানের মানসিক শক্তি সকল উন্মেষিত করিতে হয়, বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা তাহার সম্যক আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। অনন্ত জগতে মনুষ্য একাকী একটী জীব সংস্থাপিত হয় নাই। তাহার চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, তৃণাদি সমবেত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। ঈশ্বরের এরূপ অভিপ্রায় নহে যে আমরা এই সকল পদার্থের বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিব। তিনি কি উদ্দেশ্যে আমাদিগকে ইন্দ্রিয় সকল প্রদান করিয়াছেন? এই বাহ্যজগৎ ব্যতীত মনুষ্য আপনার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র জগতের অধিকারী। মানবমনের কার্য্য প্রণালী অবগত হইতে সূক্ষ্মতর ইন্দ্রিয়ের আবশ্যক, এতদুদ্দেশ্যেও তিনি আমাদিগকে উপযুক্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। আপনার অন্তঃকরণে যে কার্য্য হয়, অন্তর্দৃষ্টিতে আমরা তাহা অবলোকন করিতে সক্ষম। বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়দ্বারা আমাদের জ্ঞানবৃত্তি উন্মেষিত হয়। সকল প্রকার জ্ঞানই এই দুই প্রণালী দ্বারা মনোমধ্যে আগমন করে। এই জ্ঞানবৃত্তির স্বাভাবিক উন্মেষ ও ক্রমিক বিকাশের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে। এ জগতে কিছুই নিয়মবহির্ভূত নহে। ঐশ্বরিক আজ্ঞায় মানব-মন স্বাভাবিক বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এই স্বাভাবিক বিকাশের সহায়তার জন্য আমাদের একটীমাত্র কর্ত্তব্য আছে। প্রাকৃতিক নিয়ম বিপর্য্যস্ত করিয়া আমরা কোন শক্তিকে বিকশিত করিতে সক্ষম নই। উন্নতির পক্ষে ঈশ্বর যে নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন তাহার আবিষ্কার আমাদের উদ্দেশ্য এবং আমাদের নিজ স্বাধীনতা দ্বারা আমরা উক্ত নিয়মের ব্যভিচার না করি এই আমাদের কর্ত্তব্য।

স্বাভাবিক প্রণালী,—কেহ অস্বীকার করিতে হয় করুন, কিন্তু আমরা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে এ সংসারে কেহই সুখ ব্যতীত অন্য কিছুই অনুসন্ধান করে না। ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন নিবিড় অরণ্যমধ্যে নিষ্কাম তপস্বী ধ্যান করিতেছেন। তিনি কি বাস্তবিকই নিষ্কাম? তবে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ কর। যদি তিনি ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠেন তবে ত নিশ্চয়ই বুঝিলে যে তুমি তাঁহার সুখের অবস্থা ভঙ্গ করিয়াছ; আর যদি শান্ত ও সমাহিত হইয়া থাকেন তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, কেন তিনি অন্য কোন কার্য্য না করিয়া এইরূপ সমাধিতে নিমগ্ন রহিয়াছেন। ফলতঃ জিজ্ঞাসার কোন প্রয়োজন নাই। আমি

কেন লিখিতেছি? তুমি কেন পড়িতেছ? জিজ্ঞাসা করিলে একই উত্তর—সুখ বোধ হইতেছে, বিপরীত করিতে অনিচ্ছা হয়। জ্যোতির্বেত্তা কেন দিবাকে রাত্রি ও রাত্রিকে দিবা করিতেছেন? কেন তিনি অনিমেষভাবে উন্নেত্র হইয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতেছেন? রাসায়নিক পণ্ডিত কেন সময়েং নিজ জীবনকে বিপদে ফেলিয়া এক পদার্থের প্রতি অন্য পদার্থের কার্য্য পরীক্ষা করিতেছেন? উদ্ভিদ্‌ বেত্তা কেন জঙ্গলেং বেড়াইয়া বৃক্ষ, লতা, পাতা অন্বেষণ করিতেছেন? প্রাণীতত্ত্ব-বিশারদ কেন ভিন্নং জীবের জীবনতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতেছেন? এই সকল প্রশ্নেরই এক উত্তর—সুখ। সুখ ও আনন্দ অনুভব না করিলে ইহাদের কেহই এরূপ কার্য্যে ব্রতী হইতেন না। পক্ষান্তরে আবার দেখিতে পাই যে ক্লেশ অনুভব করিয়া, অথবা ক্লেশের ভয় করিয়া আমরা কোন কোন কার্য্য হইতে বিরত হই।

অতএব সন্তানশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের সর্ব্বপ্রথমে এইটী দৃঢ়রূপে ধারণা থাকা আবশ্যক, যেন মানসিক জ্ঞানলাভের কার্য্য কখনও কষ্ট ও দুঃখের সহিত স্মৃত না হয়। যে বালক পড়িতে বসিয়া সর্ব্বদা ভৎর্সনা শ্রবণ করে, কিংবা প্রহারের যন্ত্রণা সহ্য করে, তাহার অন্তঃকরণে পড়ার সহিত ঐ কষ্টের স্মৃতির এমনই এক দৃঢ় সম্বন্ধ আটিয়া যায় যে পড়িতে তাহার অনিচ্ছা বই ইচ্ছা হইতে পারে না। যে বালক সর্ব্বদা অনিচ্ছা সত্ত্বেও পড়িতে বাধ্য হইয়াছে, যাহা সে ভালবাসে না তাহাই তাহার পড়িতে হইয়াছে এবং অবশেষে কথঞ্চিৎ শিখিতেও হইয়াছে, সে বালক সম্বন্ধে ইহা কখনই আশা করা যাইতে পারে না, যে সে উক্ত বিষয়ই ভবিষ্যৎ জীবনে অহরহঃ অধ্যয়ন করিবে। মনুষ্যের পক্ষে একজনের শরীর যেমন ঠিক অন্য জনের শরীর হইতে পারে না, তদ্রূপ এক জনের মনও অন্য জনের মন হইতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তির মনের প্রবৃত্তি সকলে একটু বৈশিষ্ট রহিয়াছে। অন্য কাহারও রুচির সহিত আমার রুচির ঐক্য হয় না। কোন বালক কিংবা বালিকাকে যথার্থ শিক্ষাপ্রদান করিতে হইলে এবং শিক্ষকের হৃদয়ে তাহার উন্নতির জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকিলে শিক্ষার্থীর রুচি অনুসারে তাহাকে শিক্ষাদান করিতে হইবে। শিক্ষার অর্থ আর কিছুই নহে। মনের মধ্যে যেসকল স্বাভাবিক শক্তি অলক্ষ্যভাবে অবস্থান করিতেছে তাহাদিগকে উন্মীলিত করাই শিক্ষাকার্য্যের উদ্দেশ্য। কিপ্রকারে সেই সকল স্বাভাবিক শক্তিকে স্বতোবিকাশপ্রণালী অবলম্বন করাইতে হইবে তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা।

অবরোহণ প্রণালী। *

জরায়ু মধ্যে সন্তানের সঞ্চার হইলে তাহাকে কি প্রকারে রক্ষা করিতে হয়

* Analytical method.

এবং ভূমিষ্ঠ হইলে কি প্রকারে তাহাকে বর্দ্ধিত করিতে হয়, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। কি প্রকারে তাহার ইন্দ্রিয় সকলকে শিক্ষিত করিয়া মানসিক উৎকর্ষ বিধান করিতে হয় তদ্বিষয় আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

আমাদের মধ্যে ক্রমে এ বিশ্বাস দৃঢ়মুল হইতেছে, যে যাবৎ বালক বালিকা উপযুক্তরূপে পুস্তক পড়িতে না পারে, তাবৎ তাহাদের মানসিক শিক্ষার কোন উপায়ই অবলম্বন করা যাইতে পারে না। এই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা চারি পাঁচ বৎসরের শিশুদিগকেও প্রত্যহ পাঁচ ঘণ্টার নিমিত্ত করাগারে প্রেরণ করিতে কুণ্ঠিত হই না। শিশুদিগকে স্কুলে পড়িতে দিয়াই আমরা নিশ্চিন্ত ও দয়াশূন্য হইয়া বসি। আমরা এরূপ বিশ্বাস ও ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। স্কুলের শিক্ষা অপেক্ষা পারিবারিক শিক্ষা এরূপ কোমলমতি শিশুদের পক্ষে সহস্রগুণে সুখদায়ক ও সুফল-প্রদ। এবং ইহাদের পুস্তক অপেক্ষা প্রকৃত জগৎ অধিকতর মনোহর ও চিত্তাকর্ষক। আর বাস্তবিক যিনি পুস্তক পড়িতে শিখেন নাই, যিনি পুস্তক পড়িতে পান না, যিনি পুস্তক পড়িবেন না তাঁহার মানসিক শিক্ষার কি কোন উপায় নাই? আমরা বলি, মানসিক শিক্ষার যে কিছু উপায় আছে তাহা তাঁহারই। পুস্তক ব্যতীত শিক্ষা কিরূপ, আমরা ক্রমে প্রদর্শন করিব।

উদ্বোধক ইন্দ্রিয়। *

ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও রসনা।

আমরা সকলেই জানি আমাদের শরীর পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিভূষিত—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা, ত্বক্। ইহার মধ্যে নাসিকা ও জিহ্বার প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য চিন্তা করিলে পরমকারুণিক বিধাতার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। আমরা বাহ্য জগত হইতে সর্ব্বদা শরীরপোষক পদার্থ সকল আহরণ করিতেছি। প্রত্যেক কার্য্যে আমাদের শারীরিক শক্তির অপচয় হইতেছে, কিন্তু বাহ্য জগৎ হইতে নানাপ্রকার পদার্থ আহরণ করিয়া আমরা সেই ক্ষতি পূর্ণ করিতেছি। এই সকল পদার্থের মধ্যে আহার পানীয় ও বাতাস সর্ব্বপ্রধান। ইহার মধ্যে আহার ও পানীয় উভয়ই একপথে আমাদের শরীর মধ্যে প্রবেশ করে; বায়ুর একটি স্বতন্ত্র প্রণালী আছে। শরীরে খাদ্যের অভাব হইলে ক্ষুধা হয়, জলের অভাব হইলে তৃষ্ণা হয়, বায়ুর আবশ্যকতা সর্ব্বদাই রহিয়াছে। ক্ষুধা হইলে আমরা যাহা ইচ্ছা আহার করিতে পারি না; তৃষ্ণা হইলে যাহা ইচ্ছা পান করিতে পারি না; এবং সর্ব্বদা যে বায়ু ইচ্ছা সেবন করিতে পারি না। আহার ও পানীয় প্রণালীর মুখে জিহ্বা যেন একটি দ্বারবান হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। পাকস্থলীর অনিষ্টকর কোন পদার্থকে প্রণালীর অভ্যন্তরে

* Perceptive organs.

গমন করিতে উচ্চৈঃস্বরে নিষেধ করিবে। যাহা পাকস্থলির অগ্রাহ্য, তাহা জিহ্বারও অগ্রাহ্য। উভয়ের মধ্যে এক আশ্চর্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। সেইরূপ আবার নাসিকা ও ফুস্ ফুস্ পরস্পর সম্বন্ধ, ফুস্ ফুসের অগ্রাহ্য যাহা, তাহা অবশ্যই নাসিকার অগ্রাহ্য। দুর্গন্ধময় বায়ুর সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয় কিরূপ ভয়ানক সংগ্রাম আরম্ভ করে সকলেই অবগত আছেন। যেসকল বস্তু এই দুই ইন্দ্রিয় স্পর্শ করিলে অসুখ ও কষ্ট হয়, তাহা আমাদের অপকারক এবং যাহাতে আনন্দ ও সুখের সঞ্চার হয়, তাহারাই উপকারক। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থার বিপর্য্যয়ে, অন্যায় ব্যবহার দ্বারা আমরা এই দুই ইন্দ্রিয়কে এরূপ করিয়া তুলিয়াছি যে, এখন আর তাহাদিগকে বিচারক বলিয়া গ্রহণ করিতে সাহস হয় না। যাহা খাইতে বড় স্পৃহা হয়, তাহা আমরা খাইতে সাহস করি না; যাহা ঘ্রাণ করিতে সুখ হয় তাহাতে অর্থ-ব্যয় অপব্যয় মনে করি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সুখের উদ্দেশ্য ব্যতীত মনুষ্য কোন কার্য্য করে না এবং দুঃখ না পাইলে কোন কার্য্য পরিত্যাগ করে না। অতএব অপকারক দুর্গন্ধময় স্থানে গেলেই যেন লোকে ফিরিয়া আসে, অপকারক দ্রব্য মুখে গেলেই যেন ফেলিয়া দেয়, এই উদ্দেশ্যে দয়াময় বিধাতা এই দুই ইন্দ্রিয়ের সহিত সুখ ও কষ্টের অধিক সংস্রব রক্ষা করিয়াছেন। ইহাদের সহিত আমাদের জ্ঞানের বিশেষ সংস্রব নাই, ইহারা কেবলমাত্র আমাদিগকে উদ্বোধিত অর্থাৎ জাগরিত করে। সুখ ও দুঃখের বোধ করানই এই দুই ইন্দ্রিয়ের বিশেষ উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়।

অনুমাপক ইন্দ্রিয়। *

চক্ষু, কর্ণ ও ত্বকের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। এই তিনটী আমাদের জ্ঞানের বিশেষ প্রণালী। এই তিন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্যজগতের প্রকৃতি আমরা যতদূর অবগত হইতে পারি, উক্ত দুই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ততদূর পারি না। এই জন্যই বোধ হয় ঈশ্বর আমাদের এই ইন্দ্রিয়ত্রয়কে এরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন যে তাহারা শীঘ্র ক্লান্ত না হয়। জিহ্বা ও নাসিকাদ্বারা আমরা কতক্ষণ সুখ বোধ করিতে পারি? অত্যন্ত মিষ্ট যেবস্তু তাহাও অবিরত পাঁচ মিনিটের অধিককাল আস্বাদ করা যায় না। সুগন্ধ দ্রব্য তদপেক্ষা কিছু অধিককাল ভোগ করিতে পারি। সুশ্রাব্য সঙ্গীত সমস্ত রাত্রি শুনিলেও ক্লান্তি হয় না। এবং কেহ কি কখনও সুদৃশ্য দেখিয়া ক্লান্ত হইয়াছে? ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয় আমরা সংপ্রতি কিছু বলিতে চাই না।

এখন আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে সন্তানের মানসিক উন্নতি ও জ্ঞানের বিস্তৃতির জন্য চক্ষু ও কর্ণ এই দুই ইন্দ্রিয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে। সন্তান কিছু বড় না হওয়া পর্য্যন্ত

* Perceptive organs.

ত্বগিন্দ্রিয়ের উন্নতি বিধেয় ও সম্ভবনীয় নহে। এই দুইটী ইন্দ্রিয়ের আর একটী বিশেষ প্রয়োজনীয়তা এইযে ইহারা দূরস্থিত বস্তু সমূহের জ্ঞান উৎপাদিত করে। জিহ্বা ও ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত না হইলে আমরা এই দুই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কিছুই জানিতে পারি না। কোন বস্তু নাসিকার খুব নিকট না থাকিলে তাহার ঘ্রাণ পাওয়া যায় না। খুব দূরের শব্দও আমরা শুনিয়া থাকি। এবং নক্ষত্র প্রভৃতি কতদূর কেহ জানে না অথচ সকলেই দেখিয়া থাকে। সন্তান যখন ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে পারে না, যে থানে রাখ সেই থানেই থাকে, তখন তাহাকে জড় পদার্থ বলিতে হইবে। এ অবস্থায় তাহার শয্যা ব্যতীত সকল বস্তুই তাহা হইতে দূরে; অতএব মাত্র চক্ষু ও কর্ণই সে সর্ব্বদা ব্যবহার করে। তখন আমাদের উচিত যে তাহাকে এই মহৎ কার্য্যে সাহায্য করি। একবার যে রঙটী দেখিয়াছে পুনরায় তাহা দেখিয়া ঠিক সেই রঙ বলিয়া অনুমান করিতে সন্তানের কতক্লেশ ও চেষ্টা করিতে হয় তাহা অবগত না থাকিয়াই পিতা মাতা সন্তানের সহিত সহানুভূতি করিতে পারেন না।

চক্ষু।

নবজাত শিশুর ইন্দ্রিয় সকল কি প্রণালীতে প্রস্ফুটিত হয়, জননী অবশ্য তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। জন্মের পরে কিছু দিন অতীত না হইতেই শিশুর চক্ষু চঞ্চল হয়। তাহার নিদ্রিত অবস্থা অতীত হইলেই সে সর্ব্বদা চক্ষু মেলিয়া থাকে; যে দিকে আলো আছে সেই দিগে তাহার দৃষ্টি। প্রত্যেক মাতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যখন কোন শিশু স্বশরীর চালনা করিবার শক্তি প্রাপ্ত হয় তখন তাহাকে প্রদীপাভিমুখী ব্যতীত রাখা যায় না। যে দিকে প্রদীপ আছে সে সেই দিগে অবশ্য ফিরিবে। যদি হঠাৎ দেখিতে পায় যে কোন রঙ্গিল চক্‌চকে কোন কাপড় কিম্বা অন্য কোন পদার্থ রহিয়াছে, মাতা শত চেষ্টা করিলেও শিশুকে অন্য দিগে ফিরাইতে পারিবেন না। আর যত দিন শিশু নড়িতে না পারে, ততদিনও তাহার এই অবস্থা। শিশু নিস্তব্ধ হইয়া পৃষ্ঠের উপর শুইয়া আছে, নড়িতে পারে না সুতরাং আলো অন্বেষণ করিতে পারে না: কোথায়ও কোন রঙ্গিল পদার্থ আছে কি না দেখিতে পায় না। কিন্তু সে স্থির ভাবে উন্নয়ন হইয়া রহিয়াছে; তাহার সম্মুখে একখান লাল কাপড় টাঙ্গাইয়া দেও, সে ইহা মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিবে এবং তাহার দেখা না হইতে যদি উহা উঠাইয়া লও তবে হয়ত অত্যন্ত উৎসুক হইবে; না হয় একেবারে কাঁদিয়া ফেলিবে।

আমাদের দেশে এরূপ অবস্থায় শিশুর সম্মুখে পিঞ্জর টাঙ্গাইয়া রাখার যে প্রথা আছে তাহা অতি উৎকৃষ্ট। শিশু কিরূপ উৎসুক নয়নে ও সহর্ষ মনে ইহা অবলোকন করে, আমরা তাহা দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। কিন্তু অনেক সময়ে শিশু মধ্যে২ কাঁদিয়া উঠে; হয়ত বাতাসে

পিঞ্জরটী নাড়িয়া দেয়, শিশু আবার চুপ করিয়া দেখিতে থাকে। কিন্তু যদি বাতাসে খাঁচা না নাড়ে এবং শিশুও চুপ না করে তবে হয়ত জননী আসিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন। কারণ বুঝিতে পারিলেন না, তাহার মুখে স্তন্য দিলেন, সে চুপ করিল; কিন্তু তাহার মানসিক উন্নতির কিছু বিলম্ব হইল। অতএব এই সকল বিষয়ে জননীর বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত এবং কি প্রকারে সন্তানের দর্শনেন্দ্রিয়ের উন্নতি সাধন করা যায় তাহা জানা আবশ্যক।

আমার সম্মুখে এই পুস্তক খানা রহিয়াছে। আমি ইহা স্পর্শ করিতেছি না, ইহার ঘ্রাণ লইতেছি না, আস্বাদ করিতেছি না, শব্দ শুনিতেছি না। কেবল মাত্র ইহাকে দেখিয়া কি ঠিক করিব? কেবল মাত্র চক্ষু দ্বারা আমি ইহার কোন্ গুণের বিষয় অবগত হইতে পারি? কেন, আমি স্পষ্ট দেখিতেছি যে এই পুস্তক খানি শ্বেতবর্ণ, আমার চক্ষু হইতে প্রায় এক হস্ত দূরে, ইহার আয়তন প্রায় দুইবর্গ ফুট। অর্দ্ধ ইঞ্চ ঘন, কাগজ গুলি বেশ কোমল ও মসৃণ। এই পুস্তক দেখিয়া এইরূপ আরও অনেক গুণ আমার মনে হইতেছে। কিন্তু দার্শনিক পণ্ডিতেরা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করত স্থির করিয়াছেন যে বিস্তৃত রঙ ব্যতীত ইহার অন্য কোন গুণই আমরা চক্ষু দ্বারা অবগত হইতেছি না। দার্শনিক কুটিল তত্ত্বে প্রবেশ করা এপ্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। অতএব যাহারা দর্শন শাস্ত্র অবগত নহেন তাহাদের ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে যে চক্ষু প্রথমতঃ বিস্তৃত রঙ ব্যতীত অন্য কোন প্রাকৃতিক গুণ অবগত হইতে সক্ষম নয়।

আপেক্ষিক জ্ঞানঃ—আমাদের জ্ঞানের একটী সাধারণ নিয়ম এই যে এক শ্রেণীর দুই পদার্থের মধ্যে বিভিন্নতা দেখিয়াই জ্ঞানের উদ্ভব হয়। সমশ্রেণীর পদার্থ দ্বয়ের পার্থক্যই আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি। পৃথিবীতে যদি সকল পদার্থই সমান হইত তবে 'ছোট' 'বড়' শব্দ আমাদের নিকট কোন অর্থই প্রাপ্ত হইত না। ছোট আছে বলিয়া আমরা বড় দেখিতে পাই; সুখ আছে বলিয়া দুঃখও আছে, তিক্ত আছে বলিয়া মিষ্টও আছে, শীতল আছে বলিয়া উষ্ণও আছে; অন্ধকার আছে বলিয়া আলো আছে। এই গুলির একটী না থাকিলে আমরা অন্যটী বোধ করিতে পারিতাম না। পৃথিবীময় সকল পদার্থই যদি এক লাল রঙ বিশিষ্ট হইত তবে আমরা কালো, সাদা, রাঙা প্রভৃতি কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। সমশ্রেণীর পদার্থ দ্বয়ের পার্থক্যই আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি। ফলতঃ আমাদের সকল প্রকার জ্ঞানই আপেক্ষিক *।

দর্শনেন্দ্রিয়ের শিক্ষাপ্রণালী।

শিশু যে গৃহে শুইয়া থাকে তন্মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গের পদার্থ থাকে বলিয়া শিশু রঙ চিনিতে পারে। শিশুর চক্ষুর উন্নতিসাধন করিতে এ বিষয়ে বেশ একটী সুন্দর

* Relative.

পথ রহিয়াছে। আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে আমাদের দেশে গতিশক্তি-রহিত শিশুর সম্মুখে সোলার পিঞ্জর টাঙ্গাইয়া রাখার যে প্রথা আছে তাহা অতি উত্তম। কিন্তু মনোবিজ্ঞান না জানা বশতঃ এই পিঞ্জরের মধ্যে অনেক সময় অনেক দোষ লক্ষিত হয়। পিঞ্জরগুলি এরূপ ভাবে প্রস্তুত করা হয় যেন অধিক বয়স্ক লোকের নিকট তাহা অতি সুন্দর দেখা যায়। এবং যে পিঞ্জরকে আমরা সুন্দর না দেখি তাহা আমরা কথনই কিনিয়া আনি না। আমাদের মনে রাখা উচিত যে আমাদের চক্ষু ও শিশুর চক্ষু এক নহে। শিক্ষিত চক্ষু যাহা দেখিয়া পরিতোষ প্রাপ্ত হইবে, অশিক্ষিত চক্ষুর তাহা দেখিতে ভয়ানক কষ্ট হইতে পারে। ফলতঃ আমাদের চক্ষের যোগ্য পিঞ্জর দিয়া আমরা শিশুর জ্ঞানের পথ অত্যন্ত দুর্গম করিয়া ফেলি। আমাদের বিবেচনায় নিম্নলিখিত রূপে পিঞ্জর প্রস্তুত করিলে ভাল হয়।

শিশু যখন অত্যন্ত ছোট থাকে তখন পিঞ্জরের মধ্যে পক্ষী, পুষ্প ও ফল ঝুলাইবার আবশ্যকতা নাই, ইহার কিছুই শিশু তখনও দেখে নাই সুতরাং প্রতিকৃতিরও কোন লাভ নাই। তখন মাত্র সমতল একটী পিঞ্জর প্রস্তুত করাই ভাল, এবং তন্মধ্যে অধিক প্রকারের রঙ সন্নিবেশিত করা উচিত নয়; তাহা হইলে শিশুর চিন্তা ব্যতিব্যস্ত হইবার সম্ভব। ৩।৪টী রঙ এরূপ দেখিয়া সন্নিবেশিত করিতে হইবে যে তাহারা পরস্পর অত্যন্ত পৃথক প্রতীয়মান হইতে পারে। আমাদের বিবেচনায় ঘন গাঢ় কালো, লাল ও সবুজ সর্ব্বপ্রথমে শিক্ষা দেওয়া ভাল। লাল রঙটী যেন এরূপ হয় যে চক্ষু না ঝলসে। রঙ গুলি এরূপ সন্নিবেশিত করিবে যে একটীর সঙ্গে অপরটী মিশিয়া না যায়। ক্রমে যখন কিছুদিন অতীত হইল, কিম্বা যখন বুঝা গেল যে শিশু এই রঙগুলি বেশ উত্তমরূপে চিনিতে পারিয়াছে তখন আর একটী উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। আর একখানা নূতন পিঞ্জর প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহাতে ঘন কালোর কাছে খুব পাতলা কাল রঙ লাগাইতে হইবে। ঘন লালের কাছে খুব পাতলা সবুজ অথবা পীত রঙ লাগাইতে হইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল প্রকার রঙের মধ্যে প্রভেদ শিক্ষা দিতে হইবে। এস্থলে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে পিতা মাতা যেন সন্তানের জ্ঞানের জন্য অত্যন্ত উৎসুক না হন এবং উপযুক্ত শিক্ষা না হইতেই অধিক রঙ তাহার সম্মুখে উপস্থিত না করেন।

আমরা এরূপ প্রস্তাব করিতেছি না যে শিশুকে এই পিঞ্জর ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে দেওয়া হইবে না। ঘরের মধ্যে যাহা যাহা দেখিতে পারে তাহা সে অবশ্য দেখিবে। নিজ পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী ধাত্রী প্রভৃতি সকলকেই তাহার দেখিতে হইবে, এবং ইহার প্রত্যেককে চিনিতে যে তাহার কত কষ্ট হয় তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। নিঃসন্দেহ সর্ব্বপ্রথমে শিশু মাতাকে চিনিতে চেষ্টা করে। যা-

হার সহিত তাহার জিহ্বা, পাকস্থলি এবং সর্ব্বশরীরের অনির্ব্বচনীয় সুখের সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহাকে সে প্রথমে চিনিতে চেষ্টা করে। যতক্ষণ তৃপ্ত মনে স্তন পান করে যদি অন্য কোন পদার্থ বিশেষরূপে তাহার চক্ষুকে আকর্ষণ না করে তবে ততক্ষণ সে স্থিরনেত্রে জননীর মুখপানে চহিয়া থাকে। যেন সে মনে মনে বলিতে থাকে যিনি কাছে আসিলে আমি এত সুখ পাই, এবার তাহার মুখখানি খুব ভাল করিয়া দেখিয়া রাখি, আর কখনও ভুলিব না। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অনেক চেষ্টার পরে মনোমধ্যে জিহ্বার সুখের সহিত জননীর আকৃতির এক দৃঢ় সংযোগ হইয়া যায়।

সকলেই ছেলে মানুষ।

মানুষ মাত্রেই ছেলে মানুষ। এ কথা শুনিয়া অনেকে আমার উপর বিরক্ত হইবেন। রামের বড় কাকা বলিবেন, ‘আমি ষাটি বৎসরের বুড়া, আমিও কি ছেলে মানুষ’। আমি বলি, আপনি ষাটি বৎসরের ছেলে মানুষ। গোপালের মা বলিবেন, ‘আর আমি—? এই আষাঢ় গেলে আশীতে পা দিব, আমিও কি ছেলে মানুষ?’ আমি বলিব, তুমি আশী বৎসরের ছেলে মানুষ। ফলতঃ এ জগতের সকল লোকই ছেলে মানুষ।

রামের বড় কাকা ষাটি বৎসরের ছেলে মানুষ। তিনি যখন ঘোষেদের চাকুর মতন ছেলে মানুষ ছিলেন, তখন ঘুড়ি, লাটু, মারবেল ইত্যাদি তাহার প্রিয় ক্রীড়ার সামগ্রী ছিল। ক্রমে যত বয়স বেশি হইতে লাগিল, দোয়াত, কলম, বহি, শ্লেট ঘাড়ে চাপিল। তার পরে যখন যৌবনের বাতাস গায়ে লাগিল, আয়না, চিরুণী, আলবার্ট ফ্যাশনের চুল ফেরাণ, হাতে ছড়ি ইত্যাদি ক্রীড়ার সামগ্রী সকল ঘুড়ি, লাটু, মারবেল ইত্যাদিকে বেদখল করিল। মনে কর, রামের বড় কাকা এখন যুব ছেলে, লেখা পড়া শিখিয়াছেন। এখন নাটক, নবেল তাঁহার খেলার জিনিস। আফিসে যান, না গেলে চলেনা, তাই যান, কিন্তু মনটা আইবানহোর রেবেকার কাছে, দুর্গেশনন্দিনীর আয়েসার কাছে। এখন মন চিন্তা করিতে শিখিয়াছে, আকাশকুসুমের মালা গাঁথিতে শিখিয়াছে, আকাশে অট্টালিকা গড়িতে শিখিয়াছে। এখন রামের বড় কাকা মৃণালিনীর হেমচন্দ্র হইয়া ভারত উদ্ধার করেন, বিস্মৃত প্রায় সুবর্ণ গ্রামে পুনরায় বঙ্গের রাজধানী স্থাপন করেন, জাতিভেদ ইত্যাদি কুপ্রথা দেশ হইতে দূর করিয়া দেন। তবে এখন কি আর কোন ক্রীড়ার সামগ্রী নাই? আছে, এই সকলের মধ্যে

আর একটি সামগ্রী আছে, প্রিয়তমা ভার্য্যা। সেটিকে ক্রীড়ার সামগ্রী না বলিয়া আরাধ্য বস্তু বলিলেই ভাল হয়। রামের বড় কাকা আফিসে কাজ করেন, ফিরিঙ্গীর গালিগালাজ খাইয়া যেই মনটা ত্যক্ত হইয়া উঠে, অমনি আপনার আ-য়েসানিন্দিতা ভার্য্যার কথা মনে করেন। সেই মধুমাখা কথা, সেই গালভরা হাসি, সেই মলের রুণু রুণু তালে চলন, এসকল মনে পড়িলে সকল দুঃখ দূর হয়। (স্ত্রী লোকের এই প্রকার মোহিনী শক্তি থাকা-তেই বোধ হয়, আমাদের দেশে কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ইত্যাদি দেবতার আ-রাধনা পদ্ধতি চলিত হইয়াছে।) যৌবন-কালে পুরুষের খেলিবার সামগ্রী স্ত্রীলোক।

মনে কর রামের কাকা কালক্রমে যৌ-বনের সীমা ছাড়াইয়া আসিলেন। এখন তাহার ক্রীড়াসামগ্রী কি? এখনকার প্রধান ক্রীড়াসামগ্রী টাকা। টাকা জমা করা সুদের হিসাব করা, এ বড় ভাল খেলা। কিন্তু পরোপকার, আত্মোপকার দান ধ্যান ইত্যাদি কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি ভুলিয়া না গেলে টাকা লইয়া উত্তম খেলা হয় না, অর্থাৎ টাকা জমা হয় না। ফলে যদি পরের দুঃখ দেখিলে তোমার চক্ষে জল আইসে, যদি পরকে অনাহারে থা-কিতে দেখিলে তোমার প্রাণ ফাটে, তবে লক্ষ্মী তোমার প্রতি বাম। চক্ষু দুটি লো-হার কর, প্রাণটি পাথরের কর, তবে স্ত্রী পুরুষে বসিয়া, ব্যাঙ্কের খাতা খুলিয়া, ব-ন্দকি খাতা খুলিয়া টাকার খেলা খেল।

মানুষের প্রথম খেলার সামগ্রী ঘুড়ি, লাটু মারবেল ইত্যাদি; শেষ খেলার সা-মগ্রী কি?—হুঁকা। পুরুষের বয়স যত অধিক হইতে থাকে, হুঁকার সঙ্গে ভাবটা তত বাড়িতে থাকে। এই সময়ে, বরং ইহার পূর্ব্ব হইতে ছেলে মেয়ে ইত্যাদি একটা অতি আনন্দের খেলার সামগ্রী হয় বটে, কিন্তু হুঁকার মতন কেহ নহে। ছেলে মেয়ের বিবাহ দেওয়া, বৈবাহিক প্রভৃতি নূতন কুটুম্ব লাভ করা আমোদের বিষয় বটে, কিন্তু হুঁকার মতন নহে। এ সময়ে হুঁকা আর গৃহিণী, এদুটি না হইলেই নহে, দিবারাত্রে তামাক টানিব, কাশিব, গলার থুথুতে পিকদানি বোঝাই করিব, আর আফিংখোরের মতন বকিব; গৃহিণী এক একবার "হুঁ" বলিবেন। ('হুঁ' না ব-লিলে কথা কহা ভাল লাগে না।) আজি কালি একটা বিলাতী 'ডল' দেশে আ-সাতে এই শেষ খেলাটা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সে বিলাতী 'ডল' কি? বো-তল। যে বাবুরা যৌবন কালে বোতল লইয়া খেলা আরম্ভ করেন, তাঁহাদের অ-নেককে প্রায় পাকা চুলে পরকালে যাইতে হয় না। সুতরাং হুঁকা লইয়া শেষ খেলা হয় না। বোতল রূপ পুতুলের এত আদর কেন? উহা অপেক্ষা আমাদের কালীঘা-টের পুতুল বরং ভাল; তাহার নাক আছে, মুখ আছে, চক্ষু আছে, কিন্তু বোতলের ত ও সব নাই, তবে যে খানে বসাইয়া রাখ, সেই খানে বসিয়া থাকে বটে, কোমরে চন্দ্রহারের মতন চাপরাস আছে বটে, কিন্তু

কোন গড়ন নাই। ঐ চাপরাস থাকাতে আমি উহাকে যমের চাপরাসী বলি। বল দেখি, পাঠক, সত্য কি না?

এতক্ষণ কেবল পুরুষের কথাই বলিলাম, ইহাতে সুন্দরী পাঠিকারা বলিবেন, 'তবে আমাদের কি কোন খেলার সামগ্রী নাই?'

আছে। যদিও তোমরা নিজেই খেলার সামগ্রী; যদিও জগতের লোক সকল খেলাই তোমাদের জন্য খেলে, তবু তোমাদেরও খেলার সামগ্রী আছে। কারণ তোমরাও ছেলে মানুষ। তোমরা ছেলে বেলা পুতুলের বিবাহ দেও; কেন, এ জগতে আর কি কোন খেলা নাই? আছে, তবে কেন পুতুলের বিবাহ? না ওতে মনে বড় সুখ হয়। ছেলে বেলা তোমরা দেও পুতুলের বিবাহ, বড় হইলে নিজের বিবাহ, তার পরে দেও ছেলে মেয়ের বিবাহ। আর একটা খেলিবার জিনিস তোমাদের আছে। মনে করিয়াছিলাম, অমন মোটা কথাটা আপনি বুঝিবে, তাই আগে বলি নাই।—পুরুষ মানুষ। বড়শীতে মাছ গাঁথিয়া যেমন লোকে খেলে, তোমরা তেমনি পুরুষ মানুষকে প্রেমের ডোরে, আদরের বড়শীতে গাঁথিয়া খেলা করিয়া থাক। তোমাদের খেলা হয় বটে, কিন্তু পুরুষের প্রাণ যায়। যায় ই বা বলি কেমন করিয়া?—মানুষ ত জানিয়া শুনিয়া ঐ বড়শী গিলে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে পৃথিবী আপনার কোলে সকল বস্তু টানে। আর তোমরা অলৌকিক মায়াগুণে সকলকে আপনার দিকে টান। তোমরা যখন ভার্য্যারূপিণী, যখন তোমাদের রূপলাবণ্য বলে সূর্য্যের ন্যায় প্রখর, তখন তোমাদের মলের রুণু রুণু শব্দ যুব বাঙ্গালিকে মাতাইয়া তুলে। রণমুখী সিপাহির পক্ষে বিগুলের শব্দ যেমন, আফিসের ফেরত গৃহমুখী বাঙ্গালির পক্ষে তোমাদের মলের শব্দ তেমনই। ভার্য্যারূপে তোমরা স্বামীরূপ পুতুল লইয়া খেলা কর (কেবল বিবাহ দেও না) জননী রূপে তোমরা ছেলে মেয়ে লইয়া জামাই বধূ লইয়া খেলা কর। তোমাদের খেলার সামগ্রীর অভাব কি?

আরও আছে। বাঙ্গালী বধূর একটি প্রধান খেলার সামগ্রী গহনা। এ সামগ্রী বড় কাজের; আহারও বটে, ঔষধও বটে। আমি একবার কোন গহনাপ্রিয় যুবতীকে হঠাৎ একটা কথা বলিয়া বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, অনেক স্ত্রীলোকে স্বামী অপেক্ষা গহনা বেশী ভাল বাসে। তিনি একটু অসন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, 'তাও কি হয়, স্বামী হইতে গহনা লাভ, সুতরাং স্বামীকেই আমরা বেশি ভাল বাসি।' আমিও বড় ঠোঁট কাটা, মেয়ে মানুষ বলিয়া ভয় করিবার পাত্র নহি। বলিলাম, 'তা নাও হইতে পারে; স্বামী না থাকিলে গহনা পরা যায় না, তাই হয় ত স্ত্রীলোকে স্বামীকে ভাল বাসে।'

আবার তোমাদের আয়না, চিরুণী, ফিতা, আল্‌তা ইত্যাদিও খেলার সামগ্রী।

যত দিন প্রাণ থাকে, তত দিন ইহা লইয়া তোমরা খেলা করিয়া থাক। আজিকালি পুরুষেরা যেমন পাকা চুলে টেকি কাটে, তোমরাও তেমনি পাকা চুলে টেল বাঁধ। তোমাদের খেলার সামগ্রীর অভাব কি?

শ্রীরা হা—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সারমর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অষ্টম দিন।

গোপী। সাধিভূত ও সাধি যজ্ঞে কি প্রভেদ তাহা আমি তোমাকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতেছি। 'ঈশ্বর সাধিভূত' ইহার অর্থ এই যে 'প্রাণিগণের মধ্যে শয়ন, ভোজন, সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়, ঈশ্বর তাহাদের মূলে অবস্থান করেন। 'ঈশ্বর সাধিযজ্ঞ' ইহার অর্থ এই যে "মনুষ্যের মধ্যে দয়া, ধর্ম্ম, পরোপকার, ঈশ্বরোপাসনা প্রভৃতি প্রাণী হইতে বিভিন্ন যে কয়েকটি বিশেষ কার্য্য সম্পাদিত হয়, ঈশ্বর তাহাদেরও মূলে বিদ্যমান আছেন।' কি প্রাণী, কি প্রাণীশ্রেষ্ঠ ও প্রাণীতর মনুষ্য যেখানে যাহা কিছু সঙ্ঘটিত হইতেছে, সে সমস্তেরই মূলে নিয়মময় মঙ্গলাধার ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধ করা যাইতে পারে।

বিনোদ। গীতার 'ঈশ্বর' কিরূপ আমি এখনও তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না।

গোপী। ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা সহজ কথা নহে। অষ্টম অধ্যায়ে ঈশ্বরের যে সমস্ত লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, আমি একে একে তাহাদের বর্ণনা করিতেছি।

'ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্যা-নির্ম্মাতা, অনাদি, সর্ব্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর সকলের বিধাতা, মহান্ হইতেও মহান্, সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, প্রকৃতির অন্ধকার (মায়া মোহ), হইতে দূরে অবস্থিত'। ঈশ্বর সংসারের কারণীভূত, ঈশ্বর কারণের কারণীভূত অত্যুৎকৃষ্ট পদার্থ। ঈশ্বর অনাদি, সর্ব্বচরাচরের বিনাশ হইলেও ঈশ্বরের বিনাশ হয় না'।

বিনোদ। এখনও ভাল করিয়া বুঝিলাম না। 'কারণের কারণীভূত' ইহার অর্থ কি?

গোপী। পৃথিবীর গতির কারণ কি?

মনে করুন আকর্ষণ বা মধ্যাকর্ষণ উহার কারণ। ঈশ্বর ঐ কারণের কারণ। এই-রূপে যদি ক্রমোন্নতিকে জীবপ্রবাহের কারণ বলাযায়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে ঐ ক্রমোন্নতির কারণ বলিতে হইবে।

বিনোদ। মনে কর যেন ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝা গেল। কিন্তু ঐ ঈশ্বরকে কিরূপে পাওয়া যাইবে তাহার কোন উপায় কি গীতাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে?

গোপী। হইয়াছে। কৃষ্ণ বলিয়াছেন 'যে মৃত্যুকালে ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে সেই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবে।

'অন্তকালে চ মা মেব স্মরন্
মুক্ত্বা কলেবরং।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি
নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥"

বিনোদ। এত বড় সহজ উপায়। যদি যাবজ্জীবন পাপ করিয়াও মৃত্যুকালে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিলে মুক্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে জীবিতাবস্থায় সৎকার্য্য না করিলেও চলে।

গোপী। শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন, "যস্মাৎ পূর্ব্ববাসনৈব অন্তঃকালে স্মৃতি-হেতুঃ নতু তদা বিবশস্য স্মরণোদ্যমঃ সম্ভবতি তস্মাৎ সর্ব্বদা মাং অনুস্মর, সতত স্মরণং হি চিত্তশুদ্ধিং বিনা ন ভবতি। অতএব যুধ্যস্ব, চিত্তশুদ্ধ্যর্থং যুদ্ধাদি স্বধর্ম্মং অনুতিষ্ঠ"।

অর্থাৎ 'মৃত্যুকালে মনুষ্য বিবশ হয়, তৎকালে তাহার স্মরণোদ্যম থাকে না। পূর্ব্ব অভ্যাস অনুসারে চিরাভ্যস্ত বিষয় সকল তাহার স্মৃতিপথে উদিত হয়। এজন্য যদি কেহ মৃত্যুকালে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহার উচিত যে তিনি চিরকালই ঈশ্বরের স্মরণ করেন, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে ঈশ্বরের সতত স্মরণ হয় না। অতএব স্বধর্ম্ম পালন দ্বারা সকলেরই চিত্তশুদ্ধির চেষ্টা করা উচিত। যুদ্ধই তোমার (অর্জ্জুনের) স্বধর্ম্ম। অতএব তুমি যুদ্ধ কর।

বিনোদ। বেশ কথা। যাবজ্জীবন যে যেবিষয় চিন্তা করে মৃত্যুকালেও তাহার সেই বিষয়ই স্মৃতিপথে উদ্রিক্ত হয়। ভরত রাজা বোধ হয়, এই জন্যই মৃত্যু-কালে মৃগশিশুকে স্মরণ করিয়াছিলেন। স্বপ্নের সময়ও আমাদের পূর্ব্বাভ্যস্ত ও পূর্ব্ব পরিচিত বিষয় সমস্ত মনে উদিত হয়। মৃত্যুকাল একরূপ স্বপ্ন কালের ন্যায়।

গোপী। এক্ষণে কৃষ্ণ ঈশ্বর লাভের জন্য অন্য যেসমস্ত উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাও শ্রবণ কর।

'যে ব্যক্তি বাহ্যেন্দ্রিয় সমস্ত প্রত্যাহৃত করিয়া, বাহ্য বিষয়কে স্মৃতিপথ হইতে দূরীভূত করিয়া, ভ্রূদ্বয় মধ্যে প্রাণ বায়ু সন্নিবেশিত করিয়া, যোগোচিত স্থৈর্য্য অবলম্বন করিয়া, ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে করিতে ও ওঙ্কার উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিতেপারেন, তিনিই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু এইরূপ যোগ ধারণা সমস্ত জীবনের অভ্যাস দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে।

'এবঞ্চকালে (মৃত্যুকালে ধারণয়া মৎ-

প্রাপ্তি নিত্যাভ্যাস বশত এব ভবতি নতু অন্যথা।'

বিনোদ। পূর্ব্বেওত এই উপায়ের কথাই বলা হইয়াছে।

গোপী। হাঁ। তবে পূর্ব্বে যাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা বিস্তারিত রূপে বলা হইতেছে। কিন্তু ইহা ভিন্ন অন্য উপায়ের কথাও গীতাতে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

বিনোদ। সে উপায় বলিবার পূর্ব্বে 'ভ্রূবয়নিবেশিত প্রাণ' পদের অর্থ কি তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও।

গোপী। উহা যোগ শাস্ত্রের কথা। আমি নিজেই উহার অর্থ জানি না। তবে 'প্রাণ' শব্দে 'প্রাণ বায়ু' বুঝিতে হইবে এই পর্য্যন্ত তোমাকে বলিতে পারি।

বিনোদ। যাউক। এক্ষণে ঈশ্বরলাভের অন্য অন্য কি উপায় বলিতে চাও বল।

গোপী। যেসমস্ত শ্লোকে ঐ উপায়ের কথা বলা হইয়াছে, সেগুলি অত্যন্ত কঠিন। টিলাঙ্ নামক বোম্বের পণ্ডিত বলিয়াছেন—"I own I have no clear notion of these lines."

আমিও যে ইহা খুব ভালরূপ বুঝিয়াছি, তাহা নহে। তবে আমি যতদূর ভাবগ্রহ করিতে পারিয়াছি, কেবল তন্মাত্রই বলিতেছি।

কৃষ্ণ বলিতেছেন—'অগ্নি, জ্যোতিঃ, দিন, শুক্লপক্ষ, ও উত্তরায়ণ এই কয়পথে যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারা ব্রহ্মকে চিরকালের জন্য প্রাপ্ত হন। আর যাঁহারা ধূম রাত্রি কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন পথে গমন করেন, তাঁহারা কিয়ৎকালের জন্য স্বর্গ বা নরক সুখ ভোগ করিয়া পুনরায় মর্ত্ত্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জগতে শুক্ল ও কৃষ্ণ নামে দুইটি পথ চিরকাল বিদ্যমান আছে। কেহ বা শুক্ল পথ অবলম্বন করিয়া চিরকাল ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন, কেহবা কৃষ্ণপথ আশ্রয় করিয়া পর লোক হইতে পুনরাবর্ত্তন করেন।'

বিনোদ। এ প্রহেলিকার অর্থ কি?

গোপী। শ্রীধর স্বামীর সাহায্যে আমি এই প্রহেলিকার আংশিক উন্মেষণ করিয়াছি। কৃষ্ণ বলিতেছেন 'যে ব্যক্তি জ্ঞান মার্গের অনুসরণ করেন, জ্ঞান প্রথমে তাঁহার হৃদয়ে বহ্নির ন্যায় উদ্দীপিত হয়। অর্থাৎ বহ্নি যেরূপ কখনও বা বায়ুবশে উদ্দীপিত, নির্ব্বাপিত, সুস্পষ্ট ও ধূমাচ্ছন্ন হয়, মনুষ্যের মনেও জ্ঞান প্রথম প্রথম সেইরূপে কখনও সুপ্রকাশ কখনও বা অন্ধকারাবৃত হইয়া থাকে।'

বিনোদ। ভাল।

গোপী। আরও দেখ। 'যতক্ষণ কোন স্থানে বহ্নি প্রজ্বলিত থাকে ততক্ষণ সেখানে সম্পূর্ণ আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোনরূপে বা কোন কারণে বহ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, সেখানে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের আবির্ভাব হয়। সেইরূপ যিনি জ্ঞানের পদবীতে প্রথম আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে কখনও বা সম্পূর্ণ আলোক কখনও সম্পূর্ণ অন্ধকার বিরাজিত

হয়। এবং যেমন বহ্নি ক্ষণে প্রজ্বলিত ও ক্ষণে নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানবহ্নিও প্রথম প্রথম দণ্ডে দণ্ডে উদ্দীপিত ও দণ্ডে দণ্ডে নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে।

বিনোদ। তার পর।

গোপী। তার পর কৃষ্ণ জ্ঞানের দ্বিতীয় অবস্থার সহিত দিবসের তুলনা করিতেছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন—যখন জ্ঞানের পরিপক্কতা কিয়ৎ পরিমাণে সম্পাদিত হয়, তখন জ্ঞানালোক দিবালোকের ন্যায় বহুক্ষণ স্থায়ী হইয়া উঠে। দিবসে ঝড় ঝটিকা কুজ্ঝটিকা প্রভৃতি কতই দুর্ঘটনা হইয়া থাকে। কিন্তু কিছুতেই দিবসে আলোকের সম্পূর্ণ তিরোভাব বা অন্ধকারের সম্পূর্ণ আবির্ভাব হয় না। সেইরূপ যদিও জ্ঞানের দ্বিতীয় অবস্থায় জ্ঞান-সূর্য্য মধ্যে মধ্যে সন্দেহ মেঘ বা কুতর্ক ঝটিকা দ্বারা আক্রান্ত হয় বটে, কিন্তু ঐ অবস্থায় জ্ঞানের সম্পূর্ণ তিরোভাব হয় না।"

বিনোদ। বুঝিলাম। বলিয়া যাও।

গোপী। "জ্ঞানের তৃতীয় অবস্থার সহিত শুক্ল পক্ষের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ যেমন শুক্ল পক্ষে প্রায় সমস্ত অহোরাত্রই জগৎ আলোকিত থাকে সেইরূপে জ্ঞানের তৃতীয় অবস্থায় প্রায় সমস্ত অহোরাত্রই হৃদয়মন্দির জ্ঞানালোকে বিভাসিত থাকে। শুক্ল পক্ষে প্রতিদিন আলোকের বৃদ্ধি ও অন্ধকারের হ্রস্বতা হয়। সেইরূপ জ্ঞানের তৃতীয় অবস্থায় প্রতিদিন জ্ঞানের বৃদ্ধি ও অজ্ঞানতার হ্রাস হইয়া থাকে।

"জ্ঞানের চতুর্থ অবস্থার সহিত ষণ্মাসব্যাপী উত্তরায়ণের উপমা দেওয়া হইয়াছে। উত্তরায়ণে সূর্য্য ছয়মাস আমাদের মস্তকোপরি বিরাজ করেন। সেইরূপে জ্ঞানের চতুর্থ অবস্থায় জ্ঞানসূর্য্য একাদি ক্রমে ছয় মাস আমাদের চিদাকাশে বিমল কিরণ বিস্তার করেন।

"জ্ঞানের পঞ্চম অবস্থার সহিত দেবলোকের উপমা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ যেমন দেবলোকে আলোকের নিত্য বিকাশ থাকে ও অন্ধকারের সম্পূর্ণ তিরোধান হয়, সেইরূপে জ্ঞানের পঞ্চম বা চরম অবস্থায় মনুষ্যের হৃদয় জ্ঞানালোকে নিত্য বিভাসিত থাকে।"

"শ্রীধর স্বামী এস্থলে শ্রুতি হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই বচনটী সকলেরই পাঠ করা উচিত। বচনটী এই—তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি; অর্চ্চিষোঽহঃ; অহ্নঃ আপূর্য্যমাণপক্ষং; আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্ ষণ্মাসানুদঙাদিত্য এতি; ষণ্মাসাৎ দেবলোক; ইতি।"

বিনোদ। তার পর বলিতে থাক।

গোপী। তার পর, যিনি কর্ম্মজালে আপনাকে নিবদ্ধ করেন, তাঁহাদের হৃদয়ের কিকি অবস্থা হয়, কৃষ্ণ তাহারও নির্দ্দেশ করিতেছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন—"যাঁহারা কর্ম্মপথাবলম্বী, তাঁহাদের হৃদয়ে অজ্ঞানতা প্রথমে ধূমের ন্যায় উদিত হয়। অর্থাৎ যেমন ধূমের নিম্নে অগ্নি অদৃশ্যভাবে বিরাজিত থাকে, সেইরূপে তাঁহাদের হৃদয়েও প্রথম প্রথম জ্ঞানবহ্নি নি-

তান্ত অস্ফুট ভাবে বিদ্যমান থাকে।

"অজ্ঞানতার দ্বিতীয় অবস্থার সহিত রাত্রির তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ এই অবস্থায় হৃদয় রাজ্যে প্রায়ই অন্ধকার, কেবল মধ্যে মধ্যে জ্ঞান চন্দ্রের ক্ষীণালোক দৃষ্ট হয়, এই পর্য্যন্ত।"

"অজ্ঞানতার তৃতীয় অবস্থার সহিত কৃষ্ণ পক্ষের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ এই অবস্থায় ক্রমাগতঃই অন্ধকারের বৃদ্ধি ও জ্ঞানালোকের হ্রাস হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে হৃদয় রাজ্যে অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকারও দৃষ্ট হয়।"

"অজ্ঞানতার চতুর্থ অবস্থার সহিত দক্ষিণায়ণের তুলনা দেওয়া হইয়াছে। দক্ষিণায়ণ কালে সূর্য্য সর্ব্বদাই আমাদের পদতলে অবস্থান করেন। সেইরূপে অজ্ঞান, তার চতুর্থ অবস্থায় আমরা সর্ব্বদাই জ্ঞানালোককে অবহেলা করিয়া থাকি।"

"অজ্ঞানতার পঞ্চম অবস্থার সহিত পিতৃলোকের তুলনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ পিতৃলোক যেমন সর্ব্বদাই গাঢ় অন্ধকারে আবৃত থাকে, সেইরূপে অজ্ঞানতার পঞ্চম অবস্থায় আমাদের হৃদয়ও নিয়ত ঘোর অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে।"

"অজ্ঞানতার ষষ্ঠ অবস্থার সহিত চন্দ্রলোকের তুলনা করা হইয়াছে। চন্দ্রলোক সর্ব্বদাই গাঢ়অন্ধকার ময়। সেখানে সর্ব্বদাই ঝড় বৃষ্টি ইত্যাদি হইয়া থাকে। এইরূপে অজ্ঞানতার ষষ্ঠ অবস্থাতেও মনুষ্য হৃদয়ে নানারূপ অশান্তি, ক্রোধ, কোলাহল প্রভৃতির উদ্রেক হয়। এতদ্ভিন্ন ঐ অবস্থায় হৃদয় রাজ্যে নিয়ত অন্ধকারাকুল হইয়া থাকে।"

"এতৎ সম্বন্ধেও শ্রীধর স্বামী বেদ হইতে এক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। বচনটী এই—তে ধূমং অভিসম্ভবন্তি; ধূমাৎ রাত্রিং; রাত্রেঃ অপক্ষীয়মাণপক্ষং; অপক্ষীয়মাণপক্ষাৎ যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণাদিত্য এতি; মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং; পিতৃলোকাৎ চন্দ্রং; চন্দ্রং প্রাপ্য অন্যং ভবন্তি ইতি।"

বিনোদ। কৃষ্ণ জ্ঞান ও অজ্ঞান এ উভয়ের অবস্থা বড় সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমি এখনও এ সমুদয়ের সারবত্তা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না।

গোপী। পূর্ব্বে জ্যোতিঃ ও অন্ধকার সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে কৃষ্ণ নিজেই তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম একটি শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণ বলিয়াছেন—

'শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥'

অর্থাৎ সংসারে চিরকাল মনুষ্য শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই গতি অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। যাহারা শুক্ল পথ অবলম্বন করে তাহারা ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়, আর যাহারা কৃষ্ণ পথ অবলম্বন করে, তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। যাঁহারা সত্ত্বগুণ প্রণোদিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানমার্গে আরোহণ করেন, তাঁহাদের পুনর্জন্ম হয় না। যাঁ-

হারা রজোগুণ প্রণোদিত হইয়া কাম্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কিছুকাল স্বর্গ ভোগ করিয়া পুনরায় মর্ত্ত্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, 'কাম্যকর্ম্মভিশ্চ স্বর্গভোগানন্তরং আবৃত্তিঃ।' আর যাহারা তমোগুণ প্রণোদিত হইয়া নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা কিছুকাল নরক ভোগ করিয়া পুনরায় মর্ত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। 'নিষিদ্ধকর্ম্মভিস্তু নরকভোগানন্তরং আবৃত্তিঃ।

বিনোদ। কৃষ্ণ পূর্ব্বে কর্ম্মের এত প্রশংসা করিয়া এক্ষণে আবার কর্ম্মের নিন্দা করিতেছেন কেন?

গোপী। যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য আত্মসুখ বা যশঃ বা ভোগ, কৃষ্ণ সেই সমস্ত কর্ম্মের নিন্দা করিতেছেন। যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান, যে কর্ম্ম 'জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে, সে কর্ম্মের নিন্দা করা হইতেছে না। শ্রীধর স্বামীও টিকায় বলিতেছেন 'ক্ষুদ্রকর্ম্মণাস্তু জন্তুনাং অত্রৈব পুনঃ পুনর্জন্ম ইতি দ্রষ্টব্যং।' যাহারা ক্ষুদ্রকর্ম্মা অর্থাৎ যাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশয়ে কর্ম্ম করেন, তাঁহাদিগকে নিন্দা করা হইতেছে। কিন্তু যিনি নিষ্কামচিত্তে স্বধর্ম্মাচরণ রূপ কর্ত্তব্য কার্য্য প্রতিপালন করেন, জ্ঞান যাহার কর্ম্মের উদ্দেশ্য, সেই মহৎকর্ম্মা ব্যক্তিকে নিন্দা করা হইতেছে না।

শ্রীনীঃ—

নিন্দা ও প্রশংসা।

বাঙ্গালীর উন্নতির জন্য দুই দল লোকে দুইরূপ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, বাঙ্গালী মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক, অসার, কাপুরুষ; ইঁহারা ভাবেন যে দোষ প্রদর্শনাকরাই উন্নতির প্রথম ও মুখ্য উপায়। কেহ বলেন বাঙ্গালী বুদ্ধিমান্, সদাশয়, মহানুভব, ও দয়াপ্রবণ; ইঁহারা ভাবেন, যে প্রশংসা না করিলে উৎসাহ জন্মেনা। এই দুই দলের সঙ্কল্প সাধু ও সম্মানার্হ। এবং প্রত্যেকদলেই কিয়ৎপরিমাণে সত্যের পদানুসরণ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালীর চরিত্রে এমন অনেক গুলি দোষ আছে, যাহা উৎপাটন করা অতীব প্রয়োজনীয়। আবার বাঙ্গালীর চরিত্রে এমন অনেকগুলি গুণ আছে, যাহা বাঙ্গালীর শত্রুরাও প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। এই সমস্ত কারণে যাঁহারা বাঙ্গালীর উন্নতি কামনা করিয়া বাঙ্গালীদিগকে নিন্দা বা প্রশংসা করেন, সে উভয় দলকেই আমরা মনের সহিত ভক্তি ও সম্মান করিয়া থাকি।

কিন্তু এস্থলে ইহাও দেখা উচিত যে নিন্দা ও প্রশংসা এ উভয়েরই স্থানকালপাত্র ভেদ আছে। অর্থাৎ স্থান কালপাত্র ভেদে আমাদের কোথাও বা নিন্দা এবং কোথাও

বা প্রশংসা করা উচিত। প্রথমে বাঙ্গালীর স্থান কাল পাত্রের কথা একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করা যাউক।

যদি কালের কথা ধরেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়কে বাঙ্গালীর পক্ষে নিতান্ত দুঃসময় বলিতে হইবে। মেকলে অলঙ্কার-চ্ছটা প্রদর্শনের জন্য বাঙ্গালীর চরিত্রে কয়েকটী দোষাবিষ্কার করিয়াছিলেন, মেকলের পরবর্ত্তীরা অণুবীক্ষণ সংযোগে ঐ দোষগুলির পুনঃ পুনঃ আবিষ্কার সংসাধন করিতেছেন। মাদ্রাজের ব্রাহ্মন হইতে আর্ম্মিনিয়ার ইয়াহু পর্য্যন্ত অনেকেই ঐ সকল দোষের আলোচনা করিতেছেন। ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালীর শত্রুর অভাব নাই। বাঙ্গালী অনেকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে। সুতরাং অনেকেই একবাক্যে বলিতেছে যে বাঙ্গালী মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, অসার ও কাপুরুষ।

স্থান সম্বন্ধেও বাঙ্গালীকে বড় দুর্দ্দশাগ্রস্ত বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বে বাঙ্গালীর কালীদাস বা কৃত্তিবাস যাহা বলিত, বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে তাহা পঠিত, আদৃত ও সমালোচিত হইত। এখন আর সেকাল নাই। এখন তুমি যাহা বল বা লেখ তাহা সাধারণ বাঙ্গালীতে শুনে না। তোমার বাঙ্গালা ইংরাজীর তরজমা। তোমার বিষয় গুলি ইংরাজী বিষয় সমস্তের নামান্তর মাত্র। তোমার চিন্তা প্রণালী ইংরাজের চিন্তা প্রণালীর ন্যায়। ইংরাজীতে বিশেষ অধিকার না থাকিলে তোমার ভাব, ভাষা, চিন্তা তর্ক প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। সুতরাং তোমার স্থান কোথায়? তোমার নিন্দা বা প্রশংসা কোথায় গিয়া উপস্থিত হয়? যাহারা তোমার ন্যায় ইংরাজী জানে, তাহারা তোমার কথা শুনিতে চায় না। কেন না তুমি যাহা অতিকষ্টে অনেক বকিয়া ঝকিয়া আংশিক রূপে প্রকাশ করিবা, একজন ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তা অতি সহজে দুই চারি কথায় তাহার মর্ম্ম বলিয়া দিবেন। যিনি সহজ উপায়ে জ্ঞান দুর্গ অধিকার করিতে পারেন, তিনি কেন তোমার সাহায্য গ্রহণ করিবেন? যিনি নিজে পথ জানিতে পারিয়াছেন, তিনি কেন পথ-প্রদর্শকের প্রতীক্ষা করিবেন? তবে যিনি তোমার মত ইংরাজী জানেন না, তিনি তোমার নিকট কয়েকদিনের জন্য সাহায্য গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন। সুতরাং তুমি যাহা বলিবে ও লিখিবে তাহার সংবাদ লইবে অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরিণতবুদ্ধি যুবক। ঐ যুবকের চিত্তবৃত্তির বিষয় বিবেচনা করিয়া তোমাকে বাঙ্গালীর নিন্দা বা প্রশংসা করিতে হইবে।

তাহার পরে পাত্র সম্বন্ধেও বিবেচনা করিয়া দেখ। তুমি যাহাদের নিন্দা বা প্রশংসা করিতে যাইতেছ, তাহারা শত শত বর্ষের দুরবস্থা ভোগ করিয়া এক্ষণে নির্ব্বীর্য্য, নিঃসাহস, ও নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ লোকের পক্ষে নিন্দা ও প্রশংসা এ উভয়ের মধ্যে কোনটি বিশেষ উপযোগী তাহাও বিচার করিয়া দেখা উচিত। নতুবা যদি আপনি ভাবেন যে রোমে হরেস নিন্দা করিয়াছিল, গ্রীসে আরিষ্টফেনিস এবং

ইংলণ্ডে পোপ নিন্দা করিয়াছিল, অথবা ইংলণ্ডে আজিও মাথিউ আরনোল্ড করিতেছে, সুতরাং আপনারও নিন্দা করিবার অধিকার আছে,তাহা হইলে আপনার নিন্দা হইতে হয়ত বিষময় ফল প্রসূত হইতে পারে।

এখন দেখা যাউক নিন্দা করিতে হইলে কাহার নিন্দা করা উচিত এবং প্রশংসা করিলেই বা কাহার প্রশংসা করা উচিত। যে ব্যক্তি অহঙ্কার মদে উন্মত্ত হইয়া হিতাহিত বিবেচনা করিতে অক্ষম হন, কিম্বা যে ব্যক্তি সর্ব্বদা আত্মপ্রশংসা দ্বারা আপনাকে সর্ব্বগুণান্বিত মনে করিয়া আত্মোন্নতি পক্ষে শিথিল-প্রয়াস হন, কিম্বা যে ব্যক্তি আপনাকে সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করিয়া অন্যের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি অমনোযোগী হয়, কিম্বা যে ব্যক্তি অহরহঃ সকলের নিকট আত্মগৌরবের ব্যাখ্যা করেন, কিম্বা যে ব্যক্তি গর্ব্বান্ধ হইয়া অন্যের প্রতি অনাদর তাচ্ছীল্য বা ঘৃণা প্রকাশ করেন, সকলের উচিত যে শত মুখে তাঁহার নিন্দা করেন। গর্ব্বদ্বারা যে ব্যক্তি নিজের ও অন্যের প্রভূত অমঙ্গল সম্পাদন করেন নিন্দা দ্বারা তাঁহাদের সে গর্ব্বের দূরীকরণ করা উচিত।

কিন্তু যে ব্যক্তি স্বভাবতঃই ভীরু, সঙ্কুচিত ও বিনয়ী, অন্যের প্রশংসা পাইবার জন্য যিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট ও সঙ্কুচিত, যাঁহার হৃদয় শিরীষ পুষ্প অপেক্ষাও সুকোমল, যিনি চক্ষু লজ্জার দরুণ শত্রুরও অপমান করিতে কুণ্ঠিত হন, যিনি নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও অন্যকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন, একটি মিষ্ট কথা বলিলেও যিনি বহুকাল সঞ্চিত ক্রোধ প্রভৃতি বিসর্জ্জন দেন, সেই সুকুমারমতি ব্যক্তিকে নিন্দা করা উচিত নহে। তিনি একেই নির্ব্বীর্য্য ও নিরুদ্যম। নিন্দা দ্বারা তাঁহাকে আরও নির্ব্বীর্য্য বা নিরুদ্যম করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

আরও দেখুন, দশ চক্রে ভগবান ভূতোগতঃ হইয়াছিলেন। যদি বাঙ্গালীর শত্রু, বাঙ্গালীর মিত্র উভয়েই বলিতে আরম্ভ করেন যে বাঙ্গালী কাপুরুষ ও অসার, তাহা হইলে একদিন আপনি প্রাতে উঠিয়া দেখিবেন যে বাস্তবিক বাঙ্গালী অসার ও কাপুরুষের জাতি হইয়া উঠিয়াছে। অন্ততঃ ইহা মনে করিয়াও নিন্দার মাত্রা কমাইয়া প্রশংসার মাত্রা বাড়ান উচিত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আপনার নিন্দা ও প্রশংসা উভয়েই অপরিণত-বয়স্ক যুবকের নিকট গিয়া পঁহুছিবে। বল বলুন, সাহস বলুন, উদ্যম বলুন,সকলই যৌবনের সীমায় আবদ্ধ। যৌবন অতিক্রান্ত হইলে ঐ সমস্ত সদ্‌গুণ আপনা হইতেই অন্তর্হিত হইয়া যায়। যৌবনে, নিন্দা দ্বারা, ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের মূলে কুঠারাঘাত করা কর্ত্তব্য কি না, তাহাও অস্মদ্দেশীয় শিক্ষকদিগের বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আর যদিই নিন্দার এত প্রয়োজন হয়, তাহা হইলেই বা বাঙ্গালীর নিন্দুকের অভাব কি? ইংলিসম্যান,ডেলিনিউস,বেঙ্গল টাইমস,সিভিল ও মিলিটারি গেজেট প্রভৃতি যে সমস্ত পত্রিকা

আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়, বাঙ্গালীর নিন্দাই ত তাহাদের উপজীবিকা। তবে আর অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া বাঙ্গালীর নিন্দা না করিলেই ক্ষতি কি?

আরও দেখুন, নিন্দায় কবে কাহার উপকার হইয়াছে? যে শিক্ষক অহরহঃ ছাত্রের নিন্দা করেন, তাঁহা দ্বারা ছাত্রের বা সমাজের কাহারও উপকার হয় না। যে স্ত্রী স্বামীর নিন্দা করেন, সে স্ত্রী সংসারের কণ্টক। যেখানে যে কিছু মতে সৎকার্য্য হইতেছে বা হইয়াছে, সে সকলের মূলে কোথাও কি নিন্দাকে দেখিতে পাইবেন? রায়েঞ্জি কি ইতালীয়দের নিন্দা করিয়াছিল? গ্যারিবল্‌ডি ও ম্যাটসিনি কি ইতালীয়দের নিন্দা করিত? নেলসন কি ইংরাজ সৈন্যের নিন্দা করিয়াছিলেন? যখন উল্‌সলি বা নেপীয়ার সৈন্যবূহকে সমর ক্ষেত্রে প্রেরণ করেন, তখন কি তাঁহারা ইংরাজ সেনার নিন্দা করেন? নেপোলিয়ন কি ফরাসিসদের নিন্দা করিত? ফলতঃ নিন্দার তুল্য (dissoloven) বিশ্লেষক পদার্থ আর নাই। নিন্দাতে বন্ধুত্ব, প্রণয়, অনুরাগ প্রভৃতি সকল প্রকার সংযোগ বিনষ্ট হইয়া যায়। নিন্দা বিষময় পদার্থ। ইহা দ্বারা নিজের উপর ঘৃণা ও অন্যের উপর বিদ্বেষ জন্মে। যিনি আপনাকে আপনি ঘৃণা করেন, তাঁহা হইতে কোন কার্য্য সম্পাদিত হয় না; কেননা তিনি কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন না। আর যিনি অন্যকে বিদ্বেষ করেন, তিনি যতই কেন বুদ্ধিমান্ বা বিদ্বান্ হউন না কেন, তাঁহা দ্বারা সমাজের কোন কার্য্যই সম্পাদিত হইতে পারে না; কেননা অন্যের সহিত সম্প্রীতিই সামাজিক কার্য্যের প্রাণ। এতদ্ভিন্ন নিন্দার আর এক কুফল এই যে, যে আপনি নিন্দিত হয়, সে অন্যকে নিন্দা করিতে ইচ্ছা করে। যে নিন্দা দ্বারা এ সমস্ত কুফল প্রসূত হয়, সে নিন্দাকে আমাদের সকলেই পরিহার করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু যেখানে নিন্দনীয় পদার্থ দেখা যাইবে সেখানেও কি নিন্দা পরিহার করিতে হইবে? আমাদের বিবেচনায় নিন্দা সকল স্থলেই পরিহর্ত্তব্য। কেননা নিন্দায় নিন্দনীয় বিষয়ের পরিশোধন বা পরিবর্জ্জন হয় না। নিন্দা করিলে নিন্দিত ব্যক্তির দোষ সমস্ত বদ্ধমূল হইয়া যায়। ইহা দ্বারা এরূপ বলা হইতেছে না যে নিন্দনীয় বিষয়েরও প্রশংসা করিতে হইবে। নিন্দনীয় বিষয়ের নিন্দা সংক্ষেপে সমাপন করিয়া প্রশংসনীয় বিষয়ের সম্যক্ প্রশংসা করিলেই সব দিক রক্ষা হইতে পারে। যে ক্ষেত্রে কণ্টক বৃক্ষ জন্মে, সে ক্ষেত্র হইতে কণ্টক মূল উৎপাটন করিতে হইলে তাহাতে অন্য বীজ রোপণ করা আবশ্যক। যিনি অহোরাত্র কেবল কণ্টকোন্মূলন করেন, তাঁহা হইতে শুদ্ধ যে কোন সুফল পাওয়া যায় না, এমন নহে, তাঁহা দ্বারা কণ্টকোন্মূলন কার্য্যও সুচারু রূপে সম্পাদিত হয় না। এই জন্যই আমরা আমাদের দেশের গণ্য মান্য ব্যক্তিগণকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা নিন্দার মাত্রা একটু কমাইয়া প্র-

শংসার মাত্রা একটু বাড়াইয়া দেন। সকল জাতির প্রতিই সকল কালে নিন্দা ও প্রশংসা উভয়ই প্রযুক্ত হইতে পারে। যিনি স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া ঐ উভয়ের মধ্যে পরিমাণ ঠিক রাখিতে পারেন তিনিই বুদ্ধিমান্।

আমরা স্বীকার করিয়া লইতেছি যে, বাঙ্গালীর চরিত্রে অনেক দোষ আছে। কিন্তু যে দোষগুলি সাধারণতঃ বাঙ্গালীর স্কন্ধে অর্পিত হয় তাহাদের মধ্যে অনেক গুলিই আমাদের নিকট অসার ও অযৌক্তিক বলিয়া বোধহয়। বাঙ্গালী প্রথমে দেবদেবীর অবমাননা করিয়া এক্ষণে আবার দেবদেবীর প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে বলিয়া অনেকে বাঙ্গালীকে তিরস্কার ও উপহাস করিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু ইহার মধ্যে তিরস্কার বা উপহাসের বিষয় কিছুই দেখিতে পাই না। যখন প্রধান প্রধান ইংরেজ (মেকলে প্রভৃতি) ও প্রধান প্রধান বাঙ্গালী (রামমোহন রায় প্রভৃতি) একস্বরে বলিয়াছিলেন যে দেবদেবী মিথ্যা তখন বাঙ্গালী বিশ্বাস করিয়াছিল যে দেব দেবী মিথ্যা। আবার আজ কাল প্রধান প্রধান ইংরেজ (মেক্স মুলার, কাউয়েল প্রভৃতি) ও প্রধান প্রধান বাঙ্গালী (রাজেন্দ্র লাল ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি) বলিতেছে যে, দেবদেবী * মিথ্যা নহে, আর অমনি বাঙ্গালীরা বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিতেছে যে দেবদেবী মিথ্যা নহে। ইহাতে তিরস্কার বা উপহাস কেন? আমাদের অমরাবতী (ইংলণ্ড) তেও এইরূপ হইয়া থাকে। মিল বলিলেন প্রয়োজনবাদ ঠিক। বার আনা ইংরাজে তাহাই স্বীকার করিয়া লইল। হক্সলি বলিলেন ঈশ্বর অজ্ঞেয়। আর সকলে তাহাই স্বীকার করিয়া লইল। ফলতঃ প্রধান প্রধান লোকে যাহা বলে, সাধারণে তাহা বিশ্বাস করে ইহাই ত স্বাভাবিক নিয়ম। বাঙ্গালী ঐ স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্ত্তী বলিয়া তাহাকে উপহাস করা নিতান্ত অসঙ্গত। তাহার পর বাঙ্গালীর শরীরে বল নাই বলিয়া বাঙ্গালীকে নানারূপ ব্যঙ্গ ও তিরস্কার করা হইয়া থাকে। শারীরিক বলই যদি প্রশংসার উপযুক্ত কারণ হয় তাহা হইলে লালবাজারের টমলিনসন প্রেসিডেন্সীর টনি অপেক্ষা অধিক প্রশংসাভাজন। কারণ টমলিনসনের কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর আঘাতে টনিকে ধরাশায়ী হইতে হয়। এইরূপে আরও অনেক সময়ে বিনা কারণে বাঙ্গালীকে গালি খাইতে হয়। যাহারা মিত্রভাবে বাঙ্গালীর নিন্দা করেন, তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত, বাঙ্গালী কোন্২ বিষয়ে প্রকৃত পক্ষে নিন্দার পাত্র। বাঙ্গালী ভৃত্য, ইংরেজ প্রভু। এস্থলে যদি বাঙ্গালী ইংরেজের খোসামোদ করে, তাহা হইলে ঐ খোসামুদীকে চরিত্রগত কলঙ্ক বলা কি উচিত? যেখানে প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ সেখানে ঐরূপ খোসামুদী হইবেই হইবে। ইংরাজের ইংরাজ যে গ্লাডষ্টোন তিনি কি তাঁহার প্রভুস্থানী

* দেবদেবী বলিতে হিন্দুধর্ম্ম বুঝিতে হইবে।

ইলেক্টরগণের তোষামোদ করেন না ? আমি অনেক ইংরেজ দেখিয়াছি যাঁহারা কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমাদিগেরও তোষামোদ করিয়াছেন। ফলতঃ তোষামোদ আমাদের ভাগ্যের দোষ, চরিত্রের দোষ নহে। যদি কখনও বাঙ্গালীর ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হয় (নিন্দা করিলে হইবে না) তখন দেখিবে এই বাঙ্গালীরই কতলোক খোসামুদী করিবে। আর যদি বাঙ্গালী বাস্তবিকই খোসামুদে হইত, তাহা হইলে আজি বাঙ্গালী ইংরেজের এত চক্ষুঃশূল হইয়াছে কেন ?

তবে কি বাঙ্গালীর নিন্দনীয় কোন দোষ নাই ? আছে বৈ কি ? যে দেশ অনন্ত কাল পরাধীনতা সহ্য করিতে পারে, সে দেশের অনেক দোষ আছে। কিন্তু সে দোষ গুলি মেকলের হেষ্টিংস পাঠে জানা যাইবে না। কোন বিদেশীয়ের সাধ্য নাই যে তিনি আমাদের চরিত্রগত দোষ গুলি বাঁছিয়া বাছিয়া বাহির করেন। আমাদের দোষ আমরাই বাহির করিতে পারি। যদি আমরা না পারি অন্যে পারিবে না। ইংরাজেরা বা ইংরাজানুযায়ী বাঙ্গালীরা যে সমস্ত দোষ আমাদের চরিত্রে আবিষ্কার করিয়াছেন, সে গুলি অনেক স্থলে দোষই নহে। প্রকৃত দোষ যাহা তাহা আমাদের মর্ম্মাভ্যন্তরে লুকায়িত থাকিয়া পুষ্পগত কীটের ন্যায় আমাদের জীবনীশক্তির অপচয় করিতেছে। ধৈর্য্য, বিচক্ষণতা, মমতা, অনুরাগ প্রভৃতি অনুবীক্ষণের সাহায্য না লইলে ঐ সমস্ত কীটের অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে না।

বাঙ্গালীর একটা দোষের কথা এক্ষণে মনে পড়িল। বাঙ্গালীর তালবোধ নাই। বাঙ্গালীর সকলেই নারদ ঋষির ন্যায় আপনার গানে আপনি উন্মত্ত। কিরূপে পাঁচ জনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে হয় বাঙ্গালী তাহা জানে না। যদি সকল যন্ত্রীই নিজ নিজ যন্ত্রের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া চলে, তাহা হইলে ঐকতান রক্ষা হয় না। তাহা হইলে পদে পদে তালভঙ্গ হয়। বাঙ্গালির অনেক কার্য্যেই এইরূপ তালভঙ্গ হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর মধ্যে কেহ বা জ্ঞান-যন্ত্রে, কেহ বা ভক্তি-যন্ত্রে, বা কর্ম্ম-যন্ত্রে, কেহ বা প্রেম-যন্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গীয়দের মধ্যে ঐকতানের চেষ্টা নাই। বাঙ্গালীর সমাজের যে নাচিতেছে বা গাহিতেছে সে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ঐরূপ করিতেছে। তাহাকে তালে নাচাইতেছে বা গাহাইতেছে না। কিন্তু এই যে তাল বোধের অভাব, ইহাকেও আমি চরিত্র গত দোষ বলিতে পারিতেছি না। বাঙ্গালীদের মধ্যে যে গ্রাম্য সমিতির (Village community) প্রথা ছিল সেই প্রথা বলে আমাদের এই তালকাণাত্ব ঘটিয়াছে। এক্ষণে গ্রাম্য সমিতির তিরোধান হইয়াছে, আর আমাদেরও অল্পে অল্পে ঐকতান রক্ষার চেষ্টা হইতেছে। অবস্থা বশে চরিত্র মধ্যে যে দোষ সঞ্জাত হইয়া ছিল, অবস্থার পরিবর্ত্তনে সে দোষ উন্মূলিত হইতেছে। আজি বাঙ্গালীর মত ঐকতান-প্রয়াসী জাতি হিন্দুস্থানের আর কোথায় দেখিতে পাইবে ?

সমবেত হইয়া কার্য্য করিবার ইচ্ছা বাঙ্গালীর যেরূপ জন্মিয়াছে এরূপ আর কাহারও নহে। কালে এই ইচ্ছা বলবতী হইলে ঐকতানের ক্ষমতাও জন্মিবে।

বাঙ্গালীর দোষের কথা অনেকে অনেক প্রকারে বলিয়াছেন। কিন্তু প্রশংসার কথা কেহই প্রায় বলেন নাই। ইহার কারণ এই যে দোষ ধরা অতি সহজ। প্রশংসনীয় বিষয়ের অবধারণ করা অতীব কঠিন।

তৃণবৎ ভাসে দোষ জলের উপরে।
রত্ন যদি চাও তবে প্রবেশ ভিতরে॥

আমরা বাঙ্গালির একটী প্রশংসার কথা বলিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

মেদিনীপুর,বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা এ উভয়ের মধ্যবর্ত্তি স্থান। মেদিনীপুরে বাঙ্গালা হইতে চাটুর্য্যে, মুখুয্যে, ঘোষ বসু মিত্র প্রভৃতি মহাশয়েরা গিয়া বাস করিতেছেন। এবং উড়িষ্যা হইতে মাইতি, জানা, বেরা প্রভৃতি মহাশয়েরাও আসিয়া মেদিনীপুরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন। মহারাষ্ট্র হইতে সামন্ত পাত্র, মহাপাত্র প্রভৃতি মহাশয়েরা ও উঠিয়া আসিয়াছেন। এই তিন জাতি (বাঙ্গালী, উড়িয়া ও মারহাট্টা) মেদিনীপুরে একত্র বাস করিতেছে। উড়িয়া বংশীয় মহাশয়দের সংখ্যাই বোধ হয় মেদিনীপুরে অধিক। মারহাট্টা বংশীয়দের সংখ্যাও বড় কম নহে। বাঙ্গালীবংশীয়দের সংখ্যা বড় অল্প। এই তিন জাতি আজিও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করিতেছে। কিন্তু মেদিনীপুরে সমাজপতি কে? মেদিনীপুরে প্রধান প্রধান যে কয়েকটী বংশ আছে তাঁহারা কোন্ বংশীয়? কাঁহাদের বিধানে ব্যবস্থায় মেদিনীপুর পরিচালিত হয়? যদি বাঙ্গালী নিতান্তই অসার ও কাপুরুষ হইত, তাহা হইলে কি পূর্ব্বোক্ত নাতিপ্রতিযোগিতায় বাঙ্গালী আপন প্রভুত্ব ও প্রাধান্য সংস্থাপিত করিতে পারিত? শুদ্ধ চাতুর্য্য বা শুদ্ধ খোসামুদী দ্বারা কে কবে প্রধান হইয়াছে?

মেদিনীপুরে বাঙ্গালী যেরূপ প্রভুত্ব সংস্থাপন করিয়াছে, বোধ হয় চট্টগ্রাম শ্রীহট্ট প্রভৃতি দেশেও সেইরূপই করিতে সক্ষম হইয়াছে। ঘোষ বসু চাটুর্য্যে মুখুয্যে মহাশয়েরা যে পার্ব্বত্য জাতিসমূহের দ্বারা পরাভূত হইয়াছেন এরূপ বিশ্বাস হয় না।

কিন্তু এসব কথা ইতিহাস পাঠ দ্বারা প্রমাণিত ও দৃঢ়ীকৃত করিতে হইবে। যাহারা আমাদের শত্রু তাহারা ত আমাদের নিন্দা করিবেই, তাহাদের সহিত যোগ দিয়া নিজের নিন্দাস্রোতঃ বর্দ্ধিত করিলে নির্ব্বোধের ন্যায় কর্য্য করা হইবে। অতএব হে বন্ধুগণ! তোমাদের ইতিহাসে ও তোমাদের চরিত্রে কি কি প্রশংসনীয় বিষয় পাইতে পার তাহার অনুসন্ধানে সচেষ্ট হও। এবং সেই প্রশংসার সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিয়া আপনাকে ও স্বজাতিকে সম্মানিত কর! নিজের উপর নিজের সম্মান না জন্মিলে কোন কার্য্য হইবেনা। "Above all, trust thyself."

ডাক্তার সাহেবের মেম।

বাঙ্গালির মেয়েরা আজি কালি স্বাধীনতা লাভ করিতে চাহিতেছেন, স্বাধীনতা তাঁহাদের লাভ করা উচিত কি অনুচিত, আমি সে বিষয়ে কিছু বলিতে চাই না; কেবল ডাক্তার সাহেবের মেমের বিবরণ তাঁহার মুখে বলাইব, পাঠ করিলে উপকার হইতে পারে।

রিচার্ড মেকেঞ্জি আমাদের গ্রামের পুরোহিতের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমা অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়। রিচার্ডের সঙ্গে আমার বাল্য প্রণয়। ছেলে বেলা এক সঙ্গে সমুদ্রের ধারে বেড়াইতাম, গাছতলায় বসিয়া গান গাহিতাম, আমি গাহিতাম

"Bartie and I'll play together."

এ গানটী রিচার্ড বড় ভাল বাসিত

রিচার্ড বড় হইয়া লণ্ডনে গেল, আমি বড় হইয়া বেড্‌ফর্ডের এক স্কুলে গেলাম। ছুটির সময়ে উভয়ে বাড়ী যাইতাম, আবার দিন কতক আগেকার মতন দুই জনে বেড়াইতাম, ফলতঃ আমরা যত বড় হইতে লাগিলাম, আমাদের ভাল বাসা তত বাড়িতে লাগিল, শেষে স্থির হইল, রিচার্ডের সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে। রিচার্ড বড় সুন্দর পুরুষ, ভারী আমুদে, ছুটির সময় যখন আসিত, সমস্ত দিন আমাকে লণ্ডন সহরের আশ্চর্য্য বিষয় সকল বলিত, মা পিয়ানো বাজাইতেন, আমরা দুই জনে নাচিতাম। হায়, সে দিন কোথায় গেল? এখন কোথায় বা রিচার্ড, কোথায় বা আমি?

কয়েক বৎসর পরে রিচার্ড ডাক্তর হইয়া ভারতবর্ষে গেল। আমি স্কুল ছাড়িয়া বাড়ী গিয়া মায়ের কাছে রহিলাম। রিচার্ড যাইবার সময়ে আমার গলা ধরিয়া কাঁদিতে২ বলিয়া গেল, "আমার দেহ ভারতবর্ষে যাইতেছে বটে, কিন্তু প্রাণটী রহিল মেরির কাছে।" আমার নাম মেরি, আমরা স্ত্রী পুরুষে নাম ধরা ধরি করি, শুনিয়াছি ভারতবর্ষেও এসে এই প্রথা চলিতেছে। এ বড় ভাল। স্বামী যে হৃদয়, প্রাণের প্রাণ তার সঙ্গে আবার আদব কায়দা কি? তাকে প্রাণ ভরিয়া নাম ধরিয়া ডাকিব।

কি ডাকে রিচার্ডের পত্র পাইতাম, আমিও কি ডাকে রিচার্ডকে পত্র লিখিতাম, এক পত্রে রিচার্ড লিখিয়াছিল, স্ত্রী জাতি মনুষ্যসমাজের জীবন, তখন এ কথায় আমি অনুমোদন করিয়াছিলাম, এখন করি না; এখন বুঝি, স্ত্রী জাতি মনুষ্য-সমাজের বিষবৃক্ষ।

রিচার্ডের বিরহে এক এক মাস এক এক যুগ বোধ হইতে লাগিল, বহু কষ্টে দুই বৎসর গেল। রিচার্ড এই বারে ছুটি পাইয়া

দেশে আসিবে, এই বারে আমাদের বিবাহ হইবে। কিন্তু বড় আশায় নিরাশ হইলাম, রিচার্ড ছুটি পাইল না। স্থির হইল, আমি ভারতবর্ষে যাইব, রিচার্ড কলিকাতায় আসিবে, সেই খানে বিবাহ হইবে। আমার আনন্দের আর সীমা রহিল না। যাইবার বন্দোবস্ত ঠিক হইল। আমাদের গ্রামের একজন লোক জাহাজের কাপ্তান, তাঁহারই জাহাজে আমার যাওয়া স্থির হইল। মা কাপ্তান ও তাঁহার স্ত্রীর হাতে আমাকে সমর্পণ করিলেন। বিদায় কালে মায়ের গলা ধরিয়া কাঁদিলাম, শ্বশুর শাশুড়ীর গলা ধরিয়া কাঁদিলাম। কিন্তু আমার মন ভারতবর্ষে।

জাহাজে অনেক সাহেব, অনেক মেম, সকালে বিকালে যখন ডেকের উপরে পাইচারি করিতাম বা বসিয়া সমুদ্রের রঙ্গ দেখিতাম, তখন একজন যুবক বড় গায়ে পড়িয়া আমার সঙ্গে কথা কহিত, তাহার নাম কাপ্তান নিকলসন। কাপ্তান নিকলসন প্রায় আমার সমবয়স্ক, সুশ্রী পুরুষ, বীরাকৃতি ও বীরপ্রকৃতি। ক্রমে আমাদের ভারী ভাব হইল, দুই জনে ডেকে বসিয়া ভারতবর্ষের বিষয়ে, সাহিত্য বিষয়ে, নানা বিষয়ে কথা বলি। আহারের সময়ে কাপ্তান নিকলসন আমার পাশে বসেন, নানা প্রকারে আমাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। সাম্পিন ঢালিয়া প্রথমে আমাকে দেন, আমি কোন জিনিষ চাহিলে নিজে আনিয়া দেন; ডেকের উপর বসিবার জন্য আমার মোড়াটী নিজে হাতে করিয়া লইয়া যান। আমাদের দুই জনের এই প্রকার ভাব দেখিয়া, একদিন কাপ্তানের স্ত্রী আমাকে পাকে প্রকারে অনেক বুঝাইলেন। তিনি বলিলেন, জাহাজে লোকের সঙ্গে বড় একটা মিলিতে নাই। কত রকমের লোক এখানে আসে, তাহার ঠিক কি? কোন একটা গোল হইলে কাপ্তানের নিন্দা হয়।

আমি এসকল কথার মানে বুঝিলাম। বৈকাল বেলা কাপ্তান সাহেব আহারের সময়ে আমাকে ডাকিয়া আপনার কাছে বসাইলেন, কিন্তু দূরে বসিলেও কাপ্তান নিকলসনের সঙ্গে আমার ইসারা চলিতে লাগিল। আহারান্তে ডেকে গেলাম, আমি ডেকের এক ধারে দাঁড়াইয়া কাপ্তান নিকলসনের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলাম। কাপ্তানের স্ত্রীর কাছে আসিবার সাধ্য নাই; কারণ আমাদের সমাজে যদি দুই জনে নিরালা কথা কহে, তবে তাহাদের কাছে অন্যের যাওয়া নিতান্ত অভদ্রতা।

প্রকৃত কথা এই, নিকলসনের উপর আমার ভাল বাসা পড়িয়া গেল। আমি এখন ভারী শঙ্কটে পড়িলাম। রিচার্ডকে ভাল বাসি, নিকলসনকেও ভাল বাসি। রাত্রে শুইয়া২ ভাবি, কখন ও বোধ হয়, রিচার্ড ভাল, কখন বোধ হয়, নিকলসন ভাল। কিন্তু রিচার্ডকেই বিবাহ করিতে হইবে, বিবাহের দিন পর্য্যন্ত ধার্য্য হইয়াছে। অথচ নিকলসনকেও ভুলিতে পারি না। কখন নিকলসন, কখনও বা রিচার্ড। বিদায় কালে নিকলসনকে বলিলাম, তোমাকে

বিবাহ করিতে পারি না বটে, কিন্তু যাবজ্জীবন ভাল বাসিব।

কলিকাতার ঘাটে আসিয়া জাহাজ লাগিতে না লাগিতেই রিচার্ড জাহাজে আসিয়া আমায় সপ্রেম সম্ভাষণ করিল। তখন নিকলসন আমার কাছে দাঁড়াইয়া, রিচার্ডের সঙ্গে নিকলসনের আলাপ করাইয়া দিলাম।

আমাদের বিবাহে নিকলসনের নিমন্ত্রণ হইল, প্রাণ ভরিয়া নিকলসনের হাত ধরিয়া নাচিলাম।

আমার স্বামী কানপুরে থাকিতেন, বিবাহের পরে সেই খানে গেলাম, সমস্ত শীত কাল সুখে রহিলাম। ঘন ঘন নিকলসনের চিঠি পাইতাম, বিচ্ছেদে বরিয়া তাহার প্রতি ভাল বাসাটা বাড়িয়া উঠিল, মার্চ্চ মাসে নিকলসন বদলি হইয়া কানপুরে আইল, অবকাশ সময় নিকলসন আমাদের বাটীতেই কাটায়। আমার স্বামী ডাক্তার, সকালে উঠিয়াই হাস্পাতালে যান, আমি নিকলসনের সঙ্গে ঘোড়া চড়িয়া বেড়াইতে যাই। শুনিয়াছি হিন্দু সমাজে পর পুরুষের সঙ্গে বেড়াইতে যাওয়া স্ত্রী লোকের পক্ষে ভারী লজ্জার বিষয়, বিলাতেও তাই, কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরাজ সমাজে ইহা দোষ বলিয়া গণ্য নহে। মনে কর, আমার স্বামীর বন্ধু যদি আমাকে লইয়া বেড়াইতে যাইতে চাহেন, আর আমার স্বামী তাহাতে আপত্তি করেন, তাহা হইলে বন্ধুর অপমান করা হয়।

নিকলসনের সঙ্গে নিতান্ত প্রণয় হইল। কিন্তু আমার স্বামীর মনে কোন সন্দেহ নাই। অত্যন্ত গ্রীষ্ম হওয়াতে স্বামী আমাকে নাইনিতালে পাঠাইলেন, নিকলসনেরও যাইবার খুব ইচ্ছা, কিন্তু ছুটি পায় না। আমার স্বামী ডাক্তার, তিনি সার্টিফিকট দিলেন, নিকলসন ছুটি পাইল, দুই জনে সে খানে এক হোটেলে রহিলাম। মাস খানেক পরে দুই জনে পলাইয়া বম্বে গেলাম, বম্বে হইতে লণ্ডনে, লণ্ডন হইতে আমেরিকায় গেলাম। রিচার্ড মেকেঞ্জি আমাদের কত সন্ধান লইল, কোথাও পাইল না।

আমেরিকাতে আমরা মিষ্টার ও মিসেস রবিন্সন নামে পরিচয় দিলাম। সেখানে নিকলসন এক মদের কারখানা খুলিল।

দশ বৎসর এই খানে রহিলাম। অতিরিক্ত সুরাপান করাতে নিকলসন মরিয়া গেল। আমি মদের কারখানা বিক্রয় করিয়া লণ্ডনে গেলাম। এখানে আমি মিসেস রবিন্সন নামে পরিচয় দিলাম; আর বলিলাম যে, আমি বিধবা।

বিধবা, নিঃসন্তান, অনেক টাকা আছে, রূপও আছে, দেখিয়া অনেকে আমায় ভালবাসা দেখাইতে লাগিল। এসময়ে আমার বয়স ত্রিশ বৎসর, প্রণয় ব্যাপার বিলক্ষণ জানি, দেখিলাম, অনেকেই আমার টাকা ভাল বাসে, ফলে আমায় ভাল বাসে না। অবশেষে একজন কর্ণেল সাহেবের সঙ্গে আলাপ হইল। তাঁহার বয়ঃক্রম ষাটি বৎসর। পেন্সন লইয়া লণ্ডনের উপনগরে থাকেন। তিনি কেবল আমায়

যথার্থ মনের সহিত ভাল বাসিতেন, শেষে তাঁহার সহিত আমার বিবাহ হইল। উভয়ে পরম সুখে কিছুকাল রহিলাম।

এক দিন কর্ণেল সাহেব বাহির হইতে বাড়ী আসিয়া আমাকে বলিলেন,

'প্রেয়সি, আমার একজন প্রাচীন বন্ধু আসিয়াছেন। লোকটা একটু পাগ্‌লাটে, খাওয়া দাওয়া করিয়া চলিয়া যাইবে। তুমি কিন্তু খুব খাতির করিও'।

আমি কর্ণেল সাহেবের বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বেশ ভূষা করিতে লাগিলাম, এমন সময়ে আমার চাপরাসী আসিয়া বলিল, 'মা ঠাকরুণ, বাহির দরজায় পাগলা গারদের দরোয়ান বসিয়া কেন ?''

আমি বলিলাম 'হয় ত কোন বরাতে আসিয়াছে।'

টেবিলে খাদ্য সামগ্রী সমস্ত আসিল, ঝি আসিয়া আমায় সংবাদ দিল, আমি গেলে আহার আরম্ভ হইবে। ঝিকে আগে পাঠাইয়া দিয়া আমি পশ্চাতে গেলাম। নিচে নামিয়া কেবল খাবার ঘরের দ্বারে পা দিয়াছি, অমনি কর্ণেল সাহেবের বন্ধুকে দেখিয়া আমার পা দুখানি অচল হইল, মিনিট দুই দাঁড়াইয়া ফিরিয়া দোতালায় গেলাম, চাকরাণীকে দিয়া সাহেবের নিকট খবর পাঠাইলাম, 'হঠাৎ আমার মাথা ব্যথা হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে।'

সাহেবেরা আহারে বসিলেন, আমি এ দিকে একটি ব্যাগে করিয়া আমার যা কিছু ছিল, লইয়া অন্য দ্বার দিয়া বাটীর বাহির হইলাম, দ্বারে যে পাগলা গারদের দরোয়ান বসিয়াছিল, তাহার কাছে সমস্ত অবগত হইলাম। সে রাত্রে এক হোটেলে গিয়া রহিলাম।

পর দিন পাগলা গারদে গিয়া রিচার্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। রিচার্ড আমাকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল, বলিল, 'আমি তোমার জন্যই পাগল হইয়াছি।'

আমি বলিলাম, 'আমি পাপিয়সী, আমাকে স্পর্শ করিও না।'

অনন্তর সকল বৃত্তান্ত বলিলাম ; পূর্ব্ব রাত্রে কেন আমি দেখা করি নাই, তাহাও বলিলাম।

রিচার্ড বলিল, 'মেরি, তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ ; নিজেরও সর্ব্বনাশ করিয়াছ। দেখ, ঈশ্বর আছেন, শেষ কালে তাঁহাকে কি জওয়াব দিবে ?'

আমি কাঁদিতে লাগিলাম। রিচার্ড বলিতে লাগিল, 'এক কাজ কর ; অবশিষ্ট জীবন মঠে (কনভেণ্টে) গিয়া যাপনকর।

আমি রিচার্ডের নিকট ক্ষমা চাহিলাম। শেষে সমুদ্রতীরে এক মঠে গিয়া রহিলাম। আমার অনেক টাকা ছিল, মঠের কর্ত্তৃকে তাহা দিয়াছি ; এখানে কোন কষ্ট নাই, কিন্তু গত জীবনে যা যা করিয়াছি, তাহা মনে পড়িলে প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে।'

হে ভগবান, এ পাপিয়সীর পাপ ক্ষমা করুন।

শ্রীরাহা।—

নানা কথা।

একজন মিশনরি রাস্তায় ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে বলিলেন, 'আমরা সকলে এক পিতার সন্তান আছে। সকলকে ম-রিতে হয়, এবং স্বর্গে বা নরকে যাইতে হয়। অতএব জাতি মানিতে হয় না।' শ্রোতা-দের একজন বলিল, 'তবে ইল্‌বার্টবিল্ লইয়া এত গণ্ডগোল করিলেন কেন?'

একজন ভদ্রলোক, বুরিবণ বুকে বাঁধা; মদের দোকানে বসিয়া বিয়ার টানিতেছেন, তাঁহাকে দেখিয়া একজন সুরাপানার্থী চা-মার জিজ্ঞাসিল, 'কর্ত্তা, বুকে নীল ফিতা বাঁধা থাকিলে কি উপকার?' কর্ত্তা উত্তর করিলেন, 'পাহারাওয়ালা ধরে না।'

আরব দেশের একজন বণিক আফ্রি-কার কোন রাজার কাছে কতক গুলি ভাল ঘোড়া লইয়া গেল। রাজা সে গুলি কি-নিলেন, এবং আরও নূতন ঘোড়া আনি-বার জন্য তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা বায়না দিলেন। এই রাজা উজিরকে বলিলেন, 'আমার রাজ্যে যত বোকা আছে, তাহার এক তালিকা কর।' উজির তালিকাতে অগ্রে রাজার নাম লিখিল। রাজা ইহাতে আপত্তি করিলেন। উজির বলিলেন, 'বি-দেশী লোককে লক্ষ টাকা আগাম দেওয়া কি বোকার কাজ নহে?' রাজা বলিলেন, 'যদি সে ঘোড়া লইয়া আইসে?' উজির বলিলেন, 'তবে মহারাজের নাম কাটিয়া তাহার নাম লিখিব।'

'অরে, রামা, তোর কর্ত্তা বাড়ী আ-ছেন?' 'আজ্ঞে, না,' 'আমার বিশ্বাস হয় না।' 'তবে আসিয়া কর্ত্তাকে না হয় জিজ্ঞাসা করুন।'

একজন ভদ্রলোক অনেক দিন পরে একটি বন্ধুর ছেলেকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন আছ বাপু?' বালক উত্তর করিল 'ভাল আছি, মহাশয়।' ভদ্র-লোক বলিলেন, 'অমনি জিজ্ঞাসা করিতে হয়, আপনি কেমন আছেন?' বালক উ-ত্তর করিল, 'তা জানিবার আমার কোন দরকার নাই।'

পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যদু।' বল দেখি, গালিচা তৈয়ার হয় কোথায়?

'জানি না।'

'তুমি ভুগোল মুখস্থ কর নাই?'

'আজ্ঞে না।'

'কেন?'

'মহাশয় সব জিনিষই কলিকাতার বড় বাজারে পাওয়া যায়; টাকা হইলেই হইল; মুখস্থ করিবার প্রয়োজন কি?'

হিন্দুদিগের অবনতি।

বিচার প্রণালী।

হিন্দুদিগের বিচারপ্রণালী কি প্রকার ছিল, এই প্রস্তাবে তাহার আলোচনা করিব। হিন্দু গৌরবের বহুচিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, ভগ্ন দুর্গ এবং ভগ্ন মন্দির সমূহ অদ্যাপি পুরাতন হিন্দুদিগের বীরত্ব ও ধর্ম্মনিষ্ঠা খ্যাপন করিতেছে। কিন্তু হিন্দুদিগের বিচার-কার্য্যের কোন প্রত্যক্ষ চিহ্ন অস্মদ্দেশে এক্ষণে বিদ্যমান নাই। তাঁহাদের ধর্ম্মাধিকরণ, কারাগার, বধ্য-ভূমি প্রভৃতির চিহ্ন পর্য্যন্ত এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের বিচারপ্রণালী ইংরেজের সর্ব্বগ্রাসি শাসনে এক্ষণে সম্পূর্ণ বিপরীত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সুতরাং সাহিত্য ও স্মৃতিশাস্ত্রে এতৎ সম্পর্কে যে যে কথা উল্লিখিত আছে, তাহাই আমাদের একমাত্র পথ-প্রদর্শক।

ন্যায়ের অনুরোধে ইহা বলা আবশ্যক যে হিন্দুদিগের ব্যবহারবিজ্ঞান, জাতিভেদ প্রথাদ্বারা অত্যন্ত কলঙ্কিত ছিল। একই অপরাধের জন্য ব্রাহ্মণের এক দণ্ড, এবং শূদ্রের আর এক দণ্ড, আবার গুণবানের এক দণ্ড এবং নির্গুণের আর এক দণ্ড। হয়ত আমাদের চক্ষে এই কলঙ্ক যত স্পষ্ট উপলব্ধি হইত, তখনকার লোকের চক্ষে সেইরূপ উপলব্ধি হইত না। এইরূপও হইতে পারে যে, যেসকল শ্রেণী এবম্বিধ বিধিদ্বারা অত্যাচারিত হইত বলিয়া আমরা মনে করি, সেই সকল শ্রেণী ইহাতেই পরম সন্তুষ্ট থাকিত। তবে আমাদের এই পর্য্যন্ত বলিবার অধিকার আছে যে,উক্তবিধিদ্বারা বর্ত্তমান সময়ে কোন সভ্য সমাজই অনুশাসিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে না, এবং উহা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের চক্ষে স্বাধীন মানসিক উন্নতির বিশেষ প্রতিবন্ধক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, ব্যবস্থা শাস্ত্রের এবম্বিধ পক্ষপাতিত্ব রাজার স্বেচ্ছাচারিতার পরিচায়ক। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে হিন্দু রাজ্য সমূহের গঠন-প্রণালী এই প্রকার ছিল যে, রাজা বাক্যতঃ স্বেচ্ছাচারী হইলেও কার্য্যতঃ স্বেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না;—যে ব্যবস্থা সমাজের অনুমোদিত নহে, তাহা প্রচলন করিতে রাজার কোন শক্তি ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের বিবেচনায় ব্যবস্থাশাস্ত্রের উল্লিখিত পক্ষপাতিত্ব সমাজের বদ্ধমূল কুসংস্কারের ফল, রাজার স্বেচ্ছাচারিতার ফল নহে। আজি শূদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি যে প্রকার সম্মান প্রদর্শন করে, কোন খ্রীষ্টান তাহাকে শূদ্রের উপর ব্রাহ্ম

ণের ঘোরতর অত্যাচার বলিয়া মনে ক- [illegible] কিন্তু যদি গবর্ণমেণ্ট কোন [illegible] ব্যবস্থা দ্বারা [illegible] সম্মান প্রদর্শনের পথে বাধা দেন, তবে বোধ হয়, ব্রাহ্মণ শূদ্র [illegible] একই প্রকার বিপদ অনুভব করিয়া সমস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিবে। এস্থলে কিরূপ বিধিকে রাজার স্বেচ্ছাচারিতার ফল বলিব ?

আমাদের চক্ষে পুরাতন হিন্দু-ব্যবস্থা-শাস্ত্রে আরও একটি ত্রুটি লক্ষিত হয়। আমরা দেখিতে পাই যে কোন কোন অপরাধ যাহা আমাদের নিকট সামান্য বলিয়া বোধ হয়, তজ্জন্য ভয়ানক গুরুতর দণ্ড, আবার কোন কোন অপরাধ যাহা আমাদের নিকট গুরুতর বলিয়া বোধ হয়, তজ্জন্য অতি লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১০ কুম্ভের অধিক ধান্য যে ব্যক্তি চুরি করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে; কিন্তু গুরুতর আঘাতদ্বারা যদি কেহ সমশ্রেণী ব্যক্তির অঙ্গভঙ্গ করে, তবে তাহার সামান্য অর্থদণ্ড মাত্র হইবে। যদি কেহ গুরু ব্যক্তির উপর নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করে, তবে তাহার জিহ্বাচ্ছেদ হইবে, কিন্তু যদি কেহ পশুর সহিত অস্বাভাবিক সংসর্গ করে, তবে তাহাতে মধ্যমসাহস মাত্র অর্থ দণ্ড হইবে। ঐতিহাসিক মিল সাহেব এই সমস্ত ব্যবস্থাকে প্রমাণ স্বরূপে উদ্ধৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হিন্দুগণ অত্যন্ত অসভ্য ছিল, তাহারা সামান্য ও গুরু অপরাধের প্রভেদ জানিত না, এবং তাঁহাদের দেশে লোকে অসভ্যদেশের ন্যায় স্বস্ব সম্পত্তি নিরাপদে ভোগ করিতে পাইত না। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত যে একান্তই ভ্রম-মূলক ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অনুভব করিবেন। মিল যাহাকে অসভ্যতার প্রমাণ বলিয়াছেন, অনেকে আবার তাহাকেই উচ্চ সভ্যতার প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়া থাকেন। চৌর্য্য অপরাধে প্রাণদণ্ড হইত, ইহাদ্বারা যেমন কেহ কেহ এই সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন যে, দেশে অধিক চুরি হইত বলিয়াই চুরির জন্য কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; তেমন আবার কেহ কেহ এই সিদ্ধান্ত করেন যে তখন চুরি অত্যন্ত কদাচিত হইত, এবং উহা লোকে এত গুরুতর পাপ বলিয়া মনে করিত যে প্রাণদণ্ডের ন্যূন তাহার প্রায়শ্চিত্ত ছিল না। বস্তুতঃ আমরা এইরূপ বলিতে পারি যে হিন্দুগণ লঘু অপরাধে লঘু দণ্ড ও গুরু অপরাধে গুরু দণ্ডই করিতেন, কিন্তু আমরা এইক্ষণে যাহাকে লঘু ও গুরু দণ্ড বলিতে শিখিয়াছি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাহাকে অন্য প্রকার মনে করিতেন। স্বীকার করি যে প্রত্যেক দেশেই অপরাধের গুরুত্বের একটি মাত্র নির্দ্দিষ্ট তুলাদণ্ড থাকা উচিত। সেই তুলাদণ্ড সমাজের অহিত। যে কার্য্য সমাজের পক্ষে যত অহিতকর, তাহা সেই প্রকার গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। কিন্তু কোন দেশেই এইরূপ তুলায় মাপিয়া অপরাধের তারতম্য করা হয় না। আর তাহা হইলেও যে, সকল দেশে এক অপ-

রাধের সমান গুরুত্ব হইত, তাহা নহে। এক দেশ বা এক বংশ যাহাকে সমাজের হিতকর মনে করে, অপর দেশ বা অপর বংশ, তাহাকে সমাজের অহিতকর মনে করিবে, ইহাতে কিছুই বিচিত্র নাই। এই কারণে ইহা অসম্ভব নয় যে আমাদের নিকট এক্ষণ যাহা সামান্য অপরাধ বলিয়া অনুভূত হয়, তাহাই আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের নিকট গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণনীয় হইত। আমি এতদ্দ্বারা এরূপ বলিতে চাহি না যে, হিন্দুব্যবস্থাশাস্ত্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ছিল; আমার ইহাই বলা উদ্দেশ্য যে উক্ত শাস্ত্র দৃষ্টে,হিন্দুগণ অপরাধের তারতম্য বুঝিত না, কিম্বা দেশে শান্তি ছিল না,ইত্যাদি সিদ্ধান্ত যার পর নাই অসঙ্গত।

হিন্দু রাজত্বসময়ে পঞ্চবিধ প্রকার অপরাধী দিগের শাস্তি হইত।—অর্থ দণ্ড, কারাবাস, প্রহার, অঙ্গচ্ছেদ ও প্রাণদণ্ড। এক্ষণে চতুর্বিধ দণ্ড বিদ্যমান আছে; অঙ্গচ্ছেদ রহিত হইয়া গিয়াছে। ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশেই পূর্ব্বে অঙ্গচ্ছেদ-প্রথা বিদ্যমান ছিল; অতি অল্পদিন হইল উহা উঠিয়া গিয়াছে।

মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বে মোকদ্দমা সকল যেমন দেওয়ানী ও ফৌজদারী অথবা Civil ও Criminal এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, হিন্দুরাজত্বে সেইরূপ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। উভয় প্রকার মোকদ্দমার বিচারই এক বিচারালয়ে হইতে পারিত, এবং উহাদের কার্য্যবিধি ঠিক একই প্রকার ছিল।

তৎকালে বিচার কার্য্যের জন্য বহু শ্রেণীর সংস্থান (Institution) বিদ্যমান ছিল। পূর্ব্বে গ্রামাধিপতি, দশী, বিংশী, দেশাধ্যক্ষ ও সহস্র-গ্রামাধ্যক্ষগণের বিচার-ক্ষমতার উল্লেখ করিয়াছি,—ইহারা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ঘটিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবাদের মীমাংসা করিতে পারিত। কাহার কতদূর ক্ষমতা (Jurisdiction) ছিল, তাহা কোন শাস্ত্রে উল্লিখিত নাই। বোধ হয় এই ক্ষমতা রাজার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত; —রাজা দেশের অবস্থা অনুসারে যাহাকে যেরূপ ক্ষমতা দেওয়া উচিত বোধ করিতেন, তাহাই দিতেন। তবে এইরূপ সাধারণ বিধি আছে যে গ্রামাধিপতি যে বিবাদের মীমাংসা করিতে অপারগ হইবেন, দশী তাহার মীমাংসা করিবেন; দশী অক্ষম হইলে বিংশী; বিংশী অক্ষম হইলে সহস্র গ্রামাধ্যক্ষ, এবং তিনি অক্ষম হইলে রাজা স্বয়ং তাহার মীমাংসা করিবেন।

ব্যবসায় এবং আচার ঘটিত বিবাদে স্বকুল ও স্বসমাজের বিচার ক্ষমতা ছিল। কোন ব্যক্তি আচার-ভ্রষ্ট হইয়াছে কিনা, এবিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তাহার স্বকুলের ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া যাহা মীমাংসা করিত, তাহাই রাজা মান্য করিতেন; কিন্তু তাহাদের সিদ্ধান্ত স্বজাতি কিম্বা রাজা পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন। কেহ কোন ব্যবসায়-গত অপরাধ করিলে স্বজাতি অথবা স্বব্যবসায়ীগণ একত্রিত হইয়া তাহার বিচার করিত; রাজা সেই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতেন, উচিত বিবেচনা

করিলে উহা রদ করিতে পারিতেন। এ-সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক বলিয়াছেন :—'রাজ-নিযুক্ত ব্যক্তি, পূগ অর্থাৎ সমাজ, শ্রেণী (guilds) এবং কুল (family) ইহারা বিচার কার্য্যে ক্রমশঃ উচ্চ মানিত হয়।'(১)

বৃহৎ বৃহৎ বিবাদ বা অপরাধের বিচার রাজা অথবা রাজনিযুক্ত ব্যক্তি করিতেন। নিম্নবিচারকগণের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল। রাজনিযুক্ত বিচারককে প্রাড়্বিবাক বলিত। প্রাড়্বিবাক ধর্ম্মাধিকরণে তিনজন ব্যবহারবিদ ব্রাহ্মণের সহিত উপবিষ্ট হইয়া বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন (২)। ইহাতে বোধ হয় যে এক্ষণে যেমন জজ বিশেষ বিশেষ মোকদ্দমায় জুরী লইয়া বিচার করেন, তখন সেই প্রকার প্রত্যেক মোকদ্দমায়ই প্রাড়্বিবাকের জুরী লইয়া বিচার করিবার রীতি ছিল।

ধর্ম্মাধিকরণে যাজ্ঞবল্ক নিম্নলিখিত কার্য্যবিধি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দিয়াছেন ;—'বাদী যে অভিযোগ করে, তাহা প্রতিবাদীর সম্মুখে লিখিত হইবে, এবং তাহাতে বৎসর, মাস, অর্দ্ধমাস, তারিখ, নাম, জাতি প্রভৃতি উল্লিখিত থাকিবে। বাদীর সম্মুখে উক্ত লিখিত অভিযোগের প্রতিবাদী যে উত্তর দেয় তাহাও লিখিত হইবে। বাদী তৎপরই তাহার পক্ষসমর্থনার্থ যে প্রমাণ উপস্থিত করিতে চাহে তাহা সে লিখিয়া দিবে (৩)।'

প্রমাণ তিন প্রকার 'লেখ্য (document), ভোগ (possession) এবং সাক্ষী' (৪)। লেখ্য ত্রিবিধ,—'রাজ-সাক্ষিক (registered), সসাক্ষিক, এবং অসাক্ষিক। রাজনিযুক্ত কায়স্থ-লিখিত এবং রাজাধিকরণের অধ্যক্ষ-কর্ত্তৃক সাক্ষরিত লেখ্যকে রাজসাক্ষিক বলা যায়। যে কাহারও লিখিত কিন্তু সাক্ষীদ্বারা স্বাক্ষরিত লেখ্যকে সসাক্ষিক লেখ্য কহা যায় ; এবং স্বহস্ত লিখিত লেখ্যকে অসাক্ষিক লেখ্য কহা যায়। যে লেখ্য অন্যায় বল প্রয়োগদ্বারা লওয়া হয়,

(১) নৃপেণাধিকৃতাঃ পূগাঃ শ্রেণয়োঽথকুলানি চ।
পূর্ব্বংপূর্ব্বং গুরুজ্ঞেয়ং ব্যবহারবিধৌনৃণাম্॥ ৩১। যাজ্ঞবল্ক ২য় অঃ।

(২) যদা স্বয়ং ন কুর্য্যাত্তু নৃপতিঃ কার্য্যদর্শনম্।
তদা নিযুঞ্জ্যাদ্বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং কার্য্যদর্শনে॥ ৯।
সোঽস্যকার্য্যাণি সম্পশ্যেৎসভ্যৈরেব ত্রিভিবৃতঃ।
সভামেব প্রবিশ্যাগ্রামাসীনঃ স্থিত এব বা। ১০।
মনু ৮ম অঃ।

(৩) প্রার্থিনোঽগ্রতোলেখ্যং যথা বেদিতমর্থিনা।
সমামাস তদর্দ্ধাহি নাম জাত্যাদিচিহ্নিতম্॥ ৬।
শ্রুতার্থস্যোত্তরং লেখ্যংপূর্ব্বাবেদকসন্নিধৌ।
ততোর্থী লেখয়েৎ সদ্যঃ প্রতিজ্ঞাতার্থসাধনম্॥ ৭। যাজ্ঞঃ ২য় অঃ।

(৪) প্রমাণংলিখিতংভুক্তিঃ সাক্ষিণশ্চেতি কীর্ত্তিতম্। ২২। যাজ্ঞঃ ২য় অঃ।

তাহা প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না। যাহা প্রবঞ্চনা দ্বারা লওয়া হয়, তাহাও অপ্রামাণ্য। যাহা দেশাচার বিরুদ্ধ নহে,যাহাতে আধি অর্থাৎ বন্ধক অথবা করার সমূহ স্পষ্ট করিয়া লিখিত আছে, যাহাতে কোন কথা অপ্রকাশ নাই, এবং যাহার অক্ষর সমূহ পর্য্যায়ক্রমে লিখিত হইয়াছে, এমন লেখ্যই সপ্রমাণ (৫)।

স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, দ্যূতকার, মত্ত, উন্মত্ত, অভিশস্তক (যাহাকে দোষী বলিয়া সন্দেহ করা যায়); রঙ্গাবতারী (যে রঙ্গশালায় অভিনয় করে), পাষণ্ড (infidel), কূটকৃৎ (forger), বিকলেন্দ্রিয়, পতিত; বন্ধু, আত্মীয়, শত্রু, চৌর, সাহসী (openly wicked), পরিত্যক্ত, এবং এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তি অসাক্ষী (৬)। কিন্তু সংগ্রহণ (rape) চৌর্য্য, অপবাদ এবং অনধিকার চর্চ্চা অভিযোগে সকলেই সাক্ষী হইতে পারে (৭)।

পূর্ব্বকালে হিন্দু রাজত্ব সময়ে বিচার প্রণালী, যে নিতান্ত অপরিপক ছিল না। উপরোক্ত কার্য্যবিধির প্রতি দৃষ্টি করিলেই তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি হইবে। এক্ষণে ঐ কার্য্য বিধি অনেক পরিমাণে উন্নত হইয়াছে বটে, কিন্তু এ কথা বলিলে অন্যায় হইবে না যে, ঐ উন্নত কার্য্যবিধি এদেশের অনেক প্রকার সর্ব্বনাশ করিতেছে। পূর্ব্বকালের বিচার প্রণালীর এই এক বিশেষ গুণ ছিল যে প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রায়শঃ ঘরে বসিয়া বিচার পাইতে পারিত; কেবল মাত্র গুরুতর বিবাদে তাহাকে গৃহ ছাড়িয়া দূরে যাইতে হইত। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিঘটিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবাদ প্রায়শঃই গ্রামাধ্যক্ষ দ্বারা মীমাংসিত হইত; ব্যবসায় বা আচার ঘটিত মোকদ্দমা স্বজাতি এবং স্বকুলের ব্যক্তি সমষ্টি দ্বারা মীমাংসিত হইত; সুতরাং এই সকল বিবাদের জন্য তাহাকে কার্য্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দূরে যাইতে হইত না। এইক্ষণ বিচার-প্রণালী বাক্যতঃ উন্নত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই উন্নত প্রণালীর বিচার পাইবার জন্য তাহাকে যে পরিমাণ দণ্ড ভোগ করিতে হয়, তাহাতে সে অনেক সময়ে বিচার হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ মনে করে। এক্ষণে কাহারও একটি পয়সার জিনিস চুরী গেলে যদি তাহার বিচার লাভ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাহার সে জিনিসত কোন রূপেই পাওয়া যাইবে না, কিন্তু চোরকে বিচারে আনয়ন করিতে তাহাকে,যত চুরী গিয়াছে, সম্ভবতঃ তাহারও অধিক অর্থ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। বর্ত্তমান বিচার প্রণালীতে অনেক সময়ে

(৫) অথ লেখ্যং ত্রিবিধং। রাজ-সাক্ষিকম্ সসাক্ষিক মসাক্ষিকং চ। রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্। যত্র কচন যেন কেন চিল্লিখিতং সাক্ষিভিঃ স্বহস্তচিহ্নিতং সসাক্ষিকম্। স্বহস্তলিখিতমসাক্ষিকম্। তদ্বলাৎকারিত মপ্রমাণম্। উপাধিকৃতাশ্চ সর্ব্ব এব। * * * দেশাচারবিরুদ্ধং ব্যক্তাধিবিধিলক্ষণমলুপ্তক্রমাক্ষরং প্রমাণম্। বিষ্ণুস্মৃতি। ৭।

(৬) যাজ্ঞ: ২ য় অঃ, ৭২, ৭৩।

(৭) যাজ্ঞ: ২ য় অঃ ৩৪।

অপরাধী বিনা দণ্ডে মুক্তি পাইয়া যায়; কিন্তু অভিযোক্তাকে মোকদ্দমার ব্যয় রূপ গুরুতর দণ্ড ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তিকে মোকদ্দমা করিতে হইবে, সে ব্যক্তিকে আর সমস্ত কার্য্য কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া কেবল ঐ কার্য্যেই লিপ্ত থাকিতে হইবে। আমার উপর যদি কেহ অত্যাচার করিল, আমাকে সে অত্যাচার ত পূর্ব্বেই সহ্য করিতে হইল; কিন্তু আমি যদি তাহার বিচার চাই, তবে আমাকে সমস্ত কার্য্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দিনেকের দূরে আপনার টা খাইয়া বিচারের আশায় বিচারকের মুখপ্রেক্ষী হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে; যদি মোকদ্দমা হারিলাম, তবে পরিশ্রম, ও অর্থ সকলই নষ্ট হইল; আর যদি জিতিলাম, তাহা হইলেও শুদ্ধ আমার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিই চরিতার্থ হইল, কিন্তু আমার যে বহু প্রকারে অর্থদণ্ড হইয়াছে তাহার অতি সামান্য বই ফিরিয়া পাইলাম না। এক্ষণে কোর্টফির তাড়নায়, উকীল মোক্তারের তাড়নায়, ঘুষখোর আমলার তাড়নায় এবং প্রমাণ-বিষয়ক আইনের তাড়নায়, যাহার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি একান্ত প্রবলা, সে ভিন্ন অন্য কেহই বিচারপ্রার্থী হইতে সাহস পায় না। কিন্তু যে ব্যক্তি এত তাড়না সহ্য করে, সেই কি বিচার প্রাপ্ত হয়? তাহাও নহে। ইংরেজের বিচারালয়ে দোষের বিচার হয় না, অদৃষ্টের বিচার হয়। সপ্তদশ কিম্বা অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া বিচারাসন অলঙ্কৃত করিতে আইসেন; তিনি একদিনের তরেও সংসারে পাদবিক্ষেপ করেন নাই; এক দিনের তরেও মনুষ্যের প্রকৃতি পাঠ করিয়া দেখেন নাই; অথচ মনুষ্য-প্রকৃতির পূর্ণ অভিজ্ঞতাভিন্ন যে সত্য আবিষ্কার করা অসম্ভব, তাঁহাকে সেই সত্য আবিষ্কার করিতে হইবে। জনসাধারণের মতামত হইতে সাধারণতঃ আমাদের ভ্রম-সংশোধনের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু অস্মদ্দেশের বর্ত্তমান বিচারকগণকে জনসাধারণের মতামতের প্রতি বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ করিতে হয় না। জনসাধারণের সহিত তাঁহাদের কোন প্রকার সহানুভূতি নাই, তাঁহাদের সহিত তাঁহারা দীর্ঘকাল অবস্থান করেন না, তাহাদের মতামতের উপর তাঁহাদের পদোন্নতি নির্ভর করে না। সুতরাং চরিত্র ও কার্য্যগত যে অভাব ও অপূর্ণতা লইয়া তাঁহারা জীবনারম্ভ করেন, প্রায় সমস্ত জীবনেও তাহার উন্নতি কিম্বা পরিবর্ত্তন হয় না। যেকারণে লোকের মুখ হইতে সত্যকথা সহজে বাহির হয়, অস্মদ্দেশের বিচারালয়ে সেকারণ বিদ্যমান নাই। সাক্ষী ও অর্থী প্রত্যর্থীদিগের সহিত যদি বিচারক পরিচিত থাকেন, যদি পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি থাকে, যদি বিচারককে তাহারা ভক্তি শ্রদ্ধা করে, যদি বিচারক তাহাদের গুণ, স্বভাব ও প্রকৃতি বিশেষ রূপে অবগত থাকেন, তবে কদাচিত বিচারকের নিকট মিথ্যা বলিতে তাহাদের প্রবৃত্তি হয়। আর যেখানে মিথ্যা বলা হয়, সেখানেও বিচারক সহজেই তাহা

ধরিয়া ফেলিতে পারেন। যাহার সত্য কথা বলিবার আর কোন প্রবৃত্তি না থাকে, তাহারও বিচারকের নিকট সত্যপ্রিয় বলিয়া পরিচিত হইবার প্রবৃত্তি, কিম্বা তাহার নিকট অসত্যবাদী বলিয়া পরিচিত হইবার অনিচ্ছা বিদ্যমান থাকিতে পারে, এবং এবংবিধ প্রবৃত্তি বা অনিচ্ছা অন্য কারণ অসত্ত্বেও তাহাকে সত্য বলিতে মতি জন্মাইতে পারে। কিন্তু যেখানে একমাত্র বিচারালয়ে ভিন্ন আর কুত্রাপি বিচারকের সঙ্গে তাহার দেখা বা পরিচয় হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তাহার পক্ষে ঐরূপ কোন প্রবৃত্তি অথবা অনিচ্ছা বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। তুমি যদি বিচারক হও, এবং যদি তোমার সহিত নিত্তনৈমিত্তিক কার্য্যে আমার আলাপ ব্যবহার হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে আমি কখনই তোমার নিকট মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিব না। এবং যেহেতু মিথ্যা বলিতে গেলেই মিথ্যুক বলিয়া পরিচিত হইবার ভয় থাকে, সুতরাং উক্ত ভয়ই আমাকে মিথ্যা বলা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবে। এইরূপ দেখা গিয়াছে যে গ্রামে সুযোগ্য এবং নিরপেক্ষ লোক বিদ্যমান থাকিলেও,বিবাদকারীগণ তাহাকে সালিস মান্য করিতে চাহে না; কারণ তাহারা জানে যে স্বপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য তাহারা বিচালয়ে যে টুকু মিথ্যা প্রমাণ দিতে পরিবে, গ্রাম্য সালিসের নিকট তাহা দিতে পারিবে না। গ্রামবাসী দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন এক বিষয় লইয়া বিবাদ বাধিলে লেখক একদিন এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিল ‘আপনারা অকারণ কেন আদালতে যাইয়া অর্থব্যয় করিবেন, অমুককে কেন সালিস মান্য করুন না? সেই ব্যক্তি বলিল ‘আমি তাহা পারিতেছি না, ইহার মধ্যে অনেক কথা আছে, যাহা সালিসের নিকট ব্যক্ত করিতে হইবে; কিন্তু আদালতে ব্যক্ত না করিয়া পারিব।’ দুই ব্যক্তির বিবাদে যে ব্যক্তি মিথ্যা প্রমাণ সাজাইতে সঙ্কল্প করে, সে কোন মতেই গ্রাম্য সালিশের বিচারাধীনে আসিতে সম্মত হয় না। এক্ষণে মনে কর, যদি গবর্ণমেণ্ট এইরূপ নিরপেক্ষ ভদ্রলোককে স্বগ্রামে বিচারকের পদ প্রদান করেন, তবে সেই-গ্রাম বাসীদিগের কিরূপ সুবিচার পাইবার সম্ভাবনা থাকে। পূর্ব্বকালে গ্রামে গ্রামে এইরূপ বিচারক ছিল বলিয়া লোকসমূহ সত্যবাদী ছিল। এক্ষণে বিচারকের সহিত সাক্ষীগণের কোন প্রকার পরিচয় কিম্বা সহানুভূতি না থাকাতে তাহাদের সত্যকথা বলার প্রবৃত্তি অনেকটা হীনবল হইয়া পড়িয়াছে। সাক্ষী অপরিচিত বিচারকের নিকট যাহা আপনার স্বার্থানুযায়ী বলিয়া তাহার মনে হয়, তাহাই বলিয়া আইসে, সে হয়ত মনে ভাবে যে ‘ইহার সঙ্গেত আর দেখা সাক্ষাৎ হইবে না; ইহার নিকট মিথ্যা বলিলে আমার কি হইবে?’ স্বসমাজের নিকটও কোনরূপ নিন্দা-ভাজন হইতে হয় না, কারণ সমাজস্থ ব্যক্তিগণ তাহার কার্য্যাকার্য্যের কোন সংবাদ লয় না। যে মোকদ্দমায় সাধারণের দৃষ্টি ও

উৎসাহ থাকে, সে মোকদ্দমায় সাক্ষীগণ সাধারণতঃ অতি সাবধানতার সহিত সাক্ষী দিয়া থাকে ; কারণ তাহারা জানে যে এই মোকদ্দমায় মিথ্যা বলিলে তাহা লইয়া সামাজিকগণ আন্দোলন করিবে এবং তাঁহাদিগের নিকট মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হইতে হইবে। বস্তুতঃ যাহাদের স্বাভাবিক সত্যপ্রিয়তা নাই, এবং যাহাদের মিথ্যা বলিবার একমাত্র ভয় সমাজিক নিন্দা, বর্ত্তমান বিচার-প্রণালীতে তাহাদের মিথ্যা বলিবার কোন প্রতিবন্ধক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইরূপ বিচার প্রণালী অনেক দিন যাবত এদেশে প্রতিষ্ঠিত থাকাতে ইতর শ্রেণীস্থ লোকের সত্যপ্রিয়তা দিন দিনই কমিয়া যাইতেছে, এবং তাহাদের মধ্যে প্রায় এইরূপ সাধারণ সংস্কার জন্মিয়া উঠিয়াছে যে আদালতে মিথ্যা বলায় কোন অপরাধ নাই।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কর্ণ।

ইতিমধ্যে শিশুর আর একটি ইন্দ্রিয় ক্রমে প্রস্ফুটিত হইতেছে। সে ক্রমে কাণে শুনিতে আরম্ভ করিয়াছে। এরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে শিশুর কাণ ত জন্মাবধিই হইয়াছে, শব্দ ত অনেকরূপ হইতেছে, কাণের কার্য্য অবশ্য চলিয়া থাকিবে। তবে তাহার কাণের প্রস্ফুটন আবার কি? সে ত সর্ব্বদাই শুনিতেছিল।

সত্য বটে তাহার কাণের কার্য্য যথার্থই চলিতেছিল, কিন্তু মন কর্ণপ্রদত্ত সংবাদের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে প্রস্ফুটিত হইতেছে। একটি শব্দ অনেকবার শ্রবণের পরে যখন পুনরায় শুনিয়া সে ঠিক বুঝিতে পারে যে সেই শব্দ তখনই তাহার শ্রবণেন্দ্রিয়ের মূল ভিত্তির সংস্থাপন হয়। এই উন্নতির সাহায্য করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীর অনুরূপ অবলম্বন করিতে হইবে। সন্তানের কাণের কাছে এরূপ কোন বাদ্য বাজাইতে হইবে না যাহার ভিন্ন২ সুরের পার্থক্য সঙ্গীত বিদ্যায় অশিক্ষিত যুবকদিগেরও বুঝিতে কষ্ট হয়। প্রথমতঃ খুব মোটা ও খুব চিকণ শব্দ নিঃসারক বাদ্য করা উচিত। তৎপরে অন্য শব্দ যোগ হইলে এই শব্দদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী একটি অবলম্বন করা উচিত। উভয়টি হইতে তাহার পার্থক্য যেন সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু কোন সাহায্য ব্যতীতও সন্তান তাহার নিজ উন্নতি ইতিমধ্যে সাধন করিয়া লইতেছে। জননী তাহাকে স্তন্যপান করা-

ইতেছেন এবং নিজ মনের আহ্লাদে তাহাকে কত কি বলিতেছেন সোনা, মনি, চাঁদ, লক্ষ্মী বলিয়া কত কি আদরের শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন। জননী হয়ত বুঝিতেছেন না যে সন্তান ইতিমধ্যে তাহার উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লইতেছে। জিহ্বা ও চক্ষু দ্বারা সে জননীকে চিনিতে পারে, এখন কাণদ্বারা তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করিতেছে। কাণ পাতিয়া জননীর স্বর শুনিতেছে; ভাবিতেছে আর যেন না ভুলি, কথা শুনিলেই যেন ঠিক পাই যে ইহারই নিকট আমার এত সুখ, এত স্বচ্ছন্দ।

এতদ্ব্যতীত কাণের আর একটি উন্নতি ও সংসাধিত হইতেছে। যখন সন্তান স্বীয় মস্তক বামে ও দক্ষিণে ফিরাইতে পারে, তখন হইতে একটি শব্দ হইলে কোন দিক হইতে তাহা হইল এবং চক্ষুপ্রদত্ত কোন আকৃতির সহিত তাহার সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে। এঅবস্থায় জননীর কর্ত্তব্য যে সন্তানকে অধিক কষ্টে না ফেলেন—সর্ব্বদা চতুর্দ্দিক হইতে ডাকিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত না করেন। তিনি যদি সন্তানের নিকটে কেবল বাম ও দক্ষিণ দিক হইতে ডাকেন তবে সন্তানের পরিশ্রমের অনেক লাঘব হয়। কিন্তু বহুবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও সন্তান নিজ উন্নতি সাধন করে। জননীর শব্দ শুনিলে সে চিনিতে পারে এবং কোন দিক হইতে আসে তাহাও বুঝিতে পারে। অন্য কাহারও কোলে কিম্বা শয্যায় সন্তান শুইয়া আছে। এমত অবস্থায় পশ্চাৎ দিক হইতে কে তাহাকে ডাকিলেন, সে বুঝিল শব্দ কাহার, ও কোন্ দিক হইতে আসিতেছে। পাছ ফিরিয়া দেখিল, চক্ষুর যে আকৃতির সহিত সে জিহ্বার অনির্ব্বচনীয় আস্বাদের সংযোগ করিয়াছিল এই শব্দও তাহারই। তখন স্বীয় বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিল, তাহার আনন্দ হইল, যেরূপ ভাবিয়াছিল তাহাই দেখিল। মার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, মা বুঝিলেন না কি জন্য হাসিতেছে।—সন্তানের যখন এতদূর উন্নতি হইয়াছে তখন আমরা বলিয়া থাকি যে তাহার কাণ হইয়াছে।

পেশী ও ত্বক্।

ইতি মধ্যে শিশুর অন্য একটি শক্তি বৰ্দ্ধিত হইতেছে। জননী অবশ্য লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে জন্মের পর হইতেই শিশু পা নাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। যত ক্ষণ ক্লান্তি বোধ না করে, ততক্ষণ অবিরত হাত পা নাড়িতে থাকে; বাম পদ উঠাইতেছে, দক্ষিণ পদ ফেলাইতেছে। এইরূপ পর্য্যায় ক্রমে উভয় পদ নাড়িতেছে। ক্রমে হাত পা নাড়িতে শিখিয়াছে, এখন সে বিছানায় পা বাধাইয়া মাথার দিকে সরিয়া যায়। জননী কতবার কত যত্ন করিয়া তাহাকে উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া আসেন; কিন্তু সে কিছুতেই থাকিবে না। এক দিকে অবশ্যই সরিয়া যাইবে। সে কি জন্য এরূপ করিতেছে জননী হয়ত তাহা বুঝিতেছেন না। মানব-শরীরের সাধারণ

একটি নিয়ম এই যে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদি এক মাত্র ব্যবহার দ্বারাই উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। কেবল শরীর কেন মানবীয় অন্তর্জগতেও এই প্রণালীতে কার্য্য হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াদির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, তাহাদের সম্যক ব্যবহার আবশ্যক। শিশুও ব্যবহার দ্বারাই তাহার পৈশিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছে। ক্রমে সে বসিতে শিখিল। সম্মুখে একটি পদার্থ দেখিলে পূর্ব্বে তাহা ধরিতে পারিত না। হাত বাড়াইলে হাত কাঁপিত কিম্বা সেই পদার্থের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত, ঠিক সেই বস্তুর উপরে পড়িত না। এখন সে কোন বস্তু দেখিলে তাহা ধরিতে পারে। হামাগুড়ি দিয়া হাটিতে শিখিয়াছে। ঘরের প্রত্যেক বস্তু সকল কোণ হইতে টানিয়া বাহির করিতে চায়। শিশুর জন্য কোথাও কিছু শৃঙ্খলামত রাখা যায় না। এই জলের গ্লাসটা ঢালিয়া ফেলিল, কাদা করিয়া গায়ে মাখিল। ঘরের আর এক কোণে ছাই ছিল, সে যাইয়া তাহা খাইতে আরম্ভ করিয়াছে—জননী তাহাকে সরাইয়া দিলেন। চৌকির নীচে যেন কি ছিল সে যাইয়া তাহা ভাঙ্গিয়াছে, তথা হইতে মাতা তাহাকে টানিয়া বাহির করিলেন, সে যাইয়া দোয়াতের কালি গায় মাখিতে আরম্ভ করিল। মাতা তাহাও তাহাকে করিতে দিলেন না, তাহার বড় রাগ হইল, সে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। যাহার ঘরে শিশু সন্তান আছে তাহারই ঘরে এরূপ দুরন্ত শিশু আছে অথবা থাকা উচিত। যদি শিশু এরূপ দুরন্ত না হয়, তবে হয়ত তাহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, সর্ব্বদা পীড়িত; না হয় তার বুদ্ধি অতি অল্প। শিশু বোধ হয় তদ্রূপ কোন কাজই উদ্দেশ্য ব্যতীত করে নাই। সে জলের গ্লাসটা দেখিয়াছিল; যাহা দেখিতে একরূপ ধরিলে কিরূপ বোধ হয় বুঝিবার জন্য সে স্পর্শ করিয়াছিল; জল পড়িয়া গেল সে কি করিবে? মাটী পূর্ব্বে বেশ গরম ছিল, এখন শীতল হইল, হঠাৎ কেন এরূপ পরিবর্ত্তন হইল, জানিবার জন্য সে মাটিতে হাত দিয়াছিল ও বারম্বার দেখিতেছিল, তাহাতেই তাহার শরীর কাদা মাখা হইয়া গিয়াছে, সে কি করিবে? ঘরের কোণে ছাই ছিল; দেখিতে যাহা এত কাল, জিহ্বায় দিলে কিরূপ লাগে জানিবার জন্যই খাইতেছিল; হয়ত ভাল লাগে নাই অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া আছে। আবার চৌকির নীচে যেন কি দেখিতে পাইয়াছিল স্পর্শ করিয়া দেখিবার জন্য যাইয়া তাহা ধরিল, তাহাতে কিরূপ শব্দ হয়, শুনিবার জন্য বারম্বার নাড়িতে লাগিল; তোমার জিনিষ ভাঙ্গিয়া গেল সেজন্য সে দায়ী নয়। আমাদের বিবেচনায় এরূপ প্রত্যেক কাজই শিশু উদ্দেশ্যের সহিত করিয়া থাকে। এরূপ দুরন্ত শিশুকে কেহ কেহ একটি ছোট ঘরে আবদ্ধ করিতে পরামর্শ দেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহার বিপরীত কার্য্য করা উচিত। শিশু যত অধিক সংখ্যক বস্তু পরীক্ষা করিবে, এক বস্তু যত অনেক বার পরীক্ষা করিবে, একই বস্তু যত অধিক ই-

ন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিবে, তত তাহার জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে।

হস্ত দ্বারা আমরা বাহ্য পদার্থের তিনটি গুণ বিশেষ করিয়া জানিয়া থাকি— কাঠিন্য, তাপ ও মসৃণতা। হস্ত দ্বারা বস্তুর কাঠিন্য বোধ শিখাইতে হইলে প্রথমতঃ শিশুকে এরূপ দুইটি বস্তু খেলাইবার জন্য দিতে হইবে যেন একটি অত্যন্ত কঠিন ও আর একটি অত্যন্ত নরম অথবা তরল থাকে। কিছু দিন পরে এই দুইটার মধ্যবর্ত্তি আর এরূপ একটি দিতে হইবে, যাহা এই উভয়টি হইতে পৃথক বলিয়া সহজেই প্রতীয়মান হইতে পারে। পরে ক্রমেং ভিন্নং রূপ কঠিন বস্তু দিতে হইবে। তাপ ও মসৃণতা সম্বন্ধেও এইরূপ। বিবেচনার মত খেলাইবার বস্তু দিতে পারিলে এ অবস্থায় শিশুর অনেক সাহায্য হইতে পারে। এবং যে তাহার সহিত সর্ব্বদা খেলায় অর্থাৎ তাহার জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে, স্বভাবতঃই শিশু তাহাকে অধিক ভাল বাসে। সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে ছোট শিশু তদপেক্ষা কিছু বড় বালক বালিকার নিকট থাকিতেই ভাল বাসে; কারণ উভয়েই খেলায় মত্ত। আমরা যেরূপ দেখিয়া ত্যক্ত হই, তাহারা তদ্রূপ করিয়া ত্যক্ত হয় না। দুই তিনটি বালক বালিকা ভয়ানক চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে একটি এক বৎসরের শিশু আছে, আমরা আশঙ্কা করি সে ত্যক্ত হইবে, কিন্তু সে হাসিতে লাগিল। আমরা বোধ করি শিশুর সঙ্গে খেলাইতেছি কিন্তু শিশু তাহা ভাবে না। সে সর্ব্বদাই কিছু না কিছু শিক্ষা করিতে যত্নবান। সন্তানের এই ঔৎসুক্য ক্রমেই বৃদ্ধি করা উচিত। আমরা দেখিতে পাই যে যত জ্ঞানী তাহার জানিবার ইচ্ছাও তত প্রবল। সেইরূপ সন্তানকে যত শিখাইবে তত তাহার ঔৎসুক্য বাড়িবে। যে কিছুই জানে না তাহার ঔৎসুক্যও উপশমিত হয়। সে ক্রমে নির্ব্বোধ হইতে থাকে। সে দিন আমি এক জন বন্ধুর সহিত একটি গৃহে প্রবেশ করিবার সময় দ্বারের নিকটে ধাত্রীর ক্রোড়ে একটি ছোট মেয়ে দেখিতে পাইলাম। আমরা উভয়ে তাহার নিকট গেলাম, আমরা হয়ত খেলাইবার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম, কিন্তু সে আমাদের দ্বারা তাহার কার্য্য সাধন করিয়া লইল। দরজার পার্শ্বে নীল রঙের সুন্দর একটি ফুল ফুটিয়াছিল, সে আমাদিগকে তখনই তাহা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল। কেহ কেহ এরূপ অবস্থায় ফুলটি দেখিয়াই সন্তুষ্ট হয়েন, অধিক হইলে শিশুকে একবার চুম্বন করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন। কিন্তু সে কি উদ্দেশ্যে তাহা দেখাইয়া দিয়াছে জানা আবশ্যক। ফুল দেখিয়া তাহার স্পর্শ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। দেখিতে যাহা সুন্দর ছুইতে তাহা কিরূপ, এই প্রশ্ন হয়ত তাহার মনে হইয়াছিল। ধাত্রীর প্রকৃতি সে অবগত আছে; সে নিশ্চয় জানে যে ধাত্রীর নিকট চাহিলে কোন ফল নাই, তাই আমাদিগকে সে ফুলটি দেখাইল। ফুলটি তাহার হাতে দেওয়া হইলে সে বি-

শেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় সন্তানকে বিশেষ সাহায্য করা উচিত। বাগানের একটি ফুল নষ্ট হইবে, বাগান সুন্দর দেখা যাইবে না, এরূপও অনেকে বিবেচনা করিয়া থাকেন।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে বাহ্য জগতে জ্ঞানলাভার্থ আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে ; কিন্তু আধুনিক দার্শনিকগণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, আমরা এই গুলি ব্যতীত আরও একটি ইন্দ্রিয়ের অধিকারী। যে শক্তিদ্বারা আমরা হস্ত পদ চালনা করি, যাহাদ্বারা আমরা বস্তুর গুরুত্ব ও লঘুত্ব বোধ করিতে পারি, তাহাকে আধুনিক দার্শনিকেরা পৈশিক ইন্দ্রিয় বলিয়া থাকেন। এই শক্তির একটি কার্য্য আমরা ইতি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি ; কোন বস্তুর কাঠিন্য আমরা এই শক্তি দ্বারাই বোধ করিয়া থাকি। কোন্ বস্তু কিরূপ ভার, তাহাও এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়। এবিষয়েও সন্তানদিগের শিক্ষা পাওয়া আবশ্যক। এই ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা প্রণালীও উক্ত গুলির ন্যায়। প্রথমে দুইটি বস্তু এরূপ বাছিয়া দিতে হইবে যে তাহাদের গুরুত্ব স্পষ্ট ন্যূনাধিক হয় এবং ক্রমে সূক্ষ্মতর বিভেদ শিক্ষা দিতে হইবে।

বাগিন্দ্রিয়।

শিশু ক্রমে বড় হইতে থাকে আর তাহার জ্ঞান বাড়িতে থাকে। সে ক্রমে হাটিতে শিক্ষা করে, সকল স্থানে বেড়ায়, সকল বস্তু আহরণ ও পরীক্ষা করিয়া দেখে। যখন শিশু কতক গুলি শব্দের বিভিন্নতা বুঝিতে পারিয়াছে, তখন হইতে তাহার আর একটি চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। যে শব্দ সে খুব স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে তাহা নিজে উচ্চারণ করিতে অনেক চেষ্টা করিতেছে। আমরা অনেক সময়ে অনেক শিশুকে অনর্থক অনেক শব্দ উচ্চারণ করিতে দেখিয়া আনন্দের সহিত হাসিয়াছি। জননীরা হয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে এমত অবস্থায় শিশুর সঙ্গে কথা বলিলে, সে অনেক প্রকার শব্দ উচ্চারণ করে। সে ক্রমে ক্রমে অনেক প্রকার স্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করিতে শিক্ষা করে। জননী তখন তাহাকে কথা বলাইতে বিশেষ ইচ্ছুক হন। যাহাকে তিনি ভালবাসেন তাহাকে ডাকিতে বলেন ; কোন বস্তু অথবা পশু পক্ষীর নাম লইতে শিক্ষা দেন। এরূপ অবস্থায় জননীর একটু সাবধান হওয়া আবশ্যক, যে শব্দ গুলি যুবকদিগেরও উচ্চারণ করিতে কষ্ট হয় তাহা যেন তিনি শিশুকে প্রথমেই শিক্ষা দিতে না চান। আমরা এসম্বন্ধে একটি শিশুর ব্যবহার দেখিয়া বড় আমোদ ও শিক্ষা পাইয়া থাকি। শিশুর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম হিরণ্ময়ী, সকলে তাহাকে হিরণ্য বলিয়া ডাকে। নামটি সর্ব্বদাই শুনিয়া শিশুর বড় ইচ্ছা হয় যে তাহাকে ডাকে ; কিন্তু সাধ্য কি ? প্রথম সে তাহাকে "নানা" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল, পরে ক্রমে ক্রমে যখন তাহার জিহ্বা কএকটি সরল সংযুক্ত অক্ষর উচ্চারণ করিতে শিখিল তখন সে তাহাকে "নিন্ন" বলিয়া ডাকিত ; এ

খন* সে তাহাকে "ইয়ন্" বলিয়া ডাকে। তাহার ধাত্রীর কন্যার নাম রুক্মিণী; ধাত্রী তাহাকে "রুক্মিন্" বলিয়া ডাকে। শিশু তাহাকে ভালবাসে এবং ডাকিতে চায়, কিন্তু কি বলিয়া ডাকিবে ঠিক করিতে পারে না। প্রথমে সে তাহাকে 'কুম্নী' বলিয়া ডাকিতেছে। এই শিশুর উচ্চারণোন্নতি দেখিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীতি ও শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি এবং উল্লিখিত প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে। এবিষয়ে জননীর কি করা উচিত নিম্নে লিখিত হইবে।

উচ্চারণ করিতে স্বরবর্ণ গুলি শিশুর নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সহজ বোধ হয়। ইহার মধ্যে হ্রস্বদীর্ঘ প্রভেদ এবং ঋ ৯ ঐ এবং ঔ এই বর্ণগুলি ছাড়িয়া দিলে আর সকলই উচ্চারণ করিতে অতি সহজ বোধ হইবে। ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে কএকটি মাত্র প্রথম উচ্চারণ করান যাইতে পারে, তন্মধ্যে ওষ্ঠ বর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। প ব ম উচ্চারণ করিতে কোন কষ্ট হইবে না কিন্তু ফ অথবা ভ যেন শিক্ষা দিতে চেষ্টা করা না হয়। জিহ্বামূলীয়ের মধ্যে ক গ দন্ত্যবর্ণের মধ্যে ত দ ন এবং কিছু দিন পরে ল, অন্ত্য বর্ণের মধ্যে য়। এই সকল বর্ণ এক একটি করিয়া উচ্চারণ করাইতে হইবে না; যে সকল দ্রব্য জন্তু অথবা মনুষ্যের নামে এইগুলি আছে তাহাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া নাম শিখাইতে হইবে। এই গুলির সঙ্গে সঙ্গে বানান শিখিতে পারিবে। ক এবং উ উচ্চারণ করিতে পারিলে, কু বলিতে আর বিলম্ব হইবে না। কিন্তু ফলা শিখিতে বিশেষ বিলম্ব হয়; সংযুক্ত অক্ষর শিশুর মুখে সহজে উচ্চারিত হওয়া সম্ভব নয়। যখন শিশুর মুখে অনেক প্রকার শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল, তখন জননীর উচিত যে সন্তানের অত্যন্ত-প্রিয় এবং অত্যন্ত অপ্রিয় জিনিষ গুলির নাম একে একে শিক্ষা দেন। সন্তান আপনি আহ্লাদিত হইয়া শিখিতে থাকিবে। তিনবার যদি তাহাকে বলিয়া দেন 'মা! মা! কুত্তা' আর একবার কুকুর দেখিলে সে আপনি বলিয়া উঠিবে 'মা! মা! কুত্তা। যদি দুই তিনবার শরীরে একটি স্পর্শ করিয়া বলেন 'মা! মা! কাটা, আর একবার কাটা দেখিলে সন্তান আপনি বলিয়া উঠিবে 'মা! মা! কাতা।

এইরূপ উন্নত হইতে সন্তান প্রায় পাঁচ বৎসর-বয়স্ক হইয়া যায়। সকল ইন্দ্রিয় ক্রমে প্রস্ফুটিত হইয়া এক হয়। চিনি দেখিলেই বোঝে ছুইলে চূর্ণ, খাইলে মিষ্ট। পুতুল দেখিলেই বোধ করিতে পারে ছুইলে শক্ত, ফেলিলে ভাঙ্গে। ঢোল ও কাঠি দেখিলে বোঝে যে পরস্পর আঘাত করিলে একরূপ শব্দ হইবে। এইরূপে ইন্দ্রিয় সকলের পরস্পর সংযোগ নিবদ্ধ হইয়া যায়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ এই বয়সেই উচ্চতর শিক্ষা আবশ্যক বোধ হয়। অতএব এই বয়সেই হাতে

* এ প্রস্তাব ১২৮৮ সনের চৈত্রমাসে প্রথম লিখিত হয়।

খড়ি দিয়া ক, খ শিক্ষা আরম্ভ হয় ; কিন্তু এ অবস্থায় কিরূপ শিক্ষা কিরূপে আরম্ভ করা উচিত আমরা এখন তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। শ্রীশিঃ—

অগ্নিকুল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

শৃঙ্গধর এ পর্য্যন্ত বিনায়ক ঋষির সহিত আলাপ করিবার অবসর পান নাই। অথচ হঠাৎ তাহাকে রঙ্গস্থলে উপস্থিত দেখিয়া বিস্মিত হইতেছিলেন।

এখন একই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় কথোপকথনের সুবিধা হইয়াছে। শৃঙ্গধর বিনায়ককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'ঠাকুরদাদা, আপনি কি মনে করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন ?'

বিনায়ক বলিলেন, 'ভায়া, বলিব কি, যে দিন আমরা বৃহস্পতির আশ্রমে ভোজন করি, সে দিন তোমরা চলিয়া আসিলে শুনিতে পাইলাম, গায়ত্রীকে দস্যুতে অপহরণ করিয়াছে—'

শৃঙ্গধর চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন 'কি সর্ব্বনাশ—গায়ত্রীকে অপহরণ করিয়াছে! —কিরূপে করিল,—যথার্থই কি অপহরণ করিয়াছে ?'

বিনায়ক বলিলেন, শুন,—

আমি ঐ কথা শুনিয়া আর সহ্য করিতে পারিলাম না—ক্রোধ হইল, বিশেষ ঐ দিন আমি ভূরি ভোজন জন্য বড় অসুস্থ হইয়া পড়ি—ঋষিবনিতা প্রকৃতী দেবী আমায় মায়ের অধিক সুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাঁহার বিলাপ ও কাতরতা দেখিয়া তখনই এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইলাম, গায়ত্রীর অনুসন্ধান করিব, নচেৎ প্রত্যাবৃত্ত হইব না—এ মুখ আর, গায়ত্রীর সন্ধান না করিতে পারিলে, তাহার পিতা মাতাকে দেখাইব না—'

শৃঙ্গধর, 'তার পর, গায়ত্রীর সন্ধান কিছু পাইলেন ?'

বিনায়ক, দুই তিন দিন জঙ্গলে, নদীতীরে, পর্ব্বতশিখরে নানা স্থানে অনুসন্ধান করিলাম,—পাইলাম না,—এক দিন পথে অতুলের সহিত সাক্ষাৎ হইল, অতুল বলিল 'অনুসন্ধান নিষ্ফল, গায়ত্রীকে দস্যুতে অপহরণ করিয়া তাহাদিগের সেনাপতির হস্তে দিয়াছে।

শৃঙ্গধর, 'আপনি বলেন কি! ভয়ানক —তবে কি গায়ত্রী সূর্য্যনাথের নিকট রহিয়াছে—দস্যু, নারীচোর, পশু-অধম, ঘৃণ্য কুক্কুর, লম্পট, ছি—ছি—ছি, ধিক তাহার বীরত্বে, ধিক্ তাহার সাধুবাক্যে,—কপটা-

চারী, —এই বলিতে বলিতে দাঁড়াইলেন। 'তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ এবং মাংসপেশী ও শিরানিচয় স্ফীত হইয়া উঠিল,—দুইবার দন্ত কট্ মট্ করিয়া বলিলেন, তার পর কি হইল?'

বিনায়ক শৃঙ্গধরের বিষম ক্রোধ ভাব দেখিয়া বলিলেন—' বসিয়া শুন'। শৃঙ্গধর বসিলে, বলিতে লাগিলেন—' আমি অহ্নুলের কথায় ফিরিলাম না, মনে করিলাম যেমন করিয়া পারি দস্যুদলে প্রবেশ করিব, গায়ত্রীকে দেখিব, উদ্ধার করিবার উপায় করিব, তাহা করিতে গিয়াই বিভ্রাট উপস্থিত হইল। দস্যুদলপতির সহিত সাক্ষাৎ হইল, ক্রোধ হইল—তাহাকে বধ করিবার জন্য ত্রিশূল আঘাত করিলাম—দস্যু কেবল সেই ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়াই তোমাকে আমাকে এবং ইহাকে (ভীমকে দেখাইয়া) প্রাণদণ্ডের আদেশ দিল—'।

শৃঙ্গধর একটি দীর্ঘশ্বাস উদ্গীরণ করিয়া বলিলেন, ' একটু সাবধানে কাজ করিলে এরূপে জড়িত হইতেন না।

বিনায়ক বলিলেন, ' ভাই আমার জন্য ভাবনা করিও না—আমি কুম্ভকের বলে শূন্যে উড্ডীন হইতে ও অষ্ট দিবারাত্র জলতলে নিমজ্জিত থাকিতে পারি—ঈশ্বর যখন দুইবার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন তখন আর চিন্তা নাই,--সহজেই চলিয়া যাইব,—কিন্তু গায়ত্রীর অনুসন্ধান কিছুই হইল না; তাহার উপায় কি বল? — শৃঙ্গধরের শরীর আবার উষ্ম হইল দাঁড়াইয়া কিছুকাল গৃহাভ্যন্তরে পদচারণ করিলেন, পরে নির্ভয়ে গম্ভীর শব্দে এবং উচ্চ রবে বলিলেন, 'ঠাকুর দাদা, আজ হউক কালি হউক সেনাপতির সাক্ষাৎ পাইব। নরাধমকে জিজ্ঞাসা করিব, সে নিজে বালিকাকে কি জন্য চুরি করিয়াছে। না-না-না,— ঠাকুর দাদা, যদি পারেন আপনি এখনই দৈত্য ব্যূহ হইতে প্রস্থান করুন, ভগবান বৃহস্পতিকে বলিবেন, গায়ত্রী-অপহারী দৈত্য সেনাপতির বধের জন্য শৃঙ্গধরকে রাখিয়া আসিয়াছি। পরে দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি দেখাইয়া বলিলেন আমি এই বজ্র মুষ্টিতে নরাধম সূর্য্যনাথের মস্তক চূর্ণ করিব।

দুইবার মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা পাইয়া এবং নিজের পাপ কার্য্য ভাবিয়া ভাবিয়া ভীমের শরীর অবশ হইয়া পড়িয়াছিল।— তাহাতেই এপর্য্যন্ত কেবল ঘুমাইতেছিল।

ভীমদণ্ড আজন্ম বৌদ্ধ নহে, সুশিক্ষিত ও নহে। তাহার সংসারে মাত্র এক স্ত্রী ছিল ও দুটি পুত্র ছিল; দারুণ ক্রোধ ভরে স্ত্রী ও পুত্রদ্বয়ের প্রাণ সংহার করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়াছিল। তৎপরে বৌদ্ধপ্রচারকের প্ররোচনায় আর্য্য ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ দল ভুক্ত হয়। সুতরাং তাহা ভাল কি মন্দ করিল ভাবিয়া হৃদয় সংশয়যুক্ত ছিল।—ভীম ঘুমে আপন পাপের স্বপন দেখিতে ছিল,—দেখিতে ছিল, সেনাপতির আদেশে আবার তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে। দেহ পড়িয়া রহিয়াছে, জীবাত্মা পালাইতেছে। পলাইতে পলাইতে এক ঘোর অন্ধকারময় গুহায় আশ্রয় হইল। তাহার পদতলে শত শত বিষধর কিলি কিলি করি-

তেছে। শরীরে কাকবৎ সহস্র সহস্র মশক জয় ঢক্কার ন্যায় শব্দ করিয়া দংশন জন্য অগ্রসর হইতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহাতে তীব্র অগ্নি জ্বলিল, কালানল, মহাস্রোতে প্রবহমাণা হইল, লক্ষ লক্ষ পাপী লোক হায় হায় করিয়া তন্মধ্যে ভাসিয়া, পুড়িয়া যাইতে লাগিল। শূন্য হইতে মহারক্তবর্ণ এক ভীমকায় বিকটাকার পুরুষ জ্যোতিঃ পূর্ণ এক মুষলহস্তে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে, শতকড়কানিনাদে ডাকিয়া বলিল, 'মহাপাপি, দেখিতেছিস্, না, ঐ অগ্নি স্রোতে তোরে ডুবাইয়া দিব। উচ্চ রবে, কি কি পাপ করিয়াছিস্ বল্, লোক সমক্ষে বল্, ধর্ম্মের কাছে বল্ এখনও সময় আছে, নচেৎ এখনই এই মুষলাঘাতে তোর মস্তক চূর্ণ করিব।' ভীমদণ্ড ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করিয়া বলিল, 'বলি বলি রক্ষাকর, রক্ষাকর' অমনি জাগিল, জাগিয়াও সেই শব্দ শুনিতে পাইল 'মুষ্ট্যাঘাতে মস্তক চূর্ণ করিব।'

ভীম দণ্ড 'বলি বলি' শব্দে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া বসিলে শৃঙ্গধর ও বিনায়ক দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে তাহার শরীর বিবর্ণ, বদন রক্তশূন্য, নয়নদ্বয় শুভ্র এবং প্রবল-বিস্ফারিত, স্থির, এবং ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত।

বিনায়ক শৃঙ্গধরকেবলিলেন 'এ শব্দবিকার, পাপবিকার, যাহা বলিতে চায় শুনিয়া লও।'

শৃঙ্গধর চতুরতা করিয়া বলিলেন 'গায়ত্রী কোথায় আছে।'

ভীমদণ্ড, এক নিশ্বাসে বলিতে চাহিল,—বলিল—'গায়ত্রী গায়ত্রী, সমীরণগরু, গায়ত্রীকে চুরি করিয়াছি। অর্ব্বলীর গুহায় মারিয়াছি;—মারিয়াছি—নানা-না, সেনাপতি,—সেনাপতির স্ত্রী, সেনাপতি আনিয়াছে।'

শৃঙ্গধর বিনায়ককে বলিলেন 'এ পাগলের ন্যায় অসংলগ্ন বলিতেছে কেন?'

বিনায়ক বলিলেন 'পাপের উদ্বেগে ইহার আত্মা বিচলিত হইয়াছে। দেহ ও মস্তিষ্ক বিকারগ্রস্ত হইয়াছে। যাহাদের হৃদয় স্বভাবতঃ দয়া-রত ও ভাল মন্দ বিচার-নিরত, অভ্যাস ও সংসর্গ দোষে সে মূঢ় এবং দস্যু হইলেও অধিক কাল মূঢ়তা ও দস্যুতায় লিপ্ত থাকিতে পারে না। নিরন্তর পাপের উত্তেজনায় সে সংশিত এবং বিচলিত হয়। এবং যখন পাপ ফল সম্মুখে দোলিত হইতে থাকে, শাস্তি, ভীষণ অসি তাহার সম্মুখে উত্তোলন করে, তখনই সে দিশা হারা হইয়া সৎ কিম্বা বিকারগ্রস্ত হয়। বাল্মীকির জীবনের শেষ ফল দেখ, এ ব্যক্তির সাধু কিম্বা উন্মাদ হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।—এ যাহা বলিতেছে তাহা উন্মাদ-প্রলাপ তুল্য হইলেও কদাপি মিথ্যা নহে।—মিথ্যা রচনা করিতে, সময় ও চতুরতার অপেক্ষা করে, ইহার এখন সেরূপ সময় নহে।—এ যাহা বলিতেছে তাহা উহার হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশ হইতে উঠিতেছে। বাক্য উহার নহে, উহার হৃদয়ের; উহার মুখ পানে চাহিয়া দেখ এই অল্প সময় মধ্যে মূর্ত্তি কিরূপ হইয়াছে।

শৃঙ্গধর শুনিয়া বলিলেন 'আপনি মানব

প্রকৃতি সম্যক পাঠ করিয়াছেন, আপনার কথা জ্ঞানপূর্ণ এবং যথার্থ।

এই সময়ে বিনায়ক ঋষি পেট মর্দ্দন করিতে করিতে বলিলেন ভায়া, উদরে কিঞ্চিৎ সোম-রস পড়িলে আরও কত জ্ঞানের কথা শুনিতে পাইতে?

শৃঙ্গধর তাহার কথায় একটু হাসিয়া ভীমের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, 'বল্ তারপর, কি করিয়াছিস্?'—ভীম পুনরায় পূর্ব্ববৎ 'বলি, বলি, রক্ষা কর, রক্ষাকর, বলিয়া চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,' মারিয়াছি অনেক মারিয়াছি বিনতা বিনতা তার দুই পুত্র গলা চিপে মারিয়াছি।

শৃঙ্গধর বলিলেন, 'বিনতা কে?' ভীম হৃদয়ে হাত দিয়া বলিল, হায় হায় হায় বিনতা, দুঃখিনী বিনতা, আমার আমার ব্যথিত সুহৃৎ প্রাণের স্ত্রী আমার স্ত্রী, বিনা দোষে সন্দেহে মারিয়াছি। রক্ষাকর রক্ষা কর বলি আরও বলি কত পাপ, রাশি পাপ করিয়াছি আমার মাথায় পাপের বোঝা হৃদয়ে পাপের বোঝা, জটায়ু কে তীরে বিদ্ধ করিয়া মারিয়াছি—ভগিনীকে দুঃখিনী করিয়াছি, বিধবা করিয়াছি—না, না, না, তাকেও মারিয়াছি কুবুদ্ধি করিয়াছিলাম তাহার যৌবনে লোভ করিয়াছিলাম, অসতী করিতে চাহিয়াছিলাম তা শুনিল না—সেই জন্য ক্রোধে মারিয়াছি, সর্ব্বনাশ করিয়াছি।

শৃঙ্গধর শিহরিয়া উঠিলেন, ' নারকী নারকী মহাপাপী, হে জগদীশ '—

বিনায়ক হাসিয়া বলিলেন—' দেখ পাপের কেমন বিষম তাড়না?'

শৃঙ্গধর পুনরায় ভীমকে বলিলেন 'তার পর?'—

ভীম পূর্ব্ববৎ রক্ষা কর রক্ষা কর বলিয়া আরম্ভ করিল—শিলা প্রাণের বন্ধু শিলা মারিয়াছি তারেও মারিয়াছি—সেনাপতিকে গোপন স্থান দেখাইয়াছিল, আমার পাপের কথা বলিয়া দিবে, ভয় দেখাইয়াছিল। আরও বলি রক্ষা কর রক্ষা কর, এই শেষ নহে আরও মারিয়াছি, বিদ্যাধরি মারিয়াছি, রূপরাশি ক্ষয় করিয়াছি, নিষ্কলঙ্ক, পরম সতী, মহা—মহা, বলি, বলি, মহাশ্বেতা,—

শৃঙ্গধর চমকিয়া উঠিলেন, ' কি বলিলি মহাশ্বেতা,—কোথায় মারিলি—কোন্ মহাশ্বেতা?'

ভীম, মহাশ্বেতা, অর্ব্বলীতলের বিধবা —না না বিধবার কন্যা, মারিয়া জলে—

ভীম বাক্য শেষ না করিতেই শৃঙ্গধর গর্জ্জিয়া উঠিলেন—' কি করিয়াছিস্ মহাশ্বেতাকে মারিয়াছিস্—হায়! মহাশ্বেতে, হৃদয়ের ধন, কণ্ঠের মণি, কাঙ্গালের সম্পদ, ব্যথার ব্যথিত, যোগীর যোগিনী, দুঃখীর দুঃখিনী, হৃদয়সর্ব্বস্ব ধন কোথা গেলে—অবশেষে তোমার দস্যুহস্তে প্রাণ গেল, হায় কি শুনিলাম—মহাশ্বেতে তুমি নাই এই বলিতে বলিতে শৃঙ্গধরের বিপুল দেহ ভীমের উপর পতিত হইল।

ভীম রক্ষা কর, রক্ষা কর, বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। শৃঙ্গধর মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

বিনায়ক ঋষি কিয়ৎকাল অবাক্ থাকিয়া বলিতে লাগিলেন,—'আগে জানিতাম প্রেমপাগলিনী রমণীদের প্রেমই বিরহে উছলিয়া পড়িত, তারা দশা ধরিত, আর ব্রজের গোপীকারা বিরহে বিধুর হইয়া—উন্মত্ত ও স্খলিতকবরী এবং স্খলিত পিন্ধন হইত, এখন দেখিতেছি কন্দমূলবিলাসী ঋষি বালকেরাও তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নয়—পতিছলিনী কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনী রাধা এখন নাই, কিন্তু সে বিরহ সংক্রামক রোগটি এখন প্রবল দেখিতেছি। কিন্তু রমণী ছাড়িয়া এখন যে পুরুষে ধরিল এই আশ্চর্য্য। এখনকার ছেলেদের না আছে লজ্জা, না আছে গুরুজনের প্রতি সম্ভ্রম!!! আমি বুড় এখানে রহিয়াছি—ছেলেটা মহাশ্বেতা মহাশ্বেতা বলিয়া চক্ষু উল্টাইল—আমাদের ত এক দিন ছেলে বয়েস ছিল, মহাশ্বেতা দূর হউক মহাশ্বেতার মা হইলেও এ দশাপন্ন হই নাই।—এর পর হয় ত দেখিতে পাইব, ছোড়া ছুঁড়ি গুল মাতৃগর্ব্ভেই প্রেম প্রেম বলিয়া লম্ফ ঝম্ফ করিবে—

এমন সময় আবার ' হা মহাশ্বেতে তুমি নাই' বলিয়া ধীরে শৃঙ্গধর উঠিয়া বসিলেন—

বিনায়ক চক্ষু আরক্ত করিয়া বলিলেন 'শৃঙ্গধর, এই রকম বিরহ এবং দশা ধরিয়াই—দেশ উদ্ধার হয়ে থাকে না কি ?,—

শোকের আঘাতের উপর মুনির এই তীব্র ব্যঙ্গোক্তি শৃঙ্গধরের হৃদয়ে বিষম ক্রোধ জ্বালিত করিল,লঘুহৃদয়ী হইলে,মুনি, ব্যঙ্গোক্তির কিছু না কিছু ফল পাইতেন—কিন্তু শৃঙ্গধরের হৃদয় সেরূপ নহে,—শৃঙ্গধর উহা সহ্য করিলেন, বীরের ন্যায় ক্রোধপীড়ন সহিলেন, সময় এবং অবস্থার গুরুত্ব বুঝিলেন, মহাশোকে অন্তর দগ্ধীভূত করিলেও প্রশান্ত ভাবে বলিলেন, " আর্য্য, আমার চিত্ত দৌর্ব্বল্য আপনার বিরক্তিকর এবং অসম্মান-প্রদ হইয়া থাকিবে,—অপরাধ ক্ষমা করিবেন ,।

যুবার এতাদৃশ ব্যবহার দেখিয়া বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হইলেন,— বলিলেন ' প্রিয়জনের মৃত্যুসংবাদ বজ্রপাত তুল্য,—দুই ই একবার হইলে, সংশোধন সাধ্যায়ত্ত নহে। এইটি পূর্ব্বে যিনি বুঝিতে পারেন এবং পরে যিনি স্থির থাকিতে পারেন,—তিনিই মহান্।—দুঃখ করিও না,সংসার এই রূপই —প্রকৃতি অম্ল মধুরময়। সদাই শুক্ল কৃষ্ণ বসন্ত শীতময়। দুঃখময় ইহলোকে যে সুখের স্বাদ চাহিবে,—তাহার, নিত্যসুখ পূর্ণ লোকের (পরলোকের) দ্বার রুদ্ধ। মহান্ লোকের নিকট ঐহিক সুখ বিস্তার হইলে, ঈশ্বর তাহা ধ্বংস করেন। দেখ, দেশের কল্যাণ জন্য ধর্ম্মের জয়জন্যই ঈশ্বর তোমার মহাশ্বেতাকে—প্রকারান্তরে হরণ করিয়াছেন।—ঐ অনন্ত ধামে আবার মহাশ্বেতার দর্শন পাইবে।—এখন তুমি স্নেহ বন্ধনে মুক্ত—মহাশ্বেতার ঐহিক প্রেম, স্নেহ, ভালবাসা, স্বদেশে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন কর। দেখিবে কত প্রেম, কত সুখ।

শৃঙ্গধর, বিনায়কের কথায় অনেক চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করিয়া বলিলেন,—আপনার উপদেশ বেদতুল্য, মধুর। আমি বালক

বলিয়া এরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলাম এখন আমার হৃদয় প্রশান্ত হইয়াছে। ঋষিকুল চূড়া! মহাশ্বেতার শোচনীয় মৃত্যু বিবরণ এই মূঢ়ের নিকট একবার জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিতে ইচ্ছা করি,?

এবারে স্বয়ংই বিনায়ক ভীমের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, একবার, দুইবার —তিনবার এইরূপ ক্রমে দশবার জিজ্ঞাসিলেন, ভীম আর সদুত্তর দিতে পারিল না —এখন শুদ্ধ রক্ষাকর রক্ষাকর শব্দে চিৎকার করিতে লাগিল। তাহার বদনে ভয়ের চিহ্ন নয়ন ঊর্দ্ধে স্থাপিত, যোড়কর, ধ্বনি— কেবল, 'রক্ষাকর রক্ষাকর'।

শৃঙ্গধর শ্বাসত্যাগ করিয়া,—বলিলেন, —আর শুনিতে পাইলাম না বুঝি এখনই সম্পূর্ণ উন্মাদগ্রস্ত হইল।

বিনায়ক, হাসিয়া তর্জ্জনী দেখাইলেন —'ভাই?'

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পরেশনাথ কোন চিন্তায় নিযুক্ত থাকিলে—এরূপ অন্যমনা হন যে তখন কোন অসৎ বিষয়ের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেও,—অনায়াসে তদ্বিষয়ে আদেশ প্রদান করেন।—তবে সর্ব্বদা তাহার নিকটে যাওয়া এক সূর্য্যনাথ ব্যতীত কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে।

সূর্য্যনাথ শৃঙ্গধর প্রভৃতির মুক্তির অনুমতি লইয়াছেন। সম্ভবতঃ পরেশনাথ তখন চিন্তামগ্ন ছিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে একজন বৌদ্ধ সৈনিক মুক্তি পত্র লইয়া কারাগৃহে প্রবৃষ্ট হইল।

শৃঙ্গধর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'বধের আদেশ লইয়া আসিয়াছ?' সৈনিক মুক্তিপত্র তাঁহার হস্তে প্রদান করিল।

শৃঙ্গধর বলিলেন, তোমাদিগের সেনাপতির অনুগ্রহে আপ্যায়িত হইলাম।—মুক্তির পূর্ব্বে তাহার সহিত সাক্ষাত হওয়া চাই—তবে আমরা যাইব।

ভীম পূর্ব্বেই স্থানান্তরিত হইয়া বৌদ্ধ চিকিৎসক হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে—সুতরাং —শৃঙ্গধরের কথামত সৈনিক তাঁহাকে এবং বিনায়ক ঋষিকে সেনাপতির নিকট লইয়া চলিল।

কারাগৃহের অনতিদূরে শৈলোপরি সেনাপতির গৃহ। এই গৃহ প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং প্রশস্ত। পূর্ব্বতন প্রথানুসারে ইহার একমাত্র দ্বার। কিন্তু আলোক আসিবার জন্য চারিদিগে চারিটি গবাক্ষ রহিয়াছে।

গৃহ পর্ব্বতোপরি সংস্থাপিত হওয়াতে, —এই গৃহে উঠিয়া চারিদিগ ভাল করিয়া দেখা যায়।

গৃহ শয্যা সামান্য।—নারাচ, চন্দ্রহাস, ভল্ল, কুঠার, অসি, তীর ও ধনু প্রভৃতি কতগুলিন পরিষ্কৃত অস্ত্র একদিকে সজ্জিত রহিয়াছে। একদিকে একখানি সামান্য খট্টা, তদুপরি পশম-রচিত বস্ত্রের বিছানা ও উপাধান। তন্নিম্নে কএক খানি প্রস্তরাসন। একধারে একটি রজত ভৃঙ্গার,— এবং রজত দীপাধার।

সেনাপতি সূর্য্যনাথের নিত্য কর্ম্মের

মধ্যে, প্রাতঃকালে প্রাচীন গ্রন্থানুশীলন একটি কার্য্য; তিনি অদ্য একখানি আসনে বসিয়া, অপর একখানি আসনে পালী হস্তাক্ষরে লেখা কএকখানি গ্রন্থ স্থাপন করিয়াছেন। একখানি হস্তে লইয়া নিবিষ্টমনে পাঠ করিতেছেন। গ্রন্থের নাম 'পাতঞ্জল দর্শনম্'।

এমন সময়ে বৌদ্ধ সৈনিক আসিয়া নিবেদন করিল—'বন্দিদ্বয় আপনার সাক্ষাৎ বিনা যাইতে অসম্মত, এই জন্য তাহাদের শপথ গ্রহণ করি নাই।

সূর্য্যনাথ মাতা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি?'

সৈনিক পুনরায় ঐ কথা বলিল।

সূর্য্যনাথ বলিলেন, 'তাঁহারা কোথায়?,

সৈনিক বলিল, 'সঙ্গে আনিয়াছি'।

সূর্য্যনাথ, 'আসিতে দাও,' বলিয়া পুনরায় পুস্তক পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনতি বিলম্বে শৃঙ্গধর এবং বিনায়ক গৃহ প্রবিষ্ট হইলেন।

তাঁহারা প্রবেশ করিলে সূর্য্যনাথ সমাদরে তাঁহাদিগকে বসাইলেন। উপবেশন করিলে সেনাপতি পাঠাবশিষ্ট সমাপন করিয়া তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিবেন আশায়, শীঘ্র পুস্তক পাঠ শেষ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

শৃঙ্গধর ইহাতে বিরক্ত হইলেন। কিন্তু বিনায়ক দৈত্য সেনাপতিকে এতাদৃশ পাঠনিরত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এবং কৌতূহল পরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

'এখানি কি পুথি?'

'পাতঞ্জল দর্শনম্'

'কোন্ অধ্যায় পড়িতেছেন?'

'সমাধিপাদঃ'।

'কোন্‌সূত্র?'

সূর্য্যনাথ বিরক্ত হইয়া পুস্তকখানি রাখিয়া দিলেন—এবং বৈরক্তি গোপন করিবার জন্য একটু হাসিয়া বলিলেন।

'দ্বিতীয় সূত্র?'

ও—তবে, 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। সর্ব্বশব্দা গ্রহণাৎ সম্প্রজ্ঞাতোঽপি যোগ ইতি খ্যায়তে। চিত্তং হি প্রখ্যা-প্রবৃত্তি-স্থিতি শীলত্বাৎ ত্রিগুণম্। প্রখ্যারূপংহি চিত্তসত্বং রজস্তমোভ্যাং সংসৃষ্টম্ ঐশ্বর্য্যবিষয়প্রিয়ং ভবতি।' প্রভৃতি, একনিশ্বাসে চারি পাঁচ পাত আবৃত্তি করিয়া বিনায়ক ঋষি পুনরায় বলিতে লাগিলেন—আমি পাতঞ্জল দর্শনের অতি প্রাঞ্জল টীকা রচনা করিয়াছি, শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন। এই বলিয়াই আবার টীকা আরম্ভ করিলেন,—(সূর্য্যনাথ কি শৃঙ্গধর আর কথা বলিবার অবসর পাইলেন না।)

'নিরুদ্ধান্তে যস্মিন্ প্রমাণাদি বৃত্তয়োঽবস্থাবিশেষে—চিত্তস্য সোঽবস্থা বিশেষো যোগঃ।—নমুসম্প্রজ্ঞাতস্য যোগস্য ব্যাপকত্বাৎ অলক্ষণমিদ মনিরুদ্ধাহি তত্র সাত্বিকী-চিত্তবৃত্তিরিত্যত আহ সর্ব্বশব্দাগ্রহণাদিতি॥'

সময় নষ্ট হইতেছে দেখিয়া শৃঙ্গধরের অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি বৃদ্ধকে বাধা দিয়া বলিলেন, 'আপনি যাহার কাছে বকিতেছেন উনি সুপণ্ডিত, চুপ করুন এখন কাযের কথা দুই একটি হউক।

বিনায়ক তথাপি আরও উচ্চরবে—'যদি সর্ব্বচিত্তবৃত্তিনিরোধ ইত্যুচ্যতে তবে দব্যাপকং সম্প্রজ্ঞাতস্য ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়পরিপন্থিচিত্তবৃত্তিনিরোধস্তু তমপি সংগৃহ্লাতি তত্রাপি রাজসতামসচিত্তবৃত্তিনিরোধাত্তস্য চ তদ্ভাবাদিত্যর্থঃ' প্রভৃতি অনেক গুলিন টীকা দ্রুত আবৃত্তি করিয়া বলিলেন,—ফুস্ উনি করুন দেখি এই রকম টীকা?

সূর্য্যনাথ বৃদ্ধকে প্রধান পণ্ডিত জ্ঞানে তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্লুতচিত্ত হইয়াও তাঁহার উন্মাদভাব দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

শৃঙ্গধর অধিকতর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আপনি কি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়াছেন, সকল বিষয়েই দেশকাল পাত্রের বিবেচনা লোকে করিয়া থাকে।

বিনায়ক, 'কেন কি হইয়াছে, টীকা ভাল হয় নাই?' দেখ 'কুতঃ পুনরেকস্য চিত্তস্য ক্ষিপ্তাদিভূমিসম্বন্ধ কিমর্থং—বলিতেই সূর্য্যনাথ উচ্চরবে হাসিয়া উঠিলেন; ঐ সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্গধরও না হাসিয়া পারিলেন না, হাসিয়া পরে গম্ভীরভাবে বলিলেন এ শাস্ত্রালোচনার সময় নহে, যে জন্য আসিয়াছি তাহাই করা হউক।

বিনায়ক কিছু অসন্তুষ্ট হইয়া চুপ করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য ইহারা বোধক্ষম নহে মনে মনে এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

সূর্য্যনাথ বলিলেন,—'তবে আপনারা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় হইতে আসিয়াছেন?

শৃঙ্গধর বলিলেন, বিদায়ের বিলম্ব আছে বোধ হয় আমাদিগকে মুক্ত করা আপনাদের অভিপ্রেত নহে'।

সূর্য্যনাথ 'কেন?'

শৃঙ্গধর, 'আপনাদের প্রতিকূলে আর অস্ত্র ধারণ করিতে পারিব না এরূপ শপথ করিতে আমি অসক্ত।' দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধকাল পর্য্যন্ত এদেশ ত্যাগ করিয়া কৈলাসে বাস করিব, তাহাই যদি হয় তবে স্বাধীনতা কোথায় পাইলাম, এখানেই ত ভোজন পান করিয়া একরূপ আছি?'

সূর্য্যনাথ। আপনার সন্ধির জন্য এ নিয়ম নহে।

শৃঙ্গধর। তাহা হইলে সন্ধিমুক্ত তিনিই যাইবেন?

সূর্য্যনাথ কিছুকাল চিন্তা করিয়া দেখিলেন শৃঙ্গধরের কথা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। প্রকাশে বলিলেন 'শত্রু কারাগার হইতে মুক্তি পাইতে হইলে শপথ আপনাকে করিতে হইবেই।

শৃঙ্গধর। নাম মাত্র মুক্তি লইয়া আমি কি করিব?

সূর্য্য। আপনি তবে আমাদের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিবেন?'

শৃঙ্গ। অবশ্য করিব, তবে প্রতিজ্ঞা করিতে পারি আপনার শরীরে অস্ত্রক্ষেপণ করিব না।'

সূর্য্য। বৌদ্ধসমিতি আমার শরীর, ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য আমি চিন্তিত নই। অন্ততঃ আপনি কি নিয়মে মুক্তি পাইলে অসম্মত নহেন তাহাই বলুন?'

শৃঙ্গ। আমি যুদ্ধকাল পর্য্যন্ত কৈলাসে নির্ব্বাসিত থাকিব।

সূর্য্য। কৈলাসরাজ আপনার চরিত্র এবং গতিবিধি দেখিবেন।

শৃঙ্গ। দেখিতে পারেন।

সূর্য্য। আপনার সঙ্গে আমাদের লোক যাইবে।

শৃঙ্গ। যাইতে পারে।

সূর্য্যনাথ হাসিয়া বলিলেন, সন্তুষ্ট হইলাম, আপনি মুক্ত। উপস্থিত সৈনিককে ডাকিয়া বলিলেন, একজন ভাল লোক ইহার সঙ্গে দিতে হইবে।

সৈনিক সম্ভ্রমসহ বিদায় হইল।

সূর্য্যনাথ, পত্র লিখিতে বসিলেন। লেখা সম্পূর্ণ হইলে শৃঙ্গধরকে পড়িয়া শুনাইলেন। পত্র এইরূপ;—

'সকল মঙ্গলালয় নৃপতিকুলচূড়া কৈলাসপতি।

বীরকেশরী শ্রীমৎ শৃঙ্গধরদেব আমাদিগের বন্দিত্ব মুক্ত হইয়া কৈলাস বাস করিবেন এবং আমাদের সংগ্রাম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি তথাতেই থাকিবেন এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যুদ্ধকাল পর্য্যন্ত আপনি তাঁহার চরিত্র ও গতি বিধি দৃষ্টি করিবেন—আপনি তজ্জন্য দায়ী। সুহৃৎ

শ্রীসূর্য্যনাথস্য।

বৌদ্ধ সেনাধীশ।

পাঠ সমাপন হইলে মোরক করিয়া দাঁড়াইলেন। এই সময়ে শৃঙ্গধর বলিলেন আর একটি অতি প্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞাসা করিব।

সূর্য্যনাথ বলিলেন—'অনায়াসে'। শৃঙ্গধর বলিলেন, একটি ঋষি কন্যা আপনি অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন—

সূর্য্যনাথের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। কিছুকাল পরে বিকৃত বদনে বলিলেন—

'কি অপহরণ,—অপহরণ কাহাকে কহে আমি জানি না—কাহাকেও আমি অপহরণ করি নাই।

শৃঙ্গধর বলিলেন,—'অপহরণ না করিতে পারেন, তাহার সহায়তা করিয়াছেন—বালিকাটি আপনার নিকট আছে'।

সূর্য্যনাথ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন 'অপহরণ—কিম্বা তদ্ সাহায্য আমি করি নাই—কোনও বালিকা আমার নিকট নাই'।

শৃঙ্গধর অপ্রতিভ হইলেন, ভাবিলেন, উন্মাদ প্রলাপের উপর নির্ভর করিয়া—এরূপ জিজ্ঞাসা করা অসঙ্গত হইয়াছে।

বিনায়ক এই সময় গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'দৈত্য সেনাপতি!—মিথ্যাবাদী হইবেন না—ভীমদণ্ড একটি ঋষি কুমারীকে বল পূর্ব্বক আনিয়া অর্ব্বলী গুহায় রাখিয়াছিল। আপনি তাহাকে আনিয়াছেন—বালিকাটিকে এখনই দিন?

এই বারে সূর্য্যনাথ স্নিগ্ধ হইলেন। ধীরে বিনম্রস্বরে বলিলেন—

'একথা অযথার্থ নহে। আমি তাহাকে বিপদমগ্ন দেখিয়া আনিয়াছি সত্য—কিন্তু তাহাকে দিবার—আমার সাধ্য কিম্বা অধিকার নাই'।

শৃঙ্গধর গর্জ্জিয়া উঠিলেন 'কি—অধি-

কার নাই—ইহার অধিকার আর অনধিকার কি—আপনি আনিয়াছেন—আপনি দিবেন।

সূর্য্যনাথ, বলিলেন,—'অসাধ্য। সে বালিকা দুইটি কঠিন শৃঙ্খলে বদ্ধ'।

শৃঙ্গধর ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন—'চপলতা পরিত্যাগ করিয়া বলুন—তাহাকে দিবেন কি না?—আপনার শৃঙ্খলের অর্থ আমি বুঝিতে অসমর্থ।

সূর্য্যনাথ বলিলেন—এখন স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি—বালিকা আমাদের কর্ত্তৃঠাকুরাণীর হৃদয় ডোরে বাঁধা, তাহাকে দিলে তাঁহার প্রাণ বাচিবে না—আর—

আর সেই রূপবতী বালিকা আমার বন্ধুহীন জগতের এবং হৃদয়ের একমাত্র অবলম্বন আর গোপন করিয়া কি হইবে?

শৃঙ্গধর ক্রোধে এবার একবারে ধীরতা ভ্রষ্ট হইলেন—তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল, লোচনে ধারা বহিল—কম্পিতস্বরে গর্জ্জিয়া বলিলেন, 'মূঢ় কুক্কুর হইয়া যজ্ঞীয় হবি ভোজন করিবি— বামন হইয়া সুধাংশু স্পর্শ করিবি—শৃঙ্গধর তাহা সহ্য করিবে না করিবে না—এই বলিয়া বিপুল ভাস্বর প্রস্তরাসন দুই হস্তে তুলিয়া সূর্য্যনাথের—মস্তক লক্ষ্য করিলেন। সূর্য্যনাথ ভয় ও বিস্ময়ে দুই পদ সরিয়া গিয়া টিটিকারী দিয়া বলিলেন এখনও আপনি আমাদিগের বন্দি, আর এই মাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন আমার প্রতিকূলে হস্তোত্তোলন করিবেন না। ঋষিযুবার এই কি প্রতিজ্ঞা রক্ষা, আর এই কি ধীরতা? ধন্য।

শৃঙ্গধর লজ্জা পাইয়া ধীরে প্রস্তরাসন রাখিয়া হেটমুণ্ডে স্তব্ধ ও ম্রিয়মাণ হইয়া দাঁড়াইলেন।

অল্পকাল মধ্যে কৈলাস গমন জন্য লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। সেনাপতি তাহার হস্তে পত্র দিয়া শৃঙ্গধরকে বলিলেন, এই লোকের সঙ্গে গমন করুন।

বিনায়ক সূর্য্যনাথকে বলিলেন, 'নিতান্তই যদি বালিকাকে মাতৃক্রোড় পিতৃস্নেহে বঞ্চিত করিতে চাহেন, তবে একবার আমাকে দেখাইতে পারেন কি না, ইহাতেও নিষ্ঠুরতা করিবেন?'

সূর্য্যনাথ বলিলেন, 'দেখাইব, দূর হইতে দেখিবেন, কথা বলিতে পারিবেন না।'

বিনায়ক বলিলেন, 'তাহাই স্বীকার করিলাম। কখন দেখাইবেন?'

সূর্য্যনাথ বলিলেন, 'অপরাহ্ণ সময়ে।'

শৃঙ্গধর বলিলেন 'আমিও তবে আজ থাকিয়া যাই?'

সূর্য্যনাথ বলিলেন, 'যদ্রুচি আপনি মুক্ত।'

বিনায়ক ও শৃঙ্গধর বিদায় হইলেন। সম্ভ্রমার্থ সূর্য্যনাথ কিছু দূর সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাঙ্গালায় বাণিজ্য।

বহির্বাণিজ্য।

কোম্পানীর ভৃত্যগণের বাণিজ্যে বঙ্গদেশের কিরূপ সর্ব্বনাশ হইয়াছে, পূর্ব্বপ্রবন্ধে শুদ্ধ তাহাই উল্লেখ করা গিয়াছে। কিন্তু কোম্পানীর নিজের বাণিজ্য দ্বারা বঙ্গবাসীগণের কিরূপ অনিষ্ট হইয়াছে ; এপর্য্যন্ত তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। কোম্পানী যে পর্য্যন্ত বণিকের ন্যায় বাণিজ্য করিয়াছে, সে পর্য্যন্ত তদ্দ্বারা কোন অনিষ্ট হয় নাই। কোম্পানী অতি পূর্ব্ব হইতেই কতকগুলি জিনিসের উপর শুল্ক হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল ; কিন্তু তাহাতে ফরাশী, ওলন্দাজ প্রভৃতি বণিকগণেরই ক্ষতি হইয়াছিল। বঙ্গীয় বণিকগণের কোন ক্ষতি হয় নাই। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন কোম্পানী বঙ্গের দেওয়ানী প্রাপ্ত হয়, তখন হইতেই কোম্পানীর বাণিজ্যদ্বারা বঙ্গের অনিষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। ইতঃপূর্ব্বে কোম্পানী এদেশ হইতে যে সকল জিনিস রপ্তানি করিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে হয় জিনিস না হয় নগদ মুদ্রা এদেশে আমদানি করিয়াছে। সুতরাং বঙ্গ হইতে যেমন অর্থ বিদেশে গিয়াছে, বিদেশ হইতেও তেমন অর্থ বঙ্গে আসিয়াছে। কিন্তু ১৭৬৫ সনে ইংরেজগণ দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলে বঙ্গের রাজস্ব তাহাদের হস্তগত হয়। এই রাজস্ব প্রাপ্ত হইয়া কোম্পানী ইংলণ্ড হইতে মুদ্রা ও পণ্য আমদানি করা ক্ষান্ত করে। এইক্ষণ হইতে ঐ রাজস্বের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ পণ্য ক্রয় করিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইবার জন্য মজুত রাখা আরম্ভ হইল। ইহাকে তাহারা investment বলিত। আমরা ইহাকে বাণিজ্যের তহবিল বলিব। কোম্পানী এইক্ষণ রাজা ও বণিক এই উভয় পদ গ্রহণ করিল। রাজা যদি রাজার নিয়মে কার্য্য করে, এবং বণিক যদি বণিকের নিয়মে কার্য্য করে, তাহা হইলে কোন অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু রাজা যদি বণিকের নিয়মে কার্য্য করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে প্রজার আর মঙ্গলের উপায় থাকে না। কোম্পানীও তাহাই আরম্ভ করিল। কোম্পানী রাজস্ব হইতে কিছু কিছু উদ্বর্ত্ত করিয়া বাণিজ্যের তহবিলে মজুত করিতে লাগিল এবং সেই তহবিল দ্বারা পণ্য ক্রয় করিয়া জাহাজ ভরিয়া বিলাতে পাঠাইতে লাগিল।

সুতরাং পূর্ব্বে যেমন এদেশের পণ্যের পরিবর্ত্তে বিদেশ হইতে পণ্য অথবা মুদ্রা আনীত হইত, এক্ষণে আর সেই পণ্যের পরিবর্ত্তে কিছুই আনীত হইল না। এদেশ হইতে কোম্পানী জাহাজ ভরিয়া বৎসর

বৎসর পণ্য লইয়া যাইত, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে এদেশে এক কপর্দ্দকও ফিরিয়া আসিত না। বঙ্গদেশ হইতে অর্থশোষণের ইহাই আরম্ভ।

কোম্পানীর বাণিজ্যের তহবিল পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত প্রজাগণের উপর অশেষবিধ অত্যাচার হইতে আরম্ভ হইল। কোম্পানী যে মূলধন লইয়া এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল, যুদ্ধে যুদ্ধে সে মূলধন এক প্রকার প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল, তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের ভারতবর্ষে কতকগুলি ভূসম্পত্তি মাত্র রহিল। এই ভূসম্পত্তির রাজস্ব হইতে ডিরেক্টরগণের অংশীদারদিগকে মুনাফা দিতে হইত। বাণিজ্যের তহবিল হইতে যে পণ্য ক্রীত হইয়া বিলাত প্রেরিত হইত, ডিরেক্টরগণ সেই পণ্য বিক্রয় করিয়া তল্লব্ধ অর্থ অংশীদারগণকে মুনাফা স্বরূপ বণ্টন করিয়া দিত। সুতরাং ঐ তহবিল যতই বর্দ্ধিত হইবে, অংশীদারগণ ততই অধিক মুনাফা পাইতে পারিবে, ডিরেক্টরগণ ইহা অনুভব করিয়া বঙ্গের গবর্ণরের নিকট বাণিজ্যের তহবিল বর্দ্ধিত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চিঠি লিখিতে লাগিলেন। গবর্ণর এখানে দেখিতে পাইলেন যে শাসন কার্য্যের ব্যয় দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াতে বাণিজ্যের তহবিল দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। আবার কোম্পানী বেশী মাল কাটিতেছে বলিয়া ঐ সকল মালের দরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোম্পানী পূর্ব্বে যে দরে জিনিস খরিদ করিয়াছে দিন দিনই তাহা হইতে বেশী দরে খরিদ করিতে হইতেছে; সুতরাং ঐ সকল মাল বিক্রয় করিয়া ডিরেক্টরগণ পূর্ব্বে যে মুনাফা করিতেন, এক্ষণে ক্রমেই সেই মুনাফা কমিয়া যাইতেছে। অংশীদারগণকে বেশী মুনাফা দেওয়া দূরে থাকুক, পূর্ব্ব মুনাফাও দেওয়া যাইতেছে না। ডিরেক্টরগণ ইহাতে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া গবর্ণরকে স্পষ্ট আদেশ করিলেন "যে কোন উপায়ে পার, বাণিজ্যের তহবিল বৃদ্ধি কর, এবং বেশী মাল রপ্তানি কর।" গবর্ণরের ইতিপূর্ব্বে যে একটু ন্যায়পরতার মতি ছিল, এই আদেশ প্রাপ্তির পর তাহাও লোপ পাইল। কোম্পানী দেশের রাজা, তহবিল বৃদ্ধি করিতে তাহাদের কষ্ট হইবে কেন? কোম্পানী অনেক জিনিস আপনার একচেটিয়া করিয়া লইল; এবং এই একচেটিয়া ব্যবসায়ের মুনাফা দ্বারা তহবিল বৃদ্ধি করা হইল। ঐ একচেটিয়া জিনিসের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান লবণ এবং অহিফেণ, কোম্পানীর উত্তরাধিকারী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আজিও উহাদের একচেটিয়া ব্যবসায় করিতেছেন। যেসকল জিনিস কোম্পানী একচেটিয়া করিল, দেশীয় বণিকগণ তাহার ব্যবসায়ে বঞ্চিত হইল। কোম্পানী আপন ভৃত্য দ্বারা ঐ সকল জিনিস জন্মাইত, এবং আপন ইচ্ছানুযায়ি মূল্যে দেশীয়দিগের নিকট বিক্রয় করিত, অথবা অন্যান্য দেশে রপ্তানী করিত, এবং তদুৎপন্ন মুনাফা দ্বারা বাণিজ্যের তহবিল পূরণ করা হইত। যে সব জিনিস কোম্পানী ইংলণ্ডে রপ্তানি করিত, সেই সকল জিনিসে

ফরাশী ওলন্দাজ প্রভৃতিও বাণিজ্য করিত বলিয়া তাহা একচেটিয়া করিতে কোম্পানি সাহস পাইল না, কেননা তাহা হইলে ফরাশী ওলন্দাজ প্রভৃতি জাতি সকলেই তাহাদের প্রতিকূলাচারী হইবে। কিন্তু ঐ সকল জিনিস কোম্পানী একচেটিয়া না করিলেও এইরূপ উপায় অবলম্বন করিল, যাহাতে অন্য কোন জাতি উহা ক্রয় করিতে পাইত না। অন্যান্য জাতি সমূহ স্বদেশ হইতে অর্থ আনিয়া এদেশের পণ্য ক্রয় করিত। সুতরাং যে মূল্যে ক্রয় করিলে মুনাফা দাঁড়াইবে, তাহার অতিরিক্ত মূল্য দিয়া তাহারা কোন জিনিস ক্রয় করিত না। কিন্তু কোম্পানী স্বদেশ হইতে অর্থ আনিত না, এদেশের অর্থ দিয়াই এদেশের পণ্য ক্রয় করিত ; সুতরাং ১ টাকার জিনিস ৫ টাকায় কিনিলেও তাহাদের বিশেষ কিছু ব্যাপিত না। ফরাশী বণিক যে জিনিস ফ্রান্সে ১০ টাকা বিক্রয় করিতে না পারিবে, সে জিনিস কখনও এদেশে ৯ টাকার অধিক দিয়া ক্রয় করিতে তাহার সাহস হইত না। কিন্তু ইংরেজ যে জিনিস ইংলণ্ডে ১০ টাকায় বিক্রয় করিতে পারিবে তাহা সে এখানে ১২ টাকা দিয়া খরিদ করিতেও ফিরিত না ; কারণ ঐ ১২ টাকা কোম্পানী আপন ঘর হইতে দেয় নাই, উহা এদেশের টাকা, এবং উহার যে অংশ ডিরেক্টরগণ পাইতে পারে, তাহাই তাহাদের লাভ। অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে এমত অবস্থায় কোম্পানী জিনিস ক্রয় দ্বারা লোকসান না দিয়া নগদ কেন ঐ টাকা ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিত না? দিত না, তাহার কারণ এই যে, তাহা হইলে বঙ্গের নগদ মুদ্রার তহবিল একেবারে শূন্য হইয়া যাইত এবং সুতরাংই প্রজাগণের নিকট আর রাজস্ব আদায় করিতে পারিবে না।

কিন্তু এত করিয়াও কোম্পানীর বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইল না। শাসন-কার্য্যের ব্যয় ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল, রাজস্ব যাহা আদায় হইত তাহা প্রায় সকলই ঐ কার্য্যে ব্যয় হইত। এক বৎসর, কোম্পানীর শূন্য জাহাজ ইংলণ্ডে পৌঁছিল। গবর্ণর ডিরেক্টরগণের নিকট জানাইল যে রাজস্ব কিম্বা একচেটিয়ার মুনাফা হইতে বাণিজ্যের তহবিল বৃদ্ধি করা এক্ষণে সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতঃপর ডিরেক্টরগণের অনুমতি লইয়া গবর্ণর এই নিয়ম করিলেন যে কোম্পানীর ভৃত্যগণ যে কেহ স্বদেশে অর্থ পাঠাইতে চায়,সে কোম্পানির ট্রেজারিতে সেই টাকা দাখিল করিলে গবর্ণর তাহাকে একখানা হুণ্ডি দিবেন ; সেই হুণ্ডি বিলাতে ডিরেক্টর গণের নিকট উপস্থিত করিলেই হুণ্ডিবাহক টাকা প্রাপ্ত হইবেন। এই উপায়ে কোম্পানি ভৃত্যগণের অর্থদ্বারা তহবিল পূর্ণ করিতে লাগিল। এবং সেই তহবিল দ্বারা পণ্য ক্রয় করিয়া স্বদেশে পাঠাইতে আরম্ভ করিল। ডিরেক্টরগণ ঐ পণ্য বিক্রয় করিয়া ভৃত্যগণের হুণ্ডির টাকা পরিশোধ করিতেন এবং যদি কিছু বাকী থাকিত, তবে তাহাই তাঁহারা মুনাফা স্বরূপ অংশীদারদিগকে বণ্টন করিয়া দিতেন, এই উপায় অবল-

স্থলে ডিরেক্টরগণ অধিকতর বিপদে পড়িলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কোম্পানি যে দরে এখানে ক্রয় করিত, সেই দরে ইংলণ্ডে বিক্রয় করিতে পারিত না। কিন্তু তখন কোম্পানী যে মূলধন দ্বারা ক্রয় করিত, তাহা কাহাকেও পরিশোধ করিতে হইত না। এইক্ষণে কোম্পানী ভৃত্যগণের মূলধন দ্বারা জিনিস ক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং সেই মূলধন ইংলণ্ডে তাহাদিগকে পরিশোধ করিতে হইতেছে, অথচ উক্ত জিনিস বিক্রয় করিয়া সে মূলধনও উঠিতেছে না। সুতরাং লাভ হওয়া দূরে থাকুক, কোম্পানীকে এবার হুণ্ডি পরিশোধ করিতে নিজ তহবিল হইতে দণ্ড দিতে হইতেছে। এইরূপ দণ্ড কিয়ৎকাল ভোগ করিয়া অবশেষে ডিরেক্টরগণ আদেশ করিল যে ভৃত্যগণ আর কোম্পানির ট্রেজরিতে ইংলণ্ডে পাঠাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক টাকা জমা করিতে পারিবে না। কিন্তু যেই ইংরেজ কোম্পানী আপনার ট্রেজরী বন্ধ করিল, অমনি ফরাসী ওলন্দাজ প্রভৃতি বণিকগণ তাহাদের ট্রেজরী খুলিয়া দিল। এই সকল বণিক পূর্ব্বে স্বদেশ হইতে অর্থ আনিয়া এদেশের পণ্য ক্রয় করিত। এক্ষণ হইতে তাহারা বিনা সুদে ইংরেজ কোম্পানীর ভৃত্যগণের টাকা পাইয়া তদ্দারা বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিল। এই হেতু পূর্ব্বে যে ফরাসী ওলন্দাজ বণিকগণ কিছু কিছু করিয়া টাকা আনিত, এক্ষণে তাহাও রহিত হইল। এক্ষণে ইউরোপীয় সমস্ত বণিকগণই একত্র হইয়া শোষণ করিতে আরম্ভ করিল। কেহই এক কপর্দ্দক মূল্যের জিনিস এদেশে ফিরাইয়া আনিল না। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবহারে ইউরোপীয় অন্যান্য বণিকগণও আমাদের শোষণকারী হইয়া উঠিল।

এদিকে ডিরেক্টরগণ স্বীয় ভৃত্যদিগের বিরুদ্ধে ট্রেজরি বন্ধ করিয়া গবর্ণরকে আদেশ করিলেন যে বাণিজ্যের তহবিল পূরণ করিবার জন্য এক্ষণ হইতে গবর্ণর নিজনামে ভারতবর্ষে টাকা কর্জ্জ করিবেন; এবং রাজস্ব হইতে তাহার সুদ ও মূলধন যখন যাহা পারেন পরিশোধ করিবেন। ইহাতে ডিরেক্টরগণ হুণ্ডি পরিশোধ করার দায় হইতে সংপ্রতি মুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু কোম্পানী ক্রমে ক্রমে ভয়ানক ঋণগ্রস্ত হইতে আরম্ভ করিল।

ডিরেক্টরগণ রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার জন্য গবর্ণরকে যতই তাড়া দিতে লাগিল, গবর্ণর ততই প্রজাদিগের উপর দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিল। বাঙ্গলায় এযাবত রেশম ও কাপড়ের সজীব ব্যবসায় চলিতেছিল, কোম্পানীর দৌরাত্ম্যে এই উভয় ব্যবসায় লুপ্ত হয়। ঢাকার সুবিখ্যাত বস্ত্রব্যবসায়ও কোম্পানীর অত্যাচারে একপ্রকার বন্ধ হইয়া যায়। বিলাতে কাচা রেশমের অত্যন্ত কাট্‌তি হওয়াতে এখানে রেশমী বস্ত্রব্যবসায় কোম্পানী বলপূর্ব্বক উঠাইয়া দেয়। যাহারা রেশমী বস্ত্র তৈয়ার করিত, কোম্পানী তাহাদিগকে

—কাচা রেশম প্রস্তুত করিবার জন্য নিযুক্ত রাখে। পূর্ব্বে তাহাদিগকে ঘরে বসিয়াই কার্য্য করিতে দেওয়া হইত, কিন্তু ঘরে বসিয়া কার্য্য করিলে পাছে তাহারা রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া সময় নষ্ট করে, এই জন্য তাহাদিগকে কোম্পানীর কুঠিতে লইয়া যাওয়া হইত, এবং তথায় পাহারাওয়ালার অধীনে কয়েদ অবস্থায় থাকিয়া তাহাদিগকে কার্য্য করিতে হইত। অথচ এই কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে বেতন দেওয়া হইত না। তৈয়ারী রেশমের উপর ইচ্ছানুযায়ি একটা দাম ধরিয়া দেওয়া হইত। ঘরে বসিয়া তৈয়ার করিলে হয়ত পরিবারস্থ লোকের সাহায্যে সে ব্যক্তি পাঁচ গুণ রেশম তৈয়ার করিতে পারিত, এবং সুতরাং তাহার পাঁচ গুণ আয় হইত। কিন্তু কোম্পানী বাধ্য করিয়া পরিবারস্থ সকলকে অলস রাখিল, এবং তাহার একার দ্বারা কার্য্য করাইয়া সেই একার পরিশ্রমানুযায়ি কিম্বা তাহারও ন্যূন একটা দাম ধরিয়া দিল। কোম্পানীর এই ব্যবহারে শুধু যে রেশমী বস্ত্র ব্যবসায় লুপ্ত হইল তাহা নহে, উহার ব্যবসায়ীগণ দুরবস্থার শেষ সীমায় পতিত হইল। কাহাকেও না খাওয়াইয়া বলপূর্ব্বক অধিক দিন কায করান যায় না। রেশম প্রস্তুতকারীগণ ক্রমেই কম কায দিতে লাগিল; এবং কোম্পানীর লাভও ক্রমেই কমিতে লাগিল। অবশেষে কএক বৎসরের পর যখন কোম্পানী আপনার ভ্রম দেখিতে পাইল তখন এই ব্যবসায় পরিত্যাগ করিল। ঢাকার বস্ত্র ব্যবাসায়ীগণও অশেষ অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিল। ঢাকার কুঠিয়াল প্রত্যেক তন্তুবায়কে বৎসরের প্রথম দাদন দিয়া রাখে; বাজারে যে দরে বস্ত্র বিকায় তাহার অনেক ন্যূন দরে তন্তুবায়ের সহিত চুক্তি হয়। তন্তুবায় যে বস্ত্র প্রস্তুত করে, কোম্পানীর গোমস্তা আসিয়া অমনি তাহার উপর মার্কা মারিয়া যায়। যে পর্য্যন্ত দাদনের পরিমাণ কাপর কোম্পানীকে বুঝাইয়া দেওয়া না হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত উহার এক গজও অন্য কাহারও নিকট বিক্রয় করিবার সাধ্য নাই। অবশেষে বৎসরের পর হিসাব হয়। তন্তুবায় লেখা পড়া জানে না, সরকার তাহাকে যত দাদন দিয়াছে, কোম্পানীর হিসাবে তাহার অনেক বেশী লেখা রহিয়াছে; সে যত বস্ত্র দ্বারা যত টাকা পরিশোধ করিয়াছে, হিসাবে তাহার অনেক ন্যূন লেখা রহিয়াছে। সুতরাং বৎসর শেষে তাহার নামে কোম্পানীর হিসাবে প্রকাণ্ড এক বাকী দায়ধরা দৃষ্ট হয়। উপায়হীন তন্তুবায়ের বাক্য ব্যয় করিবার যো নাই। সে বৎসর ভরিয়া দাদনের টাকা পরিশোধ করে নাই, এই অপরাধে তাহাকে কয়েদ করা হয়, এবং যে পর্য্যন্ত সে ধারকর্জ্জ করিয়া ঐ টাকা পরিশোধ করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে প্রহার করিয়া, কুন্দা দিয়া, এবং আরও বিবিধ প্রকারে যন্ত্রণা দেওয়া হয়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময়ে বারোয়েল সাহেব ঢাকার কুঠিয়াল ছিলেন। তাঁহার, অত্যাচার ও পীড়নে ঢাকার বিস্তৃত বস্ত্র ব্যবসায় একবারে বন্ধ

হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এক সময়ে এই অত্যাচার এত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, যে নবাবপুরের সমস্ত তন্তুবায় এক যোট হইয়া বারোয়েল সাহেবের বিরুদ্ধে নালীশ করিবার জন্য কলিকাতা গেল। বারায়েল ইতি পূর্ব্বেই কলিকাতা পহুঁছিয়াছিলেন, তিনি লোক দ্বারা তন্তুবায়দিগকে ডাকাইয়া আপন কুঠিতে আনিলেন, এবং সেই খানে কএকদিন কএদ রাখিয়া সিপাহী সঙ্গে তাহাদিগকে ঢাকায় পাঠাইয়া দিলেন। বারোয়েলের পরে যখন হার্ষ্ট সাহেব ঢাকার কুঠিয়াল হইলেন, তখন আবার উক্ত তন্তুবায়গণ একদল হইয়া কলিকাতা গেল। কিন্তু সেখানে যাইয়া শুনিল যে গবর্ণরের সঙ্গে বারোয়েলের মহা বন্ধুতা হইয়া গিয়াছে। তথাপি তাহারা গবর্ণরের নিকট নালিশ করিল। তখন মফঃস্বলের ইংরেজের বিচার কলিকাতায় হইতে পারিত না, ইংলণ্ডে হইত। সুতরাং গবর্ণর ঐ আবেদন এবং সাক্ষীদিগের জবানবন্দী যথাসময়ে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু ইংলণ্ড হইতে তাহার আর কোন উত্তর আসিল না।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্তর্বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যে বঙ্গের বাণিজ্যশ্রী এই প্রকার বিনষ্ট হইয়া যায়। মুসলমান রাজত্ব সময়ে যে দেশ অৰ্দ্ধ পৃথিবীর পণ্য যোগাইয়াছে এবং যে দেশ হইতে অসংখ্য বাণিজ্যপোত অর্ণববক্ষে ভাসমান হইয়াছে, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাদুর্ভাব সময়ে সে দেশে একটি কৃষক বা একটি ব্যবসায়ী পেটের অন্ন জুড়িতে পারে নাই। তখন কার অবস্থা এই যে নবাব ক্ষমতাশূন্য, জমীদার কোম্পানীর গোমস্তার ভয়ে সশঙ্কিত, শিল্পীর শিল্প বন্ধ, ব্যবসায়ীর ব্যবসায় বন্ধ, নীল ও অহিফেণের চাষে কৃষকের জীবিকা বন্ধ। মহারাজ্ঞীর শাসনাধীনে ইহার অনেক আপদ দূরীভূত হইয়াছে সত্য; এক্ষণে আর গোমস্তার ভয় নাই; শিল্পী শিল্প খুলিয়াছে; কৃষকও নির্ভয়ে হাল চাষ করিতেছে। কিন্তু বঙ্গের যে সুখসমৃদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা আর ফিরিবার নয়। ফিরিবে যে, তাহার ভরসা নাই।

শ্রীশাঃ—

৺ কৃষ্ণদাস পাল।

অনুকরণপ্রিয়তা দোষে আমাদের রীতি নীতি প্রকৃতি প্রবৃত্তি সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে যাহা ভাবিত, সে তাহা বলিত, আমাদের মনের ভাব মুখে প্রতিফলিত থাকিত। কিন্তু এখন আর সেকাল নাই, এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার দুর্ভেদ্য ও দুরবগাহ্য আবরণে সমস্ত সমাজ কুজ্ঝটিকাগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে। কে কাহার মিত্র, কে কাহার শত্রু, চিনিবার উপায় নাই। যিনি

বাহিরে তোমার পরম সুহৃৎ, তোমাকে দেখিলে যাঁহার মুখপদ্ম হাস্যবিকসিত হয়, হয়ত তিনিই অন্তরে তোমার পরম বৈরী। পূর্ব্বে যিনি এইরূপ ব্যবহার করিতেন, লোকে তাহাকে ঘৃণা ও অসম্মান করিত। কিন্তু এক্ষণে এইরূপ ব্যবহারও আমাদের সমাজে শিষ্টাচার সদাচার সম্মত বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইতেছে।

৮ কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যুতে দেশে বিদেশে বিলাপ ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। যেসকল মহাত্মারা কৃষ্ণদাসের জীবিতাবস্থায় তাঁহার বক্ষোদেশে এবং পৃষ্ঠভাগে বিষময় অস্ত্র প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, আজি সেই মহাত্মারাও গদ্য পদ্য রচনাদ্বারা স্বীয় স্বীয় মনোদুঃখ জগতে প্রচার করিতেছেন। যাঁহারা দুই মাস পূর্ব্বে কৃষ্ণদাসকে ভণ্ড স্বার্থপর দেশবৈরী বলিয়া জগতে ঘোষণা করিয়াছিলেন, আজি তাঁহারাই কৃষ্ণদাসকে সত্যবাদী, নির্ভীক, দেশহিতৈষী বলিয়া প্রশংসাপত্র প্রদান করিতেছেন। পূর্ব্বে এই রূপ কাণ্ড হইলে লোকে পূর্ব্বোক্ত বিষকুম্ভ -পয়োমুখ মহাশয়দিগকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিত। লোকে বলিত গোবধ করিয়া ব্রাহ্মণকে পাদুকা দান করায় লাভ কি? লোকে বলিত গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেওয়ার প্রয়োজন কি? কিন্তু এখন যদি আপনি কাহাকেও এই বিসদৃশ ব্যাপারের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তিনি তখনই আপনাকে উত্তর দিবেন—'ইহাইত সভ্যতার নিয়ম। জীবিতাবস্থায় যত ইচ্ছা পরস্পর পরস্পরকে গালিগালাজ দিতে পার। কিন্তু মৃত্যুর পর সকলেই সকলের বন্ধু। গ্ল্যাডষ্টোন ডিজরেলির পরম শত্রু। উভয়ের জীবিতাবস্থায় উভয়ে উভয়কে নানারূপ সুশ্রাব্য অশ্রাব্য গালাগালি দিয়াছিলেন। কিন্তু ডিজরেলীর মৃত্যুর পর গ্ল্যাডষ্টোনও তাঁহার অনেক সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। ফলতঃ এইরূপ ব্যবহার ভিন্ন অন্য ব্যবহার সভ্য দেশে অসম্ভব। যদি বিলাতের এই নজীর দেখিয়াও আপনি পূর্ব্বোক্ত ব্যবহারের সাধুতা সম্বন্ধে সন্দিহান থাকেন তাহা হইলে আপনি অর্ব্বাচীন অসভ্য পৌত্তলিক মাত্র। বিলাত না গেলে এই অসভ্য সূর্য্যশোভিত আকাশের নিম্নে, ও এই অসভ্য ভূমির উপর আপনার অসভ্য অজ্ঞতা তিরোহিত হইবে না।

সে যাহা হউক যাঁহারা আজি কৃষ্ণদাসের জন্য শোক করিতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যাঁহারা কৃষ্ণদাসের মৃত্যু উপলক্ষ্য করিয়া নিজ নিজ রচনাচাতুর্য্য প্রকটন করিতেছেন, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের সম্মুখে তৈলভাণ্ড বা সম্মার্জ্জনী থাকিলেও ইহারা তৎসম্বন্ধে গদ্যপদ্যশোভিত সন্দর্ভমালা রচনা করিতে পারেন। ইহাঁরা বহুকাল ধরিয়া যে সমস্ত ললিত পদাবলীর সংগ্রহ করিয়াছিলেন, অদ্য তাহার সদ্ব্যবহার হইতেছে। ইহাঁরা সেক্সপীয়ার মিলটান প্রভৃতি পুষ্পোদ্যান

হইতে যে সমস্ত পুষ্পকলিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, অদ্য সেই গুলির বিচিত্র সংযোজন করিয়া ইহাঁরা মৃত কৃষ্ণদাসের গলদেশে অর্পণ করিতেছেন। যদি কৃষ্ণদাসের মৃত্যু না হইয়া নবজীবনের "কুঁজো মহাশয়ের" মৃত্যু হইত, তাহা হইলেও ইহারা বিচিত্র মাল্যরচনা করিয়া কুঁজো মহাশয়ের কুব্জদেশকে অলঙ্কৃত করিতেন। ইহাঁদিগকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া দ্বিতীয়শ্রেণীর বিলাপীদের কথা বলা যাউক। ইহাঁরা শিষ্টাচারপরায়ণ। ইহাঁরা ভাবেন, 'লোকটাত মরিয়াই গিয়াছে। এখন দুটা মিষ্ট কথা না বলিলে শিষ্টাচার রক্ষা পায় কিরূপে। মনে মনে যাহাই থাকুক, যে এ সময়ে দুটা মিষ্ট কথা বলিতে না পারে সে অভদ্র। আরও দেখুন, লোকটা দোষেগুণে জড়িত ছিল। এখন দোষের ভাগ পরিত্যাগ করিয়া গুণের ভাগ গ্রহণ করাই উচিত।' ইহাঁদের সম্বন্ধে আমার উত্তর এই যে এখন আর শিষ্টাচার করায় লাভ কি? যে তোমাদের প্রশংসা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইত, যে তোমাদের নিন্দাশ্রবণে ব্যথিত হইত, সে এক্ষণে কোথায়? কাহার উপকারের জন্য মনোভাব গোপন করিয়া শিষ্টাচার অবলম্বন করিতেছ? মৃত ব্যক্তির সহিত শিষ্টাচার করাও যা, আর চিত্রফলক বিন্যস্তা রমণীর সহিত প্রণয়পাশে বদ্ধ হওয়াও তা। জীবিতের সহিত শিষ্টাচার করিলে না। যখন কৃষ্ণদাস জীবিত ছিল, তখন তাহার বিদ্যা বুদ্ধি বয়স যশঃ প্রভৃতি কিছুরই অপেক্ষা কর নাই। হয়ত, তোমাদেরই বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া কৃষ্ণদাস অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। তখন অশিষ্টাচার-পরায়ণ হইয়া দুর্ব্বাক্য বলিয়াছ। এখন শিষ্টাচার করিয়া 'সোণা ফেলে আঁচলে গেরো' দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তখন যদি সত্যের অনুরোধে কৃষ্ণদাসের নিন্দা করিয়া থাক, এখনও সত্যপালনরূপ নিজব্রত রক্ষা করিতে থাক। যে শিষ্টাচারের অনুরোধে সত্যের অপলাপ করে, সে শিষ্টাচার বা সত্য উভয়ের কাহারও মর্ম্ম অবধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

এক্ষণে তৃতীয় শ্রেণীর বিলাপীদের কথা বলা যাউক। ইহাঁরা বাস্তবিকই মর্ম্মাহত হইয়া নির্জ্জনে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। কৃষ্ণদাসের মৃত্যুতে ইহাঁদের যেন স্বজন বিয়োগ হইয়াছে। ইহাঁদের অধিকাংশেরই কৃষ্ণদাসের সহিত পরিচয় ছিল। ইহাঁদের মধ্যে একজন আমাকে লিখিয়াছেন 'কৃষ্ণদাসের মৃত্যু সম্বন্ধে তোমাকে কোন কথা লিখিব না। কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে কথা পাড়িলেই আমি অনেক কথা বলিয়া ফেলিব।' ইহার মর্ম্ম এই যে 'আমি কৃষ্ণদাসকে যে রূপ প্রশংসা করিব, হয়ত তুমি তাহার অনুমোদন করিবে না। যে কৃষ্ণদাসকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে না জানিত, সে কৃষ্ণদাসের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবে না। যে শুদ্ধ কৃষ্ণদাসের বক্তৃতা বা রচনা পাঠ করিয়াছে, সে কৃষ্ণদাসের চরিত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিবে না।' আমার আর একটি বন্ধু আমাকে লিখিয়াছেন—'কৃষ্ণদাসের মৃত্যুতে আমার মনে হইতেছে যেন আমার

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা পিতার বিয়োগ হইয়াছে। কৃষ্ণদাস জগন্মান্য হইয়াও আমার ন্যায় অক্ষম ব্যক্তির দুঃখে সুখে সর্ব্বান্তঃকরণে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। যাঁহারা সৌভাগ্য বলে কৃষ্ণদাসের সহিত পরিচিত ছিলেন তাঁহারা এইরূপ হৃদয় বিদারক কাতরোক্তি প্রয়োগ করিয়া মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। ইহাঁদের কাতরোক্তি হৃদয়প্রসূত সুতরাং সম্মানার্হ।'

যদিও প্রকৃত বিলাপীর সংখ্যা এত অল্প, তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, কৃষ্ণদাসের মৃত্যুতে সর্ব্বসাধারণের মনে এক ঘোর বিষাদের ছায়া পতিত হইয়াছে। অস্ফুট ও অপ্রকাশিত ভাবে সকলেই মনে করিতেছে যে দেশে এক মহা আপৎপাত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস দেশের কি অভাব পরিপূরণ করিতেন, দেশের কোন্ কোন্ মঙ্গল তাঁহাদ্বারা সংসাধিত হইত, সর্ব্বসাধারণে তাহার কোনরূপ মীমাংসা নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছে না। অথচ সকলেই ভাবিতেছে যে দেশে মহা অনিষ্টাপাত হইয়াছে। কৃষ্ণদাসের দ্বারা দেশের কি কি মঙ্গল সাধিত ও কি কি অভাব পরিপূরিত হইত, তাহা স্পষ্টতঃ নির্দ্দেশ্য করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কৃষ্ণদাসের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা কিছু শিক্ষা করিতে পারি কি না, তাহাও প্রসঙ্গতঃ বর্ণনা করা যাইবে।

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে (১৩ই আগষ্ট) ১৮৮৩) কৃষ্ণদাস নিজের বিশ্বাস, ধারণা ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন 'রাজা ও রাজপুরুষগণ আমাদের (দেশীয়দের) পক্ষেই আছেন। যাঁহা দ্বারা রাজা ও রাজপুরুষগণ আমাদের সহিত বিচ্ছিন্ন না হন, আমাদের সেই রূপেই কার্য্য করা উচিত। রাজা ও রাজপুরুষগণের দয়া ও সাধুতার উপরেই আমাদের আশা ভরসা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। যাহাতে রাজা ও রাজপুরুষগণ বিপদে বা ঝঞ্ঝাটে না পড়েন আমাদের সেইরূপেই কার্য্য করা উচিত। ধীরভাবে ও যুক্তিদ্বারা শাসনকর্ত্তাদিগকে সকল কথা বুঝাইতে হইবে। আমরা চিরকাল এইরূপেই কার্য্য করিয়াছি। আমাদের কার্য্যও নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই। তবে আর এখন হাঁক ডাক করিতে যাইব কেন?' তাহার পরে ২৭শে আগষ্ট তারিখে কৃষ্ণদাস পুনরায় লিখিতেছেন :—

' ইংরেজেরা বিলাতে ঘরেঘরে যেসমস্ত কলহ করেন, আমরা তাহাতে যোগ দিব কেন? তাঁহারা সকলেই আমাদের প্রভু। তাঁহাদের সকলেরই নিকট আমরা আমাদের মনোদুঃখ জানাইব। তাঁহারা যে কেহ আমাদিগকে যাহা কিছু দিবেন আমরা তাহাই লইব। * * * * ইহা মনে করা কখনই উচিত নহে, যে ইংরেজ ও দেশীয়দিগের মধ্যে (ইলবার্টবিল লইয়া) যে বিদ্বেষ চলিতেছে, সেই বিদ্বেষ চিরকালই থাকিবে। যদি তাহা থাকে, তাহা হইলেই নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের সমস্ত আশা ভরসা ফুরাইয়া যাইবে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে ইংরেজে ও দেশীয়ে চিরকাল

এভাব থাকিবে না।' * * * * আবার 'ইংরেজেরা এক্ষণে আমাদের পক্ষে আছেন। যদি আমরা রাজনৈতিক উন্নতির পথে অতিবেগে ধাবমান হই, তাহা হইলে হয়ত ইংরেজেরা আমাদিগকে আর সে পথে যাইতে দিবেন না। ইংরেজেরা আমাদিগকে সন্দেহ করেন না। আমরা কেন তাঁহাদের মনে সন্দেহ উত্থাপিত হইতে দিব? ইংরেজেরা আমাদের শত্রু নহেন, আমরা কেন সাধ করিয়া তাঁহাদিগকে আমাদের শত্রু করিব?'

আমরা এক্ষণে দেখিলাম কৃষ্ণদাস পালের বিশ্বাস ও ধারণা কিরূপ ছিল। ইংরাজ আমাদের বন্ধু। তাঁহার সহিত আমাদের বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিতে হইবে। হিন্দুদের মধ্যে শ্বাশুড়ী ও পুত্রবধূ যে ভাবে কার্য্য করেন, আমাদিগকেও ইংরেজের সহিত সেই ভাবে কার্য্য করিতে হইবে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে কখনও বা একটু কলহ হইবে, কখনও বা একটু মনান্তর হইবে, কখনও বা আমরা দুটা শক্ত কথা বলিব, আবার কখনও বা ইংরেজ আমাদিগকে দুটা শক্ত কথা বলিবে। যাহাদিগকে লইয়া ঘর করিতে হয়, তাহাদের সহিত এইরূপ হইয়াই থাকে। কিন্তু এইরূপ একটুকু আধটুকু বিবাদ বিসম্বাদ হইবে বলিয়া কি আমাদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ করিতে হইবে? যদি ইংরেজ আমাদের শত্রু হয়, তাহা হইলে ত সব কথাই ফুরাইয়া গেল। কারণ ইংরাজ যদি আমাদিগকে বড় করে, তবেই আমরা বড় হইব, আর ইংরাজ যদি আমাদিগকে ছোট করে, তাহা হইলে আমরা ছোটই থাকিব। মিউটিনীর পর হইতে ইংরেজ আমাদের প্রতি সদয় হইয়াছে; আমাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। এখনও ইংরাজ আমাদিগকে সন্দেহ করেনা, এখনও ইংরাজ আমাদিগকে শত্রুভাবে অবলোকন করে না। আমরা কেন বাগাড়ম্বর করিয়া তাহাদের মনে বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রজ্বলিত করিব। চতুরা পুত্রবধূর ন্যায় শ্বাশুড়ীর মন যোগাইয়া কার্য্য কর, কালে সকলই তোমার হইবে। আর তাহা না করিয়া যদি পাড়াকুঁদুলী হইয়া সর্ব্বদাই শ্বাশুড়ীকে জ্বালাতন কর, তাহা হইলে তোমার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়ই বিনষ্ট হইবে।

কৃষ্ণদাস পাল একবার সুরেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।—

"Our end and aim are the same, though our methods of procedure may be different."

অর্থাৎ—'তুমি যাহা আশা কর, আমিও তাহাই আশা করি, তবে তুমি যে প্রণালীতে তোমার আশা প্রাপ্তির চেষ্টা কর, আমি সে প্রণালীতে করি না। আমাদের উভয়ে এই মাত্র প্রভেদ।'

আমরা একরূপ মোটামোটি রকমে কৃষ্ণদাসের রাজনৈতিক বিশ্বাস ও ধারণার কথা বলিলাম। অগ্রে দেখাযাউক, এরূপ বিশ্বাস ও ধারণায় আমাদের কিছু লাভ হইত কি না।

১। যখন কোন এক কঠিন প্রশ্ন সমুত্থিত হইত, তখন কৃষ্ণদাস আমাদের পক্ষের সমস্ত কথাই বলিতেন, যেখানে ইংরেজের নিন্দা করার প্রয়োজন হইত, সেখানে নির্ভীক চিত্তে নিন্দাও করিতেন, অথচ কেহই তাহাতে ক্রুদ্ধ হইত না। যখন ইলবার্টবিলে ইংরেজে ও গবর্ণমেণ্টে সন্ধি হইল, তখন কৃষ্ণদাস ঐ সন্ধির নাম রাখিলেন 'কলঙ্কিত সন্ধি' 'Peace with dishonor। গবর্ণমেণ্ট এই সন্ধি করিয়া কিরূপ নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন, কৃষ্ণদাস তাহাও ধীরে ধীরে অতি সুন্দর রূপে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস বলিয়াছিলেন— 'আর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট এই বিষয় স্পর্শও করিতে পারিবেন না। বহু বৎসর ধরিয়া গবর্ণমেণ্ট আর কোনও প্রকার সংশোধনীর কার্য্যে হস্তক্ষেপও করিতে পারিবেন না। এই সন্ধিদ্বারা গবর্ণমেণ্ট দেশীয়দিগকে কি ভয়ানক কুশিক্ষা প্রদান করিলেন। কতকগুলি ভারতবাসী ইংরেজে গবর্ণমেণ্টকে অবিশ্রান্ত গালাগালি দিল, মহারাণীর প্রতিনিধি লর্ড রিপণকে বহুবিধরূপে অপমানিত করিল, রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহের ভয় দেখাইল, কিন্তু এত করিয়াও তাহারা তিরস্কৃত না হইয়াও পুরস্কৃত হইল। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর অপমান কি হইতে পারে।' পাঠক দেখুন কি কৌশল! যাহা বলিবার তাহা সমস্তই বলা হইল। গবর্ণমেণ্টের ভ্রম প্রদর্শন করা হইল। তীব্র ভাষারও প্রয়োগ করা হইল। অথচ কোন পক্ষকেই একবারে ক্ষেপাইয়া দেওয়া হইল না। যদি ইংরেজদিগকে লইয়া ঘর করিতে হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা সুকৌশল আর কি হইতে পারে। কাহারও মনে ক্রোধ, বিদ্বেষ প্রভৃতি কুরিপুর উদ্দীপন হইল না। অথচ যাহা বক্তব্য, তাহা ষোল আনাই বলা হইল। যাহাদের কিছু বয়স হইয়াছে, যাহারা ভ্রাতা, ভগিনী, ভ্রাতৃবধূ, মাতা পিতা লইয়া ঘর করেন, তাঁহারাই এই কৌশলের মর্ম্ম ও প্রয়োজন কতকদূর বুঝিতে পারিবেন। যদি ভ্রাতা দায়ভাগ খুলিয়া স্বত্বসাব্যস্তের চেষ্টা করেন, যদি ভগিনী কাউয়েল প্রণীত হিন্দু ল লইয়া কলহ করিতে আরম্ভ করেন, আর যদি স্ত্রী আইন অনুসারে স্ত্রীধনের ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে সংসার কয়দিন টিকিতে পারে? কিন্তু যদি সকলেই ন্যায়পথে চলিতে চেষ্টা করেন, যদি সকলেই সর্ব্ব সময়ে নিজের নিজের কথা চাপিয়া রাখিয়া শুদ্ধ ন্যায়পথের অন্বেষণ করেন, তবেই সংসার কতকদিন একভাবে চলিতে পারে। কৃষ্ণদাস এইরূপে একান্ত চিত্তে ন্যায় ও সত্যের পূজা করিয়া কয়েক দিন সংসার একত্রও রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস অভাবে বা এসংসার ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। সুতরাং কৃষ্ণদাসের কৌশলদ্বারা এই এক লাভ হইয়াছিল যে ইংরাজ ও দেশীয় লইয়া যে সংসার গঠিত হইয়াছিল, সে সংসার একরূপে চলিতেছিল। এসংসার যে খুব সুখের সংসার তাহা বলিতেছি না। এ সংসারে যে মনস্তাপ, অবিচার, অন্যায়

নাই তাহা বলিতেছি না। কিন্তু যখন এ-সংসার ভাঙ্গিবে তখন যে কি হইবে তাহা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? কৃষ্ণদাস বলিতেন সংসার ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিওনা, সংসার ভাঙ্গিলে আর গড়িতে পারিবেনা। সংসারে থাকিয়াই মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিয়া সংসারের উন্নতি কল্পে যত্নবান হও। আমরা এই প্রণালীতে কার্য্য করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে সফলতা লাভ করিয়াছি। তোমরাও এই প্রণালীতে কার্য্য কর। আরও অধিকতররূপে সফলতা লাভ করিবে। রৌদ্রে দগ্ধ হইতেছ বলিয়া সমুদ্রে ঝাঁফ দিও না। রৌদ্র নিবারণের জন্য ছত্রের আয়োজন কর।

আমরা যাহা দেখাইলাম তাহাদ্বারা বুঝা যাইবে যে কৃষ্ণদাস সুদক্ষ মধ্যস্থের ন্যায় কার্য্য করিতেন। যখন বাঙ্গালী উদ্দাম ও উশৃঙ্খল হইত তখন কৃষ্ণদাস তাহাকে কথনও বা মিষ্ট কথায় কখনও বা কটু-বাক্যে বলিতেন—"ধীরে ধীরে চল। হাঁক ডাকের প্রয়োজন কি? সন্দেহ বা বিদ্বেষ বুদ্ধির উদ্দীপন করায় লাভ কি? যাহা বলিবার আছে তাহা ধীরে ধীরে যুক্তিপ্রদর্শন করিয়া বল। হাঁক ডাকের অপেক্ষা তাহাতে বেশী কাজ হইবে"। আবার যখন ইংরাজ উদ্দাম ও উশৃঙ্খল হইতেন, তখন কৃষ্ণদাস তাঁহাকেও কথনও বা কটু কথনও বা মিষ্ট উপদেশ দিতেন। যখন ব্রানসন দুর্ব্বাক্য হলাহল দ্বারা সমস্ত বাঙ্গালাকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিল, তখন কৃষ্ণদাস তাহাকে বলিয়াছিলেন—'ওহে বাপু! তোমাদের স্বত্বরক্ষার জন্য তোমরা সভা সমিতি বক্তৃতা প্রভৃতি সকলই কর। তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু এরূপ ইতরোচিত ভাষা প্রয়োগ কর কেন? যদি আমাদের বিবাদই করিতে হয়, তবে আইস আমরা বন্ধুর ন্যায় ও ভদ্রলোকের ন্যায় বিবাদ করি। If we must quarrel, why can we not quarrel as friends and gentlemen. যখন বিষকুম্ভ ব্রিট্যানিকস প্রতি দিন নিজ হৃদয়-পাতাল হইতে দুর্গন্ধময় হলাহল উদ্গীর্ণ করিয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণদাস তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—'নির্ব্বোধ! বুঝিতেছ না যে তোমরা এইরূপ লেখাদ্বারা আপনার পায়ে আপনি কুড়াল মারিতেছ। বুঝিতেছ না, যে এইরূপ লেখাদ্বারা তোমরা নির্ম্মল আকাশ হইতে বজ্রাঘাতের আহ্বান করিতেছ। 'You are calling forth thunder from a clear sky.' কৃষ্ণদাস আর এক সময়ে বলিয়াছিলেন—'শাসনকর্ত্তা ও অনুশাসিত এ উভয়ের মধ্যে সদ্ভাবই রাজ্যস্থ সুশৃঙ্খলার নিদানীভূত কারণ। The good feeling between the rulers and the ruled is the corner-stone of good government in every country.'

কেহ হয়ত বলিবেন, যে জেতা ও বিজিত এ উভয়ের মধ্যে এরূপ সদ্ভাব অসম্ভব। সর্পে ও ভেকে যদি সদ্ভাব সম্ভব হয়, ব্যাঘ্রে ও মেষ-শাবকে যদি সদ্ভাব সম্ভব হয়, তাহা হইলে জেতা ও বিজিতে

সদ্ভাব সম্ভবপর হইবে। যখন বিজিতেরা সকলেই দাস বলিয়া গৃহীত হইতেন, যখন বিজিতের স্ত্রী কন্যা জেতার অন্তঃপুরে আনীত হইতেন, যখন বিজিতের স্কন্ধে পা দিয়া জেতা শকটারোহণ করিতেন, যখন বিজিতেরা জেতাদের জয়যাত্রা অলঙ্কৃত করিতেন তখন জেতা ও বিজিতে সদ্ভাবের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এক্ষণে সুশিক্ষা প্রভাবে জেতারা বুদ্ধিমান হইয়াছেন, এক্ষণে জেতারা বুঝিয়াছেন যে বলদ্বারা মনুষ্য বশীভূত হয় না। এক্ষণে জেতারা বুঝিয়াছেন যে দয়া দাক্ষিণ্য না হইলে মনুষ্য বশীভূত হয় না। যতই সুশিক্ষা ও সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে, ততই লোকে একথা আরও সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিবে। যাহাতে শত্রুতার বৃদ্ধি না হইয়া মিত্রতার বৃদ্ধি হয় বুদ্ধিমান লোকে সেই চেষ্টা করিবেন। মেকলে হইতে হণ্টার পর্য্যন্ত সকল বুদ্ধিমান ইংরাজেই জেতা ও বিজিত এ উভয়ের মধ্যে প্রীতি ও সাম্য সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দু একজন পচা সম্পাদকের উপর রাগ করিয়া ইহাদের সকলকে দুরভিসন্ধি ও কৌশলের অবতার মনে করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য? ইয়াগোর কথার উপর বিশ্বাস করিয়া ডেসডিমোনাকে অবিশ্বাস করা কি চতুরের কার্য্য? ফসেটও ইলবার্ট, লরেন্স ও ক্যানিং, রিপন ও বেয়ারিং, গ্লাডষ্টোন ও হার্টিংটন, এমন কি মহারাণী স্বয়ং যাহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন ও বলিতেছেন তাহার উপর অবিশ্বাস করিয়া এঁড্রুস, পেঁড্রুস্‌, প্রভৃতি কয়েকজন নামকাটা বা নামজাদা সিপাহীর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা কি বাতুলের কার্য্য নহে? যদি বলেন যে ইহারা পুনঃ পুনঃ যাহা বলিয়াছেন তাহা আজিও কার্য্যে পরিণত হইল না কেন? তাহার উত্তর এই যে, সকল জাতিতেই সৎ ও অসৎ উভয় প্রকারের লোকই আছে। ইংরেজদের মধ্যে যাঁহারা সৎ তাঁহারা আমাদের ইষ্টাকাঙ্ক্ষা করেন। কারণ তাঁহারা জানেন যে, আমাদের ইষ্টেই তাঁহাদেরও ইষ্ট। আর যাঁহারা অসৎ তাঁহাদের বুদ্ধি বিবেচনা অল্প। যদি কখনও ইংরেজদের সর্ব্বনাশ হয়, তবে ঐ অসৎ ব্যক্তিদের দ্বারাই হইবে। সে যাহাহউক, এক্ষণে ইংরেজদের মধ্যে আমাদের ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধে এক্ষণে অসতের সংখ্যাই অধিক। এবং অসতের সংখ্যা অধিক বলিয়া সৎ ইংরেজদের সাধু উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। আমরা স্বীকার করি যে অসতের সংখ্যা চিরকালই সৎ অপেক্ষা অধিক থাকিবে এবং বহুদিন পর্য্যন্ত অসৎদের ইচ্ছাই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলবতী থাকিবে। কিন্তু এরূপ আশা করা অসঙ্গত নয় যে সুশিক্ষা সুনীতি ও সদ্ধর্ম্মপ্রভাবে নিত্য নিত্যই অসতের সংখ্যা কমিতে থাকিবে। এবং ভারতবর্ষ অল্পে অল্পে ক্রমশঃই উন্নতির পথে আরোহণ করিতে থাকিবে।

আবার ইহা ভিন্ন আরও অনেক আশা করা যাইতে পারে। আজি সম্পদের দিনে অসৎ ইংরেজ বিজিত ও অনুশাসিতদিগকে ঘৃণা করিতেছে। কিন্তু কাহারও সম্পদ চিরস্থায়ী নহে। যখন সম্পৎসূর্য্য স্থলে বি-

পদন্ধকার আসিবে, তখন অসৎ-ইংরাজও আমাদের সহিত সম্মিলিত হইবার ইচ্ছা ও প্রয়াস করিবে। যত দিন রোম মহাবল-পরাক্রান্ত ছিল, ততদিন রোম বিজিত জাতিদের উপর অত্যাচার করিত। কিন্তু যখন রোম বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া দুর্ব্বল ও হতশ্রী হইয়া আসিল, তখন রোম বিজিতদের সহিত একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সাধারণ শত্রুর সহিত বিবাদে বদ্ধপরিকর হইল। সেইরূপে যখন ইংলণ্ডের পরাক্রমের কথঞ্চিৎ হানি হইবে, তখন সৎ ইংরেজ ও অসৎ ইংরেজ উভয়েই দেশীয়দের সহিত একতা ও প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া আপনার ও দেশীয়দের উভয়ের অবস্থাই সমুন্নত করিবে। অন্ততঃ সেই সুদিনের আশা করিয়াও বর্ত্তমান অকুশল ও অশান্তির প্রতি উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য। সৎ আশায় যদি কুফল হয় তাহাও ভাল, কিন্তু কু আশা করিয়া সুফল পাওয়াও ভাল নহে। পৃথিবীতে বহুকাল ধরিয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে; বহুকাল ধরিয়া বিদ্বেষানল জ্বলিয়াছে। বহুকাল ধরিয়া মনুষ্য মনুষ্যকে আলিঙ্গন না করিয়া পদাঘাত করিয়াছে। প্রীতি দ্বারা পরস্পরের মঙ্গল সংসাধন না করিয়া অপ্রীতি দ্বারা পরস্পর পরস্পরের মানসিক নৈতিক ও সাংসারিক সর্ব্বনাশ করিয়াছে। যদি কৃষ্ণদাস অপ্রীতির মধ্যে প্রীতি, অকুশলের মধ্যে কুশল ও অশান্তির মধ্যে শান্তি আনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা হইলে আজি কে তাঁহার নিন্দা করিতে পারেন?

আজি কালি বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বনিতা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে সযত্নে পরিপোষণ করিতেছেন। ইহাঁরা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস, বর্ত্তমান অবস্থা প্রভৃতি কিছুরই পর্য্যালোচনা না করিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন যে বক্তৃতাদ্বারা বাঙ্গালা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ পরাধীনতা শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হইবে। এই সকল অপরিণামদর্শী সুকুমারমতি বালক বালিকাগণ কৃষ্ণদাস পালের জীবনী পাঠ করিয়া তৎপ্রতি বিশেষ ভক্তিমান হইবেন না। যেখানে পটহধ্বনি সহকারে আকাশে উল্লম্ফন, প্রোল্লম্ফন প্রভৃতি বাজীকরের বাজি বিশেষ দক্ষতার সহিত অভিনীত হইয়াছে, যেখানে গড়ের মাঠে বায়ু মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠদণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া দশ বিশ জন লোকে ঝোলা ঝুলি করিয়া সাহস ও কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে, ইহাঁরা সেই খানে গিয়া রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা শিক্ষা করিবেন। কৃষ্ণদাস কঠিন ভূমির উপর পায়ে হাটিতেন। কিন্তু পায়েত সকলেই হাঁটিয়া থাকে। যেখানে লোকে আকাশের মধ্যে মাথার উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, চল ভাই সেইখানে গিয়া করতালি দিতে দিতে রাজনীতি শিক্ষা করি।

কিন্তু তাই বলিয়াই যে কৃষ্ণদাস স্বাধীধীনতা ভাল বাসিতেন না, তাহাও নহে।

স্বাধীনতার দুইরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। একরূপ স্বাধীনতার অর্থ এই যে সম্মুখে জয়পতাকা উড়িতেছে, পশ্চাতে জগঝম্প বাজিতেছে, আর রাশি রাশি লোক হৈ হৈ রৈ রৈ রবে মহা কোলাহল সমুত্থান করিতেছে। এইরূপ স্বাধীনতা পাইয়া সকলে বলিবে 'ভাই বল বাঙ্গালীর জয়'। সকলে বলিবে 'বাঙ্গালী পৃথিবীর জাতি সমূহের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য।' আর তুরী ভেরী শঙ্খ ঘণ্টা সংযোগে সর্ব্বত্র নিনাদিত হইবে যে বাঙ্গালি জাতি হিমালয়ের শিখরদেশে অবস্থিত। এইরূপ আড়ম্বর পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত কৃষ্ণদাসের কিছুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। কিন্তু যে স্বাধীনতায় রাজ্য মধ্যে একরূপ আইন প্রচলিত হয়; যে স্বাধীনতায় রাজ্য মধ্যে ধন, শান্তি, সাংসারিক সুখ, মানসিক সুখের বিস্তার হয়, যে স্বাধীনতায় রাজ্যমধ্যে সুশিক্ষা ও সন্নীতি প্রবর্ত্তিত হয়, কৃষ্ণদাস সেই স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস করিতেন। শান্তিময়, মঙ্গলময় ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে সে প্রয়াস কতকদূর সফলও হইয়াছিল। কিন্তু আজি কালি বঙ্গ যে প্রকার স্বাধীনতার প্রয়াসী, সে স্বাধীনতা-সমুদ্র হইতে কৌস্তুভমণি কি হলাহল উত্থিত হইবে তাহা কে বলিতে পারে? দেববুদ্ধি কৃষ্ণদাস স্তবস্তুতির সাহায্যে অভীষ্ট বর লাভ করিয়াছিলেন। দানববুদ্ধি বঙ্গীয় পরিচালকগণ হিংসা, ক্রোধ, রক্তপিপাসা প্রভৃতি দানববৃত্তির উদ্দীপনা করিয়া কি ফল লাভ করিবেন, তাহা ত্রিকালজ্ঞ অন্তর্যামী ভগবান ভিন্ন কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। যে অগ্নিতে সর্পব্যাঘ্রময় খাণ্ডবদাহন হইয়া ছিল সেই অগ্নিতেই মহাপ্রলয় উপস্থিত হইতে পারে। এবং যে স্বাধীনতায় অত্যাচার নিবারণ হইতে পারে, সেই স্বাধীনতাতেই জাতিবিলোপ হওয়াও সম্ভব। যদি কৃষ্ণদাস এসমস্ত বিবেচনা করিয়া শান্তির পথ, মঙ্গলের পথ অবলম্বন করিয়া জাতীয় উন্নতির অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাহা হইলে কে আজি তাঁহাকে নিন্দা করিবে?

কিন্তু কেহ তাঁহার নিন্দা করুক বা না করুক, ইহা নিশ্চিত যে সর্ব্বসাধারণে তাঁহার প্রশংসা করিবে না। সর্ব্বসাধারণে মোটামুটি কথা চায়। স্বাধীনতা, সাম্য, স্বাতন্ত্রবাদ প্রভৃতি কয়েকটি মোটামুটি কথা লইয়া তাহাদের প্রশংসা করিতে থাকে, সকলেই তোমার মর্ম্ম বুঝিবে এবং তোমার প্রশংসাও করিবে। কিন্তু দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া ধীরভাবে নিজ কর্ত্তব্যানুসরণ কর, সর্ব্বসাধারণ তোমার গন্তব্যপথ বুঝিবেও না এবং তোমাকে প্রশংসাও করিবে না। সেই জন্য আমাদের আশঙ্কা হয় যে, সূক্ষ্মদর্শী বিবেচক ভিন্ন সর্ব্বসাধারণে কৃষ্ণদাসের মৃত্যুতে মর্ম্মপীড়িত হইবে না।

কৃষ্ণদাসের মতিগতির কথা যথাসাধ্য বর্ণনা করা গেল। কৃষ্ণদাসের স্বভাব চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহা তাঁহার বন্ধুগণ ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারেন না। আমরা কেবল তাঁহার উদারতা ও অমায়িকতার

একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। ব্রান্‌সন টাউনহলে বক্তৃতা করিতে করিতে বলিয়াছিল, 'দেশীয়দের মধ্যে কতকগুলি লোক সর্পের ন্যায় কুটিলগতিতে রাজার নিকটে যাইয়া তাঁহার মনের বিকৃতি জন্মাইয়া দেয়।" ইহাদ্বারা কৃষ্ণদাসকেও কতক পরিমাণে লক্ষ্য করা হইয়াছিল। কিন্তু কৃষ্ণদাস ইহার কেবল এই মাত্র উত্তর করিলেন " This insinuation is beneath contempt." তাহার পর যখন ব্রান্‌সন ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন সমস্ত দেশীয়ের মধ্যে একা কৃষ্ণদাসই তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন।

একচেঞ্জ ও রেলওয়ে।

একচেঞ্জ অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যের উপর কিরূপ কার্য্য করে; বিদেশে টাকা কর্জ্জ করিলে তাহা দ্বারা একচেঞ্জের কিরূপ পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব; টাকা কর্জ্জ করিয়া রেলওয়ে নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য কিনা; কর্ত্তব্য হইলে স্বদেশে না বিদেশে কর্জ্জ করা উচিত; এবং কাহার দ্বারা রেলওয়ে নির্ম্মাণ হওয়া উচিত; এই কএকটা বিষয় এই প্রবন্ধের আলোচ্য। আমাদের ইহা দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে যে আমরা ষ্টেট্‌সম্যান প্রভৃতি বড় বড় কাগজের সঙ্গে ইহার সকলবিষয়ে একমত হইতে পারিতেছি না। হইতে পারে যে আমাদের যুক্তিই অসঙ্গত; কিন্তু আমাদের ইচ্ছা যে আমাদের অসঙ্গতি কেহ নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ইহাও দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে যে দেশীয় সংবাদ পত্রের মধ্যে, কেহই যোগ্যতার সহিত এবিষয়েলেখনী ধারণ করেন নাই। আমরা এপর্য্যন্ত যত যুক্তি শুনিয়াছি, সকলই এক পক্ষে। আমরা আমাদের বক্তব্য পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিতকরিতে চাই। পাঠকবর্গ যদি আমাদের পক্ষ দুর্ব্বল দেখেন, আমাদের কোন আপত্তি নাই, আমরা আহ্লাদ-সহকারে ত্রুটি স্বীকার করিব।

দুই কারণে আমাদের দেশে একচেঞ্জের হ্রাস বৃদ্ধি হয়*। প্রথম, আভ্যন্তরিক কারণ, অর্থাৎ রৌপ্যের মূল্য কমিয়া যাওয়াতে টাকার মূল্য কমিয়া যায়, সুতরাং একচেঞ্জের হ্রাস হইতে থাকে। দ্বিতীয়, বাহ্যিক কারণ, অর্থাৎ উভয় দেশের লেনা দেনা কাটাকাটি করিয়া যদি ইংলণ্ড

* একচেঞ্জ কাহাকে বলে, যাঁহারা ইহা অবগত নহেন, তাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিবার পূর্ব্বে গত বৈশাখমাসের বান্ধবে "একচেঞ্জ" শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়িয়া লইবেন।

হইতে এদেশে নগদ মুদ্রা পাঠাইতে হয়, তবে এদেশের একচেঞ্জের অবস্থা কিছু ভাল হয়, আবার যদি এদেশ হইতে ইংলণ্ডে নগদ মুদ্রা পাঠাইতে হয়, তবে এদেশের একচেঞ্জ কিছু নামিয়া যায়। এই দুই কারণ কখনও একে অন্যকে কর্ত্তন করে, অর্থাৎ হয়ত আভ্যন্তরিক কারণে একচেঞ্জের অবস্থা কিছু খারাপ হইয়াছে; কিন্তু বাহ্যিক কারণে তাহা সারিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে টাকার মূল্য ২ শিলিং ছিল; কিন্তু আভ্যন্তরিক কারণে অর্থাৎ রৌপ্যের মূল্য কমিয়া যাওয়াতে অন্য কারণ না থাকিলে মূল্য প্রায় ১ শিলিং ৭৮ পেন্স্ হইত। কিন্তু তথাপি বাহ্যিক কারণে, অর্থাৎ ইংলণ্ড হইতে এদেশে নগদ মুদ্রা পাঠাইতে হয় বলিয়া, টাকার মূল্য প্রকৃত পক্ষে প্রায় ১ শিলিং ৮ পেন্স আছে। এই আভ্যন্তরিক কারণজাত একচেঞ্জ এবং বাহ্যিক কারণজাত একচেঞ্জ স্বতন্ত্ররূপে অন্তর্বাণিজ্য, বহির্বাণিজ্য ও দেশের আর্থিক অবস্থার উপর কার্য্য করিয়া থাকে। আমরা পৃথক পৃথক ইহাদের কার্য্য আলোচনা করিব। যখন একটি কারণের কার্য্য আলোচনা করিব, তখন মনে করিতে হইবে যে অন্যটি বিদ্যমান নাই।

আভ্যন্তরিক কারণজাত একচেঞ্জ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্নরূপ আমদানি ও রপ্তানির উপর কার্য্য করে। যদি সকল দেশেই রৌপ্যের মূল্য সমপরিমাণে কমিয়া যায়, তাহা হইলে ইহার কার্য্য এক প্রকার, যদি কেবল মাত্র এক ভারতবর্ষে কমিয়া যাইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার কার্য্য আর এক প্রকার। আবার যদি সকল দেশে রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহার করে তাহা হইলে ইহার কার্য্য একপ্রকার, কিন্তু যদি কোন কোন দেশ স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করে, এবং কোন কোন দেশ রৌপ্যমুদ্রা ব্যবহার করে তাহা হইলে ইহার কার্য্য আর একপ্রকার।

১। আমরা প্রথমতঃ এইরূপ কল্পনা করিব যে, সকল দেশেই রৌপ্যের মূল্য সমান পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে, এবং সকল দেশই রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহার করিতেছে। এ অবস্থায় প্রত্যেক দেশেরই আমদানি ও রপ্তানি উভয় কমিবে; কারণ মুদ্রার ক্রয় করিবার ক্ষমতা সকল দেশেই সমান পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। আমদানি ও রপ্তানির এক সাধারণ নিয়ম এই যে, যদি বিদেশীয় জিনিস পূর্ব্ব হইতে সস্তায় কিনিতে পারি, তবে আমদানি বাড়িবে, আর যদি অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হয়, আমদানি কমিবে। আবার যদি স্বদেশীয় জিনিস বিদেশীয়েরা পূর্ব্ব হইতে সস্তায় কিনিতে পারে,তবে রপ্তানি বাড়িবে এবং যদি অধিক মূল্যে কিনিতে হয়, রপ্তানি কমিবে। কিন্তু যদি মুদ্রার মূল্য সকল দেশে সমান পরিমাণ কমিয়া যায়, এবং তদ্দরুণ অন্যান্য জিনিসের মূল্য সকল দেশে সমান পরিমাণে বাড়িয়া উঠে, তবে আমাদিগকেও বিদেশীয় জিনিস পূর্ব্ব হইতে বেশী মূল্যে কিনিতে হইবে; এবং বিদেশীয়দিগকেও আমাদের জিনিসের জন্য

বেশী মূল্য দিতে হইবে; সুতরাং আমাদের আমদানি ও রপ্তানি উভয়ই কমিবে; এবং প্রত্যেক দেশ সম্পর্কেই এই নিয়ম খাটিবে।

২। এক্ষণে কল্পনা কর যে, সকল দেশেই রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহার করিতেছে, কিন্তু অন্যান্য দেশে রৌপ্যের মূল্য ঠিক আছে, কেবল ভারতবর্ষে কমিয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় আমাদের আমদানি বাড়িবে ও রপ্তানি কমিবে। কারণ আমাদের দেশে সকল জিনিসের মূল্য বাড়িয়াছে, কিন্তু অন্য কোন দেশে বাড়ে নাই। আমরা অন্য দেশ হইতে সকল জিনিসই সুলভ মূল্যে পাইব, সুতরাং আমাদের আমদানি বাড়িবে, কিন্তু অন্যান্য দেশকে আমাদের জিনিস অধিক মূল্যে কিনিতে হইবে, সুতরাং আমাদের রপ্তানি কমিবে।

৩। তার পর কল্পনা কর যে, সকল দেশেই রৌপ্যের মূল্য সমান পরিমাণে কমিয়াছে, কিন্তু ইংলণ্ড এবং অন্য কোন কোন দেশ স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করিতেছে, ভারতবর্ষ রৌপ্যমুদ্রা ব্যবহার করিতেছে; এ অবস্থায় আমাদের আমদানি কমিবে, কিন্তু রপ্তানি কমিবেও না, বাড়িবেও না। আমাদের আমদানি কমিবে, কারণ আমাদের টাকার মূল্য কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু বিদেশীয় জিনিসের মূল্য সমান আছে, সুতরাং বিদেশীয় জিনিসের জন্য আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতে অধিক মূল্য দিতে হইবে। আর আমাদের রপ্তানি কমিবেও না, বাড়িবেও না, কেন না ইংলণ্ড স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা ক্রয় বিক্রয় করে, রৌপ্যের মূল্য কমিয়া যাওয়াতে, স্বর্ণের সহিত আমাদের অন্যান্য জিনিসের সম্বন্ধ কোন প্রকারে পরিবর্ত্তিত হয় নাই; সুতরাং ইংলণ্ড পূর্ব্বেও যতখানি স্বর্ণ দ্বারা যে পরিমাণ জিনিস কিনিয়াছে, এক্ষণও ততখানি স্বর্ণ দ্বারা ঠিক সেই পরিমাণ জিনিসই ক্রয় করিতে পারিতেছে—বেশীও নহে কমও নহে।

৪। অবশেষে কল্পনা কর যে, ইংলণ্ড ও অন্য কোন কোন দেশ স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করিতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষ রৌপ্যমুদ্রা ব্যবহার করিতেছে; এবং অন্যান্য দেশে রৌপ্যের মূল্য যে প্রকার আছে, ভারতবর্ষে তাহা হইতে অনেক কমিয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় আমাদের আমদানি বাড়িবে, এবং রপ্তানিকমিবে। আমাদের দেশে রৌপ্যের মূল্য কমিয়াছে বলিয়া এখানে রৌপ্যের বিনিময়ে অতি অল্প পরিমাণ জিনিস পাইতে পারি। কিন্তু ইংলণ্ডে রৌপ্যের মূল্য আমাদের দেশের ন্যায় কমে নাই, সুতরাং আমরা ঐ রৌপ্য ইংলণ্ডে লইয়া গেলে, তদ্বিনিময়ে আমাদের দেশে যাহা পাইতাম, তাহা হইতে বেশী জিনিস পাইতে পারিব। সুতরাং আমাদের আমদানি বাড়িবে। রপ্তানি সম্পর্কে আপাততঃ দেখা যাইবে যে, রপ্তানি বাড়িবেও না, কমিবেও না; কারণ আমাদের রৌপ্যের মূল্য কমিয়া যাওয়াতে, অন্যান্য জিনিসের সহিত স্বর্ণের সম্বন্ধ পরিবর্ত্তিত হয় নাই; সুতরাং যাহারা স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করে, তাহারা পূর্ব্বেও যে মূল্যে যে

জিনিস খরিদ করিয়াছে, এক্ষণেও তাহাই করিবে। কিন্তু রপ্তানি সম্পর্কে এই ফল একটি অবস্থার উপর নির্ভরকরে। যদি ইংলণ্ড হইতে এদেশে স্বর্ণ আনিলে স্বর্ণের মূল্য এদেশে না কমে, তাহা হইলে আমাদের রপ্তানি ঠিক থাকিবে সত্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এদেশে স্বর্ণ আনিলে স্বর্ণের মূল্য কিয়ৎপরিমাণে কমিবে; সুতরাং ইংলণ্ড পূর্ব্বে যত স্বর্ণ দ্বারা এদেশীয় যত জিনিস খরিদ করিতে পারিয়াছে, এক্ষণে তাহা পারিবেনা। সুতরাং এই চতুর্থ অবস্থায় আমাদের রপ্তানি কমিবে।

দেশসমূহের প্রকৃত অবস্থা এই যে, সকল দেশেই রৌপ্যের মূল্য কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু অন্যান্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে আরও অধিক কমিয়াছে। ভারতবর্ষের ন্যায় যে সকল দেশে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত, উপরোক্ত নিয়মানুসারে সেই সকল দেশের সহিত বাণিজ্যে ভারতবর্ষের আমদানি বাড়িয়াছে ও রপ্তানি কমিয়াছে। আর ইংলণ্ড প্রভৃতি যে সকল দেশে স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলিত, সেই সকল দেশের সহিত বাণিজ্যেও রপ্তানি কমিয়াছে ও আমদানি বাড়িয়াছে। সকল দেশে রৌপ্যের মূল্য যে পরিমাণে কমিয়াছে, ভারতবর্ষের আমদানি সেই পরিমাণ কমিয়াছে, আর অন্যান্য দেশ হইতে ভারতবর্ষের রৌপ্যমূল্য যে পরিমাণ বেশী কমিয়াছে, সেই পরিমাণ ভারতবর্ষের আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমদানি ও রপ্তানীর প্রকৃত অবস্থা এই সিদ্ধান্তের অনুরূপ হইবে বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন; কারণ ঐ অবস্থা শুধু একচেঞ্জের উপর নির্ভর করে না। যদি অন্য কোন কারণ বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে উহা উল্লিখিত সিদ্ধান্তের অনুরূপ হইত, সন্দেহ নাই।

আভ্যন্তরিক একচেঞ্জের দরুণ দেশের আর্থিক অবস্থায় আরও কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ, যেসকল ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট বেতন প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের কিছু ক্ষতি হইয়াছে। কারণ তাঁহারা পূর্ব্বেও যে বেতন পাইতেন, এখনও তাহাই পাইতেছেন, কিন্তু তাঁহারা ঐ বেতন দ্বারা পূর্ব্বে যত অভাব মোচন করিতে পারিতেন, জিনিসের দাম বাড়িয়া যাওয়াতে এক্ষণে তত পারিতেছেন না। ২য়তঃ, কৃষক শ্রেণীর অবস্থার কিঞ্চিত উন্নতি হইয়াছে, কেননা, তাহাদের উৎপন্ন শস্যের মূল্য বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের রাজস্ব বাড়ে নাই, সুতরাং তাহারা বেশী অর্থ হাতে রাখিতে পারে, এবং তদ্দ্বারা বেশী অভাব মোচন করিতে সমর্থ হয়। যথা মনে কর, কোন ব্যক্তি পূর্ব্বে ১৬ মণ ধান্য জন্মাইয়া তাহার ৮ মণ বিক্রয় করিয়া রাজস্ব দিয়াছে, আর বাকী ৮ মণ দ্বারা ১০ জোড়া কাপর খরিদ করিয়াছে; এখন যদি সে ৪ মণ ধান বিক্রয় করিয়াই রাজস্ব পরিশোধ করিতে পারে, তবে অবশিষ্ট ১২ মণ ধান্য দিয়া ১৫ জোড়া কাপর খরিদ করিতে পারিবে।

আমরা এপর্য্যন্ত আভ্যন্তরিক কারণজাত একচেঞ্জের কথা বলিয়াছি। বাহ্যিক কারণ-জাত একচেঞ্জ আমদানি, রপ্তানি

ও দেশের আর্থিক অবস্থার উপর কিরূপ কার্য্য করে,তাহা সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। প্রথমতঃ, যদি একচেঞ্জ ভারতবর্ষের অনুকূলে হয় (এই একচেঞ্জ সাধারণতঃই ভারতবর্ষের অনুকূলে থাকে) তবে আমদানি বাড়িতে এবং রপ্তানি কমিতে থাকে। এই একচেঞ্জের দরুণ পূর্ব্বে যেখানে ইংলণ্ডের কোন বণিককে ১২০০ টাকা পাঠাইতে হইলে ১০০ পাউণ্ড দিতে হইত, এক্ষণে তাহাকে ঐজন্য হয়ত ১০১ পাউণ্ড দিতে হইবে, সুতরাংই ইংলণ্ডে আমাদের জিনিসের রপ্তানি কমিবে। আবার ইংলণ্ডে ১০০পাউণ্ড পাঠাইতে পূর্ব্বে যেস্থলে আমাদিগকে ১২০০ টাকা দিতে হইয়াছে, এক্ষণে তদ্দরুণ হয় ত আমাদিগকে ১১৯০ টাকা দিতে হইবে, সুতরাং সস্তায় ইংলণ্ডীয় জিনিস পাওয়া যাইবে বলিয়া আমাদের আমদানি বাড়িবে। ২য়তঃ যে সকল ইংরেজ ভারতবর্ষে নির্দ্দিষ্ট বেতন পান, একচেঞ্জ ভারতবর্ষের অনুকূলে হইলে, তাঁহাদের কিছু ক্ষতি হইবে, কেন না পূর্ব্বে তাঁহাদের বেতন দ্বারা তাঁহারা যত স্বর্ণমুদ্রা স্বদেশে পাঠাইতে পারিয়াছেন, এক্ষণে তাহা পারিবেন না। ৩য়তঃ সাধারণের পক্ষে এই একটু লাভ হইবে যে তাহারা আমদানি জিনিস পূর্ব্ব হইতে অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে সমর্থ হইবে।

এক্ষণে আমরা যদি রেলওয়ে প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য ইংলণ্ডে টাকা কর্জ্জ করি, তাহা হইলে একচেঞ্জের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইবে, দেখা যাউক। ইংলণ্ড হইতে দুই উপায়ে আমরা টাকা কর্জ্জ করিতে পারি। প্রথম উপায় এই যে আমরা ইংলণ্ডের মহাজন হইতে টাকা কর্জ্জ করিয়া নগদ তাহা ভারতবর্ষে আনিতে পারি। এইরূপ করিলে রৌপ্যের বাজার ভারতবর্ষে আরও কমিয়া যাইবে, এবং এদেশের একচেঞ্জর অবস্থা আরও খারাপ হইবে। এই ভাবে টাকা কর্জ্জ করা অত্যন্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। গবর্ণমেণ্ট কখনই তাহা করিবেন না। দ্বিতীয় উপায় এই যে সেক্রেটরী অব ষ্টেট তাহার কাউন্সিল ড্রেফ্‌ট বিক্রয় বন্ধ করিয়া, কর্জ্জ করিয়া তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন। ঐ কর্জ্জ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কর্জ্জ বলিয়া গণ্য হইবে। বোধ হয় সকলেই জানেন যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে সেক্রেটরী অব ষ্টেটের নিকট বৎসর বৎসর ন্যূন কল্পে ১৪ কোটী টাকা হোম চার্জ্জ বাবদ পাঠাইতে হয়। এই টাকা নগদ পাঠান হয় না। সেক্রেটরী অব ষ্টেট কতকগুলি কাউন্সিল ড্রেফ্‌ট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত করিয়া রাখেন। যে সকল বণিক ভারতবর্ষে টাকা পাঠাইতে চাহে,তাহারা নগদ না পাঠাইয়া সেক্রেটরী অবষ্টেটের ড্রেফ্‌ট ক্রয় করে। সেক্রেটরী অব ষ্টেট এইরূপ ড্রেফ্‌ট বিক্রয়দ্বারা তাহার ১৪ কোটী টাকা উশুল করেন। বণিকগণ ঐ ড্রেফ্‌ট ভারতবর্ষীয় বেঙ্কে দিয়া তাহাদের টাকা লইয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট বেঙ্ককে অবশেষে ঐ টাকা পরিশোধ করেন। এক্ষণে মনে কর গবর্ণমেণ্টের ১৪কোটী টাকা

কর্জ্জ করার প্রয়োজন হইয়াছে। যদি সেক্রেটরী অব ষ্টেট এক বৎসর কাউন্সিল ড্রেফ্‌ট বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেন, এবং কর্জ্জ করিয়া তাঁহার ঐ ব্যয় নির্ব্বাহ করেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের ঐ ১৪ কোটী টাকা থাকিয়া যায়, এবং উহা কর্জ্জ স্বরূপ গণ্য করিয়া গবর্ণমেণ্ট পূর্ত্ত কার্য্যে ব্যয় করিতে পারেন। এই উপায়ে নগদ মুদ্রা না আনিয়াও গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডে কর্জ্জ করিতে পারেন; এবং এই উপায় অবলম্বন করিলে ভারতবর্ষের একচেঞ্জের অবস্থার কিছু উন্নতি হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইংলণ্ডীয় যে সকল বণিকগণকে কারবারের জন্য ভারতবর্ষে টাকা পাঠাইতে হয়, তাহারা নগদ না পাঠাইয়া সেক্রেটরী অব ষ্টেটের ড্রেফ্‌ট ক্রয় করিয়া পাঠাইয়া থাকেন। কিন্তু যদি সেক্রেটরী অবষ্টেট ড্রেফ্‌ট বিক্রয় বন্ধ করেন, তবে তাঁহাদিগকে বেঙ্কবিল ক্রয় করিয়া পাঠাইতে হয়। এবং বেঙ্কবিলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াতে উহার মূল্য বাড়িয়া যায়; সুতরাং একচেঞ্জ ভারতবর্ষের অনুকূলে দাঁড়ায়। যথা এক্ষণে ১ টাকার বেঙ্কবিল ১ শিলিং ৮ পেন্স বিক্রয় হইতেছে, হয়ত সেই বেঙ্কবিল ১ শিলিং ১০ পেন্স বিক্রয় হইবে। ইহাতে আমাদের আমদানি বাড়িবে ও রপ্তানি কমিবে।

রেলওয়ে প্রভৃতি পূর্ত্তকার্য্যের জন্য টাকা কর্জ্জ করা উচিত কি না, এবং উচিত হইলে স্বদেশে কিম্বা বিদেশে কর্জ্জ করা উচিত, এই বিষয় নিয়া আজি কালি বড় আন্দোলন যাইতেছে। রেলওয়ের জন্য যে, টাকা কর্জ্জ করা আবশ্যক, অধিকাংশ লোকেই ইহা স্বীকার করেন। তাহাদের যুক্তি এই যে, রেলওয়ে দ্বারা দেশের ধন বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ নিবারণ হয়, সুতরাং যত শীঘ্র রেলওয়ে বিস্তার হয়, ততই ভাল; কিন্তু যেহেতু রাজস্ব হইতে এত টাকা উদ্বর্ত্ত করা অসম্ভব, সুতরাং কর্জ্জ করাই বিধেয়। যে ভবিষ্যদ্বংশীয়দের উপকারের জন্য রেলওয়ে নির্ম্মিত হইবে, তাহারাই ঐ টাকার সুদ বহন করিবে। রেলওয়ে নির্ম্মাণে যদি ধনবৃদ্ধি হয়, তবে কর্জ্জ করিয়াও রেলওয়ে নির্ম্মাণ করা উচিত বটে। কিন্তু যদি তাহা না হয়, তবে রেলওয়ে নির্ম্মাণে বিশেষ আপত্তি আছে। প্রধান আপত্তি এই যে, যে টাকা রেলওয়ের কার্য্যে ব্যয় হয়,তাহার প্রায় অর্দ্ধেক নানা বাবদে ইংলণ্ডে চলিয়া যায়, বাকী অর্দ্ধেকের জন্য সম্পূর্ণ টাকার সুদ ভারতবর্ষকে বহন করিতে হয়। এ অবস্থায় এক একটি রেলওয়ে নির্ম্মাণে ইংরেজদিগের উপার্জ্জনের এক একটি পন্থা সৃষ্ট হয়, আর দেশীয় প্রজাদিগের উপর টেক্স বৃদ্ধি পায় মাত্র।

যাহা হউক, যদি টাকা কর্জ্জ করাই উচিত বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে স্বদেশে না বিদেশে কর্জ্জ করা উচিত? আপাততঃ ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে যে, যে দেশে কম সুদে কর্জ্জ পাওয়া যায়, সেই দেশেই কর্জ্জ করা উচিত। কিন্তু একটুকু চিন্তা করিয়া দেখিলে অন্যরূপ প্রতীয়মান হইবে। (১) মনে কর দেশে টাকা না পাইয়া ৫০ লক্ষ টাকা ইংলণ্ডে এই নিয়মে কর্জ্জ করিলাম যে,

বৎসর বৎসর ২ লক্ষ টাকা সুদ দিতে হইবে। এই ৫০ লক্ষ আমাদের মূলধনে বাড়িল। এক্ষণে যদি ঐ ৫০ লক্ষ খাটাইয়া প্রতি বৎসর ৩ লক্ষ টাকার নূতন ধন জন্মাইতে পারি, তবে আমাদের বিদেশে কর্জ্জ করায় কোন ক্ষতি হয় না, বরং ১ লক্ষ টাকা করিয়া লাভ হয়, কারণ যেমন ২লক্ষ টাকা বিদেশকে সুদ বাবদে দিতে হইবে, তেমন ৩ লক্ষ টাকার নূতন ধন জন্মিবে ;—যদি বিদেশে কর্জ্জ না করিতাম, তবে ঐ এক লক্ষ টাকা আমাদের লাভ হইত না। কিন্তু যদি আমরা দেশে ঐরূপ নিয়মেই ৫০ লক্ষ টাকা পাইতে পারি, তবে কখনও বিদেশে যাওয়া উচিত নহে, কারণ যে ধন উৎপন্ন হয়, সমস্তই দেশে থাকিয়া যায়। বিদেশে কর্জ্জ কবিলে ৩০বৎসরে আমাদের মূলধন [৫০+(৩×৩০)--২×৩০] অর্থাৎ ৮০ লক্ষ থাকিবে, কিন্তু দেশে কর্জ্জ করিলে ৩×৩০ অর্থাৎ ৯০ লক্ষ থাকিবে, সুতরাং দেশে কর্জ্জ করাই কর্ত্তব্য। (২) এক্ষণে মনে কর, ঐ ৫০ লক্ষ দ্বারা আমরা কোন নূতন ধনই জন্মাইতে পারিতেছি না ; এ অবস্থায় যদি বিদেশে কর্জ্জ করি তবে ২৫ বৎসরে যে মূলধন আনিয়াছিলাম, তাহা বিদেশকে সুদ বাবদ ফিরাইয়া দিতে হইবে, কিন্তু যে ঋণ সে ঋণ রহিয়া যাইবে, এবং ২৫ বৎসরের পর প্রত্যেক বৎসর ২ লক্ষ টাকা আমাদিগকে অনর্থক দণ্ড দিতে হইবে। এ অবস্থায় দেশে কর্জ্জ করিলে দণ্ড হইবার কোন কারণ নাই, টেক্সদাতার পকেট হইতে মহাজনের পকেট ভরিবে,এই মাত্র ; কিন্তু সমস্ত দেশের ধনসমষ্টি বাড়িবেও না, কমিবেও না। সুতরাং এই অবস্থায়ও স্বদেশেই কর্জ্জ করা শ্রেয়ঃ। (৩) তার পর মনে কর যে,আমরা ঐ ৫০ লক্ষ টাকা খাটাইয়া প্রতি বৎসর ৩ লক্ষ টাকার নূতন ধন জন্মাইতে পারি ; কিন্তু বিদেশে কর্জ্জ করিলে আমাদিগকে বার্ষিক ২ লক্ষ টাকা সুদ দিতে হয়, আর দেশে কর্জ্জ করিলে ঐ ৩ লক্ষ টাকাই সুদ দিতে হয়। এ অবস্থায়ও আমাদের স্বদেশে কর্জ্জ করা বিধেয়, কারণ বিদেশে কর্জ্জ করিলে ৩০ বৎসরের পর আমাদের মূলধন [৫০+(৩ ×৩০)—২×৩০] অর্থাৎ ৮০ লক্ষ কিন্তু স্বদেশে কর্জ্জ করিলে ৩×৩০ অর্থাৎ ৯০ লক্ষ থাকিবে। অথচ স্বদেশে এই বেশী সুদ দেওয়াতে টেক্সদাতাদের উপর কোন ভার বৃদ্ধি পাইবে না ; কারণ দেশের যে ৩ লক্ষ টাকা ধনবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাই সুদ বাবদে মহাজনদিগকে দেওয়া হইতেছে। (৪)অবশেষে মনে কর যে আমরা ঐ ৫০ লক্ষ খাটাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকাই নূতন ধন জন্মাইতে পারি। কিন্তু বিদেশে কর্জ্জ করিলে সুদ বাবদ আমাদিগকে বার্ষিক ২ লক্ষ টাকা দিতে হয়, আর স্বদেশে কর্জ্জ করিলে ৫ লক্ষ টাকা দিতে হয়। এই অবস্থায়, অর্থাৎ যখন নূতন উৎপন্ন ধন হইতে অধিক সুদ দিতে হয়, তখন আমাদের বিদেশে কর্জ্জ করা উচিত। কারণ যদিও সমগ্র দেশের পক্ষে, স্বদেশে কর্জ্জ করিলেই ধন সমষ্টি অধিক হয়, তথাপি টেক্সদাতা দিগের সুবিধার জন্য

আমাদের অল্প লাভেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যদি স্বদেশে কর্জ্জ করা হয়, তবে টেক্সদাতার ক্ষতি আর মহাজনের লাভ হইবে, কিন্তু দেশের ধন সমষ্টি ৩ লক্ষ করিয়াই প্রতি বৎসর বাড়িবে; আর যদি বিদেশে কর্জ্জ করা যায় তবে দেশের ধন সমষ্টি ১ লক্ষ করিয়া বাড়িতে থাকিবে, কিন্তু টেক্সদাতার কোন ক্ষতি হইবে না, সুতরাং এই স্থলে বিদেশে কর্জ্জ করাই উচিত।

এক্ষণে দেখা যাউক ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ। অনেকেই জানেন যে গবর্ণমেণ্ট কোন কোন গ্যারিণ্টীড্ রেলওয়ের জন্য প্রায় শত করা ৫ টাকা সুদ বিদেশে পাঠাইতেছেন। যদি এই পরিমাণ দেশের ধনবৃদ্ধি না হইয়া থাকে, তবে বলিত হইবে যে গ্যারিণ্টীড্ রেলওয়ে দেশের উপকার না করিয়া দেশের ধনশোষণ করিতেছে। কারণ গবর্ণমেণ্ট এই বাবদ যে টাকা ইংলণ্ডে পাঠান, হয় তাহা দেশের যে ধনবৃদ্ধি হইতেছে, তাহা হইতে পাঠান, না হয় দেশে যে ধন আছে, তাহা হইতে পাঠান। গ্যারিণ্টীড্ রেলওয়ে এদেশের উপকার করিতেছে, ইহা স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে গবর্ণমেণ্ট এতদ্দরুণ ইংলণ্ডে যে শতকরা ৫ টাকা সুদ পাঠান, অন্ততঃ সেই পরিমাণ দেশের ধনবৃদ্ধি হইতেছে। রেলওয়ে দ্বারা শতকরা পাঁচ টাকা ধনবৃদ্ধি হইলে যে পর্য্যন্ত ৫ টাকা হারে স্বদেশে টাকা পাওয়া যায়, সে পর্য্যন্তও বিদেশে কর্জ্জ করা উচিত নহে। আর যদি ধনবৃদ্ধি না হয়, তবে বিদেশে স্বদেশে কোথাও কর্জ্জ করিয়া রেলওয়ে নির্ম্মাণ করা উচিত নহে। যাহা হউক আমরা স্বীকার করিলাম যে শতকরা ৫ টাকা হারে রেলওয়ে দ্বারা ধনবৃদ্ধি হইবে, এক্ষণে দেখিতে হইবে যে পাঁচ টাকা হারে স্বদেশে টাকা পাওয়া যায় কিনা। আমরা গত কএক বৎসর ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছি যে ৪ টাকা সুদের গবর্ণমেণ্টের কাগজ প্রিমিয়মে বিক্রীত হইতেছে। এ অবস্থায় এদেশে কেন ৪ টাকা সুদে টাকা পাওয়া যাইবে না বলিয়া চীৎকার হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এদেশে ৪ টাকা সুদে যদি টাকা পাওয়া যায়, আর সেই টাকা খাটাইলে অন্ততঃ শতকরা ৪ টাকা মুনাফা হইবে বলিয়া যদি ভরসা হয়, তবে বিদেশে ৩ টাকা দূরে থাকুক, ২ টাকা সুদেও কর্জ্জ করা উচিত নহে।

কিন্তু যদি উক্ত গবর্ণমেণ্টের কাগজ অধিকাংশ ইংরেজগণ ক্রয় করে, তবে স্বদেশ হইতে ইংলণ্ডে কর্জ্জ করাই উচিত। কারণ এ অবস্থায় স্বদেশে কর্জ্জ করিলেও উহার সুদ ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইবে। এবং যদি ইংলণ্ডেই সুদ পাঠাইতে হয়, তবে যতকম পাঠাইয়া পারা যায়, ততই ভাল। কিন্তু আমরা মথুরা-হাট্রাস রেলওয়েতে দেখিতে পাই যে তাহার মূলধন সমস্তই দেশীয় জমীদারগণ যোগাইয়াছে, এবং আমাদের বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে জমীদারগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিলে দেশীয়গণের নিকটই প্রচুর টাকা কর্জ্জ পাইতে পারেন।

আমাদের শেষ সমালোচ্য প্রশ্ন এই যে

রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের নিজের করা উচিত, না গ্যারিণ্টীড্ কোম্পানীর দ্বারা করান উচিত। আমাদের বিশ্বাস এই যে যদি দেশীয় কোন কোম্পানী রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিতে স্বীকৃত হয়, তবে তাহাদিগকে গ্যারিণ্টী দেওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু যদি তাহা না পাওয়া যায়, তবে গবর্ণমেণ্টের নিজেরই নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট ইংরেজ কোম্পানীদিগকে নানাপ্রকার গ্যারিণ্টী দিয়া থাকেন। কোন কোম্পানীর সহিত এই প্রকার চুক্তি হয় যে, যে পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মাণ হইতে থাকে সেই পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট তাহাদের মূলধনের উপর একটা সুদ দিবেন; নির্ম্মিত হইলে লাভ লোকশান তাহাদের, গবর্ণমেণ্টের সহিত আর কোন সংস্রব নাই। কোন কোম্পানীর সহিত এইরূপ চুক্তি হয় যে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের মূলধনের উপর একটা নির্দ্দিষ্ট সুদ দিবেন, লাভ লোকশান সমস্ত গবর্ণমেণ্টের। কোন কোম্পানীর সহিত এইরূপ চুক্তি হয় যে গবর্ণমেণ্ট মূলধনের উপর একটা নির্দ্দিষ্ট সুদ দিবেন, এবং তাহা ব্যতিরেকেও যত উদ্বর্ত্ত মুনাফা হইবে, তাহার অর্দ্ধাংশ বা চতুর্থাংশ কোম্পানীকে দিবেন। অধিকাংশ কোম্পানীর সহিতই এইরূপ চুক্তি। যে সুদের চুক্তি হয়, তাহাও বাজার দর হইতে অনেক বেশী। এ অবস্থায় জিজ্ঞাস্য এই যে যদি রেলওয়েতে মুনাফা না হয়, তবে লোকের উপর টেক্স ধরিয়া বিদেশীয় কোম্পানীকে সুদ দেওয়া হয় কেন? আর যদি মুনাফা হয় তবে গবর্ণমেণ্ট সেই মুনাফা ছাড়েন কেন? মনে কর যেন কলিকাতা হইতে নাগপুর পর্য্যন্ত একটি রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিতে ১০ কোটী টাকা ব্যয় হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি নিজে কর্জ্জ করিয়া নির্ম্মাণ করেন, তবে হয়ত ৩টাকা হারে ৩০লক্ষ টাকা সুদ দিতে হয়। আর যদি গ্যারিণ্টী দ্বারায় করান, তাহা হইলে গ্যারিণ্টীড্ মূলধনের উপর অন্ততঃ ৪ টাকা হারে সুদ দিতে হইবে। এ অবস্থায় সর্ব্ব প্রকারেই কি গবর্ণমেণ্টের নিজের রেলওয়ে নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য নহে? গত ১৮৮৩ সনের শেষ পর্য্যন্তের যে হিসাব হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে গ্যারিণ্টীড্ রেলওয়েতে ভারতবর্ষে মোট ৭৩,৭০,৪৩,৮৯৩ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে, এবং খরচ বাদে ১৮৮৩ সনে মোট ৩,৮৩, ৬৫,০০৯ টাকা মুনাফা হইয়াছে। কিন্তু কোম্পানীর সুদ এবং অন্যান্য বাবদ গবর্ণমেণ্টকে ঐ ১৮৮৩ সনে মোট ৪০৭,৪১, ১৬৪ টাকা দিতে হইয়াছে। সুতরাং ঐ এক সনে গ্যারিণ্টীড্ রেলওয়ের দরুণ গবর্ণমেণ্টের মোট ২৩,৭৬,১১৫ টাকা দণ্ড পড়িয়াছে। উক্ত হিসাবে ইহাও দৃষ্ট হয় যে, গ্যারিণ্টীড্ রেলওয়ের আরম্ভ অবধি ১৮৮৩ সনের শেষ পর্য্যন্ত এতদ্দরুণ গবর্ণমেণ্টের মোট ২৮,১৬,৬০,২৯৩ টাকা দণ্ড পড়িয়াছে। এই ২৮ কোটি টাকার অধিকাংশই কি অনর্থক দণ্ড পড়ে নাই? গ্যারিণ্টীড্ রেলওয়ের আরম্ভ হইতে ১৮৮৩ সনের শেষ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীদিগকে তাহাদের মূলধনের সুদ বাবদ ৬৭,৮৯,৪৭,৪৯২

টাকা দিয়াছেন, তন্মধ্যে ৬৭,৩০,৯২,৯৯৯ ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে, বাকি ৫৮,৫৪,৪৯৩ যাহা ভারতবর্ষে পরিশোধ হইয়াছে, তাহারও অধিকাংশ অবশ্য ইংলণ্ডে যাইয়া পৌছিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গ্যারিল্‌টীড্‌ রেলওয়েতে এই দুই অসুবিধা হইতেছে যে যে গবর্ণমেণ্ট নিজে রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিলে যত দণ্ড দিয়া পারিতেন, তাহা হইতে অনেক বেশী দণ্ড দিতে হইতেছে ; এবং কোম্পানীদিগকে যে অর্থ দেওয়া হইতেছে, তাহার অধিকাংশই ইংলণ্ডে চলিয়া যাইতেছে ; কারণ গ্যারিল্‌টীড কোম্পানীর মেম্বরগণ সকলই বিদেশীয়। পক্ষান্তরে এদেশের ষ্টেট রেলওয়ের আয় ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে উপলব্ধি হইবে যে পূর্ব্বে ইহাতে দণ্ড দিতে হইলেও এক্ষণে ইহাতে বিলক্ষণ লাভ দাঁড়াইয়াছে, আর পূর্ব্বে যে দণ্ড দিতে হইয়াছে তাহাও গ্যারিল্‌টীড্‌ রেলওয়ের তুলনায় অল্প। ষ্টেট রেলওয়ে সমূহে ১৮৮৩ সনের শেষ পর্য্যন্ত মোট ৪১,৬৩,৬৫,০৮১ টাকা মুলধন ব্যয়িত হইয়াছে ; তন্মধ্যে ৪,৯২,৪৬,৯৫৯ টাকা রাজস্ব হইতে দেওয়া হইয়াছে, বাকী টাকা কর্জ্জ করিতে হইয়াছে। ১৮৮৩ সনে খরচ বাদে মোট ১,৪৬,৮১,৪৮১ টাকা মুনাফা হইয়াছে এবং সুদ ও অন্যান্য বাবদে ১,৪২,৭৬,২৬৪ টাকা ব্যয় হইয়াছে, সুতরাং ৪,০৫,২১৭ লাভ দাঁড়াইয়াছে। এই হিসাবে দেখা যাইতেছে যে গ্যারিলটীড রেলওয়েতে ১৮৮৩ সনে গবর্ণমেণ্টের ২৩,৭৬,১৫৫ দণ্ড পড়িয়াছে, কিন্তু ষ্টেট রেলওয়েতে ৪,০৫,২১৭ লাভ হইয়াছে। ষ্টেট রেলওয়ের আরম্ভ অবধি ১৮৮৩ সনের শেষ পর্য্যন্ত মোট ৫,০৬,৯৩,৭২১ টাকা দণ্ড হইয়াছে। ইহাতেও দেখা যাইতেছে যে গবর্ণমেণ্ট গ্যারিল্‌টীড্‌ রেলওয়েতে মোট শতকরা ৩৮ টাকা দণ্ড দিয়াছেন, কিন্তু ষ্টেট রেলওয়েতে মোট শতকরা ১২ টাকা দণ্ড দিয়াছেন। ইহাদ্বারাও কি গ্যারিল্‌টীড্‌ রেলওয়ে হইতে ষ্টেটরেলওয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে না? ষ্টেট রেলওয়ে সম্পর্কে এই মাত্র আপত্তি যে রেলওয়ে কার্য্য বৃহৎ ব্যাপার, গবর্ণমেণ্ট উহার ভার গ্রহণ করা অতীব কষ্টকর মনে করেন, আর রেলওয়ে নির্ম্মিত হইয়া গেলে কর্ম্মচারীদিগকে অবশেষে বরখাস্ত করিতে হয়। কিন্তু ইহা কি সম্পূর্ণ অলীক আশঙ্কা নহে? এই সামান্য আশঙ্কার জন্য কি লক্ষ লক্ষ টাকা দণ্ড দেওয়া বিধেয়?

শ্রীশাঃ—

সাংখ্যদর্শন।

প্রথম প্রস্তাব।

দর্শনের উৎপত্তি ও কপিল কর্ত্তৃক বেদান্ত-মত নিরাস।

নূতন কোন ঘটনা হইলে তাহার একটা যুক্তি দেখাইতে চেষ্টা করা মানব-মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ; সঙ্গত হউক আর অসঙ্গতই হউক, একটা যুক্তি চাইই, এবং যতক্ষণ না একটা পাওয়া যায় ততক্ষণ মনের স্থিরতা হয় না। ভূমিকম্প যখন লোকের নিকট নূতন ছিল তখন কাহারও কল্পনা উহাতে দেবতার ক্রোধ, কাহারও বা দিক্‌কুঞ্জরের মুহুকর্ণচালন, আবার কোন ধর্ম্মভীরুর বা পাপীর দুষ্কর্ম্মভরে ক্লিষ্টা বসুন্ধরার অসহিষ্ণুতা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এইরূপে আমাদের অজ্ঞান, আমাদের জ্ঞানলিপ্সা ও প্রকৃতির গূঢ় রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ-স্পৃহা, আমাদিগকে ধীরে ধীরে বিজ্ঞান ও দর্শন রাজ্যে লইয়া যায়। ভারত প্রকৃতির রঙ্গভূমি ; এখানে কোন কালেই কল্পনার উদ্দীপক কারণের অভাব ছিল না। শান্তির সুখময় অঙ্কে লালিত আর্য্যসন্তান নিরুদ্বেগে অভ্রভেদী তুষারধবলা গিরিশিখর বা সৈকতলগ্না রজতধবলা স্রোতস্বতী, রবিকরোদ্ভাসিত ধবল দিনমান বা 'ইন্দুধাম ধবলা' রজনী দেখিয়া 'সর্ব্বশুক্লা সরস্বতীর' আরাধনায় অতি প্রাচীন কাল হইতেই নিরত হইলেন *। কাব্য ও দর্শন প্রভৃতির ক্রমে উন্নতি হইতে লাগিল। আদি মানব, প্রকৃতির কোন্ তত্ত্বের কিরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বেদে সুন্দর বর্ণিত আছে। সে মীমাংসা গুলি আমাদের মনে ভাল লাগে না বটে, কিন্তু তাঁহার মন তাহাতেই তৃপ্ত হইত। যে

* পাঠক এখানে বলিতে পারেন, প্রকৃতির এসমস্ত কার্য্যপরম্পরা লোকের মন দর্শন বা বিজ্ঞানের দিকে না নিয়া বরং কাব্যের দিকেই লইয়া যাইবে। আমাদের বিবেচনায় কবি ও দার্শনিক একই কারণ হইতে হয়, একই ঘটনা একজনকে কবি অপরকে দার্শনিক করিতে পারে। কবি স্বভাবের শোভায় মোহিত, তিনি নৈসর্গিক ঘটনাবলীর অন্তরে যে গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে তাহার অনুসন্ধানের অবসর পান না ; দার্শনিক সে শোভা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া তাহার অন্তর্নিবিষ্ট সত্যের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হন।

বিশ্বসংসারের আবর্ত্তনে নিয়ত আবর্ত্তিত হইয়া আমরা তাহার নূতনত্ব আর অনু- ভব করিতে পারি না, সে সংসার আদি মানবের পরম বিস্ময়ের সামগ্রী ছিল। যে বালসূর্য্য এইমাত্র পূর্ব্বদিক-চক্রবাল আলোকিত করিতেছিল, তাহাই তিল তিল করিয়া প্রৌঢ়বয়সে গগণচূড়ায় আ- রূঢ় হইল ও আবার তিলে তিলে অবরো- হণ করিয়া পশ্চিমাকাশ প্রান্তে তিরো- হিত হইল, সে তাহার নিকট সজীব বলিয়া বোধ হইল। যথন রজনীর গাঢ় তিমিরে বস্তু হইতে বস্তুন্তরের আকৃতিগত পার্থক্য বিদূরিত হওয়াতে জগৎ এক অনন্তপরি- সর অচিন্তনীয় ভৈরবমূর্ত্তি ধারণ করিল, তথন তাহার সোৎকণ্ঠ নয়নপাত পূর্ব্বা- কাশে ও সাবেগ কণ্ঠস্বর উষার স্তুতিগানে নিরত,—কেননা এই উষাই ভগ্ন মেঘখণ্ডের স্বর্ণরথে মহিমোজ্জল দিবসনাথের শুভাগ- মন জানাইয়া দেয়। সূর্য্যের আগমনে আ- কৃতিহীনের আকৃতি হইল,জীবনহীন জীবন পাইল এবং মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যেথানে শৃঙ্খলার নামও ছিল না, সেথানে সুন্দর শ্রী হইল। যে অমোঘ প্রভাব নিমেষ মধ্যে এত বি- স্ময়কর পরিবর্ত্তন ঘটাইল, তাহার মূল এ- কটি জড় পদার্থ, একথা সে সরল মানবের মনে স্থান পাইল না। সে ভাবিল এমন ভাস্বর মূর্ত্তি দেব-শরীরেই সম্ভবে, সুতরাং দেবতা জ্ঞানেই তাহার পূজা করিল। ক্রমে অগ্নি, মরুৎ, বরুণ, প্রভৃতিও পূজার ভাগ পাইলেন। এইরূপে একাধিক দে- বতার পূজায় আর্য্যেরা অনেককাল কাটা- ইলেন ; যথন যে দেবতার প্রভাব প্রকটিত হইত তাঁহাকেই তথন হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা বলিয়া মনে করিতেন। পরে যতই তাঁ- হাদের বুদ্ধির বিকাশ হইতে লাগিল, ততই সর্ব্বশক্তিমান্ একাধিক চেতনের কল্পনা অসমঞ্জস বোধ করিতে লাগিলেন। ত- থন দর্শনের দিকে এক পদ অগ্রসর হইয়া আপনার প্রতি আপনি প্রশ্ন করিলেন— যথন জগৎস্রষ্টা পৃথিবীর সৃষ্টি ও আকাশের বিস্তার করিলেন, তথন তাঁহার অবলম্ব কি ছিল ; জগতের উপাদানই বা কি ছিল এবং কোথা হইতে আসিল ?* এ প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নকর্ত্তা স্বয়ং এইরূপে দিতেছেন— সেই এক (অদ্বিতীয়) জ্যোতির্ম্ময় পুরু- ষের চক্ষুঃ সর্ব্বত্র পড়িতেছে ; মুখ সর্ব্বত্র বিরাজমান,বাহু সর্ব্বত্র প্রসারিত হইতেছে, চরণ তাঁহার সর্ব্বত্র যাইতে পারে। তিনি বাহুযুগলে পৃথিবীর সৃষ্টি ও পদযুগলে আকাশের বিস্তার করিতেছেন †। এ উ-

*কিংস্বিদাসী দধিষ্ঠান মারম্ভণং কতমস্বিৎ কথাসীৎ।
যাতোভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্ম্মা বিদ্যামৌ- র্ণোন্মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ॥
ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ৮০ সূত্র।

† বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো—বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সংবাহুভ্যাংধমতি সংপতত্রৈ দ্যাবাভূমী- জনয়ন্ দেব একঃ॥
ঋগ্বেদ ১০ মং ৮১ সূং।
শ্লোকের অর্থ অধিকতর পরিস্ফুট হইবে বলিয়া অনুবাদে বিশ্বতশ্চক্ষুঃ প্রভৃতি বি-

স্তরে ধর্ম্ম ও দর্শন উভয়ই তুল্যরূপে উপকৃত। ধর্ম্মের সহিত এ উত্তরের সংশ্রব দেখান অদ্যকার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, দর্শন ইহা হইতে শিখিল যে অনাবশ্যক কোন তত্ত্বেরই গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্বশক্তিমান একচেতন দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধি হইলে তদধিক চেতন মানিব না—অপ্রামাণিক বা প্রামাণিক বিরোধী কথা মানিব না। কালে বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এ দুইই ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের একায়ত্ত করিয়া লইলেন তাঁহারা যেভাবে বেদের ব্যাখ্যা করিতেন, কাহারও তাহাতে আপত্তি করার ক্ষমতা ছিল না। এইরূপে বৈদিক শিক্ষা অনুসন্ধিৎসার বিরোধিনী হইয়া দাঁড়াইল, স্বাধীন চিন্তার নাম লুপ্ত হইল, মানসিক উন্নতির গতি রুদ্ধ হইল। আমাদের দেশের একজন সুযোগ্য পণ্ডিত লিখিয়াছেন—"তাৎকালিক ব্রাহ্মণগণের মন বেদের ছাঁচে গঠিত হইয়াছিল। ভারতের পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা বেদের বড় ভক্তি করিতেন। ধর্ম্ম বা রাজনীতি, ব্যবস্থা বা দর্শন, সকল বিষয়ে বেদই প্রমাণ ছিল; বেদের মতের প্রতিবাদ করে কাহার সাধ্য, সেখানে যুক্তি বা ভূয়োদর্শনের প্রভুতা ছিল না" *। একথা সহজেই বুঝাযায় যে যেখানে শাসন অত্যন্ত প্রখর, সেইখানেই আদৌ অসন্তোষ ও পশ্চাৎ প্রতিবাদ দেখা দেয়; শেষে এমন এক সময় আসিয়া উপস্থিত হয় যে তখন শাসন আর কার্য্যকর হয় না। যাজকেরা তাহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করাতে ইউরোপে লুথরের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে তো কতিপয় দিবসের কথামাত্র। ভারতে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা শাক্যসিংহ ব্রাহ্মণগণের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। ভূত করুণার প্রবল প্রণোদনায় তিনি যজ্ঞবিধির বিরোধী হইলেন। পর-দুঃখ মোচনে জীবন উৎসৃষ্ট করিয়া জগতে নূতন ধর্ম্মের প্রচার করিলেন। সহস্র সহস্র লোক তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, ব্রাহ্মণেরা বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। শাক্যসিংহ যে প্রণালীতে তাঁহার মতের সমর্থন করিতে লাগিলেন, তাহার প্রতিবাদ করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত হইয়া পড়িল—ব্রাহ্মণগণের ইচ্ছা তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হউন, সকলের

শেষণ গুলির ভাবার্থমাত্র গৃহীত হইল।

* The Brahminical mind was formed in the mould of the Vedas. Indian scholars were from the earliest times possessed with the highest notions of reverence for those writings. In all questions, whether political or religious, dogmatic or philosophical, the authority of the Vedas was conclusive. None dared to contradict what they inculcated. No appeal to reason or experience lay from their verdict.

Dialogues on the Hindu Philosophy Page 41

উপর তাঁহাদের একাধিপত্য অপ্রতিহত থাকুক, আর শাক্য সাম্যবাদ তাঁহার ধর্ম্মের মূল বলিয়া ঘোষণা করিলেন—ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের মতের প্রতিবাদ করা মহা পাপ মনে করিতেন, এদিকে শাক্য যার তার সহিত ধর্ম্মমত নিয়া বিচার করিয়া সুখী হইতেন, একদল শক্তির অপর যুক্তির উপর নির্ভর করিতেন, একের চেষ্টা দণ্ডে ও অপরের চেষ্টা বাক্যে লোকের মনোহরণ করেন, সুতরাং সে সময়ে জয়শ্রী শাক্যের পক্ষপাতিনী হইলেন বড় বিচিত্র কথা নহে। ইউরোপে দ্বাদশ চার্লস দ্বারা বারবার পরাজিত হইয়া রুষেরা পরাজয় করিতে শিখিল ; ভারতে আর্য্য ধর্ম্মের দশাও তাহাই হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধগণের নিকট যুক্তিবলে পরাজিত হইয়া সেই যুক্তি বলেই আপন প্রভুতা পুনঃ সংস্থাপিত করিলেন। পণ্ডিতবর শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—'বৌদ্ধধর্ম্মের মূলে কোন প্রকার শ্রুতি ছিল না, বা অনুকূল কোনরূপ ঐতিহ্যও ছিল না, এজন্য উহার স্থায়িত্ব যুক্তি বলের উপরই নির্ভর করিত, সুতরাং দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের চর্চ্চা তৎসম্বন্ধে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল *। যতক্ষণ বেদের অভ্রান্ততার প্রতি লোকের বিশ্বাস আছে, ততক্ষণই না হয় বিতর্ক ও সন্দেহ নিরাকরণে বেদই প্রভু, কিন্তু যে খানে শ্রুতিতেই সন্দেহ সেখানে যুক্তি ভিন্ন মীমাংসা হইতে পারে না। অতএব ন্যায় ও মনোবিজ্ঞানের চর্চ্চা বৌদ্ধ ধর্ম্মের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল। এইরূপে ভারতে দর্শনের চর্চ্চা প্রথম আরম্ভ হয় †। কিন্তু পাঠক ইহার বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাবই যে ভারতীয় দর্শনের প্রকৃত উন্নতির কারণ একথা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।

* শাক্যসিংহের পূর্ব্বে দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের চর্চ্চা ভারতে ছিল কি না সে বিষয়ে সংশয় হইতে পারে ; থাকিলেও বোধ হয় মহাত্মা সক্রেটিসের পূর্ব্বে গ্রীস দেশে যেমন ছিল তেমনই ছিল। কিন্তু

† "...it certainly had no divine revelation to plead for its support, nor could it appeal to any tradition in its favour. It could only stand on its rational pretentions. The study of philosophy and metaphysics was therefore absolutely needed for its very existence. So long as men believed in the infallibility of the Veda, they could appeal to its texts for the decision of controversies and solution of doubts. But when revelation was ignored, disputes could only be settled by the verdict of reason. The necessities of Buddhism rendered the cultivation of Logic and Metaphysics absolutely indispensable and thus were the first attempts at philosophy called forth in India.

Dialogues. Pages 47-48.

পরিণাম কি হইল দেখুন। যুক্তিবলে বৌদ্ধেরা পরাজিত হইল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণগণেরও নয়ন উন্মীলিত হইল, তাঁহাদের মনে যে নূতন ভাব প্রবেশ করিল তাহার সহিত বৈদিক শিক্ষা ভালরূপ মিশিল না। তাঁহাদের ইচ্ছাসত্ত্বেও মন কিন্তু বেদের প্রতি আর তেমন আসক্ত রহিল না; থাকিতেও পারে না। যাহার মন স্বাধীন-চিন্তার মাধুরী একবারও অনুভব করিয়াছে, চিন্তার রাজ্যে সে আর পর-প্রদর্শিত পথে নিয়ত থাকিতে পারে না। যে দাস স্বাধীনতার স্বর্গীয় সুধার স্বাদ একবার মাত্র গ্রহণ করিয়াছে, বশ্যতা আর তাহার ভাল লাগে না। ব্রাহ্মণেরাও বৌদ্ধগণের সহিত বিচার সময়ে বৈদিক নিয়মের অবরোধ অতিক্রম করিয়া যুক্তির প্রশস্তপথে বিচরণ করিয়াছেন; এক্ষণেও তাঁহাদের সেই পথই ভাল লাগিল ও যাহাতে সেই পথ আরও পরিষ্কৃত হয় তাহারই যত্ন করিতে লাগিলেন *। সেই যত্নের ফল ন্যায়,সাংখ্য, প্রভৃতি ছয় দর্শন। ভারতবাসী এখনও ন্যায়শাস্ত্রের আদর অক্ষুণ্ণ

7 "The prevalence of Buddhism had convinced the Brahmins of the use of metaphysics in refuting objections and of the risks they ran, of incurring the contempt of the community by confixing their attention to the simple ritual of the Vedas. The Nyaya with its orderly array of scientific terms, its physics, logic and metaphysics, was manifestly fitted to train and quicken the intellectual powers. While heresy had been rampant, the vast majority of the Brahminical order were unable to think for themselves, or unlearn prejudices already instilled into their minds. The reasons for which Sudras were relieved from the task of intellectual exercises, were more and more applicable to the twice born classes. Traditional teaching and the prescribed ritual, received with implicit submission were fast incapacitating them for vigorous mental labour. If the servile tribes had a routine of duties made ready for them, the higher grades had also *their* routine, not indeed of servile attendance on human superiors, but of endless rites and ceremonies, no less enslaving to the mind. As far as intellectual activity was concerned, the distniction between Brahmins and Sudras had become almost nominal. The author of the Nyaya would no doubt have the satisfaction of believing that his new system would arrest the progress of heresy, and prevent the gradual decline of the orthodox intellect. If

রাখিয়াছে *, আর থিওসফির অনুগ্রহে প-

the Brahmin's mind continued to be stinted by the discipline of the Vedas in the same manner as the Sudra's was by the authority of the twice-born, what real difference would there remain in point of mental freedom between the highest and the lowest tribes? Implicit submission of intellect was exacted from both. Was it at all wonderful then that heresy stalked abroad, and that many Brahmins had themselves fallen into the snare? Could minds of any activity acquiesce in the above restrictions? Must they not meditate upon the wonders of the Creation, except as the antiquated Vedas directed them? And must they always interpret the Vedas in the monotonous ways taught by the old Rishis? Orthodox philosophers accordingly came forward to supply the craving of the Brahminical mind, without endangering the stability of the Brahminical order." Dialogues Pages 50-51

* নব্য যুবক গণের কথা আমরা বলিতেছি না; আর্য্য শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের ও তাঁহাদের গুরু ইউরোপীয়দের মত ভিন্ন নহে। এ বিষয়ে বারান্তরে কিছু বলিবার রহিল।

তগুলিরও আদর আবার হইতেছে এবং আর্য্যজাতি একেবারে লুপ্ত না হইলে বেদান্তেরও গৌরব যাইবে না। কিন্তু হায়! দর্শনশ্রেষ্ঠ সাংখ্যের কি দুর্দ্দশাই না ঘটিয়াছে। নব্য যুবকগণের অনেকেই বন্ধু বান্ধবের নিকট সাংখ্যের পক্ষপাতী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হন, পাছে কেহ নাস্তিক মনে করেন!! ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রত্যেকখানিই দুইভাগে বিভক্ত; প্রথম ভাগে স্বপক্ষ সংস্থাপন ও পরভাগে পরপক্ষ নিরাকরণ করা হইয়াছে। পর-মত দূষণে কপিল যেসকল যুক্তির অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপি কেহ তদতিরিক্ত কিছু বলিতে পারেন নাই, এইজন্য কপিলকৃত দর্শনের ঐ অংশ সর্ব্বত্র সমাদৃত। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই পূর্ব্বাংশের কেহ নামও লয় না, বা লইলেও নিন্দা করিবে বলিয়াই লয়। আমাদের বিশ্বাস কপিল প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা ও গুণবত্তার পরিচয় স্বপক্ষ সংস্থাপনেই দিয়া গিয়াছেন। আমাদের এবিশ্বাস ভ্রমাত্মক হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে; কিন্তু পাঠক একবার মহর্ষি বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করুন, মহাপুরাণ সকলে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা একবার পড়িয়া দেখুন †;

† দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বিষ্ণুপুরাণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব—

অব্যক্তং কারণং যত্তৎ প্রধানমৃষিসত্তমৈঃ; প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মানিত্যং সদসদাত্মকং ১৯। অক্ষয়ং নান্যদাধার মজেয়মজরং ধ্রুবং, শব্দ স্পর্শ বিহীনং তদ্রূপাদিভিরসং

দেখিবেন সে অবিকল কপিলেরই কথা। কবি কেশরী কালিদাস দেবতার মুখে আদি দেবের যে গুণগান করাইয়াছেন তাহাতে সাংখ্য মত সমর্থিত হইয়াছে *, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে সাংখ্য মত খণ্ডন সময়ে কপিলের সর্ব্বজ্ঞতা ও যুক্তি-গাঢ়তার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এক কালে সাধারণের বিশ্বাস ছিল সাংখ্যের তুল্য জ্ঞান নাই আর যোগের তুল্য বল নাই; অধিক কি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন "যোগীর মধ্যে আমিই যোগীশ্বর কপিল †।' পুরাকালে সাংখ্যের যেমন আদর ছিল, এখন তেমনই অনাদর হইয়াছে—আমরা হতভাগ্য, তাই যাহা কিছু আমাদের গৌরবের ছিল, সে সকলই লুপ্ত হইতে চলিল। কপিল কি কোন গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন? আর সে ভ্রম কি অধুনা জন-সমাজে প্রকাশিত হইয়াছে? না, তাহা নহে। তবে এ অনাদরের কারণ কি? আমার বোধহয় ইহার প্রকৃত কারণ সূত্র গুলির রচনা প্রণালী; সে প্রণালী এমনই জটিল যে ভাষ্য ভিন্ন অর্থবোধ হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। প্রাচীন মহর্ষিরা তাঁহাদের মনোগত ভাব সহজ কথায় বলিতেন না; বোধহয় ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে জ্ঞানদান তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না ‡। পাঠক মনে করুন যেন দেশ জলময় হইয়াছে,চারিদিকে জলছাড়া আর কিছুই নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে দুই চারি ক্রোশ দূরে দূরে পথের পার্শ্বের দুই একটী উচ্চ বৃক্ষের অগ্রভাগ পদ্ম পত্রের মত ভাসিতেছে; এখন স্থান হইতে স্থানা-

হৃতং ২০। ত্রিগুণং তজ্জগদ্‌যোনি রনাদি প্রভবাপ্যয়ং; তেনাগ্রেসর্ব্বমেবাসীদ্ব্যাপ্তং বৈ প্রলয়াদনু। ২১প্রধানতত্ত্বমুদ্ভূতং মহান্তং তৎ সমাবৃণোৎ। সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্। ৩৪। বৈকারিকস্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চৈব তামসঃ, ত্রিবিধোঽয়মহঙ্কারো মহত্তত্ত্বাদজায়ত। ৩৫। ভূতেন্দ্রিয়াণাং হেতুঃসত্রিগুণত্বান্মহামুনে,যথা প্রধানেনমহান্ মহতা স তথাবৃতঃ। ৩৬। তন্মাত্রাণ্য বিশেষাণি অবিশেষাস্ততোহিতে, নশান্তা নাপিঘোরাস্তে নমূঢ়াশ্চাবিশেষিণঃ। ৪৪। ভূততন্মাত্রসর্গোঽয় মহঙ্কারা ত্তু তামসাৎ তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যাহুর্দ্দেবা বৈকারিকাদশ। ৪৫।

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অধ্যায়।

* ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থ প্রবর্ত্তিনীং, তদ্দর্শিন মুদাসীনং ত্বামেব পুরুষং বিদুঃ। কুমার, দ্বিতীয় সর্গ।

† অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং, যোগিনাং কপিলো মুনিঃ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা দশমঅধ্যায়

‡ কেহ কেহ বলেন সূত্র গুলি অল্পাক্ষর হইলে সহজে মনে থাকে, বলিয়া ঐ ভাবে গ্রথিত হইয়াছে একথা এস্থলে কতদূর সংলগ্ন হইতেছে বুঝিতে পারি না; কেননা পাণিনি সর্ব্ববর্ম্মা প্রভৃতি মুনিরা যে সকল সূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, সে গুলিও অল্পাক্ষর অথচ তেমন জটিল নহে। কপিল বা বেদব্যাস ইচ্ছা করিলে অপেক্ষাকৃত সহজ ভাষায় অল্পাক্ষর সূত্র রচনা করিতে পারিতেন না এরূপ মনে করা অনুচিত।

স্তরে যাইতে হইলে,সন্তরণ ক্ষমতা থাকিলে, ঐ একটী একটী বৃক্ষের শিরোদেশে বিশ্রাম করিয়া যাইতে পারেন। সূত্র গুলিও ঠিক সেই সকল বৃক্ষাগ্রের মত ; আচার্য্য শিষ্যদিগকে সন্তরণ শিক্ষাদিলে তাঁহারা অনায়াসে এক সূত্র হইতে অন্য সূত্রে যাইতে পারিতেন ; অনভিজ্ঞের নিকট কিন্তু সে গুলি অসম্বদ্ধ বাক্যাবলী বলিয়া বোধ হইত। বস্তুতঃ সূত্র হইতে যাহা পাওয়া যায়, তদ্ভিন্ন আচার্য্যের মুখে অনেক কথা ছিল; সেই কথা গুলি আমরা আর শুনিতে পাই না; কাযেই সূত্র গুলিরও আদর বুঝি না। পরমত খণ্ডনে লোকের নিকট প্রতিপক্ষের অসারতা প্রতিপাদনই উদ্দেশ্য ; সুতরাং সেখানে রহস্য রাখিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত হইয়া পড়ে,এই জন্যই সেখানে সকল কথা সুন্দর সজ্জিত আছে, ভাষ্য পড়িলেই ভাব বুঝিতে পারা যায়। পাঠক,কপিলোক্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়া আপনাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব মনে করিয়াছি। যাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তাঁহাদের জন্য আমার এ প্রয়াস নহে যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ অথচ দুই একখানি ইংরেজী গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া কথায় কথায় আর্য্যব্যবহার ও আর্য্যশাস্ত্রের নিন্দা করিতে পারিলে জীবন সার্থক মনে করেন তাঁহাদের জন্যই আমার এ চেষ্টা ; এ চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইব এরূপ আশা নাই, কৃতকার্য্য হওয়ার ক্ষমতাও নাই। তবে যদি আমার কথায় একজনের মনেও সেই লুপ্তপ্রায় শাস্ত্রগুলি মূলে পাঠ করিবার কৌতূহল জন্মে,তবেই পরিশ্রম সফল মনে করিব। আমার উদ্দেশ্য মহৎ জানিয়া পাঠক এ বাচালতা মার্জ্জনা করিবেন।

কপিলের আবির্ভাব সময় নিরূপণ সহজ নহে। সম্ভবতঃ তিনি গোতমের পর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাব সময়ে সৃষ্টি সম্বন্ধে বেদান্তের মতই সর্ব্বত্র সমাদৃত ছিল। উপনিষদের মতে 'ঊর্ণনাভ যেমন আপন তন্তুর বিস্তার ও প্রতিসংহার করে,ওষধি সকল যেমন ভূমিশরীরে উৎপন্ন হয়, জীবিত পুরুষের শরীর হইতে যেমন কেশ ও লোম জন্মে,তেমন জগৎ অবিনাশি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন' * ও প্রলয়ে সেই ব্রহ্মেই লীন হয়। ভূপৃষ্ঠে যে ওষধি জন্মে সেভূমি হইতেই বর্দ্ধিত হয় সুতরাং ভূমিরই অংশ বিশেষ,ও ভূমিই তাহার উপাদান বলিব,আবার ঊর্ণনাভ তন্তুর সংহার করে না, প্রতিসংহার করেমাত্র। অতএব এই দৃষ্টান্ত কএকটি হইতে দুইটি কথা পাওয়া যাইতেছে—প্রথম, ব্রহ্মই জগতের উপাদান ; দ্বিতীয়,প্রলয়ে জগৎ বস্তুতঃ বিনষ্ট না হইয়া ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হয় মাত্র। সৃষ্টির এ ব্যাখ্যা কপিলের মনে ভাল লাগিল না, তিনি অকুতোভয়ে তাহার প্রতিবাদ করিলেন। শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য হইতে আমরা সে প্রতিবাদের কিয়দংশ নিম্নে গ্রহণ করিয়া আমাদের প্রথম প্রস্তা-

---

* 'যথোর্ণনাভিঃসৃজতে গৃহ্নতে চ, যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃপুরুষাৎ কেশ লোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহবিশ্বং॥

বের উপসংহার করিব 'যদি এই স্থূল (gross), সাবয়ব (organized) অচেতন, পরিচ্ছিন্ন (finite), ও অশুদ্ধ জগদাত্মক কার্য্যের উপাদান কারণ ব্রহ্ম কল্পনা করাযায়, তাহাহইলে প্রলয়ে প্রতিসংসৃজ্যমান কার্য্য (জগৎ) কারণের (ব্রহ্মের) সহিত অভিন্ন ভাবে থাকিয়া কারণকেও স্বকীয় ধর্ম্ম দ্বারা দূষিত করিবে সুতরাং কারণেও কার্য্যবৎ অশুদ্ধি প্রভৃতি দোষ-বর্ত্তিবে ; অতএব সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ উপনিষদের একথা সংলগ্ন হইতেছে না। অপিচ ব্রহ্মে লীন হওয়াতে বস্তুর বিলক্ষণতা-প্রতিপাদক ধর্ম্মগুলিরও বিলয় হইয়াছে, সুতরাং পুনরুৎপত্তি সময়ে 'এ ভোক্তা' 'এ ভোগ্য' এভাবে সৃষ্টি হইতে পারে না, কেননা তদ্রূপ প্রভেদ জন্মাইবার উপযুক্ত কারণ তখন বর্ত্তমান নাই। সুতরাং এপক্ষেও উপনিষদের কথা অসংলগ্ন হইতেছে। আর ভোক্তৃগণ পরব্রহ্মে লীন হওয়াতে ভোগের কারণ যে কর্ম্মাদি, তৎসমস্তেরও লয় হইয়াছে, সুতরাং এখন পুনরুৎপত্তি কল্পনা করিলে মুক্তজীবেরও পুনরুৎপত্তি ঘটিয়া উঠে। ইহাও উপনিষদের কথা অসংলগ্ন বলিবার অন্যতম কারণ। যদি বল প্রলয়েও জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ভাবেই থাকে, তাহাহইলে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রলয়ই হইল না এবং কার্য্য জগৎ ও তৎকারণ ব্রহ্ম এ দুয়ের অভেদ ঘটিল না (সুতরাং তোমার অদ্বৈতবাদ নিরস্ত হইল)। অতএব উপনিষদের কথা সর্ব্বপ্রকারেই অসংলগ্ন' *। কপিলের আপত্তি ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের উত্তর সবিস্তার উদ্ধৃত করিতে গেলে আমাদের এ প্রস্তাব একখানি বৃহদায়তন গ্রন্থে পরিণত হইয়া পড়ে, বিশেষ কপিলের পরমত নিরাস আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। স্থূলকথা এই, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তার্কিক চূড়ামণি শঙ্করাচার্য্যও কপিলের তেজস্বিনী প্রতিভার নিকট হীনপ্রভ; তাঁহার উত্তর পড়িয়া আমরা প্রীত হই নাই।

শ্রীসা, রা—

* "যদি স্থৌল্যসাবয়বত্বাচেতনত্ব পরিচ্ছিন্নত্বাশুদ্ধ্যাদি ধর্ম্মকং কার্য্যং ব্রহ্মকারণকমভ্যুপগম্যেত, তদাঽপীতৌপ্রলয়ে প্রতিসংসৃজ্যমানং কার্য্যংকারণেঽবিভাগমাপদ্যমানং কারণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণদূষয়েদিত্যপীতৌ কারণস্যাপি ব্রহ্মণঃ কার্য্যস্যেবা শুদ্ধ্যাদিরূপতাপ্রসঙ্গাৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্মজগতঃ কারণ মিত্যসমঞ্জসমিদ মৌপনিষদং দর্শনং অপিচ সমস্তস্য বিভাগস্যাঽবিভাগপ্রাপ্তেঃ পুনরুৎপত্তৌ নিয়মকারণাভাবাৎ ভোক্তৃভোগ্যাদি বিভাগেনোৎপত্তির্নপ্রমপ্নাতি ইত্যসমঞ্জসং। অপিচ ভোক্তৃণাং পরেণ ব্রহ্মণা? বিভাগংগতানাং কর্ম্মাদি নিমিত্তপ্রলয়েঽপি পুনরুৎপত্তৌ অভ্যুপগম্যমানায়াং মুক্তানামপি পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসং। অথেদং জগদপীতাবপি বিভক্তমেব পরেণব্রহ্মণাবতিষ্ঠেত, এবমপ্যপীতিরেবন সম্ভবতি, কারণাব্যতিরিক্তঞ্চ কার্য্যংনসম্ভবতি ইত্যসমঞ্জসমেব।" শাঙ্কর ভাষ্য দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ—৮ সূং

"প্রাচীন ও আধুনিক স্ত্রী শিক্ষার প্রভেদ।"

প্রাচীন ভারতের স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালীর সহিত বর্ত্তমান কালের স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী তুলনা করায় অনেক উপকার আছে; কিন্তু এবিষয় আলোচনা করিতে হইলে প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা সম্যক জানা আবশ্যক। প্রাচীন ইতিহাসভিন্ন এবিষয় জানিবার অন্য উপায় নাই; কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসই বা প্রকৃত রূপ কোথায় মিলিবে? রামায়ণ মহাভারতাদিকে সম্পূর্ণ ইতিহাস বলিতে পারি না, —কুমার শকুন্তলা ইত্যাদি নাটক ও খণ্ড কাব্যাদিকে ইতিহাস বলিতে পারি না; তবে প্রাচীন স্ত্রীশিক্ষার স্পষ্ট বিবরণ কোথায় পাইব? তৎসাময়িক কাব্য ও নাটকাদিতে এবং রামায়ণ মহাভারতে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়,তাহাই একআধটুকু জানি মাত্র। কিন্তু ভাবান্তরিত গ্রন্থে অধিক জানিবার আশা বৃথা; সংস্কৃতানুশীলন ব্যতীত সম্যক অবগতি কখনই সম্ভবে না।

যাহা হউক ছেলেবেলা যখন উপকথা শুনিবার জন্য বৃদ্ধা ঠাকুরাণীদিদিদের চরকা ঘুরান ও মালা যপার বিঘ্ন হইয়া তাহাদের নিকট উপকথা শুনিতে বসিয়াছি, তখন দুচারিটি গল্প শুনিয়াছি। সেই উপকথা গুলির মধ্যে সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী খনা ইত্যাদি ভারতললাম রমণীগণের বিষয় ছিল, তাই মনের সেই কাচা ছাঁচে তাহা রহিয়া গিয়াছে,আর ভুলা যায় না; তবে আজি তাই বলিতেছি। আর আমাদের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বকালবর্ত্তিনী অলক্তরাগরঞ্জিতচরণা মর্জ্জনসুশোভিতদশনা অঙ্গনাগণের সহিত নব্যভারতের এষ্টকিং ও বুটপরা চাঁদবদন পাউডারভরা বিবিঅনুকারিণী রমণীগণেরও কি তুলনা করিতে হইবে? তবে মানে মানে আমি বিদায় হই, তাহাত প্রাণান্তেও পারিব না, কে অতগুলি সুশিক্ষিত স্ত্রীপুরুষের গালি খাইতে যাইবে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক হইয়া।

যাউক এসকল ফাল্‌তো কথার সময় নাই,আসল কথা আরম্ভ করা যাউক। প্রথমতঃ প্রাচীনকাল কি তদ্বিষয় আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমি বৈদিক ও পুরাণকাল এবং বর্ত্তমান সময়ের (স্ত্রীশিক্ষা পুনঃ প্রচলন হওয়ার) পূর্ব্ববর্ত্তী কালকেই প্রাচীন নামে নির্দ্দেশ করিলাম। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীশিক্ষা কাহাকে বলে দেখা উচিত। আমার মতে কেবল বিদ্যা শিক্ষাকেই স্ত্রীশিক্ষা বলা যাইতে পারে না। বিদ্যা, শিল্প, গৃহকার্য্য, সন্তানপালন, পিতা, মাতা, শ্বশ্রূ, স্বামী ইত্যাদির সেবা; অতিথিসৎকার ইত্যাদি স্ত্রীলোকের সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়কেই স্ত্রীশিক্ষা বলা যাইতে পারে। অত-

এব প্রাচীনকালে এসমস্ত বিষয়ে স্ত্রীগণ কিরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেন, তাহাই এস্থলে উল্লেখযোগ্য মনে করি।

অনেকের মনে এই প্রকার সংস্কার আছে যে, ইংরেজদের দৃষ্টান্তানুসারেই স্ত্রীশিক্ষা প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ; পূর্ব্বকালে ভারতে স্ত্রীশিক্ষা ছিল না, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভ্রম। প্রাচীন ঋষিবচনে দেখ কি লিখা আছে "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।" কন্যাকে পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে। এই বচনটির ভাব অনেকে হয়ত কল্পনা করিতে পারেন যে, শিক্ষাশব্দে বিদ্যাশিক্ষা বুঝাইল তাহার প্রমাণ কি ? বাস্তবিক তাহার কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু বাক্যের প্রমাণ তাহাদের কার্য্য।

উল্লিখিত আছে দুরূহ শাস্ত্র বেদ ভিন্ন স্ত্রীগণ সমুদয় শাস্ত্রেই অধিকারিণী ; কিন্তু অন্যত্র দেখা যাইতেছে যে, গার্গি প্রভৃতি কতিপয় ঋষিপত্নী বেদেও সম্পূর্ণ অধিকারিণী ছিলেন ; মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য অনেক সময় স্ত্রীলোকদিগকে বেদে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিত নাটকে দেখা যায়, একজন তাপসী বেদ অধ্যয়ন জন্য বাল্মীকি মুনির আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে গমন করিতেছেন ; তাঁহারই কৃত মালতী মাধব নাটকে কামন্দকী নাম্নী একটি অসাধারণ স্ত্রীলোকের চরিত্র বর্ণিত আছে, তিনি ভূরিবসু নামক রাজমন্ত্রীর সহাধ্যায়িনী ছিলেন ; এস্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, কামন্দকী বৌদ্ধা ছিলেন, কিন্তু, তিনি যখন লিখা পড়া শিখিয়াছিলেন তখন বৌদ্ধা ছিলেন না।

মালবীকাগ্নিমিত্র নাটকে একটি বিদুষী রমণীর উল্লেখ আছে, তাহাকে লোকে পণ্ডিত কৌশিকী বলিত।

অতি প্রাচীন সময়ে স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতিই সমানরূপ বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিতেন এরূপ প্রমাণের অভাব নাই, পার্ব্বতী বাল্যকালেই বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, বিশ্বদেবী গঙ্গা বাক্যাবলী নামক একখানি স্মৃতিসংগ্রহ রচনা করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীদেবী প্রণীত মিতাক্ষর টীকা আজিও প্রচলিত আছে।

লীলাবতী ও খনা অসামান্যা বিদ্যাবতী ছিলেন, তাঁহাদের নাম চিরকাল থাকিবে সন্দেহ নাই, খনার বচন সকল সর্ব্ব দেশে প্রচলিত আছে ; লীলাবতী অঙ্কশাস্ত্রে কিরূপ অসাধারণ ব্যুৎপত্তিশালিনী ছিলেন, তাহা সকলেই জানেন।

বল্লালসেনের পুত্রবধূ লক্ষ্মণসেনের মহিষী কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, এরূপ প্রবাদ আছে ; তিনি একদা স্বামীবিরহে কাতর হইয়া উচ্ছিষ্ট পাত্র সকল ধৌত করিতে করিতে মাটিতে লিখিয়াছিলেন "পততাবিরতং বারির্নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা, অদ্য কান্ত কৃতান্তোবা দুঃখস্যান্তং করিষ্যতি।" বল্লালসেন তাহা দেখিতে পাইয়া পুত্রকে বাড়ী আনাইয়াছিলেন।

শঙ্করবিজয়গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে, শঙ্করাচার্য্য মণ্ডন মিশ্রের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলে মিশ্রপত্নী সারসবাণী

তাঁহাদের বিচারের মধ্যস্থা হইয়াছিলেন; প্রবাদ আছে কর্ণাটদেশের রাজমহিষী কবিত্ব বিষয়ে মহাকবি কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিলেন।

পাণ্ডবভার্য্যা দ্রৌপদী অসাধারণ জ্ঞানবতী রমণী ছিলেন; তিনি বনমধ্যে যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতি বিষয়ে সর্ব্বদা পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন; তাঁহারই পরামর্শে অর্জ্জুন ইন্দ্রালয়ে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া অদ্বিতীয় বীর বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে রমণীগণ গার্হস্থ বিষয়ে কিরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন, তদ্বিষয় পুরাণাদি আলোচনা করিলে বিলক্ষণ অবগত হওয়া যায়, স্ত্রীলোকের পক্ষে সমস্ত গৃহকার্য্যে সুশিক্ষিতা হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য ছিল, বহ্নিপুরাণে তাহার একটি সুন্দর সংগ্রহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—

"সাশুদ্ধা প্রাতরুত্থায় নমস্কৃত্য পতিস্বরং,
প্রাঙ্গণে মণ্ডলংদদ্যাৎ গোময়েন জলেন বা,
গৃহকৃত্যং চ কৃত্বাচ স্নাত্বা গত্বা গৃহংসতী,
সুরং বিপ্রং পতিং নত্বা পূজয়েদ্ গৃহদেবতাং
গৃহকৃত্যং সুনির্ব্বর্ত্ত্য ভোজয়িত্বা পতিংসতী
অতিথিন্ পূজয়িত্বাচ স্বয়ং ভুঙ্ক্তে সুখংসতী

এই সমস্ত ব্যতীতও স্ত্রীলোকের অনেক কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। স্ত্রীলোক সর্ব্ববিষয়ে নিষ্পাপী হইবে; শ্বশ্রূ শ্বশুর পিতা মাতা সেবা, দেবরাদির প্রতিপালন ইত্যাদি তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত; তাঁহাদিগকে সমস্ত গৃহকার্য্যাদি যাহাতে সুনির্ব্বাহ করিতে পারেন তদনুরূপ শিক্ষা দেওয়া হইত।

পাণ্ডবভার্য্যা দ্রৌপদী রাজমহিষী হইয়াও গৃহকার্য্য বিষয়ে বিলক্ষণ সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

প্রাচীনকালীন রমণীগণের প্রধান শিক্ষণীয় ও কর্ত্তব্য বিষয় ছিল, পতিসেবা, দ্বিতীয় গৃহকার্য্যাদি। কিন্তু সন্তানপালন রূপ কঠিন কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে বিশেষ কিছুই শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায় না, কেবল মনুর একটি বচনে দৃষ্ট হয় যথা—

"উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনং।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনং॥"

দেখা গেল যে, সন্তান পালন কার্য্যের ভারও স্ত্রীলোকের হস্তে অর্পিত ছিল।

কবিদিগের সময়ে স্ত্রীগণের আরও একটি বিদ্যা শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার নাম কলাবিদ্যা; সমস্ত সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগকেই এই বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইত।

ঋষিদিগের সময়ে এই সকল বিলাসিতা ছিল না, কিন্তু কবিদিগের সময়ে যখন আর্য্যগণ পূর্ব্বস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া বিলাসসুখে মগ্ন হইয়াছিলেন, তখনই নৃত্য গীতাদি কলাবিদ্যা রমণীগণকে শিক্ষা দেওয়ার প্রথা সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়া উঠিয়াছিল। মহর্ষি ব্যাস একস্থলে লিখিয়াছেন,—

"ছায়ে বানুগতাস্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসী বা দিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ॥"

কিন্তু কালিদাসের রঘুবংশের অজবিলাপ প্রতি দৃষ্টিপাত কর দেখিবে অজরাজ স্বীয় প্রিয়তমা মহিষী ইন্দুমতীর শোকে বিলাপ করিয়া বলিতেছেন " গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ। করুণাবিমুখেন মৃত্যুনাহরতাত্বাং বদ কিং নমেহৃতং ॥"

এই দুইটি শ্লোকের মধ্যে প্রথমটিতে ছায়েবানুগতাস্বচ্ছা, দ্বিতীয়টিতে ললিতে কলাবিধৌ এই বিশেষণটি অধিক আছে, ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে ঋষিদিগের সময়ে নৃত্য গীতাদি শিক্ষা চলিত ছিল না। আবার ছায়েবানুগতা এই বাক্যটিতে দেখা যাইতেছে তৎসময়ে নারীগণ স্বামীর সহিত সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারিতেন।

প্রাচীন ভারতীয় অঙ্গনাগণ যেরূপ অতিথিসেবা, স্বামীসেবা, গৃহকার্য্যাদি শিক্ষা করিতেন, সেই প্রকার তাঁহারা তৎসমুদয় কার্য্যে পরিণত না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কেন না সে কালের নিয়মই এই ছিল যে, রাজপত্নী হইলেও তিনি স্বামীসেবা ও গৃহকার্য্যাদির ভার দাসদাসীদের হাতে দিয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না।

পূর্ব্বেই দ্রৌপদীর নামোল্লেখ করা গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, তিনি বনমধ্যে দুরবস্থায় পতিত হওয়াতে স্বহস্তে পাকাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন; কিন্তু তাহা ভ্রম, কেন না তিনি অরণ্যে যেরূপ, রাজভবনেও সেরূপ এসমস্ত কর্ত্তব্য পালনে যত্নবতী ছিলেন, পাকবিদ্যায় তিনি অদ্বিতীয়া ছিলেন; ভোজদুহিতা কুন্তিও বালিকাকালে রাজকন্যা হইয়াও অতিথি সেবায় নিরন্তর নিযুক্তা থাকিতেন।

এমন কি, এই বর্ত্তমান কালের একশতবর্ষ পূর্ব্বকালবর্ত্তিনী রমণীগণই স্বহস্তে গৃহকার্য্যাদি ও অতিথিসেবাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, স্বামী,স্বামীর বন্ধু ও পরিবারবর্গ এবং অমাত্যবর্গকে স্বহস্তে ভোজন করাইয়া তৎপর নিজে আহার করিতেন। পুরাণ চর্চ্চা করিলে স্পষ্ট দৃষ্ট হয় যে, পৌরাণিক সময়ে নারীগণ পতির সাংসারিক আয় ব্যয় বিষয়েও চিন্তা করিতেন। স্মৃতিসংহিতায় বর্ণিত আছে যে, সাধ্বী স্ত্রী সমস্ত দিন প্রফুল্লমনে পরিষ্কৃতা থাকিয়া সাংসারিক সমস্ত কার্য্যাদি সম্পন্ন করিবেন এবং এই সমস্ত কার্য্য সুসম্পাদিত হইলে দিবসের শেষভাগে আয় ব্যয় বিষয়ে চিন্তা করিবেন।

স্বামীর ধন রক্ষা বিষয়েও তাঁহারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন, সভ্যতার নবীনালোকে আলোকিত চক্ষে এই চিত্রটি অতি কদর্য্য দেখাইবে সন্দেহ নাই, কেন না স্ত্রীগণ সমস্ত দিন বই কাগজ কলম লইয়া না থাকিয়া সারাদিন ঘরকন্না করিবে, এটি আজি কালি সকলেরই ক্লেশজনক সন্দেহ নাই; কিন্তু তৎকালে এরূপ শিক্ষাই প্রচলিত ছিল, এলে, বিএ, পাশ করাই সে কালকার রীতি ছিল না।

স্বামী, গুরুজন, দেবতা, দ্বিজ, অতিথি পিন্নজীবাদি, এমন কি গৃহপালিত বিড়াল

কুকুরের তত্ত্বাবধান পর্য্যন্ত স্ত্রীবেচারীর করিতে হইত অথচ তাহাদের মধ্যে ২।৪জন আবার প্রচুর জ্ঞানবতী ছিলেন; ইহা প্রাচীন ললনাগণের অল্প গৌরবের বিষয় নয়।

শাস্ত্রে আছে যে, "সাধ্বী স্ত্রী হেতুকী স্ত্রীলোকের সহিত প্রণয় রাখিবেন না' এতদ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে, আজি কালিকার সভ্যদেশবাসী অনেকানেক পণ্ডিতের হেতুবাদ তৎকালে ২।৪ জন রমণীতেও ছিল, এই নাস্তিকতার আমি প্রশংসা করিতেছি এরূপ যেন কাহারও ভ্রম না হয়, স্ত্রীগণ কতদূর চিন্তা করিতে সমর্থা হইতেন তাহাই প্রকাশ করা আমার উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা কিরূপ সম্পন্ন হইতেছে, এবং তাহা প্রাচীন কালের তুলনায় ভাল কি মন্দ তৎসম্বন্ধে দুচারি কথা সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধ্যাপক মহাশয়গণ স্ত্রীলোকের মুখে শুনিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার এসম্বন্ধে লেখনী ধারণ বৃথা? ঈশ্বর করুন কোন সুলেখিকা ভগিনী তাঁহাদের বাসনানুরূপ প্রকৃত বিবরণ প্রদান করেন; আমি কেবল কত গুলি আগর বাগর লিখিতেছি মাত্র। এখনকার স্ত্রী শিক্ষার কোন স্থিরতা দেখিতেছি না। সকলেই আপনআপন রুচি অনুসারে স্ত্রী কন্যার শিক্ষা বিধান করিতেছেন; আমি দেখিতেছি রমণীগণ ছানা ময়দা হইয়াছেন; কাহার হাতে কিরূপ গড়ন প্রাপ্ত হইবেন তাহার কোন স্থিরতা নাই। এক একজন একএক ছাঁচে গড়া হইতেছেন। পূর্ব্ব কালীন নারীগণের ন্যায় তাঁহারা বালিকা কাল হইতে গার্হস্থ্য বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন না; সুতরাং সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে তদ্বিষয়ে নিতান্ত অপটুদৃষ্ট হয়; বালিকাগণ ভাল ভাল গহনা বস্ত্র পরিয়া যথারীতি বালিকা বিদ্যালয়ে আসে যায়, লেখা পড়া যত শিক্ষা হউক না হউক গৃহ কার্য্যাদি কিছুই শিক্ষা হইয়া উঠে না, দশম একাদশ বর্ষ বয়ক্রমে আবার স্কুল ছাড়িয়া বিবাহিতা হইতে হয় এবং সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া তখন হাবু ডুবু খাওয়া সার হয় মাত্র।

আজি কালি যদিও কতিপয় বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বলকারিণী রমণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি দ্বারা ভূষিতা হইয়া বঙ্গ রমণীর গৌরব স্থল হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প, কয় জনের পিতা মাতার অবস্থা তাঁহাদের পিতা মাতার ন্যায়, এবং কয় জনের অভিভাবকের মত তাঁহাদের অভিভাবকের ন্যায় স্থির। কিন্তু ওরূপ শিক্ষা সচরাচর হউক না হউক, গৃহ কার্য্যে অপটু, অথিতি ও গুরুজন সেবায় অধৈর্য্যা রোগীর সেবায় পরাঙ্মুখা কন্যারত্ন প্রস্তুত করিতে অনেক পিতা মাতাই বিলক্ষণ পারগ হইতেছেন। অনেকে মনে করেন কন্যা একটুকু বাঙ্গলা, আধটুকু ইংরেজী দুচারিটি কার্পেটের পেটন তোলা ও একটু আলাপাদি করিতে পারিলেই শিক্ষা দানের একশেষ হইল; 'নারী জীবনের গুরুতর দায়িত্ব কয়জন পিতা মাতা ও কয়জন স্বামী আপন আপন স্ত্রীকন্যাকে

শিক্ষা দিয়া আসেন? প্রাচীন কালীন্ আর্য্য মহিলাদিগের মন যেমন অবিচলিত ছিল, তাহা নবীনাগণের শিক্ষণীয় সন্দেহ নাই। সাবিত্রী সত্যরূপ জানিলেন যে এক বৎসর মধ্যে তাঁহার ভাবী পতি সত্যবান মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইবেন, তথাপি তাঁহার সঙ্কল্প ঠিক—বৈধব্য স্বীকার তথাপি অন্য-বরে আত্ম সমর্পণ করিলেন না, অধুনা এপ্রকার সৎদৃষ্টান্ত বিরল। অতি পূর্ব্ব-কালে রমণীগণ বিলক্ষণ সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন। এরূপ বহুতর প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু বর্ত্তমান কালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব-বর্ত্তীকাল হইতে ভারতে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুস-লমান রাজগণের রাজত্বই সর্ব্ব প্রকারে ভারত রমণীর দুরবস্থার কারণ সন্দেহ নাই; "লিখা পড়া শিক্ষা দিলে স্ত্রীগণ স্বেচ্ছাচারিণী হইবে, বিধবা হইবে" ইত্যাদি নানা প্রকার কুসংস্কার-পূর্ণ বাক্য তৎসম-য়েই প্রচলিত ছিল। কিন্তু গৃহকার্য্যাদি বিষয়ে সেই সময়েও শিক্ষা দেওয়া হইত।

পূর্ব্বকালে রাজকন্যাগণ অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকিয়া বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিতেন, এবং উপযুক্ত বয়সে মনো-নীত বরে আত্ম সমর্পণ করিতেন। ঋষি কন্যাগণও প্রাপ্তবয়স পর্য্যন্ত পিতৃ কুটীরে বাস করিয়া অথিতি সেবাদি কার্য্য ও নানা শাস্ত্র শিক্ষা করিতেন, স্বামী এবং অন্যান্য পরিজন প্রতি কর্ত্তব্য ও সাংসারিক কা-র্য্যাদি তাঁহারা কুমারী কালেই উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন। শকুন্তলা যখন স্বামি-সদনে গমন করেন তখন মহর্ষি কণ্ব তাঁ-হাকে যেসকল সুন্দর সুন্দর উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন।

মহর্ষি অগস্ত্য একটি দুই বৎসরের বালি-কাকে কোথা হইতে কুড়াইয়া আনিয়া এক রাজ বাটীতে শিক্ষা জন্য রাখিয়াছি-লেন, পরে সেই বালিকা নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিতা হইয়া যৌবনপ্রাপ্তা হইলে, তিনি তাঁহাকে বিবাহ করেন তাঁহারই নাম সুধর্ম্মিণী লোপামুদ্রা ছিল, তিনি র-মণী-কুলললাম ছিলেন। পূর্ব্বকালেও বর্ত্তমান কালের ন্যায় রমণীগণ যুদ্ধ এবং রাজকার্য্য বিষয়ে বিশেষ পটুতা লাভ করিয়াছেন এরূপ বড় দৃষ্ট হয় না, তবে পূর্ব্ব-কালীন দুই চারি জন রমণী ও বর্ত্তমান কালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তিকালের দুর্গাবতী লক্ষ্মীবাই ইত্যাদি কতিপয় রমণী যুদ্ধ কার্য্যে এবং রাণী ভবানী অহল্যাবাই ই-ত্যাদি কতিপয় রমণী রাজকার্য্যে বিশেষ পটুতা প্রকাশ করিয়া স্মরণীয়া হইয়া রহি-য়াছেন।

দেখা যায় আর্য্যদের মনে এরূপ বি-শ্বাস ছিল যে সংসার-ধর্ম্মের প্রধান সহায় রমণীগণ অন্যান্য শিক্ষায় পুরুষের সমকক্ষা না হইতে পারিলেও বিশেষ হানি নাই, কিন্তু তাঁহাদিগকে নির্ম্মল-চরিত্রা ও ধর্ম্ম-শীলা হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। তদনুসারে তাঁহারা রমণীগণকে যথা সাধ্য ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিতেন। স্ত্রীর নাম ছিল সহধর্ম্মিণী। স্বামীর সহিত তাঁহাকে প্রত্যেক ধর্ম্মকার্য্যে যোগ দান করিতে হইত। অধিক কি বালি-

কাগণকেও খেলার ব্যপদেশে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করা হইত। প্রাচীন রমণীগণই বোধ করি সেই সমস্ত ব্রতের রচয়িত্রী ছিলেন।

'মাঘ মণ্ডল' 'পুনিপুকুর' যম পুকুর' ইত্যাদি ব্রতগুলি খেলাচ্ছলে ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ; বালিকা কাল হইতেই এপ্রকার ধর্ম্মশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া রমণীগণ দেবীর ন্যায় সংসারে বিরাজ করিতেন। খেলার মধ্যেও নানাপ্রকার সুনীতি পূর্ণ স্ত্রী কবি ছিল; যথা "পৃথিবীর মত ধৈর্য্যশীলা হই, সীতার মত সতী হই, গঙ্গার মত শীতলা হই" ইত্যাদি এই প্রকার শিক্ষায় যে এক সময় বিলক্ষণ সুফল ফলিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজি কালি বালিকাগণ যে ইংরেজী রীতির অনুকরণ করিয়া জন্মদিনে সঙ্গিনীগণ সহ ভোজন ও আমোদ করেন তাহা কি উল্লিখিত ব্রতাদির ন্যায় সর্ব্ব-বিষয়ে হিতকরী? ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ কি অর্থশূন্য আমোদ শ্রেষ্ঠ? যদ্দ্বারা খেলাচ্ছলে আমাদের সহিত ধর্ম্ম ও সমাজ-নীতি শিক্ষা হইত তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিব না কেবল লুকোচুরি দৌড়াদৌড়ি ও তাস পাশা চৌপাড়কেই শ্রেষ্ঠ বলিব?

পূর্ব্বকালের রমণীগণ যে বিবিধ শিল্প নৈপুণ্যও শিক্ষা করিতেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, যদিও তাঁহাদের উল্লেখ যোগ্য বিশেষ কোন শিল্পের নাম করিতে পারিব না বটে, সাধারণ সাধারণ বহুতর শিল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এক্‌জিবিসনে যেরূপ মাটির আতা, কুমড় কলা ইত্যাদি আসিয়াছে, আমাদের প্রাচীনাগণও এই প্রকার (দোষশূন্য না হউক) মাটির কাঠাল আনারসাদি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা গৃহসজ্জা সাধন করিতেন। সময় সময় এসমস্ত শিল্প দ্বারা "জামাই ঠকান" হইত, সেকালে কোন বাড়ী জামাই আসিবার কথা হইলেই মেয়ে মহলে বড় ধুম পড়িয়া যাইত, কে কি কৃত্রিম দ্রব্য দ্বারা জামাইকে ঠকাইবেন তাহারই পরামর্শ হইত, এতদ্দ্বারা তাঁহাদের শিল্পানুরাগের বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইত।

বর্ত্তমান কালের রমণীগণও শিল্পকার্য্যে উৎসাহশূন্যা নহেন, যদিও তদ্বিষয়ে অদ্যাপি কেহ অদ্বিতীয় হয়েন নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদের হস্ত-প্রস্তুত অনেক শিল্প-কার্য্য কলিকাতা একজিবিসনে সজ্জিত হইয়াছে।

পাক-কার্য্যে প্রাচীনা রমণীগণ যেরূপ পারগা ছিলেন, নব্যাগণ তদ্বিষয়ে অনেক পরিমাণে হীনা সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহারা তেমন আবার বিদ্যা বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতেছেন—এলএ,বিএ পাশ করিতেছেন, প্রাচীনা কোন রমণী কবে এল এ বিএ, পাশ করিয়াছিলেন? ভারতের পূর্ব্বকাল-বর্ত্তিনী ভগিনীগণ! আপনারা কি ক্ষেপিবেন, একথার উত্তরে কি আমাকে বলিবেন যে নির্ব্বুদ্ধি চুলোমুখী আমাদের কালে এলে বিএ কোথায় ছিল? আমরা যে তাহার নামও জানিতাম না, স্ত্রীলোক দূরে থাকুক, পুরুষেরাও ত এসক-

কলের নাম শুনে নাই, তবে আমরা কিরূপে তাহা পাশ করিব। আমাদিগকে যদি এলে বিএ পাশ করিতে নিযুক্ত করিত, তবে আমরা তাহা অবশ্যই পারিতাম সন্দেহ নাই। তেমন আবার যে সকল বর্ত্তমান কালের ভগিনীগণ গৃহকার্য্যাদি ও রন্ধনাদি কার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাঁহারাও বলিবেন যে 'আমরা কি এত বড় দুরূহ বিষয় শিক্ষা করিতে পারিতেছি যে চাটি রাঁধিতে পারি না?' বাস্তবিক দুইটিই সত্য।

এমন কেহ মনে করিবেন না যে পূর্ব্ব কালে ভারত-ললনাদের অবস্থা অতি হীন ছিল! ঋষিগণ রমণীগণকে দেবীর ন্যায় দেখিতেন, তাঁহাদিগকে অতি উচ্চ স্থানে অবস্থিতা রাখিয়াছিলেন।

মুসলমানাধিকারের পর আর্য্যগণ জ্ঞানহীন হইয়া রমণীগণকে দাসী-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। মুসলমান রাজগণের দৃষ্টান্তানুসারে রমণীগণের প্রতি নানাপ্রকার হীন ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। বর্ত্তমান কালে পুনরায় ইংরেজদের দৃষ্টান্তানুসারে ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে এবং পুরুষ জাতি নারী জাতিকে সমাদর করিতেছেন। কিন্তু হায়! এই সুখের দিনেও দুরদৃষ্ট বশতঃ একে বারে মুখ ভরিয়া হাসিতে পারিতেছি না, হাসিবার কালেও এই পোড়া চোকে জল আইসে। কিন্তু আমরা কোণের বধূ, সেই জল টুকুতে সমস্ত ভারত ভাসিয়া যায় না, কেবল আমাদের আচলের কোণা টুকুই আর্দ্র হয় মাত্র। সুরুচিসম্পন্ন শিক্ষিত যুবকগণ, বলিবেন কি যে তোমাদের কাঁদিবার কপাল, তাই কাঁদ। আমরা প্রাণপণে যত্ন করি, শিক্ষা দেই, সম্মান করি, স্বাধীনতা দেই, নিজদের সঙ্গে তোমাদিগকে কিছুমাত্র ভেদজ্ঞান করি না, তবু কান্না? তবে একান্না আর থামে না। বাস্তবিকও একান্না আর শীঘ্র থামিবে না।

আপনারা আমাদিগকে সমাদর করিতেছেন, উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, আপনাদিগের ন্যায় সামাজিক সমস্ত অধিকারেই আমাদিগকে অধিকারিণী করিতে প্রস্তুত আছেন;—কিন্তু তাহা কি ভাবিয়া? না আমরা আপনাদিগের সমান এই ভাবিয়া। আপনারা বলিতেছেন স্ত্রীপুরুষ উভয়ই একপ্রাণী, তবে কেন স্ত্রীলোক পুরুষের সমান না চলিবেন, ফিরিবেন, পরীক্ষা নাদিবেন, যুদ্ধ না করিবেন, চাকুরী না করিবেন, ওকালতি না করিবেন, ডাক্তারি না করিবেন ইত্যাদি। আপনারা আমাদিগকে আপনাদের সমান ভাবেন, তাই এই সকল কথা বলিতেছেন; কিন্তু পূর্ব্বে আর্য্যগণ নারীজাতিকে আপনাদিগের সমান ভাবিয়া শ্রদ্ধা করিতেন না বা শিক্ষা দিতেন না, তাঁহারা দেবীর ন্যায় ভাবিতেন এবং যাহাতে রমণীগণ দেবতার ন্যায় হইতে পারে তদনুরূপ শিক্ষা দিতেন। তবে বলুন দেখি এ অবস্থায় আমরা হাসিব কি কাঁদিব? অবশ্যই কাঁদিব। যখন পূর্ব্বতন আর্য্যগণের ন্যায় আপনারাও আমাদিগকে

জ্ঞান করিবেন এবং তদনুরূপ সুশিক্ষা প্রদান করিবেন, আপনাদিগের ক্রীড়া পুতুল না করিয়া শ্রদ্ধা ও সমাদরের পাত্রী করিবেন, তখন হাসিব। যখন যথার্থ দেবীর ন্যায় আপনাদিগের শ্রদ্ধার পাত্রী হইব ও দেবীর ন্যায় দেবোচিত গুণ লাভ করিব, তখন হাসিব। যখন দেবীর ন্যায় পবিত্রা হইয়াও দাসী হইতে দাসীভাবে স্বামীর চরণ সেবা করিব, পিতার চরণ পূজা করিব, সমস্ত পুরুষ জাতিকে সম্মান করিব, তখন প্রফুল্ল মনে হাসিতে থাকিব। ভারতরমণীর সে দিন দেখিলে হাসিব, না হইলে এ পোড়া মুখে শুধু সামান্যভাবে হাসি আসিবে না।

এখন আপনারা আমাদিগকে অনেক স্থলে বিবিয়ানা শিক্ষা দিয়া থাকেন, দেশীয় অনেক "সুরীতি" পরিত্যাগ করাইয়া বিলাতি বহুতর কুরীতি যত্নসহকারে শিখাইয়া থাকেন; একি সুলক্ষণ? বিলাতি ভালরীতি স্বচ্ছন্দে শিক্ষা প্রদান করুন; তাহা বলিয়া দেশীয় সুরীতি কেন পরিত্যাগ করাইবেন? সীতা রাজ-কন্যা রাজবধূ হইয়া স্বচ্ছন্দে স্বামী সমভিব্যাহারে বনগামিনী হইলেন, কত সুখ— কত প্রলোভন স্বামীর প্রতিজ্ঞা পালন জন্য পরিত্যাগ করিলেন, আর আমরা বিবিরা কি না স্বামী যদি 'পিতার পরিবার' বৃদ্ধ মাতাকে দশটিটাকা দিয়া গঙ্গাবাসের সহায়তা করেন, আর তাহাতে আমাদের বাবুগিরির যদি কিঞ্চিৎ ত্রুটি হয়, তবে আমরা সৃষ্টি-প্রলয় আরম্ভ করি, দশমহাবিদ্যার রূপ ধারণ করিয়া স্বামীরূপ মহাদেবের মহা আতঙ্কের কারণ হই। দশরথ রাজার পরম সৌভাগ্য যে তিনি আজি কালিকার শ্বশুর বা পিতা হইয়াছিলেন না, তাহা হইলে তাঁহার পুত্রবধূ সীতা তাহাকে উত্তমরূপ সভ্য শিক্ষা প্রদান করিতেন। আর যদি রামচন্দ্র আজিকার কলেজে সুশিক্ষা প্রাপ্ত যুবক হইতেন, তবে দশরথকেই আজীবনের জন্য কাশীধামগমন করিতে হইত সন্দেহ নাই।

তাই বলিতেছি, আধুনিক শিক্ষা প্রাচীন শিক্ষার ন্যায় আমাদের দেশোপযোগী হইতেছে না। সাহেবি ধরণে শিক্ষা হইতেছে, পুরুষগণ সাহেব ও রমণীগণ বিবি সাজিতেছেন। কিন্তু হায়

"সোণা দিয়ে বাঁধা কাকটার ডানা
মাণিকে জরাণো হোক তার পা দুখানা
এক এক পক্ষে তার গজ মুক্তা থাক
রাজহংস নয় কভু তবুও সে কাক"

ইংরেজেরা তবুও আমাদিগকে সম্পূর্ণ নেটিভ বলিয়া ঘৃণা করে—এত করিয়াও পোড়া নেটিভ নাম ঘুচিল না। তবে আর আর্য্য নামে কলঙ্ক দিয়া কাজ কি? ভারত কোন বিষয়ে কোনকালে হীন ছিলেন না, আজিই ভারত পুত্র ও ভারত কন্যাগণ কিসে কম? স্ত্রী শিক্ষা বিষয়েও ভারত এমেরিকার তুল্য না হউক, কিন্তু অনেক দেশাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল সন্দেহ নাই। যখন এখনকার সভ্য দেশ সকলের মনুষ্যগণ তরু-কোটরে অবস্থিতি

করিতেন, তখনই ভারতমহিলা শাস্ত্রানুশীলন করিতেন। তবে আর্য্য রমণীগণের শিক্ষা আদর্শ রাখিয়া স্ত্রী শিক্ষা দিলে কি চলিতে পারে না? মেয়ে কি সাহেবের নিকট বিয়ে দিবে যে বিবি না হইলে চলিবে না? বাছা সকল, সীতা হও, সাবিত্রী হও, খনা হও, লীলাবতী হও, কিন্তু বিবি সাজিও না। মিস কার্পেণ্টারাদি মহামান্যা ইংরেজ রমণীগণের ন্যায় চরিত্রশালিনী হও, সন্তুষ্ট হইব, কিন্তু কেবল বিবিদিগের বিলাসিতার অনুকরণ শিখিলে প্রশংসা হইবে না। যাউক, মনের আবেগে এক কথার মধ্যে আর এক কথা পাড়িয়া কতক্ষণ গলা বাজি করিলাম, ভগ্নীগণ মাপ করিও।

বর্ত্তমান কালে বিলক্ষণ স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইতেছে না। এই শিক্ষা যখন দেশীয় সুরীতি বজায় রাখিয়া ও বিদেশীয় সুরীতি গ্রহণ করিয়া সাধিত হইবে, তখনই ভারতললনার প্রকৃত সুশিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে বলা যাইবে।

পূর্ব্বকালবর্ত্তিনী রমণীগণ নৃত্য গীতাদি কলাবিদ্যায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন একথা স্থলান্তরে বলা গিয়াছে। এই নৃত্যগীত শিক্ষা ইংরেজ মহিলাগণের একটি সাধারণ শিক্ষা মধ্যে গণ্য। তাঁহাদের সকলকেই এ বিদ্যা দুইটি শিক্ষা করিতে হয়। নৃত্য শিক্ষার প্রয়োজন কিছুই দেখা যাইতেছে না; কিন্তু প্রত্যেক রমণী সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা করুন এটি আমার একান্ত বাসনা।

সকলেই জানেন যে পরমেশ্বর নারীকণ্ঠ মধুময় করিয়া সৃজন করিয়াছেন। সেই সুমধুর কণ্ঠে যদি ঈশ্বরের মধুময় নাম ও সদ্‌ভাবপূর্ণ অন্যান্য সঙ্গীত ঘরে ঘরে গীত হয়, তবে যে কত আনন্দ ও কত পবিত্রতা বৃদ্ধি হইবে বলা যায় না।

কোথাও যদি স্ত্রীলোক রামায়ণ গান করে, কিম্বা যাত্রার দলে যদি স্ত্রীলোক গায়িকা থাকে, তবে অসংখ্য অসংখ্য লোক সেই বার-নারীদিগের কণ্ঠ-নিঃসৃত গরল পান করিতে উপস্থিত হয়, খেমটা ও বাইগণের কদর্য্য অশ্লীল গান শুনিবার জন্যও আমাদের দেশের বড় বড় লোক বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাদিগকে নিজ ভবনে নিয়া নাচ গান করাইয়া থাকেন।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে বামা-কণ্ঠ গীতি শুনিতে লোকে বড় ভাল বাসে, কিন্তু গৃহে সেই সুখ চরিতার্থ হয় না বলিয়া বাহিরে তাহা উপভোগ করিতে যায়। অতএব রমণীগণকে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য; অবকাশ সময়ে যদি উত্তম উত্তম সঙ্গীত করিয়া যাপন করেন তবে নিজেও অতি বিমল আনন্দ প্রাপ্ত হইতে পারেন এবং তদ্দ্বারা অপরকেও সুখী করিতে পারেন।

সঙ্গীত-বিদ্যার ন্যায় চিত্রবিদ্যাও বামাগণের একান্ত উপকারী ভারতে পূর্ব্বকালে যে এই মহোপকারী চিত্র বিদ্যার চর্চ্চা ছিল না, একথা কোন মতেই স্বীকার করা যায় না। যখন দেখিতেছি সীতা,

ঊর্ম্মীলা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি এই ভগিনী ত্রয়ের কৌতুক নিবারণ জন্য ভূমিতে দশ-স্কন্ধ রাবণের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিলেন, যখন দেখিতেছি লক্ষণ সীতা ও রামচন্দ্রকে আলেখ্য প্রদর্শন করাইতেছেন,—তাহা এরূপ যথাযথ চিত্রিত হইয়াছে যে তাহা মুগ্ধস্বভাবা সীতা যথার্থ মনে করিতেছেন; তখন কিরূপে বলা যাইতে পারে যে এদেশে চিত্র বিদ্যার উন্নতি ছিল না। যখন দেখা যাইতেছে, রামগিরি নির্ব্বাসিত কুবেরানুচর যক্ষ স্বহস্তে পত্নীর বিরহশীর্ণ দেহলতা অঙ্কিত করিয়া আপনাকে তাহার চরণতলে স্থাপন করিতেছেন এবং দুষ্মন্ত স্বহস্তে শকুন্তলার হরিণ শাবক ও মালিনী নদী অঙ্কিত করিতেছেন,তখন স্পষ্ট প্রতীতি হয় ভারতে চিত্র বিদ্যা বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

ইংরেজদের দেশে অনেক অনেক রমণী চিত্র বিদ্যায় অদ্বিতীয়া। কিন্তু ভারত-ললনাদের মধ্যে এখন আর চিত্রের চর্চ্চা নাই এটি বড় দুঃখের বিষয়। চিত্র বিদ্যার ন্যায় পরমোপকারী ও সুকুমার বিদ্যা রমণীগণের অবশ্য শিক্ষা করা উচিত। বর্ত্তমান কালের সুরুচি-সম্পন্না ধনীর গৃহিণীগণ নানা প্রকার বিলাতি ছবিদ্বারা গৃহ-সজ্জা সাধন করিয়া থাকেন। নিজে তদ্রূপ উত্তম উত্তম ছবি অঙ্কিত করিতে পারিলে তাঁহাদিগের গৌরব ও আনন্দ উভয়ই বর্দ্ধিত হয় সন্দেহ নাই।

পাক-বিদ্যায় ভারত রমণীগণ পূর্ব্বকালে অদ্বিতীয়া ছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান কালের রমণীগণের বালিকাকাল হইতেই সরস্বতীর নিকট প্রার্থনা এই যে "হাতা বেড়ি ছাড়ি মাগো, পাঁজি পুথি ধরেছি, মূর্খ নাম ঘুচাইব সার পণ করেছি।"

কেন হাতা বেড়ি ছুইলে কি সেই ময়লা হাতে পাঁজি পুথি ছোয়া যায় না? সকল কাজেরই নির্দ্দিষ্ট সময় থাকিলে অত বড় মানব জন্মটার মধ্যে অনেক কাজ শিক্ষা করা যাইতে পারে। আমাদের দেশীয়া গৃহিণীগণ পূর্ব্বকালে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ছিলেন। কিন্তু (দুঃখ লজ্জার বিষয়) কি বলিব, এক্ষণে অনেকে সাক্ষাৎ একাদশী হইয়া দাঁড়াইতেছেন।

পাককার্য্য হীন মনে করিয়া তাহা বেতনভোগী পাচক ঠাকুর কি রাঁধুনি বামনীর হাতে সমর্পণ করা হয়, তাহারা নানা প্রকার অপরিষ্কার ভাবে আহারীয় জিনিষ প্রস্তুত করিয়া রোগ আনয়ন করিয়া থাকে। বায়ু সেবন, বারিপান ও আহার গ্রহণ এই ত্রিবিধ উপায়ে শরীর রক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, অতএব পাক বিদ্যাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা কদাপি সঙ্গত নহে। এই বিদ্যাটি কেবল উপকারীই নহে, বিলক্ষণ আমোদদায়ী। কোন আত্মীয়কে স্বহস্তে উত্তম উত্তম পাক করিয়া ভোজন করাইলে মনে একটি অনুপম আনন্দ হয় এবং তাহাতে অনেক স্থলে প্রচুর সুখ্যাতি ও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্ব্বকালের রমণীগণ এই যশের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। বর্ত্তমান কালের রমণীগণ পাক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিদ্যার জন্য সুখ্যাতি

লাভ করিয়া সুখী হইতেছেন বটে, কিন্তু তথাপি পাক কার্য্যও জীবন রক্ষায় নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রত্যেক স্ত্রীলোকের তাহা সযত্নে শিক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমি লিখাপড়া একবারে পরিত্যাগ করিয়া কেবল পাক করিবার পরামর্শ দিতেছি, একথা যেন কেহ মনে না করেন। আমার বক্তব্য এই যে এ কাজও শিক্ষা করিতে হইবে। এখন যাঁহার অবস্থা ভাল তিনি বেতনভোগী লোকদ্বারা পাক করাইতে পারেন তাহাতে হানি কি? কিন্তু একথা মনে রাখা উচিত যে নিজে না জানিলে তাহাদিগকেও কিছু শিখান যায় না বা বলা যায় না। তাহারা যেরূপ প্রস্তুত করিয়া দেউক্‌না কেন, তাহাই মহাপ্রসাদবৎ খাইতে হয়।

শাস্ত্রে লিখা থাকুক বা না থাকুক, পূর্ব্বকার লোকে বলিত যে 'শাস্ত্রে আছে পুরুষ যদি যুদ্ধ কার্য্যকে ভয় করে এবং রমণীগণ পাক কার্য্যকে ভয় করে তবে তাহাদের নরকগামী হইতে হয়।' আজি কালি ভারত সন্তান তীর ধনুক দেখিলে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়েন, অঙ্গনাগণ কেন পাকে ভয় না করিবেন?

যবনাধিকার সময়ে ভারতে স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষা প্রথা একেবারে রহিত হইয়াছিল, অধুনা ভারতসন্তানগণের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকদিগেরও সেই দুর্দ্দিন দূর হইয়া শুভদিন সমাগত হইয়াছে। ভারতের নানা স্থানে স্ত্রী শিক্ষার জন্য চেষ্টা হইতেছে, অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার সভা সকলের সাহায্যে রমণীগণ অন্তঃপুরে বসিয়াও নানা বিদ্যা অধ্যয়নে পরীক্ষা প্রদান করতঃ আপনাদের যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। স্বদেশ হিতৈষী কৃতবিদ্য পুরুষগণ স্ত্রীলোকের হিতের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন, তাঁহাদিগের যত্নেই বঙ্গ রমণীগণ আজি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায়ও কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া ভারত ললনার গৌরবস্থল হইয়াছেন। যদি কৃতবিদ্যগণ কোথাও কোন প্রকার ভুল করেন তবে তাহা তাঁহাদের ভ্রম বলিব, কিন্তু কখনই তাঁহাদিগকে স্ত্রীলোকের পরমহিতৈষী বন্ধু বই আর কিছু বলিব না। তাঁহারা না বুঝিয়া যদি কিছু করেন সে ভারত ললনার মন্দ ভাগ্যের দোষ, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই।

অতি প্রাচীন কালের তুলনায় বর্ত্তমান কালে স্ত্রীশিক্ষা কোথাও উত্তম, কোথাও তদপেক্ষা অধম হইতেছে, কিন্তু বর্ত্তমান কালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তিকাল অপেক্ষা আজি কালি যে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা অতি উত্তম, তদ্বিষয়ে কিছু সন্দেহ নাই।

এখন স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যেপ্রকার আন্দোলন চলিতেছে, ইহার ফল অবশ্যই অতি হিতকর হইবে। ক্রমেই স্ত্রীশিক্ষার দোষ সমস্ত সংশোধিত হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে।

দয়া সহিষ্ণুতা ভক্তি প্রেম স্নেহ কোমলতা ইত্যাদি স্ত্রীসুলভগুণে প্রাচীনকালের অঙ্গনাগণ যেরূপ ছিলেন, বর্ত্তমানকালের

রমণীগণ তদপেক্ষা হীন হন নাই, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি;— চরিত্রবিষয়ে ভারতললনা আজিও পৃথিবীর আদর্শস্থানীয়া *। শ্রীশ্যামাসুন্দরী দেবী—

অগ্নিকুল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সত্যবতী, একবার যে শ্যামলশোভিত স্বভাবসুন্দর গিরি-সমতল-জড়িত উদ্যানে ভ্রমণ করিতে যাইয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন অদ্য আবার কি মনে করিয়া তথায় বেড়াইতে গিয়াছেন।

আমরা এখনও ঋষিবালিকাকে সত্যবতী নামেই ডাকিব। এটি কুঙ্কুম-সুন্দরীর আদরের নাম—এটি সূর্য্যনাথের চিত্তপ্রফুল্লকর নাম।

সত্যবতী কতকগুলি সুপক্ক বনফল বৃক্ষতলায় কুড়াইতেছেন ও তারস্বরে আপনাআপনি বলিতেছেন—

"যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি স্থূলপৃষতীমাগ্নিবারুণী মনড্বাহীমালভেতেতি। তস্যাং সন্দেহঃ স্থূলাচাসৌ পৃষতীচ স্থূলপৃষতী স্থূলানি পৃষন্তি যস্যাঃ সা স্থূলপৃষতীতি তান্না বৈয়াকরণং স্বরতো ঽধ্যবস্যাতি। যদি পূর্ব্বপদপ্রকৃতি স্বরত্বং ততোবহুব্রীহিঃ অথ সমাসান্তো দান্তত্বং ততস্তৎ পুরুষ ইতি।"

এই সময় সূর্য্যনাথ ধীরে ধীরে তাঁহার পশ্চাদ্দেশে আসিয়া হাস্যমিশ্র উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—

"—ইমানিচ ভূয়ঃ শব্দানুশাসনস্য প্রয়োজনানি।"

সত্যবতী, ফিরিয়া সূর্য্যনাথকে দেখিয়াই হাসিয়া উঠিলেন—সূর্য্যনাথ তাঁহার দুটি হাত ধরিয়া অতি স্নেহে বলিলেন, এ, কে তোমায় শিখাইল?

সত্যবতী হাসিয়া বলিল, তুমিও শিখিয়াছ?

সূর্য্যনাথ মনে মনে ভাবিলেন, বালিকা ঋষিযুবকগণের পাঠ সময়ে শুনিয়া শুনিয়া এইটুক শিখিয়া থাকিবে, তথাপি তাঁহার কৌতূহল হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন—

---

* সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ প্রাচীন ও আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বামাগণের রচনা আহ্বান করিয়া, যেটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তাহার রচয়িত্রীকে একটি পুরস্কার দিতে অঙ্গীকার করেন। তদনুসারে যতগুলি প্রবন্ধ প্রেরিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এইটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে ইহার রচয়িত্রী উল্লিখিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাঃ সঃ—

"প্রাণের সত্য,বল দেখি তুমি কি বলিলে?

সত্য। বলিতে পারিলে কি দিবে ?

সূর্য্য। যাহা কারু দিই নাই তাই দিব।

সত্য। ছাই যদি দাও ?

সূর্য্য। ছাই ভস্ম কি দিবার জিনিষ?

সত্য। তবে দিবে কি ?

সূর্য্য। আমার প্রাণ তোমারে দিব।

সত্য। ও বুঝিয়াছি—ফাকি দিবে, প্রাণ কি দেওয়া যায় ?

সূর্য্য। প্রাণের অধিক ভাল বাসিব।

সত্য। তাকি কেউ বাসিয়া থাকে ?

সূর্য্য। আমি বাসিব।

সত্য। হুঁঃ—

সূর্য্য। বিশ্বাস করিলে না? আমি তোমায় বেশী ভাল বাসিব।

সত্য। ভাল ত বাসিয়াই থাক।

সূর্য্যনাথ এবারে কৃত্রিম কোপ করিয়া কহিলেন, 'যাও, বনের পাখী কি কখন পোষ মানে' এই বলিয়া চলিতে চলিতে বলিলেন 'আমি যাই ?'

সত্যবতী এবারে—'সূর্য্যনাথ যাইও না, যাইও না, আমি তোমারে কত ভাল বাসি,দেখ তোমার জন্য কত পাকা পাকা ভাল ফল কুড়াইয়াছি'এই বলিয়া দৌড়িয়া যাইয়া তাঁহার হাত ধরিলেন।

সূর্য্যনাথ অঞ্জলি পাতিয়া বলিলেন, 'দাও দেখি একটা ফল ?'

সত্যবতী সমস্ত ফলগুলিতে তাঁহার অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সূর্য্য। তুমি খাইবে না ?

সত্য। না, তুমি খাইলেই তুষ্ট হইব।

সূর্য্য। আমি খাইলে তোমার পেট ভরিবে ?

সত্য। ভরিবে।

এইবারে সূর্য্যনাথ হাসিয়া বলিলেন' সত্য, প্রাণের অধিক তোমায় ভাল বাসিব, বিশ্বাস কর নাই, আমি খাইলে তোমায় পেট ভরিবে,আমাকে কিরূপে বিশ্বাস লওয়াইবে ?'

সত্য। আমি যে তোমারে বেশী ভাল বাসি ?

সূর্য্য। আমি কিসে কম ভাল বাসি?

সত্য। কম না বাসিলে,—আরও ভালবাসিতে চাহিলে কিরূপে ?

সূর্য্যনাথ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন ; ন্যায়শাস্ত্রে সত্যবতী তাঁহাকে পরাস্ত করিল।

সূর্য্যনাথকে নিরুত্তর দেখিয়া বালিকা বলিল—'কি পড়িতেছিলাম বলিব ?'

সূর্য্যনাথ প্রীত হইয়া বলিলেন 'বল'।

সত্য। পাণিনীয় দর্শনম্—মহাভাষ্যে পস্পসাহ্নিকম্।

সূর্য্য। সমস্ত পড়িয়াছ ?

সত্য। সমস্ত আমার কণ্ঠাগ্রে।

সূর্য্যনাথ বিস্মিত হইলেন, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'যাঁহাদিগের শিক্ষা গগণস্পর্শ করিয়াছে, যাঁহাদিগের জ্ঞান সমুদ্রতুল্য, যাঁহাদিগের বালিকাগণের খেলার সামগ্রী পাণিনী পতঞ্জলী, ব্যাস ও বাল্মীকি, যাঁহাদিগের হৃদয়ও রত্নময়, তাঁহাদিগের বাহ্যজগত কঠোরতাপূর্ণ ও

দুঃখময় কেন বুঝিতে পারি না। যাঁহারা ইচ্ছা করিলে রাবণদর্পে অখণ্ড ধরামণ্ডল শাসন করিতে পারে। যাঁহারা স্বর্ণগৃহে বাস করিবার যোগ্য, পুষ্পকরথে ভ্রমণ করিবার যোগ্য, হায় তাঁহারা এতাদৃশ দুরবস্থাপন্ন যে বসন অভাবে মৃগচর্ম্ম কি তরুবল্কল, আহারাভাবে গলিতপত্র, এবং শয্যাভাবে ভূমিই জীবনের অবলম্বন করিয়াছে—বুঝিলাম এইজন্যই, কল্পিতবীণাপাণি এবং কমলার সদ্ভাব নাই, এরূপ একটি লোক প্রবাদ শুনিতে পাইয়া থাকি। শুনিয়াছি পৃথিবীর প্রথম মানব শিক্ষাভাবে—অনায়াসলব্ধ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেন, আর্য্য ঋষিগণ জ্ঞান-রাশির মহাসমুদ্র হইয়াও যে ঐহিক জগতে মাটি খান—আশ্চর্য্য বলিতে হইবে।

সত্যবতী সূর্য্যনাথকে নিস্তব্ধ এবং চিন্তা পূর্ণ দেখিয়া বলিল "সূর্য্যনাথ তোমার কি হইবে। রাগ করিলে না অবিশ্বাস করিলে?"

সূর্য্যনাথের ধ্যান ভঙ্গ হইল, হাসিয়া বলিলেন "না, সত্য, রাগ কিম্বা অবিশ্বাস করি নাই, তুমি বালিকা হইয়া এত শিখিয়াছ তাহা আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি।" সত্যবতী বলিল, "তোমরা অবিশ্বাসী নাস্তিক ভক্তি শূন্য, তাই সামান্য বিষয়েও আশ্চর্য্য বোধকর, পৃথিবীর কিছুই আশ্চর্য্যের নহে। বৃক্ষের শুষ্ক শাখাটি ঘসিয়া আগুন বাহির কর, আগুন তাহাকে দগ্ধ করে, কিন্তু ঘসিবার আগে সে আগুন কোথায় ছিল—ঐ শাখায়ই ছিল,—জ্বলে নাই, দগ্ধ করে নাই, কে রাখিয়াছিল? কেন রাখিল? ভাবিয়া কি বিস্ময় হয় না? আমি কোথায় ছিলাম, কর্ম্মসূত্রে কোথায় টানিয়া আনিল—তুমি ভাল বাসিলে, আমি ভাল বাসিলাম; কেন বাস, কেন বাসি, কে বাসায় ভাবিয়া কি আশ্চর্য্য হও না? কোথায় পিতা, কোথায় মাতা, কোথায় আসিয়াছ মানুষ মারিতে, ভাবিলে কি মনে হয়? ক্ষুদ্র প্রাণ বল্মীক মাটির বড় বড় ঘর বাড়ী বানায়, ক্ষীণ-প্রাণ মৌমাছি ফুলের মধু কুড়াইয়া কেবল মধুপূর্ণ চক্র বানায়, তাহাদের ক্ষমতা দেখিয়া কি বিস্ময় হয় না? তাদের কে বানাইতে শিখাইল? শুক সারিকা বন পাখী হইয়াও শুনিয়া শুনিয়া কথা কয়, বেদ পড়ে, সাম গান করে ইহা কি আশ্চর্য্য নয়? আমি ১৪। ১৫ বৎসরের বুড়ী হইয়া অনন্ত বিদ্যার দুটি কথা পড়িয়াছি, নগণ্য গ্রন্থের দুটি পাতা উল্টাইয়াছি, ইহাই কি বড় আশ্চর্য্যের কথা হইল? ছি ছি পুরুষ হইয়া আশ্চর্য্য হও!! আমি পড়িতে ও শিখিতে পারি না বলিয়া অমু আমায় কত গালি দিয়াছে। তোমাদের দেশের মেয়েরা কি কেবল রান্ধে আর খায়?"

বালিকার এই অসংলগ্ন মধু মাখা কথাগুলি শুনিয়া সূর্য্যনাথ আরও বিস্মিত হইলেন, কিন্তু বালিকার মুখে 'অমু' এই নামটি শুনিয়া তাহার অসুখ ও কৌতূহল হইল।

অমুথ, বালিকা আর এক পুরুষের নাম করিল, নাম করিবার কালে তাহার সুন্দর গাল দুখানি লাল হইল। মুখে একটু হাসি একটু লাজের ছায়া পড়িল, আবার

একটি দীর্ঘ নিশ্বাসে সকল উড়াইয়া দিল, তাহা সূর্য্যনাথের সূক্ষ্ম দৃষ্টি অতিক্রম করিল না, সুতরাং অসুখ। 'অনু' যেই হউক, বালিকাকে পড়াইত, বালিকা অধিক কাল তাহার সংসর্গে থাকিত, সর্ব্বদা এক স্থানে থাকিলে ভাল বাসা জন্মায়, বালিকা অনুকে অবশ্যই ভাল বাসিয়াছিল, সুতরাং অসুখ। অনু পড়ার জন্য বালিকাকে কত তিরস্কার করিয়াছে, কিন্তু সূর্য্যনাথ, ভয়ে ভাল কথাটিও তাহাকে উচ্চ রবে বলিতে সাহস করেন না, সুতরাং অসুখ।

কৌতূহল, অনু কে, বিশেষ জানিতে। কৌতূহল অনুর অধিকার কতদূর তাহা জানিতে।

সূর্য্যনাথ শুষ্ক মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অনু কে?'

সত্য। অতুল।

সূর্য্য। কে সে।

সত্য। তুমি কে?

সূর্য্য। সূর্য্যনাথ।

সত্য। সে অতুল।

সূর্য্য। তুমি তাহাকে ভাল বাস?

সত্য। বাসি।

সূর্য্য। তাকে না আমাকে বেশী ভাল বাস?

সত্য। একই রকম।

সূর্য্য। তাও কি হয়?

সত্য। কেন নয়?

সূর্য্য। দুজনকে এক রকম ভাল কে বাসিতে পারে?

সত্য। আমি।

সূর্য্যনাথ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'তুমি ক্ষুদ্র বালিকা, কিন্তু চেষ্টা করিয়া আমিও তোমার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলাম না।'

সত্যবতী, খি খি খি করিয়া কতক্ষণ হাসিয়া বলিলেন 'তুমি পাগল, একজনের অন্তরে কি আর একজন প্রবেশ করিতে পারে? পাষাণে জল পূরিতে পার?

সূর্য্যনাথ বলিলেন, 'তুমিও পাষাণ।

সত্যবতী বলিলেন, 'হইতে পারি, অনু বলিয়াছিল পাষাণে মানুষে বিভেদ নাই।'

সূর্য্য। মানুষে কথা কহে যে?

সত্য। পাষাণে ঘা দিলে শব্দ করে যে?

সূর্য্য। তাহা কি বুঝিতে পার?

সত্য। পাষাণে পারে।

সূর্য্য। তুমি তবে পাষাণে বিবাহ করিও?

সত্য। ক্ষতি কি?

সূর্য্য। অতুল বলিবে কি?

সত্য। তুমি বলিবে কি?

সূর্য্য। লজ্জাহীনা বিবাহের কথায় লজ্জা হয় না।

সত্য। তোমারও ত লজ্জা হয় না?

সূর্য্য। আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয়?

সত্য। যাহা ইচ্ছা তাহা কি করিতে পারা যায়?

সূর্য্য। যাইবে না কেন?

সত্য। তবে যে আমায় চুরি করিয়াছিল, সে পারিল না কেন?

সূর্য্য। আমি যে তোমায় আনিলাম।

সত্য। আবার যদি কেহ আমায় লইয়া যায়?

সূর্য্যনাথ এবারে বিরক্ত হইয়া বলিলেন ‘আমি তোমাকে সরলা মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি বিষম বক্র। আমি ত দূরের কথা, কণিক জীবিত থাকিলে তিনিও তোমার ন্যায়-পটুতায় হারি মানিতেন। আমি আর তোমার সহিত কথা কহিব না, তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব না’ এই বলিয়া রুষ্ট ভাবে যাইতে লাগিলেন। সূর্য্যনাথকে ক্রোধ ভরে গমন করিতে দেখিয়া বালিকা, রাগ করিও না বলিয়া, দৌড়িয়া যাইয়া তাহার হস্ত ধরিল। সূর্য্যনাথ, বালিকার কোমল হস্ত বেগে নিক্ষেপ করিয়া চলিলেন।

বালিকা এবার অভিমান-ভরে কান্দিতে লাগিল। কান্দিতে কান্দিতে বলিল সূর্য্যনাথ তুমি আমারে ভাল বাস না, আমি হাতে দুঃখ পাইয়াছি।

সূর্য্যনাথের দয়া হইল। তিনি ফিরিয়া আসিয়া রোরুদ্যমানা বালিকার গণ্ডে স্নেহ ভরে চুম্বন করিলেন। বালিকা শিহরিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিল।

সূর্য্যনাথ স্নেহপূর্ণ ভাবে বলিলেন, সত্য, তোমার হাতে দুঃখ দিয়া আমি হৃদয়ে ব্যথা পাইয়াছি। এ নিষ্ঠুরকে ক্ষমা করিবে কি?

বালিকার মনে আবার আহ্লাদ হইল। বালিকা সূর্য্যনাথকে কোমল বাহু পাশে জড়াইয়া হাসিয়া তাঁহার মুখ পানে চাহিল। সূর্য্যনাথের সকল দুঃখ দূর হইল। তিনি-বালিকার হাত ধরিয়া আপন গৃহের দিকে গমন করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যনাথের প্রস্তাবানুসারে বিনায়ক এবং শৃঙ্গধর সেনাপতির গৃহের গবাক্ষ সন্নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। বেলা অবসান প্রায়, তথাপি সূর্য্যনাথ বা গায়ত্রী অনাগত। বিনায়ক বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন,—‘চল শৃঙ্গধর, বৃথা আর কেন, উহারা আসিবে না; যখন গায়ত্রীকে লইয়া যাইবার সাধ্য নাই, তখন তাহাকে দেখিলেই বা কি হইবে?’

শৃঙ্গধর বলিলেন, “প্রয়োজন আছে, অন্ততঃ যথার্থই গায়ত্রী কি না, তাহা আপনার দেখিয়া যাওয়া উচিত। গায়ত্রী জীবিতা আছে, ইহা শুনিলে তাহার পিতা মাতা সন্তুষ্ট হইবেন।”

বিনায়ক এতক্ষণ পর্ব্বতশৃঙ্খলে দৃষ্টি করিতেছিলেন এবং মনে মনে উহার প্রাকৃতিক শোভার প্রশংসা করিতেছিলেন, এমন সময়ে দূরে কিছু দেখিতে পাইয়া বলিলেন, “শৃঙ্গধর, দেখ দেখি কেহ আসিতেছে কি না?”

শৃঙ্গধর তীক্ষ্ণচক্ষে দেখিয়া বলিলেন, “সেনাপতি এবং একটি বালিকা এরূপ বোধ হইতেছে।”

উভয়ে সেই দিকে উৎকর্ণের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে দৃশ্য নিকটবর্ত্তী হইল।

গায়ত্রী সূর্য্যনাথের হাত ধরিয়া আনন্দে আসিতেছে।

শৃঙ্গধর বলিলেন, 'ঐ দেখুন, গায়ত্রী কেমন মনের আনন্দে সূর্য্যনাথের হাত ধরিয়া আসিতেছে।'

বিনায়ক বলিলেন, 'না শৃঙ্গধর এ আমাদের ঋষিবালা, গায়ত্রী নহে, এ স্বর্ণখচিত বসন ভূষণ সে কোথায় পাইবে?'

শৃঙ্গধর বলিলেন, 'তপস্বিনী, রাজনন্দিনী সাজিয়াছে; এ সূর্য্যনাথের কাজ, সূর্য্যনাথ উহার রূপে মুগ্ধ।

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে সূর্য্যনাথ এবং ঋষিবালিকা অতিনিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সূর্য্যনাথ, বিনায়ক এবং শৃঙ্গধর উপস্থিত কি না, গৃহ মধ্যে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বালিকা তাহার গলা ধরিয়া বলিল, 'সূর্য্যনাথ এই কি তোমার থাকিবার ঘর?'

এদিকে বিনায়ক, সূর্য্যনাথ এবং গায়ত্রীর প্রণয়ভাব বুঝিতে পারিয়া ব্যথিত হইয়া বলিলেন, 'শৃঙ্গধর, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, গায়ত্রী ঐশ্বর্য্যে ভুলিয়াছে, ব্রাহ্মণের ধন চার্ব্বাকে গ্রাস করিয়াছে, এবিষময় দৃশ্য অসহ্য,—এ বিষময় কাহিনী অকথ্য। উপায়?'—

'উপায় জগদীশ্বর, ভরসা জগদীশ্বর। গায়ত্রী এখনও বালিকা, এখনও অবিবাহিতা, সূর্য্যনাথ বুদ্ধিমান, পণ্ডিত, কৌশল ব্যতীত বলপ্রয়োগ তাহার পক্ষে অসম্ভব। বালিকা অতুলকে প্রাণের অধিক ভাল বাসে, যে নাম অনেক দিন শুনে নাই, সে নাম এখন উহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট করাইব। উহার মন চঞ্চল করিব, দৈববাণী বশতঃ উহা উহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইবে। সূর্য্যনাথের কৌশল ব্যর্থ ও সাধনা অসিদ্ধ হইবে।' এই বলিয়াই গম্ভীর শব্দে চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'গায়ত্রি! দেবতুল্য ঋষিকুমার অতুল তোমার ঈশ্বরনির্দ্দেশিত স্বামী, প্রাণান্তে তাহার পাদপদ্ম ভুলিও না। পরপুরুষসংসর্গ পরিত্যাগ কর, সাবধান! সাবধান! সাবধান!' এই ভীম নাদ বজ্রের ন্যায় কোমলপ্রাণা গায়ত্রীর হৃদয়ে আঘাত করিল। বালিকা ভীতা ও বিস্মিতা হইয়া সূর্য্যনাথ হইতে দূরে সরিয়া গেল এবং ব্যাকুলহৃদয়ে স্বর্গপানে চাহিয়া হাতযোড় করিয়া বলিল, 'হায়! কি শুনিলাম। দেব প্রসন্ন হও। তুমি সকল জানিতে পার, আমার হৃদয় দর্শন কর।'

ভীম গর্জ্জনে সূর্য্যনাথও প্রথমতঃ চমকিত হইয়াছিলেন, পরে উহা বিনায়ক ও শৃঙ্গধরের দুষ্টবুদ্ধির কর্ম্ম মনে করিয়া আশ্বস্ত হইলেন। বাহির হইতে গৃহ অন্ধকারময় সুতরাং কিছুই দেখিতে পারিলেন না। বালিকার সন্দেহ এবং আতঙ্ক দূর করিবার জন্য উচ্চশব্দে বলিলেন, যে হও এ দুষ্টবুদ্ধিতে বালিকার কিছুই করিতে পারিবে না, আমি তোমাদিগকে শীঘ্রই ইহার ফল ভোগ করাইব—অকৃতজ্ঞ!'

এদিকে বালিকা কাঁপিতেছিল, তাহার ললাট স্বেদপূর্ণ এবং নয়ন অশ্রুপূর্ণ। সূর্য্যনাথ তাহার কুসংস্কারপূর্ণ ভ্রম ঘুচাইবার জন্য বলিলেন, 'সত্য, ভীত হইও না, আ-

মার গৃহ হইতে এক ব্যক্তি তোমাকে প্রতারণা করিবার জন্য এরূপ বলিয়াছে, উহা দেববাক্য নহে, চল আমরা যাই।'—

ঋষিবালার দৈবে বিশ্বাস স্খলিত হইবার নহে। সূর্য্যনাথের কথা, বায়ু বালিকার কর্ণের পাশ দিয়া উড়াইয়া লইয়া গেল, উহা তাহার উদ্বেল হৃদয়ে প্রবেশ করা দূরে থাকুক, কর্ণেও ধারণ করিল না। সুতরাং বালা নীরবে ধীরে ধীরে কুঙ্কুম-সুন্দরীর নিকট চলিলেন। আনন্দময় বিষাদময় রূপ ধারণ করিয়া চলিলেন।

সূর্য্যনাথও এসময়ে তাঁহাকে আর কিছু না বলিয়া সঙ্গে চলিলেন ; ভাবিলেন সময় স্রোতে বালিকা হৃদয় পুনরায় পরিস্কৃত হইবে। কিন্তু তথাপি বিনায়ক কি শৃঙ্গধরের বিষয় কি তাহাদের উপস্থিতি বালিকার অজ্ঞাত থাকা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। শৃঙ্গধর ও বিনায়কের এরূপ ব্যবহারে তাঁহার ক্রোধ হইতে লাগিল। মনে মনে বলিলেন, আমি যাহাদের প্রাণ রক্ষা করিলাম, তাহারা আমার এই সামান্য সুখের কণ্টক হইল। অকৃতজ্ঞ পৌত্তলিক! সূর্য্যনাথ যদি তোমাদের মত প্রতিশোধ-পূর্ণ এবং স্বার্থবাহী হইত, তবে এ দুষ্ট বুদ্ধির ফল ভোগ না করিয়া যাইতে পারিতে না। অতুল আশা বক্ষে করিয়া অনলে পুড়িয়া মরুক, সত্যবতী তাহার হইবে না।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যনাথ এবং গায়ত্রী চলিয়া গেলে শৃঙ্গধর হাসিয়া বলি[illegible] দেখিলেন আমার কএকটি সামা[illegible] কেমন মন্ত্রবৎ কার্য্য করিল। ই[illegible]হিনীতে গায়ত্রী কি ছিল কি হইয়া গেল'?

বিনায়ক বলিলেন, 'বৎস, আশীর্ব্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হও, ধন্য তোমার অসামান্য বুদ্ধি, ধন্য প্রত্যুৎপন্নমতি, কিন্তু ভাই গায়ত্রীর উদ্ধার কিরূপে হইবে'?

শৃঙ্গধর বলিলেন, 'ব্রাহ্মণের জয় পূর্ব্বে, পরে গায়ত্রী উদ্ধার হইবে'।

বিনায়ক বলিলেন,—ব্রাহ্মণের জয় কিরূপে হইবে, তুমিত নির্ব্বাসিত হইতেছ, উপায়?

শৃঙ্গধর হাসিয়া বলিলেন, এ আমার নির্ব্বাসিত হওয়া নহে, অগ্নি জ্বালিতে চলিলাম। চারিদিকে আগুন না জ্বালিতে পারিলে দৈত্য-খাণ্ডব দাহন হইবে না।

বিনায়ক বলিলেন, 'কৈলাসনাথ যে বিধর্ম্মীর মিত্র'।

শৃঙ্গ। 'বাধ্য হইয়া মিত্র, শত্রু করিতে বিলম্ব হইবে না'।

বিনা। 'সেখানে অনেক দৈত্য সেনা আছে'।

শৃঙ্গ। 'উহার দশ গুণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ও আছে'।

বিনা। 'তবে যাও ভাই, বিলম্ব করিও না, তোমার যাত্রা সিদ্ধ হউক।'

শৃঙ্গ। 'আমি আগামী প্রত্যুষেই যা-

ইতেছি, আপনি যাইয়া এদিকে আসুন। আগুন জালিয়া দিন, বোধ হয় মহাভাগ বিশ্বামিত্র এতদিন হরিদ্বার হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকি[illegible]ন। তাঁহাকে এবং আর আর আ[illegible] ঋষিগণকে আমার প্রণাম, অবস্থা এ[illegible] অভীষ্ট জানাইবেন।'

বিনায়ক। বৎস, একটি কথা, চার্ব্বাকের প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া যাইতেছ, যে চার্ব্বাক, তাহার সঙ্গে তত্তুল্য ব্যবহার করিলে কি হয় না? প্রতিজ্ঞা শব্দ, কলিকাল মাত্র ইহার স্থিতি, তৎপরই বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া লয় হইয়া যায়, উহা কাল সঙ্গী নহে। এত উহাদেরই কথা।'

শৃঙ্গ। 'উহাদের কথা, আমাদের নয়। যে অবস্থায়ই যাহার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিব, তাহা পালনই শ্রেয়, নচেৎ ব্রাহ্মণ কুলে কলঙ্ক স্পর্শিবে। আমরা যাহা বলি, তাহার সত্যতা রক্ষা যদি না করিলাম, তবে আর কে সত্যের আদর করিবে?'

শৃঙ্গধর এবং বিনায়কের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় 'ধন্য ঋষিকুল-প্রদীপ, এ সভ্যতম মানবোচিত বাক্য' এই বলিয়া সূর্য্যনাথ গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিনায়ক লজ্জিত এবং শৃঙ্গধর তৃপ্ত হইয়া চুপ করিলেন।

সূর্য্যনাথ গায়ত্রীকে রাখিয়া একটু ক্রোধভরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু বিনায়কের স্বর শুনিতে পাইয়া তাঁহারা কি বলিতেছেন শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। বিনায়কের কথা শুনিয়া তাঁহার ক্রোধ আরও উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু শৃঙ্গধরের বীরোচিত প্রত্যুত্তরে তাঁহার সকল ক্রোধ দূর হইল, তিনি তখনও উহার প্রশংসা না করিয়া আর ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না।

সূর্য্যনাথ পুনরায় বলিলেন, 'পৌত্তলিক সেনাপতি! আপনার সত্যপ্রিয়তায় মুগ্ধ হইলাম, কিন্তু আপনাদের চিত্ত কৃতজ্ঞতা-স্বীকারে পরাঙ্‌মুখ বলিয়া বোধ হয়।'

শৃঙ্গধর একটু বক্রভাবে হাসিয়া বলিলেন 'কৃতজ্ঞ না হইলে, দৈত্য-সেনাপতি দুষ্কৃতির প্রতিফল এই দণ্ডেই পাইতেন।'

সূর্য্য। 'কি অপরাধ করিয়াছি, বলিবেন কি?'

শৃঙ্গ। 'অপরাধ যথেষ্ট, একটি ঋষিকন্যাকে বল পূর্ব্বক দাসী করিয়া রাখিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।'

সূর্য্য। 'দাসী নহে, তিনি আমার জীবনের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ হইবেন।'

শৃঙ্গ। 'বাগ্‌দত্তা কন্যা অপরের হইতে পারে না।'

সূর্য্য। 'কন্যা উপযুক্ত বয়সে আপনি ভর্ত্তা মনোনীত করিবে তজ্জন্য পিতৃ মাতৃ বাগ্‌দান গ্রহণীয় নহে।'

শৃঙ্গ। 'আপনার কথা যুক্তি বিরুদ্ধ। বিবাহ সম্বন্ধে যুবতী কন্যার মতামত কদাপি গ্রাহ্য নহে। যৌবন-সুলভ লালসা অজ্ঞাত-কুল-শীল যুবককেও পতিত্বে বরিত করাইতে পারে। কিন্তু পরে উহার

বিষময় ফল প্রেম-মুগ্ধা যুবতীরা প্রায়ই ভোগ করিয়া থাকেন। এই জন্য পিতা অনেক দেখিয়া শুনিয়া কন্যার বর মিলাইয়া দেন। ইহাই বাঞ্ছনীয়।'

সূর্য্য। 'কন্যার বৈবাহিক স্বাধীনতায় পিতা মাতার হস্তক্ষেপ সুনীতি পূর্ণ নহে।'

শৃঙ্গ। 'যে কন্যা আজন্ম পিতৃ-যত্নে এবং মাতৃ-স্নেহে লালিত ও বর্দ্ধিত, পিতা মাতার অনিচ্ছায় কোন রূপ স্বাধীনতাই তাহার পক্ষে অকৃতজ্ঞতাময়। বিশেষতঃ যে কন্যার ভাল মন্দের ভাগী পিতা এবং বিধবা হইলে কিম্বা ভরণ পোষণের সংস্থান না থাকিলে যাহাকে পিতৃ-গলগ্রহই হইতে হয়, বুদ্ধিমান পিতা, তাহাকে এরূপ স্বাধীনতা দিতে অগ্রসর হন না, এবং বুদ্ধিমতী কন্যাও এরূপ স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে অভিলাষিণী নহেন।'

সূর্য্য। 'নর নারী প্রকৃতির নিকট একই পদার্থ। নর,স্বাধীনতা ভোগ করিবে, নারী উহাতে বঞ্চিত রহিবে, এরূপ একদেশপূর্ণ ভাব স্বার্থময় এবং একান্ত নিষ্ঠুরতা, সুতরাং উহা কুনীতিপূর্ণ। যাঁহারা নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী হওয়া উচিত নহে।'

শৃঙ্গ। 'মানব কদাপি স্বাধীন নহে, যাঁহারা সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বাছিয়া চলেন, তাঁহারা কিরূপে স্বাধীন হইবার প্রয়াশী হইবেন? পুরুষগণ হইতে নারীর স্বাধীনতা স্বভাবতঃই ন্যুন তবে নারীগণকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে না দেওয়া যদি পিতা বা স্বামীর দোষ হইল, তবে আর উপায় নাই।—তাহা হইলে সংসার অরণ্য অশান্তিময়, এবং নরনারী সামান্য পশু পক্ষী তুল্য হইত। যে নারী পিতা মাতা, এবং ভর্ত্তার নিকট অকৃতজ্ঞ-প্রাণা, তাহার সংসারে স্থান না হওয়াই মঙ্গলের কারণ। পক্ষান্তরে নর নারীর গঠন-বৈচিত্র একবার ভাবিয়া দেখুন। নারী কোমলাঙ্গী, কারণ ঐ কোমলতায় শিশুর কোমল দেহ রক্ষা পাইবে। হৃদয় দয়াপূর্ণ, ঐ দয়া স্বামী পুত্র ও বৃদ্ধ পিতা মাতা ও শ্বশ্রূ প্রভৃতির অশান্তিতে, শান্তি পাইবার অবলম্বনীয়া। নারী দুর্ব্বলা, বিশেষ বল প্রয়োগ করিতে হইবে এমন কোন কার্য্য তাহারা করিতে অশক্ত। উহারা মৃদুগতি, উহাদের দৌড়িবার বা ভ্রমনশীলা হইবার প্রয়োজন অল্প। উহারা ভোজনপটু, উহা রন্ধনাদি কার্য্যের উদ্দীপনা বিশেষ। উহারা, মার্জ্জন ও পরিচ্ছন্নতা-প্রিয়, সুতরাং গৃহকার্য্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রূপে নির্ব্বাহ করা উহাদের কার্য্য। উহারা বেশ-বিন্যাসে অভিলাষিণী ও নিপুণা, স্বামী মনোরঞ্জন উহাদের উদ্দেশ্য। উহারা ব্যয়কুণ্ঠা, কেননা মিতব্যয় করিয়া নিজের ও স্বামী পুত্রের ভাবী অভাব নিবারণ জন্য ধন সঞ্চয় করা উহাদের প্রকৃতি। উহাদের গর্ভে সন্তান হয়, এবং একবার গর্ভ হইলে প্রথমতঃ দশ মাস, পরে সন্তান বড় না হওয়া পর্য্যন্ত উহারা একবারে অশক্ত। যাহারা এত অশক্ত, এত দুর্ব্বল, তাহাদিগকে "যাহা

খুসী তাহা করুক, যথা ইচ্ছা তথা গমন করুক” বলিয়া বুদ্ধিমান পুরুষেরা কদাপি ছাড়িয়া দেন না।

পুরুষের দেহ কঠিন, হস্তপদ কঠিন, হৃদয় কঠিন, উহারা কষ্টসহ, ভ্রমণ-পটু, নির্ভীক, উপার্জ্জন পটু, সুতরাং উহাদিগকে যথা ইচ্ছা ছাড়িয়া দিলেই কোন ভয়ের কারণ নাই। উহারা যেন বাহিরে থাকিয়া, বল বিক্রমে কিম্বা প্রভু দাসত্বে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া গৃহিণীর হস্তে আনিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবে, এই জন্যই গঠিত।

নারী সন্তান পালন, রন্ধন, গৃহ মার্জ্জন এবং স্বামী শুশ্রূষা করিয়া সংসারের সুবন্দোবস্ত করিবে।

পুরুষ গৃহসামগ্রী, যেমন করিয়া পারুক সংগ্রহ করিয়া দিবে। সুতরাং নারীগণ সর্ব্বতোভাবেই পুরুষের আশ্রিত, রক্ষিতা এবং গঠন, প্রকৃতি ও আবশ্যকতানুরোধে, অধীনা। কাহার সাধ্য এ অধীনতা হইতে উহাদিগকে মুক্ত করিবে? যে সংসারে নারী, অধীনতা হইতে মুক্ত, তথা সদা অশান্তি বিরাজমানা, এবং সেই সংসার উচ্ছৃঙ্খলতায় পূর্ণ। গায়ত্রীবালিকা বালসুলভ স্বাধীনতায় বনে বেড়াইতেছিল, —এই স্বাধীনতা টুক উহাকে নাদিলে আপনার মত লোকে বলিত “এ নিষ্ঠুরতা”—কিন্তু উহারই কারণ বালিকা অপহৃতা হইল, এখন তাহার পিতামাতার শোকদুঃখের আর পার নাই—দেখুন দেখি’?

সূর্য্যনাথ নীরবে চিন্তাকরিতে লাগিলেন, মনে মনে বলিলেন, ‘তর্কের মুখে কি ভাল কি মন্দ ইহা জগতে অল্পলোকই অল্প লোককে বুঝাইতে পারে, আমরা যাহা সুনীতি বলি, ব্রাহ্মণেরা তাহা কুনীতি বলে, উভয়ের যুক্তিই অসাধারণ, তবে কাহার কথা যথার্থে ইহা কে নিরূপণ করিবে?’

সূর্য্যনাথকে মৌনভাবাপন্ন দেখিয়া শৃঙ্গধর বলিলেন, ‘আমি আপনার নিকট একটি ভিক্ষা চাই।’

সূর্য্যনাথ বলিলেন, ‘ঐ বালিকা ব্যতীত যাহা চাহেন তাহাতেই প্রস্তুত আছি।’

শৃঙ্গধর অসিদ্ধমনস্কাম হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন—‘আপনি তবে দুরাচার হইতে নিবৃত্ত হইবেন না? না হউন, আমি অহুলের পক্ষ সমর্থন করিব। অহুল বা তাহার মঙ্গলেচ্ছু জগতে বর্ত্তমান থাকিতে আপনি ঋষিকন্যালাভে সমর্থ হইবেন না। ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া দুই খানি অস্ত্র লইয়া নির্জ্জন স্থানে চলুন, যিনি জীবিত থাকিবেন, তিনি গায়ত্রীকে লইয়া যাইবেন।’

সূর্য্যনাথ উচ্চরবে হাস্য করিয়া বলিলেন, ‘মনে করুন আমি আপনার নিকট পরাভূত হইলাম, কিন্তু উহাতে বালিকাকে কিরূপে পাইবেন? বালিকা কর্ত্তৃঠাকুরাণীর জীবনসর্ব্বস্বধন। আমি আপনাকে স্পষ্ট কথা বলিতেছি শুনুন! আপনি যাহাকে চাহিতেছেন, তাহাকে আমার দিবার কিম্বা রাখিবার অধিকার থাকিলে অবশ্যই দিতাম। আমার উহার প্রতি যে স্বার্থ আছে তাহা ছিন্ন করিয়াও দিতাম। আমি নির্ম্মলান্তঃকরণে প্রতিজ্ঞা করিতেছি আপ-

নাদের গায়ত্রী যদি অতুলকে ভুলিতে না পারে এবং আমা হইতে তাহাকে অধিক ভাল বাসে, তবে আমি তাহার সুখের কণ্টক হইব না। সূর্য্যনাথের এই শেষ কথাটি বলিতে দুই বিন্দু অশ্রুপাত হইল।

শৃঙ্গধর তাহা দেখিলেন। মহাশ্বেতার পবিত্র প্রণয় তাঁহার মনে পড়িল। ভাবিয়া দেখিলেন, গায়ত্রীকে ভাল বাসিতে সূর্য্যনাথের এ অধিকারে বাধা কি? অতুল ও সূর্য্যনাথের অধিকার একই রূপ, প্রণয়ের কিম্বা ভাল বাসার অধিকার উভয়েরই সমান। তথাপি বিচ্ছেদ সহ্যকরিয়া,পোষিত ভাল বাসা ছিন্ন করিয়া সূর্য্যনাথ আজ কি ভয়ঙ্কর উদারতা ও মহত্ব পূর্ণ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন!! তাঁহার প্রণয় কত শুদ্ধ এবং পূর্ণ। ঐ দুই বিন্দু অশ্রু ইহার প্রচুর নিদর্শন, আর তিনি যে প্রতিজ্ঞা পালনে অবহেলা করিবেন না, ঐ উষ্ণ ও লবণাক্ত অশ্রু দ্বয় তাহার সাক্ষী স্বরূপ। শৃঙ্গধরেরও প্রণয়ের আঘাত হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। উহার বিষম যন্ত্রণার ছায়া তিনি সূর্য্যনাথের বদনে ও যে প্রতিফলিত দেখিতে পাইবেন, বিচিত্র কি? শৃঙ্গধর বাষ্প ভার চক্ষে এবং ভগ্নস্বরে বলিলেন, 'সেনাপতি, আপনার হৃদয় এত উচ্চ,আমি স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই। আশা করি জগত আপনার নিকট স্বার্থ ত্যাগ করা শিখিবে।'

সূর্য্যনাথ হাসিয়া বলিলেন,বৌদ্ধ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য তাহাই। এই বলিয়া দেয়ালের গাত্র হইতে তীর ধনুখানি হাতে লইলেন। উহা দেখিয়া বিনায়ক ভীত হইলেন, শৃঙ্গধর হাসিয়া জিজ্ঞসা করিলেন, 'তীর ধনু দিয়া কি করিবেন?'

সূর্য্যনাথ কিছু নাবলিয়া, অল্প দূরস্থ একটি পলাশ তরুকে লক্ষ করিয়া তীর ক্ষেপণ করিলেন, লৌহময় সুতীক্ষ্ণ তীর বৃক্ষ-কান্ড ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। বিনায়ক ও শৃঙ্গধর বিস্মিত হইলেন।

শৃঙ্গধর মনে মনে বলিলেন,উঁহার সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে চাহিয়াছিলাম বোধ হয় সেই জন্যই এরূপ করিলেন, প্রকাশ্যে বলিলেন 'আপনার বাহুবল অসাধারণ।'

সূর্য্যনাথ আর একটি তীর ও ধনু শৃঙ্গধরের হস্তে দিয়া বলিলেন 'আপনিও ঐ বৃক্ষটি লক্ষ করিয়া তীর ক্ষেপণ করুন।'

শৃঙ্গধর, তীর যোগ করিয়া ধনুকে টঙ্কার দিলেন, ধনু তাহার অসীম বল সহ্য করিতে না পারিয়া মড়্ মড়্ শব্দে ভাঙ্গিয়া দুই খান হইয়া পড়িল।

সূর্য্যনাথ অপ্রতিভ এবং লজ্জিত হইয়া মনে মনে বলিলেন, 'এ লোকসম্ভব বল নহে, অসাধারণ, ভীষণ, ভয়ঙ্কর।'

এমন সময় একজন বৌদ্ধ সৈনিক আসিয়া তাঁহাকে বলিল, 'প্রভুজী আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।'

বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত সূর্য্যনাথকে কখনও স্মরণ হয় না, সুতরাং সূর্য্যনাথ কিছু চিন্তা করিয়া শৃঙ্গধরকে বলিলেন, 'আপনারা অদ্যই এস্থান হইতে প্রস্থান করুন, বিলম্ব হইলে বিপদ সম্ভাবনা,' এই বলিয়া চারিজনে, তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সার মর্ম্ম।

(১৩৩ পৃষ্ঠার পর।)

নবম দিন।

বিনোদ। আজি কি কথা বলিব ?

গোপী। আজিও ঈশ্বরতত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইবে। লোকে সাধারণতঃ ঈশ্বরকে সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। কিন্তু কি অর্থে ঈশ্বরকে স্রষ্টা বলা যাইতে পারে; কি অর্থে তিনি জগদাধার, এবং কি অর্থেই বা তিনি প্রলয়কর্ত্তা অদ্য প্রথমে তাহাই বিবেচিত হইবে।

বিনোদ। তুমি সকল সময়ে গীতার কথা বল কি না, সে বিষয়ে আমার বড় সন্দেহ উপস্থিত হয়। এজন্য তোমাকে অনুরোধ করি যে, তুমি অদ্য যখন যাহা বলিবে, তদ্বিষয়ে গীতা হইতে মূল সংস্কৃতটা উদ্ধৃত করিয়া দিবে।

গোপী। দিব। কিন্তু তুমি সংস্কৃত বুঝিবে কি ?

বিনোদ। বুঝি না বুঝি তুমি প্রকৃত কথা বলিতেছ কি না তাহা বুঝিতে পারিব।

গোপী। অবিশ্বাস দুর্ব্বলহৃদয়ের চিহ্ন। আমাদের ন্যায় বৃদ্ধ জাতির সকল কার্য্যেই অবিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। পিট বলিয়াছিলেন—'Confidence is a plant of slow growth in aged bosoms.' অর্থাৎ বৃদ্ধের হৃদয়ে বিশ্বাস-বৃক্ষ সহজে অঙ্কুরিত হয় না। সে যাহা হউক এক্ষণে গীতার কথা শুন। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'হে অর্জ্জুন! আমি বিশ্বাস-কারণ, এজন্য সমস্ত জীব এক অর্থে আমার উপর নির্ভর করিতেছে। আমিও কারণরূপে বিশ্বসংসারের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়াই যে আমি এই সমস্ত বস্তুর মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছি তাহা নহে।

(ময়া কারণভূতেন• সর্ব্বং ইদং জগৎ ব্যাপ্তং 'তৎসৃষ্ট্বা ভবেদানুপ্রবিশৎ ইত্যাদিশ্রুতেঃ।' অতএব কারণভূতে ময়ি তিষ্ঠন্তি সর্ব্বাণি ভূতানি। তেষু ভূতেষু নাহং অবস্থিতঃ) '

বিনোদ। একথার তাৎপর্য্য কি ?

গোপী। এ কথার তাৎপর্য্যকে তিন চারিটি অংশে বিভক্ত করিতে হইবে। যথা—

১। ঈশ্বর সংসারের নিমিত্ত কারণ (Efficient cause.)।সুতরাং ঈশ্বর না থাকিলে সংসারও থাকিত না। এজন্য এক অর্থে সমস্ত সংসার ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতেছে।

২। যে যাহার নিমিত্ত কারণ, সে তাহার মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে অনুপ্রবিষ্ট। মনে কর, আমি এক খানি পুস্তক রচনা

করিলাম। আমি ঐ পুস্তকের নিমিত্ত কারণ। এবং যদিও ঐ পুস্তকের মধ্যে আমার হস্ত পদাদি কিছুই অঙ্কিত থাকিবে না বটে, তথাপি ঐ পুস্তকের প্রত্যেক পত্রে আমি অনুপ্রবিষ্ট থাকিব। প্যারাডাইজ লষ্টের প্রত্যেক অক্ষরে মিলটন অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। এইরূপে ম্যাডোনাতে রাফেল অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। এইরূপে জগদীশ্বর পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।

৩। কেহ কেহ বলে যে জগদীশ্বর আমাদের হৃৎপদ্মের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন। একথা প্রকৃত নহে। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে, জীবগণ ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে।

৪। তবেই মূল কথা এই দাঁড়াইল যে, এক অর্থে ঈশ্বর জীবগণের মধ্যেও বিরাজিত আছেন (২। দেখ), এক অর্থে তিনি জীবগণের মধ্যে বিরাজিত নহেন (৩। দেখ)। ঈশ্বর জীবগণের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। ঈশ্বর জীবগণের মধ্যে অবস্থিত নহেন।

বিনোদ। ইহার সব কথাই স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু ঈশ্বর যে জগতের নিমিত্ত কারণ ইহার প্রমাণ গীতা কি দিয়াছেন?

গোপী। গীতা ঐ নিমিত্ত-কারণ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই স্বীকার্য্যও অবশ্যম্ভাবী। স্পেন্সার এতৎসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও বিচার করিয়া দেখ।

"Unless a real Absolute be postulated, the relative itself becomes absolute and so brings the argument to a contradiction."

সুতরাং নিমিত্তকারণ স্বীকার্য্য হইলেও অবশ্য স্বীকার্য্য। স্মরণ করিয়া রাখা আবশ্যক যে ঈশ্বরকে গীতা জগতের নিমিত্তকারণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

বিনোদ। কিন্তু গীতার কি এ বিষয়ে একটা মীমাংসা করা উচিত ছিল না?

গোপী। না। গীতা নীতিশাস্ত্র। ইহাতে ঈশ্বর মাহাত্ম্য প্রসঙ্গ ক্রমে উত্থাপিত হইয়াছে। যদি ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে চাও, তাহা হইলে গীতা-প্রণেতা ব্যাসদেব কৃত ভাগবত অধ্যয়ন করিতে হইবে।

বিনোদ। আচ্ছা যাউক। তার পরে বল।

গোপী। পরে কৃষ্ণ বলিতেছেন 'আমার আশ্চর্য্য প্রভাব অবলোকন কর। জীবগণ এক অর্থে আমাতে অবস্থান করে, আবার এক অর্থে আমাতে অবস্থান করে না।'

বিনোদ। ইহাই ত পূর্ব্বে একবার বলা হইল।

গোপী। না। পূর্ব্বে বলা হইল যে ঈশ্বর এক অর্থে জীবগণের মধ্যে বিরাজিত আছেন এবং এক অর্থে তিনি জীবগণের মধ্যে বিরাজিত নহেন। এক্ষণে দেখা হইবে যে জীবগণ এক অর্থে ঈশ্বরে অবস্থিত আছে, এক অর্থে অবস্থিত নহে।

বিনোদ। ইহার তাৎপর্য্য কি?

গোপী। ইহার তাৎপর্য্য শ্রীধর স্বামী

সুন্দর রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন 'অয়ং ভাবঃ—যথা দেহং বিভ্রৎ, পালয়ংশ্চ জীবঃ অহঙ্কারেণ তৎ সংশ্লিষ্টঃ তিষ্ঠতি, এবং অহং ভূতানি ধারয়ন্ পালয়ন্নপি তেষু ন তিষ্ঠামি নিরহঙ্কারত্বাৎ।' অর্থাৎ 'জীবের সহিত দেহের যে সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সহিত সংসারের সেই সম্বন্ধ। দেখ যেমন জীব দেহকে ধারণ করিয়া আছেন, ও দেহকে পালন করিতেছেন, সেইরূপ ঈশ্বরও জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন, এবং ঈশ্বরই জগৎকে পালন করিতেছেন। জীব অহঙ্কার বশতঃ দেহকে, আমার আমার বলিয়া মনে করে ও দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। কিন্তু ঈশ্বর নিরহঙ্কার। তাঁহার অহংজ্ঞান নাই। সুতরাং তিনি সংসারকে তাঁহার বলিয়া মনে করেন না ; এবং তিনি সংসারের সহিত কোন রূপে সংশ্লিষ্টও নহেন। অহঙ্কার ভিন্ন সংশ্লেষের সম্ভাবনা নাই।'

বিনোদ। এখানেও গীতা স্বীকার করিয়া লইতেছেন যে, ঈশ্বর জীবকে ধারণ ও পালন করিতেছেন। ইহা ভিন্ন আরও স্বীকার করা হইল যে ঈশ্বর নিরহঙ্কার।

গোপী। ঈশ্বর সর্ব্বাধার ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইল বটে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। জগৎ অবস্থান করিতেছে ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহাও সত্য যে, জগৎ কোথাও না কোথাও অবস্থিত আছে, যে জগতেরও আধার আছে। ঈশ্বরকে সেই জগদাধার বলা হইয়াছে।

বিনোদ। আকাশকে (space) কেন জগতের আধার বলা যাউক না ?

গোপী। কিন্তু আকাশের আধার কে ?

বিনোদ। আকাশ নিজেই নিজের আধার।

গোপী। তাহা হইলে আকাশই ঈশ্বর। হিন্দুদের মতে মহাকাশ আকাশের আধার এবং মহাকাশই ঈশ্বর।

বিনোদ। ঈশ্বর ধাতা ইহা যেন স্বীকার করিলাম। ঈশ্বর পাতা ইহাও কি অবশ্য স্বীকার্য্য ?

গোপী। ঈশ্বর সংসারের নিমিত্ত-কারণ, সুতরাং গৌণভাবে ঈশ্বর আমাদের পাতা। অর্থাৎ ঈশ্বর-দত্ত শক্তি প্রভাবেই এই সংসার বর্দ্ধিত হইতেছে।

বিনোদ। কিন্তু ঈশ্বর নিরহঙ্কার কেন ?

গোপী। আমরা অন্য বস্তু হইতে পৃথক্, এজন্য আমাদের অহং বুদ্ধি হয়। অর্থাৎ 'আমি আমি' বলিলে ইহাই বুঝাযায়, যে 'আমি তুমি নয়, আমি উনি নয়, আমি বৃক্ষ নয়, আমি প্রস্তর নয় ইত্যাদি'। কিন্তু ঈশ্বর যখন সর্ব্বময় তখন তিনি কাহা হইতে আপনাকে পৃথক্ করিবেন ?

বিনোদ। ঈশ্বর যদি সংসারের আধার হইলেন, তাহা হইলে ঈশ্বর সংসারের সহিত অসংশ্লিষ্ট, ইহা কিরূপে বলা-যায় ?

গোপী। কৃষ্ণ ইহার উত্তরে একটি

সুন্দর উপমার অবতারণা করিয়াছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'যথা বায়ু আকাশে অবস্থান করিয়াও যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারে, সেইরূপে সমস্ত সংসার আমাতে অবস্থান করে।' এই শ্লোকের ব্যাখ্যা স্থলে শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন—'অসংশ্লিষ্টয়োরপি আধারাধেয়ভাবং দৃষ্টান্তেন আহ। যথেতি। অবকাশং বিনা অবস্থানানুপপত্তেঃ নিত্যং আকাশস্থিতো বায়ুঃ সর্ব্বত্রগোঽপি মহানপি ন অকাশেন সংশ্লিষ্যতে নিরবয়বত্বেন সংশ্লেষাযোগাৎ তথা সর্ব্বাণি ভূতানি ময়ি স্থিতানি জানীহি।' অর্থাৎ—'আধার ভিন্ন অবস্থান অসম্ভব। এজন্য আকাশকে বায়ুর আধার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে। বায়ু আকাশে থাকিয়া যথেচ্ছ গমন করিতেছে, তথাপি আকাশের সহিত বায়ুর যোগ হইতেছে না। কেন না আকাশ নিরবয়ব পদার্থ, নিরবয়ব পদার্থের সহিত যোগ অসম্ভব। সেই রূপে সংসার ঈশ্বরে অবস্থান করিতেছে অথচ ঈশ্বর নিরবয়ব বলিয়া সংসারের সহিত ঈশ্বরের যোগ হইতেছে না।'

বিনোদ। তাহা যেন হইল। কিন্তু এখন মোট কথা কি কি দাঁড়াইল বল।

গোপী। মোট কথা দাঁড়াইল ঈশ্বর সংসারের নিমিত্ত—কারণ। তিনি সংসারে অনুপ্রবিষ্ট, কিন্তু সংসারে অবস্থিত নহেন।

২। ঈশ্বর সংসারের ধাতা ও পাতা অথচ ঈশ্বর সংসারের সহিত সংলিপ্ত নহেন।

বিনোদ। বুঝিলাম অন্য কথা বল।

গোপী। কৃষ্ণ পূর্ব্বে বলিলেন, ঈশ্বর দাতা হইয়াও ধাতা নহেন। এইক্ষণে কৃষ্ণ বলিতেছেন, ঈশ্বর সংহর্ত্তা হইয়াও সংহর্ত্তা নহেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'প্রলয় কালে সমস্ত জীব বিনষ্ট হইয়া আমার ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায় লীন হয়। আবার কল্পারম্ভে আমিই ঐসমস্ত জীবগণকে সৃজন করি।'

বিনোদ। ইহার অর্থ কি?

গোপী। ইহার অর্থ অতি কঠিন। মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। সংসারে যত প্রকার পদার্থ বা যত প্রকার গুণ আছে, তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। লোহিত বর্ণের যত প্রকার পদার্থ, তাহাদিগকে সত্ত্ব গুণের অন্তর্ভূত করা যায়। শ্বেত বর্ণের পদার্থকে রজোগুণের অন্তর্ভূত করা যাইতে পারে। কৃষ্ণবর্ণের পদার্থকে তমোগুণের অন্তর্ভূত করা যায়। "Nature is red, white and black." Here the words red, white and black express the qualities goodness (সত্ত্ব), activity (রজঃ), and darkness (তমঃ)" Sarva Darsan Sangraha P. 227.

কিন্তু পৃথিবীতে যত প্রকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশেই সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে মিশ্রিত থাকে। তাহাদের কোন

টিতে বা সত্বের, কোনটিতে বা রজঃ পদার্থের কোনটিতে বা তমঃ পদার্থের প্রাধান্য থাকে। এইরূপ প্রাধান্য থাকে বলিয়াই আমরা বস্তুতে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি গুণমালার অনুভব করিতে পারি। যদি কোন বস্তুতে সত্ব রজঃ ও তমঃ সমভাবে মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে ঐ বস্তুর রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি কোনপ্রকার গুণই থাকিবে না। যেমন-কোন বস্তুতে তিন দিক হইতে তিনটি সমান বল প্রয়োগ করিলে ঐ বস্তুতে কোনরূপ গতির সঞ্চার হয় না, সেইরূপ সত্ব রজঃ ও তম এই তিন পদার্থ সমপরিমাণে বিশ্রিত করিলে উহাদের দ্বারা রূপবান্ বা রসবান, বা গন্ধবান্ বা স্পর্শবান বা শব্দবান্ কোনরূপ পদার্থ নির্ম্মিত হয় না। ঈশ্বরে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ কোন রূপ গুণ নাই ইহার অর্থ এই যে ঈশ্বরে সত্ব রজঃ ও তমঃ সমভাবে মিশ্রিত আছে। ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন পদার্থে সত্ব রজঃ ও তমঃ এই কয় পদার্থের সমসম্মিলন হইতে পারে না।

বিনোদ। ভাল করিয়া বুঝিলাম না।

গোপী। তবে আইস, পুনরায় বুঝিতে চেষ্টা করি। উৎকৃষ্ট পদার্থের অনুভব করা সহজ। নিকৃষ্ট পদার্থের অনুভব করাও সহজ। মধ্যম পদার্থের অনুভব করাও সহজ। পৃথিবীতে যত প্রকার পদার্থ আছে তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট, ও মধ্যম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি কি না ?

বিনোদ। অবশ্য পারি।

গোপী। এমন কোন বস্তুর অনুভব করিতে পার কি না, যাহা যে পরিমাণে উৎকৃষ্ট, সেই পরিমাণেই নিকৃষ্ট ?

বিনোদ। পারি। মধ্যম বস্তুর অর্থই এই যে ইহা যে পরিমাণে উৎকৃষ্ট, সেই পরিমাণেই নিকৃষ্ট।

গোপী। ত্রিশঙ্কু মধ্যস্থলে ছিলেন, ইহার অর্থ এই যে ত্রিশঙ্কু যে পরিমাণে পার্থিব, সেই পরিমাণেই স্বর্গীয়। যদি ঐ পরিমাণের বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় হয়, তাহা হইলেই ত্রিশঙ্কুকে হয় স্বর্গীয় নয় পার্থিব বলিতেই হইবে।

বিনোদ। ইহাত সহজ কথা। ইহা লইয়া এত গোল করিতেছ কেন ?

গোপী। বুঝিবার জন্য অনেক গোল প্রয়োজন। সে যাহা হউক, এমন কোন বস্তুর অনুভব করিতে পার কি না, যাহা যে পরিমাণে উৎকৃষ্ট, সেই পরিমাণে মধ্যম ও সেই পরিমাণে নিকৃষ্ট।

বিনোদ। না।

গোপী। তাহা হইলেই দেখিলে উৎকৃষ্ট মধ্যম ও নিকৃষ্ট যদি সমপরিমাণে সম্মিলিত হয়, তাহা হইলেই গুণের সম্পূর্ণ তিরোধান হয়। অর্থাৎ যদি কোন বস্তু সমপরিমাণে উৎকৃষ্ট মধ্যম ও নিকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে গুণ বাচক কোন শ্রেণীরই অন্তর্ভূত করা যায় না।

বিনোদ। বুঝিলাম।

গোপী। আচ্ছা। এই সাধারণ নিয়ম বিশেষ উদাহরণে প্রয়োগ কর। উৎকৃষ্ট রূপ, মধ্যম রূপ, ও নিকৃষ্ট রূপ এই তিন রূপের

সমসম্মিলন হইলে, রূপের তিরোধান হইবে। উৎকৃষ্টরস, মধ্যমরস, নিকৃষ্টরস এই তিন রসের সমসম্মিলন হইলে রসের তিরোধান হইবে। উৎকৃষ্টগন্ধ,মধ্যমগন্ধ ও নিকৃষ্ট গন্ধ এই তিন গন্ধের সমসম্মিলনে গন্ধের তিরোধান হইবে। ইত্যাদি। ঈশ্বরে সর্ব্ব পদার্থ ও সর্ব্বগুণ ঐ রূপে (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ও মধ্যমভাবে) সম্মিলিত আছে। সুতরাং ঈশ্বরে যাবতীয় পদার্থ ও গুণ সম্পূর্ণরূপে নিহিতথাকা সত্বেও তিনি নীরূপ, নির্স্বস, নির্গন্ধ ও নিঃশব্দ।

বিনোদ। এত বড় সুন্দর কথা।

গোপী। সুন্দর কথা বই কি? ঈশ্বর সর্ব্বগুণের সম্পূর্ণ আধার, এবং তিনি উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট ও মধ্যম এই তিনের সমষ্টি। এবং সেই জন্যই তিনিই নিরাকার নিরবয়ব ইত্যাদি। যেমন সমুদ্র পরিপূর্ণ হইলেই গতিহীন ও শব্দহীন হয়, সেইরূপ ঈশ্বর পরিপূর্ণ বলিয়াই তিনি নীরূপ, নির্গন্ধ ইত্যাদি। এক কথায় ঈশ্বর Absolute অথবা সম্পূর্ণ পদার্থ। তাঁহাতে সর্ব্বপদার্থ সর্ব্বগুণ সমভাবে সম্মিলিত আছে। যদি ঈশ্বর থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ঐ ভাবে ভিন্ন অন্য ভাবে বুঝা অসম্ভব।

বিনোদ। ঈশ্বর ত্রিগুণাত্মক তাহা বুঝিলাম। কিন্তু কৃষ্ণ মায়া অর্থে কি বলিলেন তাহা এখনও বুঝি নাই। তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছিলে 'প্রলয়কালে বস্তু সকল ঈশ্বরের ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায় লীন হয়। মায়া কি?

গোপী। ইহা ইংরেজীতে বুঝাইলে তোমার পক্ষে সহজ] হইবে। পূর্ব্বে যে সত্বরজস্তমোমণ্ডিত দ্রব্য ও গুণের কথা বলা হইল, সেগুলি ঈশ্বরের মায়া। অর্থাৎ —Those are the *Phenomena* evolved by God, ঐ Phenomena গুলি জীবে একভাবে থাকে ও ঈশ্বরে অন্যভাবে থাকে। কিন্তু যাহা কিছু দ্রব্য ও যাহা কিছু গুণ সে সমস্তই সত্ব রজঃ তমঃ এই তিন শ্রেণীতে বিভাজিতব্য এবং সে সমস্তই মায়া অর্থাৎ *Phenomena.*

বিনোদ। তবে ঈশ্বর আবার কি?

গোপী। ঈশ্বর সৎ পদার্থ অর্থাৎ ঈশ্বর noumenon.

ঈশ্বরকে পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল পূর্ণ পদার্থ অর্থাৎ (Absolute)। এক্ষণে তাঁহাকে বলা হইল তিনিই সৎ (Noumenon or real) এই দুই কথা একত্র করিলে দাঁড়াইল যে ঈশ্বর—(The Real Absolute)

বিনোদ। Noumenon ও Phenomena এই উভয়ে কি প্রভেদ তাহা আমার স্মরণ নাই।

গোপী। তুমি জুলাই মাসের Nineteenth centuryতে স্পেন্সার প্রণীত প্রবন্ধটি পাঠ করিও। তোমার লুপ্তস্মৃতি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। আমি তাহার মধ্য হইতে একটি কথা তোমাকে বলিতেছি।—"The unknowable is the ultimate Reality, the Sole Existence, all things present to consciousness being merely shows of it." দেখ প্রাচীন সংস্কৃতের সহিত স্পেন্সারের যে শুদ্ধ ভাবের

ঐক্য আছে তাহা নহে, উভয়ের মধ্যে ভাষার ঐক্যও বিস্ময়কর। প্রাচীন সংস্কৃত যাহাকে মায়া বলিতেন, স্পেন্সার তাহাকে show বলিতেছেন। সত্বতমঃ রজঃ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, এবং ঐগুলি ঈশ্বর-মায়া shows of God. ইহাকেই অন্য অন্য ইংরাজী দার্শনিকেরা Phenomenon বলিয়াছেন।

বিনোদ। প্রলয়কালে পদার্থ সকল ঈশ্বরের মায়াতে লীন হয়, একথার অর্থ কি?

গোপী। পদার্থ অবিনশ্বর। Mattor is indestructible। স্থূল পদার্থের বিনাশ হইলে, তাহা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম পদার্থে পরিণত হইতে থাকে। এই যে প্রস্ফুটিত পদ্মটি সম্মুখে দেখিতেছ, কিছুদিন পরে ইহার কি অবস্থা হইবে ভাবিয়া দেখ। ইহার দল গুলি শুষ্ক হইয়া যাইবে। অর্থাৎ ইহার রূপের আংশিক বিনাশ হইবে, পরে ঐ দল বারি মধ্যে নিপতিত হইয়া পচিতে থাকিবে। তাহার কিছুদিন পর ঐ দল সমূহের চিহ্ন মাত্রও থাকিবে না। অর্থাৎ ঐ পত্রটি স্থূল পদার্থ হইতে তরল পদার্থে পরিণত হইয়া যাইবে। পরে ঐ তরল পদার্থই বায়বীয় পদার্থে পরিণত হইবে। কিন্তু ঐ বায়বীয় পদার্থ থাকিবে কোথায়?

বিনোদ। থাকিবে আকাশে।

গোপী। কিন্তু আকাশের সহিত ত উহা মিলিত হইবে না। উহা মিলিত হইবে কাহার সহিত?

বিনোদ। উহা মিলিত হইবে উহার ন্যায় অন্য বায়বীয় পদার্থের সহিত।

গোপী। গীতাতেও তাহাই বলা হইতেছে। একটি পদার্থ ধরুন। ঐ পদার্থ বিনষ্ট হইল। অর্থাৎ উহা বায়বীয় পদার্থে পরিণত হইল। কিন্তু বায়ুরওত স্থূল ও সূক্ষ্ম আছে। যাহা প্রথমে স্থূল বায়ুময় ছিল তাহা ক্রমে সূক্ষ্ম বায়ুময় হইবে। অর্থাৎ ঐ পদার্থ হইতে ক্রমশঃ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ প্রভৃতির তিরোধান হইবে। এইরূপ তিরোধান হইতে হইতে এমন এক সময় আসিবে যখন উহাতে ঐ গুণ মালার একটিও দৃষ্ট হইবে না। অর্থাৎ তখন উহা ঈশ্বরের মায়াত্মিকা প্রকৃতির ন্যায় নীরূপ, নির্গন্ধ প্রভৃতি হইবে। এবং তখনই উহা ঐ প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত হইয়া যাইবে।

বিনোদ। বুঝিলাম। কিন্তু তুমি এখনত সত্ব প্রভৃতি গুণের সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে না।

গোপী। যখন কোন বস্তুর বিনাশ হয়, তখন হইতেই সত্ব তমঃ ও রজঃ এই গুণত্রয়ের বিবাদ আরম্ভ হয়। যত দিন উহাদের মধ্যে একটিরও অন্যটির উপর প্রাধান্য থাকে, ততদিন ঐ বিবাদের শান্তি হয় না, এবং ততদিন ঐ বস্তু কোন না কোনরূপে আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর থাকে। কিন্তু যখন উহাতে সত্ব রজঃ ও তমঃ সমানরূপে বণ্টিত হয় তখন গুণসাম্য হওয়াতে ঐ পদার্থ হইতে রূপ রস প্রভৃতির অন্তর্ধান হয় এবং তখন উহা গুণসাম্যাধার ঈশ্বর প্রকৃতিতে লীন হয়। সমান বস্তুর সহিত সমান বস্তুর মিলন হইয়া যায়।

বিনোদ। বুঝিলাম। কিন্তু কোন বর্ত্তমান দার্শনিকে কি একথা স্বীকার করেন?

গোপী। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য। স্পেন্‌সার নিজেই একথা স্বীকার করিয়াছেন। "It is the Eternal and Infinite Energy, out of which, Humanity has quite recently emerged and into which, in course of time, it must subside."

বিনোদ। প্রাচীন সংস্কৃতের সহিত পণ্ডিত-কেশরী স্পেনসারের এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য বাস্তবিকই বিস্ময়কর। কিন্তু তুমি এত নূতন কথা বলিতেছ যে আমি বাঁশবনে ডোম কাণা হইয়া যাইতেছি।

গোপী। এক দিনে কোন কথাই শিখা যায় না। পুনঃ পুনঃ এই বিষয়ের আলোচনা করিলেই জ্ঞানের পরিস্ফূর্ত্তি হইতে থাকিবে। সংসারের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় ইহা কি সহজে বুঝিবার কথা? এক্ষণে বুঝিয়া দেখ কৃষ্ণ কি কি বলিলেন।

১। আমি জীবগণে অবস্থিত থাকিয়াও অবস্থিত নহি (আমি নিমিত্ত কারণ)।

২। জীবগণ আমাতে অবস্থিত থাকিয়াও আমাতে অবস্থিত নহে, (জীবগণ আমার সহিত অসংশ্লিষ্ট অথচ আমি জগদাধার)।

৩। আমি সকল বস্তুর সংহার করিতেছি, অথচ ঐ সমস্ত বস্তুই বিনাশের পর আমার সহিত সম্মিলিত হইতেছে।

৪। আমিই সৎ। মনুষ্যে যাহা ধারণা করিতে পারে তাহা আমার মায়া মাত্র, তাহা আমার সত্বার প্রতিবিম্ব মাত্র।

৫। আমিই সম্পূর্ণ, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য ও সর্ব্বপ্রকার গুণ আমাতে সম ভাবে সম্মিলিত আছে।

বিনোদ। ইহার সব কথাই একরূপ একরূপ বুঝিয়াছি। এক্ষণে অন্য কথা বল।

গোপী। তাহার পরে কৃষ্ণ বলিতেছেন এক অর্থে আমিই স্রষ্টা, আবার এক অর্থে আমিই স্রষ্টা নহি। কৃষ্ণ বলিতেছেন, 'সত্ব রজঃ তমঃ এই গুণের সাম্য স্থল যে প্রকৃতি আমি আমার সেই প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া সংসার সৃজন করিতেছি। অর্থাৎ আমি প্রকৃতি হইতে সাহায্য গ্রহণ না করিলে, সৃজন করিতে পারি না। আমি সংসারের নিমিত্ত কারণ (efficient cause)। কিন্তু প্রকৃতি রূপ সংসারের উপাদান কারণ (material cause) ব্যতিরেকে আমি সৃজন করিতে পারি না।আবার ঐ উপাদান কারণও আমার আয়ত্ত।

বিনোদ। তবে কি ঈশ্বর উপাদান-কারণের সৃষ্টি করেন নাই?

গোপী। এ বিষয়ে মতভেদ আছে। গীতাতে আছে 'স্বাং প্রকৃতিং।' ইহার অর্থ দুই রূপই হইতে পারে। এমন হইতে পারে যে কৃষ্ণ 'স্বাং' অর্থে 'মদীয়াং'

বুঝিয়াছিলেন। অথবা এমনও হইতে পারে যে কৃষ্ণ 'স্বাং' অর্থে 'স্বাধীনাং' বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতি ঈশ্বর-প্রসূত হউন বা না হউন, কৃষ্ণ এস্থলে কেবল ইহাই বলিতেছেন যে 'আমি স্রষ্টা হইলেও প্রকৃতিকে ব্যতিক্রম করিতে পারি না।' আবার কৃষ্ণ ইহাও বলিতেছেন যে প্রকৃতিতে যে সমস্ত গুণ অবস্থান করে, তাহারা প্রকৃতির অধীন নহে; অর্থাৎ তাহারা প্রকৃতির অধীন নহে, তাহারা আপন আপন স্বভাবের বশীভূত। তাহারা 'অবশং' অর্থাৎ তাহারা 'স্বস্ব কর্ম্মাদি পরবশং।' প্রকৃতিতে যে সত্বগুণ আছে সেই সত্বগুণটি নিজ স্বভাব বা ধর্ম্ম অনুসারে কার্য্য করিবে। প্রকৃতি অথবা ঈশ্বর সে গুণের পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

বিনোদ। তাহা হইলে বলা হইল যে ঈশ্বর স্রষ্টা হইয়াও সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন নহেন। তিনি হয়ত প্রথমতঃ প্রকৃতির অধীন। দ্বিতীয়তঃ তিনি প্রকৃতিস্থ গুণ-মালার স্বভাবের অধীন।

গোপী। হাঁ ইহাই বলা হইল। ঈশ্বর স্জন করিতেছেন সত্য, কিন্তু যদি সংসারের উপাদান স্বরূপ প্রকৃতি না থাকিত, তাহা হইলে ঈশ্বর হয়ত স্জন করিতে পারিতেন না। ইহা ভিন্ন স্জন কালেও ঈশ্বর প্রকৃতিস্থ পদার্থগণের গুণ ব্যতিক্রম করিতে পারেন না। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিয়া সত্বে রজের বা রজে সত্বের আবির্ভাব করিতে পারেন না।

বিনোদ। বুঝিলাম, তার পরে বল।

গোপী। তার পরে ঈশ্বর বলিতেছেন 'আমি ইচ্ছা বশতঃ স্জন করি না। আমি আমার স্বভাব বশতঃ স্জন করি।'

বিনোদ। 'ইচ্ছা বশতঃ স্জন করি' একথা বলিলে কি কিছু অন্যায় কথা হইত?

গোপী। হইত বই কি? যিনি আপ্তকাম, যিনি বাঞ্ছনীয় সকল দ্রব্যেরই অধিকারী, তাঁহার ইচ্ছার স্থল কোথায়? জগদীশ্বরের ইচ্ছনীয় বিষয় নাই, সুতরাং ইচ্ছাও নাই।

বিনোদ। বুঝিলাম, তার পরে বল।

গোপী। কৃষ্ণ বলিতেছেন 'প্রকৃতি আমার সম্মুখে থাকিয়া সকল কার্য্য করিতেছে। আমি কোন কার্য্যেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করি না। আমি অধ্যক্ষরূপে উদাসীনের ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছি।'

বিনোদ। তাত বটেই। যখন সকল বস্তুই নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে প্রসূত হইতেছে, তখন জগদীশ্বর একরূপ উদাসীন বই আর কি? তবে তিনি প্রকৃতির অধ্যক্ষ কিরূপে তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

গোপী। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ঈশ্বর প্রকৃতির নিমিত্ত কারণ। এতদ্ভিন্ন ঈশ্বর প্রকৃতির প্রত্যেক অংশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। তদ্ভিন্ন প্রকৃতি ঈশ্বরে অবস্থিত রহিয়াছেন। এস্থলে কাজেই ঈশ্বরকে অধ্যক্ষ বলিতে হইয়াছে। শ্রীধর স্বামীও বলিয়াছেন 'সন্নিধিমাত্রেণ অধিষ্ঠাতৃত্বাৎ কর্ত্তৃত্বং উদাসীনত্বঞ্চ অবিরুদ্ধং।' অর্থাৎ প্রকৃতি ঈশ্বরে অবস্থিত আছেন, অথচ প্র-

কৃতি নিজ স্বভাব অনুসারে কার্য্য করিতেছে; অতএব ঈশ্বরকে এক কালেই কর্ত্তা ও উদাসীন বলা অসম্ভব নহে।

বিনোদ। কৃষ্ণ আজি ঈশ্বরকে বড়ই অসম্ভব গুণের আধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দেখ কৃষ্ণ স্রষ্টা হইয়াও অস্রষ্টা, পাতা হইয়াও অপাতা, সংহর্ত্তা হইয়াও অসংহর্ত্তা, ধাতা হইয়াও অধাতা, স্বাধীন হইয়াও পরাধীন, কর্ত্তা হইয়াও উদাসীন।

গোপী। কৃষ্ণ প্রথমেই ঐ কথা বলিয়াছিলেন। কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন 'পশ্যমে যোগমৈশ্বরং' অর্থাৎ আমার অঘটনঘটনাচাতুর্য্য অবলোকন কর। এই জন্যই সাধারণ একটি সঙ্গীতে ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে 'অসম্ভব যত, তোমাতে সম্ভব।' কিন্তু সে যাহা হউক, এক্ষণে অন্য কথা শ্রবণ কর। কৃষ্ণ বলিতেছেন 'যাহাদের হৃদয় হিংসাপ্রবণ, যাঁহারা কামদর্পাদি দ্বারা কলুষিত, তাহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া বৃথা আশা, বৃথা জ্ঞানে ও বৃথা কর্ম্মে আপনাদিগকে নিয়োজন করে। তাহারা বৃথা সুখ-প্রাপ্তির আশয়ে অন্য দেবতার পূজায় আপনাদিগকে নিয়োজিত করে। আমি সর্ব্বভূতের অধিপতি এই পরম তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া আমাকে মানুষ জ্ঞানে অবমাননা করে। আমি যে ভক্তেচ্ছাবশতঃ আমার শুদ্ধ সত্ত্বময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য দেহ অবলম্বন করিয়াছি, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না।

বিনোদ। এস্থলে কৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। তুমি কি এখানেও গীতার মত সমর্থন করিতে প্রস্তুত আছ?

গোপী। কৃষ্ণ যদি বলিতেন আমি যশোদানন্দন, গোপিকামোহন, কংসনিসূদন, তাহা হইলে কৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলিতে কুণ্ঠিত হইতে পারিতাম। কিন্তু যখন কৃষ্ণ বলিতেছেন যে তিনিই সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ও অধিষ্ঠাতা, যখন কৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, তখন আর কুণ্ঠিত হইবার কারণ দেখি না। সাধারণ হিন্দু অবতারে অবিশ্বাস করিত না। তুমি কৃষ্ণকে ঈশ্বর বল বা না বল, তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু কৃষ্ণ ঈশ্বরকে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যদি তুমি স্বীকার কর, তাহা হইলে কাজের কথা সকলই স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। কৃষ্ণকে কৃষ্ণ বলিয়া পূজা করা এক কথা, আর কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করা আর এক কথা। ঈশ্বরকে পূজা করা কর্ত্তব্য কার্য্য। ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়া না ভাবিয়া কৃষ্ণ বলিয়া ভাবিলে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। নাম যাহাই হউক না কেন, আসল কথাটা ঠিক থাকিলেই হইল।

বিনোদ। কিন্তু তুমি একথা ত নিজেই বলিলে। কৃষ্ণত বলিলেন যে তিনিই ঈশ্বর।

গোপী। কৃষ্ণ কিঞ্চিৎ পরেই বলিয়াছেন 'নানা লোকে আমাকে নানা ভাবে পূজা করিতে পারে। কেহ বা ভাবিতে পারে যে সে আমার দাস; কেহ বা ভাবিতে পারে, যে আমি সর্ব্বব্যাপী পরমে-

শ্বর।' আবার দশম অধ্যায়ে কৃষ্ণ বলিয়াছেন 'যখন আকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখিতে পাইবে, তখন সেই চন্দ্রকে 'আমি' অর্থাৎ পরমেশ্বর বলিয়া পূজা করিবে। যখন নিম্নে সমুদ্র দেখিতে পাইবে, তখন সেই সমুদ্রকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিবে। স্থাবর সমূহের মধ্যে আমাকে হিমালয় বলিয়া মনে করিবে। এবং স্রোতস্বতীর মধ্যে আমাকে গঙ্গা বলিয়া মনে করিবে ইত্যাদি।' তাহার পরে, একাদশ সর্গে কৃষ্ণ নিজ শরীর মধ্যে নদী পর্ব্বত সমস্ত দেখাইলেন। এই সব দেখিলে তুমি কি কৃষ্ণকে সাধারণ মনুষ্য বলিয়া ভ্রমে পতিত হইতে পার?

বিনোদ। কিন্তু তথাপি মনুষ্য ও ঈশ্বর এক ইহা বলিতে প্রবৃত্তি হয় না।

গোপী। ঈশ্বর স্বর্গ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া আমাদের মধ্যে আমাদের হিতের জন্য বন্ধুভাবে বিচরণ করিতেন, ইহা বলিলে বা ভাবিলে অন্যায় কি হয়?

বিনোদ। অন্যায় হউক বা না হউক ইহা কি সত্য?

গোপী। যাঁহারা দেব চরিত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহারা কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে জয় করিয়াছেন, এবং ধর্ম্ম পথে উন্নতি করাই যাঁহাদের পরম ব্রত, চিত্ত সংশুদ্ধিই যাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাঁহারা কৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলিয়া মনে করিয়া লইতে পারেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে পরমেশ্বরকে সহজে ভাবনা করিবার জন্য কৃষ্ণে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিলে কোন ক্ষতি হয় না। ঈশ্বর কি পদার্থ তাহা ভাল করিয়া বুঝিলে, যে কোন দ্রব্যে, বা যে কোন ব্যক্তিতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করা যায়, তাহাতে কোন প্রত্যবায় হয় না। কেবল এই মাত্র স্মরণ রাখা উচিত, যে যাহাতে একবার ঈশ্বরত্ব আরোপ করা গেল, তাহাতে চিরকালই ঈশ্বরের গুণ লক্ষ্য করিতে হইবে। যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবনা বা কল্পনা করা গেল, তাঁহাকে আর মনুষ্য বলিয়া ভাবনা করা যাইতে পারে না। যাঁহারা কাম ক্রোধাদির দমন করিতে পারে নাই, তাঁহারা যে কৃষ্ণকে মনুষ্য বলিয়া মনে করিবেন, তাহা কৃষ্ণ আগেই বলিয়াছিলেন। গীতা মধ্য হইতে এই কথা বলিয়া পুনরায় ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন। কৃষ্ণ কিরূপে মনুষ্য হইয়াও ঈশ্বর হইলেন, কিরূপে ঈশ্বর হইয়াও মনুষ্য হইলেন, তাহা শুদ্ধতত্ত্ব, নির্ম্মল-চিত্ত, দেব-প্রকৃতিক ব্যক্তিতেই বুঝিতে পারেন। অন্যের কাছে তুমি আমি যেরূপ মনুষ্য, কৃষ্ণও সেইরূপ।

বিনোদ। এ বিষয়ে তোমার সহিত আমার মতের মিল হইবে না। না হউক, তুমি গীতার ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনা করিতে থাক।

গোপী। সেই কথাই ভাল। কৃষ্ণ বলিতেছেন 'যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহাদের কেহ বা আমাকে তাঁহাদের সহিত একাত্মা মনে করেন, কেহ বা আমাকে তাঁহাদের প্রভু বলিয়া মনে করেন, কেহ বা আমাকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া মনে করেন। যাঁহারা আ-

মাকে ভক্তিভাবে অবলোকন করেন, তাঁহারা আমার নাম কীর্ত্তনাদি দ্বারা সর্ব্বদা আমার উপাসনা করেন।'

বিনোদ। যে ঈশ্বর উদাসীন, তাঁহাকে উপাসনা করায় লাভ কি?

গোপী। লাভ থাকুক বা না থাকুক, ঈশ্বরের হস্ত অতিক্রম করিবার উপায় নাই। যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই ঈশ্বরকে নিমিত্ত কারণ রূপে দেখিতে পাইবে। এবং যে একবার ঈশ্বরকে সংসারের নিমিত্ত কারণ বলিয়া উপলব্ধি করিবে, সে স্বভাবতঃই ঈশ্বরানুরাগ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, ভক্তিভাবে তাঁহার আশ্চর্য্য প্রভাব ধ্যান করিবে। কৃষ্ণ এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন 'আমি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ববস্তুর নিমিত্ত কারণ, আমি সকল বস্তুতেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছি। আমি বেদোক্ত যজ্ঞ, আমি স্মৃতিবিহিত হোমযাগাদি, আমি শ্রাদ্ধ, আমি অন্ন, আমি মন্ত্র, আমি ঘৃত, আমি অগ্নি। পৃথিবীর আমিই পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহী, আমিই বেদ, আমিই ওঙ্কার। আমিই সংসারের গতি; আমিই পালন কর্ত্তা, আমিই নিয়ন্তা, আমিই শুভাশুভদ্রষ্টা সাক্ষী, আমিই রক্ষক, আমিই মঙ্গলদাতা। আমিই সংসারের স্রষ্টা ধাতা ও সংহর্ত্তা, আমিই তাপ, আমিই বৃষ্টি, আমিই মৃত্যু, আমিই অমৃত। আমিই স্থূল, আমিই সূক্ষ্ম। যদি তুমি ভক্তিভাবে অন্য দেবতাকে পূজা কর, তাহা হইলে প্রকারান্তরে আমাকেই পূজা করা হইল। কারণ আমি সকলেরই নিমিত্ত কারণ ও সর্ব্বব্যাপী। যে যাগ যজ্ঞ হইতেছে, সবই আমার উদ্দেশ্যে হইতেছে। যাহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাহারা সকল বস্তুতে আমাকে দেখিয়া সদ্বিধিমতে আমাকেই পূজা করে। যাহারা জ্ঞানহীন তাহারা অন্যবস্তু হইতে আমাকে পৃথক করিয়া আমাকে অবিধি পূর্ব্বক পূজা করে। কোন রূপেই কেহ আমাকে অতিক্রম করিতে পারে না।'

বিনোদ। তাহা যেন বুঝিলাম। কিন্তু এই যে বিধিপূর্ব্বক পূজা ও অবিধি পূর্ব্বক পূজা এ উভয়ের ফল কি এক রূপ?

গোপী। যাহারা ইন্দ্রবরুণাদি দেবতা বিশেষকে ঈশ্বর বোধে পূজা করে, তাহারা দেব লোক প্রাপ্ত হয়। যাহারা মৃত পিতা প্রভৃতিকে ঈশ্বর বোধে পূজা করে, তাহারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়। যাহারা সর্পাদিকে ঈশ্বর বোধে পূজা করে, তাহারা নাগ লোক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহারা ঈশ্বরকে সর্ব্বময়, সর্ব্বাধিপতি, সর্ব্বব্যাপী ভাবিয়া পূজা করে, তাহারা বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিয়া অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করে। যাহারা দেববিশেষকে পূজা করে, তাহারা কিছু কালের জন্য স্বর্গ ভোগ করে। যাহারা সর্ব্বময় ঈশ্বরকে সংসারের সর্ব্বত্র দেখিতে পায়, তাহারা অক্ষয় ও অনন্ত স্বর্গ ভোগ করে।

বিনোদ। ইহা বড় সুন্দর কথা। ইহাতে কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবে না।

গোপী। না। কিন্তু কৃষ্ণ ঈশ্বর পূজার যে ক্রম দেখাইয়াছেন তাহা আরও সুন্দর। কৃষ্ণ বলিতেছেন 'আমার পূজার জন্য বহু-

ব্যয় সাধ্য যাগ যজ্ঞাদি কিছুরই প্রয়োজন নাই। ভক্তি সহকারে আমাকে পুষ্প পত্র ফল জল প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিলেই যথেষ্ট হয়।' ইহা দ্বারা কৃষ্ণ পশুবধ প্রভৃতি কার্য্যেরও কথঞ্চিৎ নিবারণ করিলেন। এই সব সাধারণ যুক্তি ও তর্কের উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে পরামর্শ দিতেছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন 'হে অর্জুন! তুমি যাহা কিছু কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে, যাহা কিছু ভক্ষণ করিবে, যাহা কিছু দান করিবে, যাহা কিছু যোগ করিবে, যাহা কিছু তপঃ করিবে, তৎসমস্ত যাহাতে আমাতে অর্পিত হয় সেই চেষ্টা করিবে।'

বিনোদ। ইহার তাৎপর্য্য কি?

গোপী। ইহার অর্থ এই যে ঈশ্বরকে মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইয়া থাকিও না। যদি ভোজন কালে মনে কর যে তুমি ভোজন করিতেছ না, ঈশ্বর ভোজন করিতেছেন, তাহা হইলে তুমি কখনই লোভীর ন্যায় অশুদ্ধ বা অহিতকর দ্রব্য ভোজন করিতে পারিবে না।

বিনোদ। কেন? পারিব না কেন?

গোপী। তুমি যাঁহাকে ভক্তি কর বা প্রীতি কর, তাঁহাকে কি কখন নিকৃষ্ট বা পচা বা শুষ্ক দ্রব্য ভোজন করাইতে পার? তুমি যাহা ভোজন করিতেছ, ত্বদন্তপ্রবিষ্ট ঈশ্বরও তাহাই ভোজন করিতেছেন, এরূপ মনে করিলে কে আর দুর্গন্ধ গলিত বা নিকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করিতে পারে? এইরূপে যখন তুমি কাহাকেও কিছু দান করিবে, তখন মনে করিও যে ঈশ্বরকে দান করিতেছ। এরূপ মনে করিলে কি আর তোমার যৎসামান্য বা নিকৃষ্ট বস্তু দানে স্পৃহা জন্মিবে? যখন যাগ বা হোম বা তপঃ করিবে, তখন মনে করিও যে ত্বদধিষ্ঠিত ঈশ্বরই যাগ যজ্ঞাদি করিতেছেন। এরূপ মনে করিলে কি তোমার আর নিষ্ঠুর অথবা প্রতারণা-পূর্ণ, অথবা ভক্তি বিরহিত যাগ যজ্ঞাদি করিতে স্পৃহা হইবে? যে এইরূপে কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়কেই ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতে পারিবে, সে সর্ব্বদাই ঈশ্বর সন্নিধানে অবস্থান করিয়া পরম সুখ লাভ করিবে। মিল্‌টন ও এইরূপ অর্থেই বলিয়াছিলেন—

"All is, if I have grace to use it so
As ever in my great Task-master's
eye."

বিনোদ। শুদ্ধ কর্ম্ম করিলে, শুদ্ধ বস্তু দান করিলে, শুদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করিলে, শুদ্ধ মনে যাগযজ্ঞাদি করিলে ঈশ্বর প্রীত হয়েন; অতএব শুদ্ধ কর্ম্ম কর, শুদ্ধ বস্তু ভক্ষণ কর, শুদ্ধ মনে যাগ যজ্ঞাদি কর। ইহাই কি কৃষ্ণের উক্তির তাৎপর্য্য?

গোপী। হাঁ। এবং এই উক্তিকে কৃষ্ণ আরও বিশদ করিতেছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'হে অর্জ্জুন! তুমি যদি এইরূপে সকল কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার স্বার্থজ্ঞান একেবারেই বিনষ্ট হইবে। অর্থাৎ তুমি কিসে আমার শুভ হইবে, কিসে আমার অশুভ হইবে, এইরূপ বিবেচনা না করিয়া কিসে ঈশ্বর প্রীত হইবেন, কিসে ঈশ্বর

বিরক্ত হইবেন এইরূপ চিন্তা করিবে। এইরূপ চিন্তা করিলে তুমি কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইবে না, কারণ যাহারা স্বার্থান্বেষী, তাহারাই কর্ম্মপাশে বদ্ধ হয়। তুমি আপনার সত্তা ঈশ্বরে নিমজ্জিত করিয়া স্বার্থ ত্যাগ কর। তাহা হইলেই তুমি মোক্ষস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

বিনোদ। বেশ কথা। তার পর বল।

গোপী। তার পর কৃষ্ণ বলিতেছেন। 'হে অর্জ্জুন! জাতি ভেদে কর্ম্ম ভেদে বা বর্ণভেদে কেহ আমার প্রিয় বা অপ্রিয় হয় না। শূদ্রই হউক, বা বৈশ্যই হউক, বা স্ত্রীই হউক, বা চণ্ডালই হউক, বা ব্রাহ্মণই হউক, বা ক্ষত্রিয়ই হউক, যে কেহ আমাকে ভজনা করে, সেই আমাকে প্রাপ্ত হয়, আমি তাহারই সহিত আত্ম বিনিময় করিয়া থাকি।

বিনোদ। কৃষ্ণকে কিরূপে ভজনা করিতে হইবে?

গোপী। কৃষ্ণকে সংসারের নিমিত্ত কারণ বলিয়া জানিয়া, কৃষ্ণে সংসারের ও সংসারে কৃষ্ণের অবস্থিতি লক্ষ্য করিয়া, কৃষ্ণই সংসারের স্রষ্টা পাতা ও হর্ত্তা ইহা জানিয়া, ভোজনে দানে যাগে হোমে সকল প্রকার কর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া, স্বার্থান্বেষণ শূন্য হইয়া কৃষ্ণকে নমস্কার ও পূজা করিতে হইবে। কিন্তু ইহাত সহজ কথা। ইহার পর কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর—'যে নিতান্ত দুরাচার সেও যদি আমাকে ঐরূপে অনন্য মনে ভজনা করে, তাহা হইলে তাহাকেও সাধু বলিয়া মনে করিতে হইবে'।

বিনোদ। কেন? এত বড় ভয়ঙ্কর কথা।

গোপী। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'যে আমাকে একবার ঐরূপে ভজনা করিতে পারে সে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয়, (স ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা) হে অর্জ্জুন! তুমি নিশ্চয় জানিও যে আমাকে পরমেশ্বর জ্ঞানে ভক্তি করে, সে নিতান্ত দুরাচার হইলেও শীঘ্রই পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। তুমি সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বাহু উৎক্ষেপ করতঃ সকলের নিকট ব্যক্ত করিতে পার, যে ঈশ্বরে ভক্তি করে, তাহার বিনাশ হয় না। তুমি সর্ব্বদা ভক্তি সমাহিত চিত্তে আমাকে পূজা ও নমস্কার কর। আমাতে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ কর, তাহা হইলেই তুমি মুক্ত হইবে।'

বিনোদ। আজি অনেক কথা হইয়াছে এইখানেই ক্ষান্ত হওয়া যাউক্।

শ্রীনীঃ—

সংক্ষিপ্ত-সমালোচন।

১। 'ভাষাশিক্ষা। প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, ৮১ নং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রে শ্রীমনিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।'—এই গ্রন্থখানি ইংরেজী 'কম্পোজিশন' পুস্তক সমূহের অনুকরণে লিখিত হইয়াছে। বোধ হয় ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে বাঙ্গালাভাষায় এই ধরণের পুস্তক আর এক খানিও নাই। গ্রন্থকার ইহার রচনায় বিলক্ষণ অনুসন্ধিৎসা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা বেওয়ারিশী মালের ন্যায় যাহার যে ভাবে ইচ্ছা তাহার হস্তে সেই ভাবে প্রযুক্ত অথবা অপপ্রযুক্ত হইতেছে,—অনেকে ভাষা সম্বন্ধে কোন রূপ নিয়মাধীন হওয়া ভাববিষয়ে অসারতার লক্ষণ মনে করিয়া পদে পদে ব্যাকরণ ও অভিধানের মুণ্ডপাত করিতেছেন। কোন বিষয় শৃঙ্খলায় পরিণত না হইলে তাহার উন্নতি হওয়া সুকঠিন। আমাদের বিবেচনায়, বাঙ্গালা ভাষা সম্পর্কে লেখকদিগের বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খলতা উহার উন্নতির পথে বিশেষ অন্তরায়। বিদ্যালয়সমূহে রচনা বিষয়ে কোন প্রকার নিয়মিত সুশিক্ষা না হওয়া ঐ উচ্ছৃঙ্খলতার অন্যতম কারণ, সন্দেহ নাই। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণের কৃপা হইলে, এই পুস্তকখানি উল্লিখিত সুশিক্ষার পক্ষে বিশেষ সাহায্যতা করিবে, এইরূপ ভরসা হয়। গ্রন্থকার ইহার শেষ ভাগে বিশুদ্ধ ভাষার অবয়ব, লক্ষণ ও প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়া কএকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের রচনা হইতে অনেক গুলি উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন। যাঁহারা রচনা বিষয়ে আপনাদিগকেই বিধাতা মনে না করিয়া সুলেখক হইবার প্রয়াসী, তাঁহারা এই অংশটি পাঠ করিলে কিয়ৎপরিমাণে উপকৃত হইবেন। ইহা যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে, আমরা এমন কথা বলি না,—ইহার স্থানে স্থানে অভাব ও অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হয়। কিন্তু এইরূপ সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও, আমরা বলিতে বাধ্য যে, গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় এবং সুপাঠ্য হইয়াছে। এই পুস্তকখানি স্কুল ও পাঠশালা সমূহে ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গে পঠিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

২। 'কবিতা পাঠ। শ্রীমধুসূদন সরকার কর্ত্তৃক প্রণীত ও সংগৃহীত। কলিকাতা ৪২ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, রায় যন্ত্রে, শ্রীগোপালচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।'—ইহার একটি মাত্র কবিতা ভিন্ন কোন্‌টি মধুসূদন বাবুর স্বরচিত, এবং কোন্‌টি সংগৃহীত, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া গেল না। সুতরাং ইহার সমালোচনায় আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, যদি অধিকাংশ সংগৃহীত হইয়া থাকে, তবে সংগ্রহে তিনি যথেষ্ট সুরুচির পরিচয়

দিয়াছেন, আর যদি অধিকাংশই স্বরচিত হইয়া থাকে, তবে বালকদিগের জন্য কবিতা লেখায় তিনি বিলক্ষণ পারগতা দেখাইয়াছেন। ইহার সকল কবিতাই সরস ও সুনীতি-পূর্ণ, এবং প্রায় গুলিই বালক বালিকাগণের কোমল ও কৌতূহল পূর্ণ অন্তঃকরণের উপযুক্ত। 'ডুগ্ ডুগ্ খেলা', 'করিম উদ্দীন' এবং 'বিড়ালী ও বানর' এই কয়টি কবিতা পড়িয়া আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। 'ভারত বিজয়' কবিতাটি এই পুস্তকে স্থান না পাইলেই ভাল হইত। একটি কবিতায় বিশগণ্ডা ঐতিহাসিক কাহিনী অপেক্ষা বালকের পক্ষে আর অধিকতর বিড়ম্বনা কি হইতে পারে?

৩। 'রত্নাকর। পাক্ষিক পত্র। শ্রীবাঁশীনাথ বসাক দ্বারা সম্পাদিত ও শ্রীমাধবচন্দ্র তর্ক চূড়ামণিদ্বারা সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। ঢাকা, শীতল যন্ত্র।'—ইহা একখানি পাক্ষিক পত্র। অবতরণিকার একস্থানে লেখা আছে, "এই ক্ষুদ্রায়তন পত্র খানায় ইন্দ্রিয়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, জীব-প্রকৃতি তত্ত্ব, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ও ঈশ্বর তত্ত্বের ক্রমিক আন্দোলন ও সিদ্ধান্ত থাকিবে। তাহাতে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি কাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা, পরমাত্মা, সৃষ্টি পত্তন ও অবতার তত্ত্বের মীমাংসা; নাস্তিক, নিরাকার, দ্বৈতাদ্বৈত, বিবর্ত্ত পরিণামবাদের উত্থাপন ও উপসংহার থাকিবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাষাবিজ্ঞান ও বেদ পুরাণাদির সহিত বিজ্ঞানের সমন্বয় প্রদর্শিত হইবে।" অপর এক স্থানে আছে "ইহাতে ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রতিজ্ঞার মত উপপাদ্য সকল যথাক্রমে সন্নিবেশিত থাকিবে।" আমরা ইহার যে কএক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, তন্মধ্যে বিজ্ঞাপিত কোন তত্ত্বেরই কোন সার কথা দেখিতে পাইলাম না। আমাদের বোধ হয়, রত্নাকর যদি উদ্দেশ্যের পরিসর কিঞ্চিৎ সংকীর্ণ করিয়া কার্য্যে অধিকতর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে ক্রমশঃ সুফল লাভে সমর্থ হইতে পারেন।

৪। "আলোচনা। মাসিক পত্রিকা। ৫০ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।"—আমরা যতদূর বুঝিলাম এই পত্রিকা খানি 'নবজীবনের' প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। ধর্ম্মবিষয়ক বর্ত্তমান আন্দোলন সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করিতে আমরা সংপ্রতি প্রস্তুত নহি; এই জন্য আমরা আলোচনার বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। ইহার লেখকগণের সকলকেই কৃতী বলিয়া জানি, সুতরাং ইহাঁরা নিয়মিত রূপে লিখিলে আলোচনা যে শীঘ্রই সাহিত্য সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। আমরা ইহার যে সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার সকল গুলি প্রবন্ধই সুলিখিত হইয়াছে; ভরসা করি ইহার লেখার পরিপক্কতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালী।

(১৫৮ পৃষ্ঠার পর।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অবরোহ প্রণালী। *

পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত যে,আমরা এপ্রস্তাবে কি কি শিক্ষা দিতে হইবে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা লিখিতে ইচ্ছা করি না, কেবল মাত্র কি প্রণালীতে শিক্ষা দিতে হইবে তাহারই সমালোচনার চেষ্টা করিতেছি। ইয়ুরোপে আজি কালি এই প্রশ্নটি বিশেষ আন্দোলিত হইতেছে। তাই আমরাও ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যথাসাধ্য ইহার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। কি প্রণালীতে শিক্ষা প্রদান করিলে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সন্তানের মানসিক শক্তি বিকশিত হইবে, তাহাই দেখান হইতেছে। আমাদের কখনও এরূপ বিবেচনা করা উচিত নয় যে সন্তানের মনোবৃত্তি সকল আমাদিগকে বলপূর্ব্বক বিকশিত করিতে হইবে। বাস্তবিক মনোবৃত্তি সকল যথা সময়ে আপনিই বিকাশের পথ অনুসন্ধান করিতে থাকে। যেরূপ উপযুক্ত শারীরিক শক্তি হইলে শিশু আপনি বসিতে পারিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করে, আপনি হাটিতে পারিয়া উল্লসিত হয়, সকল ইন্দ্রিয় সঞ্চালনে পারগ হইলে সর্ব্বদা খেলা করিতেই ভাল বাসে, তদ্রূপ মানসিক শক্তি বিকাশের উপযুক্ত হইলে, স্বাভাবিক প্রণালীতে তাহা বিকশিত করিতে পারিলে সে অবশ্য সমধিক আনন্দ অনুভব করিবে, এবিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ হইতে পারে না। শিশু খেলিয়া যেরূপ সন্তুষ্ট হয়, তাহার মনের যেরূপ স্ফূর্ত্তি হয়, পড়িয়া তাহা হয় না কেন? ইহাতেই বোঝা যায় যে, পড়াতে স্বাভাবিক প্রণালীমতে তাহার শক্তি বিকশিত হয় না। শক্তি ব্যবহারের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, এবং একমাত্র ব্যবহারেই মনের প্রকৃত সুখ হয়; অস্বাভাবিক মতে ইহাকে চাপিয়া রাখিলে, কিম্বা বল পূর্ব্বক ইহাকে অপরিমিত ব্যবহার করিলে মনের বাস্তবিক কষ্ট হওয়ার সম্ভব। শক্তির যে প্রকার ব্যবহারে সুখ না হইয়া কষ্ট হয়, তাহাই অস্বাভাবিক স্বীকার করিতে হইবে।

বস্তুর গুণের নাম-শিক্ষা।

প্রথম পরিচ্ছেদে, সন্তানের ইন্দ্রিয়গুলিকে এক একটি করিয়া কি প্রকারে শিক্ষা দিতে হয় তদ্বিষয় আলোচনা করিয়াছি, এখন হইতে তাহার সকলগুলিকে একত্র শিক্ষা দিতে হইবে। যত সূক্ষ্মরূপে এই

* Synthetic method.

কার্য্য করা যাইবে, সন্তান ততই স্পষ্টরূপে বাহ্যজগতের জ্ঞানলাভে সমর্থ হইবে।

শিশুর এখন পঞ্চাধিক বর্ষ বয়স হইয়াছে, সে বেশ নড়িয়া চড়িয়া খেলাইতে পারে। মাতা যাহা বলেন তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে। সে মাতার বিশেষ বাধ্য হইয়াছে, মাতা যখন যাহা তাহাকে বলেন সে তখনই তাহা শুনে। আমাদের প্রদর্শিত প্রণালীমতে সন্তানকে অনেক প্রকার রঙের নাম শিক্ষা দিয়াছেন। নাম শুনিলে তাহার রঙ মনে হয় এবং রঙ দেখিলে তাহার নাম মনে হয়। ভিন্ন ভিন্ন রঙের নাম শিখাইতে তাহার এক বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইয়াছে। বস্তুগুলি এরূপ হওয়া আবশ্যক যে রঙ ভিন্ন তাহার আর কোন গুণই সন্তানের নিকট তত আদরণীয় না হয়। যদি রঙ্ অপেক্ষা গন্ধ তাহার মনকে অধিক আকর্ষণ করে তবে সে আপাততঃ বুঝিয়া লইবে যে নাসিকাদ্বারা যাহা জানিতেছে, তাহাই বুঝি রাঙা। অতএব রঙ গুলি শিখাইবার সময় কাগজের উপরে চিত্র পটই উত্তম। কিন্তু আকৃতিগুলি এরূপ হওয়া আবশ্যক যেন শিশুর মন রঙ ছাড়িয়া আকৃতির দিকে ধাবিত না হয়। রঙের খুব চাকচিক্য থাকা আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ও গন্ধের নাম আমাদের ভাষায় অতি বিরল, সুতরাং এবিষয়ে জননীর পরিশ্রমের কিছু লাঘব হইল।

যখন এক পদার্থ পুনঃ পুনঃ দেখিয়া চিনিতে পারাযায়, যখন নাম শুনিলে দ্রব্য মনে হয়, এবং দ্রব্য দেখিলে নাম মনে হয়, তখন যেন সেই পদার্থের উপরে একটা চিহ্ন অঙ্কিত করা হয়। টক, মিঠা, তিতে, ঝাল প্রভৃতিও উক্তরূপে শিখাইতে হইবে। জিনিস আস্বাদ না করাইয়া কেবল মাত্র নাম শিখাইলে লাভ নাই। শিশু সম্মুখে একটি লঙ্কা দেখিল। সে তাহা ধরিয়া মুখে দিতেছিল, জননী বলিলেন, 'সর্ব্বনাশ, মরবি' সন্তান জননীর বিকট চীৎকার শুনিয়া ও বিকৃত মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারই দিকে আকৃষ্ট হইল, লঙ্কা খাওয়া আর তাহার মনে রহিল না। মাতা ভাবিলেন ঝাল কি তাহা সে বুঝিয়াছে, আর কখনও লঙ্কা মুখে দিবে না। কিন্তু বাস্তবিক সে ঝালের মর্ম্ম কিছুই বুঝিল না, কেবল জননীর আকৃতি ও চীৎকার মনে করিয়া রাখিল। জননীকে অনেকবার এইরূপ করিতে দেখিলে পুনরায় যখন লঙ্কা দেখিবে তখন মাতার আকৃতি ও চীৎকারই স্মরণ হইবে। সে জননীকে আবার তদ্রূপ দেখিবার জন্য তাহার দিকে তাকাইবে, মাতা হয়ত ভাবিবেন যে ঝাল বুঝিয়া তাহার দিগে চাহিয়াছে অতএব তিনি শিশুর বুদ্ধির প্রশংসা করিবেন। আমাদের বিবেচনায় এই রূপ শিক্ষায় কোন লাভ নাই। জননী যখন দেখিবেন, একটু ঝাল জিহ্বায় লাগিলে সন্তানের কোন অপকার হইবে না, সেই বয়সে একটু লঙ্কা জিহ্বায় লাগাইয়া বুঝাইয়া দিবেন ঝাল কাহাকে বলে, সন্তান প্রাণান্তেও আর এরূপ ঝাল ছুই-

বেনা। একদিন আমাদের সম্মুখে একটি শিশু বারংবার প্রদীপ ধরিতে যাইতেছিল। অন্ধকার ঘরে প্রদীপ আসিল আর সব আলোক হইল, পূর্ব্বে কিছুই দেখা গিয়াছিল না এখন সমস্তই বেশ দেখা যাইতেছে, যাহার দ্বারা এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল তাহার রঙটাও আবার দেখিতে অতি সুন্দর এরূপ জিনিষ স্পর্শ করিলে কিরূপ বোধ হয়, শিশু হয় ত তাহাই পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ধরিতে যায় আর সকলে নিষেধ করে, কিছুই বুঝিয়া উঠে না, সুতরাং আরও উৎসুক হইয়া ধরিতে যায়। আমি তাহাকে কোলে লইয়া সাবধানে তাহার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রদীপের নিকটবর্ত্তী করিলাম, তখন সে হাত পশ্চাৎদিকে টানিতে লাগিল, আমি ছাড়িয়া দিলাম। দুই তিনবার এইরূপ করিলে, সে আর প্রদীপ ধরিতে গেল না এবং বুঝিল ধরিলে কিরূপ বোধ হইবে। এরূপ অবস্থায় তাহার কথা বলিবার শক্তি থাকিলে তাহাকে ' গরম ' কিম্বা ' আগুণ' নামটা শিখাইতে পারা যায়। এই উপায়ে তাহাকে ' শক্ত ' ' নরম ' ' ভারি ' ' পাতলা ' ' শুষ্ক ' ' ভিজা ' ' বন্ধুর ' 'পালিশ' প্রভৃতি নামগুলিও শিক্ষা দেওয়া সহজ হইবে।

ঔৎসুক্য ও সূক্ষ্মদর্শনস্পৃহা।

সন্তান একে একে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের প্রত্যেক গুণের নামই শিখিয়া লইল। এখন তাহার কি শিক্ষা আবশ্যক? এখন এই মাত্র বাঞ্ছনীয় যে, শিশু সম্মুখে যে বস্তু পায় তাহার প্রত্যেক গুণ সম্যক লক্ষ্য করে। সন্তানের এই প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ উত্তেজিত হয়। শরীরের যেরূপ ক্ষুধা তৃষ্ণা ও খেলাইবার ইচ্ছা আছে মনেরও তদ্রূপ। জননী এই ইচ্ছার প্রত্যাঘাত না করিয়া সহায়তা করিলে শিশুর মহৎ উপকার হইবে। এবং জননীর প্রতি সন্তানের প্রীতি ও ভক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। অনেক সময়ে সন্তান আগ্রহ সহকারে জননীকে কত জিনিষ আনিয়া দেখিতে দেয়। ভাবে যে, যাহা তাহার নিকট নূতন ও সন্তোষজনক বোধ হয় জননীর নিকটও তাহা তদ্রূপ বোধ হইবে। কুকুর ডাকিতেছে সে তাহা অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া মাতাকে দেখাইল। ফুল ফুটিয়াছে ছিঁড়িয়া আনিয়া মাকে দিল। আবার কখনও জননী বাক্সের ভিতর কি রাখিতেছেন সন্তান তাহা দেখিতে চাহিবে। ভাজ করা কাপড়খানা কেমন তাহা খুলিয়া দেখিবে। জননী মুখের ভিতর কি চিবাইতেছেন, শিশু তাহা অঙ্গুলী দ্বারা বাহির করিবে। সন্তান বারংবার এইরূপ করিতে থাকিলে জননী চীৎকার করিয়া তাহাকে নিষেধ করেন। সর্ব্বদা ত্যক্ত করে, তিনি আর সহ্য করিতে পারেন না। এইরূপে ক্রমে সন্তানের ঔৎসুক্য বিনষ্ট হয়। এক মহিলা যথার্থই লিখিয়াছেন " মাতা হইতে কয়জন স্ত্রীলোক পারগ, কিন্তু দেখ কতটিই বা সন্তানের প্রসূতি।" আমরা বারংবার বলিতেছি সন্তানকে উপযুক্ত

শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে, তাহাকে অসংখ্য বস্তু দেখাইতে হইবে। একটি বস্তু দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে তাহার বিষয় সে কি জানে। সে একে একে অনেক গুণের নাম করিবে। প্রথমতঃ হয়ত দুই একটা গুণ অবশিষ্ট থাকিতে পারে। জননী বারংবার জিজ্ঞাসা করিবেন আর কি জানে? সন্তান বলিতে না পারিলে, সেই গুণটির প্রথম অক্ষর বলিয়া দিয়া অথবা অন্য কোনরূপে সঙ্কেত দ্বারা তাহাকে বুঝাইয়া দিবেন। এবং নিশ্চয়ই অপারগ হইলে একটু হাসিয়া বলিয়া দিবেন, এবং আর ভুলিতে নিষেধ করিবেন। এইরূপে কয়েকটি বস্তু দেখাইলে সন্তান আপনি অনুসন্ধান করিয়া বস্তু সকল আহরণ করিয়া মাতার নিকট গুণের বিষয় বলিবে এবং ভুল না হইলে অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিবে। ইহাকেই বলে মানসিক খেলা, ইহা শারীরিক খেলা অপেক্ষা অধিক সুখপ্রদ সন্দেহ নাই। জননী যেন তাহা শুনিতে কখনও ঔদাস্য প্রকাশ না করেন।

এ অবস্থায় দুই তিনটি বালককে একত্র করিয়া নানাবিধ খেলার সৃষ্টি করা যাইতে পারে। আমরা তদ্রূপ একটির উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব। অনেকেই বোধ হয় অবলোকন করিয়াছেন যে, অধিকাংশ শিশু একটি খেলার বিশেষ প্রিয়। জিনিষ কিনিতে ও বেচিতে তাহারা বড় ভাল বাসে। কোন শিশু হয় ত সমস্ত দিন মাথার উপর কিছু রাখিয়া "দৈ! দৈ!" করিয়া বেড়াইতেছে। কোন একটা ছোট পাত্রে কতক গুলি ভাল ভাল বস্তু রাখিয়া এক জনকে বিক্রিওয়ালা সাজাইয়া দেও। সে সেই জিনিষ কাহাকেও দেখিতে দিবে না; কেবল সব জিনিষের নাম ডাকিয়া বিক্রয় করিতে চাহিবে। একজন একটি জিনিষ কিনিতে চাহিবে, আর সে তাহার গুণগুলি জিজ্ঞাসা করিবে। দ্বিতীয় বালক যখন গুণগুলি উল্লেখ করিবে, আর সকলে স্বভাবতঃই ঔৎসুক্যের সহিত শুনিবে, তাহার কোন ভুল হয় কি না। ভুল হইলে তাহার শাস্তির বিধান করা যাইতে পারে, এবং শুদ্ধ হইলে সে সেই বস্তু পাইবে। ভুল হইলে তাহাকে অতি সামান্য কিছু জরিমানা করা যাইতে পারে। অথবা জরিমানার নিয়ম উচিত বোধ না হইলে তাহার দ্বারা এরূপ কোন কার্য্য করান যাইতে পারে যাহাতে তাহার উপকার হয়। অথবা তাহাকে পুনরায় বিক্রিওয়ালা হইয়া ঐ জিনিষ মাথায় করিতে হইবে। ৫। ৬। ৭ বৎসরের শিশুদের জন্য গুরুর পাঠশালার পরিবর্ত্তে যদি এইরূপ খেলার কোন বিদ্যালয় হয় তবে বোধ হয় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিজ্ঞানসঙ্গত হইবে।

সাদৃশ্য ও বিভেদশিক্ষা।

বাহ্য বস্তুর বিষয়ে আমরা যত জ্ঞান লাভ করি তন্মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। ফলতঃ এই প্রকার সকল জ্ঞানে বিজ্ঞানের একটি মাত্র উদ্দেশ্য লক্ষিত হয়। পদার্থসমূহের সাদৃশ্য ও বি-

ভেদ লক্ষ্য করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এবং এই জ্ঞান উপলক্ষ্য করিয়াই আমরা পদার্থসমূহকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াথাকি, অতএব যাহাতে এই প্রকার জ্ঞানলাভে সন্তানের ঔৎসুক্য পরিবর্দ্ধিত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়া শেষে বিভেদ শিক্ষা দেওয়া উচিত। সাদৃশ্যই সর্ব্বপ্রথম শিশুর চক্ষুকে আকর্ষণ করে এ বিষয়েও পূর্ব্বোক্ত প্রণালীর কোনরূপ খেলা অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। যেসকল বস্তু আপাততঃ দেখিতে অত্যন্ত বিসদৃশ তাহাদের মধ্যেও যেন শিশু সহজে সাদৃশ্য বাহির করিতে পারে এরূপ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

স্বশিক্ষার সূত্রপাত—আমরা বারম্বার বলিতেছি যে শিশুকে এরূপ ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যেন শিখিতে তাহার কোন মতে অনিচ্ছা না হয়, বস্তুতঃ সম্যক আগ্রহ জন্মে। বেত্রহস্ত শিক্ষককে আমরা কখনই অনুমোদন করিতে পারি না। শিশুরা খেলিতে যেরূপ ভালবাসে শিখিতেও যেন তদ্রূপ ভালবাসে এই প্রকার প্রণালী উদ্ভাবিত করাই শিক্ষা বিজ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা সংপ্রতি যেরূপ শিক্ষার কথা বলিলাম তাহাতে শিক্ষকের একটি বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে নতুবা শিশুর মানসিক শক্তির বিশেষ অপকার হইবার সম্ভাবনা। শিক্ষকের শিশুকে যত কম বলিয়া দিতে হয় ততই ভাল। এবং তাহার নিজের দ্বারা যত অধিক বলাইতে পারেন ততই তাহার উপকার। আমরা শিক্ষকের দুইটী উদ্দেশ্যকে সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ও মঙ্গলকর বলিয়া বিবেচনা করি। ১ম, শিক্ষার্থীর মনে জানিবার ইচ্ছা বৃদ্ধি করান। ২য়, নিজে জানিবার জন্য চেষ্টা করিবার ব্যগ্রতা উৎপাদন। যে শিক্ষকের মনে এই দুইটী উদ্দেশ্য প্রবল রূপে বর্ত্তমান নাই তিনি নিশ্চয়ই তাহার শিষ্য বর্গের অদ্বিতীয় শত্রু। কি প্রকারে নিজে শিক্ষা করিতে হয় তাহাই মাত্র শিশুকে শিক্ষা দিতে হইবে। এবং যাহাতে তাহার মানসিক শক্তি অধিক পরিচালিত হয় তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে।

বিবিধ বিষয়ক শিক্ষা।

যখন শিশু গৃহস্থ দ্রব্যজাতের গুণগুলি এক রূপ শিখিল তখন তাহাকে বাহিরের বস্তু দেখাইতে হইবে। তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাগানে কিম্বা মাঠে বেড়াইতে যাইতে হইবে এবং নানাপ্রকার বৃক্ষলতাদির সঙ্গে পরিচিত করিতে হইবে। এই ভারটি পিতার হস্তে থাকাই আবশ্যকীয় কারণ আমাদের দেশীয় মহিলাগণ সর্ব্বদা বাহিরে বেড়াইতে সমর্থ নহেন এবং উদ্ভিদ ও প্রাণী তত্ত্বও তাহারা অবগত নহেন। প্রথমতঃ সন্তানকে ফল দেখাইয়া বৃক্ষের নাম শিখাইতে হইবে। যে যে ফল শিশু অত্যন্ত ভালবাসে তাহাদের বৃক্ষ শিশু অতি সহজেই চিনিয়া রাখিবে। তাহাদের আকৃতি ও পাতা দেখিয়া বিভেদ ঠিক করিবে। তৎপরে ভিন্নভিন্ন ফুল দেখান উচিত। কোন্ ফুলের কি রঙ, কতটি পত্র,

পত্রের গঠন কিরূপ, এই সকল বিস্তারিত শিখাইতে হইবে। ক্রমে তাহার গর্ভকেশর,পরাগকেশর দেখাইতে হইবে ও তাহাদের সংখ্যা করাইতে হইবে। এইরূপে ক্রমে বৃক্ষের মূল ও কাণ্ডের গঠন দেখাইতে হইবে। কি প্রকারে বৃক্ষে বৃক্ষাদির জীবন কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় তদ্বিষয় পূর্ব্বে কিছু না বলাই ভাল। শেষে যখন শিশু বৃক্ষের প্রত্যেক অঙ্গ চিনিল, তখন তাহাকে প্রত্যেক অঙ্গের কার্য্য, উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা বুঝাইয়া ঈশ্বরের কৌশল ও মহিমা উপলব্ধি করাইতে হইবে। এবং জগতে এই সকল বিস্ময়কর আবশ্যকীয় বস্তু থাকিয়াও যদি আমাদের ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি বৃত্তি না থাকিত তবে আমরা সকল সুখে বঞ্চিত হইতাম ইহা বুঝাইয়া তাহাকে স্তব্ধ করিতে হইবে। ঈশ্বরের দয়া ও ক্ষমতা বুঝিয়া বালকের হৃদয় আপনি উদ্বেলিত হইবে। বুঝিবে যে পিতা মাতার সাহায্য ব্যতীত সে এই সত্য আবিষ্কার করিতে পারিত না অতএব পিতৃভক্তিতে তাহার মন আর্দ্র হইবে। এবং পূজ্যপাদ বৈজ্ঞানিকগুরু ঈশ্বরের আর কোন্ কোন্ মহিমা অবগত হইয়াছেন জানিবার জন্য তাহার ঔৎসুক্য লালায়িত হইবে।

ইতর জন্তু কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সম্বন্ধেও এইরূপ শিক্ষা আবশ্যক। কিছু কিছু শিক্ষা হইলে কীট পতঙ্গ প্রভৃতির পদ ও পক্ষের আকৃতি সংখ্যা এবং রঙ ইত্যাদি লক্ষ্য করাইতে হইবে। ক্রমে বৃহৎ জন্তুদিগের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের আকৃতি, শরীরমধ্যস্থ কার্য্য প্রণালী, পদের গঠন, দন্তের বিভেদ ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হইবে এবং এই সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া বালকের হৃদয়ে ধর্ম্ম ভাবের অঙ্কুর উৎপাদিত করিতে হইবে। প্রথমেই বক্তৃতা, উপদেশ কিম্বা পুস্তক দ্বারা ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ার প্রণালী আমাদের নিকট অস্বাভাবিক বোধ হয়।

যখন গৃহের বহির্ভাগে এইরূপ শিক্ষা হইতেছে তখন গৃহের মধ্যেও অন্যবিধ শিক্ষা চলিতে পারে। ঘরের প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে, কে প্রথম আবিষ্কার অথবা নির্ম্মাণ করিল, এখন কোথায় নির্ম্মিত হয়, সে দেশ কোন্ দিগে ও কতদূরে, কি উপায়ে কত দিনে এদেশে আনীত হয়, কত মূল্যে সাধারণতঃ বিক্রিত হয়, কোথায় সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা ; কোন্ জিনিষের ভাল মন্দ কি প্রকারে জানিতে হয়,এবং যত ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে ক্রমশঃই শিশুর মন প্রশস্ত হইবে।

চিত্র, সূক্ষ্মদর্শন স্পৃহা ও ঔৎসুক্য।

এই অবস্থায় অর্থাৎ ৭। ৮ বৎসর বয়সে অন্য একটি আবশ্যকীয় শিক্ষা আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই শিক্ষা আরো কিছু পূর্ব্বে ও আরম্ভ করা যায়। অনেকেই বোধ হয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে ৪। ৫ বৎসরের শিশুর হস্তে কোন প্রকার রঙ এবং তুলিকা প্রদান করিলে শিশু আনন্দ মনে নিবিষ্ট চিত্তে বসিয়া কত কিছু আঁকে। প্রথমতঃ তাহাকে এইরূপ রঙ দিয়া যাহা ইচ্ছা আঁকিতে দেওয়া উচিত। কয়েক দিন পরে যখন ,তাহার হাত একরূপ ঠিক হইল

তখন তাহাকে কোন জন্তুর আকৃতি চিত্রিত করিতে বলা যাইতে পারে। যে যে জন্তুর সহিত সে অত্যন্ত পরিচিত তন্মধ্যে যাহাকে সে বড় ভাল বাসে তাহাই আঁকিতে বলা উচিত। শিশু অনেক চেষ্টার পরে আঁকিবে। জননী বুঝিবেন যে তাহার কিছুই ঠিক হয় নাই, তথাপি তিনি যেন শিশুকে নিরুৎসাহিত না করেন। শিশুর শিশুচক্ষে চিত্রটি বেশ সুন্দর দেখাইবে এবং সে যতদূর বিচার করিতে পারে তাহাতে তাহার নিকট উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যই অনুমিত হইবে। জননীর মনে রাখা উচিত যে শিশু যদি তাহা হইতে ভালরূপ বোধ ও বিচার করিতে সমর্থ হইত তবে তাহার চিত্রও আরো ভাল হইত। চিত্রটি ঐ জন্তুর ছবি না হইতে পারে কিন্তু শিশুর অপরিপক্ক কল্পনায় জন্তুর যে চিত্র রহিয়াছে ঠিক তাহার প্রতিকৃতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। জননী শিশুর মাত্র দুই একটি স্পষ্ট ভুল দেখাইয়া দিলে শিশু বুঝিতে পারিবে যে ভুল হইয়াছে। এবং ঐ জন্তুর অন্য সকল অঙ্গ ভালরূপ দেখিতে মনোযোগ প্রদান করিবে। এইরূপে সূক্ষ্ম দর্শনের নিমিত্ত বালকের একটি তৃষ্ণা জন্মিবে। এবং যাহা দেখিয়াছে তাহা চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিলে স্মৃতি ও কল্পনার বিলক্ষণ উৎকর্ষ সাধিত হইবে। চিত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে সে সকল বস্তুই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিবে। এইরূপে দুই চারিটি জন্তুর প্রতিকৃতি বারম্বার অভ্যাস করাইয়া আর একটি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। যেসকল পুস্তকে কালী অথবা পেন্‌সিলে ঐ সকল জন্তুর সীমা রেখা অঙ্কিত আছে তাহার একখানা শিশুর হস্তে রঙ করিবার নিমিত্ত দেওয়া উচিত। রঙ ব্যতীত শুদ্ধ কালী অথবা পেন্‌সীল দ্বারা প্রথমেই চিত্র শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। ক্রমে বৃক্ষ, লতা, ফুল, বনস্থলী প্রভৃতির চিত্র শিক্ষা করাইতে হইবে। কিছু অগ্রসর হইলে রীতি মত চিত্র বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা উচিত।

এই অবস্থায় যদি বালক বাহিরের বৃক্ষ লতা, কীট, পতঙ্গ, পশ্বাদি সম্যক অবলোকন করিয়া থাকে তবে তাহার জ্ঞান বিশেষরূপে বিস্তৃত করা যাইতে পারে। অনেক পুস্তক হইতে ভিন্নভিন্ন পদার্থের ছবি তাহাকে দেখাইতে হইবে, এবং সেই সকল জন্তু অথবা উদ্ভিদের বিষয় যাহা প্রীতিজনক বোধ হইবে তাহা তাহার নিকট বলিতে হইবে। শিশুদ্বারা জিজ্ঞাসা করাইতে হইবে যে, জননী এই বৃত্তান্ত কোথায় শিখিলেন। তখন জননী বলিবেন এই সকলই নিম্নে লেখা রহিয়াছে। এবং কি প্রকারে তিনি ঐসকল পড়িতে শিখিলেন তাহা বলিতে হইবে, প্রথমে যে পড়িতে অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং নূতন কিছুই শেখা যায় না, তাহাও বুঝাইতে হইবে। যত শীঘ্র শিখিবে তত শীঘ্র ইহা পড়িতে হইবে। পড়িতে পারিলেই যে অনেক নূতন শেখাযায় একথা তাহাকে বারম্বার বলিতে হইবে।

ভূগোল।

—

ক্রমে তাহাকে একখানা মানচিত্র দেখাইতে হইবে। কি প্রকারে দেশের চিত্র এইরূপে অঙ্কিত হইতে পারে তাহা সে সহজেই বুঝিতে পারিবে। ঘরের যে সকল জিনিস ভিন্নভিন্ন দেশ হইতে আনীত তাহা সে পূর্ব্বেই শিখিয়াছে, সুতরাং এখন সে দেশগুলি দেখিতে চাহিবে। সে দেখিবে যে সেইগুলি ব্যতীত আরো অনেক দেশ আছে, তাহাদের বিষয়ও অবগত হইতে তাহার ঔৎসুক্য হইবে। জননী কিছু কিছু বলিয়া বলিবেন পড়িলেই শেখাযায়। বালক জিজ্ঞাসা করিবে তিনি কিপ্রকারে এই দেশগুলি চিনিলেন, তিনি বলিবেন লেখা রহিয়াছে, পড়িতে পারিলেই অত্যন্ত সহজ। এই প্রকারে জননী সন্তানের মনে লেখা পড়ার একটি অনিবার্য্য তৃষ্ণা জন্মাইতে সমর্থ হইবেন।

পাঠক হয়তঃ ভীত হইতেছেন, তাহার শিশু তাহাকে এত কথা জিজ্ঞাসা করিবে না। কিন্তু বাস্তবিক এরূপ ভয়ের কোন কারণ নাই। উক্তরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা শিশুর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। তিনি যদি অস্বাভাবিক ব্যবহার দ্বারা শিশুর ঔৎসুক্য উপশমিত করিয়া থাকেন এবং শিশু যদি তাহার আচরণ দেখিয়া সন্দেহ করিয়া থাকে যে সে যেসকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে, তিনি তাহার উত্তর জানিলেও তাহাকে বলিবেন না, বরং বিরক্ত হইবেন, তবে অবশ্য কখনই সে জিজ্ঞাসা করিবে না। আর পাঠক যদি এইরূপ ব্যবহার দ্বারা শিশুর অনিষ্ট সাধিত করিয়া নাথাকেন তবে যে শিশু তাহাকে ঐ প্রশ্নগুলি এবং ঐরূপ আরো অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিবে তদ্বিষয় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন।

শ্রীশিঃ —

সম্বন্ধ নির্ণয়।*

অদ্য আমরা পণ্ডিত শ্রীযুত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত গ্রন্থ হস্তে লইয়া বঙ্গীয় পাঠক বর্গের নিকট উপস্থিত হইতেছি। বাঙ্গালাভাষায় ঐতিহাসিক গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। যে কয়েকখানা আছে, তাহাদিগকে আমরা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকি। লালমোহন বাবুর সম্বন্ধ নির্ণয় আমাদের বিবেচনায় তাহার তৃতীয় শ্রেণীতে স্থান পাইবার উপযুক্ত। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তার একটি এমন প্রশংসার

* সম্বন্ধ নির্ণয়। কৃষ্ণনগর নর্ম্মালস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

বিষয় আছে, যে বঙ্গীয় পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ-মধ্যে অধিকাংশেই তাহার অংশ পাইতে পারেন না। লালমোহন বাবু উইলসন, বেবার, মেক্‌সমুলার, কনিংহাম প্রভৃতির পদলেহন করেন নাই। কিম্বা মিয়ার, ভাউদাজী, মেইন, মিত্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণের কুসুম কাননে প্রবেশ করিয়া তস্কর-বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই। এক কথায় ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তিনি পণ্ডিত-মণ্ডলীর চর্ব্বিত চর্ব্বণ হস্তে লইয়া পাঠকদিগের মুণ্ডচর্ব্বণ করিতে উদ্যত হন নাই। তিনি পিতৃ-পুরুষদিগের সাহিত্য উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া যে সকল কুসুম চয়ন করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা একছড়া সুন্দর মালা গাঁথিয়া মাতৃ ভাষার কমনীয় কণ্ঠে প্রদান করিয়াছেন। এই একগুণে লালমোহন বাবু আমাদের হৃদয়ের উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য জাতির কয়েক খানা কুলজি গ্রন্থ আছে, তাহাই লালমোহন বাবুর গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু কোন কোন স্থানে লালমোহন বাবু গ্রন্থ পরিত্যাগ করিয়া দেশী গল্প-নবিসদিগেরও পদানুসরণ করিয়াছেন। এবং এই রূপ অন্যায় আচরণের কথা তিনে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন *। যাহা হউক এই সকল বিষয় উপযুক্ত স্থানে বিবেচনা করা যাইবে।

* Journal. Asiatic Societyof Bengal. Vol. XLVII Part I. page 400.

লালমোহন বাবু সৃষ্টি প্রকরণ বর্ণন করিতে যাইয়া মনুপ্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্রকারগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তি বর্ণনা স্থলে তিনি ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে রাজন্য, উরু হইতে বৈশ্য, ও 'পাদপদ্ম' হইতে শূদ্রগণের উৎপত্তি লিখিয়াছেন। ভগবান্ মনুর সৃষ্টি প্রকরণ বিশেষরূপে অবগত থাকিয়া যে লালমোহন বাবু এরূপ মিথ্যা বাক্য পোষণ করিতে যত্নবান হইয়াছেন, ইহা নিতান্তই আক্ষেপের বিষয়। যদিচ মনুসংহিতায় অসংলগ্ন প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের অভাব নাই, তত্রাচ আদি ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশদ রূপে পাওয়া যাইতেছে যে 'সেই অনাদি পুরুষ স্বীয় দেহকে পুরুষ ও নারী এই দুই ভাগে বিভক্ত করত তৎসংযোগে বিরাটকে সৃষ্টি করেন। সেই বিরাট হইতে মনু, মনু হইতে দশ প্রজাপতি, দশপ্রজাপতি হইতে সমস্ত জীবজন্তুর উৎপত্তি'। সুতরাং মনুর মতে বর্ণভেদ আধুনিক অর্থাৎ প্রথমাবস্থার নহে।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস বলিয়াছেন:—

নবিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্॥

প্রাচীন আর্য্যগণের মধ্যে কোনরূপ বর্ণভেদ ছিল না। পরে কর্ম্মানুসারে শ্রেণী বিভাগের প্রয়োজন হইয়া উঠিল। সুতরাং তপো-যপনিরত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞগণ ব্রাহ্মণ, যাহারা বাহুবলে বিজাতীয় শত্রু দলকে নির্যাতন করিয়া সর্ব্বদা আত্মরক্ষা

করিতে সক্ষম তাহারা রাজন্য। বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য-নিরত ব্যক্তিগণ বৈশ্য, কাণ্ডজ্ঞান শূন্য মূর্খ নিষ্কর্ম্মাদিগকে শূদ্র আখ্যা প্রদানে দাসত্বে নিয়োগ করা হইয়াছিল। কিন্তু গণ্ড মূর্খ ব্রাহ্মণ-তনয়কে ব্রাহ্মণ ও গুণবান শূদ্রতনয়কে শূদ্র শ্রেণীতে রাখা হইত না। ভগবান মনু বলিয়াছেনঃ—

শূদ্র ব্রাহ্মণতা মেতি ব্রাহ্মণাশ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাত মেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাত্তথৈবচ॥

প্রাচীন ঋষি আপস্তম্ব বর্ণ সমূহের পরিবর্ত্তন-শীলতা স্বীকার করিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণে মহর্ষি বশিষ্ঠ, কানদ, ব্যাস, মন্দপাল, শুক প্রভৃতির জন্মবৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া ব্রাহ্মণ জাতির উৎপত্তি বিবরণ যাহা লিখিত হইয়াছে তদ্দ্বারা আমাদের মত-পোষণ হইতেছে। যাহাহউক আমরা সে সমস্ত ও অন্যান্য প্রমাণের উল্লেখ করিতে চাহিনা। বোধ হয় ইহাদ্বারাই লালমোহন বাবু বুঝিতে পারিবেন যে বর্ণ বিভাগের কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া তিনি নিতান্তই ভ্রমমার্গে পাদ-বিক্ষেপ করিয়াছেন।

লালমোহন বাবু ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ হইতে আদিম ঋষিগণের বংশাবলী বর্ণন করিয়া বলিতেছেন যেঃ—

ঋষিগণ হইতে পিতৃলোকের জন্ম।

পিতৃগণ হইতে দেব ও দানবের জন্ম।

দেবগণ হইতে জগতের সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাদির উৎপত্তি।

এই কথাগুলি লালমোহন বাবু মনু হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে দেবগণ হইতে স্থাবর জঙ্গমের উৎপত্তি হইল, আর কি দানব বংশ একধারে লোপ পাইল? এসমস্তই কল্পনার শ্রাদ্ধ। অন্যান্য কথার পর বলা হইল বিপ্রগণের পিতৃলোকের নাম সোমপাগণ, অগ্নিষত্তাগণ, সৌম্যগণ, এবং তাহারা কবি (ভৃগু) পুত্র। ক্ষত্রিয়দিগের পিতৃলোকের নাম হবির্ভুকবর্গ তাহারা অঙ্গিরা সন্তান। বৈশ্যদিগের পিতৃলোক আজ্যপাবর্গ ও তাঁহারা পুলস্ত সন্তান। শূদ্রগণের পিতৃলোক সুকালিন বর্গ ও তাঁহারা বশিষ্ঠ সন্তান।

স্কন্দপুরাণ হইতে নবগ্রহের নাম, জন্মভূমি, গোত্র, জাতির তালিকা উদ্ধৃত করিয়া লালমোহন বাবু এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, 'পূর্ব্বকালে সূর্য্য চন্দ্রাদি গ্রহগণকে ঈশ্বর জ্ঞানে লোকে পূজা করিত। যখন মানবগণ অপেক্ষাকৃত জ্ঞানসম্পন্ন হইলেন তখন ঐ সমস্তের প্রতি ঐশিক শক্তি প্রদান করিবার বিষয়ে লোকের রুচি পরিবর্ত্ত ও বিশ্বাসের খর্ব্বতা হইতে লাগিল। * * তাহাদিগকে যে ঋষি যে ভাবে যেমন অবস্থায় আবিষ্কৃত করিলেন তিনি তদ্গোত্র ও তদ্দেশবাসী বলিয়া পরিগণিত হইলেন।" আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে যে গ্রহদিগের নামকরণ হইয়াছে, ইহা আমরাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। গ্রহদিগের আবিষ্কর্ত্তার নাম, জাতি, গোত্র, ও জন্মভূমির পরিচয় পাওয়া যাইবে বলিয়া আমরা সেই তালিকাটি এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

নাম।	জন্মভূমি।	গোত্র।	জাতি।
রবি	কলিঙ্গদেশ	কাশ্যপ	ক্ষত্রিয়।
সোম	যমুনাপ্রদেশ	আত্রেয়	বৈশ্য।
মঙ্গল	অবন্তিদেশ	ভরদ্বাজ	ক্ষত্রিয়।
বুধ	মগধদেশ	আত্রেয়	বৈশ্য।
বৃহস্পতি	সিন্ধুদেশ	অঙ্গিরা	ব্রাহ্মণ।
শুক্র	ভোজকট	ভার্গব	ঐ
শনি	সৌরাষ্ট্র	কাশ্যপ	শূদ্র।
রাহু	নাটিকাপুর	পৈঠীনসি	ঐ
কেতু	অন্তর্বেদী	জৈমনি	ঐ।

দেখা যাইতেছে যে গ্রহ আবিষ্কর্ত্তাদিগের মধ্যে দুইজন ব্রাহ্মণ। দুইজন ক্ষত্রিয়, দুইজন বৈশ্য ও অন্য তিনজন শূদ্র জাতীয় ছিলেন। আবিষ্কর্ত্তাদিগের জাতি অনুসারে গ্রহদিগের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

তৎপর লালমোহন বাবু ধনঞ্জয়-কৃত ধর্ম্ম প্রদীপ হইতে গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের নামের সহিত প্রবরের তালিকা প্রদান করিয়া বলিতেছেন যে শূদ্রগণ পুরোহিতের গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় লালমোহন বাবুর এই বাক্য সম্পূর্ণ সত্য নহে। কারণ আর্য্যজাতীয় শূদ্রগণ অবশ্যই ঋষি সন্তান *। তবে অনার্য্য শ্রেণী হইতে যাহাদিগকে শূদ্রজাতিতে আনয়ন করা হইয়াছিল তাহারা অবশ্যই পুরোহিতের গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। সমস্ত শূদ্রজাতিকে অনার্য্য বংশসম্ভূত বলিয়া প্রকাশ করা লালমোহন বাবুর ন্যায় একজন পণ্ডিতের মুখে ভাল শুনায় না। আর্য্যদিগের মধ্যে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অনুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কন্যার পাণি গ্রহণ করিতেন। ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কন্যা বিবাহ করিতেন। বৈশ্য, বৈশ্য ও শূদ্র বংশ হইতে দারা গ্রহণ করিতে ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে অধিকারী ছিলেন। এই সকল দর্শন করিয়া অবশ্যই আমরা বলিতে পারি যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি স্বীকৃত আর্য্যগণ যে বংশ হইতে পত্নী গ্রহণ করিতেন সে বংশ কখনই অনার্য্যকুলসম্ভূত নহে। শূদ্র বংশীয় ব্রাহ্মণ পত্নী ও তাহাদের সন্তান সন্ততি যে সমাজে ঘৃণিত ছিলেন তাহাও বলা যাইতে পারে না। এবিষয়ে ভূরি ভূরি শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শিত হইতে পারে। যাহা হউক আমরা সে সমস্তের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে প্রস্তুত নহি। তবে একটি কথা না বলিয়া বিরত হইতে পারিলাম না। ঋষিকুলচূড়ামণি মহর্ষি বশিষ্ঠ শূদ্র কন্যার গর্ভজ

* লালমোহন বাবু স্থানান্তরে ইহাদিগকে বশিষ্ঠ সন্তান বলিয়াছেন।

এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী অশ্বমালাও শূদ্র-বংশীয়া ছিলেন। শক্তির পিতা, পরাশ-রের পিতামহ, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রপিতামহ, রঘুবংশের কুলগুরু সেই বশিষ্ঠকে লাল-মোহন বাবু কি বলিবেন?

আমাদের দেশীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যদি কাহারও আপনাকে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশজ বলিয়া অভিমান থাকিয়া থাকে, তবে আমরা তাহাকে সেই অভিমান পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করি। ভারত-বাসী সকলই মিশ্র বংশজ।

ক্ষত্রিয় জাতির বিবরণ লালমোহন বাবু অতি অল্পই লিখিয়াছেন। তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই ব-লিয়াই বোধ হয়। আমরা আপাততঃ তা-হাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু লালমোহন বাবু মগধ দেশকে বুধের জন্মস্থান বলিয়া পাটলিপুত্র নগ-রীকে চন্দ্রবংশীয়দিগের আদি রাজধানী নির্ণয় করিবার জন্য প্রকারান্তরে যত্ন করি-য়াছেন; ইহা আমরা কোন মতেই সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তদ্দ্বারা ইহাও অনুমিত হয় যে লালমোহন বাবুর পুরাতত্ত্বে দখল অতি অল্প।

লালমোহন বাবু পৌরাণিক প্রমাণ অ-বলম্বন করিয়া বলেন যে "ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও বৈশ্য রমণীর গর্ভে রাজপুত্র জাতির উৎপত্তি।" আবার ডাক্তর কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের মতে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও কা-য়স্থ রমণীর গর্ভে বিখ্যাত রাজপুত্র জাতি সমুৎপন্ন। ইহাতে মত ভেদ আছে।

বৈশ্য জাতির সম্বন্ধে লালমোহন বাবু বলিতেছেন এই জাতি ব্রহ্মার উরু হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদিগের আচার ব্যব-হার প্রায় ক্ষত্রিয় সদৃশ, তবে কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিভিন্নতাও আছে।

"বৈশ্যদিগের জাতীয় ব্যবসায়—কৃষি, বাণিজ্য ও কুসীদ ব্যবহার। ইহাদিগের সা-ধারণ নাম বণিক, * বঙ্গদেশীয় বৈশ্যগণ শূদ্র মধ্যে পতিত হইয়াছেন † সুতরাং এ-স্থলে তাহাদিগের পৃথক নির্দ্দেশের আবশ্য-কতা দেখা যায় না।"

বৈশ্য-প্রকরণ শেষ করিয়া লালমোহন বাবু শূদ্র প্রকরণে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি বঙ্গদেশীয় শূদ্রদিগকে সামান্যতঃ চারি শাখায় বিভক্ত করিয়াছেন। যথা ১—সৎশূদ্র, ২, জল আচরণীয়, ৩, জল অ-ব্যবহার্য্য, ৪ অস্পৃশ্য।

১। 'কায়স্থ ও নবশাখ সমাজ দ্বারা সৎশূদ্র সমাজ সঙ্ঘটিত হইয়াছে।' ইহাই লালমোহন বাবুর মত।

২। জল আচরণীয় শূদ্র।—যে সকল শূদ্রজাতির জল ব্রহ্মণাদি উচ্চ জাতিরা গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে অশুচি জ্ঞান করেন না তাহাদিগকেই জল আচরণীয় বলা যায়।

---

* বাণিজ্য ব্যবসায়ীর সাধারণ নাম বণিক, কিন্তু কৃষি ব্যবসায়ীর সাধারণ নাম কি বণিক হইতে পারে?

† এস্থলে লালমোহন বাবুর সহিত আমাদের মতভেদ আছে, তাহা যথা স্থানে প্রদর্শিত হইবে।

৩। জল অব্যবহার্য্য। } ইহাদিগের সম্বন্ধে পশ্চাৎ উল্লেখ করা যাইবে।
৪। অস্পৃশ্য শূদ্র।

শূদ্রদিগের বিবরণ লালমোহন বাবু নিতান্ত সংক্ষেপে লেখেন নাই। কিন্তু আমরা আপাততঃ লালমোহন বাবুর শূদ্র প্রকরণ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্করজাতি প্রকরণের একটি বিশেষ অধ্যায়ে হস্তক্ষেপ করিতেছি। বৈদ্যজাতি আমাদিগের লক্ষ্য। কিন্তু লালমোহন বাবু এইজাতিটীকে লইয়া নিতান্তই হাস্যজনক কাণ্ড করিয়াছেন। তিনি ইহাকে না মূল না সঙ্কর কোন শ্রেণীতেই রাখেন নাই। অথচ প্রকারান্তরে সঙ্কর জাতি স্বীকার পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের নিম্নে ইহাদিগের স্থান প্রদান করিবার জন্য প্রাণপনে যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু কয়েক পৃষ্ঠা পূর্ব্বে সৎশূদ্রদিগকে লক্ষ্য করিয়া লালমোহন বাবু বলিয়াছেন—'বর্ণ সঙ্করের অনেক জাতি ব্রাহ্মণবৎ দশরাত্রি অশৌচ ব্যবহার পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। তথাপি কি তাহারা সৎশূদ্র অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রাপ্ত হন, অথবা সৎশূদ্রের নিম্নে আসন গ্রহণ করেন? পাঠক কহিবেন অবশ্য নিম্নে আসন গ্রহণ করা রীতি।' লালমোহন বাবুর এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সঙ্করজাতি বৈদ্যগণ, নবশাখ হইতেও নিকৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু লালমোহন বাবু ইহাদিগকে না স্বর্গে না মর্ত্ত্যে—হরিশ্চন্দ্রের দশায় স্থাপন করিয়াছেন। মূল ও সঙ্করজাতি হইতে পৃথক করিয়া ইহাদিগের জন্য একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় করিয়াছেন, সেই অধ্যায়ের নাম 'শাখা প্রশাখা'। লালমোহন বাবু কায়স্থ জাতির প্রতি একটুকু বক্র কটাক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু বৈদ্য জাতির দ্বিজত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন মানসে প্রাণপণ যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু মনুর মতে ইহারা চতুর্বর্ণের বহির্ভূত হইতেছেন। ভগবান মনু বলিয়াছেন।

ব্রহ্মণঃক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রোনাস্তিতু পঞ্চমঃ॥

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে বৈদ্য জাতি চারিবর্ণের মধ্যে নহে। তৎপর এক আশ্রয় ছিল সঙ্কর শ্রেণী। নবশাখের নিম্নে আসন প্রদান করিতে হইবে বলিয়া লালমোহন বাবু দ্বিতীয় মনুরূপ ধারণ করত ইহাদিগকে এক স্বতন্ত্র দ্বিজ-জাতি নির্ম্মাণের চেষ্টা (প্রকারান্তরে) করিয়াছেন।

আমাদের দেশে বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত হইবার জন্য নিতান্ত লালায়িত হইয়াছেন। কিন্তু মনু যে দেশে বাস করিয়া স্বীয় সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন, সেই দেশবাসী অম্বষ্ঠদিগকে, বৈদ্য বলিলে প্রাণরক্ষা হওয়া দুষ্কর। তাঁহারা বলেন 'আমাদিগকে বৈদ্য বলিয়া গালি দিতেছ কেন, আমরা চিত্রগুপ্তের সন্তান, অদ্যাপি বৎসরান্তে আমাদিগের গৃহে চিত্রগুপ্তের পূজা হইয়া থাকে, আমরা 'অম্বষ্ঠ কায়স্থ'।' আমরা দুই একখানা তাম্রশাসনেও বৈদ্য জাতির উল্লেখ পাইয়াছি। প্রায় ছয়শতাব্দী পূর্ব্বে জনৈক রাজমন্ত্রিকে গৌরবের সহিত 'বৈদ্যকুল প্রদীপ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রাচীনকালে এই বঙ্গ-

দেশেও বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং বৈদ্যদিগকে আমরা অম্বষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। লালমোহন বাবুর দূরদর্শন-ক্ষমতার নিতান্ত অভাব এজন্য তিনি বৈদ্য জাতিকে অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ও হারীত প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্রকারগণ সঙ্কর জাতির মধ্যে যে অম্বষ্ঠের উল্লেখ করিয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় সেই অম্বষ্ঠগণ কায়স্থ জাতির অন্তর্গত। সুযোগ্য বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এবিষয়ে আমাদের মত পোষণ করিতেছেন। সমস্ত ভারতবর্ষ-নিবাসী অম্বষ্ঠ জাতি অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া এবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সুতরাং প্রত্যক্ষ্য সাক্ষী পরিত্যাগ করিয়া অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করা নিষ্প্রয়োজন। দ্বাপরের ধর্ম্মশাস্ত্রকার শঙ্খের গ্রন্থ হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া বৈদ্য-কুলজি-লেখকগণ অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যদিগকে অভিন্ন অবধারণ করিতে যত্ন পাইয়াছেন। কিন্তু আমরা ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করি। বৈদ্যকুলাঙ্গার রাজবল্লভের চক্রান্তে যে এরূপ কতবচন সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বৈদ্যদিগের কুলজি গ্রন্থ সমস্তই রাজবল্লভের পরবর্ত্তী। লালমোহন বাবু উকিল রূপ ধারণ করত তাহার মক্কেলদিগের দ্বিজত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন মানসে এমনই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও পক্ষপাতান্ধ হইয়াছেন যে তিনি এসকল বিষয় চিন্তা করিবার কিছুমাত্র অবসর প্রাপ্ত হন নাই। তিনি রামজীবন-কৃত কুলপঞ্জিকা হইতে অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার উদ্ধৃত বচনের কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

বৈদ্যেতে মহারাজ রাজবল্লভ নাম।
সাকিম বিক্রমপুর রাজনগর* গ্রাম॥
দেশে দেশে ছিল যত পণ্ডিত প্রধান।
সবে আনি জিজ্ঞাসে শাস্ত্রের প্রমাণ॥
দ্বিজের আজ্ঞায় বৈদ্য পুনঃ উপবীত।
পুনরায় দ্বিজভাব † যথা পূর্ব্বরীত॥

আমরা 'বান্ধবে' ইতিপূর্ব্বে রাজবল্লভের জীবনচরিত প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে রাজবল্লভ পূর্ব্ববঙ্গের বিধবাশাসনকর্ত্রীকে কলুষিত প্রণয়ে আবদ্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে রাজকীয় ধনাগার হইতে দুইকোটী টাকা ও দুর্ব্বল জমিদারদিগের জমিদারি আত্মসাৎ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। তিনি ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া অগ্নিষ্টোম ও অত্য-

* এই গ্রামের নাম পূর্ব্বে বিলদাউনীয়া ছিল। রাজবল্লভ ইহাকে রাজনগর আখ্যা প্রদান করেন।

† মনু কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যকে দ্বিজ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল জাতির সঙ্কর ও জারজ সন্তানের এরূপ অধিকার থাকার কথা মনু স্বীকার করেন নাই। সুতরাং আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ও বৈশ্য ব্যতীত অন্য কোন জাতিকে দ্বিজ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। বোধ হয় সুযোগ্য পাঠকমাত্রেই আমাদের মত অনুমোদন করিবেন।

গ্নিষ্টোম. প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সে সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাহাকে বলিল 'মহারাজ, দ্বিজজাতি ব্যতীত ইহাতে অন্যের অধিকার নাই।' রাজবল্লভ নিতান্ত অপমানিত হইয়া পণ্ডিতদিগের পাদপদ্মে দশলক্ষ টাকা ঢালিয়া দিলেন। পণ্ডিতগণ টাকা পাইলে না করিতে পারেন এমন কার্য্য নাই। দেখিতে দেখিতে রাশি রাশি বচন প্রমাণ বাহির হইল। সে সকল প্রমাণ দ্বারা নির্ণিত হইল।

১। অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য একজাতি।

২। বল্লাল সেনের বংশেই,—দ্বাপর যুগের জরাসন্ধ মতান্তরে চন্দ্রমা রাজবল্লভ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

৩। বৈদ্যদিগের পূর্ব্বে উপবীত ছিল। কেবল বল্লাল সেনের কুকার্য্য দ্বারা তাঁহারা আচারভ্রষ্ট হইয়া উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন।

সুতরাং এইক্ষণ তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণ পূর্ব্বক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

এই তিনটী কথার মধ্যে প্রথমটি যে নিতান্ত অসঙ্গত বাক্য তাহা আমরা বিশেষরূপে দর্শাইয়াছি। দ্বিতীয় কথা, চন্দ্রমা কিম্বা জরাসন্ধের অবতার রাজবল্লভ বল্লালের বংশধর। আমরা সর্ব্বদাই একথা বলিয়া আসিতেছি যে রাজবল্লভকে প্রাচীন গৌড়েশ্বরের উত্তর পুরুষ অবধারণ করিবার জন্যই সেন রাজগণকে বৈদ্য বংশীয় বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। বৈদ্যকুলজিকারগণ ইহা কিরূপ কৌশলের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণ শ্রবণ করুন।

ভূশূর নামক পুত্র আদি নৃপতির।
মুনি পঞ্চকের যজ্ঞে জন্ম যার স্থির॥
ভূশূরে না দেখি পুত্র আদি নৃপমণি।
নিজ তনয়া লক্ষ্মীকে পুত্রিকায়গণি॥
তাহার তনয় দেখি যায় স্বর্গপুর।
পুত্র বা কন্যার পুত্র নাহি কিছু দূর॥
অশোক দৌহিত্র জান আদি নৃপতির।
তাহার তনয় হন শূরসেন ধীর॥
যাহার ঔরসে জন্মে বীরসেন রায়।
তাহার পুত্র ভূপ সামন্ত নাম তায়॥*
সামন্তের হেমন্ত নামে তুল্য নন্দন।
বিম্বক, তাত বলি যারে করে বন্দন॥
কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্র নাহি ব্যবহার।
কিন্তু বৈদ্য বংশে এক পাই সমাচার॥
আদিশূরের বংশ ধ্বংস সেনবংশতাজা।
বিম্বকসেনের ক্ষেত্রজপুত্রবল্লালসেনরাজা।
বল্লাল নৃপের পুত্র নামেতে লক্ষ্মণ।
মাধব তাহার পুত্র বুদ্ধি বিচক্ষণ॥
কেশব ভূপতি হন মাধব তনয়।
তার সুত গুণযুত লক্ষ্মণ সে হয়॥
যার গুণ গান দ্বিজ পঞ্চের সন্তান।

* বৈদ্য কুলজি লেখক এস্থলে ঐতিহাসিক সত্যের বিরুদ্ধে যে সকল কথা প্রচার করিয়াছেন, আমরা আপাততঃ তাহার কোন রূপ প্রতিবাদ করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু বৈদ্যদের উকীল লালমোহন বাবুর ঐতিহাসিক জ্ঞান কেবল ভ্রমসঙ্কুল কুলজি গ্রন্থেই আবদ্ধ দেখা যাইতেছে।

রাজবল্লভ তাঁহার করে ধ্যান জ্ঞান ॥
পর্গনে বিক্রমপুর রাজার নগর।
সেই স্থানে বাস করে বৈদ্য কুলবর ॥

জাজ্বল্যমান মিথ্যা হঠাৎ মুখ হইতে বাহির হইতে চাহে না, এজন্যই বৈদ্য কবি লিখিলেন 'যার গুণগান দ্বিজ পঞ্চের সন্তান। রাজবল্লভ তাহার করে ধ্যান জ্ঞান॥' ডাক্তার বকনন মালদহে অবস্থান কালে শ্রবণ করেন যে 'রাজবল্লভ ও তাহার সন্ততিবর্গ আপনাদিগকে বল্লাল বংশজ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।' তিনি ইহার তথ্যানুসন্ধান জন্য ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ব বঙ্গে গমন করেন। সে সময় সেই প্রদেশের কয়েকজন প্রধান পণ্ডিত, রাজবল্লভ ও তদনুচরবর্গের প্রচারিত বাক্য সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া তাহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিরূপ স্বার্থের বশীভূত হইয়া রাজবল্লভের অনুচর ও প্রসাদভুকবর্গ ইচ্ছা পূর্ব্বক সত্যের শীর্ষে পদাঘাত পূর্ব্বক মিথ্যা বাক্য প্রচার করিতে প্রাণপণে যত্ন করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। চাটুকারবর্গ যে রাজবল্লভের ইহকালের বংশাবলী কীর্ত্তন করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলেন এমত নহে। কেহ বলিলেন যে দ্বাপরযুগে যে মহাত্মা বৃহদ্রথ রাজার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই ইদানীং রাজবল্লভরূপে বঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কেহ বলিলেন, ভগবান রোহিনীবল্লভ শশাঙ্ক সুরলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাধাম পবিত্র করিবার জন্য 'বিল দাউনিয়া' নগরে আবির্ভূত হইয়াছেন। পাঠকগণ কি এসকল কথা বিশ্বাস করিতে পারেন? এসকল যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও কল্পনা-প্রসূত তাহা বোধ হয় সুবিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

তৎপর তৃতীয় কথা হইতেছে, বৈদ্যদিগের পূর্ব্বে উপবীত ছিল। বল্লাল সেনের কুকার্য্য দ্বারা তাহারা যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এসম্বন্ধে আমাদের প্রথম আপত্তি এই যে বল্লাল সেনদেব বৈদ্য-বংশ-সম্ভূত ছিলেন না। রাজবল্লভের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ইহারা সমস্ত ভারতে অম্বষ্ঠ কায়স্থ কুলজাত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ব্বে আকবরের মন্ত্রী আবুল ফাজেল ইহা তাহার আইন আকবরি গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। তৎপর রাজবল্লভের অভ্যুদয়ের অল্প পূর্ব্বে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক যোসেফ টিফিন তল্লার, যিনি হিমালয় হইতে কুমারিকা, ও সিন্ধুতীর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তিনিও সেন-রাজগণকে কায়স্থ বংশজ লিখিয়া গিয়াছেন। সেন রাজগণের জাতি সম্বন্ধে কোন কথা উপস্থিত হইলেই বৈদ্যগণ বলেন যে দেশ-প্রচলিত প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে সেন-রাজ-শ্রেণী বৈদ্য বংশজ বলিয়া দীর্ঘ কালাবধি পরিচিত থাকার উক্তিটী কখনও সম্পূর্ণ মিথ্যা হইতে পারে না। এজন্য আমরা আবুল ফাজেল ও খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকের লিখিত বাক্য হইতে প্রমাণ করিতেছি যে রাজবল্লভের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে সেন রাজগণ কায়স্থ কুলজ বলিয়া

পরিচিত ছিলেন। কেবল রাজবল্লভ চক্রান্ত করিয়া ইহাদিগকে "বৈদ্য বংশজ" এই নূতন প্রবাদ-বাক্য সৃষ্টি করেন, সুতরাং এই প্রবাদ বাক্যের প্রতি কোনরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না।

এপর্য্যন্ত সেন-রাজ-বংশের ছয় খণ্ড প্রস্তর-লিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে।* তন্মধ্যে পাঁচ খণ্ডের প্রতিলিপি আমরা পাঠ করিয়াছি। অবশিষ্ট একখণ্ড পাঠোদ্ধার জন্য এসিয়াটিক সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহা, শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে, প্রায় ৯ বৎসর গত হইল, প্রদান করেন। আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে প্রতাপ বাবু অদ্যাবধি ইহার প্রতিলিপি কিম্বা মর্ম্ম প্রকাশ করেন নাই। যাহা হউক যে পাঁচ খণ্ডের প্রতিলিপি আমরা দর্শন করিয়াছি, তাহার একখানাতেও ইহাদিগকে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয় নাই। অধিকন্তু একখণ্ড প্রস্তর লিপি ও তিন খণ্ড তাম্রশাসনের প্রারম্ভে ভগবান ভবানীপতির শিরোভূষণ চন্দ্রমার জয় গান করিয়া সেন রাজগণকে তদ্বংশধর বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আমরা অনেক গুলি শাসন পত্র ও প্রাচীন গ্রন্থ দর্শন করিয়া যে সামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহার ব্যবহারে ইহা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে কেবল ক্ষত্রিয় কুল-জাত রাজগণই চন্দ্র ও সূর্য্য বংশজ বলিয়া পরিচয় দিতে অধিকারী বটে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে সেন রাজগণ হয় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় নয় কায়স্থ জাতীয় ছিলেন। বোধ হয় পাঠকগণ ইহা অবগত আছেন যে কিছুকাল যাবৎ কায়স্থ-জাতি ক্ষত্রিয়-বংশ সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা পাইতেছেন। যাঁহারা কুতর্ক করিয়া বলেন যে আজি কালিই কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইবার জন্য লালায়িত হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে নৈষধচরিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। যাহা হউক কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়-বংশ-সম্ভূত কিনা, তাহা অবধারণ করা আমাদের অভিপ্রায় নহে। ইহাই আমাদের বক্তব্য যে প্রাচীন কালেও কোন কোন কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। প্রস্তর-লিপি ও তাম্রফলকে যখন সেনরাজগণ, চন্দ্র বংশজ, (সুতরাং ক্ষত্রিয়) বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, তখন অবশ্যই তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ আবুল ফাজেল প্রভৃতির লেখা আলোচনা করিলে ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে সেন-রাজগণ কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কতকগুলি আধুনিক—ভ্রমসঙ্কুল কুলজিগ্রন্থ ব্যতীত কোন বিশ্বস্ত ইতিহাস কিম্বা শাসন-পত্রাদিতে তাহাদি-

---

* ১। রাজসাহির প্রস্তর ফলক, ২। সুন্দর-বনের তাম্রশাসন, ৩। তর্পণ দিঘীর তাম্রশাসন, ৪ ও ৫ বাখরগঞ্জের দুই খণ্ড তাম্রশাসন। ৬ বৌদ্ধগয়ার প্রস্তরলিপি। তন্মধ্যে বাখরগঞ্জের একখানি তাম্রফলকের মর্ম্ম প্রকাশিত হয় নাই।

গকে বৈদ্য বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই, * এমতাবস্থায় সেন-রাজগণের কার্য্য-কলাপের সহিত বৈদ্যদিগের যজ্ঞসূত্রের কোন সংস্রব থাকার কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। লালমোহন বাবু যদি বৈদ্যদিগের গোড়া উকিল না হইয়া প্রকৃত বিচারকের ন্যায় সূক্ষ্মানুসন্ধান করিতেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের মত সমর্থন করিতেন।

লালমোহন বাবু তাঁহার ময়াক্কেলদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন যে বল্লাল (যখন দিল্লীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি) কোন নীচজাতীয়া পদ্মিনী রমণীর প্রণয়ে আসক্ত হন। লক্ষ্মণ সেন তখন পিতৃ-নিয়োগ অনুসারে গৌড় শাসন করিতেছিলেন। * তিনি এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র পিতাকে নীচজাতীয় রমণী পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। বল্লাল, পুত্রের বাক্য অগ্রাহ্য করিলেন। তখন লক্ষ্মণ সেন বৈদ্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আমরা তাঁহার অন্নগ্রহণ করিব না। অদ্য হইতে ভিন্ন জাতি বলিয়া পরিচয় দিব।

"ঘুচাও ঘুচাও পৈতা বল শূদ্র এবে॥
লক্ষ্মণ-অনুগত বৈদ্য পৈতা ঘুচাইল।
সেই হইতে বৈদ্যের পৈতা গিয়াছিল॥"

বল্লালের দিল্লীতে রাজত্ব করার সংবাদটী সম্পূর্ণ মিথ্যা, সুতরাং এই সকল বাক্য যে বৈদ্যদিগের স্বার্থোদ্ধার জন্য কল্পনা-প্রসূত তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিশেষতঃ কোন বিশেষ প্রমাণ অনুসন্ধান না করিয়া সে দিবসের কয়েক খানা মূল্যহীন বৈদ্য-কুলজির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক মহারাজ বল্লালের ন্যায় একজন গুণগ্রাহী রাজার চরিত্রে যে লালমোহন বাবু এরূপ কলঙ্কারোপ করিয়াছেন ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়।

তৎপর বৈদ্যদিগের যে পূর্ব্বে যজ্ঞোপবীত

---

* তাম্রশাসনের 'ওষধিনাথ' শব্দটি লইয়া বাবু যাদবানন্দ রায় ওরফে 'গুপ্ত' মহাশয় আমাদিগকে কিরূপ মিষ্ট সম্বোধন করিয়াছেন, তাহা ভারতীয় পাঠকগণ বোধ হয় বিস্মৃত হন নাই। ঐতিহাসিক কূটপ্রশ্ন লইয়া আমরা বিজ্ঞগণের সহিত তর্ক করিতে অপ্রস্তুত নহি। মনুষ্য ভ্রমপ্রমাদের দাস, যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক বন্ধু ভাবে কেহ আমাদিগকে আমাদের ভ্রম দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু গালি গালাজের উত্তর দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য জ্ঞানের বহির্ভূত কার্য্য। যাদবানন্দ বাবু যদি শাসনপত্র গুলি দেখিয়া আমাদের বিরুদ্ধে লেখনীধারণ করিতেন তবে আমরা সুখী হইতাম. কিন্তু দেখা যাইতেছে তিনি কিছুমাত্র মূলানুসন্ধান না করিয়া কেবল নকলের নকল তস্য নকল লইয়া গণ্ডগোল করেন। 'ওষধিনাথ' শব্দের 'ধি' এর 'ি' কারটী স্পষ্টাক্ষরে শাসন পত্রে লিখিত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ইহা অস্বীকার করিবেন, তিনি হয় অন্ধ, নয়, কোন কালে শাসন পত্র দর্শন করেন নাই।

* গোপাল কৃষ্ণ কবীন্দ্র প্রণীত 'অম্বষ্ঠ সম্বাদিকা' ১০, ২১ পৃষ্ঠা দেখ।

ছিল না ও রাজনগর-নিবাসী রাজবল্লভের সময় হইতে তাহারা যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা যে কেবল আমরা দেশ-প্রচলিত প্রবাদ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি এমত নহে। রাজবল্লভের কিঞ্চিৎ কনিষ্ঠ ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কিঞ্চিদূন একশতাব্দী পূর্ব্বে ইহা তাঁহার রাজাবলী নামক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের প্রায় সমকালবর্ত্তী ডাক্তার বুকানন এই ঘটনাটী সমধিক বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে 'রাজবল্লভ দশলক্ষ টাকা দিয়া বৈদ্যদিগের জন্য, ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে যজ্ঞসূত্র ক্রয় করিয়াছিলেন।' ঢাকার ভূতপূর্ব্ব খ্যাতনামা কমিসনর বকলাণ্ড সাহেব তাঁহার 'ঢাকা বিভাগের ইতিহাস' মধ্যে লিখিয়া গিয়াছেন "The investiture of the *Paita* or sacred cord was purchased for this caste about 100 years ago, by Raja Rajbullubh of Rajnagur.

বৈদ্যদিগের অন্যতম কুলজি-লেখক গোপালকৃষ্ণ কবীন্দ্র বৈদ্যদিগের যজ্ঞসূত্র-গ্রহণ বৃত্তান্তটী এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন।

বিক্রমপুরে পরমানন্দ বংশান্বিত।
তন্মধ্যে কৃষ্ণজীবন শুভক্ষণে জাত॥
কৃষ্ণ জীবনের চারিপুত্র, রাজারাম।
ধনিরাম, রাজবল্লভ আর রাম রাম॥
যে কালে মহম্মদ সাহ দিল্লী-পালক।
নবাব মহবৎজঙ্গ * বঙ্গাদি শাসক॥
সাহবৎজঙ্গ † নামে তস্য ভ্রাতৃপুত্র।
পাদসাহী দেওয়ান মুরসিদাবাদে স্থিত॥
তাহার দেওয়ান রাজবল্লভ সুকৃতী।
সর্ব্বকার্য্যাধ্যক্ষ তাঁর মহারাজ খ্যাতি॥
ষোলশত একষট্টি শকাব্দ অবধি।
সাতোত্তর পর্য্যন্ত তাহার রাজ্যোন্নতি॥
বহুবিধ যজ্ঞ আর স্বজাতি পোষণ।
যথা সাধ্য করে নানা দান বিতরণ॥
দেখে বহুতর বৈদ্য যজ্ঞ সূত্র হীন।
কোন কোন বৈদ্য সদাচারেতে প্রবীণ॥
স্বজাতির ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া রাজন।
পণ্ডিত নিকটে করে পত্রিকা প্রেরণ॥
অগ্নিষ্টোম অত্যগ্নিষ্টোম যজ্ঞকারী।
মহারাজ রাজবল্লভ দাতা শুদ্ধাচারী॥ ‡
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ কটক কাশী ভোজ।
মধুপুর কাঞ্চীনায়া নেপাল কাম্বোজ॥
তৈলঙ্গ মগধপুর গৌর দেব রাষ্ট্র।

---

* মহাবৎজঙ্গ—আলিবর্দ্দী খাঁ।

† সাহবৎজঙ্গ—নিবাইস মহম্মদ।

§ যদিচ মিথ্যা হউক তথাপি বৈদ্যগণ বলিতেছেন যে, বল্লালের অত্যাচারে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ উপবীত ত্যাগ করে। যাহা হউক কিরূপ "শুদ্ধাচারী" ব্যক্তির দ্বারা তাহাদের পৈতা উদ্ধার হইয়াছিল তাহা পাঠকগণ শ্রবণ করুন! রাজবল্লভ তাহার প্রভু ও রাজপত্নীগামী সুতরাং তিনি সপ্তবিধের মধ্যে এক প্রকার মাতৃগামী মহাপাপী, দ্বিতীয়তঃ তিনি যবনী গমন করিয়াছিলেন সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তিনি পতিত ব্যক্তি? এইরূপ মহাপাপী ও পতিত ব্যক্তি শুদ্ধাচারী, আর [illegible] অনাচারী! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং!

কর্ণাট তৈলঙ্গ খণ্ড শ্রীক্ষেত্র সৌরাষ্ট্র।
কামরূপ জনকপুর হস্তিনা দ্রবিড়।
মহারাষ্ট্র কান্যকুব্জ অযোধ্যা দ্রাবিড়॥
নবদ্বীপ বিদর্ভ শূরসেন পাশ্চাত্য।
মৎস বর্দ্ধমান চট্টগ্রাম দাক্ষিণাত্য॥
চন্দ্রদ্বীপ জসোর আর রাজসাহী আদি।
যে যে স্থানে ছিল কোন পণ্ডিত বসতি॥
পত্র লিখি আনিয়া পণ্ডিত বিপ্রগণ।
পাতি নিয়া করে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ॥

এই সকল অবগত হইয়া কে ইহা অস্বীকার করিবেন যে রাজবল্লভের সময় হইতেই বৈদ্যগণ উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন,—ইহার পূর্ব্বে তাঁহাদের যজ্ঞসূত্র ছিল না? কিন্তু লালমোহন বাবুর গোড়ামি দেখিয়া বোধ হইতেছে যে কোন প্রকারে বৈদ্যদিগের দ্বিজত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাই তাহার এই গ্রন্থ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। যাহা হউক আমাদের বিবেচনায় বৈদ্যজাতি অতি প্রাচীন নহে। যদিও পুরাকালে চিকিৎসা ব্যবসায় থাকা, সম্ভব, তথাপি সেই সময়ে চিকিৎসা ব্যবসায়ের জন্য স্বতন্ত্র জাতি গঠিত হইয়া ছিল কি না, সন্দেহ। বোধ হয় মনুসংহিতা-রচনাকালে এই জাতি ছিল না। মনুর সময়ে অথর্ব্ব ছিল না। কোন কোন পণ্ডিতের মতে আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্বের অন্তর্গত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আরও পরবর্ত্তী হইবে। বৈদ্যজাতির উৎপত্তি-বিবরণ পুরাণেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা বৈদ্যকুলজিকারগণই স্বীকার করিতেছেন। আমাদের বোধ হইতেছে আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ী বৈদ্য মনুর সময়ে ছিল না। অদ্যাপি ভারতের কোন কোন প্রদেশে বৈদ্য বলিয়া একটি স্বতন্ত্র জাতি দৃষ্ট হয় না। লালমোহন বাবু পক্ষপাতান্ধ হইয়া একস্থানে লিখিয়াছেন যে, বৈদ্যগণ ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে সমকক্ষ ভাবে ও ব্রাহ্মণের নিম্নে আসন গ্রহণ করেন। আবার লালমোহন বাবুর উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীগণ বলেন যে, বৈদ্যজাতি হিন্দুসমাজে অত্যন্ত নীচ। কিন্তু আমরা ইহার কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে পারি না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

জীবনসন্ধ্যা।

স্থান হুগলী, ভগ্ন অট্টালিকা—সময় মেঘাচ্ছন্ন সায়াহ্ন।

১

জলদে গগন ছেয়ে
আসিছে আঁধার হ'লে.
অনন্তের প্রান্ত হ'তে গম্ভীরে ভীষণ
থেকে থেকে কাল যেন করে আবাহন।
স্তব্ধ জগত কায়া,
হৃদয়ে চাপিয়া ছায়া,
ত্রাসে শূন্য প্রান্ত পানে করে দরশন,

হেরিয়া সহসা আজ কেঁদে ওঠে মন।

২

চারি দিকে থেকে থেকে
প্রাণী কণ্ঠ ওঠে ডেকে,
ডাকে কাছে পিতা মাতা সন্তানে আপন,
জননীরে ডাকিতেছে শিশু ঘন ঘন;
ডাকে ছাগ বারবার,
গাভী পশু পক্ষী আর,
সঙ্গীহারা যেই জন ডাকে সঙ্গী তার
কাহারে ডাকিবি তুই প্রাণরে আমার!

৩

প্রাণরে! যাহারে ভাল
বাসিলি এ চিরকাল
ডাকিলে কি আসিবে সে কাছে একবার
অথবা সে কিরে তোরে ডাকে কাছে তার?
ভাই ভগ্নী সুত দারা
ডাকিলে আসিত যারা
তাহাদের সঙ্গী নাহি করিলি কখন
প্রাণ রে সায়াহ্নে কাছে রবে কোন জন!

৪

পরিপূর্ণ করি বুক
রাখিলি অনন্ত দুখ,
মুমূর্ষু শয়ন-পার্শ্বে যবে চারিধার
দাঁড়াইবে সাশ্রু নেত্রে পুত্র পরিবার—
বাস বা না বাস ভাল,
তারা তোর চিরকাল,
এক বিন্দু তাহাদের করিতে প্রদান—
তখন কোথায় সুখ পাইবিরে প্রাণ।

৫

তোর মত দুখ যার,
অতৃপ্ত জীবনে তার,
আছে এক মাত্র সুখ ধরার উপরি
মৃত্যুকালে এক খানি করতল ধরি।
কোথা সেই করতল!
প্রাণ কি ধরিবি বল্!
পরশিতে যেই কর নারিলি জীবনে
ধরিতে সে করতল পাবি কি মরণে!

৬

এ সংসারে আছে সব,
জীবন সায়াহ্নে তার,
মুমূর্ষু শয়ন পার্শ্বে হ'য়ে অবনত
ভাসে এক খানি মুখ শতচন্দ্র মত;
শতচন্দ্রাধিক জ্ঞানে,
যে মুখ হেরিলি ধ্যানে,
জীবন সায়াহ্ন আজ আঁধার নয়ন
প্রাণ রে পারশে তোর কই সে বদন!

৭

সংসার তৃষ্ণায় জ্বলি
যবে প্রাণী যায় চলি,
শুষ্ক ওষ্ঠাধরে তার একটি চুম্বন
প্রাণের অনন্ত তৃষ্ণা করে নিবারণ!
সে দারুণ পিপাসায়
প্রাণ তুই মৃতপ্রায়,
আসিতেছে ধীরে ধীরে মুদিয়া নয়ন
শুষ্ক ওষ্ঠাধরে তোর কে করে চুম্বন!

৮

না করিলি কোন কর্ম্ম,
না সাধিলি কোন ধর্ম্ম,
দুরাশার মহা সিন্ধু করি সন্তরণ
অনন্ত স্বপনে এক কাটিলি জীবন!
স্বপনে হেরিলি যাহা,
শুধু মরীচিকা তাহা,

তৃষ্ণাতুর হয়ে কাছে ছুটিলি যখনি
অনল উত্তাপে প্রাণ! দহিলি তখনি!

৯

করিলি বিস্তর দান
কিন্তু কারে দিলি প্রাণ!
এ দানের এক বিন্দু পাইলে যে জন
সার্থক ভাবিত তার সমস্ত জীবন—
তাহারে না দিলে কভু,
সে তোর, কিঙ্করী তবু,
কোন্ লাজে প্রাণ আজ ভিক্ষুক মতন
সজল নয়নে তার চাহিলি বদন!

১০

কৈশোর না হ'তে গত
ধরিলি কঠোর ব্রত,
জীবন—যৌবন—সাধ করি পরিহার
সুদীর্ঘ জীবনে এই অশ্রু করি সার!
ফলিল সে যোগ কিনা,
এ জীবনে বুঝিলি না,
আঁধার হইয়ে ক্রমে আসিল জীবন
প্রাণ রে! কে কাছে তোর রহিবে এখন?

ঈঃ—

পাতিয়ালা রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

পাতিয়ালার ভারতবিখ্যাত রাজবংশ যশল্মীরের সংস্থাপয়িতা মহাত্মা যশলজী হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ যশল স্বীয়রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণান্তর হিসার নগরীর নিকটবর্ত্তী প্রদেশে স্বীয় আবাসস্থান মনোনীত করেন। তথায় তাঁহার পুত্র চতুষ্টয়ের জন্ম হয়। তাঁহাদিগের অন্যতম বীরবর হেমেল হিসার নগরী ধ্বংশ করিয়া তৎচতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার বিক্রমপ্রভাবে দিল্লীশ্বর সমসুদ্দিন আলটমাসের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। বীরকেশরী হেমেল স্বীয় নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলেন। ১২১২ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লীপতির অনুগ্রহে সিসী ও বট্রিণ্ডা নামক জনপদ দ্বয়ের শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া হান্সার নগরী নির্ম্মাণ করেন। ১২১৪ খৃষ্টাব্দে তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র জন্দ্র পৈতৃক পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বটারা তাঁহার এক বিংশতি পুত্রের অন্যতম। তদীয় বীর পুত্র মঙ্গলরাও যশল্মীর নগরীতে স্বীয় মস্তক অকুণ্ঠিত চিত্তে অর্পণ করিয়া দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের প্রায়শ্চিত্ত করেন। আন্দেরাও তাঁহার একমাত্র পুত্র। তদীয় পুত্র খিওয়া প্রথম পরিণীতা রাজপুতবালার সন্ততি না হওয়ায় বসির নামক জনৈক জাঠ জমিদারের তনয়ার পাণিগ্রহণে স্বীয় নির্ম্মল ও উন্নত ভট্টিরাজপুত্র কুল অপবিত্র করেন। এই কারণে তিনি আত্মীয় বান্ধবদিগের ঘৃণা ও বিরক্তির ভাজন হইলেন। বসির তনয়ার গর্ভে সিধুর জন্ম হয়।

তিনিই সিধুজাঠ বংশের আদি পুরুষ। সপত্নীর পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া রাজপুতবালা মর্ম্মন্তুদ যাতনায় অধীর হইলেন। প্রভূত অর্থ প্রদান প্রলোভনে পরিচারিকা ধাত্রীকে বশীভূত করিয়া রাজকুমারের পরিবর্ত্তে অপর একটি বালিকা রাখিয়া রাজপুতবালা একাকিনী নিশীথে নিকটবর্ত্তী কাননস্থ শুষ্ক জলাশয়ে নির্ম্মমহৃদয়ে সপত্নী-বালককে বিসর্জ্জন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যুত রাজকুমার জনৈক পথিকের দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র, নিঃসন্তান পথিক তাঁহাকে গৃহে নিয়া স্বীয় সন্তানবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিচারিকা দীর্ঘকাল এই গুপ্ত রহস্য অব্যক্ত রাখিতে সমর্থ হয় নাই। অবশেষে রাজপুতবালাকে বাধ্য হইয়া আত্মদোষ স্বীকার করিতে হইল। অনেক অনুসন্ধানের পর অপহৃত বালক দীর্ঘকাল পরে পিতৃসদনে আনীত হয়।

অতঃপর মহামতি সিধুর বংশধরদিগের অবস্থা ক্রমে হীন হইতে আরম্ভ হইয়া দারিদ্র্যের চরমসীমায় উপনীত হয়। ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে যখন বাবর পঞ্জাবে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন, তখন সঙ্ঘরনামা সিধুর জনৈক বংশধর স্বীয় ভুজবীর্য্যে ও বুদ্ধিচাতুর্য্যে তাঁহাকে মোহিত করিয়া অনুচর সমভিব্যাহারে তদীয় সৈনিক দলে প্রবিষ্ট হন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দের ২১ শে এপ্রেল পাণিপথের সুপ্রসিদ্ধ সমরে বিজয়-লক্ষ্মী বীরকেশরী বাবরের অঙ্কশায়িনী হন। সেই ভীষণযুদ্ধে বীরবর সঙ্ঘর প্রাণ ত্যাগ করেন।

মহামতি বাবর স্বীয় বিশ্বস্ত মৃত অনুচরের পুত্র বরিয়ামের প্রতি দিল্লীর দক্ষিণ পশ্চিমস্থ অনুর্ব্বর ভূভাগের রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করেন। তিনি পরিত্যক্ত ভিদোয়ালনগরী পুনঃনির্ম্মাণ করেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে ভট্টিদিগের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

বরিয়ামের চতুর্থতম বংশধর মোহন স্বীয় দেয় দিল্লীশ্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজস্ব দিতে আপনাকে অসমর্থ ভাবিয়া ও জাতশত্রু ভট্টিদিগের দ্বারা সবিশেষ উপদ্রুত হইয়া হান্সী ও হিসার নগরীস্থ আত্মীয় বান্ধবগণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহানন্তর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ভিদোয়ালের সন্নিকটে ভট্টিদিগকে পরাজিত করেন। শিখগুরু হরগোবিন্দ সিংহের পরামর্শানুসারে তিনি মহারাজ নামক গ্রাম সংস্থাপন করেন। ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে মোহন ও তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপচাঁদ ভট্টিদিগের সহ সমরে নিহত হন। কনিষ্ঠ কালাচাঁদ স্বীয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র-দ্বয়ের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হন। মোহনচাঁদের মৃত্যুর অনতিবিলম্বে শিখগুরু হরগোবিন্দ ভিদোয়ালে পুনরায় উপস্থিত হন, ও তদীয় বালকদিগের বহু সন্তানসন্ততি হইবে বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। সিদ্ধপুরুষের ভবিষ্যৎ বাণী নিষ্ফল হয় নাই। পাতিয়ালা, নভা, ঝিন্দ, ভাদুরী, ও মালোদের রাজবংশ রূপচাঁদের দ্বিতীয়পুত্র ফুলেরই বংশধর।

প্রসিদ্ধ যোগী সমেরপুরী ফুলের শিক্ষাগুরু, তাঁহার নিকট হইতে প্রণায়াম (শ্বা-

সরোধদ্বারা মৃতভাবাপন্ন হওয়া) রহস্য শিক্ষা করেন। ইহা হইতেই তাঁহার শোচনীয় মৃত্যু সংঘটিত হয়। তিনি১৬২৭ খৃষ্টাব্দে পিতামহপ্রতিষ্ঠিত মহারাজ নগরী পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে সার্দ্ধদ্বিক্রোশ দূরে ফুলনামক গ্রাম প্রতিষ্ঠিত করত তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং সম্রাট সাজাহান হইতে পূর্ব্বপুরুষদিগের রাজস্বসংগ্রাহকপদের সনন্দ প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে;—

রাজস্ব সংগ্রহে ঔদাসীন্য দেখিয়া সার্হিন্দের শাসনকর্ত্তা ফুলকে কারাগারে আবদ্ধ করেন। ভীষণ কারাগৃহ হইতে পলায়নের উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্বাসাবরোধ পূর্ব্বক মৃতবৎ শয্যায় শয়ান রহিলেন। কারারক্ষকেরা মৃতদেহ দাহনার্থ ফুলের দেহ তদীয় স্বজনবান্ধবদিগের নিকট অর্পণ করিল। প্রথম পরিণীতা পত্নী বালী তাহার এই অদ্ভুত ও অমানুষিক ক্ষমতার বিষয় পরিজ্ঞাত ছিলেন। তিনি সেই সময়ে পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তদীয় দ্বিতীয়া পত্নী তাঁহাকে মৃত ভাবিয়া মৃতদেহ সৎকারার্থ অনুমতি দিলেন। কিয়ৎকাল পরে পিত্রালয় হইতে প্রত্যাগত বালী জীবিতপতি দগ্ধ হইয়াছে শুনিয়া নিতান্ত দুঃখাভিভূতা হইলেন। রাজ্ঞী অজ্ঞাতপাপ-হেতু একান্ত লজ্জিতা ও দুঃখসন্তপ্তা হইয়া সপত্নীসহবাস পরিত্যাগ পুরঃসর অন্যত্র চলিয়া গেলেন। বালীর প্রথম পুত্র তিলকচাঁদ হইতে নভা ও ঝিন্দ রাজবংশের উদ্ভব হইয়াছে। তদীয় দ্বিতীয় তনয় রামচাঁদ পাতিয়ালার নৃপতিকুলের সংস্থাপয়িতা।

ফুলগ্রামের সন্নিকটে একদল দস্যুকে পরাভূত করিয়া রামচাঁদ প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করেন। তিনি রামপুরগ্রাম সংস্থাপিত করিয়া স্বীয় অনুচর সমভিব্যাহারে দুর্ব্বলতর প্রতিবেশীদিগের গ্রামে আপতিত হইয়া স্বকীয় প্রাধান্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ভট্টিদেশ আক্রমণ করিয়া চণ্ডাগ্রামের নিকটে কুলশত্রু হাসন খাঁকে পরাভূত করতঃ তাহা হইতে প্রভূত অর্থ গ্রহণ করেন। তৎপর তিনি কোটের মুসলমান সামন্তকে ঘোরতর যুদ্ধের পর পরাজিত করেন।

এই সময়ে দিল্লীশ্বরের প্রভুতা অস্তগমনোন্মুখী দেখিয়া, রামচাঁদ স্বীয় আধিপত্য বিস্তৃতির সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। তাঁহার দেয় সমুদয় বাকী রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইয়া চেনসিংহ নামক জনৈক দূরসম্পর্কিত ভ্রাতার সাহায্যে সার্হিন্দের মুসলমান শাসনকর্ত্তার অনুমত্যনুসারে জঙ্গলময় অনুর্ব্বর ভূভাগের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলেন। চেনসিংহ তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হইলেন। উক্ত পদ সবিশেষ লাভজনক দেখিয়া চেনসিংহ সার্হিন্দের শাসনকর্ত্তা হইতে সমস্ত ভূভাগের একাধিপত্য প্রাপ্তির চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। চেনসিংহের এই ষড়যন্ত্রের বিষয় রামচাঁদের কর্ণগোচর হইলে, তিনি অবিলম্বে তাহার উপাংশুহত্যা সাধন করিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে চেনসিং

হের পুত্র বীর ও উগ্রসেন সুযোগ ক্রমে কোটলানামক স্থানে পিতৃহন্তারককে নিহত করিয়া রামচাঁদের উক্ত জঘন্য দুষ্কৃতির প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। রামচাঁদের পত্নী সাবির গর্ভে তাঁহার ছয় পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ দুনা ভাদুর রাজবংশের আদিপুরুষ। তাহাদের অন্যতম ভক্ত হইতে মালোদ রাজবংশ উৎপন্ন হইয়াছে।

অশীতিপরবৃদ্ধ রামচাঁদের ঘাতকহস্তে মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তদীয় বিপুল সম্পত্তি তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে সমাংশে বিভক্ত হয়। প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে অভীষ্ট কার্য্য সম্পাদনে তৎপর হইলেন। আলাসিংহ পাতিয়ালার জ্যেষ্ঠাধিকার সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। পাতিয়ালা নভা ও ঝিন্দের রাজবংশ ভিন্ন ফুলের বংশধরদিগের মধ্যে কুত্রাপিও জ্যেষ্ঠাধিকারের প্রচলন নাই। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে তিলক ও রামচাঁদ কর্তৃক সংস্থাপিত ভাইরূপ নামক গ্রাম অদ্য পর্য্যন্তও পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নভা, ভাদুর ও মালোদ রাজকুলের মধ্যে সমাংশে বিভাজিত থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। এতদ্দ্বারা ইহাও বিশদরূপে সপ্রমাণিত হইতেছে যে প্রোক্ত রাজ্যের সকলেই স্ব স্ব প্রধান, পূর্ব্বকালে সকলের অধিকারই সমান বিস্তৃত ছিল।

রামচাঁদের মৃত্যু সময়ে তাহার তৃতীয় পুত্র আলা সিংহ ত্রয়োবিংশতি বৎসর বয়স্ক ছিলেন। আলাসিংহ পিতৃঘাতকদিগকে সমুচিত প্রতিফল দেওয়ার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দুই বৎসর পরে পিতৃহন্তারক কমল বীর ও উগ্রসেন অল্প সংখ্যক অনুচর সমভিব্যাহারে গোমতি নামক গ্রামে আসিয়াছে শুনিয়া সুচতুর আলাসিংহ ও তদীয় ভ্রাতা শোভা কতিপয় বিশ্বস্ত অশ্বারোহী অনুচর সংগ্রহ করিয়া গোমতি গ্রামে তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর কমল ও বীরসেন অষ্টাদশ অনুচর সহ নিহত হয়।

এই ঘটনার অল্পকাল পরে সঙ্গিরা নামক স্থানের অধিবাসীদিগকে কোট ও যগরাঁর সামন্তের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য তথায় একটি থানা সংস্থাপিত করেন। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুনাকে ভাদুরের আধিপত্য প্রদান করিয়া বর্ণালানগরের জীর্ণসংস্কার করণান্তর তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। সমীপবর্ত্তী নিমাগ্রামের অধিপতি সন্দেখাঁ দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। কোটাধিপতি কালারায় তাহার আত্মীয় ও সাহায্যকারী ছিলেন। তিনি তিনশত অশ্বারোহী অনুচরের অধিনায়ক ছিলেন। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে সন্দেখাঁর মৃত্যু হয়। তাহার সমস্ত সম্পত্তি ঔরস পুত্রদ্বয়ের মধ্যে বিভাজিত হওয়ায়, পোষ্যপুত্র নিগাহিখাঁ ক্ষুণ্ণ মনে আলাসিংহের সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হয়। প্রতিহিংসাপরায়ণ নিগাহিখাঁর উত্তেজনায় যুবরাজ শার্দ্দূল সিংহ নিমাগ্রাম আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন।

এই সংবাদ শ্রবণান্তর কোটাধিপতি

কালারায় ক্রোধে অধীর হইয়া মালার কোটলার অধিপতি জমাল খাঁ ও জলন্ধর দোয়াবের সম্রাট সেনার অধিনায়ক নবাব সৈয়দ আসদালি খাঁর সহিত সম্মিলিত হইয়া বর্ণালা অবরোধ করেন। নগরের বহির্ভাগে যে ঘোরতর যুদ্ধ হয় তাহাতে আসদ আলি খাঁ নিহত হন। অবশেষে বিজয়লক্ষ্মী আলাসিংহের পক্ষাবলম্বন করেন। এই যুদ্ধের পর আলাসিংহের যশঃ সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইল। দূরদেশবাসী সামন্তবর্গ একাকী বা কতিপয় অনুচর সহ বর্ণালায় আগমন করিয়া তাহার সৈনিক সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। বস্তুতঃ বর্ণালার মহাসংগ্রামের পর হইতে ভাগ্যলক্ষ্মী আলাসিংহের প্রতি সুপ্রসন্ন হন। ইহা হইতেই এই মহাপুরুষের ভাবী মহজ্জীবনীর সূত্রপাত হয়।

১৭৩১ খৃষ্টাব্দে বর্ণালার সুপ্রসিদ্ধ সমর সংঘটিত হয়। অতঃপর আলাসিংহ তাঁহার কুলশত্রু ভট্টিগণকে পুনঃ২ আক্রমণ করিয়া তাহাদের অধিনায়ক ভাটনারের মহম্মদ আমির খাঁকে পরাজিত করেন। ক্রমাগত দশবৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াও অদীন-পরাক্রম আলাসিংহ যুদ্ধকুশল ভট্টিদিগকে স্ববশে আনয়ন করিতে সমর্থ হন নাই।

এই সময়ে আলাসিংহ রামপুরের বর্ত্তমান নবাবদিগের আদিপুরুষ রোহিলাদিগের অধিনায়ক অলিমহম্মদ খাঁর সহিত মিত্রতাপাশে সম্বদ্ধ হন। অলি মহম্মদ পৈতৃক হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন অপরিজ্ঞাত কারণে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি রোহিলখণ্ডে একটি পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করিয়া জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর বীরপুঙ্গব অলিমহম্মদকে সাহিন্দ প্রদেশের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করেন। কোটের কালারায়ের বিরুদ্ধে অভিযানে আলাসিংহ অলিমহম্মদের সহচর হইয়া গমন করেন। সেই সময়ে কালা রায় পরাজিত হইয়া পাকপত্তনে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহার ভ্রাতা মোখম খাঁ নিহত হয়। সুচতুর শিখসামন্ত দেখিলেন, যে অলি মহম্মদের সহবাসে দীর্ঘকাল ক্ষেপণ করা তাঁহার পক্ষে অনুচিত। তাঁহার স্বাধীনতা রক্ষার্থ মিত্র সহবাস পরিত্যাজ্য ইহা স্থির করিয়া মিত্রসমীপে স্বীয়াবাসে প্রত্যাগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ধূর্ত্ত শাসনকর্ত্তা স্বীয় মিত্রের প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া আলাসিংহকে কারাগৃহে বদ্ধ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। তাহাকে দীর্ঘকাল কারাগারের নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। কর্ম্মসিংহ নামা তাঁহার জনৈক বিশ্বস্ত অনুচর নিশীথে কারাগারে প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রভুর সহিত বস্ত্রবিনিময় পূর্ব্বক তাঁহার পলায়নের সুযোগ করিয়া দেন। এই কর্ম্মসিংহ রামচাঁদকর্তৃক নিহত চেনসিংহের দূর সম্পর্কিত আত্মীয়। এতদিন তিনি স্বীয় বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তি প্রদর্শনের অবসর অন্বেষণ ক-

রিতেছিলেন। চেনসিংহের আত্মীয় বলিয়া এতদিন পর্য্যন্ত পাতিয়ালায় তিনি কাহারও বিশ্বাসভাজন হইতে পারেন নাই। উপযুক্ত অবসর দেখিয়া তিনি স্বকীয় অবিচলিত প্রভুভক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রভুর সন্দেহাপনোদনে অগ্রসর হইলেন। ধন্য দেশহিতৈষিতা! ধন্য প্রভুভক্তি! যতকাল পৃথিবীতে মানবজাতি বর্ত্তমান থাকিবে, কর্ম্মসিংহ, ততদিন তোমার অত্যদ্ভুত প্রভুভক্তি-প্রদর্শন-কাহিনী জগতের ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইবে না। আলাসিংহ কর্ম্মসিংহের এই প্রভুভক্তিতে বিমোহিত হইয়া পূর্ব্ববৈর বিস্মরণ পূর্ব্বক চেনসিংহের আত্মীয়দিগকে স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইতে অনুমতি দিলেন।

এই ঘটনার অত্যল্পকাল পরেই অলিমহম্মদ সার্হিন্দের শাসনকর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া রোহিলখণ্ডে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর বট্টিগুাধিপ সর্দ্দার যৌধসিংহের পরামর্শানুসারে যে সকল গ্রাম বিদ্রোহী হইয়াছিল আলাসিংহ পঞ্চমাসকাল মধ্যে তাহাদের উপর স্বীয় প্রাধান্য পুনরায় সংস্থাপিত করিলেন।

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে আলাসিংহ ভবানীগড় দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। ফরিদ খাঁ নামক জনৈক প্রতিবেশী মুসলমান-সামন্ত স্বীয় স্বাধীনতা সঙ্কটাপন্ন ভাবিয়া উক্ত দুর্গ বিধ্বস্তকরণার্থ সার্হিন্দের শাসনকর্ত্তার সাহায্যলাভে তদভিমুখে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে সুচতুর আলাসিংহ তাহাকে পরাভূত করিয়া তাহার সমস্ত ভূসম্পত্তি আত্মসাৎ করিলেন। ইহার বর্ষত্রয় পরে গুরুবক্স সিংহ নামক জনৈক সনাওয়ার অধিকৃত হয়। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে তদন্তঃপাতী পাতিয়ালা গ্রামে আলাসিংহ একটি মৃণ্ময় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া গুরুবক্স সিংহের হস্তে নববিজিত ভূভাগের শাসনভার সমর্পণ করেন। এই সময়ে সার্হিন্দের শাসনকর্ত্তা আবুল সমদ খাঁর দেওয়ান লক্ষণ নারায়ণ নামা জনৈক কর্ম্মচারী পাতিয়ালার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সূত্রে আবুল খাঁর সহিত বিবাদ সংঘটিত হয়। সসৈন্যে আবুল সমদ সনাওয়ারে উপস্থিত হইয়া পরাজিত হন।

কাইথলের সামন্তের পূর্ব্ব পুরুষ ভাই গুরুবক্স সিংহ বট্টিগুাধিপ যোধসিংহ কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া শত্রুদমনার্থ আলাসিংহের সাহায্যপ্রার্থী হন। আলাসিংহ প্রেরিত সেনাদল অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তিনি সটলেজ নদের অপর পারস্থ শিখদিগকে স্বীয় সাহায্যে আহ্বান করেন। তাহারা বট্টিগুাধিপকে পরাজয় করিয়া তদ্দেশ উৎসন্ন করে।

অতঃপর আলাসিংহ বুহাই ও বুলোদার অধিপতি ইনায়ত ও উইলায়ত খাঁদ্বয়কে দমন করিবার জন্য সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হন। ঘোরতর যুদ্ধের পর বুলোদা অধিকৃত হইল। কিছুকাল পরে তিনি তাহা ভাই গুরুবক্স সিংহকে সমর্পণ করেন। তৎপর আলাসিংহের তৃতীয়পুত্র লালসিং মুঙ্গ নামক স্থান পাতিয়ালার অধিকারভুক্ত করেন। লালসিংহ কোনও প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রা-

প্তির অভিপ্রায় পিতৃসদনে প্রকাশ করিলে, বীরশ্রেষ্ঠ পিতা তাহা জয় করিয়া লইতে আদেশ করিলেন। মুঙ্গের ভূতপূর্ব্বসামন্ত সর্দ্দার খাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া বীরবর লালসিংহ মুঙ্গপ্রদেশ জয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সরদার খাঁ ভট্টিদিগের অধিনায়ক আবু খাঁ ও সলিম খাঁ কর্ত্তৃক স্বাধিকার বিচ্যুত হইয়াছিলেন। তাহাদিগের অনুপস্থিতি সুযোগে কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে প্রতিহিংসা-পরায়ণ সর্দ্দার খাঁ দুর্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সসৈন্যে দুর্গাবরোধ করিতে লালসিংহকে ইঙ্গিত করিলেন। এই রূপে অল্পায়াসে মুঙ্গপ্রদেশ অধিকৃত হইল।

অতঃপর সর্দ্দার লালসিংহ ও আলাসিংহ ভট্টিদিগের প্রদেশ সমূহে আপতিত হইয়া মহম্মদ হাসন ও আমিন খাঁ দ্বয়কে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন, তাহারা হিসারের শাসনকর্ত্তার শরণাপন্ন হইয়া একদল সম্রাট সেনার সহায়তা প্রাপ্ত হন। কিন্তু পোদালের যুদ্ধে ভট্টিগণ পরাজিত হইল। ইহার তিন দিবস পর নিশীথে আলাসিংহ ভট্টিশিবির আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলেন। মহম্মদ আমিন খাঁ অতিকষ্টে হিসারে পলাইয়া পরিত্রাণ পান। শত্রুদমনে সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া তিনি হিসারের শাসনকর্ত্তা নবাব নাছির খাঁর সহিত স্বীয় দুহিতার বিবাহ দেন। বহুসংখ্যক সৈন্যসহ নাছির খাঁ ভট্টিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া ধর্ত্তুল নামক স্থানে শিখসেনার সম্মুখীন হন। নাছির খাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সম্রাট-সৈন্য যুদ্ধস্থল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ করিলে আলাসিংহ ভট্টিদিগকে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত করেন। এই যুদ্ধবিজয়ে আলাসিংহের ক্ষমতা ও প্রভাব সবিশেষ বৰ্দ্ধিত হয়। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।

এই সময়ে আফগানিস্থানের দুরাণী অধিপতি আমেদসা প্রায় প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে আপতিত হইয়া পতনোন্মুখ দিল্লী সাম্রাজ্যকে বিপর্য্যস্ত করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৪৮, ১৭৫৬ ও ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি সার্হিন্দ ও দিল্লীপর্য্যন্ত অগ্রসর হন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি জিন খাঁকে সার্হিন্দের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া যান। শিখগণ অনতিবিলম্বে তাহাকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। মলার কোটলার জমাল খাঁ এবং রায়কোটের রায়ের সহায়তা না পাইলে সেই আকস্মিক বিপদ হইতে সেবার পরিত্রাণ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিলনা। এপর্য্যন্ত সুচতুর আফগানরাজ শিখবীরগণের সহিত সদ্ভাব রাখিয়াই চলিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের সহিত সখ্যতা সংস্থাপিত করণেরই প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ভারতে একাধিপত্যস্থাপনাভিলাষী শূরকেশরী শিখগণ সার্হিন্দের শাসনকর্ত্তাকে আক্রমণ করিয়া আফগানরাজের বিরাগভাজন হইলেন। অবিলম্বে শিখগর্ব্বখর্ব্বমানসে বহুসৈন্য সঙ্গে লইয়া তিনি পাতিয়ালার তদানীন্তন প্রধান নগরী বরনলায় উপস্থিত হইলেন। সংগ্রামে শিখসামন্তগণ পরাজিত

হইলেন। এই ভীষণাহবে প্রায় বিংশতি সহস্র শিখবীর নিহত হন। বরনলা হস্তগত করিয়া আফগানেরা তাহা লুণ্ঠন করিলেন। আলাসিংহ ধৃত হইয়া আমেদ সার সমীপে নীত হইলে চারিলক্ষ টাকা প্রদান পূর্ব্বক আফগানরাজের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। সুচতুর আফগানরাজ শিখদিগের সহিত মিত্রতাস্থাপনোদ্দেশে আলাসিংহকে আলিঙ্গন করিয়া রাজোপাধি প্রদান করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে আলাসিংহ রাজোপাধি প্রাপ্ত হন। অন্যান্য শিখসামন্তবর্গ এই ঘটনাতে তাঁহার প্রতি বিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ হইলেন। রাজা আলাসিংহের বিশ্বাসঘাতকতায়ই তাহাদের পরাজয় সংঘটিত হইয়াছে, এই মিথ্যাপবাদ সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইতে লাগিল। সর্দ্দার যশাসিংহের প্রযত্নে তাঁহার এই কলঙ্ক দূরীকৃত হইল। অচিরেই তাঁহার কলঙ্কাপনয়নের সুযোগ উপস্থিত হইল।

আমেদ সার কাবুল প্রত্যাবর্ত্তনের অনতিবিলম্বে শিখসামন্তচক্র মুসলমানদিগকে দূরীকৃত করণোদ্দেশ্যে ত্রয়োবিংশতি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে পথি মধ্যে কাসুর দুর্গ অধিকৃত করিয়া সার্হিন্দ অবরোধ করিলেন। মুসলমান শাসনকর্ত্তা জিন খাঁ যুদ্ধে নিহত এবং তদীয় সেনাগণ পরাভূত হইয়া পলায়ন পর হইলে শিখসামন্তগণ নগর অধিকৃত ও বিধ্বস্ত করিলেন। প্রতিহিংসা পরায়ণ শিখসামন্তবর্গ এই রূপে গুরু গোবিন্দ সিংহের পুত্রদ্বয়ের উপাংশুবধের প্রতিশোধ লইলেন। সার্হিন্দ নগরী আলাসিংহের হস্তে ন্যস্ত হইল। তিনি নগরী পুনঃনির্ম্মাণের চেষ্টা না করিয়া নগরবাসীদিগকে নবনির্ম্মিত পাতিয়ালায় বাস করিতে আদেশ করিলেন।

সুচতুর আমেদ সাহা সার্হিন্দ পুনরধিকারের চেষ্টা না করিয়া আলাসিংহের সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন। বার্ষিক সাড়ে তিন লক্ষ টাকা করনির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহার হস্তে সার্হিন্দ প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করিলেন। এই বার্ষিক করের কতকাংশ অবিলম্বে প্রদত্ত হইল। লাহোর পর্য্যন্ত আফগানরাজের অনুগমন করিয়া আলাসিংহ পাতিয়ালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্টমাসে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন।

রাজা আলাসিংহ স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলে ও সাহসিকতায় পাতিয়ালা রাজ্য সংস্থাপন করেন। তিনি অধিনায়কোচিত নানাগুণে সমলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁহার পত্নী ফত্তুর গর্ব্ভে তিনপুত্র ও এক কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠপুত্র শার্দ্দূলসিংহ অপরিমিত পানদোষে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে দুইপুত্র রাখিয়া পিতার জীবদ্দশাতেই মানবলীলা-সংবরণ করেন। জ্যেষ্ঠ হিম্মত সিংহ যোধসিংহের *

* রাজা আলাসিংহের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শোভাসিংহের বিধবা পুত্রবধূ স্বামী যোধসিংহের মৃত্যুর পর স্বীয় দেবর শার্দ্দূলসিংহকে পতিত্বে বরণ করেন। হিম্মত সিংহ সেই দ্বিতীয়-পরিণীতা পত্নীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করেন।

বিধবা পত্নীর গর্ব্ভজাত বলিয়া রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন না। কনিষ্ঠ অমরসিংহ অষ্টাদশবর্ষ বয়সে রাণী ফত্তুর প্রযত্নে নির্ব্বিবাদে শূন্য সিংহাসনে সমাসীন হইলেন। নবাভিষিক্ত রাজা অধীনস্থ শিখসামন্তবর্গ ও প্রজাবৃন্দের উপহৃত নজর প্রাপ্ত হইলেন।

হিম্মত সিংহ পৈতৃক সিংহাসন প্রাপ্তির আশয়ে হরিয়ানা হইতে সসৈন্যে যাত্রা করিয়া পাতিয়ালা নগরীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তীস্থান অধিকার করিলেন। কিন্তু ঝিন্দ, নভা ও কাইথলের শিখসামন্তত্রয়ের উদ্যোগে তাঁহাকে বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। তিনি ভবানীগড় প্রদেশে আপতিত হইয়া তাহা অধিকার করিলেন। অমরসিংহ অবিলম্বে ভবানীগড় অবরোধ করিলেন। কিন্তু রাণী ফত্তুর যত্নে ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হইল। হিম্মত সিংহের প্রভুতা ভবানীগড়ে অব্যাহত রহিল।

সর্দ্দার যশা সিংহের সাহায্যে অমরসিংহ পায়ল ও ইক্রু নামক নগরীদ্বয় ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে কোট্‌লা আফগানদিগকে বিদূরীত করিয়া স্বীয় অধিকারভুক্ত করিলেন।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে আমেদ সাহা শেষবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি লুধিয়ানা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে, রাজা অমরসিংহ তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আফগানরাজ অমরসিংহের ব্যবহারে পরমাপ্যায়িত হইয়া তাঁহাকে রাজোপাধি এবং স্বাধীন রাজোচিত নানাবিধ বহুমূল্য উপহার প্রদান করেন। এই ঘটনার উপলক্ষে রাজা অমরসিংহ লক্ষমুদ্রা নিষ্ক্রয় স্বরূপ প্রদান করিয়া মথুরা ও সাহারণ পুরবাসী দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক গৃহীত অনেকানেক বন্দীকে কারামুক্ত করেন।

আমেদ সা ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পাতিয়ালার চির শত্রু মালার কোটলার আফগানদিগের অধিনায়ক আতাউল্লা খাঁকে আক্রমণ করিয়া স্ববশে আনয়ন করেন। এই প্রবলতম শত্রুর সহিত বিরোধ করা অসম্ভব মনে ভাবিয়া আতাউল্লা খাঁ রাজা অমরসিংহের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

প্রাচীন কাল হইতে সুপ্রসিদ্ধ পিঞ্জোর দুর্গ অধিকার জন্য অমরসিংহ সহস্র সৈনিক সহ বক্সী লক্ষণ নামক জনৈক সেনাপতিকে মনিমজরার ঘরিব দাসনামা * সুপ্রসিদ্ধ

* ঘরিবদাস মনিমজরা-শিখদিগের আদিপুরুষ। সার্হিন্দের মুসলমান শাসনকর্ত্তা জিনখাঁর মৃত্যুর পর তিনি চতুরশীতি সংখ্যক গ্রামে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার পিতা গঙ্গারাম উক্ত গ্রাম সমূহের কর সংগ্রাহক ছিলেন। দিল্লীশ্বরের ক্ষমতা দিনঽ খর্ব্ব হইতে দেখিয়া, ঘরিবদাস অনায়াসেই তাহা অধিকার করিতে সমর্থ হন। অতঃপর পিঞ্জোরের দুর্গ অধিকার করিয়া স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। পিতা গঙ্গারামকে দুর্গাধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত রাখিয়া, অধিকার বিস্তারোদ্দেশে বহির্গত হন। তাঁহার অনুপস্থিতি-সুযোগে নাহন রাজ পাতিয়ালা রাজের সাহায্যে দুর্গাধিকৃত করিতে কৃতকার্য্য হন। দুর্গাধ্যক্ষ গ-

শিখ সামন্তের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। হিণ্ডূর, কালূর ও নাহন নামক জনপদ-ত্রয়ের রাজন্যবর্গ রাজা অমরসিংহের প্রেরিত সেনানীর সহিত সম্মিলিত হইলেন। সার্দ্ধৈক মাস-ব্যাপী অবরোধের পর পিঞ্জোর অধিকৃত হইল। এই অবরোধে পাতিয়ালা রাজের তিন শত সৈনিক বিনষ্ট হয়। দুর্গাধিকারের পর ইহা নাহন রাজের হস্তে অর্পিত হয়। *

পাতিয়ালার প্রায় ১০০ মাইল পশ্চিমে কোট কাপুর নামক দুর্গ অবস্থিত ছিল। তথায় বুরার জাতীয় শিখসামন্ত যোধসিংহ † রাজত্ব করিতেন। তাঁহার জনৈক অনুচর ফুলের দুর্গ হইতে একটী অশ্ব ও অশ্বতরী অপহরণ করিয়া স্বপ্রভুকে উপহার প্রদান করে। তিনি উপহৃত অশ্বের আলা ও অশ্বতরীর ফত্তু আখ্যা প্রদান করিয়া স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতা এবং দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কালক্রমে এই অপমান-সূচক যোধসিংহ কর্তৃক অনুষ্ঠিত দুর্ব্যবহার রাজা অমরসিংহের কর্ণগোচর হইল। তিনি যোধসিংহকে ঘোটক প্রেরণের জন্য পত্র লিখিলেন। গর্ব্বস্ফীত যোধসিংহ ঘটক প্রেরণ দূরে থাকুক পত্রোত্তরও প্রদান করিলেন না।—তদনন্তর মর্ম্মাহত পাতিয়ালা-রাজ সসৈন্যে যাত্রা করিয়া কাপুর হইতে পাঁচ মাইল দূরে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। শত্রু-সৈন্য পরিদর্শনার্থ দুর্গ হইতে বহির্গমন কালীন বীরবর যোধসিংহ সপুত্রক শত্রু হস্তে নিহত হন। দয়ার্দ্রচিত্ত অমরসিংহ দুর্গাবরোধ না করিয়াই পাতিয়ালায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

অতঃপর অমরসিংহ ভট্টিদিগকে পরাভূত করার মানসে সসৈন্যে যাত্রা করিয়া অহর্য্যা ও সিজ্ঝা অধিকার করেন। কিন্তু ভট্টিদেশ জয় করা কষ্টসাধ্য ভাবিয়া সর্দ্দার হাসির হস্তে এই গুরুভার অর্পণ করত অল্পকাল পরেই স্বয়ং প্রত্যাবৃত্ত হন।

অবিলম্বে বট্টিণ্ডা প্রদেশ অধিকারভুক্ত করিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। গোবিন্দগড় নামক দুর্জ্জেয় দুর্গের অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ সুখচেন সিংহের বিরুদ্ধে গজজয় ও জিত সিংহ রাজা অমরসিংহের নিকট এই অভিযোগ উপস্থিত করিল যে সুখচেন তাহাদের জনৈকা আত্মীয়ার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে। অবিলম্বে একদল সৈন্য সহ রাজা অমরসিংহ তথায় উপস্থিত হইলেন। কিয়দ্দিবসান্তর নগর অধিকৃত হইল বটে, কিন্তু সমুপযোগী যুদ্ধোপকরণের অভাবে দুর্গ অনধিকৃত রহিল। বর্ষৈককাল দুর্গাবরোধে অতিবাহিত হইলে, সুখচেন তদীয় পুত্র এবং কয়েক জন প্রধান কর্ম্মচারীকে

---

* সিমলার প্রায় ৪০ মাইল দক্ষিণে নাহন নামক রাজপুত রাজ্য অবস্থিত। ইহার বার্ষিক আয় প্রায় একলক্ষ টাকা।

† ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হামীরসিংহই ফরিদকোট রাজ পরিবারের আদিপুরুষও সংস্থাপয়িতা। হারাম নিহত হন। ঘরিব দাসের বংশধর এখন ও ৭৭টী গ্রামের অধিপতি বলিয়া প্রায় চল্লিশ সহস্র টাকা বার্ষিক পাইতেছেন।

তাহার আনুগত্যস্বীকারের প্রতিভূস্বরূপ দিতে বাধ্য হইলেন। রাজা অমরসিংহ দুর্গাবরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রতিভূগণ সমভিব্যাহারে সসৈন্যে পাতিয়ালায় প্রত্যাগত হইলেন। ক্রমে ক্রমে চারিমাস অতীত হইল, তথাপি সুখচেন স্বীয় প্রতিশ্রুতির অনুরূপ পাতিয়ালা রাজের হস্তে দুর্গসম্প্রদান করিলেন না। অনতিবিলম্বে গোবিন্দগড় ছাড়িয়া তিনি পাতিয়ালায় উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রতিভূদিগের স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন ও দুর্গ সম্প্রদান পর্য্যন্ত স্বীয় কারাবরোধ প্রার্থনা করিলে, অমরসিংহ তাহাতে সম্মত হইলেন। প্রতিভূগণ স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াও প্রতিশ্রুতি অনুসারে কার্য্য করিলেন না দেখিয়া রাজা অমরসিংহ অবিলম্বে দুর্গাক্রমণের আদেশ দিলেন ও সুখচেন সিংহকে দৃঢ়তর নিগড়াবদ্ধ করিলেন। সুখচেন দীর্ঘকাল নিদারুণ কারা যন্ত্রণা সহ্য করিতে সমর্থ হন নাই। পাতিয়ালা রাজের কর্ম্মচারীদিগের হস্তে দুর্গসম্প্রদানের জন্য পুত্র কাপুর সিংহের নিকট পত্র লিখিয়া স্বয়ং কারামুক্ত হইলেন। এই রূপে ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে বটিন্দা নামক জনপদ পাতিয়ালার অধিকারভুক্ত হইল।

বটিন্দার সন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় বিদ্রোহী জমিদারের শাসনার্থ সর্দ্দার সুখদাসসিংহের প্রতি রাজধানী রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া রাজা অমরসিংহ স্বয়ং তথায় উপস্থিত হন। তাঁহার অনুপস্থিতি সুযোগে সুকৌশলী হিম্মত সিংহ পাতিয়ালায় স্বীয় অনুচরবর্গ সহ উপনীত হইয়া আপনাকে রাজা বলিয়া বিঘোষিত করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে রাজা অমরসিংহ অনতিবিলম্বে পাতিয়ালার সমীপবর্ত্তী সামনা নামকস্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া মিত্ররাজবর্গকে কর্ত্তব্যাবধারণার্থ আহ্বান করিলেন। তথায় প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গ ও শিখসামন্তগণ একত্রিত হইয়া দুর্গাবরোধের অনুষ্ঠান করিতে পরামর্শ দিলেন। এদিকে যাঁহাদের সাহায্যে নির্ভর করিয়া হিম্মত সিংহ এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহাকে দুর্গাধিকার পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। মহানুভব অমরসিংহ জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে ক্ষমা করিয়া তাঁহার অধিকার বিস্তৃত করিয়া দিলেন। হিম্মত সিংহ রাজ্যার্দ্ধের অধিকারী ছিলেন সন্দেহ নাই। কারণ তিনি তাঁহার পিতার বৈধ বিবাহোৎপন্ন পুত্র ছিলেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি নিঃসন্তান মানবলীলা সংবরণ করেন। এই হেতু ভ্রাতৃদ্রোহানল হইতে পাতিয়ালা নিষ্কৃতি পাইল। এই সময়ে রাণী রাজকুমারী রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী সাহেব সিংহকে প্রসব করেন।

পাতিয়ালার চারি মাইল পূর্ব্বোত্তরে সেফাবাদ নামক দুর্জ্জেয় দুর্গ নবাব সেফ খাঁ কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত হয়। গুল খাঁ নামা জনৈক বিশ্বস্ত অনুচরের রক্ষণাবেক্ষণে দুইটী অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুপুত্র রাখিয়া সেফ খাঁ পরলোকান্তরিত হন। এই সুযোগে দুর্গটী অধিকৃত করার মানসে রাজা অমর-

সিংহ তাহা সসৈন্যে অবরোধ করেন। সপ্তদিবস অবরোধের পর সেফাবাদ অধিকৃত হইল। দুর্গাধিকারের পর সেফ খাঁর পুত্রদ্বয়কে উপভোগার্থ ছোটরসুলপুর গ্রাম এবং গুল খাঁকে আজীবন দৈনিক সাত টাকা বৃত্তি অসঙ্কুচিতচিত্তে প্রদান করিয়া স্বীয় মহত্ত্বের পরিচয় দিলেন।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের শীতকালে হিসার প্রদেশান্তর্গত বেগ্রাণ দুর্গ অবরোধ করিয়া রাজা অমরসিংহ ভট্টিসামন্তদিগকে পরাভূত করত উহা অধিকার করেন। তৎপর তিনি ফতাবাদ এবং সির্শা অধিকৃত করিয়া রণিয়া দুর্গ অবরোধ করেন। এই সময়ে তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল যে দিল্লীশ্বরের আদেশানুসারে হান্সীর শাসনকর্ত্তা রহিমদাদ খাঁ ঝিন্দাধিপতি রাজা গজপত সিংহের রাজধানী অবরোধ করিয়াছেন। সুখদাস সিংহকে রণিয়া অধিকৃত করার ভার দিয়া, দেওয়ান নানুনমলকে কতিপয় সৈনিক সহ ঝিন্দরাজের সাহায্যার্থ অবিলম্বে প্রেরণ করিলেন। নানুনমল ঝিন্দ এবং কাইথল পতির সমবেত সৈন্যদলের সহিত সম্মিলিত হইয়া মুসলমানদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত করিলেন। অতঃপর রাজা গজপতি সিংহের সহিত হান্সী এবং হিসার প্রদেশে আপতিত হইয়া স্বীয় প্রভুর আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা অমরসিংহও ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে হান্সীতে উপনীত হইয়া লুণ্ঠনাদিব্যাপারে স্বীয়াধিপত্য বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিমধ্যে সংবাদ পাইলেন যে সুখদাস রণিয়া অধিকার করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই রূপে সির্শা প্রদেশ পাতিয়ালার অন্তর্ভুক্ত হইল।

এই সময়ে নজফ খাঁ নামক জনৈক কার্য্যদক্ষ সাহসী বীরপুরুষ দিল্লীশ্বরের প্রধান অমাত্য ছিলেন। তিনি সসৈন্যে শিখদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া কর্ণল এবং রোটক পুনরধিকারে কৃতকার্য্য হন। রাজা অমরসিংহ জাবিতা খাঁ নামা সুপ্রসিদ্ধ রোহিলাধিনায়কের সাহায্যে নজফ খাঁর সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হন। পাতিয়ালারাজ দিল্লীশ্বরকে বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট কর প্রদানপুর্ব্বক ফতাবাদ, রণিয়া ও সির্শা অধিকারভুক্ত করিলেন। তাঁহাকে হান্সী, হিসার এবং রোটক দিল্লীর সম্রাটের হস্তে পুনরর্পণ করিতে হইল। কেহ কেহ বলেন যে নজফ খাঁ প্রভূত উৎকোচ প্রাপ্ত হইয়া এই অপমানসূচক-সন্ধিবন্ধন করিতে স্বীকৃত হন।

১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ফরিদকোট এবং কোটকাপুরা উপদ্রুত ও অধিকৃত করার জন্য পাতিয়ালারাজ দয়া সিংহকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। নবাধিকৃত প্রদেশ সমূহের সুশাসনকার্য্যে ও সুশৃঙ্খলা বিধানে ব্যাপৃত থাকার দরুণ তিনি উক্ত প্রদেশদ্বয় অধিকারের সম্যক অবসর পান নাই।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে রাজা অমরসিংহ মনিমাজরার ঘরিবদাসকে স্ববশে আনয়ন করিতে প্রয়াসী হইয়া সসৈন্যে তদধিকৃত প্রদেশে আপতিত হইলেন। ঘরিব দাস এই আকস্মিক আক্রমণে ব্যস্ত হইয়া স্বীয় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

তিনমাস পর্য্যন্ত দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়া পাতিয়ালারাজকে প্রভূত অর্থ প্রদানে সন্তুষ্ট করিয়া অব্যাহতি পাইলেন।

অতঃপর রাজা অমরসিংহ শিয়ালবাধিপতি হরিসিংহের উপর স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনার্থ শিয়ালবায় একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ইতি পূর্ব্বেই বীরপ্রবর হরিসিংহ পাতিয়ালারাজের দুরভিসন্ধি উপলব্ধি করিয়া সসজ্জ অবস্থান করিতেছিলেন, সংগ্রামে পাতিয়ালাসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল, এবং সেনাপতি নানুনমল আহত হইলেন।

এই অপমানজনক পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে বদ্ধ-পরিকর হইয়া রাজা অমরসিংহ স্বকীয় আত্মীয় ও আশ্রিত শিখসামন্তবর্গকে সসৈন্যে পাতিয়ালায় আগমন করিতে আহ্বান করিলেন। এই সমবেত সৈন্য শিয়ালবা অবরোধ করিল। পাতিয়ালা সেনানায়ক ইহা সর্ব্বত্র প্রচারিত করিয়া দিলেন যে বিপক্ষীয় যে কোন সৈনিক তাঁহার সেনাদলে মিলিত হইবে তাহাকে প্রত্যহ এক এক টাকা প্রদত্ত হইবে। দিন দিন হরিসিংহের পক্ষীয়সৈনিকেরা দলে দলে বিপক্ষদলপুষ্ট করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে হরিসিংহ নজর প্রদান পূর্ব্বক পাতিয়ালারাজের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে, পাতিয়ালা সেনা অপসারিত হইল।

১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীশ্বরের প্রধানামাত্য নবাব মজদুদ্দৌলা মালোয়া অধিকার আশয়ে সসৈন্যে দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে পাতিয়ালা হইতে ১৬ মাইল দূরে ঘরাম নামে উপস্থিত হন। সুচতুর পাতিয়ালারাজ দেওয়ান নানুনমলকে তথায় প্রেরণ করিয়া দিল্লীশ্বরের বশ্যতা স্বীকার পুরঃসর নবাবকে প্রীত করিলেন। এদিগে মুসলমানদিগের সহিত বিরোধাশঙ্কায় নানাদিগ্ হইতে শিখসেনা সমূহ পাতিয়ালায় একত্রিত হইতে লাগিল। এই সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর হইলে, তিনি শঙ্কিতচিত্তে দিল্লী প্রত্যাগমনে উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই বিপুল শিখসেনার ভয়ে তিনি আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজা অমরসিংহ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে উদরীরোগে কালগ্রাসে পতিত হন। অপরিমিত মদ্যপানই তাঁহার অকাল মৃত্যুর একমাত্র কারণ। তাঁহার মৃত্যুর মাসত্রয় পূর্ব্বে লাহোরের ৪০ মাইল উত্তরে গুজরানওয়ালা নামক স্থানে বীরকেশরী রণজিৎসিংহের জন্ম হয়। যদি রাজা অমর সিংহের অকালমৃত্যু না ঘটিত অথবা পাতিয়ালার রাজসিংহাসনে তাঁহার মত সুযোগ্য নৃপতি অধিষ্ঠিত থাকিতেন তবে পাতিয়ালারাজ চতুর্দ্দিকৃস্থিত রাজন্যবর্গের উপর সার্ব্বভৌম নরপতিরূপে বিদ্যমান থাকিয়া ভারতের অদৃষ্টাকাশে বিষম পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতেই পাতিয়ালার ক্রমিক অবনতি আরম্ভ হয়। রণজিৎসিংহের ভাগ্যলক্ষ্মী এই সময় হইতেই অভ্যুদিত হইতে আরম্ভ হয়।

বাঙ্গালার ইতিহাস।

(৩১ পৃষ্ঠার পর।)

দ্বিতীয় খণ্ডের একটি অধ্যায়।

পালরাজগণ।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রাচীন রাজন্য বর্গের ইতিহাস আমরা কিছুই অবগত নহি। রাজতরঙ্গিণীর সাহায্যে এইমাত্র জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ৬৯৫ শকাব্দে জয়ন্তদেব পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজাসনের গৌরব বর্দ্ধন করিতেছিলেন। ঐ বৎসর কাশ্মীররাজ জয়পীড় রাজ্যচ্যুত হইয়া বাঙ্গালায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। মহারাজ জয়ন্তদেব তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক তদীয়হস্তে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। জয়পীড় শ্বশুর হইতে একদল সৈন্য লইয়া কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করেন। বাঙ্গালি সৈন্যের কার্য্যকলাপ বিশদরূপে লিপিবদ্ধ করা দুরূহ। যাহাহউক ইহার তিন বৎসর পর আমরা জয়পীড়কে কাশ্মীর সিংহাসনে সমারূঢ় দেখিতে পাইতেছি। কহ্লণ পণ্ডিত জয়পীড়কে বৌদ্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় মহারাজ জয়ন্তও বৌদ্ধ ছিলেন।

ইহার কিছুকাল পরেই বাঙ্গালায় একটি বিপ্লব উপস্থিত হয়। আদিশূর নরপতির রাজ্যাভিষেক দ্বারা সেই বিপ্লবানল নির্ব্বাবিত হইয়াছিল। আদিশূরের উত্তর পুরুষগণ বঙ্গের সিংহাসনে বিরাজ করিতে লাগিলেন; এদিকে আর একটি নূতন বংশ আসিয়া পৌণ্ড্র অধিকার করিল। এক্ষণ আমরা সেই বংশের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পাল বংশীয়েরা কিরূপে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অধিকার করেন তাহার কোন প্রকৃত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরবর্ত্তী গ্রন্থকারদিগের কল্পনা-প্রসূত উপন্যাস বা 'দেশপ্রচলিত প্রবাদ' পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রস্তর লিপি ও তাম্রফলক হইতে আমরা পালবংশের ইতিহাস যাহা সঙ্কলন করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহাই পাঠকগণকে উপহার অর্পণ করিলাম।

পাল রাজন্যবর্গের নামাঙ্কিত যে সমস্ত তাম্র ও প্রস্তর লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে নালন্দার একখানি ক্ষুদ্র প্রস্তরলিপি সর্ব্বপ্রাচীন। ইহা একটি মন্দিরের দ্বারদেশে সংযোজিত ছিল। তাহাতে লিখিত আছেঃ—

'সম্বত ৭ আশ্বিন সুদি ৮ পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীগোপালরাজ নিমা (র্ম্মা) নন্তত্তয়াং (র্য্যাং)

শ্রীবাগীশ্বরী ভট্টারিকা সুবল্লবী * দেসংস্থাঃ'

এক শতাব্দী গত হইল মুঙ্গের নগরে পাল বংশের একখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে সার চার্লস উইলকিন্স সাহেব তাহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাম্রশাসনের প্রতিলিপি সহ সেই অনুবাদ 'এসিয়াটিক রিছার্চের' প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, অদ্বিতীয় ভাগ্যবান্ মহারাজ গোপালের ধর্ম্মপাল নামে এক পুত্র ছিল। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী সকল রাজাকেই জয় করিয়াছিলেন। বিজয়ী ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রাধিপতি † প্রবল নৃপতির কুমারী 'কন্যাদেবীর' পাণিগ্রহণ করেন।

কন্যাদেবীকে কোন কোন ব্যক্তি সাক্ষ্যাৎ লক্ষ্মী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এই কন্যাদেবীর গর্ভে মহারাজ ধর্ম্মপালের এক পুত্র জন্মে। এই কুমার 'দেবপাল' আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজাধিরাজ দেবপালদেব গঙ্গার উৎপত্তি স্থান হইতে সেতুবন্ধ ও লক্ষ্মীকুল হইতে পশ্চিম সাগরের তীর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ জয় করিয়াছিলেন। বিজয়কালে তাঁহার অশ্ব সকল কাম্বোজে ও হস্তী সকল বিন্ধ্য পর্ব্বতে যাইয়া আপনাদের প্রাচীন পরিবার বর্গকে দর্শন করত আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল। সেই ভারতবিজয়ী দেবপাল দেব বিজয় কার্য্য সমাধা করিয়া মুদ্গগিরিতে স্কন্ধাভার সংস্থাপন পূর্ব্বক ভট্ট বিশ্বরথের পৌত্র ভট্টবৃহর্স্মের পুত্র—ভট্ট বৃক্ষ রথ মিশ্রকে শ্রীনগর ‡ প্রদেশস্থিত ক্রমিলার অন্তঃপাতি মিসিক গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

বরদানগরে রাষ্ট্রকোটাপতি দ্বিতীয় কর্কা রাজের ৭৪৪ শকাব্দে ১২ই বৈশাখের যে একখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার ষড়বিংশতি শ্লোকে লিখিত আছে 'গৌড়েশ্বরের আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য মালবাধিপতি কর্কারাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। §

প্রফেসার লাসেন রাষ্ট্রকোটা রাজবংশের ইতিহাস লিখিতে যাইয়া বলিয়াছেন, গৌড়েশ্বর গোপালের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মালবরাজ রাষ্ট্রকোটাপতি দ্বিতীয় কর্কা রাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কর্কা রাজ ৭৩৭ শকাব্দে জীবনলীলা সংবরণ করেন। অতএব বলা যাইতে পারে পালবংশের স্থাপ-

* বল্লভী আধুনিক গুজরাট প্রদেশ।

† দক্ষিণ মহারাজ প্রদেশকে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রকোটা বলিত। সেই রাজ্যের অধিপতি প্রবলের দুহিতার নাম কন্যা দেবী। ধর্ম্ম পাল তাহার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। উইলকিন্স সাহেব শ্লোকটি ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া তাহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন,—"This prince took the hand of the daughter of Probal Raja of many countries, whose namo was Rona Debee."

‡ শ্রীনগর আধুনিক পাঠনা প্রদেশ।

§ Journal As. So. Bengal. Vol. VIII. pago 303.

ম্বিতা গোপাল ৭৩১ শকাব্দের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। শাসন পত্রের অন্তর্ভাগে লিখিত আছে যে, সাধারণের মনোরঞ্জনার্থ রাজা দেবপাল তাহার পুত্র রাজ্যপালকে যৌবরাজ্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বিহার প্রদেশস্থ ঘোসরাওঁা (প্রকাশ্য গুসরা) র বৌদ্ধ মন্দিরের দ্বারস্থিত প্রস্তর ফলকে 'শ্রীদেব পালভুবনাধিপ' লিখিত আছে। *

অল্প কয়েক বৎসর গত হইল ভাগলপুরে মহারাজ নারায়ণ পালের একখানা তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় সেই শাসন পত্রের প্রতিলিপি ও অনুবাদ স্বীয় মন্তব্যের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। † এই শাসন পত্রের সহিত মুঙ্গেরের শাসন পত্রের কিছু প্রভেদ আছে। ভাগলপুরের শাসন পত্র অবলম্বন করিয়া নিম্নলিখিত রূপ বংশাবলী প্রস্তুত করা হইয়াছে।
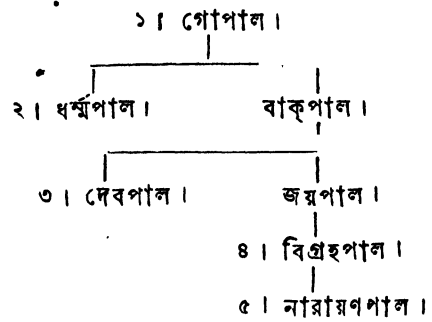
এই শাসন পত্রে দেব পালকে বাক্‌পালের পুত্র বলা হইয়াছে। মুঙ্গেরের শাসন পত্রে দেবপাল স্বয়ং, কন্যা দেবীর গর্ভজাত ধর্ম্ম পালের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এস্থলে অবশ্যই মুঙ্গেরের শাসন পত্র অপেক্ষাকৃত প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে। ভাগলপুরের শাসন পত্রে যুবরাজ রাজ্যপালের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় তিনি সিংহাসন আরোহণের পূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। এই শাসন পত্রে লিখিত আছে যে জয়পাল তাহার অগ্রজ দেব পালের আদেশানুসারে উড়িষ্যা ও কামরূপ প্রভৃতি দেশের রাজগণকে জয় করিয়াছিলেন। দেব পালের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতৃপুত্র বিগ্রহ পাল সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি হৈহয় বংশজাত লজ্জার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই লজ্জা দেবীর গর্ভে বীরচূড়ামণি নারায়ণ পাল জন্মগ্রহণ করেন।

এই অনল সদৃশ ওজস্বী ও নলের ন্যায় সচ্চরিত্র পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্নারায়ণ পালদেব কলশপোতে গ্রামে সহস্র দেব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া

---

* Journal. A. S. Bengal. Vol. XVII. page 493. এই প্রস্তর লিপির মূল ও অনুবাদ পুনর্ব্বার ব্রড্‌লি সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন। (See J. A. S. Bengal. Vol XLI. part I. page 264.) শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্র লালমিত্র বাহাদুর বিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়া ইহাকে দুই খানি স্বতন্ত্র প্রস্তর লিপি লিখিয়াছেন।

† Journal. As so Bengal. Vol. XLVII part I, pago 404.

"ভগবতঃ শিবভট্টারক" ও 'পাশুপাত আচার্য্য' কে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যথাবিধি 'পূজা বলি চরু সত্র' প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদন ও রোগী দিগের আশ্রয়, ঔষধ, ও সেবা সুশ্রূষা নির্ব্বাহ জন্য 'তীরভক্ত' (ত্রিহুত) প্রদেশস্থিত কক্ষ বিষয়ির (কক্ষ পরগণার) অধীন 'মকুতিকা' গ্রাম ভগবন্ত শিব ভট্টারক-মুদ্দিশ্য শাসনীকৃত্য প্রদত্তঃ' হইয়াছিল। এই শাসন পত্রের তারিখ ৯ই বৈশাখ ১৭ সংবৎ।

দিনাজপুরের প্রায় ৪০ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে বোদাল নামে একটি স্থান আছে। প্রথমাবস্থায় ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটি কুঠী তথায় ছিল। বোদাল পত্নীতলা পুলীষ ষ্টেশন হইতে ১০ মাইল দূরে, পূর্ব্ব-উত্তর কোণে অবস্থিত। এই বোদালের এক মাইল দূরে মঙ্গল বাড়ীর নিকট একটি স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। দেশীয় লোকে তাহাকে 'ভীমের পান্থি' কহে। এই স্তম্ভে একটি খোদিত প্রস্তর লিপি আছে। তাহার সারাংশ এইরূপঃ—

শাণ্ডিল্য গোত্রে বীরদেব নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তাহার পুত্র পাঞ্চাল। পাঞ্চালের ঔরসে গর্গ জন্মগ্রহণ করেন, গর্গ বৃহস্পাতির ন্যায় বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। 'সাধ্বী' 'প্রেমময়ী' 'বিমল হৃদয়া' ইচ্ছা তাহার পত্নী ছিলেন। ইচ্ছার গর্ভে গর্গের এক নিরুপম পুত্র জন্মে। এই বালক দর্ভপাণিআখ্যা প্রাপ্ত হন। দর্ভপাণি দেবপালের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রণাবলে মহারাজাধিরাজ দেবপাল পার্ব্বতীর পিতার পদমূল হইতে রেবার উৎপত্তি স্থান (হিমালয় হইতে মহেন্দ্র পর্ব্বত) পর্য্যন্ত, উদয় সাগর হইতে অস্ত সাগর (অর্থাৎ পূর্ব্ব পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী দেশ) পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ জয় করিয়াছিলেন। শ্রীদর্ভ পাণির ঔরসে ও শ্রীশর্করা দেবীর গর্ভে সোম সদৃশ সোমেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। শিবের পার্ব্বতীর ন্যায়, বিষ্ণুর লক্ষ্মীর ন্যায় সোমেশ্বর তরলাদেবীর পাণিগহণ করেন। সোমেশ্বর ও তরলার পুত্ররূপে ও গুণে কুমারসদৃশ ভট্ট কেদার নাথ মিশ্র। তিনি সুর পালের মন্ত্রী ছিলেন। তাহার মন্ত্রণাবলে গৌড়েশ্বর উগ্রমূর্ত্তি হূণদিগকে শান্ত করিয়া উৎকল জাতিকে আকুল করিয়া, গুর্জ্জর ও দ্রাবিড় দেশীয় রাজগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া এই বসুন্ধরা উপভোগ করিয়াছিলেন। কেদার নাথ মিশ্র দেব গ্রামের বন্ধার পাণি গ্রহণ করেন। দৈবকীর পুত্র কৃষ্ণের ন্যায়, বন্ধা ভট্টগৌরব মিশ্রকে প্রসব করিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় রামের ন্যায় ছিলেন। কিন্তু সেই জমদগ্ন বংশে জন্মিয়াও তিনি সেই রামের ন্যায় ক্ষত্রিয় বিদ্বেষ্টা ছিলেন না। ভুবনবিজয়ী নারায়ণপাল বিজয়কার্য্য সমাধা পূর্ব্বক যাহার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার মহত্ত্ব ও ক্ষমতার পরিচায়ক অন্য কি প্রমাণের আবশ্যক করে! গৌরব মিশ্র বেদজ্ঞ, ধার্ম্মিক, বিদ্যান ও ধনবান্ ছিলেন। তিনি বাঙ্গালিদিগের প্রিয় পাত্র ছিলেন।*

* এই স্তম্ভটি গৌরবমিশ্র কিংবা তাহার কোনও অনুচর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে

এই প্রস্তর লিপি হইতে বাঙ্গালা প্রাচীন সচিব বংশের নিম্নলিখিত রূপ বংশাবলী প্রস্তুত হইতে পারে।

(শাণ্ডিল্য)
বংশে—

বীরদেব।
|
পাঞ্চাল।
|
গর্গ (স্ত্রী ইচ্ছাদেবী)
|
শ্রীদর্ভপাণি (স্ত্রী শর্করাদেবী)। দেবপালের মন্ত্রী।
|
সোমেশ্বরমিশ্র (স্ত্রী তরালদেবী)।
|
কেদারনাথমিশ্র (স্ত্রী বব্বাদেবী) সুরপালের মন্ত্রী।
|
গৌরবমিশ্র। নারায়ণ পালের মন্ত্রী।

দিনাজপুরের অন্তঃপাতি আমগাছি গ্রামে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে জনৈক কৃষক একখানি তাম্রশাসন ভূগর্ভে প্রাপ্ত হয়। ঐ শাসন পত্রের খোদিত বিবরণ অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কোলব্রুক সাহেব বহুকষ্টে সেই শাসন পত্র হইতে শাসন দাতা ও তাহার পূর্ব্ব পুরুষদিগের কয়েকটি নাম পাঠ করিয়াছেন। দাতা শ্রীবিগ্রহ পালদেব (দ্বিতীয়)। কোলব্রুক সাহেবের মন্তব্য অবলম্বন করিয়া এইরূপ একটি বংশাবলী প্রস্তুত হইতে পারে।

মন্ত্রিবংশের গুণানুবাদ যুক্ত খোদিত প্রস্তর লিপি সংযুক্ত করিয়াছেন। Asiatic Researches. Vol. I & J. A. S. B. XLIII. 356.

লোকপাল। *
ধর্ম্মপাল।
|
*
|
জয়পাল।
|
দেবপাল।
|
*
|
*
নারায়ণপাল।
|
রাজ্যপাল।
|
—পাল।
|
মহীপাল।
|
ন্যায়পাল।
|
বিগ্রহপাল। †

নালন্দার বৌদ্ধমন্দিরের দ্বারস্থ প্রস্তর ফলকে এইরূপ লিখিত আছে,—

* অন্যান তাম্র ও প্রস্তর ফলকে পালবংশের স্থাপয়িতা ‘গোপাল নামে পরিচিত। কেবল একমাত্র আমগাছির তাম্র শাসনেই ‘লোকপাল’ আখ্যা দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত মিত্র মহোদয় লোকপাল, গোপালের নামান্তর অনুমান করেন। কিন্তু কোলব্রুক সাহেব যখন শাসন পত্রখানা ভাল করিয়া পাঠ করিতে পারেন নাই, এমতাবস্থায় ‘লোকপাল’ নামটী ভ্রমমূলকও হইতে পারে। A. R. Vol IX. page 442.

† কেবল বিগ্রহ পালের নামাঙ্কিত এক খানি প্রস্তরলিপিতে এইরূপ লিখিত আছে, ‘শ্রীমদ্বিগ্রহ পালদেবস্য রাজ্য স-

শ্রীমন্মহীপাল দে
ব রাজ্যে সম্বত
অগ্নি রাঘ (রাধ) দ্বার
ততেদেয় ধর্ম্মোযং প্রবর
মাহায়ান যায়িন পর
মোপাসক শ্রীমত্তৈলাঢ়
কীয়জ্জীধীপ কৌশাম্বী
বিনির্গতস্য হরদত্ত নপ্তু
র্গুরুদত্ত স্থত শ্রীবালা
দিত্য স্য যদত্র পুন্যংত
দ্ভবতু সর্ব্ব সত্ত্ব রাশেরনুত্তর
জ্ঞান বাপ্তয় ইতি॥

তৃতীয় পংক্তির ‘ অগ্নি, রাঘ, দ্বার ’ এই তিনটি শব্দের তিন প্রকার অর্থ হইতে পারে, যথা, অগ্নি—৩, রাঘ=১, দ্বার= ৯ অঙ্ক পাওয়া যাইতেছে। অঙ্কের গতি বামে, এই প্রথা অনুসারে ৯১৩ সম্বত গ-ণনা করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত মিত্র মহোদয় বলেন যে মধ্যের শব্দে ‘ রাঘ ’ নহে, উহা “ রাধ ” হইবে। যদি তাহাই ঠিক হয়, তবেও ৯১৩ সম্বত ঠিক রাখা যা-ইতে পারে; কারণ রাধ অর্থ বৈশাখ মাস। অব্দ গণনাতে রাধ অর্থাৎ বৈশাখ মাসকে ‘ ১ ’ ধরিতে হইবে, স্থতরাং ‘রাঘ’ এ ‘ রাধ ’ উভয়েতেই যখন মধ্যের অঙ্ক ‘ ১ ’ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন ৯১৩ সম্বতের কোনরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে না। কিন্তু মিত্র মহোদয় বলেন, ‘ সম্বত ’ শব্দের পর ছয়টি অঙ্ক লেখা যাইতে পারে এ-রূপ স্থান শূন্য রহিয়াছে। আমি বোধ করি প্রস্তর লিপিতে সম্বতের অঙ্ক সন্নি-বেশিত হয় নাই। আমি পূর্ব্বে যে শব্দকে ‘ রাঘ ’ পাঠ করিয়াছিলাম তাহা বাস্তবিক ‘ রাধ ’। স্থতরাং ‘ অগ্নি, রাধ ’ এই দুইটি শব্দদ্বারা বৈশাখ মাসের তৃতীয় দিবস বু-ঝাইতেছে। এস্থলে ‘ দ্বারততে ’ ইত্যাদি পদের অর্থ দান কার্য্যটি দ্বারদেশে হই-য়াছিল। যাহাহউক এই সকল কুতর্ক মূ-লক পদগুলি পরিত্যাগ করিয়া আমরা প্রস্তর লিপির স্থল মর্ম্ম এইরূপ প্রাপ্ত হইতেছি।

‘শ্রীমন্মহীপাল দেবের রাজ্য শাসনকালে ×× কৌশাম্বী নিবাসী মহায়ন সম্প্রদায়ী তেলিকুল জাত হরদত্তের পৌত্র গুরুদত্তের পুত্র শ্রীমান বালাদিত্য ধর্ম্মোদ্দেশে এই ম-ন্দির উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

এইক্ষণ আমরা বৌদ্ধ বারাণসী শরণা-থের প্রস্তর লিপির কথা উল্লেখ করিব। একটি প্রস্তর মূর্ত্তির অঙ্গে এই শ্লোকগুলি অঙ্কিত রহিয়াছে। সর্ব্বপ্রথম কর্ণেল উইল ফোর্ড ইহার প্রতিলিপি প্রকাশ করেন। * তৎপর জেনারল কনিঙ হাম সাহেব তাহার আর একটি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।† কিন্তু ইহাতে পরস্পর সম্পূর্ণ ঐক্য দৃষ্ট হই-তেছে না। যাহাহউক এই দুই প্রকার পাঠে যত দূর ঐক্য আছে তদ্দ্বারা ইহা উপলব্ধি হয় যে মহীপাল নামে এক ব্যক্তি

ম্বত ১২ মার্গদিনে ১৫ দে (য়ধর্ম্মা) য়ং স্থবর্ণ কার দেহ (বুদ্ধহে স্থতস্য)।

* A. R. Vol V. page 132.

† Arch. Survey. Report Vol III. page 121.

গৌরাধিপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র কিংবা উত্তর পুরুষ স্থিরপাল ও তদনুজ বসন্তপাল বেহার ও বারাণসী প্রদেশে রাজত্ব করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি সাধন পক্ষে যত্ন করিয়াছিলেন।

চোলারাজ কুলতুঙ্গার তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে তিনি বাঙ্গালার অধিপতি মহীপালকে জয় করিয়াছিলেন। আমাদের নিকটে এই তাম্রশাসনের লিখিতবাক্য কোনমতেই অসম্ভব বোধ হইতেছে না।

দক্ষিণাপথের দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী তাঞ্জোর ও কর্ণাট প্রদেশের কিয়দংশ প্রাচীনকালে চোল রাজ্য নামে পরিচিত ছিল। অসাধারণ পরাক্রমশালী চোলজাতির বসতিস্থান বলিয়াই সেই প্রদেশ এই আখ্যাটি প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণগণ ভগবান্ শাক্য সিংহের অনুচর বর্গকে নির্ম্মূল করিবার জন্য যে সকল নরপতির আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, চোলরাজ তাহার অন্যতম। চোলরাজগণ শৈব ছিলেন। তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া 'শঙ্করের অবতার' শঙ্করাচার্য্য ভারত বিজয় করিয়াছিলেন। চোলরাজগণ ভারতের নানাস্থলে শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ শৈবক্ষেত্রে বৈদ্যনাথের বিখ্যাত শিবমন্দির তাহাদেরই নির্ম্মিত। মন্দরগিরির সানুদেশে জনৈক চোলানরপতি যে শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন কালাপাহাড় সেই মন্দির বিচূর্ণ করেন। তাহার রাশীকৃত ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। চোলারাজ আদিত্য সেন প্রায় সমস্ত ভারত জয় করিয়া বিজিত প্রদেশের কোন কোন অংশে আপন অনুচরগণকে স্থাপন করিয়াছিলেন। আমাদের বিবেচনায় গৌড়েশ্বর বিজয় সেন চোলারাজ কুলতুঙ্গার অনুচর। চোলারাজ কুলতুঙ্গা মহীপালকে জয় করিয়া সেন বংশের স্থাপয়িতা বিজয় সেনকে গৌড়ের রাজাসনে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। যাহা হউক সেনবংশ সম্বন্ধে এক্ষণে আমরা কিছুই বলিব না। শরনাথের প্রস্তর লিপিদ্বারা ইহাই নির্ণয় হইতেছে যে, মহীপালের পর পালবংশীয় অন্য কোন নরপতি গৌড়ের রাজাসন স্পর্শ করেন নাই। সুতরাং আমরা বিবেচনা করিতে পারি যে গোপাল হইতেই যে বংশের শাসন বাঙ্গালায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল মহীপাল হইতেই সেই বংশের শাসন বিলুপ্ত হয়। আমরা তাম্র ও প্রস্তর ফলক অবলম্বনে পাল-গৌড়েশ্বরদিগের নিম্নলিখিত বংশাবলী প্রস্তুত করিয়াছি।

বংশাবলী।

১ম গোপাল।

২য় ধর্ম্মপাল।
|
৩য় দেবপাল।
|
যুবরাজ রাজ্যপাল।

বাক্‌পাল।
|
জয়পাল।
|
৪র্থ বিগ্রহপাল (১) (বাসুরপাল।)
|
৫ম নারায়ণপাল।
|
৬ষ্ঠ রাজ্যপাল।
|
৭ম —পাল।
|
৮ম বিগ্রহপাল (২)
|
৯ম মহীপাল (১)
|
১০ম ন্যায়পাল।
|
১১স বিগ্রহপাল।
|
১২শ মহীপাল (২) *

আবুল ফাজল তাঁহার বিখ্যাত আইন আকবরী গ্রন্থের ২য় খণ্ডে কায়স্থজাতির পাল নরপতিদিগের যে বংশাবলী প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তিনি কোন্ গ্রন্থ হইতে স-

* বিহার প্রদেশ যেসকল পাল নরপতির শাসন প্রচলিত ছিল এস্থলে তাহাদেরও একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

বসন্তপাল।
স্থিরপাল।
রামপাল।
গোবিন্দপাল।
ভূমিপাল।
কুমারপাল।
লক্ষ্মণপাল।
চন্দ্রপাল।
নয়নপাল।
সিন্ধুপাল।
অভয়দেব।
মল্লদেব।
কাশীরাজ।
সিংহদেব।
ভানুদেব।
সোমেশ্বর।
ভৈরবেন্দ্র (১৪৪০ খৃষ্টাব্দের পর আর আমরা পাল বংশের কোন উল্লেখ পাইতেছি না।)

ঙ্কলন করিয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ নাই। যাহা হউক, আমরা আইন আকবরি হইতে পালবংশাবলী ও তদ্বংশীয় প্রত্যেক নরপতির রাজত্বকাল এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।—

১।	ভূপাল	৯৫ বৎসর।
২।	ধীরপাল	৫৫
৩।	দেবপাল	৮৩
৪।	ভূপতিপাল	৭০
৫।	ধনপতি পাল	৪৫
৬।	বিজ্ঞানপাল	৭৫
৭।	জয়পাল	৯৮
৮।	রাজপাল	৯৮
৯।	ভোজপাল	৫
১০।	জগৎপাল	৭৪

তিব্বতদেশীয় গ্রন্থকার তারানাথ পালবংশের যে বংশাবলী প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

১। গোপাল।
২। দেবপাল।
৩। রাসপাল।
৪। ধর্ম্মপাল।
৫। মসু রক্ষিত।
৬। বেনপাল।
৭। মহীপাল।
৮। মহাপাল।
৯। সোমপাল।
১০। সৃষ্টিপাল।
১১। সথ্যপাল।
১২। বীরপাল।
১৩। ন্যায়পাল।
১৪। অমরপাল।
১৫। হস্তীপাল।
১৬। ক্ষান্তিপাল।
১৭। রামপাল।
১৮। যক্ষপাল।

আবুল ফাজেল ও তারানাথ বোধ হয় দেশপ্রচলিত প্রবাদ কিংবা অল্প প্রাচীন কোন গ্রন্থ হইতে পালরাজগণের এইরূপ তালিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু সমসাময়িক প্রমাণ তাম্র ও প্রস্তর ফলকের সহিত এই সকল তালিকা অনৈক্য থাকায় আমরা তাহাদের লিখিত বংশাবলী ঐতিহাসিকদিগের গ্রহণোপযোগী প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না। এক্ষণ আমরা পালরাজগণের জাতি, ধর্ম্ম, শাসন, প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

ক্রমশঃ।

শ্রী—সিংহ।
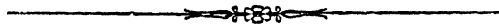
প্রাচীনভারত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আহার। পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আর্য্যগণের আহার ব্যবস্থা দুই প্রকার ছিল, যথা—প্রথম কল্প ও দ্বিতীয় কল্প। প্রথম কল্প অর্থাৎ যব, তিল, তণ্ডুল, মধু, ঘৃত, দুগ্ধ, হরিদ্রা, ও দধি; দ্বিতীয় কল্প যথা—শ্রীফল, আম্র, পনস, কদলী, দাড়িম্ব, গুড়, ইত্যাদি। কিন্তু প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের ক্রিয়াকলাপ, তাঁহাদের বল বিক্রম, তাঁহাদের অসাধারণ ধীশক্তি, অধিক কি তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, আমাদের মনে স্বতঃই উদয় হয়, যে তাঁহারা আমাদের মত সামান্যাহারে জীবন যাপন করিতেন না; তাঁহারা যে কেবল স্বচ্ছন্দবনজাত কন্দ, মূল, ফলাদি ভক্ষণ করিয়া এবংবিধ অলৌকিক অত্যাশ্চর্য্য প্রতিভা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন এমন বোধ হয় না। তাঁহাদের অন্যবিধ আহারীয় ছিল বলিয়াই বোধ হয়। এক্ষণে তাহারই অনুধাবনে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। আমাদের বিবেচনায় তাঁহারা কোন উত্তেজক ও বিশেষ ফলপ্রদ পথ্য আহার করিতেন, স্বচ্ছন্দজাত কন্দমূলফলাদি ও মাংসই সেই বলকর অন্ন। ইদানীন্তন মতে মাংসই বিশেষ বলকর পথ্য; পূর্ব্বতন আর্য্য ঋষিগণ যে মাংস ভক্ষণ করিতেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। মাংস ভক্ষণের কথা শুনিয়া হয়ত অনেকে চমৎকৃত হইবেন, অনেকে আমাদের উপর খড়্গহস্ত হইবেন, বলিবেন, যাঁহারা 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' এই সনাতন মতটি দীপ্তিশীল সুবর্ণ অক্ষরে সকল শাস্ত্রেরই শীর্ষদেশে লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই কি আবার তাহার অবমাননা করিতে পারেন? যাঁহারা

স্বচ্ছন্দং বনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ॥

এমন সুন্দর কথা বলিতেন, তাঁহারাই কি পুনরায় এই দগ্ধোদরের নিমিত্ত এরূপ গর্হিত কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে পারেন? যাঁহারা 'মাংস' শব্দের অর্থ (মাং—আমাকে সঃ—সে) 'আমাকে সে' অর্থাৎ আমি যাহার মাংস এজীবনে ভক্ষণ করিব, 'আমাকে সে' পর জীবনে ভক্ষণ করিবে এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই কি আবার সেই মাংস ব্যবস্থা সিদ্ধ জ্ঞানে আহার করিতেন? কখনই বিশ্বাস হয় না। কিন্তু ইহা বিশ্বাস না করিবার এতাধিক প্রমাণ সত্বেও আমাদিগকে তাঁহাদের মাংসাহার স্বীকার করিতে হইতেছে। কেন না মনুসংহিতা এবং নানা পুরাণ, ইতিহাসাদিতে ইহার শত শত প্রমাণ দর্শন করিতেছি।

এস্থলে আমরা প্রধানতঃ মহাত্মা মনুর মতই অবলম্বন করিলাম।

প্রথমতঃ তিনি দুগ্ধাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তন্মধ্যে নবপ্রসূতা গাভীর দশম দিন পর্য্যন্ত, উষ্ট্র কিংবা অপর কোন লিপ্তক্ষুর পশুর, মেষ, ব্যাধিগ্রস্থা বা মৃতবৎসা গাভীর, মহিষ ব্যতীত সমুদায় আরণ্য জন্তুর ও স্ত্রীদুগ্ধ এবং মিষ্ট অথচ লবণাক্ত কোন দ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন। মাংসাহার সম্বন্ধে যেগুলি নিষিদ্ধ অগ্রে তাহাই উক্ত করিয়াছেন, যথা মাংসাসী এবং গ্রাম্য পক্ষী; লিপ্তপদ পশু (বেদানুমোদিত পশু ব্যতীত) চটক,প্লব, হংস, চক্রবাক, গ্রাম্য কুক্কুট, সারস, রজ্জুবাল, দাত্যুহ, শুক, যে সকল পক্ষী চঞ্চুপুট দ্বারা ভক্ষ্য বস্তু বিদীর্ণ করিয়া ভক্ষণ করে, জালপাদ যথা শরালু, কোয়ষ্ঠী; যে সকল পক্ষী নখ দ্বারা মৃত্তিকা বিদারণ করে, যে সকল পক্ষী জলমগ্ন হইয়া আহার করে, শ্যেন, বায়স, খঞ্জন, সকল প্রকার উভচর মৎস্যাসী, গ্রাম্য বরাহ এবং সর্ব্বপ্রকার মৎস্য (পাঠীন, রোহিত ব্যতীত) ভক্ষণ নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। মৎস্যাহার মনুর মতে অতিশয় নিষিদ্ধ; তিনি বলিয়াছেন;—

যো যস্য মাংসমশ্নাতি সতন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদ স্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥

অর্থাৎ যাহারা পশুমাংস ভক্ষণ করে, তাহারা সেই পশুরই ভক্ষক; কিন্তু যিনি মৎস্যাহার করেন, তিনি কেবল মৎস্য নহে সকল পশুরই খাদক বলিয়া গণ্য; এই জন্য মৎস্য পরিবর্জ্জন করিবে। কিন্তু মহর্ষি অতিথি সৎকার সম্বন্ধে ও যজ্ঞ সমাধানান্তে পাঠীন, রোহিত, রাজীব, সিংহতুণ্ড এবং সকল জাতীয় সশল্কমৎস্য আহার্য্য বলিয়াছেন। দ্বিজাতিগণ নির্জ্জনে স্থিত বা অদৃষ্ট পূর্ব্ব কোন পশু বা পক্ষী আহার করিবেন না; সকল প্রকার পঞ্চনখী পরিত্যজ্য, তন্মধ্যে, শ্বাবিষ, শল্যকী, গোধা, গণ্ডার, কচ্ছপ ও শশ ভক্ষণ যোগ্য। উষ্ট্র ব্যতীত একপংক্তি দন্ত যুক্ত সকল পশুই সুন্দর আহারীয়; যে দ্বিজ ইচ্ছা পূর্ব্বক গ্রাম্য বরাহ, গ্রাম্য কুক্কুট,পলাণ্ডু, লশুন ও ছাতক ভক্ষণ করেন,তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় বর্ণহইতে চ্যুত হন; কিন্তু অজ্ঞাত ভক্ষণ করিলে শান্তপন বা চান্দ্রায়ণ করিয়া পাপ হইতে নিস্কৃত লাভ করিতে পারেন। অন্যান্য নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করিলে একদিন উপবাস করিলেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয়। প্রত্যেক দ্বিজাতিরই বৎসরান্তে প্রাজাপত্য যজ্ঞ করা বিধেয়;—ইহা করিলে সংবৎসরে পশু ভক্ষণ করিয়া যে পাপ সঞ্চয় হয়, তাহার ক্ষালন হয় (১)। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞার্থে এবং ভৃত্যগণের ভরণ পোষণ নিমিত্ত বেদ বিহিত পশুপক্ষী হনন করিবে; পুরাকালে অগস্ত্য মুনি এইরূপ করিয়াছিলেন;—

যজ্ঞার্থং ব্রাহ্মণৈর্ব্বধ্যাঃ প্রশস্তা মৃগপক্ষিণঃ।
ভৃত্যানাঞ্চৈব ভক্ষ্যাথমগস্ত্যোহ্যাচরেৎ পুরা॥

যাহা হউক ঋষিরা পশু হনন করিয়া দেবার্চ্চনা না করিলে, কদাপি সে মাংস ভক্ষণ

(১) মনুসংহিতা ৫। ৮—২১ শ্লোক।

করিতেন না কখন কখন এনিয়মের ব্যভিচারও হইত, মনু লিখিয়াছেন ;—

প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসং ব্রাহ্মণানাঞ্চ কাম্যয়া।
যথাবিধি নিযুক্তস্তু প্রাণানামেব চাত্যয়ে॥ ৫।১৭

অর্থাৎ প্রোক্ষণাখ্য, সংস্কারযুক্ত যজ্ঞহৃত পশুমাংস ভক্ষণ করিবে ; ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ ব্যতীত কামনানুসারে, এবং যথাবিধি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে কিংবা প্রাণ সংশয় উপস্থিত হইলে মাংস ভক্ষণ করিবে। প্রোক্ষণাখ্য, সংস্কার-যুক্ত যজ্ঞহৃত পশু মাংস ভক্ষণ যজ্ঞাংশ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ; কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন ;—

'প্রোক্ষণাখ্য সংস্কার যুক্ত যজ্ঞহৃত পশু মাংস ভক্ষণ মিদং যজ্ঞাঙ্গং বিধীয়তে।' অর্থাৎ প্রোক্ষণাখ্য, অর্থ, সংস্কারযুক্ত যজ্ঞহৃত পশুমাংস ; ইহার ভক্ষণ যজ্ঞের অঙ্গ স্বরূপ।

মনু এক স্থানে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, 'ব্রহ্মা জীবিত প্রাণিগণের ভক্ষণার্থই নানাবিধ উদ্ভিদ্ ও পশুর সৃষ্টি সাধন করিয়াছেন (২)। এবং পরস্পরে ভক্ষ্য ভক্ষক সম্বন্ধ ব্রহ্মার সৃষ্ট বলিয়া, বেদবিহিত মার্গানুসারে প্রত্যহ পশু মাংস ভক্ষণ করিলেও খাদককে কোন পাপ স্পর্শ করিবে না ; কিন্তু ইহাও বলিয়াছেন যে, মাংস প্রথম যজ্ঞে অর্পণ করিয়া পরে ভক্ষণ করিবে, না হইলে দুর্দ্দান্ত রাক্ষস মত যখন তখন ভক্ষণ করিবে না (৩)। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণও মাংসভক্ষণ শাস্ত্র সম্মত বলিয়া গিয়াছেন ; তিনি বলেন ;—

অষ্টমীং সমুপোষ্যৈব নবম্যামপরেঽহনি।
মৎস্য মাংসোপহারেন দদ্যান্নৈবেদ্যমুত্তমং।
তেনৈব বিধিনান্নস্তু স্বয়ংভুঞ্জীত নান্যথা॥

অর্থাৎ, অষ্টমী উপবাস করিয়া নবমী প্রভৃতি অন্য দিনে বিধি পূর্ব্বক দেবগণকে অর্চ্চনা করিয়া মৎস্য মাংস উপহারে উত্তম নৈবেদ্য প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং ভক্ষণ করিবে, অন্যথা নহে। যম পুরাণের একাধিক স্থলেও আমরা মাংস ভক্ষণের উল্লেখ দেখিতে পাই, যথা ;—

প্রাণাত্যয়ে তথা শ্রাদ্ধে প্রোক্ষিতং দ্বিজকাম্যয়া।
দেবান্ পিতৄন্ সমভ্যর্চ্চ খাদন্ মাংসংন দোষভাক্॥

অর্থাৎ প্রাণ সংশয় উপস্থিত হইলে ; কিংবা শ্রাদ্ধে, দেব ও পিতৃগণকে অর্চ্চনা করিয়া প্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণ করিলে কোন দোষ নাই। এই সকল দৃষ্টে তখনকার মাংসভক্ষণ প্রচলন স্পষ্টতঃই জানা যাইতেছে। মাংস প্রাপ্তি সম্বন্ধে মনু এই প্রকার বলিয়াছেন ;

ক্রীত্বা স্বয়ং বা চ্যুৎপাদ্য পরোপকৃত খর্ব্বা।
দেবান্ পিতৄন্ শ্চার্চ্চয়িত্বা খাদন্মাংসংন দুষ্যতি॥ ৩২

অর্থাৎ মাংস ক্রয় করিয়া বা স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া অথবা অন্যের নিকট প্রাপ্ত হইয়া দেবতা ও পিতৃ লোককে অর্চ্চনা পূর্ব্বক শেষ ভক্ষণ করিলে কোন দোষ স্পর্শ ক-

(২) মনু ৫। ২৮

(৩) মনু ৫। ৩০—৩১

রিবে না। কিন্তু দেব বা পিতৃ লোকের অর্চ্চনা না করিয়া মাংস ভক্ষণ করিলে পাপস্পর্শ হয়; তিনি বলিয়াছেন;—

নাদ্যাদবিধিনা মাংসং বিধিজ্ঞো নাপদি দ্বিজঃ।
জগ্ধ্বাহ্যবিধিনা মাংসং প্রেত্যতৈরদ্যতে বশঃ॥
না তাদৃশং ভবত্যেনো মৃগ হন্তুর্ধনার্থিনঃ।
যাদৃশং ভবতি প্রেত্য বৃথামাংসানি খাদতঃ॥
কুর্য্যাদ্ঘৃতপশুং সাঙ্গং কুর্য্যাৎ পিষ্ট পশুং তথা॥
নত্বেব তু বৃথা হন্তুং পশুমিচ্ছেৎ কদাচন॥
যাবন্তি পশু রোমাণি তাবৎ কৃত্বোহিমারণং।
বৃথা পশুঘ্নঃ প্রাপ্নোতি প্রেত্যং জন্মনি জন্মনি॥ ৩৮

অর্থাৎ দ্বিজ এই নিয়ম সম্যক অবগত থাকিয়া অবিধি পূর্ব্বক মাংস ভক্ষণ বিপদে পড়িয়াও করিবেন না; যদি করেন পরলোকে ঐ সকল পশু তাহাকে ভক্ষণ করিবে; তখন তাহার পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় থাকিবে না; যিনি বৃথা মাংস ভক্ষণ করেন তাঁহার পাপ যত, তত লাভ লালসায় মৃগবধকারীর নহে। পশুবধ করিয়া যজ্ঞ করিবে—বৃথা পশু হনন করিবে না; যিনি বৃথা হনন করেন তাঁহাকে পশুর গাত্রে যত সংখ্যক রোম আছে ততবার প্রেত জন্ম গ্রহণ করিয়া কষ্টভোগ করিতে হয়।

যজ্ঞ, দেব বা পিতৃকার্য্য অথবা অতিথিসৎকার প্রভৃতি ভিন্ন কেবল স্বীয় উদর পরিপোষণ নিমিত্ত মাংস ভক্ষণকে আর্য্যগণ মহাপাপ জ্ঞান করিতেন। অন্যথা ঐ সকল কার্য্যে পশুবধ অহিংসা মধ্যে পরিগণিত করিয়া গিয়াছেন। যথা;—

যা বেদবিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিন্ চরাচরে।
অহিংসা মেবতাং বিদ্যাদ্বেদাদ্ধর্ম্মোহি নির্বভৌ॥ ৪৪

অর্থাৎ বেদবিহিত হিংসা অহিংসা মধ্যে পরিগণিত; কেন না বেদই ধর্ম্মের এক মাত্র প্রধান স্থল, এবং এই জন্যই তিনি অন্য এক স্থলে বলিয়াছেন যে, যিনি যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াও যজ্ঞহৃত পশুমাংস ভক্ষণ না করেন পরলোকে তাঁহার অধোগতি হয় ও একবিংশতি জন্ম তাঁহাকে পশু হইয়া জীবনাতিবাহিত করিতে হয় (৪)। এই সকল দৃষ্টে তখন যে মাংসাহার বিশেষ প্রচলিত ছিল তাহা জানা যাইতেছে; এক্ষণে ইহার বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ আছে তাহারই অবতারণা করা যাইতেছে। এ বিষয়েও মনু আমাদের পথপ্রদর্শক; তিনি বলিয়াছেন;—

ন কৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গস্তস্মান্মাংসং বিবর্জ্জয়েৎ॥
সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌ চ দেহিনাং।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্তেত সর্ব্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ॥
ন ভক্ষয়তি যোমাংসং বিধিংহিত্বা পিশাচবৎ।

(৪) মনু ৫। ৩৫।

স লোকপ্রিয়তাং যাতি ব্যাধিভিশ্চ ন পীড্যতে ॥
স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছতি।
অনভ্যর্চ্চ্য পিতৄন্‌দেবান্‌ ততোঽন্যো নাস্ত্য পুণ্যকৃৎ ॥
বর্ষে বর্ষেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
মাংসানি চ ন খাদেদ্যস্তয়োঃপুণ্যফলং সমং
ফলমূলাশনৈর্মেধ্যৈর্মুন্যন্নাঞ্চ ভোজনৈঃ।
ন তৎফলমবাপ্নোতিযন্মাংসপরিবর্জ্জনাৎ॥(৫)

অর্থাৎ প্রাণিহিংসা না করিলে কখন মাংস উৎপন্ন হয় না, কিন্তু প্রাণিবধ নরকের কারণ, অতএব মাংস পরিত্যাগ করিবে; শুক্র ও শোণিতে মাংস উৎপন্ন এবং বধ ও বন্ধন নির্দ্দয় হৃদয়ের কার্য্য ইহা বিবেচনা করিয়া সকল প্রকার মাংসাহার হইতে সাধুগণ নিবৃত্ত হয়। যে ব্যক্তি বিধিলঙ্ঘন করিয়া পিশাচবৎ মাংস ভক্ষণ না করে সে সকলের প্রিয় হয় এবং ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করে না। যে ব্যক্তি পরমাংস দ্বারা দেব ও পিতৃলোক অর্চ্চনা না করিয়া কেবল আপনার মাংস বৃদ্ধি কামনা করে তাহার ন্যায় পাপাত্মা এ জগতে আর নাই; যে লোক শতবর্ষ ব্যাপিয়া বৎসর বৎসর অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, আর যে ব্যক্তি কোন প্রকার মাংসভক্ষণ না করে, এতদুভয়ের পুণ্য ফল সমান; লোকে মাংস ভক্ষণ না করিয়া যত ফলভাগী হয়, মুনিগণ ফলমূল ভোজন ও বাণপ্রস্থাশ্রমে নীবারান্ন ভোজনে তত ফল লাভে সমর্থ হয় না"। শুদ্ধ তাহাই নহে তিনি আরও বলিয়াছেন যে "পশু হত্যায় আজ্ঞাদাতা, কর্ত্তনকারী, বিনাশকারী, মাংসবিক্রেতা, পাচক, পরিবেশনকর্ত্তা ও ভোক্তা সকলেই সমান ফলভাগী ও ঘাতক বলিয়া অভিহিত।" তিনি আরও বলেন যে, "যে ব্যক্তি অহিংস্রক হরিণাদি পশু আত্মসুখসাধনোদ্দেশে হত্যা করে, সে জীবিতাবস্থায় কি পরকালে কোথাও শান্তি প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু যে হিতৈষী প্রাণিদিগকে বধ কি বন্ধন দ্বারা ক্লেশ না দেন, তিনি চিরকাল অনন্ত সুখভোগ করেন।" এই সকল দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে, মাংসাহার মনুর অভিপ্রেত ছিল না, তবে সমাজে তাহা বিশেষ প্রচলন ছিল বলিয়াই তাঁহাকে তাহার ব্যবস্থা দিতে হইয়াছে। এক্ষণে অন্যান্য ঋষির মত প্রদর্শিত হইতেছে; শ্রীমদ্ভাগবতভাষ্যকার বলেন;—

'যে ত্বিহ বৈ পুরুষাঃ পুরুষমেধেন যজন্তে, যাশ্চস্ত্রিয়ো নৃপশূন্‌ খাদন্তি, তাংশ্চ তাশ্চতে পশবো ইহ নিহতা যমসদনে যাতয়ন্তো রক্ষোগণাঃ। শৌনিকাইব স্বধিতিনা বদায়াসৃক্‌ পিবন্তীতি।' অর্থাৎ যে পুরুষ এই জগতে পুরুষ মেধ যজ্ঞ ও যে স্ত্রী নরপশু মাংস ভক্ষণ করিবে, সেই সকল নিহত পশু যমসদনের রক্ষী হয় এবং শৌনিকের ন্যায় তথায় তাহাদের রক্ত পান করিবে। নন্দিপুরাণ বলেন;—

রোগার্ত্তোঽভ্যর্থিতো বাপি যো মাংসং নাত্ত্য লোলুপঃ।
ফলমাপ্নোত্যযত্নেন সোঽশ্বমেধ শতস্যচ ॥

অর্থাৎ রোগার্ত্ত অথবা নিমন্ত্রিত হইয়াও

(৫) মনু ৫। ৪৭—৫৪।

যে ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ না করে সে বিনা আয়াসে শত অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। ভবিষ্যপুরাণ বলেন ;—

যশ্চোপদেশং কুরুতে পরস্য তু মহাত্মনঃ।
মাংসস্য বর্জ্জনফলং সোঽমাংসাদফলং লভেৎ॥

অর্থাৎ যে মহাত্মা মাংস পরিত্যাগের উপদেশ সকলকে প্রদান করেন, তিনি অমাংসাশীর ফললাভ করেন। মহাভারত বলিয়াছেন ;—

পশোস্তমার্য্যমানস্য ন মাংসং গ্রাহয়েৎ কচিৎ।
পৃষ্ঠমাংসং গর্ভশয্যাং শুষ্কমাংসমথাপি বা॥

অর্থাৎ কোন প্রকারেই পশুবধ করিয়া তাহার মাংসাদি গ্রহণ করিবে না। যোগিনী হৃদয়তন্ত্রে মহাদেব বলিয়াছেন ;—

সর্ব্বহিংসাবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বপ্রাণি হিতে রতঃ।
কামক্রোধলোভমোহরাগদ্বেষবিবর্জ্জিতঃ॥

ইত্যাদি এই সকল বীরভাবের লক্ষণ। এবং বীরভাবই সকলের শ্রেষ্ঠ। আবার তিনি মহানির্ব্বাণতন্ত্রে বলিয়াছেন ;—

মদং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রামৈথুনমেবচ।
মকার পঞ্চমং কৃত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৭।৮

অর্থাৎ মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পাঁচটি ব্যবহার করিলে লোকের আর পুনর্জন্ম হয় না অর্থাৎ স্বর্গ অধিকার হয়। মহাদেবের যোগিনী তন্ত্রের উক্তির সহিত মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের উক্তির পার্থক্য নিবন্ধন সন্দিহান হইয়া পার্ব্বতী তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করেন ; মহাদেব তদুত্তরে বলিয়াছেন আমি ঠিক্ কথাই বলিয়াছি, তুমি উহার অর্থগ্রহ করিতে পার নাই বলিয়াই আমাকে এরূপ বলিতেছ ; উহাদের অর্থ এই ;—

যদুক্তং পরমং ব্রহ্মং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনং।
তস্মিনপ্রমদন্ জ্ঞানং তন্মদ্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ১০

অর্থাৎ যোগবল দ্বারা নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন পরম ব্রহ্মেতে যে প্রমদন জ্ঞান তাহাই মদ্য বলিয়া পরিগণিত ; অর্থাৎ সুরাপায়ী ব্যক্তি যেরূপ স্বীয় শরীর রক্ষণার্থ অনবধান হইয়াও আনন্দ লাভ করে, সেইরূপ বিষয় বাসনা দূরে নিক্ষেপ করিয়া নির্ম্মল ব্রহ্মে যে আনন্দপ্রদজ্ঞান লাভ হয় তাহাই মদ্য।

এবং মাং সনোতি হি যৎ কর্ম্ম তন্মাংসং পরিকীর্ত্তিতম্।
নচ কায় প্রতীকস্তুযোগিভির্ম্মাংস মুচ্যতে॥ ১১

অর্থাৎ প্রাণিহিংসা করিয়া যে মাংস পাওয়া যায় তাহা মাংস নহে ; পরম ব্রহ্ম আমাকে ইহ জগতে যে কর্ম্ম সম্পাদন করিতে দিয়াছেন, সেই কর্ম্ম সমর্পণের নাম মাংস।

মৎস্যমানং সর্ব্বভূতে সুখ দুঃখাদি মৎপ্রিয়ে।
ইতি যৎ সাত্বিকজ্ঞানং তন্মৎস্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ১২

অর্থাৎ আমার ন্যায় সুখ ও দুঃখের সময় সর্ব্বভূতেই যে সমান জ্ঞান—সেই সাত্বিক জ্ঞানের নাম মৎস্য।

মাংস ব্যবহার নিষেধক এমন সহস্র সহস্র প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে,

কিন্তু তাহা হইলেও ইহা যে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত সমাজে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল তাহা নিশ্চয়। বুদ্ধদেবই পশুর প্রতি এই অত্যাচার সন্দর্শন করিয়া অতিশয় দুঃখের সহিত তাহার প্রতিবিধান করিতে অগ্রসর হন। তিনিই প্রথমে পশু হিংসার বহুনিন্দা করিয়া ভারতীয়গণকে 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' এই সনাতন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন; এই সময় হইতেই নিন্দিত পশুহিংসা আর্য্য সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল এবং সকলেই বুদ্ধদেবের জ্ঞানময় বিশুদ্ধ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পশুরক্ত-কলঙ্কিত বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সনাতন বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল; মহামুনি শাক্যসিংহ এই রূপে সকলেরই বরেণ্য হইয়া পরিশেষে অবতার বলিয়া গণ্য হইয়াছেন; যথা আমরা কল্কী পুরাণে দেখিতে পাই;—

পুনরিহ বিধিকৃত বেদধর্ম্মানুষ্ঠান বিহিত
নানাদর্শন সংঘৃণঃ।
সংসার কর্ম্মত্যাগ বিধিনা ব্রহ্মাভ্যাস বিলাস চাতুরীম।
প্রকৃতি বিমান নাম সম্পাদয়ন্ বুদ্ধাবতার
ত্বমসি॥

অর্থাৎ পুনর্ব্বার আপনিই বিধাতৃ-বিহিত বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে নানাপ্রকার ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক, সংসারের মিথ্যা মায়া প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিবার উপায় উপদেশ দিবার নিমিত্ত বুদ্ধাবতার হইয়া প্রাকৃতিক বিষয়ের অবমাননা করেন নাই।

গোমাংস। সকল প্রকার পশু মাংসের কথাই এক প্রকার বলা হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত পবিত্র গোসম্বন্ধে কোন কিছুই বলা হয় নাই। আর্য্য ঋষিগণ গোমাংস ভক্ষণ করিতেন কিনা এক্ষণে তাহারই অনুধাবণ করা যাইতেছে। তাঁহারা যে অশ্বমাংস ভক্ষণ করিতেন তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; ইতিহাসাদিতে অশ্বমেধের বহুল উল্লেখ আছে; আবার অশ্বমেধের ন্যায় পুরাকালে গোমেধ যজ্ঞেরও অস্তিত্ব দর্শন করা যায়। গোমেধ ও গোঘ্ন এই দুইটি শব্দই গোমাংস ভক্ষণের প্রমাণ; গোঘ্ন শব্দের ব্যুৎপত্তি ('গো+হন+টচ্); ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করিলে গোঘ্ন শব্দে গোহনন করা যায় যাহার নিমিত্ত এইরূপ অর্থ বুঝায়—ইহার আভিধানিক অর্থ অভ্যাগত ব্যক্তি। তাহা হইলেই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে পূর্ব্বকালে কাহারও গৃহে কোন অতিথি আগমন করিলে তাঁহার জন্য গো হনন করা হইত। মহর্ষি মনুপ্রণীত ব্যবস্থানেও গোমাংস ভক্ষণের বিধি দেখিতে পাওয়া যায়; তিনি একস্থলে বলিয়াছেন 'ব্রাহ্মণ মন্ত্রপূত না করিয়া কদাচ গোমাংস ভক্ষণ করিবেন না—বেদ বিহিত মত পূত করিয়া তাহা আহার করিতে পারেন' (৫+৩৬)। অন্যস্থলে বলিয়াছেন 'যজ্ঞার্থে হত গো, পশু, পক্ষী, বৃক্ষাদি পর জীবনে উচ্চস্থান লাভ করে।' তাঁহার মতে নিম্নলিখিত কয় সময়েই কেবল গোহত্যা প্রশস্ত; যথা—অভ্যাগত উপস্থিত হইলে, যজ্ঞে, এবং পিতৃ কিংবা দেবার্চ্চনা কালে; অন্যথা নহে; যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বেদবি-

চিত এই কথিত কয়টি সময়েই গোহত্যা করেন তিনি নিজে এবং ঐ গো নিশ্চয়ই মোক্ষ প্রাপ্ত হয় (৫।৪০—৪২)। গো-সম্বন্ধে এবংবিধ নিয়ম পরিলক্ষিত হইলেও তাহা যে বিশেষ প্রচরক্রপ ছিল এমন বোধ হয় না; তবে সময়ে সময়ে তাঁহারা উহার মাংসাহার করিতেন ইহাই বোধ হয়; পূর্ব্বকালে যখন গোমাংস ভক্ষণ প্রচলিত ছিল তখন সমাজ সম্পূর্ণ নূতন; তখন সকলেই গৃহপালিত পশু মাংসেই উদর পূরণ করিতেন; কৃষি কর্ম্মাদি সেই অল্পে অল্পে সমাজে লব্ধ প্রবেশ হইয়াছে; সুতরাং তখন প্রায় কোন প্রকার মাংসই পরিত্যক্ত হয় নাই।

ঋষিগণের এই সকল ব্যবস্থা দৃষ্টেই মহাকবি ভবভূতি তদীয় উত্তর রাম চরিতে গোমাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে এই প্রকার লিখিয়াছেন;—

'স মাংস মধুপর্ক ইত্যাম্নায়ং বহুমন্যমানাঃ শ্রোত্রিয়ায়া ভ্যাগতায় বৎসতরীং,মহোক্ষং মহাজম্বা
নির্বপন্তি গৃহমেধিনঃ তংহি ধর্ম্মসূত্রকারা সমামনন্তি।'

অর্থাৎ 'সমাংস মধুপর্ক দিবে' এই বেদবিধিতে বহু সম্মান করিয়া গৃহীরা অভ্যাগত ব্রাহ্মণের নিমিত্ত বৎসতরী, মহোক্ষ (ষাঁড়) কিংবা মহাছাগ বধ করিবে; ধর্ম্মসূত্রকারগণও এই বিধির সমাদর করেন। বৈদ্যক শাস্ত্রেও গোমাংসের দোষ গুণ কীর্ত্তন আছে; যথা ভস্মমিশ্র;—

গোমাংসন্তু গুরুস্নিগ্ধং পিত্তশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনম্।
বৃংহণং বাতহৃদবল্যমপথ্যং পীনস প্রণুৎ॥

যাহাহউক এই সকল দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে ইহা প্রথম সমাজে প্রচলিত ছিল; পরে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে; মনু যদিও গোমাংস বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু তৎপরবর্ত্তী যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ তাহা নিবারণ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতেই বেশ জানা যাইতেছে যে আদিম সমাজে ইহা প্রচলিত থাকিলেও পরসমাজে তাহার লোপ হইয়াছিল।

গোমেধ যজ্ঞের ন্যায় নরমেধ যজ্ঞও পূর্ব্বকালে সমাধা হইত; ইহাতে মনুষ্যকে বলি প্রদান করা হইত। নরমেধ ব্যতীত আরও পুরুষমেধ প্রভৃতি এমন কতকগুলি যজ্ঞ ছিল, যাহাতে সময়ে সময়ে মনুষ্য উৎসর্গীকৃত হইত। এই ঘৃণিত নিষ্ঠুর প্রথারও সেই বৈদিক সময়েই আদি; কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে অশ্বমেধ ও শুক্ল যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় পুরুষমেধ উপলক্ষে নরবলি দিবার কথা উল্লিখিত আছে; কিন্তু শুক্ল যজুর্ব্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণে এ প্রথা স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। ইহাতে জানাযায়, বেদ সকল এক সময়ের রচনা নহে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লোক দ্বারা রচিত হইয়াছে; এবং এই জন্যই সমগ্র বেদ, বৈদিক সমাজের সুন্দর আমূল বিবরণ প্রদান করিতে সমর্থ। বেদে এই নরবলি সম্বন্ধে দুই প্রকার মত দেখা যায়; সুতরাং তদ্দ্বারা আমরা ইহাই নির্ণয় করিতে পারি

যে, ইহা প্রাথমিক বৈদিক সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, পরে ঐ সমাজের মধ্যভাগে তাহা অতি নিষ্ঠুর ও ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। মধ্য সময়েও ইহার প্রচলন ছিল না; পরে দেশ মধ্যে শক্তির পূজা আরম্ভ হইলে পুনরায় এই ঘৃণিত প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। কালিকা পুরাণের রুধিরাধ্যায়ে আমরা নরবলির একটি বিস্তৃত বিবরণ দর্শন করি; অনেক তন্ত্রও ইহার অনুকূলে মত প্রদান করিয়াছে। মহাকবি ভবভূতি-প্রণীত 'মালতী মাধব' নামক নাটকেও ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে; উক্ত নাটকের অঘোর ঘণ্ট ও তাহার সহচরী কপালকুণ্ডলা মালতিকে চামুণ্ডার নিকট বলি প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল; যদি মালতি তাহার বন্ধুগণ কর্তৃক রক্ষিতা না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে উৎসর্গ করা হইত।

এই সময়ে নরবলি দুই প্রকারে সমাধা হইত; প্রথম মনুষ্য স্বেচ্ছাক্রমে দেব সমীপে আপনাকে উৎসর্গ করিত ও দ্বিতীয়তঃ বল পূর্ব্বক তাহাকে বলি প্রদান করা হইত। তখন কুসংস্কার মনুষ্য মধ্যে সাতিশয় প্রবল ছিল। তাহারা মনে করিত এই রূপে আত্মনাশ করিলে দেবতারা অতিশয় প্রসন্ন হন, এবং স্বর্গে তাহার স্থান অপরিবর্ত্তিত ও নিশ্চয়। এই কুসংস্কার বশতঃই নরবলি সদৃশ আরও অনেক প্রকার ভয়ানক আত্মোৎসর্গ সংসাধিত হইত; যথা ভৃগুপতন অর্থাৎ পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ, মহাপ্রস্থান অর্থাৎ সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়া প্রাণ ত্যাগ, তুষানল, অর্থাৎ মন্দাগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ, এইরূপ নানাবিধ প্রাণত্যাগ পরিদৃষ্ট হয়; ইহা যে ভীষণ কুসংস্কারের ফল তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই অজ্ঞান তিমিরের দাস হইয়া সে কালে কত শত জীব অকালে পৃথিবীতল হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা কি? নরবলি বা নরমেধে যে মাংস উৎপন্ন হইত তাহা যে দেবগণকে প্রসন্ন করিবার জন্য হোমাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু পর সময়ে মদমত্ত শক্তি উপাসকগণ তাহা রাক্ষসবৎ ভক্ষণ করিত; সেই নৃমাংস ভোজন নিবারণ করিবার জন্য মহানির্ব্বাণতন্ত্র লিখিয়াছেন :—

নরমাংসং ন ভুঞ্জীয়াৎ নরাকৃতিপশুংস্তথা।
বহূপকারকান্ গাশ্চ মাংসাদান্ রসবর্জ্জিতান্॥ ৮। ১০৮

নর ও গোমাংস ভক্ষণ নিষেধক আমরা বহুল প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে পারি; কিন্তু তৎসমুদায় না দিয়া আমরা দুই একটি নিম্নে প্রদান করিলাম; তাহাতেই কি কি কার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছিল বেশ জানা যাইবে। পরাশর লিখিয়াছেন,—

অগম্যাগমনেচৈব মদ্যগোমাংসভক্ষণে।
শুদ্ধ্যৈ চান্দ্রায়ণংকুর্য্যান্নদীংগত্বা সমুদ্রগাং॥
চান্দ্রায়ণেততশ্চীর্ণেকুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণভোজনং।
অনুভূৎসহিতাংগাঞ্চদদ্যাদ্বিপ্রায়দক্ষিণাং॥

ইহাতে মদ্যপানও সমান পাপ বলিয়া

অভিহিত হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত বিবেক গ্রন্থে নর ও গোমাংস ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত কীর্ত্তিত হইয়াছে ; যথা ;—

'বিড়্বরাহ গ্রাম্য কুক্কুট নর গোমাংসভক্ষণে সর্ব্বেষ্বেব দ্বিজাতীনাং প্রায়শ্চিত্তান্তে ভূয়ঃ সংস্কারং কুর্য্যাৎ।'

আবার নিম্নলিখিত সমুদায় কার্য্যগুলি কলিযুগে অতিশয় নিষিদ্ধ ; যথা কল্পসূত্র পুরাণে ;—

অশ্বালম্ভং গবালম্ভং সন্ন্যাসংপল পৈতৃকং
দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তির্কলৌপঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ

রঘুনন্দন প্রণীত 'উদ্বাহতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত রচনা কয়েকটি দেখিতে পাওয়া যায় ; এগুলি তাঁহার স্বপ্রণীত নহে ; তিনি পরাশর, হেমাদ্রি, আদিত্য ও বৃহন্নারদীয় প্রভৃতি সংহিতা ও পুরাণ হইতে সেগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্যথা ;——

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তি র্দত্তকন্যা প্রদীয়তে
কন্যানাম সবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ
বানপ্রস্থাশ্রমস্যাপি প্রবেশোবিধিশ্চোদিতঃ॥

বৃত্তস্বাধ্যায় সাপেক্ষ মথসঙ্কোচনং তথা।
প্রায়শ্চিত্ত বিধানঞ্চবিপ্রাণাংমরণান্তিকং॥
সংসর্গদোষপাপেষু মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
দত্তৌরসে তরেষাঞ্চ পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ॥
শূদ্রেষু দাস গোপাল কুল মিত্রার্দ্ধসীরিণাং।
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ॥
ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্কতাদি ক্রিয়াপিচ।
ভৃগ্বগ্নি পতনঞ্চৈব বৃদ্ধাদি মরণন্তথা॥

এতানি লোক তৃপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ।
সময় শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবত্তবেৎ॥

ইত্যাদিত্য পুরাণে। অন্যত্র যথাহ-বৃহন্নারদীয়ং ;—

সমুদ্র যাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলু বিধারণং।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযম স্তথা॥
দেবরেণ সুতোৎপত্তি র্মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ।
মাংসাদানং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা
দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং বরস্যচ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ॥
মহাপ্রস্থান গমনং গোমেধঞ্চ তথা মখং।
ইমান্ ধর্ম্মান্‌কলিযুগে বর্জ্জানাহুর্মনীষিণঃ

ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা কেবল মাত্র নরাশ্বগোমেধ নয়, আরও অনেক অনিষ্টকর বিষয় নিবারণ করা হইয়াছে। আদিপুরাণে এইরূপ দৃষ্ট হয় ;—

ঊঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।
কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুং

অন্য স্থানে

দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তির্দত্তা কন্যা নদীয়তে।
ন যজ্ঞ গোবধঃ কার্য্যঃ কলৌ ন চ কমণ্ডলুঃ

এই সকল দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে পুরাণাদির সময়েই মাংস ভক্ষণ অনিষ্টকর বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইয়াছে, ইহার অনেক দিন পরে চৈতন্যদেব প্রাদুর্ভূত হইয়া মাংসাহার একবারেই নিষেধ করিয়া যান ; তিনিও বুদ্ধদেবের মতানুযায়ী 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' এই মহান্ উপদেশ প্রদান করেন।

আধুনিক নব্য সম্প্রদায় মধ্যে পুনরায় ইহার বিশেষ প্রচলন হইয়াছে। আমরা মাংসাহারকে অন্যায় বলিতেছি না, তবে না করিলেও যে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই তাহাই এক্ষণে নির্দ্দেশ করিতেছি। অনেকে বলেন দুর্ব্বল বঙ্গবাসীর বলাধান করা সর্ব্ব প্রকারে কর্ত্তব্য এবং মাংসই অতি পুষ্টিকর পথ্য; মাংস ভক্ষণে শরীর বিশেষ বল সম্পন্ন হয়। আমরা একথা অস্বীকার করি না; দুর্ব্বলেন্দ্রিয় বঙ্গবাসীর বলাধান করা যে সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু মাংসাহার করিলেই যে শরীর সবল হয় এবং স্বচ্ছন্দ-জাত ফল-মুল-শাকাদি ভক্ষণে শরীর দুর্ব্বল হয় এমন কথা বলিতে পারি না। প্রত্যুত শাকাদি ভক্ষণেও শরীর অতিমাত্র সবল হয় তবে আর মাংসাহারের প্রয়োজন কি? আমাদের কথায় যদি পাঠকের বিশ্বাস না হয় তাই ইয়ুরোপ ও আমেরিকার কতকগুলি প্রসিদ্ধ ডাক্তারের মত এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে মাংসাহার অপেক্ষা শাকাদি বলাধানের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

এই সম্বন্ধে ডাক্তার নিকল্স T. L. Nicholls তাঁহার "শারীরতত্ত্ব" "Human Physiology" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "Man is naturally a frue-eating animal and he finds his most natural and healthtul food in vegetable kingdom. Though the use of fish and flesh may be justifiable as a necessity, it is not the original or the best food of man, and the most perfect health and therefore the highest use and enjoyment of life may be attained on a purely vegetable diet." এই গ্রন্থের অন্যস্থলে তিনি বলিয়াছেন,—Flesh is a stimulating form of food, often impure and unhealthy in itself, causing fever of the blood, and exciting passionate feeling." আমাদের ব্যবস্থাপকগণ ইহার এই সকল গুণ সম্যক অবগত ছিলেন, এবং তজ্জন্যই বিধবাগণের মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ একেবারেই নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। আর একজন বিখ্যাত আমেরিকান ডাক্তার তদীয় "মানবরহস্য" Mysteries of man নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন "Fruit and Farinacea are the natural and therefore the most healthy food for man. They are best fitted to sustain him in vigour of body and mind. They preserve him in health and enable him to recover from desease. They contain all the elements he requires in the best proportion, and in the best condition. A vegetarian diet is pre-eminently the diet of beauty, energy, activity, and enjoyment. It is the best at all ages, in all conditions and in all employments; It is the best for the labourer as for the

philosopher, the artist, the professional man, or the man of the world. On a vegetable diet, as I have seen in numerous cases, the skin grows clear, the cheeks rosy, the eyes bright, all senses acute, the intellect vigorous, the feeling deep and pure, the digestion good, all functions regular, the passions under control, the temper calm, the intuitive perceptions quickened and the whole being exalted into a new, more vigorous and more beautiful life."

Small-pox owes its virulence to filthy habits and eating flesh. Vegetarians of pure lives and healthy constitutions are in no danger from it and some will not take it by inocculation.

A bad diet with flesh and stimulents is the cause of consumption.

A flesh diet is exciting, feverish, inflamatory as well as impure and often highly poisonous."

তিনি আরও বলিয়াছেন ;—

"The finest forms, the best teeth, the strongest muscles, the most active limbs, in the world, are fed on a purely vegetable diet ; which with regard to intellectual and moral improvement, it is curious and interesting fact that there can scarcely be mentioned a great philosopher of ancient or modern times who has not given his testimony, either in his opinions or his practice of a vegetarian diet."

প্রসিদ্ধ ডাক্তার গামজি (Gamjie) তাঁহার খাদ্য বিষয়ক বক্তৃতায় বলিয়াছেন "That it is difficult to detect diseased meat and that such meat engender virulent maladies in the human frame."

আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ মাংসের এই অপকারিতা বহুকাল পূর্ব্বে অবগত হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই শাস্ত্রমধ্যে ইহা বিশেষ রূপে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা যে আমাদের মধ্যে নানারূপ সংক্রামক পীড়া আনয়ন করে তাহা প্রসিদ্ধ চিকিৎসক গণ স্বীকার করিয়াছেন এবং আমরাও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সচরাচর দেখিতে পাই ; তাই তাঁহারা ইদানীং যাহাতে মাংস ভক্ষণ একবারে নিবারণ হয় তাহার বিহিত চেষ্টা করিয়াছেন। কামেন্দ্রিয় উত্তেজনা করা ইহার এক প্রধান গুণ ; মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ এই অপকারিতা বহুকাল পূর্ব্বে পরিজ্ঞাত ছিলেন, তাই বিধবা গণের খাদ্য নির্দ্দেশ স্থলে ভগবান্ মনু বলিয়াছেন 'পবিত্র পুষ্প ও ফল মূলাদি ভক্ষণ দ্বারা তাহারা শরীর কৃশ করিবে, কেননা মৎস্যাদি ভক্ষণে কামেন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় তাহাদিগকে ধর্ম্ম-পথ ভ্রষ্ট করিতে পারে।' এই

জন্য কেবল মনু নহেন প্রায় সকল ব্যবস্থাপকই ইহার বিরুদ্ধে মত প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা যে কেবল মাংস, মৎস্য ভক্ষণই নিষেধ করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, মদ্যপান ও অতীব নিষিদ্ধ; তাঁহারা বলিয়াছেন মদ্যপান করিলে চান্দ্রায়ন ব্রত করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে; কুলার্ণব তন্ত্রে মহাদেব বলিয়াছেন :—

সুরা দর্শন মাত্রেণ কুর্য্যাৎ সূর্য্যাবলোকনঃ।
তাং সমাঘ্রাণ মাত্রেণ প্রাণায়ামত্রয়ং চরেৎ
ন স্পৃশেৎ মাদকং দ্রব্যং নাদ্রিবঞ্চাপি ভক্ষয়েৎ॥

অর্থাৎ সুরাদর্শন মাত্রে সূর্য্য দেখিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে; আঘ্রাণ করিলে তিনবার প্রাণায়াম করিবে; মাদক দ্রব্য স্পর্শও করিবেনা। সুরার বিরুদ্ধে আমরা এইরূপ শত শত ব্যবস্থা দেখিতে পাই; এবং এই সকল ব্যবস্থা ও মহাজন বাক্য জন্যই এক সময় ইহা দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। কিন্তু ইদানীং ইংরেজী সভ্যতার গুণে ইহা পুনরায় কৃতবিদ্য বঙ্গীয় যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলক্ষণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে; কত শত লোক এই মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুর কুহকে পড়িয়া আত্মীয় স্বজনকে দুঃখের দুস্তর সাগরে নিক্ষেপ করিয়া অকালে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়; সুরারাক্ষসী মনঃকষ্ট দেয় নাই বঙ্গদেশে এমন কোন গৃহস্থ আছে কি? ইহার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করেন নাই এমন কোন লোক আছেন কি? কিন্তু হায়! ইহার এই গরলময় ফল প্রত্যক্ষীভূত হইলেও বঙ্গবাসী তাহাতে নিমজ্জিত! সুরা সমুদ্রে পতিতহইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিলেও তাহা হইতে তীরে উঠিবার ইচ্ছা নাই; যাহাদের অনুকরণে ইহা এত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারাও ইহার এই বিষময় ফল নিরীক্ষণ করিয়া স্বদেশ হইতে ইহা উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত সচেষ্টিত, তথাপি বঙ্গীয় সমাজে ইহার এত আদর; সমাজ তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না, বুঝিয়াও বুঝিতেছে না। হায়! কত দিনে ইহা দেশ হইতে চলিয়া গিয়া পীড়িত লোকগণকে রক্ষা করিবে; কতদিনে দানব সমাজ মানবসমাজে পরিণত হইবে। সে দিন এক্ষণেও বহুদূরে।

এক্ষণে দেখাযাউক পুরাকালে কোন প্রকার মাদক দ্রব্যের ব্যবহার ছিল কি না?

সোমরস।

মাদক দ্রব্যের কথা বলিলেই অগ্রে সোমরসের কথাই আমাদের মানসক্ষেত্রে সমুদিত হয়। এক্ষণে সেই সোমরসেরই বৃত্তান্ত বিবৃত করা যাইতেছে। প্রথমে দেখাযাউক ইহা কি প্রকারে উৎপন্ন হইত; সোমরস, সোমলতা নামক লতার মূল হইতে নির্গত রস বিশেষ, এই লতার পঞ্চদশটি মাত্র পত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, পত্রগুলি অমাবস্যার পর প্রতিপদ হইতে এক একটি করিয়া জন্মিতে আরম্ভ হইয়া

পূর্ণিমার দিন পূর্ণ পঞ্চদশ পত্র বিশিষ্ট হয়, আবার পূর্ণিমার পর প্রতিপদ হইতে এক একটি করিয়া স্খলিত হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যার দিন পত্রশূন্য হয়; তখন কেবল মাত্র ডাঁটা অবশিষ্ট থাকে। সোম অর্থাৎ চন্দ্রের সহিত এই লতার এবংবিধ সাদৃশ্য জন্যই ইহার নাম সোমলতা। সোমলতা সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্ব্বিংশতি প্রকার; যথা;—অংশুমান, ভুঞ্জমান, চন্দ্রমা, রজত প্রভা, দুর্ব্বাসীম, কনীয়ান, শ্বেতাক্ষ, কনকপ্রভা, প্রতানবান, তালবৃন্ত, করবীর, অংশবান, স্বয়ংপ্রভ, মহাসোম, গরুড়াহৃত, গায়ত্র্যাস্ত্রৈষ্টভ, পাঙক্ত, জগতে, শাঙ্কর, অগ্নিষ্টোম, রৈবত, ত্রিপদীযুক্তা, গায়ত্রী এবং উড়ুপতি। সোম এই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার দৃষ্ট হইলেও এতৎ সমুদায়েরই গুণ সমান, তবে আকৃতি ঘটিত অনেক বিভিন্নতা আছে। যথা, অংশুমান সোম ঘৃত-গন্ধ-বিশিষ্ট, রজতপ্রভা সোম কন্দবিশিষ্ট, সেই কন্দের গঠন কদলী ফলের ন্যায়, ভুঞ্জমান সোম রশুনের ন্যায় পত্র বিশিষ্ট, চন্দ্রমা সোম সুবর্ণাভ এবং জলে জন্মে, গরুড়াহৃত ও শ্বেতাক্ষ সোম দেখিতে সর্প-নির্ম্মোক তুল্য, উভয়েই বৃক্ষাগ্রভাগে লম্বিত হইয়া থাকে ও অন্যান্য সকল প্রকার সোমই বিচিত্র বর্ণের মণ্ডলের দ্বারা চিত্রিত। ঋষিগণ সোমলতা পাইবার এই রূপ স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—হিমালয়, সহ্য, মহেন্দ্র, মলয়, শ্রীপর্ব্বত, দেবগিরি, দেবসহ, পরিপাত্র, বিন্ধ্য, এবং বিতস্তা নদীর উত্তরস্থিত পর্ব্বত প্রভৃতি পর্ব্বতে, দেবসুন্দ, কাশ্মীর দেশস্থিত মানস সরোবর প্রভৃতি হ্রদে এবং সিন্ধুনদে সোমলতা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সোমলতা কি প্রকার আমরা কখন দেখি নাই, এখন কেন বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ভারতে সোমের অভাব হইয়াছে। অনেক পুরাণেও সোমাভাব পরিদৃষ্ট হয়, এবং সেই জন্যই সোমের পরিবর্ত্তে তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ অন্য লতার ব্যবহার করা হইয়াছে। আর্য্য ঋষিগণ সৌসাদৃশ্য দর্শনেই প্রতিনিধিত্ব সাব্যস্ত করিতেন; তাঁহারা সোমাভাবে পুত্তিকার ব্যবস্থা করিয়াছেন, যথা শ্রুতিগ্রন্থে 'সোমাভাবে পুত্তিকামভিষুনুয়াৎ' অর্থাৎ সোমভাব হইলে পুত্তিকা দিবে; অন্যান্য গ্রন্থেও এই ব্যবস্থাটি পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এই বচনদ্বারা পুত্তিকা পত্র বা লতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, কি পুত্তিকার রস, ব্যবস্থাপিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন; আমাদের বিবেচনায় সোমলতার সহিত পুত্তিকালতার (Guilandina Bonduc) কিছুমাত্র সৌসাদৃশ্য নাই; কারণ সোমলতার ন্যায় ইহা পঞ্চদশ পত্র বিশিষ্ট নহে, এবং ইহার এমন গুণও নাই যে চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন এক একটি করিয়া পত্র বর্দ্ধিত হইয়া পৌর্ণমাসীর দিন সম্পূর্ণ পত্র বিশিষ্ট হয়, এবং পরে এক একটি করিয়া পতিত হইয়া অমাবস্যার দিন শূন্যপত্র হয়। কিংবা আমরা উপরে যে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার সোমের উল্লেখ করিয়াছি তাহার কাহারও সহিত পুত্তিকা-

পত্রের কোন সৌসাদৃশ্য নাই; তবে এ-প্রকার প্রতিনিধিত্বের অর্থ কি? আমাদের মতে, সোমরসের সহিত পুত্তিকা র-রসের সৌসাদৃশ্য আছে; সোমরসের বর্ণ সম্বন্ধে বেদে এই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা দুগ্ধের ন্যায় গাঢ় ও জলের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, যথা;—'সত্তে পয়াংসি সমুচন্তু রাজা' এবং "রাজ্ঞোন্নুতে বরুণস্য ব্রতানি বৃহস্পাতেবং তব সোমধাম।" এই সকল বচনে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সোমরস গাঢ় ও বরুণ বা জলের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট; এক্ষণে পুত্তিকা রসের আকৃতি কি প্রকার দেখা যাউক; ইহাও দেখিতে জলের ন্যায় এবং ইহা দুগ্ধের ন্যায় গাঢ়; তাহা হইলেই বেশ প্রতীয়মান হয় যে আর্য্য ঋষিগণ গুণের তারতম্য না করিয়া এই দুই রসের আকৃতি গত সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য বশতঃ সোমাভাবে ইহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সোমরসের গুণ—মাদক, হর্ষ জনক, পুষ্টিকারক, রোগনাশক, সুমিষ্ট ইত্যাদি; ইহার এতাধিক গুণ থাকা জন্যই ঋষিগণ ইহাকে অমৃতের সহিত সমান বলিয়া গণ্য করিয়াছেন; তাঁহারা বলিতেন অতি পূর্ব্বকালে জরা-মরণ-হরণ-কারণ দেবতারা যেমন অমৃত সৃজন করিয়া দেবগণের হিত সাধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহারা মর্ত্তালোকের হিতসাধনজন্য সোমরস সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সোমরস পূর্ব্বকালে সকলেই আনন্দে পান করিতেন, এবং কি যজ্ঞ, কি তপস্যা, কি শ্রাদ্ধ সকল স্থলেই ইহা প্রদান করিতেন; তৎকালে ইহার এত প্রচলন হইয়াছিল যে কি বেদ, কি উপবেদ, কি উপনিষদ, কি স্মৃতি, কি পুরাণ, কি ইতিহাস সকল গ্রন্থেই ইহার পুনঃ পুনঃ উক্তি ও সাধুবাদ পরিলক্ষিত হয়; ফলতঃ পূর্ব্বে যেমন মাংসের অতি প্রচলন ছিল, সেইরূপ মাংসের সহচর এই সোমরস নামক মদ্যও বিশেষ প্রচলিত ছিল; দেবগণকেও সোমপানার্থ আবাহন করা হইত; সামবেদ সংহিতায় অগ্নির অর্চ্চনা স্থলে অগ্নিকে সোমপান করিবার জন্য ঋষিগণ প্রার্থনা করিতেছেন;—

এহ্যু যু ব্রবাণি তেহগ্ন ইত্থেতরা গিরঃ। এভি বর্দ্ধসি ইন্দুভিঃ॥ অর্থাৎ হে অগ্নি! তোমার জন্য স্তুতিগুলি আমরা এই রূপে ভাল করিয়াই বলিব, এমত আশা করিতেছি। অতএব তুমি আগমন করিয়া সেই সকল স্তুতি ও তদ্ভিন্ন উ—এই প্রকার ইতর স্তুতি গুলিও শ্রবণ কর; এবং আমাদের প্রদত্ত এই সোম দ্বারা বর্দ্ধিত হও। অন্যস্থলে,

প্রতিত্যঞ্চারুমধ্বরং গোপীথায় প্রহুয়সে। মরুদ্ভি রগ্ন আগহি॥

হে অগ্নি! তোমাকে সোমপান করাইবার জন্য সুন্দর যজ্ঞ আরম্ভ করা হইয়াছে। তুমি এরূপ যজ্ঞের জন্যই আহূত হইয়াছ; অতএব এই সুন্দর যজ্ঞে বায়ু প্রভৃতি দেবগণের সহিত আগমন কর। এইরূপ পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র সর্ব্বত্রই। প্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থেও ইহার বিশেষ প্রশংসাবাদ আছে; যথা আমরা সুশ্রুতে দেখিতে পাই;—

যুগে যুগেঽপি কর্ত্তব্যে যোগিনো যোগ-
সাধনে।
পিবেৎ সোমরসং ভদ্রে আয়ুর্ম্মেধা-বল
প্রদং॥
শিব সংহিতা।

অর্থাৎ 'যোগিগণের যোগ সাধনের নিমিত্ত এবং সকলেই যুগে যুগে আয়ু, মেধা, ও বলপ্রদ সোমরস পান করিবে।' তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, সন্ন্যাসিগণ ও সোমরস পানে বিমুখ ছিলেন না। যাহা হউক সোমরস যে পূর্ব্বতনকালে সকলেরই সেবনীয় ছিল, তাহা এক প্রকার প্রদর্শন করা হইল; এবং সোমরস মদ্যের স্থানীয়; সুতরাং তৎকালে সকলেই মদ্যপান করিতেন তাহাই প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে তদানীন্তন কালে অপর কোন প্রকার মাদক দ্রব্যের ব্যবহার ছিল কি না তাহাই দেখা যাইতেছে; ইহা দেখিতে গেলে আমরা আরও কয়েক প্রকার মদ্যের দর্শন লাভ করি; যথা, তাল নির্য্যাস (তাড়ী), গৌড়ী, পৈষ্টী ইত্যাদি; তাল নির্য্যাসের বিশেষ মাদকতা শক্তি আছে; সৈন্যগণ মধ্যে ইহার বিশেষ প্রচলন ছিল; সৈন্যগণ যুদ্ধের সময় ইহা পান করিত; ইতর লোকের মধ্যে গৌড়ী, পৈষ্টী ইত্যাদি মদ্যের বিশেষ প্রচলন ছিল; গুড় হইতে উৎপন্ন মদ্য গৌড়ী, ও তণ্ডুল হইতে উৎপন্ন মদ্য পৈষ্টী নামে আখ্যাত হইত। এক্ষণেও এই দুই দ্রব্য হইতে মদ্য প্রস্তুত হয়। উচ্চতন সমাজে এই সকল মদ্যের প্রচলন ছিল না, নিম্নতন সমাজে ইহাদের আদর ছিল; তখন উভয় সমাজই ভয়ানক মদ্যপ ছিলেন। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণীয়গণ সোমরস পান এবং নিম্নবর্ণীয় ইতর লোকগণ গৌড়ী ইত্যাদি মদ্য পান করিতেন; এক্ষণেও ইতর লোকগণ যেমন হস্তে কিঞ্চিৎ অর্থ পাইলেই শৌণ্ডিকালয় গমন করিয়া থাকে; পূর্ব্বকালেও সেই রীতি ছিল; আমরা অভিজ্ঞান শকুন্তলে দেখিতে পাই, ধীবর দুষ্মন্ত-প্রদত্ত শকুন্তলার অঙ্গুরীয়ক রাজাকে প্রত্যর্পণ করিয়া যে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়, তাহা লইয়া তদ্দণ্ডে শৌণ্ডিকালয়ে সুরাপানার্থ গমন করিয়াছিল। ফলতঃ সোমরস ব্যতীত অন্য কোন প্রকার মদ্যই কখন প্রশংসিত হয় নাই। পরে ইহার বিরুদ্ধে নানা প্রকার শাসন দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, ইহা এককালে সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল এবং তজ্জন্যই অধুনাতন বঙ্গীয় সমাজে ইহা পরিবর্দ্ধিত তেজে স্থান অধিকার করিয়া দেশ উৎসন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার তেজ যদি এইরূপই প্রবল থাকে, জানি না তাহা হইলে দেশ উৎসন্ন যাইতে আর কয়দিন অবশিষ্ট? অধুনাতন বঙ্গীয় সমাজে এমন গৃহ নাই, যাহা এই সাক্ষাৎ হলাহলের বিষময় ফলে ক্লিষ্ট না হইয়াছে! কত শত লোক এই জীবন্ত কালের নিকট প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া অকালে লোকলীলা সংবরণ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা কি? কত গৃহস্থ ইহার জন্য অবিরত দগ্ধ হইতেছে তাহার সংখ্যা কে করে? কত শত লোক ইহার এই সর্ব্ব সংহারক ফলের জন্য জী-

বিত দগ্ধ হইতেছে তাহার নির্ণয় কি? আমার মত কত শত হতভাগ্য, ইহার জন্য দিবানিশি নয়নাসারে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছে তাহার নির্ণয় কে করে? অহো! ইহার কি প্রতিবিধান নাই? দেশের রাজা যাহার অনুকূল তাহা নষ্ট করিবার জন্য কি কোন প্রতিবিধান নাই? হায়! যে রাজা এমন সর্ব্ব সংহারক—সর্ব্ব হলাহল উজ্জীবিত রাখিতে চাহে তাঁহাকে ধিক্!! যদি প্রতিবিধান কিছু না থাকে সে দেশ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস করাই শ্রেয়স্কর।

ক্রীড়া।

প্রাচীন আর্য্যসমাজে আমোদ জনক ক্রীড়ার বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল রাজন্যগণ সময়ে সময়ে অক্ষ ক্রীড়ায় কিছু সময় অতিবাহিত করিতেন; নল রাজা বা যুধিষ্ঠিরের অক্ষ ক্রীড়া সমধিক প্রসিদ্ধ, চতুরঙ্গ ক্রীড়ারও প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যঋষিগণ ক্রীড়ায় আনন্দানুভব করিবার অবসর পাইতেন না; ধর্ম্মকার্য্যেই তাঁহাদের প্রায় তাবৎ সময়ই নিয়োজিত হইত; তবে ক্ষত্রিয়গণ আপনাপন কার্য্য সমাধানান্তে মধ্যে মধ্যে ইহাতে আনন্দ উপভোগ করিতেন; কিন্তু তাহাও অতি অল্প সময়ের জন্য; তবে ব্যায়াম ক্রীড়ায় যে তাঁহারা অনেকসময় ক্ষেপণ করিতেন তাহা নিশ্চয়। শরীর রক্ষণার্থ সকল ক্ষত্রিয়ই দিবসে একবার করিয়া ব্যায়াম করিতেন; না করিলে শরীর কর্ম্মাক্ষম ও অপটু হইয়া যাইত। এই ব্যায়াম সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের অনেক সুন্দর ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়; তাঁহারা বলিতেন, রীতিমত ব্যায়াম চর্চ্চা করিলে শরীরে লঘুতা, কার্য্যদক্ষতা, স্থৈর্য্য ও ক্লেশ সহিষ্ণুতা জন্মে এবং অন্যান্য দোষ ক্ষয় ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়, ভারতীয় আর্য্যগণ ব্যায়াম সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

ব্যায়ামোহি সদা পথ্যো বলিনাং স্নিগ্ধভোজিনাং।
সচ শীতে বসন্তেচ তেষাং পথ্যতমঃস্মৃতঃ।
সর্ব্বেষ্বৃতুষু সর্ব্বেহি সর্ব্বৈরাত্মহিতার্থিভিঃ
শক্ত্যর্দ্ধেন তু কর্ত্তব্যো ব্যায়ামোহন্যতোহন্যথা॥
কুক্ষৌ ললাটে গ্রীবায়াং যদা ঘর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে।
শক্ত্যর্দ্ধং তং বিজানীয়াদায়তোচ্ছ্বাস মেবচ॥
লাঘবং কর্ম্ম সামর্থ্যং স্থৈর্য্যং ক্লেশ-সহিষ্ণুতা।
দোষক্ষয়োঽগ্নিবৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে॥
ব্যায়ামং কুর্ব্বতো নিত্যং বিরুদ্ধমপি ভোজনং।
বিদগ্ধমবিদগ্ধং বা নির্দ্দোষং পরিপচ্যতে॥
ন চ ব্যায়াম-সদৃশমন্যৎ স্থৌল্যাপকর্ষণং।
ন চ ব্যায়ামিনং মর্ত্ত্যং মর্দ্দয়ন্ত্যরয়ো বলাৎ॥
নচৈনং সহসাক্রম্য জরা সমাধিগচ্ছতি।

ব্যাধয়ো নোপসর্পন্তি বৈনতেয়মিবোরগাঃ॥*
অর্থাৎ বলশালী ও স্নিগ্ধদ্রব্য ভোজনকারীগণের ব্যায়াম ক্রীড়া সর্ব্বদা হিতকর; বিশেষতঃ শীত ও বসন্তকালে ইহা অধিকতর ফলোপধায়ক হয়; আত্মহিতান্বেষণকারী লোকগণের পক্ষে সকল ঋতুতেই শক্তির অর্দ্ধ পরিমাণে ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য; ইহার অন্যথা করিলে এই ব্যায়াম তাহার শরীর নষ্ট করে, ব্যায়ামকালে যখন কুক্ষি, ললাট, ও গ্রীবা দেশ হইতে ঘর্ম্ম বিনির্গত হইতে থাকে, এবং নিশ্বাস দীর্ঘ হয়, তখনই শক্তির অর্দ্ধ ব্যায়াম হইল বুঝিতে হইবে; ইহা হইতে এই কয়টি ফল লাভ হয়, যথা শরীরের লঘুতা, কার্য্যদক্ষতা ধৈর্য্য, ও ক্লেশ সহিষ্ণুতা; অন্যান্য অজীর্ণাদি দোষ ক্ষয় হইয়া ইহা অগ্নিবৃদ্ধি করে। যে ব্যক্তি নিত্য ব্যায়াম করে তাহার বিরুদ্ধ, বিদগ্ধ কিংবা অবিদগ্ধ ভোজনও নির্দ্দোষবৎ পরিপাক হয়, শরীরের স্থূলতা বিদূরিত করিবার নিমিত্ত ইহার মত অন্য উপায় আর নাই; ব্যায়ামাশক্ত ব্যক্তিকে শত্রুরা বল পূর্ব্বক ক্লেশ দিতে কখনই সমর্থ হয় না এবং বিনতানন্দন গরুড়ের নিকট সর্প সকল যাইতে যেমন ভীত হয়, সেইরূপ ব্যাধি সকল ইহার নিকট যাইতে ভয় করে।

যাহা এতাদৃশ ফল প্রদান করে তাহা যে তদানীন্তন কালে সকলেই সম্পন্ন করিতেন, তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ভগবান্ মনুও রাজধর্ম্ম বিষয়ক প্রস্তাবে রাজগণের দিবসে অন্ততঃ একবার ব্যায়াম কর্ত্তব্য এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মৃগয়া ও ব্যায়ামের একটি অঙ্গ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত; আমরা দেখিতে পাই পূর্ব্বতন প্রায় সকল রাজাই অরণ্যে মৃগয়ায় অনেক সময় ক্ষেপণ করিতেন। রামচন্দ্র, দুষ্মন্ত, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকল রাজাই রাজধানী হইতে মৃগয়ার্থ বন প্রবেশ করিয়াছেন। যাহা হউক তৎকালে ব্যায়ামের সমধিক চর্চ্চা ছিল; কিন্তু ইদানীন্তনকালে এমন সুন্দর ফলপ্রদ ক্রীড়া একেবারেই পরিত্যক্ত প্রায় হইয়াছিল। তবে আজকাল যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে অনুমান করা যায় যে শীঘ্র ইহা পুনরায় পূর্ব্বস্থান অধিকার করিবে। বিশেষ আধুনিক বঙ্গীয় সমাজের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ইহার বিশেষ প্রচলন না হইলে হয়ত শতাব্দী পরে বাঙ্গালীর নাম পর্য্যন্তও জগতীতল হইতে বিলুপ্ত হইবে। এক্ষণে আর্য্যগণের শিক্ষাসম্বন্ধে কিপ্রকার বন্দোবস্ত ছিল তাহাই প্রদর্শন করা যাইতেছে।

বিদ্যাশিক্ষা।

শিক্ষা বলিলেই অগ্রে বিদ্যাশিক্ষার কথাই আমাদের মানসক্ষেত্রে সমুদিত হয়, কিন্তু পুরাকালে শস্ত্রশিক্ষাকেও বিদ্যাশিক্ষার ন্যায় গণ্য করা হইত, এই জন্য শিক্ষাসম্বন্ধে বলিতে গেলে এই দুই প্রকার শিক্ষাসম্বন্ধেই বলিতে হইবে।

---

* ব্যায়ামশিক্ষা ১ ম ভাগ শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত দেখ।

এক্ষণে বিদ্যাশিক্ষারই আলোচনা করা যাইতেছে। বিদ্যাশিক্ষা প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ মধ্যেই সন্নিবিষ্ট ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া যে অন্যান্য জাতিগণ বিদ্যাশিক্ষা করিতে পাইতেন না তাহা নহে; কারণ দেখা যায় ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও রাজর্ষি জনক সমুদায় শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত ছিলেন; অধিকন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক ব্রাহ্মণ কুমারও বেদ শিক্ষা করিতে যাইতেন। শস্ত্রবিদ্যাও এইরূপ কেবলমাত্র ক্ষত্রিয় মধ্যেই সন্নিবিষ্ট ছিল না; ব্রাহ্মণ বা অপরজাতিগণও শস্ত্রশিক্ষা করিতেন। রামায়ণ ও মহাভারতে আমরা শস্ত্রজ্ঞানী বহুল ব্রাহ্মণ দর্শন করি, পরশুরাম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, প্রভৃতি ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণ কুমার ও বিলক্ষণ শস্ত্রজ্ঞানী; ইহাদের অন্যতমের নিকট হইতে ক্ষত্রিয়গণ শাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আপনাদিগকে ধন্যজ্ঞান করিয়াছেন। কুরুপাণ্ডবীয়গণ দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া আপনারা মনে মনে অতিশয় শ্লাঘা করিতেন। একজাতি অন্য জাতির বৃত্তি শিক্ষা যদি সমাজে নিন্দনীয় কি অযশস্কর হইত, তাহা হইলে কদাচ এরূপ ঘটিত না। ইহাতেই জানা যাইতেছে, জাতি মাত্রেরই যে নিজ নিজ বৃত্তির অনুসরণ করিতে হইবে তাহা নহে। তাঁহারা স্ববৃত্তি ব্যতীত কখন কখন উচ্চতর কিংবা নিম্নতর বর্ণের বৃত্তিরও অনুসরণ করিতেন, তাহাতে সমাজে কোন দোষ স্পর্শ করিত না।

শাস্ত্রশিক্ষার মধ্যে তৎকালে বেদই সর্ব্ব প্রধান বলিয়া কীর্ত্তিত হইত। অনন্তর পরবর্ত্তী সময়ে বেদশিক্ষা যদিও অনন্যসাধারণ হইয়া স্মৃতিগ্রন্থের সমধিক আদর পরিলক্ষিত হয়, তত্রাচ বেদের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি কখন অপহৃত হয় নাই; প্রত্যুত বেদই সকল শিক্ষার চরম ইহা সকল কালে সকল সময়েই পরিগণিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ উপবীত গ্রহণের পরই বেদ পাঠ করিতে আরম্ভ করিতেন, এবং কেহ নয় বৎসরে, কেহ কেহ অষ্টাদশ বৎসরে আর কেহ কেহ বা ষড়ত্রিংশ বৎসরে ইহার পাঠ সমাধা করিতেন। পাঠকালে অধ্যয়নকালীন গুরুগৃহে বাস করিতে হইত। বেদাধ্যয়নের এইরূপ প্রকরণ পরিদৃষ্ট হয়;—বেদাধ্যয়নকারী ছাত্র প্রথম উত্তরমুখ হইয়া জলে অবগাহনান্তর গায়ত্রী স্মরণ করিবে ও পরে উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া আচার্য্যের নিকট বেদ শিক্ষার্থে উপস্থিত হইবে; উপদেশ প্রাপ্তির প্রথমে ও শেষে, ছাত্রকে প্রতিদিন গুরুর পাদদ্বয় বন্দনা করিতে হইবে এবং অধ্যয়নের সময় তাঁহার উভয় হস্ত যুক্ত থাকিবে; এইরূপে ছাত্র যখন উপদেশ প্রাপ্ত্যর্থ প্রস্তুত হইবে, তখন গুরু 'পাঠ কর' এই কথা উচ্চারণ করিবেন এবং পাঠান্তে "বিশ্রাম কর" বলিলেই পাঠ বন্ধ হইবে; উপদেশ প্রাপ্তির সময় সর্ব্বদা "ওঁ" এই বেদোৎপন্ন শব্দটি উচ্চারণ করিবে; না করিলে বেদবিদ্যা তাঁহার নিকট হইতে অন্তর্হিত হয়, কিংবা যদি থাকে তাহা হইলে তাহা অধিক দিন স্থায়ী অথবা কোন কার্য্য

করিতে সমর্থ হয় না *। অধ্যাপকগণ সকল প্রকার ছাত্রকে বেদ শিক্ষা দিবেন না, কেবল এই দশজনকে মাত্র দিবেন ; গুরুপুত্র, বুদ্ধিমান্ বালক, যিনি অন্যান্য শাস্ত্র শিক্ষা দিতে সমর্থ, ন্যায়বান্, পবিত্রাত্মা, মৈত্রেয়, বলশালী, ধনী, সৎ এবং আত্মীয় অর্থাৎ যাহার সহিত রক্ত সম্বন্ধ আছে। এই দশ জনই বেদাধ্যয়নে অনুমত হইতেন—অন্যকে বেদের মর্ম্ম অবগত করান হইত না †। ইহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন প্রধান বর্ণ এবং মূর্দ্ধাবষিক্ত, মাহিষ্য ও করণ এই তিন অনন্তরজগণ ব্যতীত অন্য সকল বর্ণেরই বেদপাঠ নিষেধ করা হইয়াছে। বেদাধ্যয়ন করিবার সময় কোন ছাত্র গুরুকে অন্যায় প্রশ্ন করিবেন না এবং গুরুও অন্যায় উত্তর প্রদান করিবেন না ; যদি কেহ এ নিয়মের ব্যভিচার করেন তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে এক জনের মৃত্যু নিশ্চিত ‡। যেস্থলে ধর্ম্ম, ধন বা উপযুক্ত মনঃসংযোগ নাই সে স্থলে পবিত্র উপদেশ-বীজ বপন করা হইবে না;—কেন না অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে উত্তমবীজ রোপিত হইলে ঐ বীজ যেমন ফলোপধায়ক হয় না, সেইরূপ অমনোযোগী পুরুষে বিদ্যাবীজ বপন করিলে তাহাতে কোন ফলই পাওয়া যায় না ; বেদাধ্যাপক অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে সুন্দরবীজ বপন না করিয়া আজন্ম বিদ্যাদানে নিস্তব্ধ হইয়া থাকুন তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু যেন না দুঃখে পতিত হইয়াও অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে বপন করেন ; ইহাই আর্য্যগণের শিক্ষা দিবার সনাতন নিয়ম ছিল ¶। বেদ বিদ্যা যদিও আর্য্যগণের চরম শিক্ষা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু যে ব্যক্তি গুরূপদেশ ব্যতীত তাহা শিক্ষা করিতেন তিনি চৌরপদবাচ্য ও তাঁহাকে চিরজীবন ক্লেশ সহ্য করিতে হইত §। পূর্ব্বকালে গুরু ছাত্রগণের নিকট হইতে অতিশয় সম্মানিত হইতেন। ছাত্রগণ গুরুদর্শন করিলেই যথাবিহিত প্রণামাদি করিতেন। এমন কি এক সময়ে গুরু ও রাজদর্শন ঘটিলে তাঁহারা অগ্রে গুরুর অর্চ্চনা করিয়া পরে রাজার মান্য প্রদান করিতেন। প্রকার ও শিক্ষাভেদে গুরুর ভিন্ন ভিন্ন উপাধি হইত ; যিনি ছাত্রের উপবীত প্রদানান্তে তাঁহাকে সমগ্র বেদ, যজ্ঞকাণ্ড এবং পবিত্র উপনিষদ শিক্ষা দিতেন তিনি "আচার্য্য" নামে অভিহিত হইতেন ; যিনি নিজ ভরণপোষণের নিমিত্ত ছাত্রের নিকট হইতে দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া বেদের কিয়দংশ, বেদাঙ্গ বা অন্য কিছু শিক্ষা দিতেন তাঁহাকে 'উপাধ্যায়' বলা হইত ; পিতা, যিনি পুত্রার্থে বেদবিহিত সমুদায় ক্রিয়াদি সম্পন্ন ও তাহার ভরণ পোষণ করিতেন। তিনি গুরুপদ বাচ্য হইতেন ; যিনি হোম, অগ্নিষ্টোম, এবং অন্যান্য কার্য্যাদি করিবার নিমিত্ত বেতন গ্রহণ করিতেন তাঁহাকে

* মনুসংহিতা ২। ১০—১৪।

† মনুসংহিতা ২। ১০৯।

‡ মনু ২। ১১১।

¶ মনু ২। ১১২—১১৩।

§ মনু ২। ১১৬।

'ঋত্বিক' বলা হইত *। আচার্য্য দশ উপাধ্যায় হইতে শ্রেষ্ঠ পিতাঃ শত আচার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং মাতা সহস্র পিতা হইতেও শ্রেষ্ঠ; কিন্তু যে আচার্য্য ন্যায় ও যত্ন সহকারে বেদশিক্ষা প্রদান করেন, তিনি মাতার সমান এবং পিতার ন্যায় পূজ্য।

লোকে বয়োজ্যেষ্ঠ, ধনী, বলবান্ হইলেই যে 'মহান্' পদ বাচ্য হন তাহা নহে; যাঁহার মন বেদ ও বেদাঙ্গ-শিক্ষায় সজ্জিত হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে মহান্। অশিক্ষিত ব্যক্তি চিরকালই বালক এবং যিনি তাঁহাকে বেদশিক্ষা দেন তিনি কনিষ্ঠ হইলেও তাহার পিতৃ স্বরূপ; এইজন্য বয়ঃকনিষ্ঠ কোন অধ্যাপক, বয়োজ্যেষ্ঠ কোন আত্মীয়কে বেদ শিক্ষা প্রদান করিলে তিনিও তাহার পিতৃ-সদৃশ ও পিতৃবৎ পূজনীয়। মনু ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন— তিনি বলেন অঙ্গিরা পুত্র কবি তাঁহার পিতৃব্য ও পিতৃব্য পুত্রগণকে বেদশিক্ষা দিয়া উক্ত বিদ্যায় তাঁহাদিগকে পারদর্শী করিয়া দেন; একদা তিনি তাঁহাদিগকে পুত্র শব্দে নির্দ্দেশ করেন; ইহাতে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া দেবগণ সমীপে অভিযোগ করেন; তাহাতে দেবগণ একত্রিত হইয়া তাঁহাদিগকে 'অঙ্গিরা পুত্র যথার্থ কথাই বলিয়াছেন' এইরূপ উত্তর প্রদান করেন। বাস্তবিকই বেদশিক্ষা তৎকালে এতই আদরণীয় হইয়াছিল যে, যিনি তাহা অধ্যয়ন করিতেন তিনিই দেববৎ পূজনীয়, আর যিনি তাহা শিক্ষা না করিতেন তিনি শূদ্র পদবাচ্য হইতেন এবং তাঁহার সহিত কোন সুব্রাহ্মণই আলাপাদি করিতেন না। বেদশিক্ষা করিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী প্রথমতঃ স্নান ও গায়ত্রী স্মরণ করিয়া দেব, ঋষি ও পিতৃগণকে জলাঞ্জলি দিবেন অর্থাৎ তর্পণ করিবেন; অনন্তর দেব মূর্ত্তিগণের যথা বিধি পূজার্চ্চনা করিয়া হোমার্থ কাষ্ঠাহরণ করিবেন; এবং তাঁহাকে মধু, মাংস, সুগন্ধি দ্রব্য, পুষ্পমালা, বৃক্ষাদির সুমিষ্ট রস, স্ত্রীসংসর্গ, অম্লোৎপাদক আপাত মধুর দ্রব্য, প্রাণিহিংসা, অঙ্গরাগ, অঞ্জন, কাষ্টপাদুকা, পুত্র, কাম, ক্রোধ, লোভ, নৃত্য, গীত, ক্রীড়া, বিবাদ, পরদ্বেষ, মিথ্যা কথা, স্ত্রীলোকের প্রতি সোৎসুক দৃষ্টি এবং পর কার্য্যহানি প্রভৃতি যত্ন পূর্ব্বক পরিহার করিতে হইবে; এইরূপে প্রস্তুত ও ইন্দ্রিয়াদি সংযম করিয়া ছাত্র গুরুর আবশ্যক মত পুষ্প, পাত্র, গোময় মৃত্তিকা এবং কুশ সংগ্রহ করিবেন; অনন্তর ভিক্ষা পূর্ব্বক নিজ আহারীয় সংগ্রহ করিবেন †। যিনি উপর্য্যুপরি সাত দিবস হোমাগ্নিতে কাষ্ঠ নিক্ষেপ ও ভিক্ষা না করিতেন, তাঁহাকে 'অবকীর্ণি' শাস্তি গ্রহণ করিতে হইত, গুরুগণ পুরাকালে এতই পূজনীয় ছিলেন যে, ছাত্রগণ তাঁহার নাম পর্য্যন্তও মুখে উচ্চারণ করিতে কিংবা তাঁহার রীতি, নীতি ও বক্তৃতাদি কিছুই অনুকরণ করিতে পারিতেন না; যে স্থলে অন্য লোক তাঁহার গুরুর সত্য দোষ গুলিরও উল্লেখ করিতেন তথায় তিনি কর্ণে হস্ত দিতেন ও তথা হ-

* মনু সংহিতন ২। ১৪০—১৪৩।

(৮) মনু ২। ১৭৬—১৮২।

ইতে শীঘ্র অন্যত্র প্রস্থান করিবেন। আর যদি ছাত্র নিজে গুরুর সত্য দোষ গুলি ও ব্যক্ত করেন তাহা হইলে পর জন্মে তিনি গৰ্দ্দভ, মিথ্যা দোষারোপ করিলে কুক্কুর, বিনানুমতিতে তাঁহার দ্রব্য ব্যবহার করিলে কীট, এবং তাঁহার গুণের হিংসা করিলে সরীসৃপ হইবেন ; ছাত্র গুরুর সহিত একাসনে উপবেশন করিতে কখন সমর্থ হইতেন না (৯)।

কিন্তু নানাবিধ শাস্ত্র দৃষ্টে ইহাই প্রতীত হয় যে, গুরুর সত্য দোষ উল্লেখ করিলে কোন দোষ স্পর্শ করিত না ; প্রত্যুত মহাভারতে ;—

কিন্তু রোষ পরীতেন গুরুণা ভবিতা গুণঃ।
শত্রোরপি গুণা বাচ্যা, দোষা বাচ্যা গুরোরপি॥

ইত্যাদি বাক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ আর নানা স্থলে পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের বিবেচনায় সত্য দোষ থাকিলে তিনি গুরুই হউন কিংবা যিনিই হউন তাহা বলিবার কোন ক্ষতি নাই ; কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার অযথা নিন্দা করা, বা বিনা কারণে সকলের নিকট তাঁহার দোষ কীর্ত্তন করা কখনও কর্ত্তব্য নহে। তবে সাধারণতঃ গুরুর দোষ কীর্ত্তন দোষাবহ, এবং তাহাতে নিজেরও মান্যের হানি হইবার সম্ভাবনা, এই জন্যই গুরুনিন্দা সম্বন্ধে মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ উপর্য্যুক্ত মত প্রচার করিয়াছেন।

জ্ঞানার্জ্জন যে কেবল মাত্র ব্রাহ্মণগণ হইতেই হইত, এমন কিছু কথা নাই ; যেখানে যাঁহার নিকট হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহারই নিকট তাহা শিক্ষা করিবে। মনু বলিয়াছেন অপকৃষ্ট লোক হইতেও সদ্বিদ্যা গ্রহণ করিবে—অন্ত্যজ বা চণ্ডাল হইতে উচ্চ ধর্ম্মোপদেশ শিক্ষা করিবে এবং নীচ বংশ হইতেও সুন্দরী স্ত্রী গ্রহণ করিবে, যথা ;—

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যা মাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥
২।২৩৮

কেননা বিষ হইতেও অমৃত, বালক হইতে সুচারু বাক্য, শত্রু হইতে ভদ্রাবরণ এবং অবিশুদ্ধ পদার্থ হইতেও বিশুদ্ধ সুবর্ণ প্রহণীয় (২—২৩৯)।

স্বর্গ গমনের উপায়ীভূত আচার্য্যগণ ছাত্রগণকে এবংবিধ যত্নসহকারে বিদ্যাদান করিলে তাঁহাদের নিকট হইতে কখন কিছু প্রাপ্ত হইতেন কি না, এইক্ষণে তাঁহারই আলোচনা করা যাউক। বেদাধ্যয়ন সময়ে বা অন্যান্য শাস্ত্র শিক্ষাদান কালে গুরু বেতন বা দক্ষিণা স্বরূপ কিছুই গ্রহণ করিতেন না ; তবে ছাত্র গুরুর প্রাত্যহিক আবশ্যকীয় দ্রব্য ও পুষ্পাদি সংগ্রহ করিতেন এবং সময়ে সময়ে অধ্যাপকের গো ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। এবং পাঠ সমাধান্তে যথাসাধ্য অর্থ দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিতেন। এই অর্থেই যে গুরুর ব্যয় সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত তাহা কোন ক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না ; বিশেষতঃ তাঁহাদের ব্যয়ও নিতান্ত অল্প ছিল না ; যত

(৯) মনুসংহিতা ২য় অধ্যায়। ১৯৯—২০১ শ্লোক।

গুলি ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতেন তৎসকলেরই আহারীয় ও বসন ইত্যাদি তাঁহাকে দিতে হইত; ছাত্রগণ ভিক্ষা দিতে যাহা সংগ্রহ করিতেন তাহা সামান্য মাত্র; তবেই বুঝা যায় বিদ্যাদানে তাঁহাদের কত ব্যয় হইত; এ প্রকার বিদ্যাদান প্রথা ভারতবর্ষে এক্ষণেও বিদ্যমান আছে; ধন্য নিঃস্বার্থভাবে নিজে আহারীয় ও বসনাদি প্রদান করিয়া বিদ্যাদান করিয়াছেন? ধন্য ভারতীয় ঋষিগণ! ধন্য ভারতবর্ষ! যিনি এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম এবং বোধ হয় সর্ব্বশেষ; অন্য কোন দেশে যে এরূপ স্বার্থকতা করিয়া কেহ কখন এরূপ বিদ্যাদান করিবেন, তাহা স্বপ্ন বা আকাশকুসুমবৎ অলীক বোধ হয়। তবে যে ইহাঁদের কিছুই স্বার্থ ছিল না তাহা নহে; তাঁহাদের স্বার্থ এই যে, তাঁহারা সকলের নিকট অধিকতর সম্মানিত হইতেন; রাজগণ তাঁহাদের সতত মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতেন এবং ইঁহাদিগকে অন্যান্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শীর্ষ স্থানীয় ও পরম পূজনীয় জ্ঞান করিতেন। ছাত্রগণের ভিক্ষালব্ধধন গুরু প্রাপ্ত হইতেন; কিন্তু রাজাই তাঁহাদের বিশেষ সহায়তা করিতেন। ইহাঁদিগকে রাজকর প্রদান করিতে হইত না; তবে তপশ্চারণ করিয়া তাঁহারা যে পুণ্য সঞ্চয় করিতেন, তাহার ষষ্ঠাংশের একাংশ ধর্ম্মতঃ রাজার প্রাপ্য এবং ইহাই ব্রাহ্মণগণের কর। তদ্ব্যতীত প্রত্যেক যজ্ঞ ক্রিয়ার প্রথমেই ভূস্বামী পূজা করিতে হইত, ইহাও তাঁহাদের করস্বরূপ; এ সম্বন্ধে শাসন প্রণালী নামক প্রস্তাবে বিশেষ করিয়া লেখা যাইবে। সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণগণ যে বিশেষরূপে রাজকর্ত্তৃক সম্মানিত ও পুরস্কৃত হইতেন তাহার নিদর্শন আজি পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয়; দেবোত্তর বা ব্রহ্মোত্তর জমীই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ; শিক্ষিত ব্রাহ্মণগণকে রাজগণ এইরূপ নিষ্কর ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়া তাঁহাদের সংস্থান করিয়া দিতেন; এবং তাঁহারাও পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে সেই সকল ভূমি উপভোগ করিতেন। আরও ব্রাহ্মণ বা তাপসকুমারগণ যে স্থানে বা তপোবনে তপশ্চারণ করিতেন সেই সেই স্থানে রাজার বিশেষ দৃষ্টি থাকিত এবং যাহাতে দস্যু রাক্ষস প্রভৃতি অসভ্য লোক হইতে তাঁহাদের কোন পীড়া না জন্মে তদ্বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ যত্ন থাকিত। এতদ্ব্যতীত তপোবনে রাজন্যগণ প্রায়ই মৃগয়া ব্যপদেশে কিংবা অন্য কারণে গমন করিয়া তাঁহাদের তপোনিষ্ঠা ও কার্য্যাদি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন; যদি কোন তাপস অন্য কর্ত্তৃক উত্ত্যক্ত হইতেন, রাজসমক্ষে তাহা জ্ঞাপন করিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত সেনাপতি পাঠাইয়া কিংবা স্থল বিশেষে স্বয়ংই উপস্থিত হইয়া দুর্বৃত্ত পিশাচগণ হইতে তপোবন রক্ষা করিতেন। রাজগণ ভূমিনিহিত যে অর্থ প্রাপ্ত হইতেন, তাহার অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণের প্রাপ্য ও অর্দ্ধাংশ রাজকোষসাৎ হইত, কিন্তু ব্রাহ্মণ গুপ্ত নিধি উদ্ধার করিলে তিনি রাজদ্বারে তাহা বিজ্ঞাপন দিয়া সমুদায়ই নিজে আত্মসাৎ করিতে পাইতেন; যথা মনু লিখিয়াছেন;—

বিদ্বাংস্তু ব্রাহ্মণো দৃষ্ট্বা পূর্ব্বোপনিহিতং নিধিং।
অশেষতোঽপ্যাদদীত সর্ব্বস্যাধিপতির্হি সঃ ॥ ৩৭
যস্তু পশ্যেন্নিধিং রাজা পুরাণং নিহিতং ক্ষিতৌ।
তস্মাদ্দ্বিজেভ্যো দত্বার্দ্ধমর্দ্ধং শেষে প্রবেশয়েৎ ॥ ৮ ৩৮

এই সকল দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে তৎকালে রাজা কিংবা রাজকুমারগণ ব্রাহ্মণের বিশেষ সহায়তা ও তাঁহাদিগকে যথাবিহিত সম্মান করিতেন, এবং ব্রাহ্মণাবমাননা কিংবা কোন প্রকারে তাঁহাদের মঃনকষ্টের কারণ হইলে আপনাদিগকে মহাপাপী জ্ঞান করিতেন। ব্রাহ্মণও রাজার সর্ব্বাংশে হিতকামনা ও যাহাতে তাঁহার কোন প্রকার অমঙ্গল না হয় তাহারই অনুষ্ঠান করিতেন। এক কথায় তৎকালে ব্রাহ্মণ ও রাজায় অতিশয় সম্প্রীতি ছিল, কেহ কখনও কাহার মঃনকষ্টের কারণ হইতেন না; রাজা ব্রাহ্মণকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন এবং ব্রাহ্মণও রাজাকে স্নেহ করিতে ক্রুটি করিতেন না; সকলের সহিত এইরূপ সম্প্রীতি ছিল বলিয়াই সমাজে হঠাৎ কোন অপ্রীতিকর কারণ ঘটিত না।

বিশেষতঃ রাজার সহিত সাধারণ প্রজার অতিশয় ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহা শাসন প্রণালী নামক প্রস্তাবে বাহুল্য রূপে প্রদর্শন করা যাইবে; প্রজা মনঃসুখে জীবনাতিবাহিত করিলে সে রাজ্যের অমঙ্গল কোথায়? তাহার ভিত্তি অচল, অটল পাষাণ সদৃশ কাহারই নড়াইবার টলাইবার সাধ্য নাই। রাজায় প্রজায় তখন এপ্রকার সম্বন্ধ ছিল যে, প্রজার সুখে রাজা এবং রাজার সুখে প্রজা সুখানুভব করিতেন; রাজায় প্রজায় তখন এইরূপ সহানুভূতি ছিল বলিয়াই সহস্র বৎসরেও কোন বৈদেশিক নরপতি হিন্দু রাজার কেশাগ্রভাগও স্পর্শ করিতে পারেন নাই। বিশেষ তখন সমাজে সকলেরই সহিত সমান সহানুভূতি ছিল—সমাজ হইতে একজন বিচ্যুত হইলে—কিংবা অন্য কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলে প্রশান্ত-সরোবর-বক্ষে লোষ্ট্র নিক্ষেপবৎ সমগ্র সমাজ তাহাতে ত্রস্ত ও আন্দোলিত হইত; সেই উৎপীড়ন সকলেই যেন নিজের বলিয়া জ্ঞান করিতেন; এইরূপ সহানুভূতি ছিল বলিয়াই সমাজে সহসা কোন অনিষ্টাপাত হইত না; আবার শুদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই সহানুভূতি আছে বলিয়াই, আজি সপ্তশতাধিক বৎসর বৈদেশীক—বিজাতীয়—বিধর্ম্মী লোকের সংশ্রবেও হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্ম দুর্ভেদ্য দুরারোহ গিরির শৃঙ্গের ন্যায় সদর্পে দণ্ডায়মান থাকিয়া জগতীস্থ সকলকে সহানুভূতির সুখকর ফল বিজ্ঞাপন করিতেছে; আবার অন্যবিষয়ে ইহাদের সহানুভূতি নাই বলিয়াই আজি স্বাধীন আর্য্যঋষিগণের দুর্ব্বল সন্তানগণ দাসত্বের মর্ম্মন্তুদ যাতনায় অধীর হইয়াছে; তাই বলি এক পক্ষে তুমি যেমন ভারতের হিতসাধন করিয়াছ অন্যপক্ষে ভারত তোমা-

হইতে তেমনি বা ততোধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; সে ক্ষতি সংশোধন করিবার শক্তি শীঘ্র হইবে না। সহানুভূতি! তুমি এক্ষণে সর্ব্ব বিষয়ে ভারতের সহায় হও— তুমি পুনরায় হিন্দু সমাজে আপন পূর্ব্বাধিপত্য বিস্তার কর; দেখিবে এই মৃতপ্রায়—দগ্ধ ভারত আবার শীঘ্রই স্বর্ণময়ী হইয়া সকলের শীর্ষস্থানীয়া হইবে।

অস্ত্রশিক্ষা।

এক্ষণে অস্ত্রশিক্ষা সম্বন্ধে ভারতে কি প্রকার বন্দোবস্ত ছিল, তাহাই কীর্ত্তিত হইতেছে: ইহা প্রধানতঃ ক্ষত্রিয়গণ মধ্যেই সন্নিবেশিত ছিল; কিন্তু অন্যান্য জাতিও স্বেচ্ছাক্রমে একার্য্য করিতে পারিতেন তাহার আভাস পূর্ব্বে প্রদান করা হইয়াছে। ক্ষত্রিয়গণ অধিকতর ক্ষমতাশালী হইলেই সমাজে অধিকতর প্রতিষ্ঠাপিত হইতেন; না হইলে তিনি মান্যলাভে সমর্থ হইতেন না। পুরাকালে অষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণ কুমারের, একাদশ বৎসরে ক্ষত্রিয় সন্তানের, এবং দ্বাদশ বৎসরে বৈশ্য পুত্রের উপনয়ন সংস্কার হইত; কিন্তু নিজ নিজ বৃত্তি শিক্ষার নিমিত্ত সেই সন্তান কিংবা তাঁহাদের পিতৃগণ বিশেষ যত্নবান্ হইলে ব্রাহ্মণ কুমার পঞ্চম, ক্ষত্রিয় সন্তান ষষ্ঠ এবং বৈশ্যতনয় অষ্টম বৎসরে সংস্কৃত হইতেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ কুমার বেদাধ্যয়ন, ক্ষত্রিয় তনয় শস্ত্রালোচন, এবং বৈশ্য পুত্র যথা নিয়মে বণিগ্‌বৃত্তি শিক্ষা করিতেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তনয়গণ কোন ক্রমেই সংস্কৃত হইতে যথাক্রমে ষোড়শ, দ্বাবিংশ ও চতুর্ব্বিংশ বৎসর অতিক্রম করিতে পারিতেন না; যদি কোন কারণ বশতঃ তাহা হইত, তাহা হইলে তাঁহারা 'ব্রাত্য' বা ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া আখ্যাত হইতেন এবং তাঁহাদের সহিত কোন সুব্রাহ্মণই আপনাদের সংশ্রব রাখিতেন না (২। ৩৬—৪০)।

এই রূপে সংস্কৃত হইয়া ক্ষত্রিয় তনয় শস্ত্রালোচনে যত্নবান্ হইতেন; শস্ত্র শিক্ষার প্রথমেই ব্যায়াম; ব্যায়াম উত্তম রূপে অভ্যস্ত হইলে পর তরবারি; অনন্তর ধনুর্ব্বাণ, গদা, মুষল, পট্টিশ ইত্যাদি নানাবিধ অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। তবে সকল অস্ত্রাপেক্ষা ধনুর্ব্বাণই প্রধান এবং ফলদায়ক; কেননা ধনুর্ব্বাণ ব্যতীত পুরাকালে দূরস্থিত শত্রু বিনাশের অন্যকোন সুন্দর অস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না; এইজন্য অধিকাংশ ছাত্রই এই বিদ্যা বিশেষ রূপে শিক্ষা করিতেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই প্রাচীন কালের যুদ্ধ মাত্রেই শরাসনই প্রধান যুদ্ধোপকরণ—এবং বাহুল্য রূপে প্রচলিত। কিন্তু রামায়ণে শরাসন ব্যতীত দূরস্থিত শত্রু বিনাশের জন্য শতঘ্নী নামক অস্ত্রের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়; প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী সুবিখ্যাত পণ্ডিত উইলসন সাহেব বলেন, "The *Sataghni* i e. *centicide*, or slayer of a hundred, is generally supposed to be a sort of fire-arms, or the ancient Indian rocket." তিনি শতঘ্নীকে প্রাচীন ভারতীয়গণের বন্দুক শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কেননা

বারুদ-তেজ ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রে এ-কবারে শতলোক বিনষ্ট করা যাইতে পারে না। শতঘ্নী নাম শ্রবণ করিলেই তাহা এক প্রকার বন্দুক বলিয়াই বোধ হয়; ইহাই বা পুরাকালের ব্রহ্মাস্ত্র; যাহা হউক শিক্ষালে এ অস্ত্রের বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না।

শাস্ত্র শিক্ষার ন্যায় শস্ত্রশিক্ষা সমাজের যে বিশেষ হিতকর, তাহা আর্য্য ঋষিগণ বিলক্ষণ পরিজ্ঞাতছিলেন, এবং সেই জন্যই এই বিদ্যাকেও অন্যান্য বিদ্যার মধ্যে প্রধানতম বলিয়া গণ্য করিয়াছেন; এবং বেদাভ্যাসের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণের শস্ত্রাভ্যাস অবশ্যকরণীয় ইহা শত সহস্র স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ, তিনিই সমাজের শীর্ষস্থানীয় এবং সকলেরই পূজনীয়; এই জ্ঞান ছিল বলিয়াই এবং যোদ্ধৃগণ এইরূপ মান পাইতেন বলিয়াই আর্য্যগণ অন্য কোন জাতির পদানত হন নাই, তাঁহারা নিজেই শাসন কর্ত্তা, নিজেই রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন; তাই অন্য সকলকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, তাই অন্য সকলকে দস্যু, পিশাচ, ম্লেচ্ছ, রাক্ষস বলিয়া ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন। তৎকালে সমাজে বংশমর্য্যাদা বলিয়া বিশেষ কোন গৌরব ছিল না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; যিনি যে পরিমাণে মানসিক বা শারীরিক বীর্য্য প্রদর্শন করিতে পারিতেন তিনিই তদনুযায়ী সমাজে মর্য্যাদা প্রাপ্ত ও আদরণীয় হইতেন; তিনি নিম্নবর্ণীয় হইলে যে মর্য্যাদালাভে বঞ্চিত হইতেন তাহা নহে; যিনিই হউন কোন বিষয়ে বীর্য্য প্রকাশ করিলেই তিনি মাননীয় ও পূজনীয় হইতেন; ইহাই পুরাকালের সনাতন নিয়ম ছিল। আমরা দেখিতে পাই বেদোল্লিখিত কবস ঋষি শূদ্র হইয়াও বিদ্যাবুদ্ধি প্রভাবে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন; আবার সত্যবতীসুত বেদব্যাস বিদ্যাপ্রভাবে সমাজে যেরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কোন সুজাত ঋষিকুমারের ভাগ্যে কখনও ঘটিয়া উঠে নাই। অপরদিকে অলাম্বুষ, কর্ণ প্রভৃতি যোদ্ধৃগণ আজীবন হীনবংশজাত বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকিয়াও আপনাপন ভুজবীর্য্য বলে সমাজে অসাধারণ ক্ষমতা ও অসামান্য প্রতিপত্তি লাভ করিয়া বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় সন্তান অপেক্ষাও অত্যধিক সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল দৃষ্টে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয় যে, তৎকালে শারীরিক বা মানসিক শক্তিই সমাজে বিশেষরূপে সম্মান লাভ করিত; বংশ মর্য্যাদা তৎকালে তত প্রবল ছিল না, এবং তাহা ছিল না বলিয়াই আর্য্য সমাজ উন্নতির উচ্চতোরণে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখন বংশের মর্য্যাদা অপেক্ষা গুণের মর্য্যাদাই অধিকতর সম্মানিত হইত, তাই প্রাচীন সমাজ এক সময় ক্ষণপ্রভার ন্যায় সমুদায় জগৎ বিভাষিত করিয়াছিলেন। আবার কুক্ষণে দেশে বংশ মর্য্যাদার গৌরব বাড়িয়াছিল, তাই ইহার অধঃপতন ঘটিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে আবার যে প্রকার লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহাতে লোকে বংশ অপেক্ষা গুণেরই অধিক

মর্য্যাদা করিতে শিখিতেছে বলিয়া বোধ হয়; সমাজ এইরূপ অবস্থায় থাকিলে জানিনা, ইহার পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া যাইতে আর কত বিলম্ব? ক্ষত্রিয়গণের অন্যান্য বৃত্তি শাসনপ্রণালী নামক প্রস্তাবে সন্নিবেশিত হইবে এইজন্য এস্থলে তদুল্লেখে ক্ষান্ত হইলাম।

ক্রমশঃ।

শ্রী কৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

বেণীসংহার।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গাধিপতি আদিশূর প্রারব্ধ যজ্ঞ নির্ব্বাহার্থ কান্যকুব্জ হইতে যে বেদবিৎ পঞ্চগোত্রোৎপন্ন পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, সাণ্ডিল্য গোত্রোদ্ভব কবিবর ভট্টনারায়ণ তাহাদিগের অন্যতম। তিনি বীররস প্রধান বেণীসংহার নাটক প্রণয়ন করেন। ইহা মহাকবি কালিদাস বা ভবভূতি প্রণীত নাটকাপেক্ষা কাব্যাংশে নিকৃষ্টতর সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে রসভাবাদির বিলক্ষণ চমৎকারিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। ভীমসেনের ক্রোধ ও বীরত্ব, দুর্য্যোধনের অভিমান, যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃবাৎসল্য প্রভৃতি ইহাকে সমলঙ্কৃত করিয়া সহৃদয় পাঠকবর্গকে মোহিত করিতেছে। সংস্কৃত ভাষায় ইহা একখান সুপ্রসিদ্ধ নাটক। সুবিখ্যাত আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ স্বকৃত সাহিত্যদর্পণে ইহার নানাস্থান উদ্ধৃত করিয়া বেণীসংহারের উৎকর্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলতঃ বেণীসংহার সংস্কৃত ভাষার এক উজ্জ্বলরত্ন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বেণীসংহার ছয় অঙ্কে বিভক্ত। ইহাতে বিরাটাবাসাগত পাণ্ডবদিগের চিরসুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণের কুরুরাজ সমীপে সন্ধিবন্ধনার্থ গমন হইতে, দুর্য্যোধনের বিনাশান্তর বীরকেশরী ভীমসেন কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথম অঙ্কে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির যুদ্ধ বিগ্রহ ও ভ্রাতৃবিরোধ পরিহার মানসে পঞ্চভ্রাতার জন্য পাঁচটিমাত্র গ্রামের অধিপতিত্ব প্রাপ্তি কামনা করিয়া সুহৃৎশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে দুর্য্যোধন সমীপে প্রেরণ করত কুরুরাজ প্রদত্ত উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যে পাপমতি কুরুরাজ তাঁহাদিগকে আশৈশব সৌহার্দ্দপাশ ছিন্ন করিয়া নানাবিধ কূটোপায়ে কখনও বা ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া, কখনও বা জতুনির্ম্মিতগৃহে পোড়াইতে চেষ্টা করিয়া প্রাণ নষ্ট করিতে উদ্যোগী ছিলেন, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির এমন ঘোরতর শত্রুর সহিতও সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হইলেন। অহো মহানুভাবকতা!

পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পাণ্ডব পক্ষপাত হেতুক ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কৃষ্ণ ক্রোধপরবশ ও বিফল মনোরথ হইয়া পাণ্ডবশিবিরে অবিলম্বে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। উভয়পক্ষেই যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ হইল। যুধিষ্টিরের অমানুষিক ধীরতা, এবং জ্ঞাতি কুলোচ্ছেদে পরাঙ্মুখতা দর্শন করিয়া ভীম জ্যেষ্ঠর প্রতি একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি প্রহৃষ্টমনে সমর সজ্জায় মনোনিবেশ করিয়া উৎকণ্ঠিত মনে যুদ্ধারম্ভের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয়াঙ্কে দুর্য্যোধন ও ভানুমতীর পরস্পর সন্দর্শন ও কথোপকথন এবং কুরুপতি দুর্য্যোধনের রণযাত্রা বর্ণিত হইয়াছে। পতিব্রতা ভানুমতী স্বামীর সমরবিজয়ার্থ সংযতচিত্তে দেবতারাধনে নিযুক্তা হইয়া বালোদ্যানে সখীগণসহ অবস্থিতি করিতেছিলেন। যুদ্ধপ্রয়াণের পূর্ব্বে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য দুর্য্যোধন তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি দেবার্চ্চনে এতদূর একাগ্রমনা ছিলেন যে, কুরুরাজের উপস্থিতিও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এই সময়ে প্রবল বাত্যাচক্রে তদীয় রথপতাকা ভগ্নীকৃত হইয়া ভাবি অমঙ্গলের সূচনা করিল। প্রিয়পুত্র অভিমন্যুর অকাল মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত মহাবীর অর্জ্জুনের হস্ত হইতে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সংরক্ষণ কুরুরাজভগিনী দুঃশলা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন। তিনি দুঃশলাকে আশ্বস্তা করিয়া, ভানুমতীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া, যুদ্ধ ক্ষেত্রাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয়াঙ্কে দ্রোণাচার্য্যের অবৈধ মৃত্যু, তদ্দরুণ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার শোক ও ক্রোধ, কর্ণের সহিত তাঁহার বিরোধ ও অস্ত্রত্যাগ, এবং ভীম কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনানুজ দুঃশাসনের শোণিতপান বর্ণিত হইয়াছে।

দুঃশাসনের মৃত্যুতে কুরুরাজের বিষাদ, কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধ, অর্জ্জুন হস্তে কর্ণপুত্র শূরশ্রেষ্ঠ বৃষসেনের নিধন, কুরুশিবিরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর আগমন—চতুর্থাঙ্কের বর্ণনীয় বিষয়।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য দুর্য্যোধনকে অনেক বিধ বুঝাইলেন, কিন্তু অভিমানী কুরুপতি কোন ক্রমেই পিত্রাদেশপালনে স্বীকৃত হইলেন না। ইতিমধ্যে অর্জ্জুনহস্তে প্রিয়সুহৃৎ কর্ণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া একান্ত দুঃখসন্তপ্ত হইলেন। তৎপর কুরুশিবিরে সমাগত ভীমার্জ্জুনের সহিত দুর্য্যোধনের বাগ্যুদ্ধ হয়। অঙ্গরাজ কর্ণের মৃত্যুর পর অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের সমীপে উপস্থিত হইয়া হতাবশিষ্ট কুরুসৈন্যের অধিনায়কতা প্রার্থনা করেন। কুরুরাজের ব্যবহারে আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া তথা হইতে ক্রোধভরে প্রস্থান করেন। এই সকল বিষয় পঞ্চমাঙ্কে বিবৃত হইয়াছে।

ভীম দুর্য্যোধন সমীপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আগামী কল্য প্রভাতে দারুণ গদাঘাতে তাঁহাকে নিহত করিবেন। কুরুরাজ কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা ভিন্ন স্ব-

পক্ষীয় সমস্ত সৈন্যের নিধনে ব্যাকুলচিত্ত হইয়াও সত্যসন্ধ ভীমের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া পলায়নপর হইলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর সমীপবর্ত্তী মহাসরসীজলে নিমজ্জমান দুর্য্যোধনের সমীপে উপনীত হইয়া ভীমার্জ্জুন ও কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রাণভয়ে পলায়নজনিত অপরাধে বিবিধরূপে তিরস্কার করিয়া ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সম্মত করাইলেন। ইত্যবসরে দুর্য্যোধনের সুহৃৎ চার্ব্বাক নামা জনৈক রাক্ষস মুনিবেশ ধারণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া দুর্য্যোধন হস্তে ভীমের নিধনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। এই মিথ্যা সংবাদে যুধিষ্ঠির প্রতারিত হইয়া, দ্রৌপদীর সহিত অগ্নিপ্রবেশে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অবিলম্বে দুর্য্যোধনকে সমরে নিহত করিয়া রক্তাক্তকলেবরে ভীম তথায় উপস্থিত হইয়া আসন্নমৃত্যুমুখ হইতে তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন। কুরুসভায় দুঃশাসন ও দুর্য্যোধন কর্তৃক অপমানিত হওয়ার পর হইতেই আলুলায়িতকেশা দ্রৌপদীর কেশসংযমন করিয়া ভীম স্বীয় প্রতিজ্ঞা হইতে বিমুক্ত হইলেন। ষষ্ঠাংকে এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ভীম এই নাটকের নায়ক। ভীমসেনের চরিত্র সম্যকৃরূপে প্রদর্শন করিবার জন্য কুরুক্ষেত্র মহাসমরের প্রধানতম অধিনায়ক কৃষ্ণার্জ্জুনের চরিত্র অপরিস্ফুট রহিয়াছে। তাঁহাদের চরিত্রের সম্যক্ বিকাশ কবির অভীপ্সিত নয়। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, বীরত্ব, জিঘাংসা, প্রবলক্রোধ, প্রণয়, ভক্তি প্রভৃতি সমস্ত প্রবৃত্তিই সুবিশদরূপে প্রকটীকৃত হইয়াছে।

যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিকুলক্ষয়-পরিহার মানসে কৃষ্ণকে সন্ধিসংস্থাপনার্থ দুর্য্যোধন সমীপে দূতরূপে প্রেরণ করিলেন। বীরসিংহ ভীমের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। এই সময় পর্য্যন্ত তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি সমুচিত সম্মাননা প্রযুক্ত চিরবৈরী কৌরবদিগ কর্তৃক অনুষ্ঠিত বহুবিধ দুষ্কার্য্য অবনতমস্তকে ও স্থিরচিত্তে সহ্য করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু এখন আর তাঁহার সন্ধিবন্ধনোৎসুক জ্যেষ্ঠের প্রতি বিরাগের পরিসীমা রহিল না। তিনি বৈরনির্য্যাতনার্থ একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। সহদেবকে বিদ্রুপ করিয়া বলিলেন,—

"ন খলু ন খলু অমঙ্গলানি চিন্তয়িতুমর্হন্তি ভবন্তঃ কৌরবাণাং, সন্ধেয়াস্তে ভ্রাতরো যুষ্মাকং।"

ধীরচেতা সহদেব সরোষে কহিলেন, 'আর্য্য, যদি রাজা যুধিষ্ঠির নিষেধ না করিতেন তবে কি আপনার অনুজেরা চিরশত্রু ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণকে এ পর্য্যন্ত ক্ষমা করিত?' ভীমের ক্রোধানল একান্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন 'তুমি যথার্থই কহিয়াছ। আজ হইতে আমি তোমাদিগ হইতে ভিন্ন হইয়া, চিরবৈরীর সহিত তোমাদের কৃত সন্ধি ভগ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।'

সহদেব। (অনুনয়ের সহিত) আপনি এইরূপ ক্রোধপরবশ হইলে গুরুস্থানীয় মহারাজ দুঃখিত হইবেন।

ভীম। (সহাস্যে) কি গুরু আমার প্রতি ক্ষুণ্ণ হইবেন? তিনি কি দুঃখ অনুভব করিতে জানেন?

"তথাভূতাং দৃষ্ট্বা নৃপসদসি পাঞ্চালতনয়াং,
বনে ব্যাধৈঃ সার্দ্ধং সুচিরমুষিতং বল্কলধরঃ।
বিরাটস্যাবাসে স্থিতমনুচিতারম্ভনিভৃতং,
গুরুঃ খেদং খিন্নে ময়ি ভজতি, নাদ্যাপি কুরুষু?"

যে ভীম ঘোর অপমান, রাজ্যচ্যুতি, বনবাসজনিত ক্লেশ অম্লানবদনে ও ধীরভাবে সহ্য করিতেছিলেন, আজ চিরপূজ্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিষ্ণুতা ও মহত্ত্ব তাঁহাকে বিচলিত করিল। জ্যেষ্ঠের বিসদৃশ ব্যবহার তিনি কোন মতেই অনুমোদন করিতে পারিলেন না। যে জ্যেষ্ঠকে তিনি দেবতার ন্যায় হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন, যাঁহার আদেশ প্রতীক্ষায় তিনি বৈরনির্য্যাতনে ছিলেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—

যুষ্মচ্ছাসনলঙ্ঘনাম্ভসি ময়া মগ্নেন নাম স্থিতং
প্রাপ্তা নাম বিগর্হণা স্থিতিমতাং মধ্যেঽনুজানামপি।
ক্রোধোল্লাসিত-শোণিতারুণ-গদস্যোচ্ছিন্দতঃ কৌরবান্,
অদ্যৈকং দিবসং মমাসি ন গুরু, নাহং বিধেয়স্তব॥

কৌরবগণানুষ্ঠিত সমুদয় দুষ্কার্য্য স্মরণ করিয়া, তাঁহার জিঘাংসাবৃত্তি বলবতী হইল। তিনি ক্রোধে এতদূর অভিভূত হইয়াছিলেন যে, অস্ত্রাগার হইতে অবিলম্বে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া অসংখ্য শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার জন্য ভ্রমক্রমে দ্রৌপদীর আবাসগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। স্রোতস্বিনী বহুকাল রুদ্ধ থাকিয়া অপ্রতিহত-প্রভাবে তটদেশ প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইল। তাহার বেগ সংবরণ করে কাহার সাধ্য? কর্ত্তব্যজ্ঞান দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, গুরুজনের আদেশের অপেক্ষা না করিয়া সমরসাগরে ঝাঁপ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষত্রিয় হইয়া যুধিষ্ঠির কিরূপে শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধের অনুষ্ঠানে ক্ষান্ত রহিলেন, ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। জ্যেষ্ঠের ধীরতা ও সহিষ্ণুতা তাঁহার নিকট ভীরুতা ও কাপুরুষতা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পাঁচখান মাত্র গ্রাম পাইলেই, ধার্ম্মিকরাজ যুধিষ্ঠির চিরবৈরীর সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, এ-কথা শুনিয়া তিনি কাণে হাত দিলেন। এমন নিদারুণ শত্রুর সহিত সমস্ত পৃথিবী পাইলেও ভীম সন্ধি করিতে প্রস্তুত নহেন। শত্রুকে হনন না করিয়া বীরপুরুষ কিরূপে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন, ইহা তাঁহার বোধগম্য হইল না।

"ভীম। অথ ভগবান্ কৃষ্ণঃ কেন প্রকারেণ সন্ধিং কর্ত্তুং সুযোধনং প্রতি প্রহিতঃ?

সহদেব। আর্য্য, পঞ্চভির্গ্রামৈঃ।

ভীম। (কর্ণ হস্তে আচ্ছাদন করিয়া) অহহ! কথং তস্য দেবস্যাজাতশত্রোরপ্যয়মীদৃশস্তেজোঽপকর্ষ?—তদ্বৎস! ন ত্বয়া কথিতং, ন চ ময়া ভীমেন শ্রুতং।

যত্তদূর্জ্জিতমত্যুগ্রং ক্ষাত্রং তেজোঽস্য ভূপতেঃ।

দীব্যতাক্ষৈ স্তদানেন নূনং তদপি হারিতং॥
কিং নাম পঞ্চভিঃ গ্রামৈঃ সন্ধিঃ? সহদেব! পশ্য,

মথ্নামি কৌরবশতং সমরে ন কোপাৎ?
দুঃশাসনস্য রুধিরং ন পিবাম্যুরস্তঃ?
সংচূর্ণয়ামি গদয়া ন সুযোধনোরূ?
সন্ধি করোতু ভবতাং নৃপতিঃ পণেন।

ভীম। কুরুষু তাবদসন্ধেয়তা তবৈব নিবেদিতা, যদৈব অস্মাভিরিতো বনং গচ্ছদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেব কুরুকুলস্য নিধনং প্রতিজ্ঞাতং। প্রসিদ্ধশ্চ লোকেহপি ধার্ত্তরাষ্ট্রকুলক্ষয়ঃ।

সহদেব। (লজ্জাং নাটয়তি)

ভীম। কিং লজ্জাকরো ভবতাং? রে মূর্খ!

যুষ্মান্ হ্রেপয়তি ক্রোধাল্লোকে শক্রকুলক্ষয়ঃ।
ন লজ্জতি দারাণাং সভায়াং কেশকর্ষণং?"

পাপমতি দুর্য্যোধনকে সবংশে ধ্বংশ না করিলে কি বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা চরিতার্থ হইতে পারে? চিরশক্রর সহিত মিত্রতা স্থাপনের বৃথা প্রয়াসে আবশ্যক কি? কূট নীতি অবলম্বন করিয়া লোকদিগকে কুরুরাজের সন্ধিবিমুখতা এবং আপনাদের স্বজাতিক্ষয়-পরিহার প্রদর্শন সরলমনা বীরপুঙ্গবের নিকট নিতান্ত অনর্থক বোধ হইল। কুরুসভায় সমস্ত রাজন্যমণ্ডলীর সমক্ষে দুর্য্যোধনের আদেশে দুরাচার দুঃশাসন প্রিয়পত্নীর বস্ত্র ও কেশ আকর্ষণ করিয়া যে মর্ম্মন্তুদ শেল হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়াছিল, সেই নিদারুণ ব্যথা কি তাহাদের সবংশে হনন ভিন্ন দূর হইতে পারে? তিনি উদ্বিগ্না, দুঃখদগ্ধা, আলুলায়িতকেশা দ্রৌপদীর সমক্ষে ক্রোধভরে কহিলেন,—

"অয়ি পাঞ্চালতনয়ে! অলং বিষাদেন যৎকরিষ্যে অচিরেণৈব কালেন, তৎ শ্রূয়তাম্—

চঞ্চদ্ভুজভ্রমিত-চণ্ড-গদাভিঘাত-
সংচূর্ণিতোরুযুগলস্য সুযোধনস্য।
স্ত্যানাবনদ্ধ-ঘন-শোণিত-শোণপাণি
রুত্তংসয়িষ্যতি কচাংস্তব দেবি"! ভীমঃ

দ্রৌপদী। কিং নাথ! দুষ্করং ত্বয়া পরিকুপিতেন? অনুগৃহ্নন্তু এতৎ ব্যবসিতং তে ভ্রাতরঃ।"

ভীমের আশ্বাসবাক্যে সান্ত্বনালাভ করিয়া, দ্রৌপদী তাঁহার নিদারুণ প্রতিজ্ঞা পূরণের অবসরের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

অনতিবিলম্বে ভীমের অভীষ্ট পূর্ণপ্রায় হইল। দুর্য্যোধন বৃথাভিমানে অন্ধ হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করিতে অসম্মত হইলেন। রণদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। কুরুকুল দগ্ধ করিবার জন্য পাণ্ডবদিগের ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অচিরে পাণ্ডবশিবিরে বিঘোষিত হইল,—

"যৎ সত্য-ব্রত-ভঙ্গ-ভীরু-মনসা যত্নেন মন্দীকৃতং
যৎ বিস্মর্ত্তুমপীহিতং শমবতা শান্তিং কুলস্যেচ্ছতা।
তদ্ দ্যুতারণি-সম্ভৃতং নৃপসুতা কেশাম্বরাকর্ষণৈঃ
ক্রোধজ্যোতিরিদং মহৎ-কুরুবনে যৌধিষ্ঠিরং জৃম্ভতে॥"

অতিহৃষ্টমনে প্রিয়তমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ভীম যুদ্ধক্ষেত্রের অভিমুখে বহির্গত হইলেন। যাইবার সময় দ্রৌপদীকে আশ্বস্ত করিলেন,

'ভূয়ঃ পরিভব-ক্লান্তি-লজ্জা বিধুরিতাননং।
অনিঃশেষিত-কৌরব্যং ন পশ্যসি বৃকোদরং॥'

ভীম ক্ষমা কি তাহা জানিতেন না। তিনি শত্রুকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত জঘন্য কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার জন্য দ্রৌপদীর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষণ কালের জন্যও তাহা বিস্মৃত হন নাই। দুঃশাসনকে সম্মুখে দেখিয়া আজ তাঁহার ক্রোধানল শতগুণ প্রজ্বলিত হইল। অবসর পাইয়া আজ তিনি দুরাচারকে স্বীয় ক্রোধানলে আহুতি দিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করিতে সচেষ্টিত হইলেন। আজ বীরবরের দুর্জ্জেয় ক্রোধ হইতে দুঃশাসনকে রক্ষা করিতে কৌরবপক্ষীয় কেহ সমর্থ হইল না। তিনি উভয় সেনাদলের সাক্ষাতে দুঃশাসনকে নিহত করিয়া তাহার রক্তপান করত স্বীয় জিঘাংসাবৃত্তিকে চরিতার্থ করিলেন। কি ভয়ঙ্কর ক্রোধ! কি ভয়াবহ জিঘাংসা-পরিতৃপ্তি!!

'ভীম। (নেপথ্যে) আঃ দুরাত্মন্! দ্রৌপদী কেশাম্বর-কর্ষণ! মহাপাতকিন্! ধার্ত্তরাষ্ট্রাপসদ! চিরস্য খলু কালস্য মৎসম্মুখাগতোঽসি। অরে ক্ষুদ্রপশো। কেদানীং গম্যতে? ভো ভো রাধেয়-দুর্য্যোধন-সৌবল-প্রভৃতয়ঃ পাণ্ডব-বিদ্বেষিণঃ চাপপাণয় মানধনাঃ! শৃণ্বন্তু ভবন্তঃ,

স্পৃষ্টা যেন শিরোরুহে নৃ-পশুনা পাঞ্চাল-রাজাত্মজা,
যেনাস্যাঃ পরিধানমপ্যপহৃতং রাজ্ঞাং গুরূণাং পুরঃ।
যস্যোরঃ-স্থল-শোণিতাসবমহং পাতুং প্রতিজ্ঞাতবান্,
সোঽয়ং মদ্ভুজ-পঞ্জরে নিপতিতঃ, সংরক্ষ্যতাং কৌরবাঃ॥'

ভীম মর্ম্মঘাতিনী শ্লেষোক্তিতে যে বিলক্ষণ পটু ছিলেন, তাহা উল্লিখিত প্রত্যেক কথাই সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। অস্ত্রে, শস্ত্রে কথায় শত্রুর মর্ম্মদেশ ছেদন করিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না, বরং বিশেষ আহ্লাদই প্রকাশ করিতেন। দুর্য্যোধনের সর্ব্বপ্রধান সুহৃৎ ও পরামর্শদাতা কর্ণের মৃত্যুর পর রণজয়ী ভীমার্জ্জুন দুর্যোধনের অন্বেষণে কৌরব-শিবিরে উপস্থিত হইয়া তদীয় অনুচরবর্গকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

'কর্ত্তা দ্যূতচ্ছলানাং জতুময়-শরণোদ্দীপনঃ সোঽভিমানী,
কৃষ্ণাকেশোত্তরীয়-ব্যপনয়ন-মরুৎ পাণ্ডবা যস্য দাসাঃ।
রাজা দুঃশাসনাদে, গুরু রনুজশতস্যাঙ্গরাজস্য মিত্রং।
ক্বাস্তে দুর্য্যোধনোঽসৌ কথয়ত ন রুষা দ্রষ্টুমভ্যাগতৌ স্বঃ॥''

পূজনীয় ব্যক্তি অন্যায়াচরণ করিলে বা দুষ্কর্ম্মের অনুমোদন করিলে, ভীমের মর্ম্মদংশী বাক্যবাণ এড়াইতে পারিত না। তিনি অম্লানবদনে জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণামাবসরে কহিলেন,—

"নিহতাশেষ-কৌরব্যঃ ক্ষীবো দুঃশাসনাসৃজা।
ভংক্তা সুযোধনস্যোর্ব্বো ভীমোঽয়ং শিরশ্চতি॥

তাত! অলমলং মন্যুনা।
"কৃষ্ণা কেশেষু কৃষ্টা তব সদসি বধূঃ পাণ্ডবানাং নৃপৈ র্যৈ
সর্ব্বৈ তে ক্রোধবহ্নৌ কৃশ-শলভ-কুলাবজ্ঞয়া যেন দগ্ধাঃ।
এতস্মাৎ শ্রাবয়েঽহং, ন খলু ভুজবল-শ্লাঘয়া, নাপি দর্পাৎ,
পুত্রৈঃ পৌত্রৈশ্চ কর্ম্মণ্যতিগুরুণি কৃতে, তাত! সাক্ষী ত্বমেব॥"

এবংবিধ দারুণবাক্যে ধৃতরাষ্ট্রের ও দুর্য্যোধনের যে অসহ্য কষ্ট হইয়াছিল, সমস্ত বান্ধবাদির ধ্বংশেও সেরূপ হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কায়মনোবাক্যে শত্রুদ্রোহিতা ভীমসেনকে সার্থকনামা করিয়াছে। শত্রুর প্রতি এরূপ দারুণ বিদ্বেষ বশতঃই, তিনি নিতান্ত বীভৎস ও অমানুষিক অনুষ্ঠান হইতেও ক্ষান্ত হইতেন না। তিনি দুঃশাসনের কেবল বধে আপনাকে সন্তুষ্ট মনে করিতে পারেন নাই। যে পর্য্যন্ত তাহার হৃদয় ছিন্ন করিয়া রক্ত পান না করিয়াছিলেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার শত্রুজন-জনিত তৃষ্ণা অপরিতৃপ্ত রহিয়াছিল। গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরুদেশ ভঙ্গ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, শত্রুপ্রধানের শোণিতে সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হওয়াতে যে পর্য্যন্ত দর্শকমণ্ডলীর ভীতি উৎপাদন না করিয়াছিলেন সে পর্য্যন্ত তাঁহার জিঘাংসা বৃত্তি পরিতৃপ্ত হয় নাই। তাঁহার রক্তাক্তকলেবর দর্শনে চতুর্দ্দিকে বিত্রস্ত দর্শকগণ পলায়ন আরম্ভ করিল। চিরপরিচিত আত্মীয়েরাও অতিভীমদর্শক ভীমকে চিনিতে পারিলেন না। যুধিষ্ঠিরের পাদবন্দন করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞার উপসংহার করিতে তাঁহার নিকট বিদায় চাহিলেন।

ভীম। আর্য্য! মুঞ্চতু মাং ক্ষণমেকং ভবান্।

যুধি। কিমপরং অবশিষ্টং?

ভীম। আর্য্য! সুমহদবশিষ্টং। সংযচ্ছামি তাবদেন দুর্য্যোধন-দুঃশাসন-রুধিরোক্ষিতেন পাণিনা পাঞ্চাল্যা দুঃশাসনাবকৃষ্টং কেশহস্তং।

তিনি ভীতা দ্রৌপদীকে শত্রুবধজনিত আহ্লাদে আহ্লাদিতমনে কহিলেন,

"পঞ্চালরাজ-তনয়ে! দিষ্ট্যা বর্দ্ধসে রিপুকুলক্ষয়েণ। পশ্য,
যেনাকৃষ্টাসি রাজ্ঞাং সদসি নৃপশুনা তেন দুঃশাসনেন
স্ত্যানান্যেতানি তস্য, স্পৃশ মমকরয়োঃ, পীতশেষাণ্যসৃঞ্জি।
কান্তে! রাজ্ঞঃ কুরূণামপি রুধিরমিদং মদ্গদা চূর্ণিতোরো
রঙ্গেঽঙ্গেষু সক্তং তব পরিভবজস্যানলস্যোপশান্ত্যৈ॥

ভীম। স্মরতি ভবতী, যন্ময়োক্তং—চঞ্চদ্ভুজেতি (পূর্ব্বোক্তমেব পঠতি)

দ্রৌপদী। নাথ! স্মরামি অনুভবামিচ।

ভীম। ভবতি! সংযম্যতামিদানীং ধার্ত্তরাষ্ট্র-কুল-কাল-রাত্রির্দুঃশাসন-বিলুলিতা বেণী।

দ্রৌ। নাথ! বিস্মৃতাস্মি এতৎব্যাপারং, নাথস্য প্রসাদেন পুনরপি শিক্ষিষ্যামি।

চেটী। (বেণীং বধ্নাতি)

(নেপথ্যে)

ক্রোধান্ধৈর্যস্য মোক্ষাৎ কুরু-নরপতিভিঃ পাণ্ডুপুত্রৈঃ কৃতানি
প্রত্যাশং মুক্তকেশান্যতুলভুজবলৈঃ পার্থিবান্তঃ-পুরাণি।
কৃষ্ণায়াঃ কেশপাশঃ কুপিত-যম-সখো ধূমকেতুঃ কুরূণাং
সোঽয়ং বদ্ধঃ প্রজানাং বিরমতু নিধনং, স্বস্তি রাজ্ঞাং কুলেভ্যঃ॥

যুধি। দেবি! এষতে বেণী-সংহারঃ অভিনন্দ্যতে নভস্থলসঞ্চারিণা সিদ্ধজনেন।”

সতীর ক্রোধানলে কৌরবগণ অকালে নিধনপ্রাপ্ত হইল। কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমরের পর সর্ব্বত্র শান্তি সংস্থাপিত হইল। যুধিষ্ঠিরের শাসন-প্রভাব সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল। পাপের রাজত্ব তিরোহিত হইল, পুণ্যের রাজত্ব আরম্ভ হইল।

অগ্নিকুল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

একবিংশতি পরিচ্ছেদ।

যে দিবস শৃঙ্গধর প্রভৃতির বধের আদেশ প্রচলিত হয় তাহার পর দিন অপরাহ্ন সময়ে পরেশনাথ জনৈক সেনানীকে বলিলেন ‘পৌত্তলিকগণের যে যে বন্দী আছে তাহাদিগকে লইয়া আইস।”

দুর্ভাগ্যবশতঃ সেনানী উপস্থিত ছিল না, সুতরাং তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ মাত্র অবগত ছিল, শেষে কি হইয়াছিল জানে না, সবিনয়ে নিবেদন করিল,—কল্য তাহাদের প্রাণদণ্ড হইয়াছে।’

এই কথা শুনিবামাত্র পরেশনাথ অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন, বৈরক্তি এবং ক্রোধে কাঁদিতে লাগিলেন ও ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া বলিলেন,—‘প্রাণদণ্ড!—ভয়ানক কথা, সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশ!! বন্দী আশ্রিত, নিরস্ত্র, তাহাদের প্রাণদণ্ড!! কস্মিন কালে হইতে পারে না। কাহার সাধ্য এরূপ কার্য্য করিতে পারে? কাহার আদেশে হইল, কে করিল, বৌদ্ধগণ কি চর্ম্মকার হইয়াছে?—আমি আজ আগুন জ্বালাইব, সর্ব্বনাশ করিব,—যাহার আদেশে, যাহা কর্ত্তৃক এই ভয়ঙ্কর কার্য্য হইয়াছে তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিব। সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!!!’

উপস্থিত সেনানী পুরাতন লোক, পরেশনাথের প্রকৃতি তাহার বিশেষরূপে জানা ছিল। সুতরাং ভীত না হইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিল—

‘আপনারই আদেশে এরূপ কায হইয়াছে?’

পরেশনাথ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—‘আমার আদেশে হইয়াছে কখন

নয়, কখন নয়, কোন্ নির্ব্বোধ উহা পালন করিল, কোন্ নরাধমকে আদেশ করিয়াছিলাম?—সে কি জানে না পরেশনাথ কাহারও প্রাণ লইবার কর্ত্তা নহে? সে পিশাচ কি জানে না মারিলে আর বাঁচান যায় না? পরেশনাথের আদেশে এ পর্য্যন্ত কাহারও প্রাণবধ হয় নাই—এ নূতন লোক, নরপ্রেত, কে সে? কাহাকে আদেশ করিয়াছিলাম?' এই বলিয়া পরেশনাথ নীরবে উদ্বিগ্নভাবে চিন্তা কিম্বা অনুশোচনা করিতে লাগিলেন, তাহার বদন এখন ক্রোধভাব ছাড়িয়া গভীর বিষন্ন হইল, হস্ত পদ শিথিল হইল, নয়ন বাষ্পভারাক্রান্ত হইল।

এইভাবে অনেকক্ষণ থাকিয়া পরেশনাথ কাতরে বলিলেন,—'সৈনিক! আমারই আদেশে তবে এ কায হইয়াছে,—কোন্ অযোগ্য ও মূঢ় আমার আদেশ পালন করিয়াছে?'

সৈনিক বলিল, 'দ্বিতীয় সেনাপতি।'

পরেশনাথ বলিলেন, 'কি বেদঘ্ন?—যাও তুমি এখনি তাহাকে ডাকিয়া আন?'

* * * *

বেদঘ্ন ও চারিজন বৌদ্ধ প্রচারক একত্র হইয়া অদ্য দুর্গের বহির্ভাগে বেড়াইতেছেন। নিদাঘ বৈকাল, নিবীড় সূর্য্যরশ্মি, বৃক্ষ রাজির শিরোদেশ সুবর্ণমণ্ডিত করিয়াছে। তন্নিম্নভাগ ছায়াযুক্ত এবং সুশীতল। সেই শীতল বৃক্ষতল তাহাদের ভ্রমণ স্থান হইয়াছে।

প্রচারক চতুষ্টয়ের একজন অশীতিপর বৃদ্ধ, তাহার নাম চৈত্ররথ, চৈত্ররথ বলিলেন 'এই সুশীতলময় স্থান প্রধান সেনাপতির একটি প্রধান কীর্ত্তি-তীর্থ স্বরূপ'!

সূর্য্যনাথ বেদঘ্নের শত্রু। বেদঘ্নের তিনি কদাচ অনিষ্ট করেন নাই, তথাপি তিনি শত্রু। সূর্য্যনাথের এক দোষ, তিনি বীর, বলবান, সুন্দর, এবং প্রধান সেনাপতি। তাহার দ্বিতীয় দোষ পরেশনাথ তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ করেন। তৃতীয় দোষ, তাহার বাহিরে ভিতরে কি অন্তঃপুরে কখনও যাইবার বাধা নাই। চতুর্থ কুঙ্কুমসুন্দরী তাহাকে ভাল বাসেন। পঞ্চম দোষ অনেক বড় বড় কার্য্য প্রভুর বিনা অনুমতিতে করিয়াও প্রশংসিত হন। এইরূপ আরো অনেক দোষ তাহার বলা যাইতে পারে।

বেদঘ্ন চৈত্ররথের একথা শুনিয়া ঈর্ষায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, পরে বলিলেন, 'কেন কার এমন কি কীর্ত্তি এখানে আছে?"

চৈত্র, 'এইখানে এক পৌত্তলিক তাহাকে বধজন্য তীর মারিয়াছিল।'

বেদ, 'তার পর?'

চৈত্র, 'তাহাকে তিনি ধৃত করিলেন।'

বেদ, 'পরে বধ করিলেন কেন'?

চৈত্র, 'আমরা হইলে তাহাই সম্ভব ছিল। তিনি তাহা না করিয়া সদুপদেশ দিয়া তাহাকে ক্ষমা করিলেন, এবং মুক্তি দিলেন।'

বেদ, 'সেনাপতির পশু তুল্য ব্যবহারও অনেক আছে।'

চৈত্র, 'একটিও নাই'।

এই সময় তিন জন প্রচারক এবং বেদঘ্ন একযোগে বলিলেন, 'আছে।'

চৈত্র, 'বল ?'

বেদ, 'বলিতে সাহস হয় না'।

চৈত্র। 'নির্ভয়ে বল'।

বেদ। 'মাতৃতুল্য যিনি, তাঁর প্রতি স্ত্রীভাব জন্মান কি ভয়ঙ্কর কথা নহে ?'

চৈত্র। 'বুঝিয়াছি, একথা কুঙ্কুমার প্রতি আরোপ করিতেছ'।

বেদ। 'ছোটলোককে প্রশ্রয় দিলে ইহাই হইয়া থাকে'।

বৃদ্ধ চৈত্ররথ ক্রুদ্ধ হইল। বলিল 'বেদঘ্ন সূর্য্যনাথ পবিত্র, ব্যভিচারাশক্ত নহে। কুঙ্কুমা সাবিত্রী তুল্যা। আর সূর্য্যনাথ ছোট লোকও নহে'।

বেদ। 'প্রমাণ কি'?

চৈত্র। 'যদি স্থিরভাবে এখানে বসিয়া শুন তবে সপ্রমাণ সকল বলিব'।

এই কথা শুনিয়া সকলেই আগ্রহ সহকারে তথায় কতগুলি গলিত পত্র সংগ্রহ করিয়া উপবেশন করিলেন।

চৈত্ররথ বলিতে আরম্ভ করিলেন! সূর্য্যনাথ রাজ মহেন্দ্রীর চালুক্য রাজার তৃতীয় পুত্র। ইহার দশম বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে এক সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিয়া বলেন, 'এ বালকটি সর্ব্ববিদ্যায় ভূষিত হইয়াও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে।' রাজা এই কথা প্রত্যয় করিয়া তাহাকে সৌরাষ্ট্রে মাতুলালয় পাঠাইয়া দেন। মাতুল ইহাকে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করাইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা প্রদান করেন। রাজাও সেই উদ্দেশে পাঠাইয়াছিলেন। সূর্য্যনাথ অল্প সময়ের মধ্যেই পণ্ডিত হইলেন। কিন্তু শিক্ষার সঙ্গেসঙ্গে তাহার অনেক কুসংস্কার দূর হইল। তিনি বেদ অধ্যয়ন করিলেন, মন তথাপি পরিষ্কার হইল না। ক্রমে চার্ব্বাক, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, প্রভৃতি দর্শন, গোপনভাবে আর একজন পণ্ডিতের নিকট পাঠ করিলেন। তিনি যত পাঠ করেন ততই ধর্ম্মসম্বন্ধে সন্দিহান হন। এই সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটিত হয়।

তুঙ্গবেনার রাজা পরেশনাথের ধর্ম্মভাবে মোহিত হইয়া স্বীয় বালিকা কন্যাকে তাহার সহিত বিবাহ দেন। ইহার কিছুদিন পরেই পরেশনাথ একবারে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেন। তুঙ্গবেনার রাজাও সৌরাষ্ট্রে বিবাহ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে কন্যাকে মাতুলালয়ে পাঠাইয়া দেন। এই মাতুলালয় এবং সূর্য্যনাথের মাতুলালয় পরস্পর অতি নিকট। আমাদের কর্ত্রী কুঙ্কুমা ঠাকুরাণীই তুঙ্গবেন রাজার দুহিতা। সূর্যনাথ এবং কঙ্কুম এক বয়সী। একস্থানে বাস, এক সঙ্গে আহার, একত্র ভ্রমণ, বাল্যকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। এ অবস্থায় প্রীতি এবং পরস্পরে সৌহার্দ্দ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। উভয়ের যৌবন কাল উপস্থিত হইল। উভয়ের প্রণয়ও ক্রমে দৃঢ় হইতে চলিল। কুঙ্কুমের মাতুল কুঙ্কুমের বিবাহের কথা জ্ঞাত ছিলেন না। সুতরাং তাহার পিতার নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন যে 'কুঙ্কুমের

যৌবন কাল উপস্থিত এখন বিবাহ দেওয়া উচিত। আমি ভাল বর নির্ব্বাচন করিয়াছি'। বর আর কেহ নহে সূর্য্যনাথ। পত্রবাহক ফিরিয়া আসিল। উত্তর আসিল 'সাবধান কন্যা বিবাহিতা, সংসার বিরাগী রাজর্ষী পরেশনাথ আমার জামাতা, এই পত্র পাইয়া কুস্কুমের মাতুল বিষাদে মলিন হইলেন। স্ত্রীকে বলিলেন, 'কুস্কুমকে বলিও সে বিবাহিতা, সূর্য্যনাথের সহিত বিবাহ হইতে পারিবে না'।

একথা কুস্কুম শুনিলেন,—শুনিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। সূর্যনাথ ক্রমে দুই দিন তাহার সাক্ষাত পাইলেন না। পরে একদিন কস্কুম আপনি তাহার সহিত সাক্ষাত করিয়া অবস্থা বিবৃত করিলেন এবং সূর্য্যনাথের হাত ধরিয়া বলিলেন,—'সূর্য্যনাথ! আমি বিবাহিতা কিন্তু নাজানিয়া তোমাকে ভাল বাসিয়াছি, মনে মনে তোমাকে স্বামী রূপে পূজা করিয়াছি—এ পাপ কিসে নিবারিত হইবে?'। সূর্য্যনাথ কান্দিতে ছিলেন হঠাৎ বলিলেন—'বিচ্ছেদে'। মহাপাপ, তুষানলে দগ্ধ হইলে শান্তি হয়। প্রগাঢ় প্রণয়ের পূর্ণ বিচ্ছেদ তুষানল হইতে কম নহে,—বিচ্ছেদে প্রণয় পাপের শান্তি হইবে,—ইহা মনে করিয়া কুক্কম আশাযুক্ত হইয়া ওড়নায় চক্ষুর জল মুছিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার কালে কেবল বলিলেন—'এই তবে আমার প্রায়শ্চিত্ত'।

সূর্য্যনাথের আশার আলোক কিন্তু এখনও নিবিয়া যায় নাই। চার্ব্বাক দর্শন প্রভৃতি নানাবিধ প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া তাহার চিত্ত সন্দিগ্ধ। তিনি মনে করিতেছিলেন, 'যাহার বিবাহ অজ্ঞাত, অনীপ্সিত, এবং যাহার সেই নামমাত্র স্বামী সংসার ত্যাগী,—এবং স্ত্রী ত্যাগী —তাহাকে বিবাহ করিব—বাধা কি,—সমাজ বাধা জন্মায় দুইজনে না হয় অরণ্যে বাস করিব। কুস্কুমকে বিবাহ করিব'। কত দিন কতমাস কাটিয়া গেল, তথাপি কুস্কুম সূর্য্যনাথকে দেখা দেন না। অনেকদিন পরে বহুচেষ্টার ফলে তাহার সহিত দেখা হইল। সূর্য্যনাথ, তাহাকে অনেক উপদেশ দিল অনেক বুঝাইল—কিন্তু তাহার মন অটল। সূর্য্য বলিল 'সমাজ পরিত্যাগ করিব, সংসার পরিত্যাগ করিব, সৌরাষ্ট্র পরিত্যাগ করিব, যে খানে পরিচিত লোক সে খানে যাইব না, তথাপি—তোমাকে বিবাহ করিব'।

কস্কুম বলিলেন, নিষ্ঠুরার ন্যায় বজ্রবাক্যে বলিলেন, 'আমার জন্য আত্মহত্যা করিলেও আমাকে বিবাহ করিবার আর তোমার আশা নাই'।

সূর্য্যনাথ কান্দিলেন, কান্দিয়া বলিলেন, —'কুস্কুম, তবে আমাকে কি বধ করিবে?'।

কুস্কুম। 'অনুচিত কিসে?'

সূর্য্য। 'তাহাই তবে কর,'।

কুস্কুম। 'আমার নিষ্প্রয়োজন, অন্য লোকের চেষ্টা কর?'।

সূর্য্যনাথ, 'তবে এই চিরকালের জন্য বিদায় হই' বলিয়া—তখনই দ্বিতীয় বস্ত্র আর না লইয়া সৌরাষ্ট্র হইতে পলায়ন করিলেন। কেহ তাহার অনুসন্ধান পাইল

না। দশ দিন পর জনরব উঠিল,সূর্য্যনাথকে ব্যাঘ্রে মারিয়াছে। এ সংবাদে—কুঙ্কুম দুই দিন অজ্ঞান হইয়াছিলেন।

এদিকে সূর্য্যনাথ দিবারাত্র সমভাবে দুই দিন চলিয়া সন্তার গ্রামে এক বৌদ্ধ প্রচারকের বাড়ীতে উপনীত হইলেন,—তিনি তাহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মশিক্ষা দিতে লাগিলেন। সূর্য্যনাথ অল্প দিনের মধ্যেই ধর্ম্মপাদ, শুক্রনীতি এবং নবধর্ম্ম প্রভৃতি একাদশ খানী গ্রন্থ সুচারু রূপে পাঠ করিলেন। বৌদ্ধ প্রচারকের সদ্‌গুণ, সদ্ব্যবহার, এবং সদুপদেশে তাহার মন সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইল। এবং তিনি অচিরে বৌদ্ধ হইলেন। বৌদ্ধ হইয়া অষ্টাদশ মাস পর, সেই প্রচারকের সঙ্গে সূর্য্যনাথ আসিয়া পরেশনাথের মহিমালোকে অবতীর্ণ হন। এবং কুঙ্কুম ঠাকুরানীকেও পরেশনাথের অন্তঃপুরে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হন’।

প্রচারক ত্রয় এবং বেদঘ্ন শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। বেদঘ্ন বলিল,—‘আপনি দিব্য একটি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন’!

চৈত্ররথ বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—‘বোধহীন, আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করিয়াছ?’

- বেদঘ্ন,—‘আপনি সত্যবাদী, কিন্তু এটি যখন শুনা কথা তখন অবশ্যই আপনি, মিথ্যাবাদী কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই।’

চৈত্র (ক্রোধে) ‘আমিই সূর্য্যনাথের সেই ধর্ম্মোপদেষ্টা, আমিই সূর্য্যনাথকে আনিয়াছি।’

বেদ, ‘মানিলাম; সৌরাষ্ট্রের গুহ্য কাহিনী কিরূপে জানিলেন?’

চৈত্র (হাসিয়া) ‘পাগল, সৌরাষ্ট্রে আমার কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। আমার কন্যা কুঙ্কুমা মাতার সখী—তিনি সকল গুহ্য কথাই তাহাকে বলিয়াছেন, সে আমাকে বলিয়াছে।’

এই সময়ে সৈনিক বেদঘ্নের অনুসন্ধান করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বেদঘ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কিজন্য আসিয়াছ?’ সৈনিক বলিল,‘প্রভুজী আপনাকে এখনই যাইতে বলিয়াছেন’। এই কথা শুনিয়া সকলেই ত্রস্ত ভাবে দুর্গাভিমুখে চলিল।

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ।

বেদঘ্ন—পৈত্রিক বৌদ্ধ, তাঁহার শিক্ষা সামান্য, তিনি সামান্য সৈনিক হইতে দ্বিতীয় সেনাপতি পদে ক্রমে উন্নীত হইয়াছেন। তিনি নিষ্ঠুর, স্বকার্য্য তৎপর, পরেশনাথের একান্ত আজ্ঞাকারী,—এবং ধর্ম্মে অন্ধ বিশ্বাসী। পরেশনাথ এই শেষোক্ত দুই কারণে তাহার প্রতি অধিক সন্তুষ্ট। সুতরাং বেদঘ্নের আশা অতি প্রবলা এবং উচ্চ। এখন কেবল সূর্য্যনাথই তাহার উচ্চে উঠিবার পথ-কণ্টক। এজন্য তিনি সূর্য্যনাথের অধীন হইয়াও তাহার প্রতি মনে মনে সন্তুষ্ট নহেন। পরেশনাথ সূর্য্যনাথের সহিত কথা বার্ত্তা কহিলে তা-

হার হিংসা হয়, অপর কোন ব্যক্তিকে পরেশনাথ ভাল বাসিলেও তাহার কষ্ট ও হিংসা হয়। তখন তাহার কুৎসিত পশু-তুল্য, বা গণ্ডার তুল্য অতিদীর্ঘ নাশার অগ্রভাগস্থ লোম গুলিন স্ফীত হয়। গো-তুল্য চক্ষুর্দ্বয় চক্রাকারে ঘুর্ণিত হয়। তাহার পাণ্ডুবর্ণ শূকরবৎ কুৎসিত বদন ঈষৎ তাম্রাভ হয়। রজত কোদালীবৎ উচ্চ দন্ত শ্রেণী যেন আরো একটু উচ্চ দেখায়। এবং পেচক ললাট সদৃশ ক্ষুদ্র ললাট রেখাযুক্ত হয়।

এই মহাপুরুষের অভিলাষ সকলে তাহাকে সর্ব্ব বিষয়ে পণ্ডিত মনে করুক। মূর্খত্ব সত্ত্বেও ইহার উহার নিকট শুনিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিতেন। নিম্নদরের লোকে মনে করিত, দ্বিতীয় সেনাপতি ব্যাকরণ, চিকিৎসা, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, যুদ্ধপালি, সংস্কৃত, মৈথিলী, দ্রাবিড়ি, প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে এবং সর্ব্বভাষায় সুশিক্ষিত। বুদ্ধিমান্ লোকে তাহার উচ্চপদ জন্য ভয় করিয়াও তাহার বৃথা গর্ব্ব এবং মিথ্যা পাণ্ডিত্যাভিমান দেখিয়া তাহাকে উপহাস ও ঘৃণা করিতেন।

আজ বেদঘ্ন ধীরে ধীরে যাইতেছেন, এবং প্রশস্ত দন্তপংক্তি বাহির করিয়া মধুর মধুর হাসিতেছেন। মনের ভাব, ' আমি বড় লোক বড় লোকের কাছে যাইতেছি, অন্যের সাধ্য কি ?' হাসির আরো কারণ আছে। সৈনিক সকল কথা বলিয়াছে তিনি তাহা শুনিয়া সূর্য্যনাথকে প্রভুর নিকট অপদস্থ করিবেন এমন একটি উপায়ও মনে মনে স্থির করিয়াছেন। যাহাহউক তাঁহার ধর্ম্মগৃহে যাইতে অধিক বিলম্ব হইল না,—পরেশনাথের গৃহই ধর্ম্মগৃহ নামে চিহ্নিত।

এদিকে পরেশনাথ বিলম্বে অধৈর্য্য হইয়া একবার এদিকে একবার ওদিকে পাদচারণ করিতেছেন। বেদঘ্ন আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন। বেদঘ্নকে দেখিয়া তিনি গর্জ্জিয়া বলিলেন ' বেদঘ্ন, নরঘ্ন, হিংস্র, শার্দ্দূল আমাকে আর কি তোমার মুখ দেখিতে বল ?

বেদঘ্ন হাসিতে হাসিতে করযোড়ে নিবেদন করিলেন, প্রভু আমার কি অপরাধ হইয়াছে ?

পরেশনাথ দুই হস্তে চক্ষু ঢাকিয়া বলিলেন 'ভল্লূক ; বন্দিদ্বয়কে বধ করিয়াছিস।'

বেদঘ্ন বিনীতভাবে, নাসিকা উচ্চ করিয়া বলিলেন, ' প্রভু এই জন্য দাসের প্রতি অপ্রসন্ন, দাস বন্দিদ্বয়কে বধ করে নাই ; প্রভুর দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষায় তাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের এক গাছি কেশেরও অপচয় হয় নাই '।

এ সংবাদে পরেশনাথ এত সন্তুষ্ট হইলেন যে তৎক্ষণাৎ তিনি ' পুত্র ! দীর্ঘায়ু হও ' বলিয়া বেদঘ্নকে সস্নেহ আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর এই অসাধারণ অনুগ্রহ লাভ করিয়া বেদঘ্ন নাসিকা কণ্ডূয়ন করিতে করিতে অগ্রভাগের কিয়ৎ পরিমাণ চর্ম্ম উঠাইয়া ফেলিলেন। সুখ বা আনন্দ উপলব্ধি হইলেই বেদঘ্ন নাসিকা মর্দ্দন করিতেন।

পরেশনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন 'বন্দিদ্বয় কোথায়'?

বেদঘ্ন বলিলেন—'কারাগারে'। সৈনিক এই কথা শুনিয়া বলিল কারাগার আমি অল্পক্ষণ হইল দেখিয়া আসিয়াছি; কারাগারে নাই।

পরেশনাথ বেদঘ্নের দিকে চাহিয়া বলিলেন 'কেমন ?'

বেদঘ্ন কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'বোধ হয় তাহারা সেনাপতির গৃহে।'

পরেশনাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন 'কি, সেনাপতির গৃহে ?'

বেদ। 'সেনাপতি স্বগৃহে তাহাদিগকে লইয়া প্রায়ই আমোদ প্রমোদ করেন।

পরেশ। কিরূপ আমোদ প্রমোদ ?

বেদ। 'তাহাদের গান শ্রবণ করেন, তাহাদিগকে পূজা করিতে দেন।'

পরেশ। 'কারাগারের প্রহরী এবং রক্ষক তাহাদিগকে যাইতে বাধা জন্মায় না'?

বেদ। প্রভুর অতিরিক্ত অনুগ্রহে তাহাকে সকলেই ভয় করে, আমরা বাধ্য হইয়া সেনাপতির অবৈধাচার সহ্য করি।

এইসময়ে সেনাপতি সূর্য্যনাথ আসিয়া পরেশনাথকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলেন।

সেনাপতির স্ফূর্ত্তিযুক্ত প্রসন্ন বদন, বীরত্ব ব্যঞ্জক স্থূলোন্নত মোহন শরীর এবং প্রগাঢ় সৌন্দর্য্য দেখিয়া বেদঘ্ন লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন।

পরেশনাথ সেনাপতির অসাক্ষাতে যতটুকু বিরক্ত হইয়াছিলেন, এখন তাহার বীরোচিত সৌন্দর্য্য, সহাস্য মুখকান্তি এবং প্রশস্ত ভাব অবলোকন করিয়া তাহা ক্ষয় হইয়া গেল। বাৎসল্য, স্নেহ ও আনন্দ সেই অস্থায়ী বৈরক্তির স্থান পূর্ণ করিল। উহা দেখিয়া বেদঘ্নের মুখ শুকাইয়া গেল। সূর্য্যনাথের সহিত আপন দূরত্ব অনুভব করিলেন। সূর্য্যনাথও বেদঘ্নের মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে বেদঘ্ন মন্দ অভিপ্রায়ে তথায় আসিয়াছে, এরূপ দর্শন দূরীকরণ মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই নিষ্পন্ন হইল। পরেশনাথ সূর্য্যনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'বন্দিদ্বয় কোথায় ?'

সূর্য্যনাথ বলিলেন 'মুক্ত'

পরেশনাথ, (বিস্ময়ে) 'কাহার আদেশে'।

সূর্য্য। 'আপনার'।

পরেশ। 'আমার স্মরণ হইতেছে না।'

সূর্য্য। 'না হইতে পারে।'

পরেশ। 'আমি অনুমতি দিই নাই।'

সূর্য্য। 'অনুমতি দিয়াছেন।'

পরেশ। না।

সূর্য্যনাথ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—

'আপনি প্রধান, যাহা কিছু করা হয় সমস্তই আপনার উদ্দেশ্যে এবং সত্যধর্ম্ম বিস্তার উদ্দেশ্যে, আমাদের ইহাতে স্বার্থ নাই, তথাপি আপনার এরূপ সন্দিগ্ধ ভাব ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবে। আপনার স্মৃতি দোষ ঘটিয়াছে, যাহা এখন আদেশ করিলেন এক দণ্ড পরেই তাহা ভুলিয়া

যান, এরূপ অবস্থায় কায কর্ম্ম কিরূপে চলিতে পারে। যদি আমার কথা বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে আপনি অবশ্য স্বীকার করিবেন আপনার আদেশমত সকল কার্য্য করিয়া থাকি। যদি আমার কিংবা অন্য কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারেন তবে বলুন, আমরা কল্য হইতে প্রত্যেক সামান্য বিষয়ের জন্যও আপনার অপেক্ষা করিব; এবং সর্ব্ব বিষয়ে আপনার নিজহস্ত-লিখিত আদেশ বাঞ্ছা করিব। আপনি বিশ্বাস না করিলে অন্ততঃ মান ও প্রাণের ভয়ে আমাদিগকেও অবিশ্বাস করিতে হইবে। আর যদি পরের কথায় আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তাহাও বলুন, আমি এখনই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।'

পরেশনাথ অপ্রতিভ হইলেন, এবং কোমলস্বরে বলিলেন,—'সূর্য্যনাথ! আমাকে বিপদবেষ্টিত দেখিয়া কি ছাড়িয়া যাইবে,—পিতায় সন্তানের এবং সন্তান পিতার আবদার কি সময়ে সহ্য করে না?,

সূর্য্যনাথ পূর্ব্বভাবেই বলিলেন, 'আবদার মারি কি গালি, সামান্য কথা,—জীবনের সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতে এবং সকল সুখ বর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু আপনার মুখে অবিশ্বাসের কথা তিলার্দ্ধ কালের জন্যও সহ্য করিতে পারিব না।

পরেশনাথ একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'এ সময়ে কি বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া উচিত হইয়াছে?'

সূর্য্য। 'আপনার আদেশে দিয়াছি।'

পরেশ। 'তাহাই হইল। আমি ভাল কি মন্দ আদেশ করিলাম এটাত বিবেচনা করা উচিত ছিল?'

সূর্য্য। 'আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়াই দিয়াছি।'

পরেশ। 'যদি অনিষ্ট হয়?'

সূর্য্য। 'আমার রক্ত মাংসে সে অনিষ্ট সংশোধন করিব।'

পরেশনাথ আর অধিক কিছু না বলিয়া সূর্য্যনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন 'এখন যাইতে পার?'

সূর্য্যনাথ বিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। বুঝিলেন যে বিরক্ত করিয়া এবং বিরক্ত হইয়া আসিলেন। বিচ্ছিন্ন সুখে নহে, অসন্তোষে হইল।

সূর্য্যনাথ প্রস্থান করিলে বেদঘ্নের স্ফূর্ত্তি হইল। তাহার বিশাল নাশা স্ফীত ও বিশাল দন্তশ্রেণী ওষ্ঠ ভেদ করিয়া শিরোত্তোলন করিল।

পরেশনাথ বলিলেন, 'বেদঘ্ন এ সময় এই বন্দিদ্বয়কে মুক্তি দেওয়া কি সঙ্গত হইয়াছে?,

বেদঘ্ন উত্তর করিবার পূর্ব্বে দন্ত ও নাসিকা বিকৃত করিয়া একবার কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইলেন, পরে বলিলেন, 'অতি অন্যায় এবং অবোধের কার্য্য হইয়াছে, ইহার ভিতরে আরো কিছু অসমসাহসিকতা আছে।,

পরেশনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—'কি অসমসাহসিকতা?,

বেদঘ আবার গলা পরিষ্কার করিয়া

বলিলেন, 'বলিতে সাহস হইতেছে না।'

পরেশ। 'যথার্থ হইলে নির্ভয়ে বলিবে, সাবধান মিথ্যা বলিও না, আমার ক্রোধ বিষম তাহা তুমি জান।'

বেদ। 'বন্দিগণের সহিত গুপ্ত পরামর্শ হইয়াছে, পৌত্তলিকগণের সহায়তা করা হইবে।'

পরেশ। 'অসম্ভব, ইহাতে কি স্বার্থ আছে?'

বেদ। 'পৌত্তলিক সেনাপতির ভগিনীকে বিবাহ করিবেন।

পরেশ। 'অসাধারণ বিস্ময়কর, অসম্ভব। অন্য কেহ হইলে বিশ্বাস করিতাম। সূর্য্যনাথ ইহা করিতে পারে না, কথনও নয়, সূর্য্যনাথ,—ও—না, সূর্য্যনাথ আমার দক্ষিণ হস্ত, সূর্য্যনাথ বিশ্বাসী, সূর্য্যনাথ পণ্ডিত, বিবেচক, জিতেন্দ্রিয়।,

বেদ। 'সেনাপতিকে আপনি চিনিতে পারেন নাই, ইনি অবিশ্বাসী, অবিবেচক, স্বার্থপর এবং অশুদ্ধ চরিত্র।, বলিতে লজ্জা করে আপনার অন্তঃপুরই সেনাপতির ব্যভিচার এবং বিলাসের স্থান, ইহা আপনি জানেন না।'

এখনও পরেশনাথ ক্রোধে অগ্নিতুল্য হইয়া উচ্চরবে বলিতে লাগিলেন, 'বেদঘ্ন! তুই কুক্কুর, নিন্দুক, তুই সূর্য্যনাথের নিন্দা করিতে যাইয়া আমারই সাক্ষাতে রাজকুমারী কৃষ্ণমার দুর্ণাম করিতেছিস্, এত বড় সাহস, নরাধম এখনই বিশিষ্ট প্রমাণ দেখাইতে হইবে। নচেৎ এই দণ্ডে, যে মুখে বলিলি, ঐ মুখের শাস্তি করিব।'

বেদঘ্নের মুখ শুষ্ক হইল। কিন্তু তথাপি বেদঘ্ন ঠকিবার লোক নহেন, কিছু কাল চিন্তা করিয়া এবং নাসিকা কণ্ডূয়ন করিয়া বলিলেন, 'প্রভো! আমার উপর বৃথা রাগ করিতেছেন, আমি কর্ত্রী মাতার কথা বলি নাই, আপনি গুপ্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখুন অন্তঃপুরে বাহিরের কোন স্ত্রীলোক আছে কি না? এবং সে যুবতী ও সেনাপতি কর্তৃক আনীত কি না।

পরেশনাথের বদন গম্ভীর হইল. দুই চারিপদ নীরবে বেড়াইয়া তাহার বালক ভৃত্যকে ডাকিলেন,—'বেটা, বেটা,—তাহাকে বেটা বলিয়াই পরেশনাথ ডাকিয়া থাকেন। বেটা আসিয়া উপস্থিত হইল।

পরেশনাথ বলিলেন, 'বেটা নূতন কোন যুবতীকে অন্তঃপুরে দেখিয়াছ?

'দেখিয়াছি।'

'বয়েস?'

'১৪ কি ১৫।'

'নাম?'

'সত্যবতী।'

'কিরূপে আসিল?,

'সেনাপতি আনিয়াছে।,

'কিরূপে আনিয়াছেন?'

'জানি না।'

'আমায় বল নি কেন?'

'আপনি জানেন এই মনে করিয়া।'

'এখনও কি আছে?'

'আছে।'

পরেশ নাথের গম্ভীর বদন আবার প্রদীপ্ত হইল। কিছুকাল বেদঘ্নের প্রতি

দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, 'বেদঘ্ন!—তুমি মিথ্যা বল নাই—তোমাকে কি পুরস্কার দিব,—বেদঘ্ন আমি সূর্য্যনাথকে আর বিশ্বাস করিতে পারি না, কি করিব,—সূর্য্যনাথের মস্তকচ্ছেদন করিব,—সে দুরাচার—বৌদ্ধকলঙ্ক, অকৃতজ্ঞ—বেদঘ্ন! উত্তর করিও না চুপ করিয়া শুন,—আমার উপদেশ পালন কর—তোমাকে সেনাপতির কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। সূর্য্যনাথ'—যাহাকে পুত্রের অধিক স্নেহ করিয়াছি,—এই বলিয়া কতক্ষণ নিস্তব্ধ এবং নির্ব্বাক, হইয়া রহিলেন, এই সময়ে বেদঘ্ন আনন্দে অধীর হইয়া নাসিকা কণ্ডুয়ন করিতে করিতে বলিলেন, 'প্রভো?'

পরেশনাথ ঐ সম্বোধনে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন,—'উত্তর করিও না, কথা কহিও না, আমাকে বলিতে দাও'—এই বলিয়া আবার কতক্ষণ পাদচারণ করিয়া বলিবেন—'বেদঘ্ন যাও—শীঘ্র যাও—এখনই যাও,—সূর্য্যনাথ অবিশ্বাসী, ব্যভিচারী,—তাহার প্রাণদণ্ড অনুমোদনীয়।'

যে সৈনিক বেদঘ্নকে ডাকিয়া আনিয়াছিল, তাহার নাম 'বর্ম্মধর'—বর্ম্মধর এতক্ষণ চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল—বেদরেঘ্ন ভয়ে এবং নিজ ক্ষুদ্র পদ মনে করিয়া কিছুই বলে নাই। কিন্তু এখন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। দুই পদ অগ্রসর হইয়া নতজানু হইল এবং পরেশ নাথের পাদ স্পর্শ করিয়া বলিল—'ধর্ম্মরাজ, সর্ব্বনাশ করিবেন না, সেনাপতির দোষ এখনও অপ্রমাণিত। সেনাপতির বিপদ ঘটিলে আপনার বিপদ ঘটিবে—দুর্গ শূন্য হইবে,—ধর্ম্ম বিস্তার ভার হইয়া উঠিবে।'

বেদঘ্ন বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন 'বর্ম্মধর, তোমার অনধিকার চর্চ্চা অসহনীয়'।

বর্ম্মধর ক্রোধ করিয়া বলিল— 'এই বর্ম্মধর একদিন প্রচারক ছিল,—তুমিই তাহার অধোগতির কর্ত্তা, সেনাপতি তোমার নিকট কি দোষ করিয়াছেন।'

বেদঘ্ন ক্রোধ ভরে তাহাকে মারিবেন, হঠাৎ পরেশনাথের প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার চৈতন্য হইল। পরেশনাথ বলিলেন, 'বেদঘ্ন, না সৈনিক ভাল বলিয়াছে, প্রাণদণ্ড—সূর্য্যনাথের প্রাণদণ্ড, তাহা হইবে না, পুত্র হত্যার দোষে দুষী হইব না, এই বলিয়া নীরব হইলেন। উত্তরীয় বসনে চক্ষু মুছিয়া কিছুকাল চক্ষু মুদিয়া রহিলেন—'বেদঘ্ন আমার দুর্জ্জয় ক্রোধ এখন কমিয়াছে। অন্য আদেশ পর্য্যন্ত সূর্য্যনাথ কারাগারে বন্দী হইয়া থাকিবে। যাও সৈনিক, আমি তোমার কথায় সন্তুষ্ট হইয়াছি—বেদঘ্নের সঙ্গে যাও—বেদঘ্ন, যাও আমার আদেশ অদ্যাই পালনীয়।'

বেদঘ্ন যথা বিহিত সম্মান সহকারে আনন্দে বিদায় হইলেন, পশ্চাতে দুঃখ ভারাক্রান্ত হইয়া বর্ম্মধর ধীরে চলিল।

পরেশনাথ—পুনরায় ডাকিয়া বলিলেন বেদঘ্ন—সূর্য্যনাথ নির্দ্দোষী প্রমাণিত হইলে, এই উৎক্ষিপ্ত ক্রোধ রাশি তোমার স্কন্ধে বর্ষিত হইবে জানিও।'

ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যনাথ নিজ, গৃহে আহারে বসিয়াছেন একজন পরিচারিকা তাঁহার আহার্য্য আনিয়া দিয়াছে। আহারের উপকরণ আরম্বর শূন্য। একখানি রৌপ্য থালায় চারিখানি মালপুয়া, চারিখানি মোটারুটী কিছু সুপক্ক খর্জ্জূর, কয়েকটা সুপক্ক পেয়ারা অর্দ্ধখণ্ড পক্ক দাড়িম্ব—এক বাটী দুগ্ধ এবং, কিছু ছোলার ডাল। পানীয় একঘটি ঝরনা স্ফটিক।

সূর্য্যনাথ একখানি প্রস্তরাসনে স্বয়ং উপবেশন করিয়া আর একখানিতে আহারীয় দ্রব্য স্থাপন করিয়াছেন। অল্পদূরে রজত দীপাধারে দীপ জ্বলিতেছে। নিকটে একটি অগ্নিপাত্র প্রভূত ধুপাহুতি পাইয়া রাশি রাশি ধুম উদ্গীরণ করিয়া মশক দংশক দূরে ক্ষেপণ করিতেছে—উহার সুতীব্রগন্ধে গৃহ আমোদিত করিয়াছে। দ্বার এবং গবাক্ষ বন্ধ। উহার সংযোগ স্থান বস্ত্রে আবরিত হইয়াছে।

পরিচারিকা এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। এবং আহার কালে বলিতেছে 'মালপুয়া, কর্ত্তৃঠাকুরাণী আজ নিজেই প্রস্তুত করিয়াছেন।—একটিও তাঁহারই। ফল গুলিন কিন্তু তাঁর দেওয়া নয়?' সূর্য্যনাথ এই সময়ে ফলই খাইতেছিলেন—বলিলেন 'তবে কার?'

পরিচারিকা হাসিয়া বলিল—'সত্যবতী ঠাকুরাণীর। আমি যখন খাবার লইয়া আসি তখন তিনি—আমার সঙ্গে কিছু দূর আসিয়া এই ফল গুলিন থালায় দিয়া দৌড়িয়া গেলেন।'

সূর্য্যনাথ একটি ফল ও রাখিলেন না সব যত্ন পূর্ব্বক একে একে খাইলেন। একটি ফল থালা হইতে বাহিরে পড়িয়াছিল তাহাও খুটিয়া মুখে দিলেন। ইহা দেখিয়া পরিচারিকা কহিল,—'বেস, আমি তো ফল গুলি ফেলিয়াই দিতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু না ফেলিয়া ভাল করিয়াছি।'

সূর্য্যনাথ তাহার দিকে চাহিয়া হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, 'তুমি ফল ভাল বাস না,—যে—এমন সময়ে পদ শব্দ হইল সেই সঙ্গে কে গম্ভীর শব্দে বলিল—'দরজা খুলিয়া দাও?' সূর্য্যনাথের বাক্য সমাপ্তি হইল না।

পরিচারিকা উচ্চরবে বলিল, 'আহারে বসিয়াছে অপেক্ষা কর।'

অসহ্য আগন্তুক তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া পুনরায় দ্বারে আঘাত করিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিল, 'এখনই দ্বার খুলিয়া দাও নতুবা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিব।'

সেনাপতির দ্বারদেশে এরূপ গর্ব্ব বাক্য বলিবার কাহারও সাধ্য নাই, সুতরাং পরিচারিকা শত্রু উপস্থিত এই মনে করিয়া একান্ত ভীত এবং অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত প্রায় হইল সূর্য্যনাথ স্বর শুনিয়াই বুঝিতে পারিলেন বেদগ্ন বলিতেছে। এরূপ অসম্ভ্রম জনক বাক্য ও ব্যবহারে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'বেদগ্ন তুমি কি উন্মাদ হইয়া আসিয়াছ? যদি তাহা না হইয়া থাক, যাহা বলিবে তাহা ভদ্রভাবে বাহিরে

দাঁড়াইয়া বল, আহারে বসিয়াছি, প্রয়োজন হয় আহারান্তে দ্বার খুলিয়া দিব।”

বেদঘ্ন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, ‘তোমার নিকট আমি নিজ প্রয়োজনে কিংবা অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে আসি নাই, আজি বেদঘ্ন সেনাপতি সূর্য্যনাথ তাহার অনুগ্রহপ্রার্থী এবং বন্দী’।

সূর্য্যনাথ এই কথা শ্রবণ মাত্র আহার সমাপন না করিয়াই তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিলেন। এবং বলিলেন কি করিবে কর?, বেদঘ্ন মনে করিয়াছিলেন, সূর্য্যনাথ বন্দী হইবার সময় বাধা জন্মাইবেন, এই জন্য নিজ বাধ্যের ষোলজন বলবান সশস্ত্র সৈনিক পরিবেষ্টিত হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু সূর্য্যনাথের এবংবিধ স্নিগ্ধভাবে আত্মসমর্পণ করায় বিস্মিত হইলেন। তিনি সদল বলে গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াই বলিলেন, ‘বন্দীকে শৃঙ্খল বদ্ধ কর।,

তৎক্ষণাৎ একজন নিষ্ঠুর সৈনিক তাহার হস্তপদে শৃঙ্খল বদ্ধ করিতে লাগিল। সূর্য্যনাথ স্থিরচিত্তে তাহা সহ্য করিয়া বলিলেন, ‘নূতন সেনাপতি! আমাদের প্রধানের কি এইরূপই আদেশ হইয়াছে?,

‘আদেশ এইরূপই হইয়াছে, কিন্তু আমি ইচ্ছা করিলে এরূপ কষ্ট হইতে তোমাকে মুক্ত রাখিতে পারি, এই বলিয়া বেদঘ্ন স্বীয় মহত্ত্ব প্রদর্শন ভাবে সূর্য্যনাথের দিকে চাহিলেন।

সূর্য্যনাথ মানব চরিত্র বোধে পটু। বেদঘ্নের মানস বুঝিয়া হাসিয়া বলিলেন; ‘আমি নূতন সেনাপতির অনুগ্রহ চাহি না, পরেশনাথজীর আদেশ সর্ব্বাঙ্গীন পালন করিব।,

তবে তাহাই হউক বলিয়া নূতন সেনাপতি কিঞ্চিৎ রোষভাবে বলিলেন, বন্দীকে কারাগারে লইয়া চল,।

সূর্য্যনাথ সশস্ত্র সৈন্য পরিবেষ্টিত বন্দী হইয়া নীরবে কারাগারে চলিলেন।

পরিচারিকা অর্দ্ধভুক্ত খাদ্য সহ থালা ঘটি লইয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। শত্রু আসিয়া অনিষ্ট করিলে যতনা বিস্মিত হইত, পরিচারিকা সদল কর্তৃক সূর্য্যনাথের এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া অধিকতর বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া চলিল। গমনকালে যে কারায় সূর্য্যনাথ নিষ্ঠুরতা সহকারে নিক্ষিপ্ত হইলেন তাহা দেখিয়া গেল।

তাহার গমন কালে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া বেদঘ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘পরিচারিকে! সূর্য্যনাথের রক্ষিতা রমণী কি অন্তঃপুরে স্থান পাইবার যোগ্যা।,

পরিচারিকা বিরক্ত হইয়া বলিল ‘সূর্য্যনাথের রক্ষিতা কোন রমণী অন্তঃপুরে নাই; সূর্য্যনাথ সাধারণ লোকের মত নহেন।,

বেদ। ‘বুঝিয়াছি তুমিও তাহার বাধ্য, কিছু বলিবে না,।

পরি। তুমি বল পূর্ব্বক কি মিথ্যা কথা লইতে চাহ?,

বেদ। ‘বলে কি ছলে লই কালি বুঝিতে পারিবে। অন্তঃপুর হইতে তাহাকে বাহির করিব।,

পরি। (হাসিয়া।) আমি তাহার উপায় করিয়া দিব।

বেদ। 'এখনই গোপন করিতেছিলে, আবার উপায় করিয়া দিবে বলিতেছ ইহার তাৎপর্য্য কি?,

রমণী হাসিয়া বেদঘ্নের মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিল 'তোমার উপকার করিতে আমার স্বার্থ আছে।

পরিচারিকা সুবদনা, বয়সও তাহার এমন অধিক নহে। তাহার মুখখানী বেদঘ্ন মিষ্ট দেখিলেন, তাহার হাস্যে ও কটাক্ষে বেদঘ্ন পীড়িত হইলেন। ভগ্ন স্বরে চুপে চুপে বলিলেন, 'তুমি আমার সহায়তা করিলে তোমাকে আর পরিচারিকা বৃত্তি করিতে হইবে না'।

পরিচারিকা আরো হাসিয়া আরো চক্ষু নাচাইয়া বলিল 'আমিত তাই চাই' বেদঘ্ন মোহিত হইয়া বলিলেন, 'যাও কাল দেখা পাইব তো?'

'আজ রাত্রি শেষে বাগানে যাইও' বলিয়া আর দুই চমক হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া পরিচারিকা প্রস্থান করিল। বেদঘ্ন তাহার দিকে হা করিয়া তাকাইয়া রহিলেন।

চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদ।

রজনী প্রায় এক প্রহর হইয়াছে রজনী ঘোরা তিমিরময়ী। আকাশে আজ চাঁদ নাই কেবল সংখ্যাতীত নক্ষত্র ও নীহারিকা পুঞ্জ বিরাজ করিতেছে। এক চন্দ্রের কার্য্য শত লক্ষ নক্ষত্রেও করিতে পারিতেছে না,—সব আঁধার। বৌদ্ধ গগণের সূর্য্য অনুদয়ে আজ বৌদ্ধ সংসারের দশাও তাহাই হইয়াছে।
—সূর্য্যনাথ বন্দী।

অন্তঃপুরে ভোজন গৃহে, সুবিস্তীর্ণ মশারি। তন্নিম্নে আলোক জ্বলিতেছে, কুঙ্কুম সুন্দরী এবং সত্যবতী আলোক সমীপে আহারে বসিয়াছেন। দুই খানী শ্বেত প্রস্তর থালে আহার্য্য সজ্জিত হইয়াছে— নিকটে বারিপূর্ণ রজত ভৃঙ্গার। রমণীদ্বয় মখমল-রচিত আসনে উপবেশন করিয়া— আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

কুঙ্কুম সুন্দরী নিরভরণা—কেবল কর্ণে একযোড়া প্রবাল গ্রথিত দোলক। হস্তে স্বর্ণে প্রবালে গ্রথিত বলয়। কণ্ঠে কিছু নাই। কেশদাম মুক্ত। গোলাপীবর্ণে রঞ্জিত সুচিক্কণ সূত্র-বস্ত্রের ঘাগরা, ও কাঁচলী পরিহিত। এবং ঐ বস্ত্রের একখানী ওড়না অসাবধানে স্কন্ধে, মস্তকে ও পৃষ্ঠে রহিয়াছে। অথচ আবরণের কার্য্য করিতেছে না।

সত্যবতীর পরিচ্ছদ উজ্জ্বল নীলবর্ণের রেশমী ঘাগরা, তাহাতে শত শত সুবর্ণ ফলফুল লতা পাতা অঙ্কিত। কাঁচলী উন্মোচিত হইয়া বাম জঙ্ঘাতলে রহিয়াছে। পীত বর্ণের বারাণসী ওড়নায় পৃষ্ঠ দেশ ঢাকা রহিয়াছে। বক্ষ মুক্ত। পৃষ্ঠ দেশে একটি মাত্র কেশবেণী অসরল ভাবে নিপতিত। তাহার কণ্ঠে উজ্জ্বল রত্নকণ্ঠি—প্রকোষ্ঠে স্বর্ণ বিমণ্ডিত হীরক বলয়। কর্ণে হীরক দোলক। ললাটে একবিন্দু হীরক আটায় সংলগ্ন।

সত্যবতী ঈষৎ হাসিতে হাসিতে সুন্দর মুখ নাড়িতে নাড়িতে কথা কহিতেছেন। কুঙ্কুম স্নেহ সহকারে, দুইকর্ণে তাহার কথা শুনিতেছেন এবং দুই চক্ষে তাঁহার অসামান্য রূপমাধুরী দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতেছেন।

সত্যবতী বলিতেছেন 'মা-আমি এক দিন ঐ পূর্ব্ব দিকের ফুল বনে বেড়াইতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ওখানে দিব্য একটি পাথরের ঘর আছে, এক বৃদ্ধ মুনি ওখানে বসিয়া থাকেন—মুনির দাঁড়ীগোপ কিছুই নাই—মুখ খানা বড় লাল'।

কুঙ্কুম হাসিয়া বলিলেন, 'মুনি তোমাকে কিছু বলিলেন'?

'নামা, বলিতে পারিলেন না—তিনি আমাকে ধরিতে চাহিলেন, পারিলেন না, আমি ভয়ে পালাইয়া আসিলাম,—ঐ মুনিটী কে মা?'—এই কথা বলিয়া বালিকা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া চাহিয়া রহিল।

কুঙ্কুম বলিলেন, 'অহরহ কত লোকে 'জয় পরেশনাথের জয়' বলিয়া ধ্বনি করিয়া থাকে শুনিতে পাইয়া থাক,—ঐ মহাপুরুষের নামই সেই পরেশনাথ, এখন চিনিলে?'

সত্যবতী বলিলেন, 'তবেত উনি তোমাকে বিবাহ করিয়াছেন?'

কুঙ্কুম হাসিতে লাগিলেন। সত্যবতী পুনরায় বলিল, 'বুড়ার সঙ্গে তোমার বিবাহ হইয়াছে?'

কুঙ্কুম হাসিয়া বলিলেন, 'অমন বুড়া বর কয়জনের অদৃষ্টে মিলিয়া থাকে?'

সত্যবতী বলিলেন, 'তবে তুমি বুড়াকেই বুঝি ভাল বাসিতে?'

সত্যবতীর মনের ভাব, যাহাকে যে ভালবাসে তাহারই সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়—ইহা কুঙ্কুম সুন্দরী বুঝিলেন, বলিলেন 'মা বাল্য প্রণয়ে বিধাতার অভিসম্পাত আছে,তাই প্রায় ঘটে না,পিতা মাতা যাহা ঘটান তাহাই ঘটিয়া থাকে'।

সত্যবতী একথায় কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কেবল একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া—কুঙ্কুম সুন্দরীর দিকে নিরীহ হরিণশিশুর ন্যায় চাহিয়া রহিলেন।

কুঙ্কুম মনে মনে বলিলেন,এ চক্ষুর মূল্য কোটী সুবর্ণ মুদ্রা। প্রকাশ্যে বলিলেন, 'মা, ভয় কি তোমাকে যারে তারে দিব না, যাহাকে ভালবাস সেই তোমাকে—পাইবে'।

সত্যবতীর বদন প্রসন্ন হইল। অধোবদনা হইলেন, একখানা মালপুয় খণ্ড খণ্ড করিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'মা দেখ কেমন নরম ছিড়িয়া যায়? মালপুয় নরম ছিড়িয়া যায়, আশ্চর্য্য কথা নহে, বা ইহাতে হাসি আসিতে পারে তাহাও নহে, অনেক সময় লজ্জাবতী বালিকারা এক কথায় হাসিয়া, আর এক কথায় হাসিবার কারণ প্রদর্শন করে। কুঙ্কুমও একদিন এরূপ হাসির ব্যাখ্যা করিতেন, ভুক্তভোগী এরূপ হাসির অর্থ সহজে টের পায়।—কুঙ্কুম উচ্চ হাস্য করিলেন। মনে মনে বলিলেন, ছুঁড়ীকে আরো একটু হাসাইয়া লই, এবার হয়তো ঘাগরা ছিড়িয়া বলিবে দেখ মা টানিলে

ঘাগরা ছিড়িয়া যায়। বড় করিয়া বলিলেন, 'সূর্য্যনাথ তোমার চর হইবেন কেমন?' বালিকা একটু হাসিয়া বদন গম্ভীর করিল, মস্তক অবনত করিল, পরে ধীরে ধীরে ভোজন আরম্ভ করিল। আবার ওড়না দিয়া চক্ষুও মুছিল। কুঙ্কুম এইবার ঠকিলেন। অন্যকথা পাড়িয়া বলিলেন 'সত্য রাঁধিতে জান,?

'জানি'

'কি কি রাঁধিতে জান?'

'মাংস, পিষ্টক আর প্রায়সক—'।

'ছি ছি মাংস কি মনুষ্যে খায়, ওকথা মুখে আনিও না, মাংস খায় বিড়ালে কুকুরে বাঘে—নয়?'

এমন সময় পরিচারিকা আসিয়া থালা রাখিল, পাষাণে লাগিল। উহার শব্দ হইল। সত্যবতী বলিলেন 'ঐ ময়না আসিয়াছে?' ইত্যবসরে ময়না গৃহে প্রবিষ্ট হইল।

সত্যবতী মনে করিলেন আহারীয় সামগ্রীর সঙ্গে কতগুলি বৎসামান্য ফল দিয়াছিলাম, সূর্য্যনাথ বুঝি রাগ করিয়াছেন। কুঙ্কুম মনে করিলেন, দাসী এত শীঘ্র আসিল, সূর্য্যনাথের বুঝি পেট ভরে নাই। উভয়েই ময়নার দিকে চাহিলেন, উভয়েই নির্ব্বাক।

ময়নাই প্রথমে নীরব—নাশ করিল। বলিল 'সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে—'

একযোগে কুঙ্কুম ও সত্যবতী 'কি কি' বলিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

ময়না বসিয়া ধীরে ধীরে সকল কথা বিবৃত করিল। সত্যবতী দুই ঘটি জল পান করিলেন, ওড়নার এক অঞ্চল চক্ষু মুছিয়া ভিজাইলেন। কুঙ্কুম বীরদর্পে দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'অধঃপাতে যাইবার লক্ষণ দাঁড়াইয়াছে।' সূর্য্যনাথের হাতে পায়ে লোহার শিকল পড়িল—না বৌদ্ধ-কুল-লৌহ শিকলে বেষ্টিত হইল। কাহার কুমন্ত্রণাজালে পরেশনাথ জড়িত হইলেন জানি না। কে শত্রু মুখ হাসাইতে চলিল, কে শত্রুর কণ্টকিত পথ বাঙ্কিতে লাগিল। তিনি সরল, কিছুত বিবেচনা নাই। ময়নে চল, আমার সঙ্গে চল, আমি নিজ হস্তে সূর্য্যনাথের বন্ধন মোচন করিব। সূর্য্যনাথ রাজার পুত্র, দেশে গিয়া রাজ্য করুক। এই বলিয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে হস্তমুখ ধৌত করিয়া পুনরায় বলিলেন, 'না ময়না একথা বুঝি পরেশনাথ জানেন না, কে শত্রুতা করিয়া করিয়াছে, চল, এবে তাঁরই কাছে যাই।'

ময়না বলিল, 'ঠাকুরাণী আপনি সন্তান বাৎসল্যে সেনাপতির মঙ্গলকামনা করিতেছেন, অসরল লোকে তাহা বুঝিবে না, উপকারের চেষ্টায় তাঁহার আরো অনিষ্ট এবং আপনার কলঙ্ক হইতে পারে। অদ্য কোথাও যাইয়া প্রয়োজন নাই। কল্য যা হয় বুদ্ধি পরামর্শ করিয়া ঠিক করা যাইবে।

ময়নার কথা শুনিয়া কুঙ্কুমসুন্দরীর শরীর চমকিয়া উঠিল। উচ্চস্থান হইতে নীচে পড়িতে পড়িতে না পড়িলে শরীরের সমস্ত স্নায়ুমণ্ডল যেমন একযোগে

কুঞ্চিত হইয়া প্রকৃতিস্থ হইতে দেহে আঘাত করে, তদ্রূপ কুঙ্কুমার শরীর আঘাতিত হইল। অন্তরে একটু লজ্জা হইল; মনে বুঝিলেন দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া ময়না উত্তম কথাই বলিয়াছে। সুতরাং নীরবে বসিয়া সত্যবতীকে টানিয়া ক্রোড়ে লইলেন।

কথায় কথায় দেড় প্রহরের চিহ্নস্বরূপ, ডিম্ ডিম্ ধ্বনি হইল। আর দুইজন নিম্নদরের পরিচারিকা মশাল জ্বালিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। কুঙ্কুম ও সত্যবতী তাহাদের সহিত শয়নগৃহে গমন করিল না। ময়না গৃহ পরিষ্কার করিয়া আগারে বসিল, কিছুকাল পরে পরিচারিকাদ্বয় কর্ত্রীকে শয়ন করাইয়া তথায় আসিয়া জুটিল। উহারা নূতন লোক, বাড়ী চীনদেশে, এখনও ভাল করিয়া পালী কি প্রাকৃত, মৈথিলী, মাগধী, কি তৈলঙ্গী, সুরাটি কহিতে শিখে নাই। চৈনেয় কোয়াঙ মঠের পূঁষা* উহাদিগকে পরেশনাথের নিকট উপহার দিয়াছিলেন। চীনে পরেশনাথ ফাঁমিং নামে পরিচিত। উহাদের বড়টি কথাবার্ত্তা একরূপ বুঝিতে পারে। ছোটটি পারেনা।

ছোট পরিচারিকা আসিয়া প্রেতস্বরে বলিতে লাগিল, 'উঁচি ইঁংয়া ফুঙা।'

ময়না হাসিয়া বলিল, 'আবার ভূতের কচকচি কেন—খাবি একখান?' এই বলিয়া একখান রুটি দেখাইল। ছোট পরিচারিকা নাড়িয়া আবার বলিল 'ট্যাং ট্যাং' ‡ ময়না বিরক্ত হইয়া বলিল 'যা ফ্যাচ ফ্যাচ করিস না। আমি কিছু বুঝি না।

বড় পরিচারিকা, হাত মুখের ভঙ্গি করিয়া কথক বা কথায় বুঝাইয়া বলিল— 'বাহিরে কি হইয়াছে, ও দেখিয়া আসিয়াছে তাহাই শুনিতে বলে।'

ছোট পরি,—'উঁ সঁত বত কৌয়াং জুঁই?'¶ ময়না, 'সত্যবতী, তাই কি হয়েছে?'

ছোট পরি, ফাঁংমু টোএন্ ইউএনই। § হুঁরজ্—

'উই ইং' **

ময়না দ্বিতীয়াকে বলিল, 'আমি তো কিছুই ও ছাই বুঝিনা, তুমি শুনিয়া সকল কথা আমায় বুঝাইয়া বল?'

বড় পরিচারিকা সকল কথা শুনিয়া অতি কষ্টে ময়নাকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইল—

'বাহিরে সভা হইয়াছে' সূর্য্যনাথ সকলেরই প্রিয়,—তাহার বিপদ, তাহাদের পুনর্ম্মিলন বুঝি আর হয় না।

কেহ বলিতেছে তাহার প্রাণদণ্ড করা হইয়াছে যাহার।

---

* বৌদ্ধ মহন্ত।

† নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত জ্ঞান

‡ বিচারাগার, বা বাহিরের বৈঠকখানা।

¶ সত্যবতীটি ফুলের কলি।

§ প্রণয়ী যুগলের পুনর্ম্মিলন হয় কিনা সন্দেহ।

** সূর্য্যনাথকে কেনা ভাল বাসে।

'উঁই, ই' র প্রকৃত অর্থ, 'হৃদয় বাসনা'।

উচিত, কেহ বাধা দিতেছে; সত্যবতী না কি দুশ্চরিত্রা, কালি তাহারে তাড়াইয়া দিবে।'

ময়না অত্যধিক চিন্তিতা হইয়া বলিল 'ও ত সকল কথা বলিতে বা বুঝিতে পারে না, তবে কিরূপে এসকল কথা কহিতেছে।'

বড় পরিচারিকা বলিল, 'ও বলিতে পারে না; কিন্তু অর্দ্ধেক বুঝিয়া ও অর্দ্ধেক হাব ভাব দেখিয়া প্রায় সকলই বুঝিতে পারে। বাহিরে যে, ফাঁসিং ও আরো অনেক লোক দরবারে বসিয়াছে তাহা আমি জানি।'

ময়না আর আহার করিল না। আহারীয় দ্রব্য গুলিন সমস্ত পরিচারিকা দিগকে দিল, তাহারা তাহা লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় হইল।

ময়না ধীরে ধীরে বাহিরে চলিল। কি পরামর্শ হইতেছে তাহাই তাহার জানিবার উদ্দেশ্য। যাইয়া নৈরাশ হইল। দরবার অল্পক্ষণ হইল ভাঙ্গিয়াছে। ময়না পুনরায় ফিরিয়া আসিবার মনন করিয়া সিঁড়ি দিয়া ধীরে ধীরে নামিতেছে এমন সময় কে তাহার অঞ্চল ধরিল। সে চমকিয়া উঠিল, পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতে পাইল, এক দীর্ঘাকার পুরুষ।

দীর্ঘকায় পুরুষ চুপ করিয়া বলিল 'ভয় নাই আমি' ময়নার কানে কানে কথা বলিবার সময় দীর্ঘাকার পুরুষের প্রলম্বিত নাসিকা তাহার গালে লাগিল। ময়না সিহরিয়া বলিল 'চিনিয়াছি ছাড়িয়া দাও।' পুরুষ আবার কানে কানে বলিল—স্মরণ থাকিবে তো?'

'তোমার যেন থাকে?'

'রাত্রি শেষে?'

'রাত্রি শেষে'

'পশ্চিম দ্বারের বাহিরে?'

'হাঁ,—বাগানে'

'চাঁদনী উঠিলে,

'হাঁ'

'মনে যেন থাকে?'

'খুব থাকিবে'

এই সময়ে পদ শব্দ হইল, তাড়া তাড়ি উভয়ে উভয়দিগে নিজ, নিজ স্থানে—চলিল। ময়না আর অনেক হাসি হাসিল এবং আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিল।

ক্রমে দুই প্রহর ও আড়াই প্রহরের দামামা ধ্বনি হইল। কুঙ্কুম এবং সত্যবতী এক বিছানায় শয়ন করিয়াছিলেন, কুঙ্কুম অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া পরে নিদ্রাভিভূতা হইয়াছেন। সত্যবতী এপর্য্যন্ত নিদ্রা যান নাই, কিরূপে সূর্য্যনাথের বন্ধন মোচন করিতে পারিবেন তাহাই ভাবিতেছেন।

দামামার শব্দে, অর্দ্ধ রাত্র গত হইয়াছে মনে করিয়া ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিলেন। নিভু নিভু দেউটী জ্বলিতেছিল, উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। পরে আপন বাল্য প্রিয় কৃষ্ণাজিন পরিধান করিয়া ঘাগরী ওড়না প্রভৃতি রাখিয়া দিলেন। ভ্রম, ব্যস্ততা বা ইচ্ছা বশতঃই হউক, গহনা গুলিন উন্মোচন করিলেন না। এবং নিঃ

শব্দে দ্বার খুলিয়া—নির্ভয়ে বাহিরে গেলেন।

ময়না কারাগৃহের স্থান, দিক এবং অবস্থা ভাল করিয়া বলিয়াছিল—সত্যবতী তদনুসারে অনুসন্ধান করিতে করিতে চলিলেন। বৌদ্ধ সৈনিকগণের দুর্গ মধ্যে প্রহরা দিবার রীতি ছিল না। কেবল দুর্গের বাহিরে বড় দরজার নিকট চারি পাঁচ জন বলবান লোক প্রহরায় নিযুক্ত থাকিত।

ভিতরে নিয়মিত প্রহরা ছিলনা, কেবল প্রহরে প্রহরে একজন করিয়া সৈনিক—একবার করিয়া সকল গৃহের নিকট ডাকিয়া যাইত। সুতরাং সত্যবতীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইল না। কেবল অন্ধকারে উচ্চ নীচ স্থান দিয়া যাইতে ইষ্টক ও পাথরে পড়িয়া শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষত ও রুধিরাক্ত হইল। এইরূপে সত্যবতী অনেক কষ্টে একটি ক্ষুদ্র বিবর তুল্য নিম্ন গৃহের নিকট উপস্থিত হইয়া সশঙ্কিত মনে দ্বারে আঘাত করিলেন, কেহ শব্দ করিল না। পরে বড় করিয়া আঘাত করিলেন, ভিতর হইতে শব্দ হইল 'কে তুমি?' শব্দ সূর্য্যনাথের বুঝিতে পারিয়া, সত্যবতী বলিলেন 'সূর্য্যনাথ! আমি তোমার সত্য আসিয়াছি।'

সূর্য্যনাথ ভগ্নস্বরে বলিলেন, বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'তুমি কি আমার বিপদ দেখিতে আসিয়াছ, স্বয়ং বিপদে পড়িতে আসিয়াছ! গৃহে আইস আমার উঠিবার শক্তি নাই, দরজা ঠেলিলেই খুলিয়া যাইবে।

সত্যবতী দ্বার খুলিয়া ঘরে আসিতেই শৃঙ্খল ঠেকিয়া পড়িয়া গেলেন। পাষাণে পড়িয়া ললাটে ক্ষত এবং নাসিকা দিয়া রক্ত নিঃসৃত হইতে লাগিল। সত্যবতী বেদনা পাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সূর্য্যনাথ রোদন স্বরে বলিলেন, 'প্রাণের সত্য, ও বেদনা ইহজন্মে আমার হৃদয়ে থাকিবে, কেন আসিয়াছিলে—আমার উঠিবার শক্তি নাই' এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সত্যবতী বেদনাকে বেদনা বোধ না করিয়া অমনি উঠিয়া—অন্ধকারে হাত্ বাড়াইয়া বুঝিলেন, সূর্য্যনাথের দুই পদ দুই শৃঙ্খলে আকৃষ্ট, দুই হস্ত দুই শৃঙ্খলে আকৃষ্ট—ঐ শৃঙ্খল চতুষ্টয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র খুটিতে বদ্ধ। তাঁহার পাশ ফিরিবার সাধ্য নাই। চিত হইয়া শীতল পাষাণে পড়িয়া আছেন। যে মস্তক মণিময় উষ্ণিষে আবরিত থাকিত তাহা শূন্য, কঠিন পাষাণে পড়িয়া রহিয়াছে। সত্যবতী আবার কান্দিয়া বলিলেন, —'সূর্য্যনাথ, তোমার একষ্ট সহিতে পারি না, বল কিরূপে শৃঙ্খল মোচন করিব।'

সূর্য্যনাথ বলিলেন, 'সত্য তুমি মানব হইতে মহৎ। প্রকৃতি সংসারের অর্দ্ধেক স্নেহ ও দয়া তোমার এই কোমল প্রাণে ঢালিয়া রাখিয়াছেন।—মুক্তির চেষ্টা বৃথা, তুমি একবার আমার কাছে আইস?'।

সত্যবতী আপন সুকোমল জঙ্ঘায় সূর্য্যনাথের মস্তক স্থাপন করিয়া বলিলেন,

কালি, মা তোমাকে মুক্ত করিবেন'।

'তিনি কি শুনিয়াছেন?'

'ময়না সকল কহিয়াছে'

'তবে তুমি আসিয়া এত কষ্ট পাইলে কেন?'

'তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি,আগে—জানিলে, একটা বালিশ আনিতাম'।

'ঘায়ের বেদনা কি সুবর্ণে ঢাকিলে সারে—সত্য?'

সত্যবতী নীরবে রহিলেন, তাহার নাসিকার রক্ত এবং নয়নবারি একত্রে মিশিয়া সূর্য্যনাথের ললাটে এবং গাত্রে পড়িতে লাগিল।

সূর্য্যনাথ বলিলেন, 'সত্য কান্দিও না, এখন গৃহে ফিরিয়া যাও, কেহ দেখিলে প্রমাদ হইবে।'

সত্যবতী বলিলেন, 'তুমি আমাকে বিপদুদ্ধার করিয়াছিলে,—আমি কি তোমার কিছুই করিব না?'

সূর্য্যনাথ বলিলেন, 'তবে কি শুদ্ধ কৃতজ্ঞতা পাশ হইতে মুক্ত হইবে বলিয়া আসিয়াছ?'

সত্যবতী বলিলেন, 'সূর্য্যনাথ, আমার ভুল হইয়াছে—রাগ করিও না তোমার ভালবাসায় আমাকে টানিয়া আনিয়াছে।'

সূর্য্যনাথ ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন যে বালিকা অসাবধান, এবং শুদ্ধ বালসুলভ মধুরতাময়, সংসারের কিছু বুঝে না, সে আজ গম্ভীর প্রকৃতি হইয়াছে এবং প্রৌঢ়া বুদ্ধিমতীর ন্যায় কথা কহিতেছে ও স্নেহ করিতেছে।

সূর্য্যনাথকে নীরব দেখিয়া সত্যবতী আবার বলিলেন, 'বল সূর্য্যনাথ তোমার পায় ধরি, কিরূপে শৃঙ্খল খুলিব?'।

সূর্য্যনাথ বলিলেন তাহা কি তুমি পারিবে, চারিটী প্রস্তর খোদিত গর্ত্তে চারিটী কাষ্ঠকীলক প্রোথিত রহিয়াছে—ঐ গুলিন উঠাইলে—আমি উঠিয়া বসিতে পারি'।

সত্যবতী ধীরে সূর্য্যনাথের মস্তক পাষাণে রাখিয়া—দাঁড়াইলেন এবং অতিকষ্টে কীলক চতুষ্টয় উঠাইয়া বলিলেন,—'সূর্য্যনাথ উঠাইতে পারিয়াছি, তুমি উঠিয়া বসো।'

সূর্য্যনাথ পরমাহ্লাদে উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, 'সত্য, তোমার দয়ায় আমি অনেক সুখে থাকিব, আজ তুমি আর অধিক গৌণ না করিয়া শীঘ্র যাও, বিপদ সম্ভাবনা আছে। সত্যবতী, তবে চলিলাম সূর্য্যনাথ, বলিয়া কেবল দ্বারে পা দিয়াছেন, অমনি কে বজ্রমুষ্টিতে তাহার হাত ধরিয়া বিকট রবে বলিল'

'পিশাচী যাইবি কোথায়,কারাগারেও অভিসারে আসিয়াছিস।'

সত্যবতী কান্দিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'সূর্য্যনাথ আমি মরিলাম।'

সূর্য্যনাথের মস্তকে বজ্রপাত হইল। তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই হইল। তাহার হস্ত পদে চারিটি বৃহৎ শিকল, তাহা লইয়া যাওয়া অসাধ্য, তথাপি গৃহের দ্বার সমীপে আসিয়া গম্ভীরনাদে এবং ক্রোধ পূর্ণভাবে বলিলেন,—

'সৈনিক, সাবধান বালিকার গাত্র স্পর্শ করিওনা, ছাড়িয়া দাও,।

সৈনিক বলিল, ' ছাড়িতে পারিব না।' সূর্য্যনাথ গর্জ্জিয়া বলিলেন; ' অকৃতজ্ঞ' অন্ততঃ আমার কথায় ইহাকে ছাড়িয়াদে।

সৈনিক বলিল, ' অকৃতজ্ঞ হইব, তথাপি অকার্য্যপরায়ণ হইতে পারি না। '

সূর্য্যনাথ দেখিলেন যথার্থ কথাই কহিতেছে। একটু নরম হইয়া বলিলেন, ' সৈনিক, ইহাকে দিয়া তুমি কি করিবে?'

কন্য সেনাপতির হস্তে অর্পণ করিব।

অদ্য রাত্রে?

আমার ইচ্ছাধীন।

আমার একটি কথা রাখিবে?

যোগ্য হইলে রাখিতে প্রস্তুত আছি।

আজ রাত্রে এইখানেই রাখিতে পার?

সৈনিক বিকট রবে হাসিয়া বলিল 'অভিসারের সহায়তা করিব।'

সূর্য্যনাথ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া ক্রোধে বলিলেন, ' নরাধম তোমার ঐ পাপমুখে সহস্র পাদুকাঘাত করিব। সূর্য্যনাথ চিরদিন বন্দী রহিবে না।

সৈনিক ক্রোধপূর্ব্বক কারাগৃহের দ্বার বদ্ধ করিয়া শিকল আটিয়া দিয়া সত্যবতীকে টানিয়া লইয়া চলিল, বালিকা কান্দিতে কান্দিতে চলিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীঃ—

মহারাষ্ট্রীয় জাতির অভ্যুদয়।

প্রথম অধ্যায়।

প্রত্যেক দেশের প্রাচীন ইতিহাসের ন্যায়, মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাচীন ইতিহাসও অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন। কিন্তু মুসলমানদিগের বিজয়ের পূর্ব্বে দুই তিনটি রাষ্ট্রবিপ্লবের অপরিস্ফুট বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জনশ্রুতি এই যে গুর্সী নামক নীচ জাতিই মহারাষ্ট্রের আদিম অধিবাসী। নৃত্য-গীত-বাদ্যে মহারাষ্ট্রের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তাহারা সমধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। পুরাণও এই জন-প্রবাদের সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছে। তাহাতে লিখিত আছে যে প্রবল পরাক্রমশালী লঙ্কেশ্বর রাবণ কাবেরী ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী দণ্ডকারণ্য নামক নিবিড় অরণ্য অধিকৃত করিয়া সঙ্গীত-শাস্ত্রবেত্তাদিগকে উহার আধিপত্য প্রদান করেন।

যে সাম্রাজ্যের প্রথম ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, 'টগর' নামক মহাসমৃদ্ধিশালী নগরী তাহার রাজধানী ছিল। খৃষ্টের জন্মের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই নগরীতে মিসরদেশীয় বণিকেরা বাণিজ্যার্থ আগমন করিত। 'ইরিথ্রিয়ান সাগরে জলযাত্রা' নামক পুস্তকে জনৈক গ্রীক গ্রন্থকার লিখিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার সময়ে (খৃষ্টের মৃত্যুর দ্বিতীয় শতাব্দীতে) টগরে নানা দেশীয় বণিকগণ বাণিজ্যার্থ আগমন করিত। গ্রীক দেশীয় বণিকগণও তথা হইতে বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইত। দুর্ভাগ্যবশতঃ টগরের প্রকৃত স্থান নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অনেকে অনুমান করেন যে বর্ত্তমান 'ভীর' নগরীর কিঞ্চিৎ উত্তর পূর্ব্বে পুণ্যসলিলা গোদাবরীর তটে উহা অবস্থিত ছিল।

এখানে একজন রাজপুতবংশীয় রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি অন্যান্য রাজন্যবর্গের উপরি আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া টগরের রাজাধিরাজ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের শাসন-প্রভাব বহুদূর উত্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

খৃষ্টের মৃত্যুর ৭৮ বৎসর পরে শালিবাহন নামক নীচজাতীয় জনৈক রাজা প্রাদুর্ভূত হন। তিনি বিদ্রোহীদিগের অধিনায়ক হইয়া তৎকালিক টগর রাজকে পদচ্যুত করিয়া নিজে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি টগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'প্রতিষ্ঠান' নগরীতে স্বীয় রাজধানী সংস্থাপিত করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে গোদাবরী-তীরস্থ মঙ্গি পৈটানই প্রাচীন প্রতিষ্ঠান নগরী। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের সময়ে তিনি যে অব্দ প্রচলিত করেন, তাহা

এখন ও 'শকাব্দ' নামে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত।

মহারাষ্ট্রে মহারাজ শালিবাহন সম্বন্ধে নানাবিধ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। জনপ্রবাদ তাঁহাকে মহাদেবের অবতার বলিয়া বর্ণন করিয়াছে। তাঁহার মাতা এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের তনয়া ছিলেন। কুমারী অবস্থায় সর্পবেশধারী জনৈক দেবতার সংসর্গে তাঁতার গর্ভসঞ্চারের কথা ব্রাহ্মণের কর্ণগোচর হইলে, লোকের নিকট অপমানিত হওয়ার ভয়ে, তিনি স্বকীয় তনয়াকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। অন্তঃসত্ত্বা ব্রাহ্মণবালা নিকটবর্ত্তী এক কুম্ভকার গৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া অনতিবিলম্বে মহারাষ্ট্রের ভাবী অধিপতিকে প্রসব করেন। কোন কোন প্রবাদ তাঁহাকে কুন্‌ভী (কৃষক) বলিয়া বর্ণন করিয়াছে।

মহারাজ শালিবাহন আসীর নামক জনপদ স্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া, তথাকার শিশোদীয় বংশীয় রাজপুত রাজাকে দূরীভূত করিয়া দেন। রাজবংশীয় জনৈক স্ত্রীলোক তাঁহার অপোগণ্ড শিশুসহ বিজেতার নির্ম্মম হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া সাতপুরা পর্ব্বত মালার জন-মানব-বিহীন অধিত্যকা প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই শিশু হইতেই চিতোরের ভুবনবিখ্যাত রাজবংশ সমুদ্ভূত হয়। শালিবাহনের বিজয় সময় পর্য্যন্ত আসীরের রাজগণ তথায় ১৬৮০ বৎসর নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করেন। বিজেতা রাজা পরাজিত রাজবংশের, পূর্ব্বোক্ত রমণী ও তাঁহার অপোগণ্ড শিশু ভিন্ন, সমূলে উচ্ছেদ সাধন করেন। তৎপর শালিবাহন মালব রাজ বিক্রমজিতের সহিত বহুকাল সংগ্রাম করেন। অবশেষে পবিত্রসলিলা নর্ম্মদা তাঁহাদের রাজ্যের সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এই বিক্রমজিৎ বা বিক্রমাদিত্য সমকালীন ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয় না। বিক্রমাদিত্য যে অব্দ খৃষ্টের জন্মের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত করিয়া যান তাহা সংবৎ নামে প্রসিদ্ধ। খৃষ্টের মৃত্যুর ৭৮ বৎসরে শালিবাহনের শকাব্দ আরম্ভ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ১৩৩ বৎসর অতীত হইয়াছে। কিম্বদন্তীর বিক্রমজিৎ কে ছিলেন, তাহা নিশ্চয় করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে।

তৎপর মহারাষ্ট্রে অনেকবার রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। প্রতিষ্ঠান হইতে কোন্ কারণে ও কোন্ সময়ে রাজধানী দেবগড় (বর্ত্তমান দৌলতাবাদ) নগরীতে উঠিয়া যায়, তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব। কোনকোন হস্ত লিখিত পুস্তকে রাজা শালিবাহন হইতে যদু রামদেব রাও পর্য্যন্ত রাজবংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস যোগ্য কিনা, তদ্বিষয়ে নিশ্চয় কিছুই বলা যাইতে পারে না। ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এই রাজা রামদেবের সময়ে তদানীন্তন দিল্লীশ্বরের ভ্রাতষ্পুত্র আলাউদ্দিন সর্ব্বপ্রথম দাক্ষিণাত্যে মুসলমানদিগের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্র নানা রাজ্যে বিভক্ত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক ফিরিস্তা স্বপ্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসে গণ্ডোয়ানা ও বাগ্লানার রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। সম্রাট আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুরের দাক্ষিণাত্যে দ্বিতীয়বার অভিযানের সময়, মোগল সেনাপতির সাহায্যার্থ আগত গুজরাটের শাসনকর্ত্তা আলপ খাঁ রাজা কিরণ হইতে অভিযান-সময়ে বাধা প্রাপ্ত হন। বোম্বের নিকটবর্ত্তী টানাতে আবিষ্কৃত একখানি তাম্রশাসন-পত্রে উল্লিখিত আছে যে ১০১৮ খৃষ্টাব্দে 'সালসেটি' নামক স্থানে টগর রাজাদিগের জনৈক বংশধর রাজত্ব করিতেন। সেতারার অপর একখান তাম্রশাসন-পত্র পাঠে জানাযায় যে ১১৯২ খৃষ্টাব্দে পানল্লা নামক স্থানে টগর রাজবংশীয় জনৈক পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজ্য সেতারার উত্তরবর্ত্তী মহাদেব পর্ব্বত মালা হইতে কোলাপুরের দক্ষিণস্থিত হিরণ্যকেশী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার রাজ্য সিঙ্গীনামা জনৈক রাজপুত রাজা কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। রাজ্য মধ্যে স্বীয় প্রভাব বদ্ধমূল করার পূর্ব্বেই রাজা সিঙ্গীর মৃত্যু হয়। তৎপর পানালা রাজ ভোজের সমস্ত রাজ্য বহুসংখ্যক স্বাধীন সামন্তবর্গের মধ্যে বিভাজিত হয়। পুনা নগরী হইতে ওয়ার্ণা নদী পর্য্যন্ত ভূভাগ সার্কে রাজাদিগের অধিকার ভুক্ত হয়। তাঁহাদের বংশধরেরা এক্ষণ পর্য্যন্তও মহারাষ্ট্রীয় সামন্তবর্গের মধ্যে অতিশয় সম্মানিত হইতেছে।

ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আলাউদ্দিন খিলজী অষ্টসহস্র সেনা সহ নর্ম্মদা অতিক্রম করিয়া খান্দেশের মধ্য দিয়া সহসা দেবগড়ের সম্মুখে উপনীত হন। রাজা রামদেব রাও যদু নগরী রক্ষণে অপারগ হইয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিজয়ী আলাউদ্দিনের নিকট তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। আলাউদ্দিন সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। রাজা দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক বিজয়ী মুসলমান সেনাপতির সসৈন্যে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন জন্য বহু অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এদিকে রাজকুমার মুসলমানদিগকে স্বদেশ হইতে দূরীভূত করণার্থ বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে দেবগড়ে উপনীত হইয়া আলাউদ্দিনকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। অবিলম্বে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবশেষে হিন্দু সেনা যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল। ক্রুদ্ধ আলাউদ্দিন পূর্ব্ব সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া প্রভূত অর্থ চাহিলেন। রাজা রামদেব ইলিচপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী ভূভাগের আধিপত্য সহ কোষাগারের সমুদয় রাশীকৃত অর্থ প্রদান করিয়া বিজয়ীর তুষ্টি সম্পাদনে বাধ্য হইলেন।

সম্রাট আলাউদ্দিনের শাসনকালে তাঁহার সেনাপতি মালিক কাফুর ক্রমে তিন বার দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিয়া তেলিঙ্গানা এবং মহারাষ্ট্রের অধিকাংশে দিল্লীশ্বরের আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি নর্ম্মদা হইতে কুমারী অন্তরীপ পর্য্যন্ত

সমস্ত ভূভাগে আপতিত হইয়া প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন।

সম্রাট আলাউদ্দিনের রাজত্বের শেষভাগে এবং তাঁহার মৃত্যুর পর দিল্লীতে যে অন্তর্বিদ্রোহ ও নানাবিধ ষড়যন্ত্র উপস্থিত হয়, সেই সুযোগে দাক্ষিণাত্যে হিন্দু রাজত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেবগড়ের দুর্গভিন্ন সমস্ত স্থান পুনরায় হিন্দু রাজগণের হস্তগত হইল। হরপালদেব এবং অন্যান্য হিন্দুরাজগণ দেবগড় অবরোধ করিলেন। দিল্লীশ্বর মোবারিক প্রভূত সৈন্য সহ তথায় উপস্থিত হইলে, অবরোধকারীরা দেবগড় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। বীরশ্রেষ্ঠ হরপালদেব অবিলম্বে ধৃত হইয়া দিল্লীশ্বরের আদেশে নির্দ্দয়রূপে জীবিতাবস্থায় চর্ম্মোত্তোলিত হওনান্তর নিহত হন।

১৩২৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট টোগলকের পুত্র জুনাখাঁ বিদ্রোহী হিন্দুদিগের দমনার্থ দাক্ষিণাত্যে উপনীত হইয়া তেলিঙ্গানা ও তাহার রাজধানী ওয়ারেঙ্গোল পুনরধিকার করেন। এই ঘটনার প্রায় দ্বাদশ বর্ষ পর ওয়ারেঙ্গোল হইতে বিতাড়িত দুইজন প্রধান লোক তুঙ্গভদ্রা নদী তটে বিজয় নগর সংস্থাপিত করিয়া অতি পরাক্রান্ত রাজ্যের সূত্রপাত করেন।

জুনা খাঁ মহম্মদ টোগলক সা নাম ধারণ পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনিই দেবগড়কে দৌলতাবাদ নামে অভিহিত করিয়া, তথায় স্বীয় রাজধানী স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। অবশেষে এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই অর্দ্ধোন্মত্ত সম্রাটের রাজত্বের শেষভাগে সম্রাটের ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে খর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়া, তাঁহার উত্তরাধিকারিদের সময়ে রাজধানী ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী অপ্রশস্ত ভূভাগমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্ত্তা সম্রাটের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হন। দাক্ষিণাত্যে দিল্লীশ্বরের অত্যাচার ও দুর্ব্ব্যবহারে বিরক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ ও হিন্দুসামন্তবর্গের সবিশেষ সাহায্যে ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁ বাহমণি নামা প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্য সংস্থাপন করেন। নূতন সুলতান সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তদ্দেশীয় সমস্ত লোকের প্রতি সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া স্বীয় সিংহাসন দৃঢ়ীভূত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রধান প্রধান হিন্দু-সামন্তবর্গকে জায়গীর ও নানা অধিকার প্রদান করিলেন। কাহাকে তিনি তাহাদের পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিলেন। কাহার কাহারও প্রতি প্রাদেশিক রাজস্ব আদায়ের ভার দিলেন। কাহাকেও বা দুই তিন শত সেনার অধিনায়কত্ব প্রদান পুরঃসর, বড় বড় মুসলমান জাইগীরদারদিগের তত্ত্বাবধানে, ভরণপোষণ নির্ব্বাহার্থ জায়গীর প্রদান করিলেন। এইরূপে সুলতান আলাউদ্দিন দেশীয় লোকদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া অনায়াসে তাহাদের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হইলেন। কঙ্কাণ ঘাট মাট ভিন্ন সমস্ত মহারাষ্ট্র তিনি অপ্রতিহত-প্রভাবে শাসন করিতে লাগিলেন।

১৩৬৬ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দদেব যত্নর প্ররোচনায় বেরাম খাঁ নামক জনৈক রাজপুরুষ, সুলতান মহম্মদ সাহের কর্ণাটে অনুপস্থিতি সুযোগে, বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করিয়া বাগ্‌লানা রাজ ও বেরারের অন্যান্য হিন্দু সামন্তবর্গের সাহায্যে মহারাষ্ট্রে স্বীয় প্রভুতা বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্রের অধিকাংশ স্থান তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে সুলতান স্বয়ং উপস্থিত হইলে বিদ্রোহী সেনাগণ তাহাদের অধিনায়কদিগকে পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলে, প্রধান বিদ্রোহীগণ পলায়নপর হইতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর 'বাহমণি' -রাজ্যের পতনোন্মুখ অবস্থার প্রারম্ভ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রে আর বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হয় নাই। সেই সময়ে কতিপয় স্থানের মহারাষ্ট্রবাসী দুর্গরক্ষকেরা স্ব স্ব স্বাধীনতা বিঘোষিত করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই।

১৩৯৬ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে অতি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ইহা 'দুর্গা দেবী' নামে সুপ্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে যে ইহা দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রকে উচ্ছন্ন করে। দুর্ভিক্ষের এই ভীষণ আক্রমণে অনেক প্রদেশ জনমানবশূন্য হইয়া পড়িল। গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ হইতে ইহার পরে ত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত নিতান্ত স্বল্প রাজস্ব মাত্র আদায় হইয়াছিল। মুসলমানদিগের অধিকৃত পার্ব্বত্য দুর্গ ও তদ্বিধ দুর্জ্জেয় স্থান সমূহ দস্যু অথবা স্ব স্ব প্রধান স্বাধীন সামন্তবর্গের হস্তগত হইল। দুর্ভিক্ষের পর স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাবৃত্ত কৃষক সমূহ তাহাদের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতে বাধ্য হইল। বাহমণি রাজ্যের নবম সুলতান আমেদসা দস্যুদিগকে সমূলে নির্ম্মূলিত করিয়া দেশে শান্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রজাবৃন্দকে নিরাপদ করিবার জন্য ১৪২৯ খৃষ্টাব্দে মালিক উল টিজরের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। দাদু নারসু কালে নামক জনৈক অভিজ্ঞ ও সুচতুর ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত প্রেরিত হইল। প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তাগণ সসৈন্যে তাঁহার অনুগমন করিল। কুত্তাও দেশস্থ কতিপয় রামুসী ও মহাদেব শৈলবাসী দস্যুগণকে পরাজিত করিয়া বহুসংখ্যক দুর্গ অধিকার পূর্ব্বক টিজর কঙ্কাণে প্রবেশ করিলেন। বিজয়ী মুসলমান সেনাপতি বিদরে প্রত্যাবৃত্ত হইলে,দাদা নার্স ও রাজসভার জনৈক তুরস্ক সভ্য অধিবাসীগণের মধ্যে শান্তিসংস্থাপন পূর্ব্বক অধিকৃত প্রদেশ সমূহের বন্দোবস্ত করণে নিযুক্ত রহিলেন। গ্রাম সমূহের পূর্ব্বতন সীমা অনির্দ্দিষ্ট থাকায় দাদুনার্সে দুই কি ততোধিক গ্রামের একত্রীকরণ দ্বারা নূতন গ্রামগুলির বর্দ্ধিতায়তনে সীমা নির্দ্ধারণ করিলেন। কৃষকগণের মধ্যে এই নিয়মে ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল। প্রথম বৎসরে কৃষকেরা কর্ষিত ভূমি নিষ্কর উপভোগ করিবে; দ্বিতীয় বর্ষে তাহাদিগকে প্রতি বিঘায় এক এক 'তোব্রা' * শস্য প্রদান

* মহারাষ্ট্রে অশ্বদিগকে শস্য খাওয়াইবার জন্য এই চর্ম্মের থলিয়া ব্যবহৃত হইত।

করিতে হইবে। এই বন্দোবস্ত দ্বারায় ঘাট মাটার দস্যুগণ দ্বারা প্রপীড়িত প্রজাবৃন্দ স্বল্পকালস্থায়ী শান্তি সুখ সম্ভোগে সমর্থ হইল বটে, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই নিরাশ্রয় প্রজাবৃন্দ দস্যুদিগের উপদ্রবে ও অত্যাচারে পুনরায় ব্যতিব্যস্ত ও উৎপীড়িত হইতে লাগিল। এতদ্দ্বারায় অচিরে ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে সমুদয় পার্ব্বতীয় দুর্গমালা অধিকৃত না হইলে গ্রাম্য কৃষকগণের নিরুপদ্রবে বসতি করা অসম্ভব।

১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে দিলোয়ার খাঁ পার্ব্বত্য-দস্যুদলের দমনার্থ প্রেরিত হইলেন। কিন্তু তিনি অচিরেই অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রণদক্ষ বিজয়ী সেনাপতি মালিক উল টিজর পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি চাকুনে স্বীয় সেনানিবেশ সংস্থাপন করিয়া জুনারে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। তথা হইতে কঙ্কাণের নানাস্থানে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, সেনা প্রেরণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজাগণকে স্ববশে আনয়ন করিলেন। অতঃপর তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পানালারাজের বংশোদ্ভব সার্কে-উপাধিক রাজার দুর্গ অবরোধ করিয়া, সপরিবারে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করিলেন। টিজর পরাজিত রাজাকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে জেদ করিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ রাজা বিশেষ চতুরতা সহকারে মুসলমান সেনাপতিকে বিনীত ভাবে কহিলেন যে সিংহগড়ের রাজা আমার অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। আমি আপনাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সিংহগড়াধিপতি নিশ্চয়ই আমার প্রজাবৃন্দের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটাইয়া আমাকে পদচ্যুত করিয়া আমার রাজ্য অধিকার করত সবিশেষ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিবে। আপনারা তাঁহাকে পরাভূত করিয়া আমাকে বা আমার কোন আত্মীয়কে সিংহগড়ের একাধিপত্য প্রদান করিলে, আমি অসঙ্কুচিত চিত্তে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সুলতানকে বার্ষিক রাজস্ব প্রদান করিব এবং বিদ্রোহী রাজাদিগের দমনার্থ যথাসাধ্য সাহায্য করিব।"

টিজর বিশেষ বিবেচনা না করিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অনতিবিলম্বে তিনি সসৈন্যে সিংহগড়াভিমুখে অভিযান করিলেন। ধূর্ত্ত ও বিশ্বাসঘাতক মারহাট্টাগণ গভীর নিশীথে মুসলমান শিবির আক্রমণ করিয়া সুষুপ্তাবস্থায় সপ্তসহস্র অনুচর সহ টিজরকে নিহত করিল। সুলতানের অবশিষ্ট সৈন্য স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এবংবিধ অবৈধ উপায়ে সার্কেরাজ স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া ষোড়শবর্ষ নিরুপদ্রবে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন।

বাহমণি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান আলা উদ্দিনের মৃত্যু সময়ে প্রায় সমুদয় মহারাষ্ট্র টেলিঙ্গানার কিয়দংশ, কর্ণাটের অন্তর্গত রৈচোর ও মুদ্‌গল তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র সুলতান মহম্মদ সা শাসনকার্য্যের সুশৃঙ্খলাবিধানার্থ স্বাধিকারভুক্ত সমস্ত প্রদেশ চারিভাগে বিভক্ত করিয়া চারিজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। কালক্রমে বিজয়নগর, টেলিঙ্গানা, ও উড়িষ্যার

রাজগণ এবং কঙ্কাণের সামন্তরাজ বর্গকে পরাজিত করিয়া,বাহমণি রাজগণ স্বরাজ্যের আয়তন সবিশেষ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। বিজয় নগর ভিন্ন অপরাপর হিন্দুরাজগণের রাজ্য প্রায় নামমাত্রে পর্য্যবসিত করিলেন। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে রাজমন্ত্রী খাজে জেহান গাওয়ান প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া স্বীয় প্রভুর ক্ষমতা বর্দ্ধিত পূর্ব্বক রাজ্যের সুশাসন সংস্থাপন জন্য পূর্ব্বোক্ত ভাগ চতুষ্টয়কে অষ্টভাগে বিভক্ত করিলেন। এই সুশাসন সংস্থাপনের চেষ্টা পাওয়াতে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ সুদক্ষ ও প্রভুভক্ত মন্ত্রীবরের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া তাঁহার বিনাশার্থ ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। তিনি মিথ্যাভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া স্বদেশের মঙ্গলবিধানে যত্নবান হওয়া অপরাধে স্বীয় অকর্ম্মণ্য প্রভুর আদেশক্রমে নিহত হইলেন। খাজে জেহানের এই নিরপরাধ অকাল মৃত্যু হইতেই বাহমণি রাজ্যের পতন আরম্ভ হইয়া, অচিরেই তাহা নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইল। প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তাগণ ক্রমে ক্রমে স্বস্ব স্বাধীনতা বিঘোষিত করিয়া, বহুবিস্তৃত রাজ্যকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া লইল। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের শাসনকর্ত্তা আদিল সাহা বিজাপুরে সুপ্রসিদ্ধ আদিলসাহী রাজ্য সংস্থাপিত করিলেন। ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে আমেদ সা আমেদ নগর সংস্থাপন পূর্ব্বক তথায় নিজামসাহী রাজ্য স্থাপন করিলেন। ১৫১২ খৃষ্টাব্দে কুতুব উল মুলুক গোলকুণ্ডায় কুতুবসাহী রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। বরিদসাহী ও উমেদসাহী রাজ্য কিয়ৎকাল স্বাধীন থাকিয়া, যথাক্রমে বিজাপুর ও আমেদনগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। এইরূপে বাহমণি রাজ্যের পরিবর্ত্তে তিনটি প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্য দাক্ষিণাত্যে সংস্থাপিত হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত মোগল সম্রাট দিগের ক্ষমতা উপেক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহাদের সহিত দিল্লীশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রবল শত্রুতা রূপ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ অচিরে অভ্যুদিত হইল। কালক্রমে তাঁহারা দিল্লীশ্বরের প্রতিদ্বন্দী হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে দৌলতাবাদ এবং জুনারের শাসনকর্ত্তা মালিক আমেদ পার্ব্বত্য দুর্গ সমূহের অভিরক্ষক মহারাষ্ট্রীয় সেনাদিগকে বিদ্রোহী দেখিতে পাইয়া তাহাদিগের দমনার্থ যত্নপর হইলেন। পুনার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী সিংহগড় প্রভৃতি সমুদয় ও কঙ্কণ প্রদেশস্থ বহুসংখ্যক দুর্গ অধিকৃত করিলেন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে পর্টুগিস্ দেশীয় বণিকগণ বাণিজ্যার্থ মলবার উপকূলে দেখা দিল। ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে চৌলনগরীর যুদ্ধে পর্টুগিজদিগের কামান মহারাষ্ট্রের উপকূলে সর্ব্বপ্রথম শ্রুতিগোচর হয়। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা ডাবুল অধিকার করিয়া তাহা বিদগ্ধ করেন। ১৫১০

খৃষ্টাব্দে রণপণ্ডিত আলবুকার্ক গোয়া নগরী অধিকার করেন। ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা চিক্লি তারাপুর হইতে বেসিন পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান বিধ্বংস পূর্ব্বক টানা ও বোম্বের অধিবাসীগণ হইতে প্রভূত অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। তাঁহারা ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে দামাউন অধিকার পূর্ব্বক গুজরাটাধিপতি সুলতান বাহাদুর সার নিকট হইতে ডিউতে দুর্গনির্ম্মাণের ক্ষমতা ও বেসিনের একাধিপত্য প্রাপ্ত হয়েন। ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে সুলতান ইব্রাহিম আদিল সাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা আবদুল্লাকে বিজাপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করণার্থ তাহারা গোয়ার সমীপবর্ত্তী বানকুট পর্য্যন্ত সমস্ত উপকূল প্রদেশ তরবারি ও অনলের সাহায্যে অতি নৃশংসভাবে ধ্বংস করিল। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে পর্টুগিজদিগ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নানাবিধ নৃশংসানুষ্ঠানে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে স্বরাজ্য হইতে দূরীকরণার্থ বিজাপুর ও আমেদনগরের সুলতান দ্বয় সম্মিলিত হইলেন, কিন্তু অচিরে তাঁহাদিগকে বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল।

১৫২৯ খৃষ্টাব্দে আমেদনগরের দ্বিতীয় সুলতান বুরহান নিজাম সা কোয়ারসিন নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে স্বীয় প্রধানমন্ত্রিত্ব (পেশোয়া) পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময় হইতে নিজামসাহী রাজ্যে হিন্দুরা সবিশেষ ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিলেন। বিজাপুরের চতুর্থ সুলতান ইব্রাহিম আদিল সা ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই মহারাষ্ট্রদেশবাসীদিগকে শাসন ও যুদ্ধ কার্য্যে সুদক্ষ দেখিয়া তাঁহাদিগকে আপন রাজ্যে নানাবিধ কার্য্যে বহুলপরিমাণে নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। পারসী ভাষার পরিবর্ত্তে রাজকীয় কাগজপত্রে তিনি মহারাষ্ট্রীভাষা প্রচলিত করিলেন *। ইহাতে রাজ্যমধ্যে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা ও আধিপত্যের ভূয়সী বৃদ্ধি হইল। বিদেশীয় সৈন্যদিগকে বিদায় দিয়া তিনি ত্রিংশৎ সহস্র দাক্ষিণাত্যবাসী অশ্বারোহী-সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। ইতিপূর্ব্বে শিল্লিদারগণ আপন আপন ব্যয়ে অশ্ব ও খাদ্য লইয়া যুদ্ধকালে সুলতানের সাহায্য করিত। তিনি শিল্লিদারগণের পরিবর্ত্তে রাজ্যের ব্যয়ে পরিপোষিত বর্গীদিগকে স্বীয় অশ্বারোহীসৈন্যদলে ভুক্ত করিতে লাগিলেন। বর্গীগণ শত্রুর দেশ লুণ্ঠনে ও উৎসাদনে, রাস্তাদি দ্বারা যাতায়াত বন্ধ ও খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠন প্রভৃতি নানা উপায়ে শত্রু-নির্য্যাতনে সবিশেষ দক্ষ ছিলেন।

১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে রক্ষিত্তা গণ্ডীর (টেলিকোটা) ভীষণ সমরে সমবেত মুসলমান সেনার আক্রমণে দাক্ষিণাত্যের একমাত্র হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর উৎসন্ন হইল। সম্মিলিত সুলতানদিগের মধ্যে ঈর্ষ্যানল প্রজ্জলিত হওয়ায়, বিজয়নগর-রাজের ভ্রাতা স্বরাজ্যের কিয়দংশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইলেন। রাজ্যের অন্যান্য

---

* প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি উভয় ভাষাতেই লিখিত হইত।

স্থানে জমীদারগণ এই ঘটনার অনতিবিলম্বে স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিলেন।

১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রায় সমস্ত মহারাষ্ট্রে বিজাপুর ও আমেদনগরের সুলতানদিগের প্রভুতা সংস্থাপিত হইয়াছিল। খান্দেশের কিয়দংশ বরহানপুরের সুলতানের অধিকারে ছিল। কঙ্কাণ প্রদেশে গুজরাটের সুলতানেরা আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। গোয়া প্রভৃতি উপকূলবর্ত্তী কএকটি স্থান পর্টুগীজদিগের অধিকারে ছিল।

বাহমণি সুলতানদিগের ন্যায় বিজাপুর ও আমেদনগরের সুলতানগণ পার্ব্বতীয় দুর্গসমূহের শাসন ও রক্ষণভার মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপর সমর্পণ করিতেন। এতন্মধ্যে সুদৃঢ় দুর্গসমূহে সুলতানেরা স্বয়ং সুবিশ্বস্ত ও সুদক্ষ কিল্লাদার নিযুক্ত করিতেন। দুর্গরক্ষক সৈনিকগণ কখনও বা রাজকোষ হইতে বেতন পাইত, কখনও বা প্রাদেশিক জমীদার (দেশমুখ) ও জাইগীরদারগণকে তাহাদের বেতন যোগাইতে হইত। মারহাট্টা সামন্তগণ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অশ্বারোহীসৈন্যের অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহাদের ও তদধীনস্থ সৈন্যদিগের ভরণপোষণ ব্যয়নির্ব্বাহার্থ তাঁহারা জায়গীর প্রাপ্ত হইতেন। জায়গীরের আয়তনানুরূপ তাঁহাদিগকে যুদ্ধকালে সৈন্য লইয়া যাইতে হইত না। অল্প সংখ্যক সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়াই তাঁহারা সুবিস্তৃত জায়গীর উপভোগ করিতে পাইতেন। ফুলটন দেশপতিকে পেশোয়াদিগের অধিকারকালে সার্দ্ধত্রিংশত সেনা লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হইত, কিন্তু বিজাপুরের সুলতানের সাহায্যার্থ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মাত্র পঞ্চাশৎ সেনা লইয়া উপস্থিত হইতেন। মহারাষ্ট্রীয় সামন্তবর্গকে সংবাদ প্রাপ্তির অনতিবিলম্বেই সানুচর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রভুর সাহায্যার্থ উপস্থিত হইতে হইত। তাঁহারা স্বীয় যথেচ্ছাচারী প্রভুদিগের দ্বারা যে কোন সময়ে যুদ্ধার্থ আহূত বা অপসারিত হইতেন। সুলতানগণ অধীনস্থ মহারাষ্ট্রীয় সামন্তবর্গকে রাজা, নায়ক এবং রাও প্রভৃতি সম্ভ্রমসূচক উপাধি প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করিতেন। উপাধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা স্ব স্ব পদমর্য্যাদা সংরক্ষণ জন্য সমুপযুক্ত অর্থ ও ভূমি প্রাপ্ত হইতেন।

মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকগণ বিজাপুর ও আমেদনগরের সুলতানদিগের অধীনেই বহুল পরিমাণে নিযুক্ত হইত। কেহ কেহ গোলকোণ্ডার সুলতানদিগের সৈন্যদলেও সংভুক্ত হইত। কি জাতীয় ভাব, কি ভাষা ও ধর্ম্মের একতা, কিছুতেই তাহাদিগকে যুদ্ধে স্বদেশীয় ভ্রাতৃবর্গের রক্তপাতে বিরত করিত না। তাহারা বিভিন্ন রাজ্যের অধীনে থাকিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে পরস্পরের সহিত যেমন যুদ্ধ করিত, তেমনই এক পরিবারস্থ হইয়াও তাহারা ঈর্ষ্যাদ্বেষাদির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া অম্লানবদনে পরস্পরের প্রতি নিদারুণ শত্রুর ন্যায় নৃশংসাচরণেও কুণ্ঠিত হইত না। এই পারিবারিক ও সাম্প্রদায়িক কলহাবলম্বন করিয়া মুসলমান সুলতানগণ দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপর

বহুকাল পর্য্যন্ত অপ্রতিহত প্রভুতা স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিল।

বিজাপুর রাজ্যে (১) চন্দ্র রাও মোরে, (২) রাও নায়ক নিম্বলকার বা ফুলটন রাও, (৩) জুহার রাও ঘাটগে, (৪) রাও মনে, (৫) ঘোরপুরে, (৬) ডুফ্লে, (৭) সাবন্ত বাহাদুর—এই সাত জন মহারাষ্ট্রীয় সামন্তবর্গের মধ্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধ ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

(১) নীরা ও ওয়ার্ণা নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ অধিকৃত করণার্থ মোরে নামক জনৈক সেনানায়ক দ্বাদশ সহস্র হিন্দু পদাতিক সেনা সহ বিজাপুরের প্রথম সুলতান ইয়ুসফ আদিল সা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন। সুলতান তাঁহার এই বীর্য্যবত্তার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সার্কেরাজের বংশধরদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। তিনি সার্কেরাজতনয়দিগকে স্বদেশ হইতে দূরীকৃত করিয়া তাঁহাদিগের সাহায্যকারী গুজর, মামুলকার, মহিতি এবং মোহরীক পরিবারস্থ প্রধান প্রধান সামন্তবর্গের অত্যাচার সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত করত প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সুলতান বিজয়ী সেনাপতিকে চন্দ্ররাও এই সম্ভ্রমসূচক উপাধিসহ জাওলীর আধিপত্য প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করিলেন। তাঁহার পুত্র যশোবন্ত রাও বুরহান নিজাম সার সৈন্যের সহিত বিজাপুর সেনার পুরিন্দার সন্নিকটে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে শত্রুপক্ষীয় সবুজবর্ণ একটি পতাকা ধৃত করিয়া বীরশ্রেষ্ঠ পিতার সুযোগ্য তনয় বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সুলতান তাঁহার বীরত্বে প্রীত হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে গৃহীত সবুজপাতাকা ব্যবহার করিতে অনুমতি দেন। তাঁহার বংশধরেরা চন্দ্ররাও মোরে এই নাম ধারণ পূর্ব্বক সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে জাওলী উপভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সুশাসনে সেই জনশূন্য অনুর্ব্বর প্রদেশ ধনে জনে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। তাঁহারা সুলতানকে নাম মাত্র কর প্রদান করিয়া স্বাধীনতা সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ হইলেন।

(২) এই পরিবারের আদি নাম 'পাওয়ার' বলিয়া কথিত আছে। ফুলটন রাওর পূর্ব্ব পুরুষের বাসস্থান নিম্বলিক (নিম্লুক) গ্রামের নামানুসারে তাঁহাদের নিম্বলকার এই পারিবারিক আখ্যা হইয়াছে। এই পরিবার মহারাষ্ট্রে অতি প্রাচীন বলিয়া পরিগণিত। ফুলটন দেশের জমীদারী কিরূপে ইহাঁদের হস্তগত হয় তাহা জানা যায় নাই। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুলতান নিম্বলকারকে ফুলটনের সরদেশমুখ নিযুক্ত করেন। কথিত আছে ফুলটনের দেশমুখ কালক্রমে সুলতানের অধীনতাপাশ উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীন সামন্ত হন। তাঁহারা অনেকবার রাজকোষে দেয় রাজস্ব প্রেরণে বিরত হইয়া সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছেন। এই পরিবারস্থ জুগপাল নামক সুপ্রসিদ্ধ দস্যুপতির ভগিনী শিবজীর পিতামহী ছিলেন।

(৩) ঘাটগে পরিবারের প্রধান মান পরগণার সরদেশমুখ (রাজস্ব আদায়কারী) ছিলেন। তাঁহাদের আদিপুরুষ কুম্ভাও দে-

শবাসী ছিলেন। বাহমণি রাজ্যে রাম রাজ ঘাটগে অল্প সংখ্যক একদল সেনার অধিনায়ক ছিলেন। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে নগোজী ঘাটগে 'জুহর রাও' এই সম্ভ্রমসূচক উপাধি সহ মুল্লোরির দেশমুখে নিযুক্ত হন। এই পরিবারের কেহ কেহ কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য রক্ষা করিয়া সুলতান হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁদের পারিবারিক কলহ বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্তও নিবৃত্ত হয় নাই।

(৪) মানে পরিবারের প্রধান সামন্ত মুসোয়ারের দেশমুখ ছিলেন। সার্কেদিগের ন্যায় তাঁহাদের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি অতীব বলবতী ছিল। তাঁহারা বিজাপুরের প্রসিদ্ধ শিল্লিদার ছিলেন।

(৫) ঘোরপুরেরা পূর্ব্বে ভোঁসলা বলিয়া অভিহিত হইতেন। বাহমণি সুলতানদিগের রাজত্বকালে কোন সময়ে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কঙ্কাণ প্রদেশস্থ একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ সর্ব্ব প্রথমে অধিরোহণ করিয়া এই নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই পরিবার প্রাচীন কাল হইতে শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক খ্যাতিলাভ করে। ইহাঁরা বিজাপুর সুলতানদিগের অধীনে দেশমুখের কার্য্য করিত। ঘোরপুরেরা দুই প্রধান পরিবারে বিভক্ত—ওয়ার্ণা নদী তীরস্থ কাপশীতে একের,ঘাটপর্ব্বের তটস্থিত মুধোলে অপরের আদি বাসস্থান ছিল। কাপশী পরিবারের, একজন আমীর উল ওমরা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

(৬) সাবন্তেরা পুরুষানুক্রমে গোয়ার নিকটবর্ত্তী ওয়ারীর দেশমুখ ছিলেন। তাঁহাদের প্রধান সামন্ত স্বীয় প্রসিদ্ধ পদাতিক সৈন্যের সহিত পর্টুগাজদিগের সহিত অনেকবার যুদ্ধ করিয়া সুলতান হইতে 'বাহাদুর, উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের আদি উপাধি ভোঁসলা ছিল। এখনও তাঁহাদের প্রধান ভোঁসলা এবং তাঁহাদের বাসস্থান সাবন্ত-বাড়ী নামে সুবিখ্যাত।

(৭) দুফ্লে পরিবার বিজাপুরের সমীপবর্ত্তী ঝাট পরগণার দেশমুখ ছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বাভিধেয় 'চাওয়ান' তাঁহাদের তহশীলদারীর অন্তর্ভুক্ত দুফ্লাপুর গ্রামের নামানুসারে 'দুফ্লে' আখ্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহারা সুলতানকে যুদ্ধকালে কতিপয় অশ্বারোহী প্রেরণ করিয়া সাহায্য করিত।

তৃতীয় অধ্যায়।

আমেদনগরে লুকজী যদুরাও নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় সামন্ত সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তদধীনস্থ দশসহস্র সৈন্যের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহার্থ তিনি একটি সুবিস্তীর্ণ জায়গীর উপভোগ করিতেছিলেন। নিজামসাহী রাজ্যে সিন্দখেরের দেশমুখ যদুরাও সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী সামন্ত ছিলেন। এই যদু পরিবার দেবগড়ের সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশোদ্ভব বলিয়া অনুমিত হয়।

আমেদনগরের সুলতানদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া ভোঁসলাভিধেয় অপর একটি পরিবারও বিশেষরূপে খ্যাত হয়।

তাঁহাদের প্রতি নানা স্থানের রাজস্ব আদায়ের ভার সমর্পিত হইয়াছিল, দৌলতাবাদের নিকটবর্ত্তী ভারোল গ্রামই তাঁহাদের প্রধান আবাসস্থান ছিল। বাবজী ভোঁসলার দুই পুত্র ছিল—জ্যেষ্ঠের নাম মল্লজী ও কনিষ্ঠের নাম উইত্তুজী। মল্লজী যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতেই ফুলটনের দেশমুখ জুগপাল রাও নায়ক নিম্বলকারের ভগিনী দীপা বাই এর পাণিগ্রহণ করেন। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে লোকজি যদুরাওর সবিশেষ সাহায্যে মর্ত্তিজা নিজাম সার অশ্বারোহী সৈন্য মধ্যে স্বীয় স্বল্পসংখ্যক অনুচর সমভিব্যাহারে প্রবেশাধিকার লাভে কৃতকার্য্য হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসর মাত্র। বহুকাল পর্য্যন্ত পুত্রমুখ সন্দর্শনে বঞ্চিত থাকায় তিনি নিতান্ত বিষণ্ণ ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কুলদেবতা টুলজাপুরের দেবী ভবানীর আরাধনেও অভীপ্সিত ফল প্রাপ্ত না হওয়ায় তিনি একবারে নিরাশ হইলেন। অবশেষে আমেদনগরবাসী প্রসিদ্ধ ফকির সা সরিফের বরে তিনি ক্রমে বর্ষদ্বয়মধ্যে দুই পুত্র লাভ করেন। অনুগৃহীতা সিদ্ধপুরুষের নামানুসারে জ্যেষ্ঠের নাম সাজী এবং কনিষ্ঠের নাম সরিফজী রাখিয়া তৎপ্রতি তাঁহার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও গভীর ভক্তি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিলেন না। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে সাজীর জন্ম হয়।

স্বকীয় সুদক্ষতা, রণ-নৈপুণ্য বীর্য্যবত্তা ও কর্ত্তব্য পরায়ণতায় শিলিদার মল্লজী প্রসিদ্ধি লাভ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার উপকারক ও অভিভাবক যদুরাওও সাতিশয় প্রীত হইলেন। একদা যদুরাওর বাটীতে হোলি উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া মল্লজী তথায় সপুত্রক উপস্থিত হইলেন। সাজীর বয়ঃক্রম তখন পাঁচ বৎসর মাত্র। যদুরাও তাঁহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করত স্বীয় সুন্দরী বালিকা জিজির সমীপে বসাইলেন। পঞ্চবর্ষবয়স্ক বালক ত্রিবর্ষবয়স্কা বালিকার সহিত খেলা করিতে আরম্ভ করিল। পরস্পরের প্রতি আবীর নিক্ষেপ করিয়া সভাসীন সমুদয়কেই সবিশেষ আমোদিত করিল। হর্ষাতিশয্য প্রযুক্ত অন্যমনস্ক হইয়া যদুরাও বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'জিজি, ইহাকে স্বামীপদে বরণ করিবে?' অনন্তর কৌতুকাবিষ্ট সভাস্থ লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 'ইহারা উভয়ে বেশ মিলিয়াছে।' মল্লজী ভোঁসলা তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সভাস্থ লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন বন্ধুগণ 'দেখুন, যদুরাও অদ্য আমার সহিত বিবাহ-সূত্রে সম্বদ্ধ হইলেন'। সভাস্থ কেহ কেহ মস্তকঘূর্ণন করিয়া এই কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করিল। যদুরাও মল্লজীর ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

পরদিন যদুরাও মল্লজীকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিলে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন 'সাজীকে আপনি যথাবিধি বরিত জামাতা বলিয়া স্বীকার না করিলে, আমি আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিব না'। কৌতুকোচ্চারিত বাক্য প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যে পরিণত করিতে অভিমানী যদুরাও সম্পূর্ণরূপে

অস্বীকার করিলেন। তাঁহার অভিমানিনী, উচ্চবংশোদ্ভবা ও জাতিগৌরব-গর্ব্বিতা পত্নী পরিহাসচ্ছলেও যে তিনি কুলমর্য্যাদাবিহীন মল্লজীর পুত্রকে স্বীয় জামাতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি সবিশেষ বিরক্ত হইয়া, তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন।

অতঃপর মনঃক্ষুব্ধ হইয়া মল্লজী স্বকীয় আবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কিরূপে এই-বিবাহে যদুরাওকে সম্মত করাইবেন, তাহার উপায় চিন্তনে ব্যাপৃত রহিলেন। তিনি স্বকীয় পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জন্মভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি ও তদ্‌ভ্রাতা উইত্তুজী দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অল্পকাল মধ্যেই প্রভূত অর্থরাশি সংগ্রহে সমর্থ হইলেন। চুমারগুণ্ডির শেষাও নায়ক পুণ্ডোনামা জনৈক সুবিশ্বস্ত বণিকের হস্তে তাঁহাদের সমস্ত অর্থরাশি ন্যস্ত করিলেন। মল্লজী যেরূপ চতুর উদ্যমশীল ও অধ্যবসায়শালী লোক ছিলেন, তাহাতে অভীপ্সিত কার্য্য সম্পাদনার্থ তিনি যে অবৈধ উপায় অবলম্বন করিবেন—ইহা সহসা বিশ্বাস হয় না। প্রবাদ আছে যে তিনি স্বীয় জন্মভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, একদা ভবানী তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া রাশীকৃত গুপ্তধনপ্রাপ্তির স্থান নির্দ্দেশ করিয়া অন্তর্হিত হন। চিরভক্তকে দেবী সন্তুষ্ট হইয়া এই ভবিষ্যদ্‌বাণী শ্রবণ করান যে 'তাঁহার পরিবার মধ্যে দেবাধিদেব মহাদেবের অংশে জনৈক মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইবেন। তিনি যে রাজত্ব সংস্থাপন করিবেন তাহা সপ্তবিংশতিপুরুষ পর্য্যন্ত তদীয় বংশধরেরা উপভোগ করিবে। সেই অমিততেজা মহাপুরুষ মহারাষ্ট্রে ন্যায়পরতার রাজ্য বিস্তার করিয়া দেবতার পবিত্র মন্দির সমূহের ও ব্রাহ্মণগণের উপদ্রবকারীদিগকে যথোচিত রূপে দণ্ডনীয় করিয়া স্বীয় যশঃসৌরভে দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিবেন।' এই দেবাদিষ্ট বাণীর অমোঘতা সম্পাদনার্থই দেবী মল্লজীকে গুপ্ত ধনাগার প্রদর্শন করান।

মল্লজী এই প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়া ঘোটক ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি পুষ্করিণী খনন, কূপ খনন, দেবমন্দির-নির্ম্মাণ প্রভৃতি সৎকার্য্যেও উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু এই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও, যদুরাওর সহিত বৈবাহিক-সূত্রে সম্বন্ধ হওয়ার আশা ক্ষণকালের তরেও তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। তাঁহার শ্যালক যুগপল নায়ক নিম্বলকার স্বীয় ভাগিনেয়ের কুলপাবন এই বিবাহ সংঘটনে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেছিলেন। অর্থের অসাধ্য কিছুই নাই। দিন দিন মল্লজীর অর্থাগম দেখিয়া যদুরাওর অসম্মতি তিরোহিত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে অর্থপ্রভাবে মল্লজীর সবিশেষ পদবৃদ্ধি হইল। আমেদনগরাধীশ্বর তাঁহাকে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সেনার অধিনায়ক করিয়া মল্লজী রাজা ভোঁসলা উপাধি প্রদান পুরঃসর সবিশেষ সম্মানিত করিলেন। পুনা ও সোপা পরগণাদ্বয় তিনি স্বকীয় সৈন্যের ভরণপোষণার্থ জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে অল্পকাল মধ্যেই মল্লজী সুলতানের সবিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠি-

গেন। মল্লজীর সহিত সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার জন্য সুলতান স্বয়ং যদুরাওকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলে, তিনি সাজীকে জামাতাপদে বরিত করিতে সম্মত হইলেন। অবিলম্বে বিবাহের শুভানুষ্ঠান হইতে লাগিল। মহা সমারোহে বিবাহ সম্পন্ন হইল। বিবাহে সুলতান স্বয়ং উপস্থিত হইয়া উভয় পক্ষকে সম্মানিত করিলেন।

১৫৯০ খৃষ্টাব্দে মোগলকুলতিলক সম্রাট আকবর আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সর্ব্বত্র স্বীয় একাধিপত্য বিস্তৃত ও দৃঢ়ীভূত করিয়া, দাক্ষিণাত্যের রাজন্য বর্গকে স্ববশে আনয়ন পূর্ব্বক ভারতবর্ষের একচ্ছত্রী অধীশ্বর হওয়ার জন্য প্রয়াসী হইলেন। এই সময়ে বিজাপুর আমেদনগর ও গোলকুণ্ডার সুলতান ত্রয়ের মধ্যে পরস্পর বিবাদানল প্রজ্জলিত হইয়াছিল। প্রতি রাজ্যে এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্তর্বিদ্রোহেরও অভাব ছিল না। আমেদনগরে হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে অরাজক রাজ্যের আধিপত্য লইয়া ভীষণ বিবাদ উপস্থিত হইল। হিন্দুদলের অধিনায়ক মীনরাজ বিপক্ষ পরাভবে একান্ত অসমর্থ হইয়া মোগল সম্রাটের-সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাতে সম্রাট স্বীয় অভীষ্ট সাধনের সুযোগ পাইয়া সসৈন্যে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইলেন; তদীয় মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি খান্দেশ বেরারের অধিকাংশ, আমেদনগর ও তৎসন্নিধিবর্ত্তী অনেকগুলি স্থানে আপনার আধিপত্য স্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, মোগলেরা আমেদনগরাধিপতি বাহাদুর নিজামসাকে পরাভূত করিয়া গোয়ালিয়রের দুর্গে অবরুদ্ধ করে।

আমেদনগরের এই শোচনীয় দশাবিপর্য্যয়ের সময়ে মালিক আম্বর নামা এক অদীন-পরাক্রম মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হন। তিনি কিয়ৎকালের জন্য মোগল সম্রাটের সর্ব্বগ্রাসিনী রাজ্য-বিস্তৃতি-লালসার হস্ত হইতে আমেদনগরের প্রনষ্টগৌরব উদ্ধারে কৃতকার্য্য হন। তিনি অনেকবার মোগলদিগের বিরুদ্ধে সমরে বিজয়ী হন। যদি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদ্বয় তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতাপহারক মোগলদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইত, তাহা হইলে অচিরে তাঁহাদের রাজ্য বিধ্বস্ত হইত না। এই সমবেত শক্তির সম্মুখে মহারাষ্ট্রীয় জাতিকেও মস্তক অবনত করিয়া থাকিতে হইত। তাঁহাদের অভ্যুদয়কালও ভবিষ্যতের অনন্ত গর্ভে লীন হইয়া থাকিত। তাঁহাদের পরস্পর বিবাদ ও মোগল সম্রাট গণের সহিত ঘোরতর বিবাদেই যে মহারাষ্ট্রীয় জাতিকে অভ্যুদিত হইতে উত্তেজিত ও প্ররোচিত করিয়াছিল, তাহাতে আর সংসয় নাই। সৌভাগ্য লক্ষ্মী সতত মালিক আম্বরের আশ্রিতা রহেন নাই। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে লোকজী যদুরাও প্রমুখ মারহাট্টা সামন্ত বর্গ তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোগলদিগের পক্ষ অবলম্বন করিল। মোগলেরা যদুরাওকে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র সৈন্যের অধিনায়কতা ও অন্যান্য সামন্তবর্গকে সম্রান্ত পদ প্রদান করিয়া তাঁহাদের

গৌরব বৃদ্ধি করিতে বিলম্ব করিলেন না।

মারহাট্টা সামন্তবর্গ মালিক অম্বরের অধীনে থাকিয়া মোগলদিগকে অনেকবার পরাজিত করিয়া স্বজাতীয় বীর্য্যবত্তা প্রদর্শনে ত্রুটি করে নাই। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে আমেদনগরের উত্তর প্রান্তদেশে মোগলদিগের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ফুলটনের যুগপল নায়ক নিম্বলকার অশেষ বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিয়া শত্রুহস্তে নিহত হন। এই যুদ্ধে যদুরাও ও সাজী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর সাজী পৈতৃক জায়গীরের অবিসংবাদিত অধিকার প্রাপ্ত হন।

১৬২৬ খৃষ্টাব্দে মালিক আম্বরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ফতেখাঁ পৈতৃক পদ প্রাপ্ত হন। মালিক অম্বর কর্তৃক সিংহাসনাভিষিক্ত সুলতান বর্তিজা নিজাম সা (দ্বিতীয়) তখন পর্য্যন্তও প্রাপ্ত বয়স্ক হন নাই বিধায়, রাজ্যশাসনের ভার ফতেখাঁর প্রতি সমর্পিত হয়। তাঁহার উদ্ধত ব্যবহারে রাজ্যের সমুদয় প্রধান প্রধান লোক তাঁহার প্রতি বিরক্ত হন।

১৬৩০ খৃষ্টাব্দে সুলতান প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করার অনতিবিলম্বেই ফতেখাঁ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই যদুরাও পুনরায় সুলতানের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তাঁহার মোগলপক্ষাবলম্বনে সুলতান হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি তাঁহার সদসৎ জ্ঞানকে লোপ করিয়া অতিপ্রবল হইয়া উঠিল। সুলতান তাঁহাকে দৌলতাবাদের দুর্গে রাজ্য সম্বন্ধীয় কোন নিগূঢ় পরামর্শের ব্যপদেশে আনয়ন পূর্ব্বক অনুযাত্রিক বন্ধু বান্ধবগণ সহ নিহত করিয়া স্বীয় নৃশংসতা ও বিশ্বাসঘাতকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে অণুমাত্রও সঙ্কুচিত হইলেন না। তাঁহার পত্নী এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় না হইয়া মৃতপতির বিশ্বস্ত সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া সিন্দুখৈরে পলায়ন করিলেন। তথা হইতে জগদেব রাও যদুকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে সম্রাট শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অনুরোধে জগদেব রাও মোগল সেনাদলের মধ্যে পঞ্চসহস্র সেনাধিনায়ক পদ সহ মৃত ভ্রাতার জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন। সিন্দুখৈরের যদুগণ বরাবর মোগলপক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রভুভক্তি প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই।

ইতি পূর্ব্বে খাঁ জেহান নামে একজন অমিততেজা বীরপুরুষ মোগলাধিকৃত দাক্ষিণাত্যের সুবাদার সম্রাট সা জাহানের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়া নিজাম সাহী রাজ্য মধ্যে আশ্রয়গ্রহণে বাধ্য হন। সাজীপ্রমুখ অনেকানেক সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় সামন্ত ও জমীদার তাঁহার পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক মোগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। খাঁ জেহানের পলায়নের পর সাজী স্বকীয় জায়গীর হইতে উচ্ছন্ন হওয়ার ভয়ে, মোগল সেনাপতি আজিম খাঁর নিকট সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। সম্রাট তাঁহার বিদ্রোহিতাপরাধ

ক্ষমা করিলে, তিনি সানুচর দ্বিসহস্র অশ্বারোহীসেনা সহ সম্রাটসদনে উপনীত হইলেন। সম্রাট তাঁহার ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহাকে পৈতৃক জায়গীরে দৃঢ়ীভূত করিয়া, মোগলসেনাদলের ছয়হাজারী মনসবদারের পদ সহ আমেদনগর ও অন্যান্য কতিপয় স্থানের রাজস্ব আদায়ের ভার প্রদান করিলেন। এই সময়ে তাঁহার খুল্লতাত উইতুজীর পুত্র কেল্লজীও মোগলসেনাদলে প্রবিষ্ট হন।

এই ঘটনার দুইবৎসর পর (১৬৩১ খৃষ্টাব্দে) সাজী সম্রাটের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া বিজাপুরের সুলতান মহম্মদ আদিলসার পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক দৌলতাবাদ আক্রমণ করেন। অনন্যোপায় হইয়া ফতে খাঁ মোগলসেনানায়ক মহাবত খাঁর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাদের সহায়তার পুরস্কার স্বরূপ দৌলতাবাদের দুর্গ তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হন। ইতিপূর্ব্বে ফতে খাঁ সুলতান মর্ত্তিজা নিজাম সার প্রসাদে কারাগার হইতে বিমুক্ত হইয়া, সুলতানকে কারাবদ্ধ ও নিহত করিয়া প্রভুভক্তি ও কৃতজ্ঞতার একশেষ প্রদর্শন করেন! নিহত সুলতানের অপোগণ্ড শিশুকে আমেদনগর রাজ্যের সিংহাসনে অধিরোপিত করিয়া তাহার নামে রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক সম্রাটকে প্রসন্ন করণার্থ তৎসমীপে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন। সম্রাট তাঁহাকে স্বপদে দৃঢ়ীকৃত করিয়া, কএকটি স্থান জায়গীর স্বরূপ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় প্রসন্নতা জ্ঞাপিত করিলেন। ইতি পূর্ব্বে সম্রাট সাজীকে যে জায়গীর প্রদান করেন, তাহার কোন কোন স্থান ফতেখাঁকেও প্রদান করেন। এই নিমিত্তই সাজী সম্রাটের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি বিজাপুর সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া ফতেখাঁর হস্ত হইতে দৌলতাবাদ গ্রহণে প্রয়াসী হন। দৌলতাবাদের নিকটে যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে মোগলেরা বিজয়ী হন। যুদ্ধে পারাজিত হইয়া বিজাপুর সেনানায়ক গণ চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অবিলম্বে ফতে খাঁর নিকট দুত প্রেরিত হইল। তাঁহারা দূত মুখে বলিয়া পাঠাইলেন যে 'দৌলতাবাদের ন্যায় সুদৃঢ় দুর্গ সুযোগান্বেষী অতিপরাক্রান্ত শক্র মোগলদিগের হস্তে সমর্পণ করিলে, পরিণামে' তজ্জন্য আক্ষেপ ও অনুশোচনা করিতে হইবে। বিজয়ী মোগলদিগের হস্তে দুর্গ সমর্পণ না করিলে এবং সাজীকে সবিশেষ পুরস্কৃত করিলে, তাঁহারা পুনরায় মোগলদিগকে স্বদেশ হইতে বিতাড়নার্থ পরস্পর সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে না ফতে খাঁ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, অবিলম্বে মোগল সেনার উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। অবিলম্বে মহাবত খাঁ দৌলতাবাদ অবরোধ করিয়া ফতে খাঁকে সমুচিত শাস্তি দিতে সংকল্প করিলেন। অষ্টপঞ্চাশৎ দিনের পর উপযুক্ত খাদ্যাভাবে নিজামসাহী রাজ্যের রাজধানী শক্রহস্তে আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। ফতে খাঁ পেনসন প্রাপ্ত হইয়া রাজকার্য্য হইতে অব-

স্থত হইলেন। ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া সম্রাট নির্দ্দোষী বালক সুলতানকে গোয়ালিয়রের কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে আমেদনগর রাজ্য বিধ্বস্ত হইল।

মোগলসেনাপতি কর্ত্তৃক দৌলতাবাদের অবরোধ সময়ে ত্রিম্বক দুর্গাধ্যক্ষ মালদর খাঁ মহাবত খাঁ দ্বারা সম্রাটসদনে স্বীয় আনুগত্য স্বীকার করিয়া পাঠাইলে সম্রাট সপরিবারে সাজীকে ধৃত করিয়া স্বীয় প্রভুভক্তির পরিচয় প্রদানার্থ তাঁহাকে আদেশ করিলেন। সাজীপত্নী জিজিবাই সবান্ধবে বাইজাপুর নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সম্রাট আদেশে মালদর খাঁ তথায় উপস্থিত হইয়া প্রভূত অর্থ সহ তাঁহাকে ধৃত করিতে কৃতকার্য্য হইলেন। সাজীর কতিপয় আত্মীয়ের অনুরোধে সম্রাট তাঁহাকে কারামুক্ত করিলে, জিজিবাই কণ্ডনের দুর্গে নীত হইলেন।

১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে দৌলতাবাদে মোগলদিগের বিজয়পতাকা উড্ডীন হইলে, সাজী রাজবংশীয় অপর একজন বালককে নিজামসাহী রাজ্যের সুলতান পদে অভিষিক্ত করিয়া স্বহস্তে সমস্ত রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। নূতন সুলতানের নামে রাজ্যের সমুদয় প্রদেশে ও অধিকাংশ দুর্গ সমূহে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া, কএকজন সুদক্ষ ব্রাহ্মণের সাহায্যে অধিকৃত প্রদেশের সুবন্দোবস্তে ও সুশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। কতিপয় সুদৃঢ় দুর্গ ব্যতীত নীরা নদী হইতে চান্দোর শৈলমালা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ সাজী অপ্রতিহত প্রভাবে শাসন করিতে লাগিলেন। সাজী ক্রমশঃ স্বীয় সৈন্যবল বৃদ্ধি করিয়া মোগলদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিযুক্ত হইলেন। ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে মহাবত খাঁ ও যুবরাজ সুজা সসৈন্যে পুরিন্দার দুর্গ অবরোধ করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন। মহারাষ্ট্রীয় সেনাগণের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া দুর্গাবরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারা বুরহানপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর সম্রাট যুবরাজ আরংজীবকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার সাহায্যার্থ খাঁ দাওরাণ ও খাঁ জুমান নামক সেনাপতি দ্বয়কে প্রেরণ করিলেন।

সম্রাট সাজাহান সাজীকে সাহায্য করায় দরুণ বিজাপুরের সুলতান মহম্মদ আদিল সার প্রতি বিরক্ত হইয়া, তাঁহার সমীপে একজন দূত প্রেরণ করিলেন। সুলতান যদি নবাধিকৃত ভূতপূর্ব্ব নিজামসাহী রাজ্যের দুর্গ সকল সম্রাট হস্তে সমর্পণ করেন এবং সাজীর পক্ষ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে সম্রাট তাঁহাকে কঙ্কাণ ও সোলাপুর প্রদেশের একাধিপত্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সুলতান এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন। অবিলম্বে সায়েস্তা খাঁ এবং আলিবর্দ্দি খাঁ সাজীর অধিকৃত চান্দোর, সঙ্গমনীর ও নাসিক দুর্গ অবরোধ করিতে

প্রেরিত হইলেন। খাঁ জুমানের অধীনে বিংশতি সহস্র সৈন্য সাজীকে নিজামসাহী রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়া তদধীনস্থ সমস্ত দুর্গ অধিকার করণার্থ প্রেরিত হইলেন। খাঁ দাওরাণ ও সৈয়দ খাঁ জাহানের অধীনে দুই দল সৈন্য বিজাপুরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল।

আলিবর্দ্দি খাঁ চান্দোর, নাসিক প্রভৃতি পঁচিশটি দুর্গ অল্লায়াসেই অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। সায়েস্তা খাঁ বিজাপুর রাজ্যের প্রান্তস্থিত নলদুর্গ অধিকার করিয়া বিদর ও সোলাপুরের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে সম্রাটের প্রভুতা সংস্থাপনে সমর্থ হইলেন। কিন্তু ত্রিম্বক, কণ্ডানা, সেওনারী এবং কঙ্কাণস্থিত অনেক গুলি দুর্গ সাজীর অনুচর দিগের হস্তেই রহিল।

সাজী খাঁ জুমানের সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধে অগ্রসর না হইয়া আপনার অল্পসংখ্যক সেনা লইয়া কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত নানাবিধ কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক মোগল সেনাগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু তিনি যথাক্রমে আমেদনগর চুমার গুণ্ডী এবং বরমুক্তি হইতে বিতাড়িত হইয়া নীরা নদী অতিক্রম পুরঃসর মেরিচ এবং কোলাপুরের অভিমুখে পলায়নপর হইলেন। মোগলসেনা তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। বিজাপুরের সুলতানের সহায়তা পাইয়া তিনি সময় সময় আকস্মিক আক্রমণে তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিলেন। তিনি বিশেষ সতর্কতা সহকারে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া শত্রু সেনা কর্ত্তৃক তদনুসরণ বিফল করিয়া ফেলিলেন। সাজীর অনুধাবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোগল সেনাপতি চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান আক্রমণ ও বিধ্বংস করিয়া মরুভূমি রূপে পরিণত করিলেন। অনতিবিলম্বে বিজাপুর পতির সহিত স্বল্পকাল স্থায়ী সন্ধি সংস্থাপিত হইলে, তিনি পুনর্ব্বার সাজীর অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে বিজাপুরাধীশ্বর চারিদিগ হইতে মোগল সেনার আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত ও জর্জ্জরিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। মোগলদিগের ভীষণ আক্রমণে তাঁহার রাজ্য উৎসন্ন হওয়ার উপক্রম হইল। প্রজাবৃন্দের ক্লেশের সীমা রহিল না। শ্যামল-শস্যরাজি-বিরাজিত প্রদেশ সমূহ ভীষণ মরুভূমির আকারে পরিণত হইল। প্রজাবৃন্দ গৃহাবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যে ও দুর্গম প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। চারিদিগ হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল। অত্যাচরিত প্রজাবৃন্দের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে সুলতানের হৃদয় বিগলিত হইল। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাটের সহিত সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। সুলতান নলদুর্গ বিদর, কল্লিয়ানী প্রদেশ সহ পুরিন্দা ও সোলাপুরের একাধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন। বাকন পর্য্যন্ত ভীমা ও নীরা নদীদ্বয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ বিজাপুরের অঙ্গবিস্তৃতি সাধন করিল। সুলতান ইহার পরিবর্ত্তে সম্রাটকে বিংশতি লক্ষ পাগোদা বার্ষিককর দিতে সম্মত হইলেন। সম্রাট সাজী ও তাঁহার অনুচর

বগকে ক্ষমা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। যদি সাজী সমস্ত যুদ্ধোপকরণ সহ তদধিকৃত সমুদয় দুর্গ সম্রাট হস্তে সমর্পণ না করেন, তবে তিনি দিল্লীশ্বর ও বিজাপুরপতি উভয়ের সাধারণ শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবেন, এবং বিজাপুর হইতে নির্ব্বাসিত হইবেন।

এই সন্ধির প্রস্তাব হওয়া মাত্র, সাজী কঙ্কাণে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে বাধ্য হইতে অস্বীকৃত হইলে, খাঁ জুমান যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ক্রমেং তাঁহার অধিকৃত দুর্গ সমুহ অধিকার করিয়া তাহাতে সম্রাটের আধিপত্য সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্প কএক মাসের মধ্যে ত্রিম্বক প্রভৃতি সুদৃঢ় দুর্গ সকলের অধিকাংশ মোগলদিগের হস্তে নিপতিত হইলে, সাজী ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, সম্রাট সেনাদলে প্রবেশার্থ অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট তাঁহাকে বিজাপুরেশ্বরের সেনাদলে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন। সাজী কোণ্ডানার সুপ্রসিদ্ধ দুর্গ সুলতানের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। মুরারি পন্ত নামক সুলতানের জনৈক প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধে সুলতান তাঁহাকে পুনা ও সুপা জায়গীর স্বরূপ পুনঃ প্রদান করিলেন। সাজী যে বালককে আমেদনগরের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তিনি খাঁ জুমানের হস্তে পতিত হইয়া গোয়ালিয়রের দুর্গে অবরুদ্ধ হইলেন।

সাংখ্যদর্শন। *

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

গুণত্রয়।

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে যাহা যাহা দেখাইয়াছি আদৌ সংক্ষেপে তৎসমুদায়ের উল্লেখ করিব।

১। সৃষ্টি কিরূপে হইল জানিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক।

২। বৈদিক সময়ের প্রারম্ভে না হউক অন্ততঃ মধ্যবর্ত্তিকালে জগৎ ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট ভারতবাসী এসিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে।

---

* লেখক সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে ইংরাজীতে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন এ সকল প্রস্তাব তাহারই অনুবাদ মাত্র সুতরাং অনুবাদের ভাষায় যে সকল দোষ সচরাচর ঘটিয়া থাকে ইহাতে ও সে গুলি থাকা অসম্ভব নহে। সাঃ রাঃ।

৩। সৃষ্ট বস্তু মাত্রেরই উপাদান আবশ্যক, জগতের উপাদান কি? এ প্রশ্নের উত্তরে উপনিষৎ বলিতেছে ঈশ্বরই জগতের উপাদান।

৪। কপিল এ উত্তর ভ্রান্ত প্রমাণ করিলেন।

বহুকালের অনুসন্ধানে যে তত্ত্বরূপ সরোবরের আবিষ্কারে লোকের জ্ঞানতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হইতেছিল কপিল-সূর্য্যের তর্কতেজে যদি সেই সরোবর শুষ্ক হইল তবে তৃষ্ণা পূর্ব্ববৎ বলবতী অবশ্যই হইবে। কপিল স্বয়ং ও একথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সেই তৃষ্ণা নিবারণের উপায় ও করিয়া গিয়াছেন।

সুবিখ্যাত ডেকার্টে যেমন ভূয়োদর্শন-জনিত-জ্ঞান পরম্পরার মূলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া লব্ধ-পূর্ব্ব তত্ত্বগুলির অলব্ধবৎ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন উপনিষদুক্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রতিবাদ করিয়া কপিল ও তেমনি সৃষ্টিতত্ত্বের তদানীন্তন জ্ঞাত বিষয়গুলির অজ্ঞাতবৎ উপেক্ষা করিলেন ও ঐ সকল তত্ত্বের মূলোদ্ঘাটনে স্বকীয় মহীয়সী প্রতিভা নিয়োজিত করিলেন। প্রতিতত্ত্বের বিশ্লেষণে যে তত্ত্বান্তরে উপনীত হইলেন তৎসমস্ত পরস্পর তুলনা করিয়া প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চস্থূল ভূত ও পুরুষ এই লোক বিশ্রুত পঞ্চবিংশতি মূলতত্ত্বের আবিষ্কার করিলেন। *

সংপূর্ব্বক খ্যা ধাতুর অর্থ গণনা পূর্ব্বক নির্দ্দেশ; সাংখ্য পদ সংপূর্ব্বক খ্যা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ভূয়োদর্শন জনিত জ্ঞানের মূলে অন্যোন্যের সহিত আশ্রয়াশ্রয়ি ভাবে সম্বদ্ধ যে সকল তত্ত্ব নিহিত আছে কপিল তৎসমস্তের সংখ্যা অর্থাৎ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এই জন্য তাঁহার প্রণীত দর্শন সাংখ্য নামে খ্যাত। *

সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের কোন না কোনটীর অন্তর্ভূত; কপিলের মতে এতদতিরিক্ত সৃষ্ট বস্তু নাই। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব লইয়া কপিল যে অপূর্ব্ব সৃষ্টিবাদ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে যে ভাবে জীবনের অতি গভীর তত্ত্বগুলি আলোচিত ও নিরূপিত ও গূঢ় সমস্যা গুলি অবতারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া হত বুদ্ধি হইতে হয়। আধুনিক দার্শনিকগণের কেহ তদপেক্ষা সুন্দররূপে ঐ সকল তত্ত্বের মীমাংসা করিতে পারেন কি না সন্দেহ।

প্রতিসর্গের † সর্ব্ব শেষে কপিল সত্ত্ব রজঃ

---

* 'সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্মহান্‌মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি, পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ।'

সাংখ্য প্রবচন প্রথম অধ্যায় ৬১ সূত্র।

* সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে চৈব প্রকৃতিং চ প্রচক্ষতে,
তত্ত্বানি চ চতুর্ব্বিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

বিজ্ঞান ভিক্ষুধৃত ভারতবাক্য।

† প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার ইত্যাদিক্রমে সৃষ্টির নাম সর্গ;

ও তমঃ এইগুণত্রয়ে উপনীত হইলেন। সমস্তভাবে (as a collective whole) গুণত্রয়ের নাম প্রকৃতি ; প্রকৃতি গুণত্রয়ের আশ্রয় নহে। অন্যান্য তত্ত্বগুলির পূর্ব্ববর্ত্তি তত্ত্ব যেমন পরবর্ত্তিতত্ত্বের আশ্রয় কপিল গুণত্রয়ের তদ্রূপ কোন আশ্রয়ের উল্লেখ করেন নাই। এই গুণত্রয় সৃষ্টির আদি। কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ ইহারা সৃষ্টির আদি বলাতে কিছু বুঝিলাম কি? কিছুই না। যে অন্ধকার ছিল সেই অন্ধকারই রহিল। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এ নামত্রয়ে কপিল কি লক্ষ্য করিতেন না জানিলে এ কথা বুঝিতে পারিব না ; অতএব সর্ব্বাগ্রে তাহাই জানিবার চেষ্টা করিব।

আদৌ তমস্ শব্দের অর্থ কি দেখা যাউক। প্রথমেই বলিয়া রাখি ইংরাজিতে যাহাকে Resistance বলে বোধ হয়, তমস্ শব্দ কপিল সেই অর্থেই ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, সংস্কৃত তমস্ ও বোধ হয় তাহাই। দেখিতেছি পাঠক মহাশয় নাসা কুঞ্চিত করিতেছেন, ঐ আর একজনের অধর প্রান্ত বিস্ফারিত হইতেছে বোধ হয়, হাসি রাখিতে পারিতেছেন না! স্বীকার করি প্রাচীন কথায় নবীন ভাব দেখা রোগটা নব্যদলের আছে। কিন্তু আমার অনুরোধ আমার কথাগুলি পূর্ব্বাপর মন দিয়া শুনুন তারপর হাসিতে হয় হাসিবেন। আর ইহাও মনে রাখিবেন ঐ সকল বিষয়ের মীমাংসায় যখন সেই প্রাচীন ঋষির সশরীরে দর্শন ঘটিয়া উঠিতেছে না, তখন যতই কেন প্রমাণ প্রয়োগ করা যাউক না, নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কিছুতেই হইতে পারে না। এখন যাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহা সম্ভবপর হইলেই যথেষ্ট হইল।

এক্ষণে তমোগুণ কি বুঝিবার জন্য কপিল তমোগুণের যে যে ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহার সহিত ইংরাজীতে যাহাকে Resistance কহে তাহার ধর্ম্মগুলির তুলনা করিব।

তমোগুণ 'বিষাদাত্মক'*—বিষাদ তমোগুণের একটি ধর্ম্ম। কিন্তু 'বিষাদ' কি? সাধারণ কথায় দুঃখোৎপত্তি জনিত মনের অবস্থা বিশেষকে 'বিষাদ' কহে ; এ 'বিষাদ' শব্দের গৌণ অর্থ মাত্র, মুখ্যতঃ 'বিষাদ' শব্দে অবসন্নতা বুঝায়। অতএব তমোগুণ 'বিষাদাত্মক' ইহা হইতে এই বুঝিতে হইবে যে অবসাদ তমোগুণের একটি ধর্ম্ম—স্বধু তাহাই নহে, অবসাদ তমোগুণেরই ধর্ম্ম, তমোগুণ নাথাকিলে অবসাদ বা অবসন্নতা থাকিত না। পাঠক বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে Resistance না থাকিলে আমাদের অবসন্নতার উপলব্ধি হইত না। রাম এই বৃহৎ প্রস্তর খানি তু-

---

অহঙ্কার স্বকারণ মহতে লীন হইলে রহিল প্রকৃতি ও মহৎ ; মহৎ স্বকারণ প্রকৃতিতে লীন হইলে, সর্ব্বশেষে প্রকৃতি মাত্র রহিল। এই প্রকার কার্য্যগুলি স্ব স্ব কারণে লীন হইয়া মূল প্রকৃতিতে উপস্থিত হওয়ার নাম প্রতিসর্গ।

*'প্রীত্যপ্রীতি বিষাদাদ্যৈ গুর্ণানামন্যোঽন্যং বৈধর্ম্ম্যং'

সাংখ্যপ্রঃ প্রথম অঃ ১২৭ সূঃ

গিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কেননা রামের বাহুর পেশী সকলের আকুঞ্চনীশক্তি বাহু উৰ্দ্ধদিকে তুলিতে গিয়া প্রস্তরের নিম্ন প্রবণতা কর্ত্তৃক নিরন্তর নিরুদ্ধ-প্রসর হইতে ছিল। নিম্ন প্রবণতা যে পরিমাণে অধিক হইবে, অবসন্নতাও সেই পরিমাণে অধিক হইবে ; নিম্ন প্রবণতা কমিলে অবসন্নতাও কমিবে। কেবল মাত্র হাতখানি উঠাইলে ততদূর অবসন্নতা হয় না। কেননা তখন নিম্ন প্রবণতা নিতান্ত অল্প। পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি একেবারে নাথাকিলে প্রস্তর খানি তুলিতে রামের অবসন্নতা হইত না। যে যে স্থলে অবসন্নতার উপলব্ধি হয়, সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে সেই সেই স্থলে আমাদের উপলব্ধির মূলে নিরোধ (Resistance) রহিয়াছে। দুঃখোৎপত্তি জনিত মানসিক ভাবকে কেন 'বিষাদ' কহে তাহাও সহজেই দেখান যাইতে পারে। কোন ভাব বিশেষের স্থায়িত্ব কামনা করিয়া মনে তাহার স্থানদিলে যতক্ষণ ঐ ভাবের সাতত্য (continuation) থাকে ততক্ষণ সুখানুভব হইতে থাকে। কিন্তু ভাবপ্রবাহ নিরুদ্ধ (Resisted) হইলেই বিষাদ উপস্থিত হয়। সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া তাঁহার প্রতি সন্তানোচিত ব্যবহার অবশ্যই করিবে, মাতার মনে এভাব অনুক্ষণ থাকে, প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র মাতার প্রতি অপুত্রোচিত ব্যবহার করিলে তাঁহার সেই মানসিক ভাব প্রবাহ নিরুদ্ধ (Resisted) হইয়া বিষাদ জন্মাইবে। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বিষাদের গৌণ অর্থের মূলেও নিরোধ (Resistance) রহিয়াছে। 'নিয়ম'* ও তমোগুণের একটি ধর্ম্ম। নি পূর্ব্বক যম্ ধাতু বাধা দেওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব যাহার বাধা জন্মাইবার শক্তি আছে তাহাকে নিয়ম বলা যাইতে পারে। কোন সভা ভবিষ্যৎ কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে যাহা বিধিবদ্ধ করেন, তাহাকে ঐ সভার নিয়ম কহে, কেননা সভার কোন সভ্যই ঐ সকল বিধি অতিক্রম করিতে পারেন না ; ঐ বিধিগুলি তাঁহাদের যথেচ্ছ ব্যবহারের বাধাজন্মায়। সুতরাং তমোগুণের এই দ্বিতীয় ধর্ম্মটিও Resistance কেই লক্ষ্য করিতেছে। তমোগুণের তৃতীয় ধর্ম্ম 'গুরুতা' †; ইহাদ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে না যে প্রস্তরাদিরন্যায় তমোগুণেরও ভার আছে। ভার দ্রব্যধর্ম্ম গুণ কখনও দ্রব্য হইতে পারে না।

অতএব এখানে ইহাই বুঝিতে হইবে যে তমোগুণ আমাদিগকে গুরুতার জ্ঞান দেয়—তমোগুণ থাকাতেই আমরা দ্রব্যের গুরুত্ব অনুভব করিতে পারি। অনুধাবন করিলে সহজেই বুঝাযায় যে Resistance ই আমাদের গুরুত্ব জ্ঞানের কারণ। পাঠক এখানে আপত্তি করিতে পারেন যে শক্তি অর্থাৎ Forceই দ্রব্যের গুরুত্বের কারণ, Resistance নহে। স্বীকার করি এক অর্থে শক্তিই গুরুত্বের কারণ ; পৃথিবীর

---

* 'প্রকাশ প্রবৃত্তি নিয়মার্থাঃ'
সাংখ্যকারিকা ১২ শ্লোক।

† 'গুরুবরণকমেব তমঃ'
ঐ ১৩ শ্লোক।

আকর্ষণী শক্তি না থাকিলে কোন দ্রব্যই আমাদের নিকট গুরু বলিয়া বোধ হইত না। কিন্তু সেকারণ মুখ্য নহে গৌণমাত্র। মনের যে অবস্থা বিশেষ হইলে আমাদের গুরুত্ব জ্ঞান জন্মে শক্তি সেই অবস্থা বিশেষের কারণ, সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গুরুত্ব জ্ঞানের কারণ নহে। কথাটা বোধ হয় পরিষ্কার হইল না। রাম এই প্রস্তর খানি তুলিয়া বলিল 'এবড় ভারী'; একথা রাম কেন বলিল? পৃথিবী তাহার আকর্ষণী শক্তি দ্বারা প্রস্তর খানি নীচের দিকে টানিতেছে ইহা কি রাম প্রত্যক্ষ করিয়াছে? না; রাম তাহার হস্তস্থ পেশী গুলির আকুঞ্চন অনুভব করিয়াছে মাত্র তদ্ভিন্ন তাহার প্রত্যক্ষ কিছুই হয় নাই; সেই আকুঞ্চন হইতেই তাহার গুরুত্ব জ্ঞান জন্মিয়াছে; শক্তির অস্তিত্ব ইহা হইতে অনুমান মাত্র। আমরা অহরহ দেখিতেছি শক্তির নিরোধ করিতে গেলেই আমাদের পেশীগুলির এক প্রকার অবস্থা বিশেষ উপস্থিত হয়। রাম আমার হাত খানি টানিয়া লইল, আমি হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিলাম, অমনি আমার হাতের পেশীর অবস্থা বিশেষ উপস্থিত হইল; এইরূপ শক্তি প্রয়োগের পরই পেশী সকলের ঐরূপ অবস্থার উপস্থিতি নিরন্তর দেখিতে দেখিতে আমাদের এরূপ একটি সংস্কার জন্মে যে অতঃপর যখনই আমরা পেশীর ঐরূপ অবস্থা জানিতে পারি তখনই শক্তির অনুমান করি। তবেই হইল আমরা Resistance মাত্র অনুভব করি এবং তাহা হইতেই আমাদের গুরুত্ব জ্ঞান জন্মে। অতএব এই ধর্ম্মেও তমস্ ও Resistance এদুয়ের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখিতেছি। তমোগুণের চতুর্থ ধর্ম্ম 'বরণকত্ব'†। তমোগুণ সকলকে আবৃত করে অর্থাৎ তমোগুণ প্রভাবেই সকলে অভিভূত হয়। এ Resistance এর ও একটি ধর্ম্ম। এপর্য্যন্ত যাহা দেখিলাম তাহাতে তমোগুণ ও Resistance এদুয়ের কোন প্রভেদ পাইলাম না।

এক্ষণে সত্ত্ব গুণ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিব। সত্ত্বগুণ 'লঘু'*; সাধারণ কথায় 'লঘু' ও 'গুরু' এদুইটী পরস্পর বিরোধী গুণ; গুরুতা তমোগুণের ধর্ম্ম পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অতএব সত্ত্ব গুণকে তমোগুণ বিরোধী মনে করা অসঙ্গত নহে। পণ্ডিতবর বাচস্পতি মিশ্র ও সত্ত্বগুণকে 'গৌরবপ্রতিদ্বন্দ্বি' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; গমনার্থক লঘি ধাতু হইতে 'লঘু' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে; উল্লম্ফন করিয়া পার হওয়াকে যে আমরা লঙ্ঘন বলি ঐ লঙ্ঘন শব্দ ও লঘি ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অতএব সত্ত্বগুণ লঘু ইহা হইতে তমোগুণ যেমন গমনের প্রতিকূল সত্ত্বগুণ তেমন নহে এরূপ মনে করা যাইতে পারে। সত্ত্বগুণের প্রবৃত্তিমত্তা (Activity) নাই। এগুণ উদাসীন; প্রবৃত্তির অনুকূল বা প্রতিকূল উভয় বিধ ধর্ম্মবর্জ্জিত অভাবাত্মক অতএব নিষ্ক্রিয় (Passive) গুণ বিশেষ। সত্ত্বগুণ

---

† "গুরুবরণকমেবতমঃ।"
কারিকা ১৩ শ্লোক।

* 'লঘ্বাদিধর্ম্মৈঃ সাধর্ম্ম্যং বৈধর্ম্ম্যং চগুণানাং' সাংখ্যপ্রবচন প্রথম অধ্যায় ১১৮ সূত্র।

'ইষ্ট' * আকাঙ্ক্ষার বিষয়,জীবনের একমাত্র লক্ষ্য,ঈশ্বরকৃষ্ণএকথা বলিয়া সত্ত্বগুণ যে উদাসীতা ভিন্ন আর কিছুই নহে তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন; কেন না কপিলের মতে উদাসীনতাই জীবনের চরমলক্ষ্য এবং তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই তিনি সাংখ্যশাস্ত্র লিখিয়া গিয়াছেন। টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র 'ইষ্টং' একথার পর 'সাংখ্যাচার্য্যৈঃ' একথা সন্নিবেশিত করিয়াছেন; সুতরাং তিনিও সত্ত্বগুণ উদাসীনতা অর্থেই বুঝিয়া গিয়াছেন। ব্যুৎপত্তি গত অর্থ ধরিলে 'সত্ত্ব' পদে বিদ্যমানতা মাত্র বুঝায়; অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকেExistence কহে সত্ত্বগুণ তাহাই। কিন্তু এ বিদ্যমানতা—উদাসীন; এ কোন বিশিষ্ট প্রকার (Concrete) বিদ্যমানতা নহে। আমার সম্মুখে এই কাগজ, কলম ও দোয়াত এই তিনটী বস্তুই বিদ্যমান রহিয়াছে; কেবল বিদ্যমানতা মাত্রে ইহাদের সাদৃশ্য আছে বটে কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মে ইহারা বিভিন্ন; তাহা না হইলে আমরা একটি হইতে ইহাদের অপর দুইটীকে চিনিয়া লইতে পারিতামনা। অতএব এই তিনটীর বিদ্যমানতা বিভিন্ন ধর্ম্ম বিশিষ্ট—আমি তিনটী পৃথক্ প্রকার বিদ্যমানতা (Existence) প্রত্যক্ষ করিতেছি। 'সত্ত্ব' পদে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম বিশিষ্ট বিদ্যমানতা বুঝায় না; এবিদ্যমানতা নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ ইংরাজী ভাষায় ইহাকে abstract existenceবলা যায়। কারিকায় সত্ত্বগুণকে 'প্রীত্যাত্মক' বলা হইয়াছে তাহারও কারণ সহজেই দেখান যাইতে পারে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কোন ভাব প্রবাহের সাতত্য (Continuation) যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ প্রীতিও থাকিবে; সাতত্য সত্তা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এস্থলে দুইটী আপত্তি হইতে পারে। প্রথম, দুইটী প্রীতিকর ভাব একের পর অপরটি হইলে পরবর্ত্তী টি বিষাদের কারণ হয় না কেন? উত্তরে বলা যাইতে পারে প্রীতিকর ভাব পরস্পর বিরোধী হওয়া সম্ভব নহে; সুতরাং পরবর্ত্তিভাব পূর্ব্ববর্ত্তিভাবের নিরোধ জন্মাইতে পারে না এই জন্যই কথিত অবস্থায় আমরা বিষাদ অনুভব করি না। দ্বিতীয় আপত্তি এই পরবর্ত্তি ভাবটী পূর্ব্ববর্ত্তিভাবের বিরোধী হইলে বিষাদ জন্মাইবে একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; তবে বিষাদজনক পরবর্ত্তিভাবের সাতত্য থাকিলে তাহা হইতেও প্রীতিজন্মে না কেন? ইহার উত্তরে আদৌ এই বলা যাইতে পারে যে সাতত্য (Continuation) প্রীতির জনক একথা আমরা বলিনাই—সাতত্য যতক্ষণ থাকে প্রীতিও ততক্ষণ থাকিবে এবং সাতত্য প্রীতির কারণ এদুইটী পৃথক্ কথা। অপিচ পরবর্ত্তী ভাবকে বিষাদাত্মক বলার কারণ কি বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রীত্যাত্মক ভাবের যে নিরোধ হইয়াছে আমাদের সে স্মৃতি যায় নাই এবং সেই জন্যই আমরা পরবর্ত্তী ভাবকে বিষাদাত্মক বলি; সেই নিরোধের স্মৃতি আমাদের না থাকিলে বোধ করি আমরা একথা বলিতামনা। পুরীষকীট তাহার বাসস্থা-

* 'সত্ত্বং লঘু প্রকাশক মিষ্টং'
সাংখ্যকারিকা ১৩ শ্লোক।

নের জন্য বোধ করি বিষাদিত হয় না; সেইরূপ যদি আজীবন আমাদের দ্বিতীয় প্রকার ভাবেরই উপলব্ধি হইত তবে তাহা হইতে আমাদের বিষাদ জন্মিত কিনা বিতর্কের কথা; সুতরাং এ আপত্তি হইতে সত্ত্বগুণ প্রীত্যাত্মক একথার খণ্ডন হইল না। পাঠক মহাশয় বোধ হয় এক্ষণে স্বীকার করিবেন যে সত্ত্বগুণকে abstract existence বলা নিতান্ত অসংলগ্ন কথা নহে।

অতঃপর রজোগুণ কি বিবেচনা করা যাউক। রজোগুণকে কারিকায় 'প্রবৃত্ত্যর্থক' বলা হইয়াছে। 'প্রবৃত্তি' ও activity একই কথা মনে করা যাইতে পারে। অতএব রজোগুণ হইতে activity হয়; আবার আমরা জানি শক্তি অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে Force কহে তাহা হইতেও activity হয়। রজোগুণনা থাকিলে প্রবৃত্তি থাকিবে না এবং Force না থাকিলেও প্রবৃত্তি থাকিবে না। যে Steamengine 'প্রবৃত্ত' হইয়া সহস্র আরোহীর ভার অবলীলাক্রমে বহিয়া লইয়া যাইতেছে তাহার প্রবৃত্তির মূল শক্তি; আমি যে কোন কার্য্য করিব মনে করিয়া তাহাতে 'প্রবৃত্ত' হই তাহার ও মূল শক্তি। এশক্তি ভিন্ন প্রকার; এখানে সঙ্কল্পাত্মিকা শক্তি স্নায়ু সকলকে উত্তেজিত করিয়া আমার তৎকার্য্য সাধনোপযোগী প্রত্যঙ্গ বিশেষকে প্রবৃত্ত করায়; ইংরাজীতে এশক্তির নাম will force। যদি ইহাই হইল যে রজোগুণের সত্তায় প্রবৃত্তির সত্তা ও তদভাবে প্রবৃত্তির অভাব এবং শক্তির সত্তায় প্রবৃত্তির সত্তা ও তদভাবে প্রবৃত্তির ও অভাব হয় তবে রজোগুণ ও শক্তি (Force) একই পদার্থ বলা যাইতে পারে। রজোগুণকে 'চল'* বলা হইয়াছে ইহাতে ও রজোগুণের সহিত শক্তির সাদৃশ্য দেখিতেছি। এ সাদৃশ্য সংস্থাপনে যদি অতঃপর ও কিছু আবশ্যক বোধ হয় তবে তাহারও উল্লেখ করা যাইতে পারে। রজোগুণ 'উপষ্টম্ভক'। 'উপষ্টম্ভক' কথাটী বুঝাইবার জন্য পণ্ডিতবর বাচস্পতি মিশ্রের বৃত্তি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব। মিশ্র কহিতেছেন— 'সত্ত্বতমসী স্বয়মক্রিয়তয়া স্ব স্ব কার্য্য প্রবৃত্তিং প্রত্যবসীদন্তী রজসোপষ্টভ্যেতে, অবসাদাৎ প্রচ্যাব্য স্বকার্য্যে তে উৎসাহং প্রযত্নং কার্য্যেতে তদিদমুক্তমুপষ্টম্ভকং রজ ইতি' অর্থাৎ সত্ত্বও তমোগুণ স্বয়ং অক্রিয় হেতু নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া জড়ভাবে থাকে, রজোগুণ তাহাদের জড়ত্ব দূর করিয়া নিজ নিজ কার্য্য প্রবৃত্তির প্রতি উৎসাহ জন্মায় এই জন্যই রজোগুণকে 'উপষ্টম্ভক' বলা হইয়াছে। এ অর্থে শক্তি (Force) ও 'উপষ্টম্ভক' সন্দেহ নাই।

এপর্য্যন্ত যে সকল প্রমাণের উল্লেখ করা হইয়াছে তদ্দৃষ্টে বোধ হয় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এবং Existence Force ও resistance এ পক্ষদ্বয়ের সাদৃশ্য সম্বন্ধে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক আমরা এতক্ষণ ব্যস্তভাবে (separately) ইহাদের সাদৃশ্য দেখিতেছিলাম এক্ষণে সমস্ত (collectively) ভাবে সে সাদৃশ্য একবার দেখিয়া অদ্যকার প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

* 'উপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ' কারিকা ১৩শ্লোক

এস্থলে আদৌ কয়েকটী কথা বলিতে হইতেছে। যখন কোন পদার্থ আমরা প্রত্যক্ষ করি তখন প্রকৃত পক্ষে ঐ পদার্থের ধর্ম্ম গুলি ভিন্ন আর কিছুই আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না। চন্দ্র দেখিতেছি একথা বলিলে এই বুঝায় যে গৌর, ভাস্বর, বিস্তৃতিমান্ ও অবস্থান বিশেষবান্ কোনমূর্ত্তি দেখিতেছি। এই চারিটি ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে চন্দ্র আর আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে না। অতএব ইহা হইতে এই বুঝিলাম যে যাহার কোন ধর্ম্ম নাই তাহা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না সুতরাং তৎসম্বন্ধে জ্ঞান ও আমাদের থাকিতে পারে না। সুধু তাহাই নহে ; ঐ যে আকাশে চন্দ্র দেখিতেছি, যদি আকাশ ও চন্দ্রেরন্যায় গৌর ও ভাস্বর হইত, তবে আমরা আর তাহা দেখিতে পাইতাম না, বা দেখিতে পাইয়া ও দেখিতেছি বলিয়া বুঝিতে পারিতাম না ; আকাশ মাত্র দেখিতেছি বলিয়াই বোধ হইত। আবার ভূপৃষ্ঠ, আকাশ ও এদুয়ের মধ্যবর্ত্তিস্থান এই তিনটিই যদি একই প্রকার ধর্ম্ম বিশিষ্ট হইত তবে আকাশের ও প্রত্যক্ষ হইত না বা হইলে ও হইয়াছে বলিয়া বোধ হইত না। চন্দ্র দেখিতেছি বলিয়া বোধ হইতেছে কেন না চন্দ্র ও তৎসন্নিহিত নভঃপ্রদেশ বিভিন্ন ধর্ম্ম বিশিষ্ট। অতএব বুঝিলাম কোন পদার্থ প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে হইলে তাহার সন্নিহিত পদার্থ তাহা হইতে বিভিন্ন ধর্ম্ম বিশিষ্ট হইতে হইবে। এবিশ্বসংসারের যাবদীয় বস্তু যদি একই ধর্ম্ম বিশিষ্ট হইত তাহা হইলে আমরা কোন বস্তুরই উপলব্ধি করিতে পারিতাম না।

এক্ষণে পাঠক একবার মনে মনে existence (abstract), force ও resistance ইহাদের ক্রমে এক একটির বিনাশ কল্পনা করিয়া কি ফল লাভ হয় ভাবিয়া দেখুন। Existence না থাকিলে যে আর দুইটি ও থাকিবে না সে বিষয়ে তো কথাই নাই। যদি শক্তি (Force) না থাকে তবে নিরোধ (resistance) ও থাকিবে না কারণ নিরোধের বিষয় নাই। এক্ষণে রহিল সত্তা মাত্র (abstract existence) ৮ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সত্তা কোন ধর্ম্ম বিশেষবান্ নহে, এবং এই মাত্র দেখিয়াছি যাহার কোন ধর্ম্ম নাই আমরা তাহার উপলব্ধি করিতে পারি না ; যাহার উপলব্ধি করিতে পারি না তাহা আছে একথা কিরূপে বলি ? আমাদের সম্বন্ধে সে না থাকারই মধ্যে। অতএব সত্তা(abstract existence) আমরা নাই বলিলেও পারি। তাহা হইলে দেখিলাম শক্তির ধ্বংসে নিরোধ এবং সত্তার ও ধ্বংস হয়। সর্ব্বশেষে মনে করুন নিরোধের বিনাশ হইয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি নিরোধ হইতে আমরা শক্তির অনুমান করি ; সুতরাং নিরোধের বিনাশে আমাদের শক্তির অস্তিত্ব জানিবার উপায় ও বিনষ্ট হইল ; অর্থাৎ আমাদের পক্ষে শক্তি নাই ; তাহা হইলে আবার পূর্ব্ববৎ সত্তা মাত্র রহিল। বিশিষ্ট ধর্ম্ম বর্জ্জিত সত্তা (Abstract Existence) আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সু-

তরাং নিরোধের (Resistance) বিনাশে অপর দুইটিরও বিনাশ হইল। এ সকল কথা হইতে এই বুঝিলাম যে (Existence, Force,) ও (Resistance) এ তিনটি আশ্রয়াশ্রয়ি ভাবে সম্বদ্ধ,এক অপরের জনক ও ইহাদের বৃত্তিযুগপৎ হইয়া থাকে। কারিকায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে (অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়জনন মিথুন বৃত্তয়শ্চ গুণাঃ)।

আমরা যথাশক্তি গুণত্রয়ের সহিত Existence, Force ও Resistance এই ধর্ম্মত্রয়ের সাদৃশ্য দেখাইলাম। সাদৃশ্য এতদপেক্ষা সর্ব্বাঙ্গীণ কি হইতে পারে আমরা অনুমান করিতে পারি না। আমাদের বিবেচনায় এ সাদৃশ্য ও তাদাত্ম্যে প্রভেদ নাই ; এ বিবেচনা সঙ্গত কিনা পাঠক বিচার করিবেন।

শ্রীসা, রা—

প্রাচীন ভারত।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

স্ত্রীশিক্ষা।

স্ত্রীলোক সকল অবস্থাতেই পুরুষের সম্পূর্ণ অধীন ;—

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রস্তু স্থবিরে কালে স্ত্রিয়ো নাস্তি স্বতন্ত্রতা॥

স্ত্রীলোক কুমারী অবস্থায় পিতার, যৌবনে পতির ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের সম্পূর্ণ অধীন। তদ্ব্যতীত অপুত্রক হইলে পতিকুলের তদভাবে পিতৃকুলের, তদভাবে রাজার অধীন হইয়া থাকিবেন ; অপুত্রক স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ; যথা আমরা মনুসংহিতায় দেখিতে পাই ;—

বন্ধ্যাস্বপুত্রাসুচৈবংস্যাৎ রক্ষণং নিষ্কুলাসু চ।
পতিব্রতাসুচ স্ত্রীষু বিধবাস্বাতুরাসুচ॥
৮। ২৮

যাহা হউক পুরাকালে স্ত্রীলোক কখনই কোন অবস্থাতেও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে সমর্থা হইতেন না (মনু ৫। ১৪৮। এবং ৯। ৩)।

যদিও স্ত্রীগণের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমরা এইরূপ নানাপ্রকার কঠিন বিধান প্রত্যক্ষ করি তথাপি তাঁহাদের মানসিক উৎকর্ষ সাধনে আর্য্য মহর্ষিগণ কখনই স্খলিতপদ হন নাই ; প্রত্যুত অনেকেই স্ত্রীশিক্ষা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীয় স্বীয় ঔদার্য্য ও মহানুভাবকতার ভূরি ভূরি পরি-

চয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আমরা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে দেখিতে পাই ;—

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥

অর্থাৎ কন্যাগণকে অতি যত্নসহকারে লালন পালন ও শিক্ষা প্রদান করিয়া ধন রত্ন সহিত তাহাদিগকে বিদ্বান বরে সম্প্রদান করিবে। মহাভারত বন পর্ব্বে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠির সংবাদে আমরা দেখিতে পাই, মহর্ষি বেদব্যাস দ্রৌপদীকে পণ্ডিতা শব্দে আখ্যাত করিয়াছেন ;—

প্রিয়াচ দর্শনীয়াচ পণ্ডিতাচ পতিব্রতা।
অথ কৃষ্ণা ধর্ম্মরাজমিদং বচনমব্রবীৎ॥

অর্থাৎ প্রিয়া, দর্শনীয়া পণ্ডিতা, পতিব্রতা কৃষ্ণা ধর্ম্মরাজকে এই কথা বলিলেন ; মহাভারতের সময়ে স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা যদি সমাজে ঘৃণাকর হইত, তাহা হইলে পাণ্ডব গণের হিতেচ্ছু মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কখনই দ্রৌপদীর বিশেষণ স্থলে পণ্ডিতা শব্দটি ব্যবহার করিতেন না ; ইহাতেই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে ঐ সময়ে উহা স্ত্রীলোকের নানা গুণের অন্যতম বলিয়া অভিহিত হইত। বেদ প্রণয়নের সময়েও স্ত্রীগণ বিদুষী ছিলেন ; তাঁহার প্রমাণ বেদাদি হইতেই সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এমন কি তৎ সময়ে তাঁহারা দুরূহ বেদ বিদ্যা পর্য্যন্ত অভ্যাস করিতেন, তবে মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ স্ত্রীগণের বেদ পাঠ নিষেধ করিয়াছেন (৯। ১৮—১৯) কিন্তু তাই বলিয়া যে সর্ব্বত্রই মন্বাদির নিয়ম প্রতিপালিত হইত এমন বোধ হয় না, কেননা শ্রুতি গ্রন্থে দেখা যায় স্ত্রীলোকও পুরুষের ন্যায় বেদাধ্যয়ন করিতেছেন। বৃহৎ আরণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী গার্গিকে বেদের কঠিনাংশ জ্ঞানকাণ্ড শিক্ষা দিতেছেন ; এবং এইরূপে তাঁহার নিকট ব্যাখ্যা করিতেছেন ;—

এতদ্বৈতদক্ষরং গার্গি ব্রহ্মণা অভিবদন্তি।

ইহা দ্বারা বেস প্রতিপন্ন হয় যে গার্গি বেদাধ্যয়ন করিতেন ; এইরূপে মৈত্রেয়ী প্রভৃতি স্ত্রীগণও বেদ পাঠ করিতেন এইরূপ জানা যায়। ঋগ্বেদে দেখিতে পাই অত্রিবংশ সমুদ্ভূতা বিশ্ববারা নাম্নী রমণী ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্ত স্বয়ং রচনা করিয়াছেন ; যদি স্ত্রীশিক্ষা তৎকালে গুণের নিদান স্বরূপ না হইত, তাহা হইলে উক্ত রমণীর নাম কখনই তাহাতে সন্নিবেশিত হইত না। আরও বেদ প্রচারক ঋষিগণের মধ্যে আমরা জুহূ, দেবশুনি প্রভৃতি স্ত্রী ঋষিগণের উল্লেখ দেখিতে পাই ; ইহাঁরা অন্যান্য ঋষির মত সাধারণ্যে বেদ প্রচার করিতেন ; কিন্তু কোন বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকিলে তাহা জনসমাজে কখনই প্রচার করা যায় না, ইহাতেই বিশেষ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে তাঁহারা বিশেষরূপে বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন ; এই সকল দৃষ্টে ইহাই অনুমান করা যাইতে পারে যে, বৈদিক সময়ে বেদ পাঠ স্ত্রীগণের মধ্যে নিষিদ্ধ ছিল না। তবে মহর্ষি মনু তাঁহাদের বেদ পাঠ নিষেধ করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার বেদ পাঠ নিষেধ করার অভি-

প্রায়ে ইহাই উপলব্ধি হইতেছে যে স্ত্রীলোকগণ বেদ ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার অধিকারিণী। বেদ স্ত্রাগণের কোনই উপকারে আইসে না এই জন্যই তাঁহার অধ্যয়ন নিষেধ করিয়াছেন বলিয়াই প্রতীয়মান হয় (৯। ১৮—১৯)। অন্য কোন কারণে নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের ৫২ অধ্যায়ের শ্রীধর স্বামী কৃত টিকায় পরিদৃষ্ট হয় যে, ভীষ্মকদুহিতা শিশুপালের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তা হইয়া তাঁহাকে গোপনে পত্রিকা লিখিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন; এই সকল দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীয়মান ইতে ছে যে. বেদ, মনুসংহিতা মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের সময়ে স্ত্রীগণের শিক্ষা সমাজে প্রচলিত ছিল।

এক্ষণে আমরা পরবর্ত্তী অর্থাৎ মধ্য সময়ে স্ত্রীশিক্ষা সমাজে প্রচলিত ছিল কি না তাহাই প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। মধ্য সময়ের লেখক কালিদাসাদির গ্রন্থ নিচয় সন্দর্শন করিলেই এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে; এক্ষণে দেখাযাউক তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থে স্ত্রীশিক্ষার কোন উল্লেখ আছে কি না? কালিদাস প্রণীত কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞান শকুন্তলা প্রভৃতি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেই ইহা যে তখনও সমাজে স্থান পাইয়াছিল তাহা উত্তম রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। শকুন্তলা মালিনী নদী তীরস্থিত পত্রকুটীরে বিরহবেদনায় অস্থিরা হইয়া পদ্মপত্র রচিত শয্যায় শায়িতা আছেন, তাঁহার দুই সহচরী অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদা যথাসাধ্য প্রতীকার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। আবার তাঁহার বিরহবিকার অনুমান করিয়া তাঁহারা তাঁহার মুখ হইতে বিকারের যথার্থ কারণ অবগত হইতে বারম্বার অনুরোধ ও যত্ন করিতেছেন, এদিকে মহারাজ দুষ্মন্ত লতা বিতান অন্তরাল হইতে ধীরে ধীরে তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঋষিপালিতা শকুন্তলা পদ্মপত্রে দুষ্মন্তকে পত্র লিখিতেছেন। চক্ষু মুদ্রিতেছেন, আবার লিখিতেছেন, লিখিয়া অর্দ্ধরুদ্ধ স্বরে সহচরীগণকে পড়িয়া শুনাইতেছেন, এই সুন্দর দৃশ্যটি পাঠকের স্মরণ হয়? যদি হয় তাহা হইলে আর কি করিয়া বলিবেন তৎকালে বিদ্যা শিক্ষা স্ত্রী সমাজে স্থান পায় নাই? আবার তৎপরবর্ত্তী কবি ভবভূতি উত্তর রামচরিতের দ্বিতীয় অঙ্কে বলিতেছেন, আত্রেয়ী বাল্মিকী আশ্রম হইতে অগস্ত্য ও অন্যান্য ঋষির নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে যাইতেছেন, ইহা দেখিয়াও কি বলিবেন তৎকালে স্ত্রীগণ ইদানীন্তন কালের ন্যায় অশিক্ষিতা ছিলেন? এস্থলে যদি কেহ বলেন শকুন্তলা কি আত্রেয়ী কালিদাস বা ভবভূতির সম সাময়িক নহেন; তাঁহারা পূর্ব্বকালের ঘটনা লইয়া স্বস্ব গ্রন্থের উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন, রামায়ণাদির সময়ে স্ত্রীশিক্ষা সমাজে প্রচলিত ছিল, সেই জন্য তাঁহারা আপনাপন গ্রন্থ মধ্যে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন,

এতদুত্তরে আমরা বলি, তাঁহাদের সময়ে যদি স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীলোকগণের প্রধান গুণ বলিয়া পরিগণিত না হইত, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই তাহার উল্লেখ করিতে পারিতেন না ; কেননা প্রাচীন ঘটনা ধরিয়া লিখিলেও তাহা নিজ সময়ের ছায়ায় পরিপূরিত হয় ; না হইলে সে গ্রন্থ কখনই স্বাভাবিক ও সকলের মনস্তুষ্টি বিধান করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু কালিদাসাদির গ্রন্থ তাঁহাদের সময়েও বিশেষ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিল; তদানীন্তন সমাজানুযায়ী লিখন না হইলে গ্রন্থ তত শীঘ্র কখনই সমাজে আদৃত হইত না ইহাদ্বারা বেস প্রতিপন্ন হইতেছে যে তাঁহাদের সময়েও অল্প বা অধিক পরিমাণে স্ত্রীশিক্ষা সমাজে প্রচলিত ছিল। পাঠক খনা লীলাবতীর সমুদয় লীলা কি বিস্মৃত হইয়াছেন? যদি না হইয়া থাকেন তবে কোন প্রাণে বলিবেন আর্য্য রমণীগণ পুরাকালে শিক্ষিতা হইতেন না। আবার পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্ত্রী লোকগণ কি ধর্ম্ম কি যুদ্ধ এইরূপ কঠিন বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, তাঁহাদের হৃদয় প্রদীপ্ত জ্ঞানালোকে বিভাসিত না হইলে কদাচ সেরূপ সম্ভাবিত নহে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে তদানীন্তন সমাজে স্ত্রীগণ উত্তমরূপে শিক্ষিতা হইতেন।. পুত্রকে শিক্ষা প্রদান করা যেমন পিতা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম কন্যাকেও শিক্ষা দেওয়া সেইরূপ তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল; পুত্রের শিক্ষার্থে যত্ন করিলে পরকালের কোন বিশেষ ফলই হয় না; কিন্তু কন্যাকে শিক্ষা প্রদান করিয়া উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করিলে তাঁহার পুণ্য সঞ্চয় হয় ও তিনি অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী হন। এই সকল কারণ বশতঃই স্ত্রীশিক্ষা তৎকালে এতাধিক প্রচলিত হইয়াছিল। আবার স্ত্রীগণ যে কেবল বিদ্যা শিক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন তাহা নহে; তাঁহারা চিত্র বিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিদ্যারও সমধিক আলোচনা করিতেন এবং যত্ন সহকারে তাহা শিক্ষা করিতেন এক্ষণে ক্রমান্বয়ে তাহাই প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

পুরাণ ও শ্রীহর্ষাদি প্রণীত গ্রন্থ নিচয় দৃষ্টে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে পুরাকালে স্ত্রীলোকগণ চিত্র বিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শিতা দেখাইতেন; আমরা নিম্নে কবি শ্রীহর্ষ প্রণীত রত্নাবলী নাটিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—পাঠক! ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন যে চিত্র বিদ্যা স্ত্রীলোকগণের বিশেষ আয়ত্তাধীন ছিল; এবং তাঁহারা স্বহস্তে এমন চিত্র নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে তাহা আধুনিক ফটোগ্রাফ হইতে কোন অংশেই নিকৃষ্টবলিয়া বিবেচনা হয় না। তৎকালে চিত্র বিদ্যার এতাদৃশী উন্নতি হইয়াছিল যে আত্মার অবস্থান্তর বুঝাইবার নিমিত্ত চিত্রের অবস্থাগত ভেদের সহিত, আত্মার অবস্থা ভেদের কোন বিভিন্নতাই পরিলক্ষিত হইত না; প্রত্যুত চিত্র-

পট দর্শন করিলেই চিত্র পটাঙ্কিত ব্যক্তির অবস্থা স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারা যাইত। কবি শ্রীহর্ষ তদীয় রত্নাবলী নাটিকার দ্বিতীয় অঙ্কে লিখিয়াছেন ;—

সুসঙ্গতা।—(উপবিশ্য ফলকং গৃহীত্বা দৃষ্টাচ) সহি কো এসো তুএ আলিহিদো।

সাগরিকা।--পউত্ত মহুসবো ভ অবং অণঙ্গো।

সুসঙ্গতা।—(সস্মিতং) অহোদে নিউণত্তনং কিং! উন সুউণং বি অ চিত্তং পরিভাদি, তা অহংপি আলিহিঅ রই সনাহং করিস্সং। (বর্ত্তিকাং গৃহীত্বা নাট্যেন রতি ব্যপদেশেন সাগরিকামালিখতি।)

সাগরিকা।—(বিলোক্য সক্রোধং।) সহি, সুসঙ্গদে, কীস তুএ অহং এথ আলিহিদা।

সসুঙ্গতা।—(বিহস্য।) সহি, কি অ আরণে কুপ্পসি, জাদিসো তুএ কামদেবো আলিহিদো,তাদিসী মএ রই আলিহিদেত্তি, তা অন্যহা সংভাবিণি কি তুএ এদিনা আলোবিদেন, কহেহি সব্বং বুত্তন্তং।

* * * * * *

রাজা। (ফলকং নিধন্য।)

কৃচ্ছ্রাদূরুযুগং ব্যতীত্য সুচিরং ভ্রান্ত্বা নিতম্বস্থলে
মধ্যেঽস্যাস্ত্রিবলী তরঙ্গ বিষমে নিষ্পন্দতামাগতা।
মদ্দৃষ্টি স্তৃষিতেব সম্প্রতি শনৈরারুহ্য তুঙ্গৌ স্তনৌ
সাকাঙ্ক্ষং মুহুরীক্ষতে জল লব প্রস্যন্দিনী লোচনে॥

আমরা এই সুন্দর অংশটির অনুবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—

সুসঙ্গতা।—(উপবেশন পূর্ব্বক চিত্র গ্রহণ ও দর্শন করিয়া) সখি! তুমি ইহাতে কাহাকে লিখিয়াছ ?

সাগরিকা।—বসন্ত মহোৎসবে ভগবান অনঙ্গ।

সুসঙ্গতা।—(সস্মিত বদনে) আহাহা! তুমি কি নিপুণ চিত্রকর? কিন্তু ইহা ত সম্পূর্ণ হয় নাই ; তা আমি রতি লিখিয়া ইহাকে সনাথ করি।

(বর্ত্তিকা গ্রহণ করিয়া রতি ব্যপদেশে সাগরিকার চিত্র লিখন।)

সাগরিকা।—(দেখিয়া সক্রোধে) সখি সুসঙ্গেতে—কি নিমিত্ত তুমি আমাকে ইহাতে লিখিলে ?

সুসঙ্গতা।—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) সখি। কেন অকারণে রাগ কর ? তুমি যেমন কামদেব লিখিয়াছ আমিও তেমনি রতি লিখিয়াছি ; তাহে অন্যথাসম্ভাবিনী এখন আর ওসব কথায় কাজ কি ? আমাকে সমুদায় বৃত্তান্ত বল।

× × × × ×

রাজা।—(চিত্রপট দর্শন পূর্ব্বক) আমার চক্ষুদ্বয় অতি কষ্টে উরু যুগ অতিক্রম করিয়া নিতম্বস্থলে ভ্রমণান্তর মধ্যদেশে গিয়া পতিত হয় ; তথায় বিষম ত্রিবলী তরঙ্গে তাঁহারা নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছে ; এক্ষণে তৃষিতের ন্যায় আমার দৃষ্টি ক্রমশঃ পয়োধর যুগল পর্য্যন্ত উঠিয়া সাকাঙ্ক্ষে ইহাঁর সজল নয়ন যুগলের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে।

এই উদ্ধৃত অংশ দেখিয়া কে অস্বীকার করিবেন যে তখন স্ত্রীগণ সুন্দর চিত্রপট প্রস্তুত করিতেন না। সাগরিকা সিংহল রাজকন্যা; তিনি বসন্ত মহোৎসবের দিন বৎসরাজ উদয়নকে অবলোকন করিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরাগিণী হইয়াছিলেন; কিন্তু একথা কাহাকেও না জানাইয়া একদিন একাকী কদলীকুঞ্জ কুটীরে গমন করিয়া স্বীয় বিরহ বেদনার কথঞ্চিৎ উপশমনার্থ উদয়নের প্রতিকৃতি চিত্র করিতেছিলেন, এমন সময় সুসঙ্গতা নাম্নী অপরাদাসী তথায় উপস্থিত হয়; সুসঙ্গতা চিত্র দেখিয়াই তাহা বৎসরাজের চিত্র বলিয়া জানিতে পারিল। সাগরিকা বৎসরাজের অবিকল প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়াছিলেন, না হইলে সুসঙ্গতা কি প্রকারে তাহা বৎসরাজের বলিয়া বুঝিতে পারিল; ইহাতেই স্পষ্ট জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে, যে তখন স্ত্রীগণ মধ্যে চিত্র বিদ্যার কিরূপ উৎকর্ষ হইয়াছিল। যদি কেহ বলেন সাগরিকা রাজকন্যা, সুতরাং তাঁহার পক্ষে চিত্র বিদ্যাভ্যাস কঠিন নহে; কিন্তু ইহা সাধারণ স্ত্রী সমাজে প্রচলিত ছিল না। তাহাতে আমরা বলি দাসী সুসঙ্গতাত আর রাজকন্যা নহে; যদি সাধারণে চিত্রালোচন না করিত তাহা হইলে সুসঙ্গতা কি প্রকারে সাগরিকার অবিকল প্রতিকৃতি লিখিতে সমর্থ হইত? ইহা দৃষ্টে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয় যে উহা সাধারণ স্ত্রী সমাজে প্রচলিত এবং স্ত্রীগণের একটি প্রধান গুণ বলিয়া পরিগণিত ছিল।

এখনকার স্ত্রীলোকের মত তদানীন্তন কামিনীগণ পশমের কার্য্য করিতেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহারা যে অন্যান্য শিল্প কার্য্য করিতেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এসম্বন্ধে আর অধিক লিখিবার আবশ্যকতা নাই। তবে চিত্রপট লিখন যে শিল্প কার্য্যের সামান্য নিদর্শন নহে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত; আমরা ব্যবস্থাপকগণের ব্যবস্থায় যোষিদ্‌গণের শিল্পার্জ্জিত ধন বলিয়া ধনের উল্লেখ দেখিতে পাই; শিল্পার্জ্জিত ধন বলিলে স্ত্রীলোকগণ নিজের শিল্পাদি দ্বারা বিক্রয়ে যে ধন উপার্জ্জন করিতেন তাহাই। দায়ভাগের স্ত্রীধন প্রকরণে লিখিত আছে যে, স্বামীবিপদ গ্রস্ত না হইলে কদাচ স্ত্রীধন লইতে পারিতেন না; কিন্তু স্ত্রীর পিতা, মাতা বা পিতৃকুলের জ্ঞাতি ভিন্ন অন্য লোক হইতে প্রাপ্ত ধনে পতির বিপদ ভিন্ন ব্যবহারের ক্ষমতা আছে।

পূর্ব্বকালে সঙ্গীত বিদ্যাও স্ত্রীসমাজে সম্মান লাভ করিয়াছিল; উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, চিত্রলেখা প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত স্থল; যদি কেহ বলেন, উহারা মানবী নহে, অপ্সরযোনি-সম্ভূতা, ও গণিকা, তাহা হইলে আমরা নাটকাদির প্রথমে নটীর অবতারণার উল্লেখ করি। তাঁহারা সঙ্গীতাভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। ইহাতেও যদি কেহ বলেন, তাহারা নট বংশ সম্ভূতা; সুতরাং নীচ সমাজস্থা, তাহারা সঙ্গীতালোচনা করিত বলিয়া যে সভ্য আর্য্য রমণী সমাজেও তাহা সম্মান লাভ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ কি? তাহা হইলে আমরা মৎস্যরাজ

পুত্রী উত্তরাকে তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারি। মৎস্যরাজ স্বীয় দুহিতাকে সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শিনী করিবার নিমিত্তই বৃহন্নলা নামধারী তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনকে তাঁহার সঙ্গীতাধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছিলেন; সঙ্গীত শিক্ষা যদি সমাজের প্রতিকূল হইত তাহা হইলে বিরাটরাজ কখনই স্বীয় কন্যাকে কলঙ্কিনী করিবার জন্য তাঁহার শিক্ষক নিযুক্ত করিতেন না। ইহাতেই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, তৎকালে সঙ্গীত ভদ্র স্ত্রীসমাজেও স্বীয় রমণীয় মনমুগ্ধকারী, অসামান্য আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল এবং ইহা স্ত্রীলোকগণের নানাবিধ সদ্‌গুণের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু বৃদ্ধ মনু ইহাদের সঙ্গীত শিক্ষার নিতান্ত বিরোধী; তাহা হইলেও তাঁহার নিয়ম যে এবিষয়ে সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হইত না তাহা উপরিধৃত দৃষ্টান্তেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত প্রদর্শনকরা যাইতে পারে; কিন্তু তদুল্লেখ অনাবশ্যক। পুরাকালে পুরুষগণ মধ্যে সঙ্গীত বিদ্যার যথেষ্ট সমালোচন হইত; প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে সঙ্গীতের ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদ আছে, কেহ কেহ ইহাকে জপাদি সকলেরই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। গন্ধর্ব্ব বেদাদি শত শত গ্রন্থ সঙ্গীত বিদ্যার উপদেশে পরিপূর্ণ। যাহাহউক তদুল্লেখে ক্ষান্ত হইয়া স্ত্রীলোকগণ তৎকালে সমাজে কি প্রকার অবস্থায় অবস্থিত ছিলেন তাহাই প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

স্ত্রীগণের সামাজিক অবস্থা।

প্রথমতঃ দেখাযাউক স্ত্রীগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাতন আর্য্য ঋষিরা কি প্রকার মত অবলম্বন করিয়াছেন। এসম্বন্ধে ইউরোপীয়গণ বলেন যে জগদীশ্বর প্রথমে আদমকে (Adam) সৃষ্টি করিয়া এই পৃথীতলে ঈডেন (Eden) নামক উদ্যানে প্রেরণ করেন। পরে তাঁহার সুখ বিধানার্থ তাঁহার বামপঞ্জর হইতে ইবার (Eve) সৃষ্টি সাধন হয়। ইহাতে অন্য কথায় ইহাই বলা হইল যে স্ত্রীগণ কেবল পুরুষ জাতির সুখ সম্বর্দ্ধনার্থই সৃষ্ট হইয়াছেন; তাঁহারা পুরুষ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং পুরুষের সম্পূর্ণ অধীন; স্ত্রীলোকের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই যুক্তি ও মত কখনই জ্ঞানীগণের মনস্তুষ্টি সংসাধক নহে, ইহা কখনই জগদীশ্বরের অভিপ্রেত নহে যে একজন সতত অন্যের অধীন হইয়া থাকেন, তাঁহার নিকট স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সমান। এসম্বন্ধে ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ যে মত প্রদান করিয়াছেন তাহা অতি উদার ও মহান; তাঁহারা পুরুষ হইতে স্ত্রীর উৎপত্তি বলেন না, তাঁহাদের মতে যেমন পুরুষ তেমনই স্ত্রী সৃষ্ট হইয়াছে, আর্য্যঋষিগণ যদিও স্ত্রীলোককে বিধানানুসারে পুরুষের সম্পূর্ণ অধীন করিয়াছেন তথাপি উৎপত্তি কালে উভয়কেই সমান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; আবার কেহ কেহ বা তাঁহাদিগকে পুরুষ হইতেও উপপদ প্রদান করিয়াছেন; এসম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন—

দ্বিধাকৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী——— ॥ ১। ৩২

অর্থাৎ ব্রহ্মা আপনার দেহ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া তাহার অর্দ্ধে পুরুষ ও অপরার্দ্ধে নারী হইলেন। তাহা হইলেই উৎপত্তি কালে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই সমানস্থান প্রদান করা হইয়াছে। আবার অন্যমতে এই পৃথিবী সর্ব্ব প্রথমে অন্ধ তামসে সমাচ্ছন্ন ছিল, তখন কোন জীব জন্তু বা গ্রহাদিরই সৃষ্টি হয় নাই, কেবল দিগন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আদ্যাশক্তি সেই অন্ধকার মধ্যে একা বিরাজিতা ছিলেন, তাঁহা হইতেই এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, স্ত্রী পুরুষের সমান নহেন, বরং শ্রেষ্ঠা, এবং পুরুষ-অন্যান্য জীব জন্তু ও গ্রহ নক্ষত্রাদি তাঁহারই সৃষ্টি। ইহাদ্বারা স্পষ্টতঃই জানা যাইতেছে যে, বাইবেলের মত আর্য্য ঋষিরা স্ত্রীকে পুরুষের অধীন করেন নাই। না করিয়া তাঁহারা আপনাদেরই মহত্ত্ব অব্যাহত রাখিয়াছেন; আবার মনু অপর একস্থলে বলিয়াছেন যে "মনুষ্য মাত্র স্ত্রীর সহিত এক যোগে সম্পূর্ণ একটি জন—কারণ স্ত্রী দেহের অর্দ্ধাংশ" ইহাতেও সেই মহত্ত্ব সুরক্ষিত হইয়াছে।

সমাজে স্ত্রী তিন প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়; সাধ্বী, ভোগ্যা ও কুলটা। পুরাণাদির মতে স্ত্রী প্রকৃতির অংশ; এবং সত্ত্ব গুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে সাধ্বী, রজো গুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে ভোগ্যা এবং তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে কুলটা নারীর উৎপত্তি হইয়াছে। কুলটা বলিলেই আমাদের মনে গণিকা বলিয়া জ্ঞান হয়; কিন্তু পূর্ব্বকালে কুলটা শব্দের বিভিন্নার্থ ছিল। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টিকাকার রাম তর্কবাগীশ লিখিয়াছেন, কুলটাও যতী অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তাহার ব্যুৎপত্তি এই প্রকার 'কুলং গ্রামং অটতি গচ্ছতি ভ্রাম্যতি' অর্থাৎ যাহারা স্বাধীন ভাবে গ্রাম মধ্যে বিচরণ করে;—আর ইদানীন্তন ব্যুৎপত্তি এইরূপ 'কুলং অটতি ত্যজতি' অর্থাৎ যাহারা স্বীয় কুল ত্যাগ করে। যাহা হউক এই উভয় ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিলেও এই বোধ হয় যে কুলটা শব্দ কখনই ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রী বলিয়া ব্যবহৃত হয় নাই। কেননা 'নস্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' অর্থাৎ কোন স্ত্রীই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে পারিবেন না; যদি তাহা হয় তবে যাঁহারা স্বাধীন ভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন তাঁহারা কখনই পবিত্রা নহেন সুতরাং দুষ্টা স্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

এক্ষণে দেখা যাউক সমাজে স্ত্রীলোকের কি প্রকার অধিকার ছিল—ইহা দেখিতে হইলে স্মৃতিশাস্ত্রপ্রণেতা গণের ব্যবস্থা দৃষ্টি করিতে হয়। স্ত্রী সম্বন্ধে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, দক্ষ, ব্যাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংহিতাকারগণ নিজ নিজ সংহিতা মধ্যে বহুল কীর্ত্তন করিয়াছেন; তন্মধ্যে দক্ষ, ব্যাস ও বিষ্ণুই বিস্তারিত রূপে লিখিয়াছেন। কিন্তু মনু সংহিতাকার গণের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান; এই জন্য আমরা তাঁহারই মত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম; আবশ্যক হইলে অন্যান্য সংহিতাকার গণের মতও সমালোচন করা যাইবে।

ক্রমশঃ

অগ্নিকুল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ।

ময়না শয়ন করিয়া অবধি নিদ্রা যাইতে পারিতেছে না। বেদঘ্নের সুদীর্ঘ নাসিকা তাহার মনে পড়িতেছে আর হাসিতেছে কখন কখন বা ভাবিতেছে বেদঘ্ন কেমন করিয়া সেনাপতি হইল যাহার সামান্য বোধ নাই, যে পরদারে এত উৎসাহী এবং যাহার মন এত নীচ!! সংসারে উন্নতি কাহার?—সাধুর না পাষণ্ডের না চাটুকারের! চাটুকারেরই জয়, যে পরের নিন্দা পরের অনিষ্ট করে, পরশ্রীকাতর, পরের প্রশংসা শুনিতে অসুখী, তাহারই জয় তাহারই উন্নতি। একজন ধর্ম্মের জন্য সুখ, রাজত্ব, সম্ভ্রম, বিলাস ছাড়িয়া প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে, উচিত কার্য্য করে ও সত্য কথা কহে—তাহার দণ্ড। আর একজন দাসীপুত্র হইয়া, মিথ্যা কহিয়া অসদাচরণ করিয়া এবং কেবল নিন্দা ও স্তুতিস্তব করিয়া প্রশংসা ও উচ্চ পদ পায়, ইহার বিচার নাই, ইহার দৃষ্টি নাই, পুণ্যের জয় নাই, পাপের শাস্তি নাই, এ কেমন কথা। সূর্য্যনাথ বন্দী হইলেন, বেদঘ্ন সেনাপতি হইলেন,—ছি ছি ছি। যাহার ক্ষমতা আছে সেই দুষ্টের দমন করিয়া থাকে, ইহার দেশকাল পাত্রের বিবেচনা কি। সূর্য্যনাথকে উদ্ধার করিব আমার ক্ষমতা নাই। কিন্তু বেদঘ্নের কিছু অনিষ্ট করিতে পারি আমার তেমন ক্ষমতা আছে। আর কএক দণ্ড পরেই, এই ময়না সুন্দরী তাহার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ হইবেন।

আচ্ছা ভাল, বেদঘ্ন আমার কি অনিষ্ট করিয়াছে। দস্যু অপরের প্রাণ নিয়াছে,—রাজার তাহাতে কি, তিনি তাহার প্রাণ লইবার কে। অবশ্য প্রাণ লইবার তাহার অধিকার আছে। কেননা দস্যু যদি রাজাকেও তাহাই করে। বেদঘ্ন সূর্য্যনাথের অনিষ্ট করিয়াছে—আমারও তো করিতে পারে? তবে আমি কি রাজা?—আমার যত টুকু ক্ষমতা আছে আমি তত টুকু রাজা। রাজার সৈন্য সামন্ত আছে আমার যে তাহা নাই। কে বলিল নাই?—তবে এতবড় সেনাপতির ঘাড় মচকাইলাম কেমন করিয়া। রাজার রাজদণ্ড, প্রজার রাজভক্তি। যৌবন আমার রাজদণ্ড, সাধুর উপকার করিতে পারি না পারি, যত দিন এই দণ্ড রাজরাজেশ্বরী ময়না সুন্দরীর শ্রীকর কমল প্রান্তে—থাকিবে, তত দিন—দুরাচারগণ শাস্তির হাত অতিক্রম করিতে পারিবে না। আজ বেদঘ্নের বিচারের দিন; আমার এই সুকোমল পদ্মাভ গালে—সে কর্কশ গণ্ডার-নাসিকা স্পর্শ করাইয়াছিল কেন? আর সূর্য্যনাথের ভোজন শেষ না হইতে তাঁহাকে শিকল পরাইল কেন।

সূর্য্যনাথ আমার কে?—কেন, তিনি আমাকে ঘৃণা করেন তথাপি আমি তাঁহার দাসী। ঘৃণা যদি না করিতেন?—ঘৃণা না করিলে—আমি তাঁহাকে ঘৃণা করিতাম। ইহাই সংসারের নিয়ম, যে চাহে না বা যাহার চাহিবার প্রয়োজন নাই লোকে তাহাকেই আদর করিয়া দেয়,—যে চাহে তাহাকে না দিয়া লোকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়,—পণ্ডিতের ঘরে হা অন্ন, মূর্খের অন্ন বাঁদরে খায়।

অনেক ক্ষণ এইরূপ পাগলির মত ভাবিয়া ময়না দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। গগণে চাহিয়া দেখিল—মন্দাকিনী শুকাইয়া গিয়াছে। বড় বড় নক্ষত্রগুলি বিবর্ণ প্রায় হইয়াছে। ময়না আপনা আপনি ছোট করিয়া বলিল—'এইত শেষরাত্রি, এখন শুভ যাত্রার আয়োজন দেখি গিয়া'।

এদিকে বেদম্ন সূর্য্যনাথকে কারাগারে দিয়া পরেশনাথের সমীপে গিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া—আপন দ্রব্য সামগ্রী সূর্য্যনাথের অট্টালিকায় আনিয়া—আপন বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। আহারাদি করিয়া সূর্য্যনাথের খট্টায় শয়ন করিয়াছেন। আর মনে মনে আপনাকে মহতের এক শেষ ভাবিতেছেন। কোনরূপে রাত্র প্রভাত হইলেই হয়, সেনাপতির পোসাক পরিয়া বেড়াইয়া আসিতে পারেন। মনে মনে আরও ভাবিতেছেন 'আজি শেষ রজনী হইতে আমার সৌভাগ্য অঙ্কুরিত, পল্লবিত এবং প্রস্ফুটিত হইবে। ময়না তো হাতে উড়িয়া আপনি আসিয়াছে—সেই আমার শিকারী বাজ হইবে। সূর্য্যনাথের সুন্দর বন্য পাখীটি ধরিয়া আনিবে। কুঙ্কুমা প্রভুপত্নী বটে কিন্তু প্রভুর ত্যজ্যা। শুনিয়াছি তিনি বড় বিলাসিনী,—বিলাস-প্রিয়তা আমারও সামান্য নহে,—সুতরাং ব্যবহারগত মিল থাকিলে প্রকৃতিগত মিল থাকাও অসম্ভব নহে। তবেইত হইল আমি সূর্য্যনাথ হইতে কম কিসে হইলাম। ধন বল, মান বল, বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল—আমি সূর্য্যনাথ হইতে কিছুতেই ন্যূন নহি, তাহাই যদি না হইবে, তবে সামান্য সৈনিকপদ হইতে প্রধান সেনাপতি কি রূপে হইলাম। তবে বয়েস আমার কিছু বেশী, তেমন আমার সৌন্দর্য্যও বেশী, কেমন নাকটি আমার, আমি নাসিকার রাজা, শুনিয়াছি রমণীগণ এই নাসিকার প্রশংসা করিয়া থাকেন, কবিগণ ইহাকেই বলেন, খ গ জিনি নাসা। ইহার পর কবি-লেখনীতে খগের পরিবর্ত্তে বেদম্ন নাসা, উপমাস্থলে যে প্রসূত হইবে না তাহারই বা আশ্চর্য্য কি'।

এইরূপ অনেক সুখ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার তন্দ্রা আসিল। অনেক সুখস্বপ্ন দেখিয়া অবশেষে দেখিতে লাগিলেন, ময়না তাঁহার কাছে শুইয়া, তাঁহার নাসিকাটি একবার খসাইতেছে—একবার বসাইতেছে এইরূপ করিতে করিতে একবার লইয়া পলাইল। অমনি বেদম্ন নাকে হাত দিয়া তাড়াতাড়ি, চমকিয়া—জাগিলেন।

এমন সময় কে দরজায় শব্দ করিল, বেদম বলিল, 'কে তুমি?' আগন্তুক বলিল

'যোধসিংহ।'

'কে আমার পরম-মিত্র যোধ?'

'হাঁ দ্বার খুলিয়া দিন?'

বেদঘ্ন দ্বারোদ্ঘাটন করিলে, অমনি যোধসিংহ গৃহে প্রবিষ্ট হইল। সত্যবতী তাহার পশ্চাতে ছিলেন সুতরাং বেদঘ্ন তাহাকে দেখিতে পান নাই—বলিলেন

'যোধ কি জন্য আসিয়াছ?'

যোধ কিছু না বলিয়া সত্যবতীকে টানিয়া সম্মুখে আনিলেন।

সত্যবতীর চক্ষে অগ্নি ছুটিতেছে—ক্রোধে বদন রক্তিম এবং স্ফীত হইয়াছে, কপালের হীরকবিন্দুতে দীপরশ্মি লাগিয়া কপালেও যেন অগ্নি ছুটিতেছে—এদিকে সর্ব্বাঙ্গ উলঙ্গ, কটিবেড়া কৃষ্ণাজীন। হঠাৎ এই ভীষণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া বেদঘ্ন ভয় বিস্ময়ে তাড়াতাড়ি পশ্চাৎপদ হইলেন, পরে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —'একি!—কে'?

'কারাগৃহে সেনাপতির নিকট পাইয়াছি।'

'ইহারই নাম সত্যবতী'।

'তাহাই সম্ভব'।

বালিকা দন্ত কটমট করিয়া বলিল—

'আমার নাম গায়ত্রী'।

বেদঘ্ন বলিলেন, 'তুমি যেই হও, অসামান্য রূপবতী, তোমাকে আজ এই গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হইবে'।

'আমি থাকিব না'।

'কোথায় যাইবে?'

'মায়ের কাছে'

'কে মা'?

'তোমার প্রভুপত্নী'—

বেদঘ্ন হা, হা, রবে বিকট শব্দে হাস্য করিয়া বলিলেন, 'যোধ তুমি যাও আমি দরজা বন্ধ করিয়া দিই'—

সত্যবতী বিপদ দেখিয়া হতাশ নয়নে চারিদিকে চাহিলেন, হঠাৎ দেয়ালের গায় অনেক গুলি অস্ত্র দেখিতে পাইয়া,—তন্মধ্যস্থ যুদ্ধকুঠার হস্তে তুলিয়া বলিলেন 'কাটিয়া দুই খণ্ড করিব।'

বেদঘ্ন ভয়ে দৌড়িয়া দুই তিন সিড়ি নীচে নামিলেন, যোধ সিংহও তাহাই করিল। সত্যবতী স্থিরভাবে কুঠারহস্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বেদঘ্ন তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া বাহিরের বন্ধনী আটিয়া দিয়া কহিলেন—

'যোধ, কল্য প্রত্যূষে এই ভয়ঙ্করী বালিকাকে বিচারার্থে প্রভু সমীপে উপস্থিত করিতে হইবে?'

'এই সিংহমুখে আবার যাইতে পারিলে ত?' বলিয়া যোধ সিংহ হাসিল।

বেদঘ্ন বলিলেন, 'ছি যোধ এত বড় বলবান হইয়া একটি ক্ষুদ্র বালিকার নিকট যাইতে এত ভয়'।

'আপনি তবে পলাইয়া আসিলেন কেন?'

'আমি ভয়ে নয়, কাটিবে বলিয়া আসিয়াছি।' যোধ মনে মনে বলিল—'আমরা বেস সেনাপতিটি পাইয়াছি।'

বেদঘ্ন বলিলেন, 'যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা হইল না।'

'আমি থাকিতে তাহা হইতে পারিত না।'

'কেন?'

বালিকাকে একাকী আপনার কাছে রাখিয়া যাইতাম না।'

'তবে আনিয়াছিলে কেন?'

'কি করিতে হইবে তাহা শুনিতে।'

'উহাকে রাখিয়া যাইতে বলিতাম।'

'শুনিতাম না।'

'সেনাপতির কথা অগ্রাহ্য করিতে?'

'অন্যায় বলিলে কাহারও কথা গ্রাহ্য নয়।'

'সূর্য্যনাথের কথা কখন অগ্রাহ্য কর নাই।'

'সূর্য্যনাথ অগ্রাহ্যজনক কথা বলিতেও জানেন না।'

বেদম্ন বিরক্ত হইয়া আপন পূর্ব্বগৃহে বিশ্রাম করিতে চলিলেন।

যোধসিংহ সূর্য্যনাথের দ্বার খুলিয়া বলিল,—'নারীর মান সম্ভ্রম যোধসিংহের সাক্ষাতে কাহারও হরণ করিবার সাধ্য নাই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

এদিকে সত্যবতী ভিতরের অর্গল বন্ধ করিয়া সূর্য্যনাথের শয্যায় শয়ন করিলেন।

বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে মালাবারির মন্তব্য।

বোম্বাইর বেরামজী মালাবারি বাল্যবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁহার সুদক্ষ লেখনী ধারণ করিয়া দেশস্থ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমণ্ডলীর মনোযোগ পুনরায় ইহার দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। এই অবৈধ প্রথার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক ঘৃণায় ও ক্রোধে, এবং ইহার উপর তাঁহার সদিচ্ছা প্রণোদিত প্রবল আক্রমণে, কাহারও যোগ দান করিবার প্রবৃত্তি না হইলেও এই জন্য কেহ তাহাকে কটূক্তি করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। যদিও আজি কালি দেশের কোন কোন প্রধান লোক স্বদেশপ্রিয়তার নবনির্ম্মিত আবরণ চক্ষে দিয়া সমাজের দোষরাশি সুস্পষ্ট দেখিতে অক্ষম হইয়াছেন, এবং যদিও কোন কোন নব্যযুবক তাঁহাদের শিষ্যপদ লাভাশয়ে শিষ্যধর্ম্মানুসারে গুরুর বহু সম্মুখে অগ্রসর হইয়া সমাজের কলঙ্করাশিকেই গুণের পরাকাষ্ঠা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, তথাপি আমরা ভরসা করি, কি গুরু কি শিষ্য সকলেই এ-কথা স্বীকার করিবে যে, বাল্যবিবাহের প্রতি কাহারও অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে, এবং মালাবারি ঐরূপ অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া মাতৃভুমির বিরুদ্ধে কোনরূপ অপরাধ করে নাই। বাল্যবিবাহের সপক্ষে দুএকটি যুক্তি না আছে এমত নহে। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান যুক্তি এই যে, যে দেশে বাল্যবিবাহ নাই, সে দেশে অবৈধ সন্তানের সংখ্যা অধিক। কিন্তু বাল্যবিবাহের বিপক্ষের যুক্তিসমূহ এত প্র-

বলতর, যে ঐরূপ একটি অনুকূল যুক্তিসত্ত্বেও কোন শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহাকে বর্ত্তমান আকারে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন না। অবৈধ সন্তানোৎপাদন নিবারণোদ্দেশ্যেই যাঁহারা বাল্যবিবাহকে প্রশ্রয় দিতে চান, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে বিধবাবিবাহ প্রচলন করিতে সচেষ্ট হউন। আমাদের বিবেচনায়, বাল্যবিবাহ গর্হিত কি না, এই বিষয় আলোচনার সময় উত্তীর্ণ হইয়া, এই গর্হিত প্রথার কিরূপে উচ্ছেদ সাধন করা যায়, এক্ষণে তাহাই চিন্তা করার সময় হইয়াছে। কিন্তু এই উপায় সম্পর্কে বোধ হয় বহু মতভেদ উপস্থিত হইবে। আমরা মালাবারির সহিত এই উপায় সম্পর্কে একমত হইতে না পারিয়াই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

মালাবারির মতে বাল্যবিবাহ হইতে নিম্নলিখিত কুফল উৎপন্ন হয় ;—

(১) পিতা মাতা পাত্র কিংবা পাত্রী নির্ব্বাচনে যথেষ্ট বিচারক্ষমতা প্রদর্শন করিতে চাহেন না অথবা করিতে পারেন না, এই জন্য প্রায়শঃই পাত্রের উপযুক্ত পাত্রী কিংবা পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র সংঘটিত হয় না। সমাজ বহুধা বিভক্ত হওয়াতে পাত্র নির্ব্বাচনের ক্ষেত্র এত সঙ্কীর্ণ যে, অনেক সময়ে পাত্র খুজিয়া পাওয়াই দুষ্কর, সুতরাং বাধ্য হইয়া অনুপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান করিতে হয়। আবার অনেক স্থলেই, বিশেষতঃ অশিক্ষিত লোকের মধ্যে, পিতা মাতা সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্যবিস্মৃত হইয়া অর্থলোভে কিংবা অন্যরূপ স্বার্থসাধনমানসে অনুপযুক্ত পাত্রী কিংবা পাত্রের সহিত পুত্র কিংবা কন্যাকে চিরজীবনের জন্য বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ করেন। ইহার ফল অনেক সময় গৃহবিবাদ, অন্তর্ব্বিষাদ কিংবা বৈধব্য। মালাবারির এই কথা এত যথার্থ যে, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। যেখানে পিতা মাতা সন্তানের মঙ্গলকামনায় সন্তানকে পরিণয়বদ্ধ করেন, সেখানে দৈবঘটনা ব্যতীত কোন অশুভ ফল না ঘটাই সম্ভব। কিন্তু যেখানে পিতামাতা, সন্তানের মঙ্গল কামনায় নহে, কিন্তু সমাজের দায়ে কিংবা অর্থলোভে, ঐরূপ কার্য্য করেন, সেখানে যে অশুভ ফল উৎপন্ন হইবে, কিছুই বিচিত্র নহে।

(২) বাল্যবিবাহে, পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই স্বাস্থ্যের হানি হয়, আর অপরিণত বয়সে সন্তান হওয়াতে উহারা দুর্ব্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়, এবং এইরূপে সমগ্র জাতি বংশপরম্পরায় ক্রমশঃই ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইতে থাকে। মালাবারির এই কথা বাল্যবিবাহিত সকলের প্রতিই যে খাটে তাহা নহে —কিন্তু অধিকাংশের প্রতি খাটে। যদি বালক বালিকা বিবাহের পর উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত পৃথক্ থাকে, তবে উল্লিখিতরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ থাকে না। যদি পিতামাতা সমাজের দায়ে অথবা অন্য কারণে শৈশবে সন্তানের বিবাহ দিতে বাধ্য হন, তবে তাঁহাদের অন্ততঃ এইটুকু সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য যে, তাহারা উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত যেন পৃথক্ থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা এতটুকু

দৃষ্টি দেওয়াও আবশ্যক মনে করেন না।

(৩) বাল্যবিবাহে বালক বালিকা উভয়েরই শিক্ষার ব্যাঘাত হয়। বাল্যবিবাহের সকল দোষ অপেক্ষা এই দোষই গুরুতর। বালকের মনে যখন জ্যামিতি কিংবা ভূগোলের দৃশ্য বিদ্যমান থাকা কর্ত্তব্য, তখন তাহার মনে শিশু-ভার্য্যার সুন্দর মুখচ্ছবি কিংবা তাঁহার কোমল কণ্ঠধ্বনিই জাগিতে থাকে। বালকের অন্তঃকরণের ত্রিসীমায়ও যখন চিত্তচাঞ্চল্যকর কোন ভাবের সংস্পর্শ হওয়া উচিত নহে, তখন তাহার অন্তঃকরণ অপরিপক্ক কদর্য্য প্রণয়ের আবিলভাবে নিয়ত উদ্বেল হইতে থাকে। আবার যখন বালিকার কোমল অন্তঃকরণ রামায়ণ কিংবা মহাভারতের পবিত্র কাহিনীতে দ্রব হইয়া পবিত্রতার দিকে ধাবিত হইবে, তখন অপোগণ্ড যুবকের অশ্রাব্য প্রণয়বুলী নিয়ত তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার হৃদয়ের নির্ম্মলতা, সারল্য ও মধুরিমা একবারে বিনাশ করিয়া ফেলে। অনেক তেজস্বী বালককে বিবাহের পর হইতে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে দেখা গিয়াছে। তথাপি বালক সম্পর্কে অধ্যয়ন চলিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বালিকার শিক্ষা বিবাহের দিনই একরূপ পরিসমাপ্ত হয়। হয় ত সহস্র স্ত্রীলোকের মধ্যে একটি, স্বামীদ্বারা কিংবা স্বপ্রযত্নে সুশিক্ষিতা হইতে পারে; কিন্তু এইরূপ বিরল-দৃষ্টান্ত কোন নীতির সমর্থনে উল্লেখ করা সঙ্গত নহে। এদেশে প্রায় সমস্ত বালিকাই ১২ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহিতা হয়, সুতরাং এই বয়সের পর কোন বালিকাই নিয়মিতরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারে না। যে পর্য্যন্ত বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকে, সে পর্য্যন্ত দেশে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি হওয়া অসম্ভব।

(৪) বাল্যবিবাহে যুবককে অসময়ে সংসারের ভার গ্রহণ এবং সাংসারিক চিন্তা করিতে হয়। সুতরাং সে যুবত্বেই বৃদ্ধ হইয়া পড়ে এবং তাহাকে ভবিষ্যৎ উন্নতির সমস্ত আশা বিসর্জ্জন দিতে হয়। যে সকল যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া অধ্যয়ন পরিত্যাগ করে, তাহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। একদিকে যোগ্যতার অভাব, আর এক দিকে পরিবার ভরণপোষণের ভার, এবং অপর দিকে স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ কিংবা অর্থ বা অলঙ্কার দ্বারা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছা, এইরূপ বিভিন্ন অবস্থার যুগপৎ নিপীড়নে যুবা একবারে ভগ্নোদ্যম ও হতাশ্বাস হইয়া পড়ে। যাহারা স্কুল কিংবা কালেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হয়, তাহাদের অবস্থাও ইহা হইতে বড় ভাল নহে। অবশ্য যাহারা অর্থের সচ্ছলতা হেতু স্বাধীনজীবন যাপন করিতেও সমর্থ, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা এত বিরল যে, ইহাদিগকে গণনায় না আনিলেও চলে। অধিকাংশ যুবককেই শিক্ষা সমাপ্তি কিংবা পরিত্যাগ করিয়া চাকরীর অনুসন্ধানে বাহির হইতে হয়, কেন না তাহাদের সমূহ প্রয়োজন এত অধিক যে চাকরী ভিন্ন অন্য উপায়ে সেই প্রয়োজন পূরণ হইতে পারে না। স্বাধীন ব্যব-

সায়ে কিছুকালের নিমিত্ত অল্পলাভে অথবা বিনালাভেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়; কিন্তু শূন্য-হস্তে সংসারে প্রবেশ করিয়া এবং প্রথম-তঃই একটি পরিবার প্রতিপালনের ভার মস্তকে লইয়া সেই কিছুকাল অপেক্ষা করিবার অবসর কোথায়? সাংসারিক চিন্তার ফল আমাদের চরিত্রের উপরও কিয়ৎপরিমাণে ফলিয়া থাকে। যৌবনের প্রারম্ভে উৎসাহ, সাহস, প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি গুণনিচয় মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচায়ক, কিন্তু ঐ সময়ে সাংসারিক চিন্তায় বৃদ্ধের ন্যায় আমাদিগকে এত সাবধান ও গণনানিপুণ হইয়া চলিতে হয় যে, আমাদের কোন কার্য্যেই আর শেষে উদ্যম, উৎসাহ কিম্বা আগ্রহাতিশয় থাকে না; স্বার্থপরতা, কাপুরুষতা, স্বার্থ-বহির্ভূত বিষয়ে শৈথিল্য ও উদাসীনতা, আলস্য, অপরের প্রতি বিদ্বেষ, তোষামোদকারিতা প্রভৃতি দোষরাশি অচিরেই হৃদয়কে অধিকার করিয়া সমস্ত সৌন্দর্য্য বিনাশ পূর্ব্বক উহাকে মরুক্ষেত্রে পরিণত করে। সুতরাং বাল্যবিবাহ, স্বাধীন ব্যবসায়াবলম্বন ও চরিত্রবিকাশ, এই উভয়েরই গুরু প্রতিবন্ধক।

৫। মালাবারি বলেন যে বাল্যবিবাহে দেশের জন-সংখ্যা অপরিমিতরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। মালাবারির এই কথা যথার্থ কিনা, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। যে সকল দেশে বাল্যবিবাহ নাই, সেই সকল দেশের সহিত আমাদের দেশের তুলনা করিলে মালাবারির বিপরীত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হয়। গ্রেট ব্রিটেনে যে বাল্যবিবাহ নাই, তথাপি সেখানে প্রতি ১০ বৎসরে শত করা ১২। ১৩ জন করিয়া লোক বাড়িতেছে। আর আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ থাকা সত্ত্বেও প্রতি ১০ বৎসরে শতকরা ৫ জনের অধিক জন-সংখ্যা বাড়িতেছে না। ১৮৮১ সনের সেনসাসে দেখা যায় যে ১৮৭২ হইতে ১৮৮০ সন পর্য্যন্ত ৯ বৎসরে মূল বঙ্গদেশে জন সংখ্যা শতকরা মাত্র ৫.৪৬ জন বাড়িয়াছে। এই হিসাবে মূল বঙ্গদেশে প্রায় ১১৫ বৎসরে লোক সংখ্যা দ্বিগুণিত হইবে। আর গ্রেটব্রিটেনে যে হিসাবে লোক-সংখ্যা বাড়িতেছে, তাহাতে ৫৬ বৎসরেই উহা দ্বিগুণিত হওয়ার সম্ভাবনা। অতএব বাল্যবিবাহের দরুণ যে লোক-সংখ্যা অপরিমিত রূপে বৃদ্ধি পাইতেছে, একথা সপ্রমাণ হইতেছে না। অবশ্য ইহা সম্ভব যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত না থাকিলে এক্ষণে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা হইতেও কম বৃদ্ধি পাইত; কারণ সকলেই জানেন যে, বাল্যবিবাহে বিবাহের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এদেশে শতকরা ৪৬.৭১ পুরুষ এবং ২৯০৭১ স্ত্রীলোক অবিবাহিত, কিন্তু গ্রেটব্রিটেন, আয়র্লণ্ড ও ফ্রান্সে শতকরা ৬১.৯৫ পুরুষ ও ৫৭.৯ স্ত্রীলোক অবিবাহিত। ইহা সম্ভব যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত না থাকিলে আমাদের দেশে অবিবাহিতের সংখ্যা আরও অধিক সুতরাং জনসংখ্যা আরও কম হইত। কিন্তু জনসংখ্যা অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়াই যে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের বিষয় তাহা নহে। যে হারে দেশের

খাদ্য বস্তু বাড়াইতে পারা যায়, সেই হারে লোক-সংখ্যা বাড়িলে বিশেষ কোন ভয়ের কারণ নাই। যে ইংলণ্ডে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বাড়ান এক প্রকার অসম্ভব, এবং যেস্থান উদর-পূর্ত্তি জন্য বিদেশ হইতে খাদ্য বস্তু আমদানি করিতে বাধ্য, সেই ইংলণ্ডে প্রতি দশ বৎসরে শত করা ১৩ জন বাড়িলেও যদি তাহাদের আহারীয় যোটে, তবে যে বঙ্গদেশে উর্ব্বরতার কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই, যেখানে অপরিমিত ভূমি জঙ্গল কিম্বা জলের নীচে পড়িয়া আছে, এবং যেখানে খাদ্যবস্তু বিদেশ হইতে আনা দূরে থাকুক, লক্ষ লক্ষ মণ খাদ্যবস্তু বিদেশে রপ্তানি হইতেছে, সে দেশে প্রতি দশ বৎসরে শত করা ৫ জন লোক বাড়িলে শীঘ্র কোন ভয়ের কারণ নাই।

বাল্যবিবাহে যে আমাদের দেশে জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। বাল্যবিবাহে যেমন অল্প-বয়সে সন্তানোৎপাদন হইতে আরম্ভ হয়, তেমন আবার অল্প বয়সেই সন্তানোৎপাদন শক্তি বিনষ্ট হয়। সুতরাং সন্তানোৎপাদনের মোট কাল, সকল দেশেই প্রায় সমান। বয়সের গড়কাল ধরিয়া হিসাব করিলে দেখা যায় যে আমাদের দেশে সন্তানোৎপাদনের কাল ইংলণ্ড হইতে অনেক কম। ইংলণ্ডে লোকের বয়স গড়ে মাত্র ৪১। ৪২ বৎসর। সে দেশে সন্তানোৎপাদন বিবাহের পর হইতেই আরম্ভ হয়, এবং বিবাহ সাধারণতঃ ১৮। ১৯ বৎসর বয়সে হইতে থাকে। সুতরাং ইংলণ্ডে সন্তানোৎপাদন কাল ২৩। ২৪ বৎসর। আমাদের দেশে লোকের বয়স গড়ে ঊর্দ্ধ্ব সংখ্যা ৩৩। ৩৪ বৎসর হইবে।* বিধবা স্ত্রীলোকদিগকে যদি মৃতের মধ্যে গণনা করা যায় তবে এই গড় কাল আরও কমিয়া যাইবে। এক্ষণে আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের সাধারণতঃ ১৫।১৬ বৎসর বয়সে সন্তান হইতে আরম্ভ হয় এইরূপ ধরিলে মোট সন্তানোৎপাদন কাল এদেশে মাত্র ১৮। ১৯ বৎসর দাঁড়ায়। সুতরাং ইংলণ্ড অপেক্ষা আমাদের দেশে শিশুর সংখ্যা অধিক না হইয়া অল্প হইবারই কথা। প্রত্যক্ষও কি তাহাই দেখিতে পাই না? আমাদের দেশে বাল্য-বিবাহ সত্ত্বেও লোকের সাধারণতঃ ৪। ৫টির এবং প্রায় কাহারই ৭। ৮টির অধিক সন্তান হয় না। আর ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে অধিক বয়সে বিবাহ করিয়াও লোকের এই পরিমাণ কিম্বা ততোধিক সন্তান জন্মিয়া থাকে। এদেশে একান্নভুক্ততা সত্ত্বেও প্রতি ঘরে গড়ে ৬ জন লোকের অধিক নাই। আর ইংলণ্ডে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র থাকাতেও প্রতি ঘরে গড়ে ৫ জন লোক আছে।

আর এক কারণে বাল্যবিবাহ জন-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারে না। অপরিণত বয়সে সন্তান জন্মিলে তাহার দীর্ঘজীবন পাইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। তাহাতে আমাদের দেশে স্বাস্থ্য-রক্ষার রীতি এত কদর্য্য যে বহু সন্তান শৈশবে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বিনষ্ট

---

* কি প্রণালীতে বয়সের গড় ধরিতে হয়, তাহা ১৮৬২ সনের Encyclopædia Britania Vol XVIII ৪২৪ পৃষ্ঠায় দেখ।

হয়। ১৮৮২ সনের শাসন-বিবরণীতে দেখা যায় যে ঐ সনে বঙ্গদেশে এক বৎসরের ন্যূনবয়স্ক সহস্র শিশুর মধ্যে ১২১টি,১ হইতে ৫বৎসর বয়স্ক১০৯টি,৫ হইতে ১০বৎসর বয়স্ক ১৩১টি এবং ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক ১৩৭টি বালক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কোন কোন সহরে ১০০০ নবজাত শিশুর মধ্যে ৫০০ পাঁচ শতেরও অধিক শিশু বিনষ্ট হইয়াছে। এইরূপ ভয়ানক শৈশব মৃত্যুসংখ্যা পৃথিবীর আর কোন সভ্য দেশে নাই। ইহার পরেও কি জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, বাল্যবিবাহ সত্ত্বেও লোক-সংখ্যা অপরিমিত বৃদ্ধি পাইতেছে না কেন?

কিন্তু বাল্যবিবাহ জন-সংখ্যা অপরিমিত বৃদ্ধি না করিলেও সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় দারিদ্র বৃদ্ধি করিতেছে সন্দেহ নাই। কারণ আমাদের দেশে মূল ধনের সদ্ব্যবহার না হওয়াতে শ্রমজীবীদিগের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে, এবং সেই শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাদের জন্য সেই পরিমাণ কায যুটিতেছে না। অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশে পরিশ্রমের চাহিদা থাকিলে, যে হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে সে হারে কুলাইত না। আমাদের দেশের লোকের প্রকৃতি এইরূপ যে,যে ব্যবসায়ে আছি, তাহাতে একজনের স্থলে ২৫ জন হইলেও সেই ব্যবসায়েই থাকিব, তথাপি অন্যান্য ব্যবসায় ধরিব না। আর যে স্থানে আছি, সেস্থানে এক টাকার পরিবর্ত্তে ৫ টাকা ব্যয় করিতে হইলেও সেই খানেই থাকিব, তথাপি অন্যস্থানে যাইব না। এইজন্য ভদ্রলোক গৃহে উপবাস করিয়া মরিবে, তথাপি কোন শ্রমজীবীর ব্যবসায় অবলম্বন করিবে না। আর একস্থানে জন-বহুলতায় অস্বাস্থ্য ও দুর্ভিক্ষ ভোগ করিবে, তথাপি যেসকল স্থান লোকাভাবে জঙ্গল হইয়া রহিয়াছে সে স্থানে যাইবে না। দেশের এইরূপ রীতি না থাকিলে, বাল্যবিবাহে জন সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও আশঙ্কার কোন কারণ থাকিত না।

বাল্যবিবাহের আর এক মহদনিষ্ট বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের মধ্যে শতকরা ২১টির অধিক বিধবা। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বিধবার সংখ্যা শতকরা ৯ জন। সত্যবটে আমাদের দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাথাকাতে বিধবার সংখ্যা এত অধিক হইতেছে; কিন্তু বাল্যবিবাহও যে ইহার অন্যতম কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এদেশে ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে হাজারকে ২৩০টি বালক বিবাহিত হয়। মৃত্যু সংখ্যাদৃষ্টে দেখা যায় যে প্রতি হাজার বালকের মধ্যে গড়ে প্রায় ৭০টি বালকের মৃত্যু হয়। সুতরাং এই ২৩০টি বালকের মধ্যে এই হিসাবে অন্ততঃ ১৬টি বালক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া ১৬টি বিধবা রাখিয়া যায়। ১৫ বৎসরের নিম্নে বালকদের বিবাহ হওয়াতে এইরূপে প্রতি হাজারে ১৬টি বালিকা বিধবা হইতেছে। ১৫ বৎসরের নিম্নে কোন বালকের বিবাহ না হইলে এতগুলি বালিকা বিধবা হইত না।

মালাবারি বাল্যবিবাহের যে সকল গর্হিত ফলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা উপরে তাহার সমালোচনা করিলাম। এক্ষণে তিনি বাল্যবিবাহ নিবারণের যে উপায় স্থির করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে দু চারিটি কথা বলিব।

প্রথমতঃ তাঁহার মতে গবর্ণমেণ্টের এইরূপ নিয়ম করা কর্ত্তব্য যে, বিবাহিত বালক দণ্ডস্বরূপ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিবে না। আমাদের বোধ হয় যে, দণ্ডবিধি আইনের নির্ব্বাসন দণ্ডও ইহা হইতে লঘু। প্রত্যেকেরই অপরাধের সমুচিত দণ্ড হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় বাল্যবিবাহ এমত গুরু অপরাধ নহে যে, তজ্জন্য তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করিতে হইবে। কেহ চুরি কিংবা ডাকাতি করিয়াও যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইতে বারিত না হয়, তবে বাল্যবিবাহ করিয়া বারিত হইবে কেন? পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে ১৮৭৮ সনে ক্রফ্‌ট সাহেব একবার এইরূপ একটা প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশের সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করাতে তাহা আর কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন যে, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হওয়া কর্ত্তব্য; সুতরাং অন্যান্য গুণ সমান থাকিলে বিবাহিত ও অবিবাহিত প্রার্থীর মধ্যে অবিবাহিত প্রার্থীকে গ্রহণ করাই বিধেয়। আমাদের নিকট ইহাও অত্যন্ত আপত্তিজনক উপায় বলিয়া বোধ হয়। প্রথমতঃ ইহা দ্বারা, নিম্নশ্রেণীতে, অর্থাৎ যে সকল লোক গবর্ণমেণ্টের কাজের প্রত্যাশা করে না, তাহাদের মধ্যে, বাল্যবিবাহের কোন প্রতিবন্ধক জন্মাইবে না। দ্বিতীয়তঃ বিবাহিত ও অবিবাহিত এই উভয়ের মধ্যে অবিবাহিত যে শ্রেষ্ঠ, ইহার কোন প্রমাণ নাই। অনেক বিজ্ঞ ডাক্তারের মত এই যে, বিবাহিত লোক গড়ে অবিবাহিত লোক হইতে দীর্ঘায়ু হয়। তার পর ইহা নিশ্চয় যে, অবিবাহিত ব্যক্তি হইতে বিবাহিত ব্যক্তি অধিকতর শান্ত, সাবধান, কার্য্যনিপুণ ও কোমলচরিত্র হয়; সুতরাং শ্রেষ্ঠত্বের যুক্তি বিবাহিতের দিকেই বোধ হয় গড়াইয়া পড়িবে। তৃতীয়তঃ পিতার অপরাধে পুত্রের শাস্তি হওয়া অত্যন্ত অবিধেয়। পিতা পুত্রের অজ্ঞাতভাবে তাহার স্কন্ধে এক বৃহৎ ভার চাপাইয়া দিয়াছে। পুত্র সেই ভার বহনে সমর্থ হইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট কার্য্যের প্রার্থনা করিতেছে। এস্থলে সেই নির্দ্দোষ ব্যক্তির এবংবিধ কষ্টে গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি হওয়া এবং তাহাকে সাহায্য করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা না করিয়া যদি তাহাকে বিনা অপরাধে তাড়াইয়া দেন, তবে তাহার প্রতি যার পর নাই অবিচার করা হয়। একজন একখানি ভগ্নপদ লইয়া কোন চিকিৎসকের নিকট গেলে যদি চিকিৎসক তাহার অসাবধানতার দণ্ডস্বরূপ অপর পা খানিও ভাঙ্গিয়া দেন, তবে তাহার উপর যাদৃশ ব্যবহার করা হয়, বাল্যবিবাহ নিপীড়িত ব্যক্তির

প্রতিও মালাবারি সেই রূপ ব্যবহার করিতে চাহেন। আমরা এই সকল কারণে মালাবারির দ্বিতীয় প্রস্তাব অত্যন্ত অনিষ্ট কর বলিয়া মনে করি।

মালাবারির তৃতীয় প্রস্তাব এই যে ছাত্রগণ অবিবাহিত থাকার পক্ষে গবর্ণমেণ্টের প্রলোভন দেওয়া কর্ত্তব্য। বোধ হয় মালাবারির অভিপ্রায় এই যে কোন নির্দ্দিষ্ট বয়স পর্য্যন্ত যে সকল ছাত্রগণ অবিবাহিত থাকিবে, তাহাদিগকে বৃত্তি কিম্বা পুরস্কার দেওয়া উচিত। কিন্তু ইহাতে গবর্ণমেণ্টের যে পরিমাণ ব্যয় হইবে,দেশের সে পরিমাণ উপকার হইবে কিনা, সন্দেহ। বঙ্গ দেশে সমস্ত পুরুষ সংখ্যার মধ্যে গড়ে ·০৭ লোক উচ্চশিক্ষা.১লোক মধ্যশিক্ষা এবং১.৫ লোক নিম্ন শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। ইহাদিগের জন্য পুরস্কারের কিম্বা বৃত্তির ব্যবস্থা করিলে যে বাল্যবিবাহ অধিক মাত্রায় কমিবে, এরূপ আশা করা যায় না। যেখানে আমোদের জন্য বাল্যবিবাহ হয়, সেখানে হয়ত এইরূপ প্রলোভন থাকিলে বাল্যবিবাহ না হইতেও পারে, কিন্তু যেখানে পিতা মাতা স্বার্থলাভাশয়ে সন্তানের বিবাহ দেয়, সেখানে সেই স্বার্থ উল্লিখিত সামান্য প্রলোভনের উপর জয় লাভ করিবে সন্দেহ নাই। আর এই প্রলোভনে বালক-বিবাহ কিয়ৎপরিমাণে কমিবে, ইহা স্বীকার করিলেও, বালিকাবিবাহ কমিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অথচ বালিকাবিবাহ না কমিলে বিশেষ কিছুই উপকার হইবে না। সুতরাং যাহাতে ব্যয়ের পরিমাণে উপকারের প্রত্যাশা নাই,এরূপ কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

মালাবারি অন্য যে কএকটি প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের নিকট সাধু বলিয়া বোধ হইল। আমরা বারান্তরে ইহাদের উল্লেখ করিয়া বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আমাদের স্বাভিমত প্রকাশ করিব।

শ্রী—

সংক্ষিপ্তসমালোচন।

১। "অষ্টাঙ্গ হৃদয়। অর্থাৎ মহামতি-বাগ্‌ভট-বিরচিত সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ। অরুণদত্তকৃত-টীকা-সহিত চিকিৎসক-শিরোভূষণ শ্রীযুক্ত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনগুপ্ত কবিরত্ন মহোদয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধানে শ্রীবিজয়রত্ন সেনগুপ্ত কবিরাজকর্ত্তৃক অনুবাদিত, সংশোধিত ও প্রকাশিত।"—সমুদ্র যেমন অনন্তরত্নের অমেয় ভাণ্ডার,ভারতের অক্ষয়কীর্ত্তিরূপিণী সংস্কৃতভাষাও জ্ঞান-বিজ্ঞান-রূপ নানাবিধ অমূল্যরত্নের সেইরূপ এক অতলস্পর্শ আধার। আয়ুর্ব্বিজ্ঞান সেই রত্নরাজির মধ্যে উজ্জ্বলতম রত্ন;—স্পর্শশীতল, প্রাণপ্রদ ও মানবজাতির সুখসন্তানের নিদানভূত,—এবং মহামতি বাগ্‌ভট-প্রণীত এই বিখ্যাতনামা গ্রন্থ সেই রত্নরাজির এক অপূর্ব্ব সংগ্রহ। সুতরাং যাঁহাদিগের প্রযত্নে

ইহা আজি বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়া বঙ্গীয় ভিষক্‌সমাজে প্রচারিত হইতেছে, তাঁহারা সাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। আমরা অনেক স্থলে, মূলের সহিত এই অনুবাদ অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া, পাঠ করিয়া দেখিয়াছি এবং পড়িয়া প্রকৃতই অতি প্রগাঢ় আনন্দ অনুভব করিয়াছি। বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতের এইরূপ বিশুদ্ধ ও বিশদ বঙ্গানুবাদ সামান্য শিক্ষা ও সামান্য ক্ষমতার নিদর্শন নহে। বাবু বিজয়রত্ন অতি কৃতী ব্যক্তি। এবং তিনি শ্রীযুক্ত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন ও শ্রীযুক্ত কবিরাজ অন্নদাপ্রসাদ সেন প্রভৃতি তাঁহার যে সকল গুণ-পূজ্য গুরুজনের সাহায্যে এই কষ্টসাধ্য কার্য্যে হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জ্ঞানেও গৌরবে, পাণ্ডিত্যেও পরীক্ষা নৈপুণ্যে, চিকিৎসক সম্প্রদায়ের শিরঃস্থানীয় ব্যক্তি। এতগুণের যেখানে একত্র সমবায় হইয়াছে, সেখানে কার্য্যফল যে বিশেষ প্রশংসার্হ হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি? এদেশের নবীন সভ্যেরা যে নাটক নভেলের উচ্ছ্বসিত রসমাধুরী পরিত্যাগ করিয়া পুরাতন আচার্য্যদিগের এইরূপ অতি পুরাতন বিরস বিজ্ঞানের স্বাদগ্রহের জন্য উৎসুক হইবেন, আমাদিগের এইরূপ আশা অতি অল্প। কিন্তু আমাদিগের ভরসা আছে যে, যেসকল সারগ্রাহী, শিক্ষানুরাগী, সমৃদ্ধ ব্যক্তিরা সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া নিজ নিজ সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই 'অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের' অতিমাত্র আদর করিয়া বিজয় বাবুর এই আরব্ধ অনুষ্ঠানের সুসমাপ্তি বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিবেন। বিজয় বাবুর অনুবাদের প্রাঞ্জলতায় 'অষ্টাঙ্গ হৃদয়' এইক্ষণ সকলেরই সুখবোধ্য সামগ্রী হইয়াছে। সংস্কৃতে যাঁহারা রীতিমত শিক্ষা লাভ করেন নাই, তাঁহারাও এই উপাদেয় অনুবাদের সাহায্যে অনায়াসে মূল গ্রন্থের মর্ম্মতত্ত্ব পরিগ্রহে সমর্থ হইবেন। আর, এই গ্রন্থ লইয়া যিনি যতটুকু কাল পরিশ্রম করিবেন, তিনিই পরিশ্রমের প্রতিদানে জীবনী-শক্তির সম্বর্দ্ধক ও স্বাস্থ্য-সুখের পথ-প্রদর্শক প্রকৃত শিক্ষা লাভে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতে পারিবেন। আমরা উপসংহারে পুনরপি বলি, অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের প্রকাশক ও অনুবাদক সমাজের ধন্যবাদার্হ।

২। "বীরাঙ্গনা। ঐতিহাসিক উপন্যাস, শ্রীনবকান্তচট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত" এদেশের সাধারণ পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই ইদানীং উপন্যাস পড়িয়া দিন পাত করিয়া থাকেন; এবং দর্শন ও বিজ্ঞান, ইতিহাস ও অর্থনীতি অথবা সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি সকল শাস্ত্রে উপেক্ষা করিয়া তরল উপন্যাসের তরল মধুর মধ্যেই ডুবিয়া রহিতে সুখানুভব করেন। এইজন্য এদেশের ভাল মন্দ, ছোট বড়, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেই উপন্যাস লিখিতে প্রয়াস পাইতেছে; এবং যাহারা বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় বা রটি শব্দ একত্র গাঁথিয়া সামান্য একটি সদর্থ বাক্য রচনা করিতে সর্ব্বতোভাবে অসমর্থ, তাহারাও উপন্যাসের নামে ছাই মাটি কিছু একটা লিখিয়া বঙ্গ সাহিত্যের বি-

নোদ বিপণিতে বিজ্ঞাপনের ধ্বজা তুলিতেছে। ইহা এদেশের বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা। কিন্তু এ দুর্ভাগ্য জাতিগত উন্নতি ও অবনতিবিষয়ক নিয়মের অবশ্যম্ভাবি ফল। সুতরাং ইহা শীঘ্র দূর হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। বীরাঙ্গনা ঐরূপ ছাই ভস্ম নহে। ইহার রচনা স্থানে স্থানে সুন্দর, কাহিনীটি কিয়ৎপরিমাণে কৌশলের পরিচায়ক, নীতি বিষয়ে মোটের উপরে গ্রন্থখানি অনিন্দনীয়, এবং ইহাতে যুদ্ধের যে একটি বর্ণনা আছে, তাহা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু ইহার গুণের ব্যাখ্যায় ইহার উপর আর কিছু বাড়াইয়া বলিতে গেলে, সমালোচনায় আর ন্যায়পরতার স্থল থাকে না। উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্য চরিত্র-বিশ্লেষ, উপন্যাসের প্রকৃত সার্থকতা চরিত্র-বিকাশে। এই পুস্তকে কোনও একটি চরিত্রেই সেইরূপ বিশ্লেষ কিংবা সেইরূপ বিকাশ পরিলক্ষিত হইল না। মণিপুরী মুখচ্ছবির মত ইহার সকল ছবিই যেন এক সাঁচে ঢালা হইয়াছে। গ্রন্থকার যে কয়টি প্রতিকৃতি ইহাতে আদর্শরূপে উপস্থাপন করিয়াছেন, তাহারা বীরত্ব, কার্য্যতৎপরতা ও হৃদয়ের পবিত্রতায় প্রায় পূর্ণ পদার্থ বলিয়াই গ্রন্থে পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতিগত পূর্ণতার ক্রমিক বিকাশ বিনা পূর্ণ সৌন্দর্য্যের এইরূপ সবল প্রদর্শন সাধারণতঃ যেরূপ দোষাবহ হয়, বীরাঙ্গনা-রচয়িতার এই সাধু চেষ্টায়ও সেই সমস্ত দোষ সকল দিকে পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রতিকৃতিগুলি অচিন্তিতপূর্ব্ব আকস্মিক সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত হইয়াও কুলালচক্রের মৃৎপুত্তলের ন্যায় পাঠকের মনঃপ্রাণ স্পর্শ করিতে অক্ষম রহিতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উপন্যাস কতকগুলি চরিত্র লইয়া। যে লেখক সেই সকল চরিত্র আলেখ্যে এইরূপ চিত্রিত করিতে পারেন যে, দেখিলেই লোকে তাহা চিনিয়া রাখিতে পারে, এবং একবার চিনিয়া লইলেই চিরকালের জন্য তাহা চিত্রপট হইতে চিত্তপটে আসিয়া প্রতিফলিত হইয়া রহে, তিনিই চিত্রনৈপুণ্যে কৃতার্থ ও কৃতী। বীরাঙ্গনায় সেইরূপ কৃতিত্ব ও সেইরূপ কৃতার্থতার কোনও চিহ্নই নাই। বীরাঙ্গনার নায়ক মহারাজ গণেশ বেশ একজন গোছাল রকমের বীরপুরুষ, এবং নায়িকা গোলাপকুমারীও গোছাল রকমেরই বীরাঙ্গনা। কিন্তু এইরূপ সাঁচে ঢালা, এমনই প্রকৃতি বিশিষ্ট আরও যে শতশত চিত্র পাঠকের কল্পনায় উদ্ভাসিত হইতেছে, তাহাদের সহিত ইহাদের পার্থক্য কোথায়? কিন্তু তাই বলিয়া যে বীরাঙ্গনা অপাঠ্য পুস্তক অথবা অবস্তু মধ্যে গণ্য এমন কথাও আমরা বলি না। ইহা কাব্যও নহে এবং উপন্যাসও নহে। কিন্তু তথাপি ইহাতে মন ভুলানো মধুর কথা অনেক আছে।

গ্রন্থের আবরণ পত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই। সাহিত্যানুরাগী সদাশয় প্রকাশক গ্রন্থকারের হইয়া অতি সংক্ষেপে তদীয় উদ্দেশ্যের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন যে, যশঃসঞ্চয়, অর্থ লাভ অথবা করকণ্ডূয়নের তৃপ্তিসাধন,

ইহার কিছুই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মতে " লেখক পাঠককে হাসাইবার কাঁদাইবার জন্য যত্ন অপেক্ষা সাধারণকে সুরুচিকর আদর্শের প্রতিকৃতি দেখাইতে অধিক প্রয়াস পাইয়াছেন।"এইবারই বড় বিষম গোল। প্রকাশক সুরুচির দোহাই দিয়া যেমন সুন্দর বিজ্ঞাপন লিখিয়াছেন,গ্রন্থকার আপনিও সুরুচিপ্রসঙ্গে গ্রন্থের স্থানে স্থানে সেইরূপ সুদীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকা গাইয়াছেন। যেসকল পুরাতন লেখককে বাঙ্গালা কাব্য নাটক ও উপন্যাসাদির গুরুজ্ঞানে সম্মান করা উচিত, তাঁহাদিগকে গঞ্জনা করিতেও তাঁহার লেখনী কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু তিনি স্বকীয় সুশিক্ষা ও সুরুচির পরিচয় দানের জন্য নারীদেহের যেরূপ নূতন ধরণের বর্ণনা করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে আমরা কিছু বলি আর না বলি, যদি উপন্যাস নামে প্রলুব্ধ হইয়া লোকে তাঁহার এই পুস্তক পড়ে, তাহা হইলে বুদ্ধিমান্ পাঠক মাত্রেই ইহা এক আঁচড়ে বুঝিয়া লইবে যে,কোন্ গ্রন্থের কোথায় কুরুচির কোন্ অনুস্বার ও কোন্ বিসর্গটি প্রচ্ছন্ন ভাবে পড়িয়া আছে, গ্রন্থকার যত্ন করিয়া খুজিয়া খুজিয়া অতি মনোযোগের সহিত তাহা পাঠ করিয়াছেন, এবং সুরুচির স্বর্গীয় নামে স্বর্গভেদি চীৎকারের সময়েও দন্ত কলমে ধরা পড়িয়া দূষ্যরুচির লেখকদিগের মধ্যেই অধিকতর দূষ্যরূপে গণ্য হইয়াছেন। প্র কৃত সুরুচি পুষ্পিত সৌন্দর্য্যের ন্যায় পবিত্র,এবং প্রভাত-পুষ্পের ন্যায় প্রীতিপ্রদ। যিনি সুরুচিকে যথার্থই সম্মান করিতে জানেন, এবং সুরুচি ও স্বাদগ্রাহিতাকে হৃদয়ে একই সঙ্গে পোষণ করিতে সমর্থ হন, তাঁহাকে বড় লোক বলিলে দোষ নাই। কিন্তু কিবা অঙ্গে কিবা বঙ্গে কোনও দেশেই সাহিত্যের প্রথম বিকাশ সময়ে এসকল কথার আদর হয় না।

লেখক গোলাব কুমারীর রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া, আগে সুরুচির অনেক কথা কহিয়া, অবশেষে নিম্নোক্ত রূপ বাছা বাছা বাক্যে আপনার রুচিবিষয়ক বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন ;—

"আমরা পবিত্রা গোলাবকে ভারতচন্দ্রের ন্যায় অশ্লীল ভাবে উলঙ্গ করিয়া আপন কল্পনার পরিচয় দিতে পারগ নহি,ইত্যাদি —'ইহাতেও কোন কোনও কুতার্কিক পাঠক আপনাদের গৃহ লক্ষ্মীগণের পরিহিত ঢাকাই সিমলাই, বা শান্তিপুরের শাড়ীর প্রকোষ্ঠ হইতে তাহাদের চারু অঙ্গ বিন্যাসের শোভা দেখিতে দেখিতে আমাদিগকে প্রশ্ন করিতে পারেন' 'কাপড় থাকিলেই কি অঙ্গ সৌষ্ঠব ঢাকা থাকে? কাপড়ের ভিতর হইতে যতদূর দেখা যায় তাহাতেই একরূপ রূপ বর্ণনা করা যাইতে পারে" ইত্যাদি।

ইহার পরেও লেখক 'বঙ্গীয় বর্ত্তমান রুচির ও বর্ত্তমান পদ্ধতির' উপর কটু কটাক্ষ বর্ষণ করিতে সাহস পাইয়াছেন। আমরা বলি তাঁহার ধন্য সাহস! যিনি অতি সামান্য মাত্রায়ও আত্মশিক্ষার সম্মান করিতে জানেন, তাঁহার এইরূপ সাহস থাকে কি না, সন্দেহের কথা। অথবা ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।

ঔরংজীবের গুরুদক্ষিণা

সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ঔরংজীব পাদসাহ দিল্লীর রাজাসনে উপবেশন করিয়াছেন। এই সময়ে ঔরংজীবের বাল্যকালের শিক্ষক মোল্লা সলিয়া রাজধানীতে উপনীত হইলেন। তাঁহার মনে অপার আনন্দ। তাঁহার ছাত্র ভারতের সম্রাট, তিনি মহারাজাধিরাজের শিক্ষাগুরু। তিনি অবশ্যই ওমরাহদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান আসন প্রাপ্ত হইবেন। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইবেন। তাঁহার ক্ষুদ্রকুটীর দ্বিতীয় রাজপ্রাসাদে পরিণত হইবে। ভারতের সুন্দরীকুলের অগ্রগণ্যাগণ তাঁহার পদ-প্রান্তে উপবেশন করিয়া সেই প্রাসাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবে, এইরূপ শূন্যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আকাশকুসুম ও মুক্তালতা দ্বারা সেই গৃহ সুসজ্জিত করিয়া আশায় বুক বাঁধিয়া মোল্লাজী ঔরংজীবের দ্বারে উপস্থিত হইলেন

ওমরাহগণের মুখে সম্রাট শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার বাল্যকালের শিক্ষক মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত মোল্লাজী সলিয়া তাঁহার দর্শনাভিলাষী। ঔরংজীব তিনমাস পর্য্যন্ত এই কথায় কোন উত্তর দিলেন না।

মোল্লাজী বেগতিক দেখিয়া ওমরাহদিগকে ছাড়িয়া সম্রাটের ভগ্নী রোসেনারা বেগমকে মুরব্বি ধরিলেন। বেগম সাহেব মোল্লাবেচারার দুঃখে দুঃখিত হইয়া সম্রাটকে অনুরোধ করিলেন। ইহার কিছু দিবস পরে একদা পাদসাহ ঔরংজীব এক নির্জ্জন গৃহে উপবেশন করিয়াছেন। হাকিম্‌লমুল্লুক, দানেসবন্দখাঁ প্রভৃতি ৩। ৪ জন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ওমরাহ সম্রাটের পার্শ্বে দণ্ডায়মান। এই সময়ে মোল্লাজী সলিয়ার সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইতে অনুমতি হইল। মোল্লাজী শ্রীকর কমলযুগল দ্বারা সুদীর্ঘ শ্মশ্রু গুম্ফ মর্দ্দন করিয়া ভারতেশ্বর সমীপে উপস্থিত হইলেন।

ঔরংজীব সুমিষ্টবচনে বলিতে লাগিলেন ‘ হে পণ্ডিত প্রবর মোল্লাজী আপনি কি জন্য আমার নিকট আসিয়াছেন,তাহা বলিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন। আপনি কি ভারত সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান সম্মান পাইতে ইচ্ছা করেন? তাহা হইলে চলুন আমরা আপনার কার্য্যকলাপের সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই। বাল্যকালে আপনি আমার ক্ষুদ্র অন্তঃকরণের উপর যেসকল উপদেশ রূপ অমৃত সিঞ্চন করিয়াছিলেন, তাহা আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে। একজন সুশিক্ষিত যুবকের নিকট হইতে তাঁহার শিক্ষাগুরু যে কি

পরিমাণ কৃতজ্ঞতার কুসুমাঞ্জলি পাইতে পারেন তাহা আমি অবগত আছি। কিন্তু আমি আপনার নিকট হইতে কিরূপ উপদেশ ও শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা শ্রবণ করুন।

আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন,—'ফেরিঙ্গী স্থান (ইউরোপ) কএকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপমাত্র। ফেরিঙ্গী রাজাদিগের মধ্যে পর্ত্তুগেলের রাজা সর্ব্বপ্রধান। তৎপর হলণ্ডের রাজা, তাহার পর ইংলণ্ডের রাজা। ফরাসী দেশের রাজা এন্দুলেসীয়া দেশের রাজা ও অন্যান্য রাজগণ ভারতের ক্ষুদ্র২ সামন্ত নরপতিদিগের ন্যায়। দিল্লীর সম্রাটই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান নরপতি। হুমাউন, আকবর, জাহাঙ্গীর ও সাহজাহানের ন্যায় রাজা নভূত নভবিষ্যতি। পারস্য, উজবেক, তাতার, কাসগার, পিণ্ড, শ্যাম, চীন ও মহাচীন প্রভৃতি দেশীয় রাজগণ দিল্লীর পাদসাহের নাম শ্রবণ করিলে ভয়ে মরিয়া যায়। ধন্য ভূগোলশাস্ত্রবিৎ, ধন্য ঐতিহাসিক পণ্ডিত, তোমাকে শত ধন্যবাদ।

আমার মত একজন রাজপুত্রের শিক্ষকের কি আমাকে জগতের প্রধান প্রধান জাতি সমূহের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার বল বিক্রম, যুদ্ধ কৌশল প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল না? বিশেষতঃ ইতিহাস,—যাহা অধ্যয়ন দ্বারা মানবজাতি ও রাজ্যসমূহের পতন উন্নতি ও বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও বিপ্লব সমূহের কারণ অবগত হইতে পারা যায়; যে ইতিহাস উত্তর পুরুষগণের কর্ণে পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তিকলাপরূপ অমৃত সিঞ্চন করিয়া তাহাদিগকে তদনুকরণে সমুৎসাহিত করে; যে ইতিহাস অনুদার বুদ্ধি লোকদিগকে পূর্ব্বপুরুষগণের সমকক্ষ হইতে ও মনীষীদিগকে সমধিক উৎকর্ষ লাভে প্রণোদিত করে; সেই জলন্ত প্রত্যক্ষ দর্শনরূপ ইতিহাস সম্বন্ধীয় কিছুমাত্র জ্ঞান আমি তোমার নিকট হইতে লাভ করিতে পারি নাই। অধিক কি আমার বিখ্যাত পূর্ব্বপুরুষ যাঁহারা ভারতে এই বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, আমি তোমার নিকট তাঁহাদের কার্য্যকলাপের বিবরণ কিছুমাত্র শ্রবণ করি নাই। তাঁহাদের জীবনচরিত তাঁহাদের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক ঘটনাবলী, কি কৌশলে ও বাহুবলে তাঁহারা এই বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কিছুই তুমি আমাকে জানিতে দেও নাই। পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের অধিবাসী দিগের ভাষা শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। তুমি তাহা না করিয়া কেবল আরব্য ভাষা লইয়া আমাকে জ্বালাতন করিয়াছ, তুমি আরবি ব্যাকরণের সূত্র ও ব্যবস্থা শাস্ত্রের দুই একটি কথা লইয়া আমার শৈশব জীবন নষ্ট করিয়াছ। একজন রাজপুত্রের কত গুরুতর বিষয় শিক্ষা করিবার আছে তাহা একবারও তোমার মনে উদয় হয় নাই। তুমি নিতান্ত অনাবশ্যকীয় ও নীরস বিষয় দ্বারা আমার জীবনের উৎকৃষ্ট ভাগ মাটী করিয়াছ।

'তুমি কি ইহা জান না যে, বাল্যকালই

শিক্ষার সময় ? এই সময় বুদ্ধি সতেজ ও স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রবল থাকে। এই সময়ে শত সহস্র সদুপদেশ অক্লেশে হৃদয়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই সময়ে যাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই উত্তরকালে সৎকার্য্য সমূহ সম্পাদন করিয়া যশস্বী হইতে পারেন। আমরা কি কেবল আরবি ভাষা দ্বারাই ঈশ্বরোপাসনা ও কিঞ্চিৎ ব্যবস্থাশাস্ত্র শিক্ষা করিতে পারি? আমাদের মাতৃ ভাষা দ্বারাই কি এই সকল বিষয় সহজে শিক্ষা হইতে পারে না? তুমি আমার পিতা পাদসাহ সাহজাহানকে বলিয়াছিলে যে, তুমি আমাকে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দিতেছ। আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে যে, এমন কতকগুলি সূত্র ও বিষয় লইয়া তুমি আমার মস্তিষ্ক জ্বালাতন করিয়াছ যে তদ্দ্বারা ওজস্বিতা বিনষ্ট ব্যতীত ভাবি জীবনে কোন প্রকার উপকার হইতে পারে না। তুমি এমন কতকগুলি তোমার প্রিয় বিষয় লইয়া আমার জীবনের উৎকৃষ্ট ভাগ নষ্ট করিয়াছ, তুমি চলিয়া গেলে সেই সকল আমার কোন উপকারে আইসে নাই। তুমি আমাকে মানব চরিত্রানুশীলন জন্য কোন শিক্ষা দান কর নাই। যে সকল বিষয় দ্বারা মনের উন্নতি সাধিত হয় এবং যে শিক্ষা দ্বারা ভাবি জীবনে কুকার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকার জন্য প্রস্তুত হইতে পারা যায়, যদি তুমি আমাকে এরূপ সৎ ও উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদান করিতে, তাহা হইলে, মহাবীর সেকেন্দার তাঁহার গুরু অরিসততলের নিকট যতদূর কৃতজ্ঞ ছিলেন, আমি তোমার নিকট তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ কৃতজ্ঞতাঋণে বদ্ধ থাকিতাম ও যাবজ্জীবন তাহা পরিশোধের চেষ্টা করিতাম।

হে পণ্ডিত প্রবর মোল্লাজী উত্তর কর, রাজা ও প্রজার পরস্পর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দেওয়া কি তোমার কর্ত্তব্য ছিল না? ইহা কি তোমার মনে হয় নাই যে, এক সময়ে দিল্লীর রাজসিংহাসন ও আত্ম-রক্ষার জন্য আমাকে তরবারিহস্তে আমার ভ্রাতা গণের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে হইবে? তুমি অবশ্যই ভূতপূর্ব্ব ভারত সম্রাট গণের সন্তান সন্ততি দিগের বিবরণ অবগত ছিলে। কৈ! একবারও তুমি আমাকে যুদ্ধ বিদ্যার কোন কথা বল নাই। কি প্রকারে নগর অবরোধ করিতে হয়, কি প্রকারে শত্রুদুর্গ অধিকার করিতে হয়, এবং সংগ্রাম-ক্ষেত্রে কি প্রকারে শত্রু সৈনাকে বিমুখ করিতে হয়, সে সকল বিষয়ে তুমি আমাকে কোনরূপ শিক্ষা প্রদান কর নাই। আমার সৌভাগ্য বশতঃ, তোমার অপেক্ষা অনেক বিজ্ঞ লোক হইতে এই সকল বিষয়ে আমি যথেষ্ট উপদেশ লাভ করিয়াছি।

যাও তোমার বাসস্থানে গমন কর। লোক-সমাজে আত্মপ্রকাশ করিও না। তুমি যে কে ইহা যেন কেহ জানিতে না পারে।

মোল্লাজী ঔরংজীবের নিকট এইরূপ গুরু দক্ষিণা প্রাপ্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ইতিহাস লেখক ও পাঠক সকলেই স-

সম্ভাবে ঔরংজীবের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করি না। তিনি উপযুক্ত রূপ শিক্ষা ও সদুপদেশ প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া আমরা তাঁহার জন্য দুঃখ করি। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান ও বিক্রমশালী রাজা মোগলবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার চরিত্রে যে সকল দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা কেবল সৎশিক্ষার অভাব ও কুশিক্ষার ফল। তাঁহার চরিত্রের প্রধান কলঙ্ক এই যে তিনি সিংহাসন আরোহণ করিয়া পিতাকে কারাবদ্ধ ও ভ্রাতা ত্রয়ের প্রাণ দণ্ড করিয়াছিলেন। ইহাও তাঁহার কুশিক্ষারই ফল। তাঁহার পিতামহ জাহাঙ্গির ও তাঁহার পিতা সাহজাহান সিংহাসন আরোহণ করিয়া সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃবর্গের প্রাণ দণ্ড করিয়া আপনাদিগকে নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন, ঔরংজীবও তাঁহার পিতৃ পিতামহের প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া ভ্রাতাত্রয়ের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। মোগল রাজবংশে এমন কুশিক্ষা প্রচলিত হইয়াছিল যে কোন রাজপুত্র সিংহাসনের দাবি পরিত্যাগ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন না। সাহজাহান তাঁহার দুগ্ধপোষ্য ভ্রাতষ্পুত্রগণকে বধ করিতে বিরত হন নাই। আর মুসলমানদিগকেই বা দোষ দি কেন। আমাদের 'দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা শ্রীধর্ম্মাশোক' কি করিয়াছিলেন?

সাহাজাহান তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যা জোহনারা বেগমের অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন। এই জোহনারা বেগম প্রাণপণে ঔরংজীবের অনিষ্ট ও দারার মঙ্গলকামনা করিয়াছিলেন। যদি সাহজাহান অবরুদ্ধ না হইতেন তাহা হইলে জোহনারার উত্তেজনায় নিশ্চয়ই তিনি দারার পক্ষ হইয়া ঔরংজীবের শিরে তরবারি চালনা করিতেন। সাহাজাহান কারারুদ্ধ হইয়াও দারাকে অর্থ ও উপদেশ দ্বারা সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। যদি ঔরংজীব উদার-নীতি অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তাঁহাকে দারা কিংবা সুজার তরবারিতে অথবা মুরাদ বকাদর প্রদত্ত হলাহলে অকালে শমনভবনে গমন করিতে হইত। ঔরংজীবের চরিত্রের কলঙ্ক কেবল তাঁহার নিজের ও পুরুষানুক্রমে প্রচলিত কুশিক্ষার ফল মাত্র। যদি ঔরংজীব একটি সুশিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার অসাধারণ ওজস্বিতার সহিত নির্ম্মলচরিত্র সংযুক্ত হইয়া তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজার্হ করিতে পারিত।

ঔরংজীবের ন্যায় ঈশ্বর-প্রেমিক রাজা মোগলবংশে জন্মগ্রহণ করে নাই। আমাদের শ্রীধর্ম্মাশোক ও মোগলবংশের ঔরংজীব এক উপকরণে নির্ম্মিত। এজন্যই বলিতেছিলাম যে, সুশিক্ষা ও সদুপদেশ প্রাপ্ত হইলে তিনি একটি দেবতা হইতে পারিতেন। তাঁহার "চরমালেখ্য" (বা উইল) ই তাঁহার একটি জলন্ত প্রমাণ।

পাঠকদিগের কুতুহল নিবারণ জন্য আ-

মরা ঔরংজীবের উইলের প্রথম ও শেষভাগ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"I came empty-handed into the world, and empty-handed I quit it.

*　　*　　*　　*

I came naked into the world,and naked I go out of it. Let no ensigns or royal pomp accompany my funeral. Let Harnidodin Khan, who is faithful and trusty,convey my corpse to the place of Shah Zen-al-din, and make a tomb for it in the same manner as is done for dervises. Let not my fortunate children give themselves any concern about a monument."

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

অগ্নিকুল।

ষড়্‌বিংশতি পরিচ্ছেদ।

রাত্রি শেষে চন্দ্রালোক দেখা দিয়াছে। ঐ চন্দ্রালোকে ময়না অন্তঃপুরের দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। শৈলশৃঙ্খলোপরি একটি দীর্ঘাকার পুরুষ অপেক্ষা করিতেছিল, ময়না ধীরে ধীরে তাহার সমীপে উপস্থিত হইল। দীর্ঘাকার পুরুষ পরিচিত বেদম্ন।

ময়না তাহার নিকট যাইয়া বলিল, 'দাসী উপস্থিত কি করিতে হইবে আদেশ কর?' বেদম্ন হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'চরিতার্থ হইলাম। তুমি যে সত্যই আমার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিবে বিশ্বাস করি নাই।' ময়না মৃদুস্বরে গান করিয়া বলিল।

'প্রণয়ের অনুরোধে সাগরে ডুবিতে পারি।
এতে কি অসুখ তার যে গো প্রণয়ভিখারী?
মণিলোভ করে যে।
ইতি উতি করে কি সে—
ভুজঙ্গ দংশনে—ডরি?'

বেদম্ন একান্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন 'ঠিক বলিয়াছ তুমি যে এত রসিকা কদাপি মনে করি নাই, বৌদ্ধ অন্তঃপুরে যে এত রসের ছড়াছড়ি আজ জানিলাম।'

ময়না—আবার আরম্ভ করিল—

'প্রকৃতি সুরসে পূর্ণ সকল ভুবনে।
ভবনে ঈশানে কিবা নীলিম গহনে।
প্রকৃতির রসতত্ত্ব।
কত তাহে মধুরত্ব—
এখনি জানিবে কিবা নীরস পরাণে?
পাষাণে কুসুম ফুটে।
কেহ না পীযূষ লুটে।
আপনি ঝড়িয়ে চুম্বে—(শেষে) নীরস পাষাণে'। বেদম্ন এবার আনন্দে

'বলি হারি যাই' বলিয়া ময়নার স্কন্ধে হাত চাপাইলেন, ময়না শিহরিয়া সরিয়া গেল, তথাপি ভাবমুগ্ধ বেদঘ্নের হস্ত কিছু কাল শূন্যে নিরবলম্বনে রহিল।

ময়না হাসিয়া বলিল,'কৃষ্ণ কোথায়'? বেদঘ্ন বলিলেন, 'এইতো তোমার কৃষ্ণ উপস্থিত?'

ময়না আরো হাসিয়া বলিল, 'আমি তো কেবল তাহার বাহন গড়ুরকেই দেখিতেছি।'

বেদঘ্ন একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'আমাকে পরিহাস করিতেছ'?

ময়না হাসিয়া বলিল, রাগ করিও না, 'কৃষ্ণ যখন আসিলেন না, তখন রাধাও গড়ুরীর রূপ ধারণ করিবে।

বেদঘ্ন আবার হাসিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, 'এই ঘাসের উপর বসো' উভয়ে নিকট নিকট বসিলেন।

ময়না বলিল,—

১

গড়ুর গড়ুরী
বানর বানরী
কপোত কপোতী
কুরূপ কুমতি
কোকিল কোকিলা
বালকেতে বালা
পিরিতির মালা
লয়ে করে খেলা
এ কিরূপ সুখ
কেন তবে দুখ
গড়ুরের নামে?

২

গড়ুরী আমারে
কেননা বলরে
মনেতেও মোর
নাহিক গুমর
হয়ে থাকে পাপ
করো নারে মাপ
নাসিকা আঘাতে
মনের সুখেতে
রাখরে বামে?

বেদঘ্ন কাতরে বলিলেন, 'ময়নে, পরিহাস ত্যাগ কর, পাগলামী ছাড়, রাত্রি শেষ হইয়া আসিল, আমি যাহা বলি এখন তাহারই উত্তর দাও'?

ময়না এই অবসরে, দুইবার চক্ষু ঘুরাইয়া হাত তুলিয়া কাচলী সাবধান করিতে করিতে একবার আপন চক্ষে আবার বেদঘ্নের নয়নে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, 'তা হবে না তা হবে না আগে আমার কথার উত্তর দাও?'

বেদঘ্ন মত্ত হইয়া বলিলেন, 'কি বলনা প্রিয়ে'?

ময়না বলিল, 'নিন্দা ও অপবাদ করিলে কি হয়?'

বেদঘ্ন বলিলেন, 'অনুচিত কার্য্য হয়।'

ম,—'উপকারীর মন্দ করিলে কি হয়?

বে,—'তাহাও অনুচিত।'

ম,—'পরদার করিলে কি হয়?'

বে,—'সুখ হয়'।

ময়না 'এইবার ঠিক বলিয়াছ, ঠিক

বলিয়াছ—সুখ হয় সত্য কথা, চাও সুখ চাও, রাত্তি পোহাইল, * * * * * বলিয়া বেদঘ্নের বক্ষ ধরিয়া ঠেলিল। বেদঘ্ন অবশের ন্যায় শুইয়া পড়িলেন। ময়নাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শুইয়া বলিল, 'পরদারে কেমন সুখ পাইলে? বেদঘ্ন বিকটরবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ময়না তড়িৎগতি অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

বেদঘ্ন নাসিকা ধরিয়া ছটপট করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এঁ কেঁ বাঁ রঁ মাঁ রি য়াঁছে, বঁধ কঁরিয়াছে, ডাঁ কাঁ ই তঁ, হাঁয় হাঁয় রে, প্রাঁণ গেল, কিঁ কঁরি, জঁলিয়া মরিলাম, সর্ব্বনাঁশিনী, থাঁকঁ পাঁপিনী তোঁর গলা কাঁটিব। কেঁন আঁসিয়াছিলাম আঁর বাঁচিলাম না, হায় রে।' রুধিরের প্রস্রবণ বহিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া যাইতে লাগিল, এইরূপে অনেকক্ষণ বেদনায় ছট পট করিয়া এবং প্রভূত শোণিত-পাতে দুর্ব্বল হইয়া পরিশেষে একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

এমন সময় সহসা কে আসিয়া মধুরস্বরে বলিতে লাগিল—'হায় একি, কে মারিয়াছে—নিষ্ঠুর, রক্ত পড়িতেছে, অচৈতন্য। আহা এযে সেই, বিধাত;—তুমি কি ইহার পাপের শাস্তি করিয়াছ?—জগদীশ, ইহার পাপভার মোচন কর,—এ আর পাপ করিবে না রক্ষা কর?'। এই মধুর বচন সতেজে বেদনাগ্রস্ত বেদঘ্নের তন্দ্রাগত কর্ণে প্রবিষ্ট হইল।

বেদঘ্ন তৎক্ষণাৎ চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া দেখিতে পাইল—সেই ভীষণ সৌন্দর্য্য, সেই বালিকা মূর্ত্তি—বিষাদ-বদনে, বিষাদ-নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

বেদঘ্ন ভয় ও বিস্ময়ে হস্তে চক্ষু ঢাকিয়া —'একি দেখিতেছি আবার—স্বপ্ন, বিভীষিকা, না ইন্দ্রজাল'!!!

বালিকা ধীরে ধীরে আসিয়া নিকটে বসিয়া—কোমল করে তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিল—'স্বপ্ন, বিভীষিকা বা ইন্দ্রজাল নহে —আমি গায়ত্রী'।

বেদঘ্ন অধিকতর বিস্মিত হইয়া—ভাবিতে লাগিলেন,—একি দেবতা, মনুষ্য নয়, কিরূপে এখানে আসিল। গায়ত্রী ইত্যবসরে পর্ব্বত-জাত পরিচিত বেদনাহর ঔষধি-পত্র নিষ্পীড়িত করিয়া তাঁহার ক্ষত নাসায় রস প্রদান করিতে লাগিলেন। রস দিবা মাত্র বেদনা হ্রাস হইয়া স্নিগ্ধ বোধ হইতে লাগিল—

বেদঘ্ন করুণ স্বরে বলিলেন 'তুমি—যে হও আমার করুণাময়ী মা'। বালিকার বদন আনন্দময় হইল, সে নির্ম্মলানন্দে পবিত্র স্নেহ মিলিত হইল—পরদুঃখবিগলিত-হৃদয়া বালিকার নয়নে অশ্রু দেখা দিল—বালিকা কোমলকণ্ঠে বলিল—'আর পাপ করিও না, আর আমারে বাদ্ধিও না?'

বেদঘ্ন বলিলেন—'মা, তোমারে হৃদয়ে বান্ধিব'।

বালিকা আরো তাহার নিকটে আসিয়া বসিয়া বলিল—'বেদনা কমিয়াছে?' বেদঘ্ন বলিলেন 'অনেক কমিয়াছে'। বালিকা বলিল, তবে এখনও আরো আছে?' বেদঘ্ন বলিলেন,—'অল্প,'

বালিকা তড়িৎগতি পুনরায় অদৃশ্য হইল।

বেদঘ্ন ভাবিতে লাগিলেন,—আশ্চর্য্য বালিকা, আশ্চর্য্য সরলা, ইহার দয়ার ও স্নেহের কাছে শত্রু মিত্র ভেদ নাই—আমি মূঢ়, এহেন দেবতাকে কুবচন বলিয়াছি—কু ভাবে দৃষ্টি করিয়াছি—আমি নীচ, ইহার হৃদয় গগণস্পর্শ করিয়াছে,—প্রেমের উৎস, দয়ার মূর্ত্তি, স্নেহের সাগর, শুশ্রূষায় মাতা—হায় আমি কোথায়, একে?—অর্গলবদ্ধ পাষাণ মন্দির ভেদ করিয়া কিরূপে আসিল!!! যদি আমার ভয়ে কোন উপায়ে কাহারও সাহায্যে পলায়ন করিয়া থাকে, তবে আমাকে চিনিয়াও পলাইল না কেন? —আমি শত্রু, কোথায় বিপদে আনন্দিত হইবে, না—মায়ের অধিক স্নেহে আমারই শুশ্রূষা। এহৃদয় নশ্বর দেহের নয়,—পৌত্তলিকের কি অপরাধ, আমি জীবন ভরিয়া এই স্নেহময়ী দেবীর পূজা করিব—'মা! কোথায় অদৃশ্য হইলে?

'এই আসিলাম' বলিয়া আবার চপলা চমকের ন্যায় বালিকা সুন্দরী, আবির্ভূতা হইল। বালিকার স্কন্ধে একবোঝা সফুলফলপত্রশোভিতা ছিন্নলতা দেখিয়া বেদঘ্ন বিস্মিত হইলেন।

বালিকা, বেদঘ্নের মস্তকের নিকট উপবেশন করিয়া, বলিল—'এই লতার রস পান কর, বেদনা সারিয়া যাইবে।' বেদঘ্ন বলিলেন 'কিরূপে রস বাহির করিব?' বালিকা বলিল আমি চর্ব্বণ করিয়া দিতেছি এই বলিয়া, লতা পাতা চর্ব্বণ করিয়া—তাঁহার মুখে রস ঢালিয়া দিতে লাগিল। কএকবার মাত্র দিতেই বেদঘ্নের মত্ততা জন্মিল—এবং অল্প ক্ষণের মধ্যেই তিনি গভীর ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িলেন। বালিকা তাঁহার শিয়রে বসিয়া সস্নেহে মস্তকে হস্ত পরামর্শ করিতে লাগিল। আর মৃদু লোলিত সুতানে গাইতে লাগিল।

'সুমধুরা নিদ্রেলোতুই সন্তাপহারিণী
পরশি মোহন কর
ভয়চিন্তা নাশকর
স্নেহ পূর্ণ মাতা হেন, সোহাগকারিণী।
মৃণাল হইতে তুই শীতল পরশ,
পীযূষ হইতে তুই সুখদ সরস,
তাই সে তোরে লো কহে অমিয়-সিঞ্চিনী।
মৃত্যু তোর পিতা
শান্তি তোর মাতা
দ্বিগুণে, ভূষিতা তুইলো দেহ ক্ষয় শোধিনী
অসীম বল শালিনী
ভীষণ তোর মোহিনী
কি সিংহ কি করী, বীর,
দেব দৈত্য চরাচর
তাড়িত পরশে শক্তি,—হর, ভীমারূপিণী।
মিনতি তোরে লো সতী,
পিয়ে সোম, সুধামতী
—'হরলো বেদনা ইহার, দুখীর দুখিনী।'

এ দিকে ময়না আসিয়া শয়ন করিয়াছে সত্য। তাহার নিদ্রা হয় নাই। এই অসাধারণ কায করিয়া তাহার ভয় এবং চিন্তা হইয়াছে। মনে মনে দুঃখও হইয়াছে। বেদঘ্নের নাসিকা ছেদিত হইলে তাহার দুঃখপূর্ণ আর্ত্তনাদ, কাতরোক্তি,

ময়নার এখনও যেন কাণে আসিতেছে, হৃদয়ে বিদ্ধ হইতেছে। ময়না ভাবিতেছে —'এ সর্ব্বনাশ কেন করিলাম, কেন আমার এদুর্ম্মতি হইয়াছিল—কেন বিশ্বাসঘাতকতা কেন প্রবঞ্চনা করিলাম। বেদম্ন আমার সহিত প্রণয় করিতে চাহিয়াছিলেন, ভালবাসিয়াছিলেন—আমার কি এই উপযুক্ত প্রতিদান হইয়াছে?—আমি তাঁহাকে ভালবাসিলে কি দোষ হইত,—আমার বিবাহ হয় নাই,—কলঙ্কীনী হইতাম না। সূর্য্যনাথ কে হৃদয়ে স্থান দিয়াছি তাঁহার আশা আমার দুরাশা। সত্যবতীর কাছে আমি দাসীযোগ্যা। আমি বিজিতা বন্দী, তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী পরিচারিকাদলভুক্ত—আমার আদর নাই, আদর পাইয়াছিলাম পূজা পাইতে বসিয়াছিলাম, তাহা ছাড়িলাম কেন?—আমি দুঃখিনী বেদম্নকে চিরশত্রু করিলাম কেন? সত্যবতী প্রকারান্তরে আমার শত্রু, আমার আশার কণ্টক,—তাহার সূর্য্যনাথ, আমার কি?—তবে এত করিলাম কেন, বেদম্ন তো আমার কোনই অপচয় করে নাই—শুনিয়াছি কুকর্ম্ম করিলে হৃদয় অবসন্ন হয় আমার এখন তাহাই হইতেছে আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে, ইচ্ছা হইতেছে চীৎকার করিয়া কাঁদি—ইচ্ছা হইতেছে সেই দুরবস্থাপন্ন বেদম্নের কাছে যাইয়া পা ধরিয়া ক্ষমা চাই—হৃদয় ভরিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করি। যে বেদম্নকে নির্গুণ মনে ভাবিয়াছি, চক্ষে কুৎসিত দেখিয়াছি মনে বলিতেছে আবার যাইয়া দেখিলে সেই চক্ষে তাঁহাকে সুন্দর দেখিব। বেদম্নকে দুঃখ দিয়া আমার মন ফিরিয়া গেল কেন, বুঝিতেছি না। সম্পদ এবং সৌন্দর্য্য কি আহত, বিপদগ্রস্ত এবং বেদনাগ্রস্তের নিকট ক্ষীণ মোহিনী!! পুরুষেরা শত শত লোক কুঠারাগ্রে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে তাহাদের কি হইয়া থাকে, আমি একটি নাসিকা কাটিয়া অস্থির হইতেছি কি আশ্চর্য্য!!!' ভাবিতে ভাবিতে ময়না আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। দ্বার খুলিয়া বাহির হইল।

প্রকৃতি এখন ঊষাময়, চন্দ্র সূর্য্য সৃষ্টির পূর্ব্বে, এই ঊষাদেবী প্রকৃতি সুন্দরীর নর্ম্মসখী ছিলেন, তখন ঊষাময় প্রকৃতি এবং প্রকৃতিময় ঊষা বিরাজিত ছিল। এখন ঊষা দুইবার মাত্র প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন, চন্দ্র সূর্য্যের ভয়ে ভয়ে একবার সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে একবার চন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বে সখীর সহিত অল্প কালের জন্য মিলিত হন।

রজনীর অবসানে পতিপ্রাণা ঊষা লোলিত সহকারে আসিয়া সখীর অধর চুম্বন করিতেছেন, ময়না এই সময়ে বাহির হইল।

বাহির হইয়া গত রজনীর যুদ্ধক্ষেত্র দেখিতে চলিল। দ্বারদেশে উপস্থিত হইল একটি মধুময় ললিত ঝঙ্কার তাহার কাণে আসিল। ময়না ভয় পাইল, ইতঃস্তত করি, অবশেষে সাবধানে নিঃশব্দ দ্বারোদ্ঘাটন করিল। দ্বার খুলিয়া সেই শৈল শৃঙ্গলে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল—তথায় যাইবার ভরসা হইল না। নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া কিছুকাল ঐ সুমধুর

কলকণ্ঠ শুনিয়া ধীরে দরজা বন্ধ করিল।

দ্বার বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিতে কুঙ্কুম সুন্দরীর সহিত তাহার দেখা হইল।

কুঙ্কুমের চক্ষু স্ফীত, বদন ভাবনালাঞ্ছিত এবং মন উদ্বিগ্ন। তাঁহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া ময়নার ভয় হইল। এদিকে কুঙ্কুম সুন্দরী ময়নার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন।

ময়নার চক্ষু উন্মাদের লক্ষণযুক্ত, বদন শুষ্ক এবং বিবর্ণ, তাহার মূর্ত্তি ভীত শঙ্কিত এবং সন্দেহ জনক। তাহার বস্ত্রে প্রভূত শোণিত চিহ্ন। একে একে সকলই তিনি দেখিলেন। তাঁহার ক্রোধ, ভয়, এবং বিষম সন্দেহ বোধ হইল—অধৈর্য্য এবং অসহ্য হইয়া বলিলেন—'ময়না আমার সত্যকে কি করিয়াছিস্ বল, তোর মুখ শুকাইয়াছে, কাপড়ে রক্ত লাগিয়া রহিয়াছে—রাক্ষসি, আমার সত্যধন কৈ বল, তুই তাহারে মারিয়াছিস্,—কোথায় মারিয়াছিস্?'

ময়না কুঙ্কুমের এভাব দেখিয়া অধিকতর ভীত ও বিস্মিত হইল তাহার মুখে কথা ফুটিল না। কেবল চাহিয়া রহিল।

কুঙ্কুম তাহাকে নির্ব্বাক নিস্পন্দ এবং কেবল উৎকীর্ণের ন্যায় চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া এক প্রকার নিঃসন্দেহ হইয়া কান্দিয়া ক্রোধের সহিত বলিতে লাগিলেন, 'সত্য তোর কি অপরাধ করিয়াছিল—রাক্ষসি, তাহাকে মারিয়া কি সুখ পাইলি, আজ তোরে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া কুকুর দিয়া খাওয়াইব। হায় প্রাণের সত্য,—মা তোমাকে না দেখিয়া আমি তোমার উপর রাগ করিতে ছিলাম। তুমি যে নাই তা জানি নাই রাক্ষসী ময়না তোমার প্রাণ বিনাশ করিয়াছে'। এই বলিয়া কান্দিয়া আবার বলিলেন, 'ময়না বল,—কোথায় আমার মাকে মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছিস দেখা'।

ময়না এবারে হাসিয়া বলিল—'মাঠাকুরাণী পাগল হইয়াছেন'—এই বলিয়া যাইয়া দরজা খুলিয়া দিল;

কুঙ্কুম দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, কে শয়ন করিয়া আছে সত্যবতী স্নেহভাবে তাহার বদন লক্ষ্য করিয়া অধোবদনে বসিয়া তাহার মস্তকে হাত বুলাইতেছে আর গান করিতেছে, আপনার ভাবে আপনি মুগ্ধ হইয়া আছে।

কুঙ্কুমের বদনের বিষাদচিহ্ন এখন ক্রোধে এবং বিস্ময়ে মিশ্রিত হইল তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—'সত্য এ কি ছিঃ ছিঃ ছিঃ।'

সত্য চাহিয়া দেখিল কুঙ্কুম অনতিদূরে দাঁড়াইয়া। তাহার আনন্দ হইল, বালা নিতান্ত বালিকার ন্যায় দৌড়িয়া আসিয়া কুঙ্কুমকে জড়াইয়া ধরিল।

কুঙ্কুম, ঘৃণা ও রোষভাবে হস্ত ছাড়াইয়া তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া বলিলেন 'আমি মনে করিয়াছিলাম তুমি বালিকা, কিন্তু তোমার কার্য্য অসতীযুবতী হইতেও লজ্জাকর, এত অল্পবয়সে প্রণয় করিতে ও অভিসারে যাইতে শিখিয়াছ কয়জনকে ভাল বাসিবে বল?'

সত্য কান্দিতে লাগিল—কান্দিয়া বলিল—'মা এমন হইলে কেন?—আমি কি দোষ করিয়াছি?—

কুঙ্কুম বলিলেন, 'রজনীতে ঘরের বাহির হইয়া কাহার সেবা করিতে ছিলে, ভালবাসায় কি পাত্রাপাত্র জ্ঞান নাই!'

সত্যবতী বলিল, 'মা আমিত জানি সকলকেই ভাল বাসিতে হইবে। যে পীড়িত তাহার শুশ্রূষা না করিলে যে অধর্ম্ম হয়?

কুঙ্কুম 'যাহার শুশ্রূষা করিতে ছিলে তাঁহার পীড়ার কথা কিরূপে জানিয়াছিলে, কি জন্য রাত্রিযোগে বাহির হইয়া আসিয়াছিলে?'

সত্য, 'আমি সূর্য্যনাথের কারাগারে তাহার বন্ধন মোচন করিতে গিয়াছিলাম।'

কুঙ্কুম, 'আশ্চর্য্য!! বন্ধন মোচন করিয়াছ?'

সত্য, 'পারি নাই—কেবল তাঁহার হস্ত পদের লৌহ শৃঙ্খল খসাইয়াছি।'

'তাহার পর?'

আমাকে ধরিয়া এক ঘরে বদ্ধ করিল।'

'কে?'

'যাহাকে এখনই শুশ্রূষা করিতেছিলাম।'

'এখানে আসিলে কিরূপে?'

এই প্রশ্ন শুনিয়া সত্যবতী আবার কান্দিয়া বক্ষ এবং হস্ত দেখাইয়া বলিল—'ঐই দেখ মা কত দুঃখ পাইয়াছি?—দরজা বন্ধ বাহির হইতে না পারিয়া জানালা দিয়া লম্ফ দিয়া নামিয়াছিলাম। পড়িয়া এই দুঃখ পাইয়াছি—অনেক ক্ষণ অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলাম। জ্ঞান হইলে, ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিতে ছিলাম, পথে দেখিলাম—আমার সেই শত্রু ভূমিতলে পড়িয়া ছটফট করিতেছে তাহার শরীরে রক্ত তাহার নাসিকা কে কাটিয়াছে আমার দয়া হইল তাই তাহার শুশ্রূষা করিতে ছিলাম,—তুমি না বুঝিয়া আমায় কত গালি দিয়াছ—আমি আর তোমার কাছে যাইব না, আর তোমার কোলে উঠিব না, আর তোমারে মা বলিয়া ডাকিব না, যাও তুমি,—আমি যাইয়া স্রোতে ডুবিয়া মরি'—এই বলিতে বলিতে বালিকা কান্দিয়া ফিরিয়া চলিল।

সত্য মিথ্যা কহিতে জানে না কুঙ্কুম তাহার সকল কথা বিশ্বাস করিলেন, তাহার শরীরের ক্ষত চিহ্ন দেখিয়া শিহরিলেন এবং তাহার মনে দুঃখ দিয়াছেন মনে করিয়া ব্যাকুলা হইয়া—তাহাকে ধরিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া মুখ চুম্বন করিলেন।

বালিকা তাঁহার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কান্দিতে লাগিল।

সত্যবতীকে এই ভাবে লইয়া কুঙ্কুম প্রস্থান করিলেন। ময়না দ্বার বন্ধ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। দ্বার বন্ধ করিবার সময় দেখিতে পাইল বেদব্র তথায় নাই।

সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদ।

প্রাতঃকাল পরেশনাথ ধর্ম্মগৃহে বসিয়া আছেন, সূর্য্যনাথকে কারাবাসে রাখা উচিত কি অনুচিত হইয়াছে তাহাই ভাবিতেছেন, এমন সময় বেটা আসিয়া নিবেদন করিল—'নীলাচল হইতে লোক আসিয়াছে'।

পরেশনাথ বলিলেন,অশুভ সংবাদ শুনিয়া শুনিয়া ও উপর্য্যুপরি বাধ্য হইয়া অশুভকর কার্য্য করিয়া আমার মন দুর্ব্বল হইয়া প-ড়িয়াছে—শুভসংবাদ থাকিলে তাহাকে এ-খনই আসিতে বল, নচেৎ প্রয়োজন নাই আর অশুভ সংবাদ শুনিবার স্পৃহা নাই।'

অল্পকাল পরে একটি নূতন লোক গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া পরেশনাথকে প্রণাম করিল। এব্যক্তির বয়েস—অনুমান বিংশতি বৎসর, মুখশ্রী সুন্দর, ললাট উন্নত, নাসাগ্রভাগ সূক্ষ্ম। ভ্রূদ্বয় সংমিলিত। বর্ণ উজ্জ্বলশ্যাম, শরীর বলব্যঞ্জক এবং মধ্যমাকার, চক্ষুদ্বয় স্ফীত উজ্জ্বল এবং রক্তাভ। কেশ স্কন্ধ পর্য্যন্ত লম্বিত। শ্মশ্রু নবীন উদ্গত ও অল্প। ইহার পরিধান গৈরীক বর্ণের প-শমী আটা ইজার, শরীরে জানু পর্য্যন্ত ল-ম্বিত রক্ত বর্ণের মখমলের আটা জামা কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল, এবং মস্তকে সুবর্ণখচিত হরিৎ বর্ণের উষ্ণীষ। কটিদেশে অসি এবং পৃষ্ঠে গণ্ডার চর্ম্ম লম্বিত। এই ব্যক্তিকে দেখিলে একজন উচ্চ শ্রেণীস্থ সৈনিক ব-লিয়া বোধহয়, এবং আকার প্রকারে— ইহাকে বীর, ও প্রিয়দর্শন অনুভূত হয়।

পরেশনাথ তাহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হই-লেন, বলিলেন, 'দূত, আমার বোধহয় তুমি ভাল সংবাদ আনিয়াছ—আমার মন যেন তোমাকে দেখিয়াই উৎফুল্ল, হই-তেছে।

দূত মিষ্টস্বরে বলিল, 'ধর্ম্মরক্ষণ, আমি শুভ সংবাদই আনিয়াছি। নীলাচল রাজ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন। নীলাচলের সর্ব্বত্রই—নির্ব্বিঘ্নে বৌদ্ধপতাকা উড়িতেছে' —এই বলিয়া অঙ্গরক্ষা হইতে খুলিয়া এক খানি পত্র বাহির করিয়া দিল।

নীলাচল সহজে জয় হইয়াছে এই সং-বাদে পরেশনাথ একান্ত আনন্দিত হইয়া, বালক ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—'বেটা, সেনাপতি এবং যে যে প্রচারক আছেন, তাঁহাদিগকে আমার স্মরণ জানাইতে বল।

বেটা গমন করিলে, পরেশনাথ পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন,—পত্র পাঠ করিতে করিতে আনন্দে দাঁড়াইলেন, এবং সহাস্য-বদনে বলিলেন, তোমারই নাম অমর চাঁদ তুমিই উৎকলবিজয়ী বীর?—আমি তৃপ্ত হইলাম,—তুমি সূর্য্যনাথের ন্যায় সুন্দর যুবা,—আকৃতি ঠিক তদ্রূপ—আশা করি তোমার প্রকৃতি—তাহা হইতে উৎকৃষ্ট হ-ইবে।'

আগন্তুক কুটিল হাস্য করিয়া বলিলেন 'কার্য্যেই পরিচিত করিবে।'

পরেশনাথ তাঁহাকে বসিতে আদর করিয়া আপনি বসিলেন এবং স্নেহভাবে আগন্তুকের সুবদন নিরীক্ষণ করিতে লা-গিলেন। মনে মনে বলিলেন, ইঁহার বর্ণ কিঞ্চিৎ শুভ্র হইলে সূর্য্যনাথ বলিয়া ভ্রম হইতে পারিত।

এমন সময় চৈত্ররথ প্রভৃতি চারিজন প্রচারক উপস্থিত হইলেন, পরেশনাথ তাঁ-হাদিগকে দেখিয়াই আনন্দভরে বলিলেন 'উৎকল রাজ সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন এই অসাধারণ যুবাই উৎকলবিজয়ী বীর।'

এই সংবাদে এবং বীর যুবাকে দেখিয়া

সকলেই প্রফুল্ল হইলেন, চৈত্ররথের সন্দেহ কেবল দূর হইল না। মনে মনে বলিলেন নীলাচল জয় আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু এ ব্যক্তি কদাপি বৌদ্ধ নহে।

এদিকে আগন্তুক চৈত্ররথকে তীক্ষ্ণচক্ষে তাঁহার আপাদ মস্তক দৃষ্টি করিতে দেখিয়া, কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন, এবং তাঁহার খরতর তল্লাসদৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া মুখ এদিক্ ওদিক্ করিতে লাগিলেন। চৈত্ররথ উহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেন।

পরেশনাথ দূরদর্শী এবং বৃদ্ধ চৈত্ররথকে একটু হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন 'ভাই জী, আজ আনন্দের দিন ভোজের আয়োজন করিয়া দিন, আজ সকলে মিলিয়া একত্রে ভোজন করা যাইবে।

চৈত্ররথ বলিলেন, 'আপনার যদভিরুচি,।

পরেশনাথ পুনরায় বলিলেন, 'আজ সমস্ত সৈন্যগণকে নির্দ্দোষ আমোদ করিতে ঘোষণা দিন'।

চৈত্ররথ বলিলেন, 'যে আজ্ঞা,।

পরেশনাথ বলিলেন, 'দুর্গে শত দামামা ধ্বনি নিনাদিত হওয়া উচিত'।

চৈত্ররথ বলিলেন 'তাহাই হইবে,।

এই সময়ে বেটা আসিয়া নিবেদন করিল 'সেনাপতি দূতের নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তিনি অত্যন্ত পীড়িত, আসিতে অশক্ত।'

পরেশনাথ কাহারও পীড়া হইলে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েন এবং স্বয়ং যাইয়া তাহাকে দেখেন এবং কখন বা স্বয়ং শুশ্রূষাও করিয়া থাকেন, তিনি সেনাপতির পীড়ার সংবাদে অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন, বলিলেন, 'পীড়া, কি পীড়া হইয়াছে? শারীরিক নিয়মলঙ্ঘনের ফল পীড়া, কখন বা মানসিক ও সামাজিক কি নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘনেও পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। বৌদ্ধগণ ক্রমেই যথেচ্ছাচারী হইতেছে, আজ সেনাপতির পীড়া, কাল সেনাগণের পীড়া, ভয়ঙ্কর কথা, দোষ না পাইলে পীড়া শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। পীড়া শত্রু, নিয়ম প্রতিপালন উহার অভেদ্য দুর্গ।

সেনাপতির কি পীড়া হইয়াছে?

বালক ভৃত্য বলিল, 'দূত বলিল তাঁহার মস্তক বেদনা ও নাসিকা দিয়া অজস্র রক্তপাত হইতেছে।,

পরেশনাথ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'চিকিৎসকেরা কি করিতেছে? আমার সেনাপতি পীড়িত, তাহাদের চৈতন্য নাই? আমার লোকজন এবং দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ সেনাপতি এবং সেনাগণ না বাঁচিলে চিকিৎসকের কি প্রয়োজন? আজ আমি তাহাদিগকে কিছু অলসতার শিক্ষা দিব, এই বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিলেন। ঐসঙ্গে সকলেই উঠিল।

এ সময়ে আর একজন প্রচারক বলিলেন, 'সেনাপতির নিকট চিকিৎসক উপস্থিত আছে, সেনাপতির পীড়া সামান্য নাসিকায় কিরূপে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহাতেই রক্তপাত হইয়াছে,।

চৈত্ররথ একটু ব্যঙ্গোক্তি করিয়া বলিলেন ' নাসিকায় আঘাত লাগিয়াছে, হইতে পারে, কিন্তু আমি জানি আঘাত লাগে নাই, কাহার অস্ত্র লাগিয়াছিল তাহাই বল।

পরেশনাথ চমকিয়া বলিলেন ' অস্ত্র ' অস্ত্র নাসিকায়, সে কি ?

চৈত্ররথ বলিলেন, 'কে তাহার নাসিকা ছেদন করিয়া দিয়াছে।,

পরেশনাথ বলিলেন, ভয়ঙ্কর আশ্চর্য্য কাহার সাধ্য সেনাপতির নাসিকা ছেদন করিতে পারে ? তাহার শিরঃচ্ছেদ করিব তাহার সর্ব্বনাশ করিব, বল কে কাটিয়াছে।,

চৈত্র, ' কে কাটিয়াছে, সেনাপতি জানেন ,।

পরেশ, ' দুর্গে অবশ্য পৌত্তলিক প্রবেশ করিয়াছে ।

চৈত্র, ' পৌত্তলিক ;—সম্ভব নহে।, .

এদিকে যোধসিংহ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সেনাপতির অট্টালিকার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সত্যবতীকে কত ডাকিয়াও উত্তর পাইল না, দরজা ভাঙ্গিতে চাহিল, তথাপি উত্তর পাইল না। অবশেষে ভীত হইল, পাছে বালিকা অস্ত্রে আত্মহত্যা করিয়া থাকে। ভয় পাইয়া সেনাপতির অন্বেষণে চলিল তাহাকে কোন স্থানে না পাইয়া অবশেষে পরেশনাথের সমীপে আসিয়া অবস্থা জানাইল।

পরেশনাথ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এই আর এক অশুভ সংবাদ বালিকা কোথায় গেল, কিরূপে গেল, সে কে ?

যোধসিংহ কি বলিবে কিছুই বলিতে পারিল না। পরেশনাথ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—' এ অমানুষিক অসাধারণ বালিকা কত বড়, কিরূপ দেখিতে ?'

যোধসিংহ এবারে সবিস্তার বিবৃত করিল। শুনিয়া পরেশনাথ দুই হস্তে চক্ষু ঢাকিলেন, কিছুকাল পরে বলিলেন, 'আমি ইহাকেই দেখিয়াছি যোধসিং যাও, শীঘ্র যাও, দ্বার ভাঙ্গিয়া দেখ কি হইল ' ।

যোধসিংহ আজ্ঞামাত্র গমন করিল, পরেশনাথ পুনরায় ধর্ম্মগৃহে বসিলেন, এবং চৈত্ররথকে বসিতে বলিয়া সকলকে বিদায় দিলেন।

চৈত্ররথ বলিলেন, ' সূর্য্যনাথ সম্ভবতঃ এই বালিকাকেই আনিয়াছেন ' ।

পরেশনাথ বলিলেন 'বালিকা নিতান্তই বালিকা উন্মাদ বলিয়া বোধ হয়, এ যদি ঠিক সূর্য্যনাথের সেই হয়, তবে সূর্য্যনাথ নিষ্পাপী ' ।

চৈত্ররথ বলিলেন, ' সূর্য্যনাথ চিরদিনই নিষ্পাপী, ধার্ম্মিক নীতিজ্ঞ প্রভুপরায়ণ স্বার্থশূন্য, আমি বেস জানি ' ।

পরেশনাথ বলিলেন, ' কি রূপে জানিলেন ?'

চৈত্ররথ, বলিলেন, ' সূর্য্যনাথ রাজার পুত্র, স্বার্থ ও সুখ ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ হইয়াছেন।'

পরেশ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—' এতদিন আমি ইহা জানিতে পারি নাই,— কোন্ দেশের রাজপুত্র ?'

চৈত্ররথ বলিলেন, 'তিনি রাজ মহেন্দ্রীয় মহারাজ চালুক্যের তৃতীয় পুত্র?'

পরেশনাথ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'অভাবনীয় ঘটনা, এই দুরাচার পৌত্তলিক চালুক্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের একান্ত বিদ্বেষী আপনি কি রূপে সূর্য্যনাথের পরিচয় পাইয়াছেন?'

চৈত্ররথ বলিলেন, 'যে থানে আমার কন্যার বিবাহ দিয়াছি ঐ থানে চালুক্য রাজা বিবাহ করেন, সূর্য্যনাথ দীর্ঘকাল মাতুলালয় ছিলেন, আমি তাঁহাকে সবিশেষ জানি'।

পরেশনাথ বলিলেন, 'তবে, যৌবন সময়ে যাহার এরূপ অসাধারণ ত্যাগ-স্বীকার—সে স্বার্থপর হইয়া আমাদের অনিষ্ট কদাপি করিতে পারে না—সূর্য্যনাথকে আমি মহৎ লোক বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম—সূর্য্যনাথ তবে যথার্থই বিশ্বাসপাত্র,—আমি অন্যায় করিয়াছি বেদঘ্নের কথায় তাহাকে কারাবাস দিয়াছি,—বেদঘ্ন মিথ্যা বলিয়াছে বেদঘ্নের সর্ব্বনাশ করিব,—কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ, সহজে এত অন্যায় করিয়াছে'!

চৈত্ররথ বলিলেন, 'সূর্য্যনাথ ধর্ম্ম বিস্তারের প্রধান সহায়, সকলের একান্ত প্রিয়, আপনার একান্ত ভক্ত, তাঁহাকে শৃঙ্খল পরাইবার সময় তিনি একটি কথা বলেন নাই, শির পাতিয়া নীরবে আপনার আদেশ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার জন্য সকলে কান্দিয়াছে তাঁহার অভাবে সকল বিশৃঙ্খল হইয়াছে'।

পরেশনাথের ভ্রূ কুঞ্চিত, নয়ন বাষ্পে স্ফীত, বদন গম্ভীর হইল, বলিলেন—'বেদঘ্ন দুরাচার, নিষ্ঠুর, শৃঙ্খল কাহার কথায় পরাইয়াছিল? আমি বলি নাই, বুঝিলাম, জানিলাম, বেদঘ্ন হিংসায় এই অবৈধ কার্য্য করিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ, আমি সূর্য্যনাথের বধের আদেশ দিয়াছিলাম,—আজি তবে কি হইত সাধুজী! (চৈত্ররথ) আমি কি করিয়াছিলাম,—এই বলিয়া কান্দিয়া দুই হস্তে চক্ষু আবৃত করিলেন।

চৈত্ররথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন 'আশ্চর্য্য যে, নিষ্ঠুর তাঁহার বধ সাধন করে নাই'।

পরেশনাথ চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—গম্ভীর শব্দে বলিলেন, 'না সাধুজী, হিংস্র পশুর জিহ্বা সূর্য্যনাথের শোণিত পানের জন্য দুই হস্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, আমি কেবল বর্ম্মধরের সৎপরামর্শে প্রাণদণ্ড রহিত করিয়াছিলাম,—বর্ম্মধর আমাকে এই ভয়ঙ্কর অসৎ কার্য্য হইতে—এই সাজ্বাতিক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে। বর্ম্মধর পুরস্কৃত হইবে, বর্ম্মধর পরম মিত্রের কাজ করিয়াছে—আমি বেদঘ্নের কথায় তাহারও অনিষ্ট করিয়াছি;—প্রচারকের পদ হইতে অপসৃত করিয়া তাহাকে সামান্য দূতের কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছি—সাধু বর্ম্মধর, সাধু বর্ম্মধর, সাধুজী, আমি এখনই ইহার বিহিত করিব, বেটা, বেটা'

বেটা আসিয়া উপস্থিত হইল। পরেশনাথ বলিলেন, 'দূতকে বলিয়া দাও, সূর্য্যনাথ, বর্ম্মধর এবং বেদঘ্ন, ইহাদিগকে এখনই আমার নিকট উপস্থিত করে'।

বালকভৃত্য বলিল, 'সেনাপতি পীড়িত আছেন'।

পরেশ ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন—'আমি পীড়া ভাল করিতে জানি'।

বালকভৃত্য ভয়ে আর কিছু না বলিয়া তাড়াতাড়ি স্বকার্য্যে প্রস্থান করিল।

চৈত্ররথ মৃদুস্বরে বলিলেন, স্নানাহারের সময় হইয়াছে এতক্ষণ ভোজের আয়োজন হইয়া থাকিবে। ইহাদিগকে বৈকালে আনিলে ভাল হয় না?

পরেশনাথ বলিলেন—'তবে তাহাই বলিয়া দিন'। তদনুসারে চৈত্ররথ গাত্রোত্থান করিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভোজ

অন্তঃপুরের একটি বৃহৎ গৃহে প্রায় বিংশতিখানি পশমরচিত আসন এবং তন্নিকটে প্রস্তর থালিতে খাদ্য সজ্জিত হইয়াছে। জলপাত্র এবং বাটি সমস্তই প্রস্তরনির্ম্মিত। আহার্য্য সমস্তই নিরামিষ দ্রব্য, ভাত, তিন চারি প্রকারের দাল, গোধুমরুটী তিন চারি প্রকারের শাক, আলু প্রভৃতি ফল মূলের বহুবিধ ব্যঞ্জন। শর্করা এবং দধি, দুগ্ধ নবনী। খিচড়ী, ও পায়স, পরেশনাথ প্রথমাসন গ্রহণ করিয়াছেন, তৎপর চৈত্ররথ, মধ্যে দুখানি স্থান শূন্য তৎপর প্রচারকগণ, এবং ক্ষমতাপন্ন আর আর প্রধান বৌদ্ধগণ উপবেশন করিয়াছেন। দুইটি স্থান অপূর্ণ দেখিয়া পরেশনাথ বলিলেন 'কে কে আসেন নাই তাঁহাদিগকে আনিতে হইবে?'

চৈত্ররথ বলিলেন, 'হিসাব মত স্থান করা হইয়াছে তদনুসারে প্রধান সেনাপতি এবং সেনাপতির স্থান শূন্য রহিয়াছে'।

পরেশনাথ বলিলেন, 'সূর্য্যনাথকে এখনই কারামুক্ত করিতে হইবে, তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত হইয়াছে দ্বিতীয় স্থান বেদঘ্নের, অদ্যকার জন্য তাহাকে অন্ততঃ আমাদের সঙ্গে বসিয়া আহার করিবার সম্মান দেওয়া যাক্,—বিচার পরে হইবে'।

পরেশনাথের আদেশ মাত্র দূত বেদঘ্ন এবং সূর্য্যনাথের জন্য প্রেরিত হইল। সূর্য্যনাথের মুক্তির কথা শুনিয়া সকলেরই বদন প্রসন্ন হইল।—অমনি পোনের ষোলজন নিমন্ত্রিত, 'জয় পরেশনাথের জয়' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। চৈত্ররথ বলিলেন 'আজি আমরা দ্বিগুণ আনন্দে ভোজ উপভোগ করিব।'

পরেশনাথ উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, 'সূর্য্যনাথকে যে অপমান করিয়াছি—কি করিলে তাহার ক্ষতিপূরণ হইবে?'

সকলে এক বাক্যে বলিয়া উঠিল 'ধর্ম্মরাজের মিষ্টবাক্যই তজ্জন্য প্রচুর।'

এই সময়ে বেদঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নাসিকা ছিন্ন, বদন বিষাদ-পূর্ণ, বর্ণ মলিন, আসিয়া ধরাবনতবদনে এক পাশে দাঁড়াইলেন। তাঁহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া অনেকেই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না পরেশনাথ কিছু দুঃ-

খিত হইয়া বলিলেন, 'বেদঘ্ন, আমার অপরাধ নাই, আমি তোমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিয়াছি ও বিশ্বাস করিয়াছি—আমি জানি না তুমি তজ্জন্য কিরূপ যোগ্য। তোমার চরিত্র সন্দেহজনক বোধ হয়।'

বেদঘ্ন বলিলেন, 'প্রভুর আদেশ মত কার্য্য করিয়াছি—আর কিছু এদাস জানে না,চরিত্র সন্দিগ্ধ এবং কার্য্য অবিশ্বাসীর মত হইয়া থাকিলে স্নেহ ও অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইব।'

বেদঘ্নের, সানুনাসিক শব্দে আবার সকলেই হাসিতে লাগিল। পরেশনাথ বলিলেন, 'বেদঘ্ন, আমার একজন সেনাপতি তোমার মত সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হয়, ইহা বড় কষ্টের ব্যাপার বলিতে হইবে,—তোমার নাসিকার এরূপ দুরবস্থা কে করিয়াছে আমি জানিতে চাই।'

বেদঘ্ন কি বলিবেন, তাঁহার মুখ শুকাইল; নীরবে, অশ্রুপূর্ণলোচনে ধরা দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পরেশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইলেন না। সূর্য্যনাথ তখনই আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। সূর্য্যনাথের আগমন দেখিয়া পরমাহ্লাদিতচিত্তে সকলেই দাঁড়াইয়া অগ্রসর হইলেন, পরেশনাথ কিছুকাল স্তম্ভিতের ন্যায় নীরব থাকিয়া সূর্য্যনাথের গলা জড়াইয়া ধরিলেন, এবং রোদনস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'সূর্য্যনাথ—আমাকে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর,আমি তোমাকে বৃথা কষ্ট দিয়াছি—অন্যায় রূপে অপমান করিয়াছি'—এই বলিয়া নীরবে সূর্য্যনাথের স্কন্ধে মাতা দিয়া রহিলেন,—দরবিগলিত নয়ন-ধারায় তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ভিজিয়া যাইতে লাগিল।

এই দৃশ্যে সকলে মোহিত এবং সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় গম্ভীর নিনাদ করিল—'জয় পরেশ নাথের জয়।'

এই সময়ে জয়-ধ্বনির কোলাহল শব্দে সত্যবতী দৌড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুঙ্কুম তাহার বেশবিন্যাস করিতেছিলেন, এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই—বালা অর্দ্ধসজ্জিত অবস্থায় উপস্থিত। বিপুল কেশ-কলাপ অর্দ্ধ বেণীবদ্ধ, অর্দ্ধ বিশৃঙ্খল, ঘাঘরী সুদৃঢ় সংযত নহে, বক্ষ কাঁচলিহীন ওড়নার একদেশ স্কন্ধে, অবশিষ্ট মৃত্তিকায় লুটাইতেছে। ময়না পদে অলক্তক রাগ দিতে ছিল, তাহাও শেষ হয় নাই—এক পদ রঞ্জিত, অপর পদ অরঞ্জিত। উহার বদন সরলতামিশ্র বাল্যভাবযুক্ত তাহার সহিত, নিরীহ মধুরতাময় পূর্ণ প্রফুল্লতা বিরাজমানা, সুবঙ্কিম মনোহর সরল নয়ন কৌতূহলোদ্দীপ্ত, জ্যোৎস্নাময়।

হঠাৎ এই স্বর্গীয় শোভা উপস্থিত দেখিয়া—সকলেই নীরব এবং বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিল। পরেশনাথ এই মনোহর দৃশ্য দেখিয়া—'এ সেই বালিকা' বলিয়া সবিস্ময়ে ধরিতে গেলেন, বালা হাসিয়া দৌড়িয়া পালাইল। আবার সকলে বিস্মিত হইল।

এই সময় যোধ সিংহ আসিয়া নিবেদন করিল—'ধর্ম্মরাজ, দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি—রমণী

নাই—কিরূপে কোথায় গেল বুঝিতে পারি না'—

পরেশ নাথ অট্ট হাস্য করিয়া বলিলেন 'সূর্য্যনাথ, এই বালিকা কারাগারে গিয়াছিল ?'—

সূর্য্য, 'এই বালিকা'

পরেশ, 'কিজন্য গিয়াছিল ?'

সূর্য্য 'আমার শৃঙ্খল ও কারা মোচন করিতে।'

পরেশ, 'এই বালিকা তুমি আনিয়াছিলে ?'

সূর্য্য, 'এই বালিকা।'

পরেশ 'কিরূপে পাইয়া ছিলে এবং ইহার পিতা মাতার অনুসন্ধান করিয়া ইহাকে পাঠাও নাই কেন ?'

সূর্য্যনাথ তখন একে একে সমস্ত বিবরণ সবিশেষ বিবৃত করিলেন।

'কে সে নরাধম, ভীম দণ্ড কোথায়?' বলিয়া পরেশনাথ চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সূর্য্যনাথ বলিলেন 'ভীম পাগল হইয়াছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘা হইয়াছে।'—

পরেশনাথ বলিলেন, 'সূর্য্যনাথ ঐ বালিকাটিকে লইয়া আইস আমি ভাল করিয়া দেখিব।'

সূর্য্যনাথ গমন করিলে, পরেশনাথ বলিলেন 'সূর্য্যনাথ নির্দ্দোষী, এ নির্ম্মল সরলা মূর্ত্তি,—শোভাময়ী বালিকাকে কোন্ পাষণ্ড স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারে, আমি সংসার-বিরাগী, এই বালিকা আজি আমার দৃঢ় হৃদয়েও সন্তান স্নেহ সঞ্জাত করিয়াছে। বল, বেদম্ন এই বালিকার প্রতি কিরূপে অসম্ভবনীয় কুৎসাপূর্ণ দোষারোপ করিয়াছিলে ?

বেদম্ন সজল-নয়নে বলিলেন 'আমি স্বয়ং অশুদ্ধচরিত্র সেই জন্য একথা বলিয়াছিলাম। ঐ স্নেহময়ী বালিকা আমার মাতৃতুল্যা। আমি মহাপরাধী। আমার অর্দ্ধেক শাস্তি হইয়াছে, অপরার্দ্ধ ভোগ জন্য প্রস্তুত আছি। প্রভু আমি অপরাধী। আজি আপনার কাছে খেদ মিটাইয়া বলিব, যাহা অভিরুচি তাহাই করিবেন, আমাকে তুষানলে দগ্ধ করিলেও অসন্তুষ্ট হইব না, আমার তাহাই হওয়া উচিত। এই কথা বলিয়া বেদম্ন কাঁদিতে লাগিলেন।

সেই হঠকারী এবং উষ্ণপ্রকৃতি ও অহঙ্কারী বেদম্নের এরূপ পরিবর্ত্তনে সকলে বিষমরূপে বিস্মিত হইলেন।

পরেশনাথের হৃদয়ে আবার দয়ার ছায়া পড়িল, আবার বেদম্নের প্রতি কৃপাদৃষ্টে চাহিয়া বলিলেন, 'বল, নির্ম্মলচিত্তে অনুতপ্তহৃদয়ে সকল দোষের কথা বলিলে আমি তোমাকে ক্ষমা করি—শুদ্ধ ক্ষমা নহে—যে পিতৃস্নেহ নিজ দোষে হারাইয়াছ তাহাই পাইবে।'

বেদম্ন ক্রমে সূর্য্যনাথের প্রতি বিদ্বেষ, তাঁহার অনিষ্টচেষ্টা, কারাগারে কষ্ট দেওয়া, সত্যবতীর সহিত অসদ্ব্যবহার, তৎকর্ত্তৃক বিপদে শুশ্রূষা, ময়নার প্রতি অসৎ চেষ্টা, তৎকর্ত্তৃক নাসিকা ছিন্ন হওয়া প্রভৃতি সকল কথা বলিয়া, কান্দিয়া পরেশনাথের পা জড়াইয়া ধরিলেন।

পরেশনাথ তখন গম্ভীরবচনে বলিলেন, 'বেদম্ন ! উঠ ? সাধু হইয়া দাঁড়াও ? আর এক বেদম্ন দাঁড়াও। ক্ষমা করিলাম।'

বেদম্ন দাঁড়াইলে,—পরেশনাথ তাঁহার মুখ দেখিয়া বলিলেন, 'এখন কদাচারের কলুষিত ভাব, অশুদ্ধতার পঙ্কিলশ্রী তোমার বদন হইতে দূর হইয়াছে—মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তোমার বদন আর একখানি ছিল। এখন তুমি স্ফুটিতনয়নে নিঃশঙ্কহৃদয়ে আমার দিকে চাহিতে পারিতেছ।'

আর কেহ কথা কহিল না, গৃহ নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ। কিছুকাল পরে পরেশনাথ পুনরায় গম্ভীরস্বরে বলিলেন।

'বেদম্ন বাল্যকাল হইতে অভ্যাসগুণে যে সাধু হইয়া সাধুভাবে জীবন ত্যাগ করে, আমি তাহার প্রশংসা করি না। যে যৌবনের প্রারম্ভে কুনীতির প্রলোভনে মজিয়া তাহার আশু তৃপ্তিকর স্বাদ একবার পাইয়াও মহাবীরত্বে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া আজীবন সাধুত্বে অতিবাহিত করিতে পারে,আমি তাহাকেই প্রকৃত সাধু বলিয়া থাকি। আশা করি, তুমি প্রকৃত সাধু নামের যোগ্য হইবে।,

এই অতুল আশাকর প্রভুবাক্য শুনিয়া বেদম্নের বদন প্রসন্ন হইল; তাঁহার শরীর রোমাঞ্চ হইল, নয়নে প্রীতিধারা বহিল।

পরেশনাথ তাঁহার প্রতি পুনরায় গভীরদৃষ্টি করিয়া বলিলেন 'তুমি অদ্য হইতে নবজীবন পাইলে। দেখ আজ তোমার হৃদয়ে কত পবিত্রতা, কত প্রীতি, কত সারল্য, কত শান্তি, কত সুখ, আজ তোমার হৃদয় পৌত্তলিক-কল্পিত স্বর্গের সম্পত্তি রাশিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছে।

বেদম্ন বলিলেন যথার্থই আজ আমি সুখী হইয়াছি। প্রভু এত সুখ হৃদয়ে ধরিতে পারে আমি জানি নাই।

পরেশনাথ উৎসাহে শান্তি, শান্তি, শান্তি,—জগৎময় শান্তি বিরাজিত হউক, বলিয়া নীরব হইলেন। আবার সকলে একত্র হইয়া বলিল 'জয় পরেশনাথের জয়, জয় সত্য এবং শান্তির জয়।'

শ্রীঃ—

রাজর্ষি উমেদসিংহ।

রাজা উমেদসিংহ ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। অম্বরাধীশ্বর রাজা জয় সিংহের ষড়যন্ত্রে তাঁহার পিতা রাজা বুধসিংহ পঞ্চোলাসের ভীষণ সমরে পরাজিত হইয়া স্বকীয় পৈতৃক রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। পরমাত্মীয় কোটারাজ ভীমসিংহ অম্বর-রাজের সহিত সম্মিলিত হইয়া বুন্দীরাজ্য বিভক্ত করত আত্মীয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের সুযোগ উপেক্ষা করিলেন না। নানাবিধ চেষ্টা করিয়াও বীরশ্রেষ্ঠ বুধসিংহ স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে অকৃতকার্য্য হইলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি আর কৃপাদৃষ্টি করিলেন না। রোষে, ক্ষোভে ও দুঃসহ অপমানে বীরবরের হৃদয় বিদীর্ণ হইল। মৃত্যু এই নিদারুণ যন্ত্রণা হইতে অচিরাৎ তাঁহাকে মুক্ত করিল। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই তাঁহার মর্ম্মঘাতী দুর্দ্দান্ত শত্রু অম্বর-পতি জয়সিংহেরও মৃত্যু হইল।

উমেদসিংহ শত্রুগণ কর্তৃক মাতুলালয় হইতে বিতাড়িত হইয়া কোটেশ্বর দুর্জ্জনশালের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। নির্ব্বাসিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত রাজকুমারের দুঃখে মহানুভব কোটেশ্বরের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। পৈতৃক রাজ্য উদ্ধারার্থ তিনি রাজকুমারকে যথাসাধ্য সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন। উমেদসিংহ জয়সিংহের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া স্বজাতীয় কতিপয় অনুচরসহ অবিলম্বে পাটন ও গৈনল্লি অধিকার করিলেন। রাজা দুর্জ্জনশাল তাঁহাকে প্রতিশ্রুত সাহায্য প্রদানে পরাঙ্মুখ হন নাই।

অম্বরেশ্বর ঈশ্বরীসিংহ এই সংবাদে একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কোটায় স্বীয় অপ্রতিহত প্রভুত্ব সংস্থাপনমানসে তিনমাস কাল পর্য্যন্ত রাজধানী অবরোধ করিয়া রহিলেন। অবশেষে ক্ষুণ্ণমনে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল।

কোটা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে অম্বরেশ্বর একদল শিখসৈন্য উমেদসিংহের আশ্রয়স্থল লোহারী আক্রমণার্থ প্রেরণ করিলেন। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক অমিততেজা উমেদসিংহ প্রভুভক্ত মীনাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। বিপন্ন রাজকুমারের দুঃখে তাহাদের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। পাঁচ হাজার ধনুকধারী মীনা সৈন্য অনতিবিলম্বে তাঁহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইল। এই পার্ব্বত্য সেনা সহ উমেদ সিংহ বীচোরি নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া শত্রুসেনার

আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তথায় তাহারা পৌঁছিল। তিনি তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া স্বকীয় বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিলেন। ১৭৪৪ খৃষ্টীয়াব্দে এই ঘটনা ঘটে।

বীচোরির বিজয়-সংবাদ সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইল। চতুর্দ্দিগ হইতে তাঁহার স্বজাতীয় বীরাগ্রগণ্য হরগণ বিজয়ী উমেদ সিংহের সাহায্যার্থ আগমন করিয়া তাঁহার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল ; এরূপে বর্দ্ধিতবিক্রম হইয়া তিনি শত্রুদিগকে স্বরাজ্য হইতে দূরীভূত করিতে সঙ্কল্পারূঢ় হইলেন। তাঁহার উল্লাস ও উৎসাহের আর পরিসীমা রহিল না।

এদিগে বীচোরির যুদ্ধক্ষেত্রের নিদারুণ অপমান প্রক্ষালন করিবার জন্য রাজা ঈশ্বরী সিংহ নারায়ণ দাস ক্ষেত্রি নামক জনৈক সুবিচক্ষণ সেনাপতিকে অষ্টাদশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে উমেদ সিংহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। তাহারা দুরলানা নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া উমেদ সিংহের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

আজ উমেদসিংহ শত্রুদিগকে দূরীভূত করা অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া, স্বজাতীয় হরিদ্বর্ণে সুরঞ্জিত পতাকামূলে স্বপক্ষীয়, সমুদয় সেনাগণকে একত্রিত করিয়া, দুরলানাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথি মধ্যে আশাপূর্ণা দেবীর মন্দিরে উপনীত হইয়া, অশ্রুপূর্ণনয়নে ও ভক্তিগদ্গদস্বরে আপনার বিজয়বর প্রার্থনা করিলেন। দুরলানায় উভয় দল পরস্পরের সম্মুখীন হইল। অবিলম্বে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উমেদসিংহ স্বরাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তি এবং স্বজাতীয় হরদিগের লুপ্তগৌরবের পুনরুদ্ধার জন্য মহা সাহসিকতা সহকারে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সুবিশস্ত প্রভুভক্ত হরসামন্তবর্গ বিজয়াশায় নিরাশ হইয়া, তাঁহাকে অচিরে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন জন্য অনুরোধ করিলেন। বুন্দী রাজ্যের যিনি একমাত্র আশাস্থল, তিনি বাঁচিয়া থাকিলে সমস্ত রাজ্য অচিরাৎ তাঁহাদের হস্তগত হইবে।

অগত্যা উমেদসিংহ যুদ্ধাহত প্রিয়তম অশ্বে আরোহণ করিয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ পুরঃসর, ইন্দ্রগড়াভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। অশ্বরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিল, উদরাভ্যন্তর হইতে অন্ত্রনাড়িকাদি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। পথিমধ্যে সোয়ালির গিরিসঙ্কটে প্রভুকে বহন করিতে২ ঘোটকশ্রেষ্ঠের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। প্রভুভক্ত অশ্বের নিকটে বসিয়া উমেদসিংহ ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজ্যাধিকারের পর তিনি হুঞ্জার প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই।

অনন্তর উমেদসিংহ পদব্রজে ইন্দ্রগড়ে উপনীত হইয়া দেব সিংহের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। স্বীয় রাজ্যেশ্বরকে এরূপ বিপন্ন দেখিয়া পাষণ্ড হরসামন্ত আশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক, একটি অশ্বও আরো-

ভণার্থ প্রদান করিয়া তাঁহার সাহায্য করিলেন না। অতঃপর তিনি কুরোইনে উপস্থিত হইলে, তথাকার সামন্ত তাঁহার যথোচিত সমাদর ও অতিথিসৎকার করিয়া প্রভুভক্তি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিলেন না। অনতিবিলম্বে স্বীয় বিশ্বস্ত আত্মীয় ও অনুচর বর্গকে বিদায় দিয়া তিনি পূর্ব্বতন গুপ্তিস্থান রামপুরে উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কোটারাজ দুর্জ্জন শাল উমেদসিংহের অমানুষিক বীরত্বে সমধিক প্রীত হইয়া, বীরপুঙ্গব রাজকবিকে একদল সেনা সহ তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। তাহাদের সহিত স্বীয় সুবিশ্বস্ত অনুচর বর্গকে সম্মিলিত করিয়া উমেদসিংহ বুন্দী নগরী ও তারাগড়ের দুর্গ অধিকারে কৃতকার্য্য হইলেন, তাঁহার আশা এতদিনে কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ হইল।

অনতিবিলম্বে দলীলসিং অম্বরের রাজসভায় উপনীত হইয়া উমেদসিংহের বিজয়বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিল। সুপ্রসিদ্ধ কেশু দাস সসৈন্যে বুন্দী অবরোধ করিলে, উমেদ সিংহ তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। দলীল সিংহ এক্ষণে বুন্দীরাজ্যের শাসন ভার লইয়া প্রভুদ্রোহিতা রূপ দুরপনেয় কলঙ্কে স্বীয় হস্ত পুনর্ব্বার কলুষিত করিতে অসম্মত হইলেন।

স্বরাজ্য হইতে পুনরায় নির্ব্বাসিত হইয়া পৈতৃক রাজ্য উদ্ধারার্থ উপায় চিন্তনে নিযুক্ত হইলেন। মারবার কি মিবার রাজের সাহায্য প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হইয়া, স্বকীয় মুষ্টিমেয় অনুচর বর্গ সমভিব্যাহারে বুন্দী রাজ্যের নানা স্থান আকস্মিক আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিলেন। একদা তিনি বিনোদিয়া গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহার বিমাতা সংসারে বিতৃষ্ণ হইয়া নির্জ্জন-বাসে অনুতাপাশ্রুতে স্বীয় অনপনেয় পাপরাশি প্রক্ষালন চেষ্টায় কালাতিপাত করিতেছিলেন। তিনিই উমেদসিংহের সমুদয় বিপদের মূল। তিনি বুধসিংহের একতমা মহিষী, অম্বর-রাজ জয় সিংহের সহোদরা। নিঃসন্তান হওয়ায় তিনি সপত্নীর অপোগণ্ড শিশুদ্বয়কে ঈর্ষ্যাকষায়িতলোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজা বুধসিংহের অনুপস্থিতি সুযোগে তিনি আসন্নপ্রসবের ভাণ করিয়া এক অপোগণ্ড শিশুকে তাঁহার বৈধ সন্তান বলিয়া বিঘোষিত করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। রাজা বুধসিংহ মহিষীর এরূপ বিষদৃশ আচরণের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি একান্ত বিরক্ত হইলেন এবং স্বীয় শ্যালক অম্বর-রাজকে উহা অবগত করাইলেন। এই সূত্রাবলম্বনেই উভয় রাজ্যমধ্যে বিরোধ সংঘটিত হইয়া বুন্দী রাজ্যের স্বাধীনতাপহরণের সঙ্গে সঙ্গে বুন্দীরাজের আয়ুষ্কালেরও শেষ হয়। আপনাকে স্বরাজ্যের ও স্বপতির সমস্ত বিপজ্জালের নিদানীভূত নিশ্চয় করিয়া তিনি এক্ষণে অনুশোচনার মুর্ম্মুরদাহনে অহরহঃ দগ্ধ হইতেছিলেন। কিরূপে স্বীয় অনপনেয় পাপরাশি প্রক্ষালিত হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিতেছিলেন। উমেদ সিংহ বিনোদিয়াতে উপস্থিত হইয়া বিমা-

তার যথাযোগ্য সম্ভাষণে পরাঙ্‌মুখ হইলেন না। দুর্গত ও বিপন্ন রাজকুমারকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া রাজমহিষীর অনুশোচনার আর পরিসীমা রহিল না। রাজকুমারের দুঃখবিমোচনে সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া, উপায়ান্তর অভাবে তিনি নর্ম্মদাতীরে মলহর রাও হোলকারের শিবিরে অচিরে উপনীত হইলেন। তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে মহারাষ্ট্র সেনাপতি, উমেদসিংহকে অচিরে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এদিগে মিবার রাজ-তাঁহার ভাগিনেয় মধুসিংহকে অম্বরের রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে কৃতকার্য্য হইলে,হোলকারকে চতুঃষষ্টিলক্ষ মুদ্রা প্রদানে অঙ্গীকার করিলেন। অচিরে জয়পুর অবরুদ্ধ হইল। স্বীয় মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া হোলকারের প্রভূত সেনাদলের সম্মুখীন না হইয়া, তিনি উমেদ সিংহকে বুন্দীরাজ্যের একাধিপত্য প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। তাঁহাকে স্বহস্তে বুন্দীরাজের ললাটদেশ রাজটিকায় সুশোভিত করিয়া দিতে হইল। রোষে, ক্ষোভে ও অপমানে অম্বরেশ্বর বিষপানে স্বীয় ঘৃণিত জীবন পরিত্যাগ করিলেন।

এইরূপে ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্দ্দশ বর্ষ নির্ব্বাসন ও অজ্ঞাতবাসের পর উমেদসিংহ পৈতৃক সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দিগের উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত উপদ্রবে ও অত্যাচারে তিনি ক্ষণকালের জন্যও শান্তিলাভে সমর্থ হন নাই। রাজ্যপ্রাপ্তির অনতিবিলম্বে তিনি চম্বলনদের বামতীরবর্ত্তি সমস্ত পাটবপ্রদেশ হোলকারকে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে মহারাষ্ট্রীয়েরা রাজপুতনায় প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহা উৎসন্ন করিতে আরম্ভ করিল। রাজস্থানের রাজন্যবর্গ ইচ্ছা করিয়া স্বদেশে প্রবল শত্রুকে প্রবেশাধিকার দিয়া, তাহার দুর্ব্বারগতিরোধে কখনও যত্নবান না হইয়া শত্রুকর্তৃক উপদ্রুত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইতে লাগিলেন। উমেদসিংহ জাতীয় সমুদয়গুণে সম্যকরূপে বিভূষিত হইয়াও প্রতিহিংসা পরবশ হইয়া অনপনেয় কলঙ্ককালিমায় স্বীয় বিমল যশঃশোভা কলঙ্কিত করা হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন নাই। যদি এই কলঙ্কে তিনি স্বীয় হস্ত কলুষিত না করিতেন, তবে তাঁহাকে আমরা রাজপুত রাজনামগুলীর অতি গৌরবান্বিত আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইতাম না। দোষস্পর্শশূন্য লোক জগতে বিরল। উমেদসিংহ রক্ত মাংসের শরীর লইয়া কিরূপে মানবীয় দোষে মুক্ত থাকিবেন?

ইন্দ্রগড়ের সামন্ত দেবসিংহ দুরলানার যুদ্ধের পর দুর্গত প্রভুর প্রতি যে ঘোরতর দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন, উমেদসিংহ রাজাধিকারের পর দেবসিংহের সেই অপরাধে তাঁহার কোনও শাস্তি বিধান না করিয়া স্বীয় স্বভাব-সিদ্ধ মহানুভাবতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুরাচার দেবসিংহ প্রভুর সেই মহত্ত্বে মোহিত হইয়া ভবিষ্য জীবনে প্রভুভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় চরিত্রগত কলঙ্কাপনোদনে যত্নবান না হইয়া,

বরং তাহার বিপরীতাচরণে প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠিত হইল না। বুন্দীপতি অম্বর-রাজ মধু-সিংহকে স্বীয় ভগিনীপ্রদানে সঙ্কল্প করিয়া বিবাহের প্রস্তাবসূচক নারিকেল জয়পুরে প্রেরণ করিলেন। সেই সময়ে দেবসিংহ জয়পুর রাজসভায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, রাজা তাঁহাকে বুন্দীশ্বরের সহোদরার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি রাজকুমারীর জন্মের বৈধতা বিষয়ে মিথ্যা সন্দেহ প্রকাশ করিয়া স্বীয় প্রভুর অবমাননা প্রদর্শনে অণুমাত্রও কুণ্ঠিত হইলেন না। নারিকেল অচিরে বুন্দীতে প্রতিপ্রেরিত হইল। এই দুঃসহ অপমানে বুন্দীরাজ অহর্নিশি দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

রাজা উমেদসিংহ ইহার অল্পকাল পরে 'বিজয়সেনী মাতার' আরাধনার্থ কারোয়ারে আগমন করিয়া ইন্দ্রগড়পতিকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান করিলেন। আত্মীয়বর্গের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া দেবসিংহ স্বীয় পুত্র ও পৌত্রসহ রাজসদনে উপস্থিত হইলেন। রাজাদেশে অবিলম্বে তাঁহাদের শিরশ্ছেদ হইল। ইন্দ্রগড়ের আধিপত্য দুর্ম্মতি দেবসিংহের ভ্রাতার প্রতি অর্পিত হইল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে উমেদসিংহ এই বিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বকীয় নির্ম্মল চরিত্র কলঙ্কিত করেন। কিন্তু অচিরে তাঁহার হৃদয় এই নিদারুণ পাপে অপবিত্র ও কালিমাময় হইয়া উঠিল, জীবন দুর্ব্বিষহ ভার বোধ হইতে লাগিল। অনুতাপানলে সাতবৎসর পর্য্যন্ত অনবরত দগ্ধ হইয়া ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর বেশে ভারতবর্ষস্থিত সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ সমূহ দর্শনে বহির্গত হইলেন। রাজর্ষির পুণ্যকীর্ত্তি ক্রমে ক্রমে রাজস্থানের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। যিনি শৈশবেই মহাবীর বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, যিনি যৌবনে রাজ্যশাসন করিয়া প্রজারঞ্জন ও অন্যান্য রাজন্যবর্গের আদর্শস্থল হইয়া উঠিয়াছিলেন, এখন তিনি পবিত্র সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রাজস্থানের সর্ব্বত্র সমভাবে সম্মানিত হইতে লাগিলেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে রাজর্ষি মানবলীলা সংবরণ করিয়া স্বীয় সুদীর্ঘ ও বিচিত্র ঘটনাপূর্ণজীবনের পর্য্যবসান করেন।

শ্রীঃ—
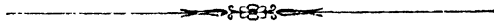
আর্য্য পঞ্জিকা।

আমরা দেখি সূর্য্য প্রত্যহ প্রাতঃকালে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিম দিকে সরিতে সরিতে সন্ধ্যার সময় আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হয়। সূর্য্যের এই দৈনিক গতিকে আহ্নিক গতি বলে। এই গতি বাস্তবিক সূর্য্যের নহে, ইহার মূল কারণ এই যে পৃথিবী তাহার মেরুদণ্ডের (axis passing through the poles) উপরে পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বদিকে আবর্ত্তিত হইতেছে এবং আমরাও তৎসঙ্গে ঘুরিতেছি। সুতরাং যেরূপ রেইলপথে চলিয়া পার্শ্বস্থ বৃক্ষাদির প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যেন আমরা স্থিরই আছি, উক্ত বৃক্ষাদি বিপরীত দিকে ভ্রমণ করিতেছে, ঠিক্ সেইরূপ আমাদের স্বকীয় ঘূর্ণন অনুভব করিতে না পারিয়া দেখিতেছি যেন আমরা স্থিরই আছি এবং গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে অনবরত ঘুরিতেছে।

যেরূপ দেখা যায় সূর্য্যাদি অনবরত ঘুরিতেছে তাহা স্বীকার না করার কারণ:—

১। পৃথিবী আবর্ত্তিত হইতেছে মনে করিলে বিষুবদ্বৃত্তের এক এক বিন্দুর গতির হার প্রতি পলে প্রায় ৭ মাইল হয়। কিন্তু নক্ষত্রগণ ঘুরিতেছে মনে করিলে তাহাদের গতির হার এত অধিক হয় যে তাহা অসম্ভব বলিয়া প্রতীতি জন্মে; বিশেষতঃ যখন মনে করা যায় যে উহাদের আকার পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বৃহৎ।

২। যখন সমুদয় জ্যোতিষ্কের গতিই এক রকম অর্থাৎ ৬০ দণ্ডে এক বার ঘূরিয়া আসে, তখন সকল নক্ষত্রাদি শক্ত রূপে পরস্পর আবদ্ধ না হইলে এইরূপ ঘূর্ণন অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

৩। যদি কোন উচ্চ স্থান হইতে একটি বস্তু নীচের দিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তবে ঐ বস্তু ঠিক তাহার নিম্নদেশে না পড়িয়া কিছু পূর্ব্বদিকে সরিয়া পড়ে। যদি পৃথিবী আবর্ত্তিত না হইত তবে ঐ বস্তু ঠিক নিম্নেই পতিত হইত; কিন্তু আবর্ত্তন হয় বলিয়া উচ্চ স্থানে আবর্ত্তনের হার নিম্ন স্থানের হার অপেক্ষা অধিক এবং সেই কারণে যে স্থান হইতে পতিত হয় সেই স্থানের হার অনুযায়ী পূর্ব্বদিকে অধিক সরিয়া পড়ে।

আহ্নিক গতি ব্যতীত সূর্য্যের অন্য প্রকার এক গতি আছে, তাহা এত সূক্ষ্ম যে চক্ষুর্দ্বারা স্থির করা যাইতে পারে না। সূর্য্যাস্তের অব্যবহিত পরে যদি আমরা একটি নক্ষত্রকে মস্তকোপরি লক্ষ্য করিয়া রাখি, তবে তাহার ১০। ১২ দিন পরে ঠিক ঐ সময় নভোমণ্ডলের দিকে দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে যে সেই নক্ষত্রটি অনেক

পশ্চিমে সরিয়াছে, অর্থাৎ সূর্য্যের অপেক্ষাকৃত নিকটে আসিয়াছে। সকল স্থির নক্ষত্র সম্বন্ধেই এইরূপ লক্ষিত হইবে। অতএব মনে করিতে হইবে হয়ত সূর্য্য পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্ব দিকে নচেৎ নভোমণ্ডল নক্ষত্রাদি সহ পৃথিবীর ন্যায় পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে অনবরত ঘুরিতেছে। পৃথিবীর ন্যায় নভোমণ্ডল কোন স্থূল পদার্থ নহে, সুতরাং চক্রবৎ আবর্ত্তন করা নভোমণ্ডলের পক্ষে অসম্ভব। কাজেই মনে করিতে হইবে সূর্য্যই পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিতেছে। সূর্য্যের এই গতিকে বার্ষিক গতি বলে এবং সূর্য্য যে কক্ষাতে পরিভ্রমণ করে তাহার নাম রাশিচক্র। রাশিচক্র একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত নহে, উহা একটি বৃত্তাভাস। রাশিচক্রে স্থিত কোন স্থির-নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পুনঃ ঐ নক্ষত্রে আসিতে যে সময়ের আবশ্যক, তাহাকে এক নাক্ষত্রিক বর্ষ কহে।

সূর্য্যের এই গতিও বাস্তবিক সূর্য্যের নহে, পৃথিবী এক সদৃশ কক্ষাতে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে এবং আমরা স্বকীয় গতি অনুভব করিতে না পারিয়া সূর্য্যের গতি দেখিতেছি। প্রাচীন মতে পৃথিবীকে স্থির মনে করিয়া সূর্য্যেরই গতি প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু সূর্য্য স্থির এবং পৃথিবী ঘূরিতেছে কিংবা পৃথিবী স্থির, সূর্য্য ঘুরিতেছে ইহার যেটি সত্য মনে করি, গণনার আপেক্ষিক ফল এক রকমই হইবে। বাহ্যিক দৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া আমরা সাধারণতঃ সূর্য্যেরই গতি বলিব।
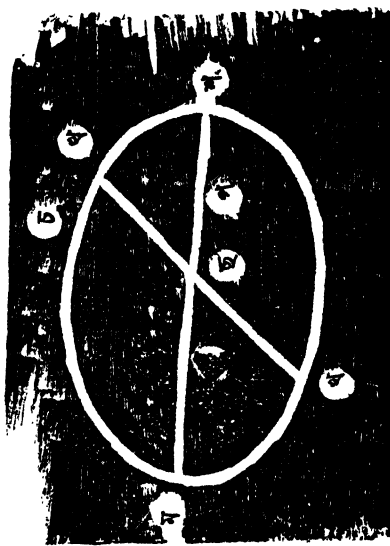
মনে কর ম চ খ শ রাশিচক্র খ খ বিষুবদ্বৃত্তের সঙ্গে অবচ্ছেদ, শ ম বৃহত্তম ব্যাস, শ শীঘ্রোচ্চ, ম মন্দোচ্চ, প পৃথিবী, ছ কেন্দ্র এবং চ একটি স্থির-নক্ষত্র।

চকে মেষের প্রারম্ভবিন্দু মনে করিলে পৃথিবী চ হইতে চ ম এর দিকে ঘুরিয়া পুনঃ চতে আসিতে যে সময়ের আবশ্যক তাহা হিন্দুদিগের এক বৎসর। একবর্ষের পরিমাণ হিন্দু মতে ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল, ৩১ বিপল ২৪ অনুপল এবং পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদদিগের সূক্ষ্ম গণনায় উহার পরিমাণ ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ২২ পল ৫৬ বিপল ৪৬.৫ অনুপল। অতএব দেখাযায় প্রাচীন মত অপেক্ষা আধুনিক মতে বর্ষ মাত্র ৮ পল ৩৪ বিপল ৩৭.৫ অনুপল ন্যূন এবং প্রায় ৪২৫ বৎসরে এক দিনের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। ভবিষ্যতে আমরা আধুনিক মত

অবলম্বন করিয়া নাক্ষত্রিক বর্ষের মান ৩৬৫.২৫৬৩৭৪ দিন ধরিব।

থকে ক্রান্তিপাত বলে উহার বিপরীত দিকে অর্থাৎ খ শ এর দিকে এক সূক্ষ্ম গতি আছে, তাহার পরিমাণ সূর্য্য সিদ্ধান্তের মতে বার্ষিক ৫৪ বিকলা এবং পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের মতে ৫০.২২ বিকলা। সূর্য্যসিদ্ধান্ত বলেন, থ এর গতি সর্ব্বদা বিপরীত অর্থাৎ পশ্চিম দিকে নহে। উহা চ হইতে ২৭ অংশ পূর্ব্ব দিকে যাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক চ এর মধ্য দিয়া ২৭ অংশ চ এর পশ্চিম দিকে যায় এবং পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চ তে আসে। এইক্ষণ ক্রান্তিপাত উহার কক্ষার তৃতীয় পাদের ২০ অংশ ৪৬ কলা ও ৩০ বিকলাতে আছে, অর্থাৎ আঠারশত বৎসরে ২৭ অংশ পূর্ব্বদিকে যাইয়া আর আঠারশত বৎসরে পুনঃ চ তে আসিয়াছিল। এবং ১৩৮৫ বৎসর যাবৎ পশ্চিম দিকে চলিতেছে। আবার ৪১৫ বৎসর পরে পুনঃ চ এর দিকে চলিবে। এইক্ষণ ১০ই চৈত্র তারিখে সূর্য্য ক্রান্তি পাতে আসে এবং ঐ দিবস দিন রাত্রি সমান হয় আরও ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত ১০ই চৈত্র ঐরূপ হইয়া শেষে ৯ই চৈত্র সূর্য্য ক্রান্তি পাতে আসিবে এবং ঐ দিবস দিন রাত্রি সমান হইবে, এইরূপ সরিতে সরিতে ২২২১ শকে ৪ঠা চৈত্র দিন রাত্রি সমান হইয়া ক্রান্তি পাত পুনঃ চ এর দিকে চলিবে, পরে ক্রমে অগ্রসর হইয়া ৩০২১ শকে ৩০শে চৈত্র চ বিন্দুতে যথার্থ বিষুব সংক্রান্তি হইবে। ইহা সূর্য্য সিদ্ধান্তের মত। প্রাকৃতিক কারণের দিকে দৃষ্টি করিলে ভাস্করাচার্য্য মুঞ্জাল প্রভৃতি আর্য্য এবং নব্য পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদদিগের সঙ্গে ঐক্য হইয়া আমরাও বলিব সূর্য্য সিদ্ধান্ত যে বলেন ক্রান্তি পাত ৪১৫ বৎসর পরে প্রত্যাবর্ত্তন দ্বারা পুনঃ চ এর দিকে আসিবে তাহা অসম্ভব। কারণ বিষুবদ্বৃত্তের স্থানে পৃথিবীর আকার অধিক উন্নত। এবং ঐ স্থলে চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত অধিক। আকর্ষক বিষুবদ্বৃত্তের সম ধরাতলে কিংবা মেরুদণ্ডের সমসূত্রে না থাকিলে তাহাদের আকর্ষণের ফল সমভাবে বিভক্ত হইতে পারে না। অতএব আকর্ষক ও আকৃষ্ট বস্তুর কেন্দ্রদ্বয় যোগ করিলে যে রেখা পাওয়া যায় আকৃষ্ট বস্তুর (পৃথিবীর) উন্নত স্থান (বিষুবদ্বৃত্ত) সেই দিকে (রাশিচক্রের দিকে) অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে দেখা যায় বিষুবদ্বৃত্ত ক্রমে রাশিচক্রের দিকে সরিয়া আসিতেছে, কিন্তু পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনের দরুণ বিষুবদ্বৃত্ত ও রাশিচক্রের মধ্যে যে অবনতি তাহা আশানুরূপ সঙ্কোচিত হইতে পারিতেছে না, কাজেই বিষুবদ্বৃত্ত উচিত রূপে রাশিচক্রের দিকে সরিতে পারিতেছে না। নচেৎ এই দুই বৃত্ত এতদিনে মিলিয়া যাইত। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে বিষুবৎকেন্দ্র (pole of the equator) রাশিচক্রকেন্দ্রের (pole of the ecliptic) বা কদম্বের চতুর্দ্দিকে অল্প অল্প ঘুরিতেছে এবং ইহাতেই বিষুবদ্বৃত্ত অবনতি প্রায়স্থির রাখিয়া রাশিচক্রের উপর বিপরীত দিকে অল্প-

পরিমাণে ঘুরিতেছে। পৃথিবীকে সর্ব্বত্র সমান (homogeneous) মনে করিয়া এই প্রণালীতে অয়নাংশ গণনা করিলে তাহার পরিমাণ বার্ষিক ৫৬.৪ বিকলা হয়। অতএব দেখা যায় এই প্রাকৃতিক কারণ বর্ত্তমান থাকিতে ক্রান্তিপাতের গতি সর্ব্বদাই পশ্চিম দিকে হইবে এবং কখনও পূর্ব্বদিকে হইবে না। পাশ্চাত্য মতে বর্ষ ক্রান্তিপাত অর্থাৎ খ হইতে গণনা করা হয়। উহার পশ্চিমাভিমুখ গতি বশতঃ রাশিচক্রের ৫০ বিকলা বাকি থাকা সত্ত্বেই বৎসর পূর্ণ হইয়া থাকে, অর্থাৎ সূর্য্য পুনঃ ঐ ক্রান্তিপাতে আসে। সুতরাং ইহা নাক্ষত্রিক বর্ষ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন এবং তাহার পরিমাণ ৩৬৫ দিন ১৪ দণ্ড ৩২ পল অথবা ৩৬৫.২৪২২১৬ দিন।

অন্যপ্রকার বৎসর শীঘ্রোচ্চ শ হইতে শীঘ্রোচ্চ পর্য্যন্ত গণনা করা হইয়া থাকে, উচ্চের পূর্ব্ব দিকে এক সামান্য গতি আছে, তাহার পরিমাণ পাশ্চাত্য মতে বার্ষিক ১১.২৫ বিকলা। অতএব ঔচ্চ বর্ষের পরিমাণ নাক্ষত্রিকবর্ষ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। যথা ৩৬৫.২৫৯৫৪৪ দিন।

মেষের প্রারম্ভ বিন্দু চ হইতে আরম্ভ করিয়া, রাশিচক্রকে সমান ১২ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার প্রত্যেক ভাগকে রাশি বলে। এই রাশি সকলের মধ্যে যে নক্ষত্রপুঞ্জ আছে, তাহার আকার কল্পনা করিয়া, প্রাচীনেরা ঐ সকল রাশির নাম মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনুঃ, মকর, কুম্ভ, ও মীন রাখিয়াছেন। যে সময় রাশিদিগের নাম দেওয়া হয়, তখন ক্রান্তিপাত (vernal equinox) মেষের প্রারম্ভ বিন্দুতে ছিল। এইক্ষণ প্রায় ২০ অংশ পশ্চিমদিকে সরিয়া মীন রাশিতে আসিয়াছে। পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদগণ ক্রান্তিপাত পশ্চিমে সরা সত্ত্বেও পূর্ব্ব নিয়মে ক্রান্তিপাতকে এক্ষণও মেষের প্রারম্ভ (First point of aries) বলিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের মধ্যেও সংক্রান্তির নাম পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে, যথা যদিচ ক্রান্তিপাত এক্ষণ মীন রাশিতে তথাপি মেষ সংক্রান্তিকে মহাবিষুব সংক্রান্তি বলা হয়। এইরূপ অয়ন সংক্রান্তির নামও পূর্ব্ববৎ রাখা হইয়াছে। ক্রান্তিপাত হইতে বর্ষ গণনা করিলে ঋতুর পরিবর্ত্তন দেখা যায় না বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য নিয়ম অনুকরণ করিয়া আমরা নাক্ষত্রিক বর্ষগণনা ত্যাগ করিলে আমাদের পঞ্জিকার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইবে এবং প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদদিগের অনুষ্ঠিত অনেক ঘটনার পরিবর্ত্তন দেখা যাইবে; যথা বৈশাখ মাসে সূর্য্য আর যে নক্ষত্রপুঞ্জ মেষ নামে খ্যাত তাহাতে উদয় হইবে না ইত্যাদি। অতএব অনেক মহাত্মা যে প্রস্তাব করিয়াছেন পাশ্চাত্য নিয়মে ক্রান্তিপাত হইতে বর্ষ গণনা করিয়া মেষ সংক্রান্তি অর্থাৎ বর্ষারম্ভ ১০ই চৈত্র পরিবর্ত্তন করা উচিত। আমরা তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগদান করিতে পারিতেছি না। তাঁহারা এইরূপ পরিবর্ত্তনোপলক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন তন্মধ্যে তিনটিই প্রধান। যথা—

১। ৩০ শে চৈত্রের পর বর্ষারম্ভ করাতে শাস্ত্রোক্ত অনেক কার্য্য লোপ হইতেছে।

২। আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদগণ অয়নাংশ না ধরাতে তাঁহাদের স্ফুট গণনা ভ্রমাত্মক।

৩। যথার্থ অশ্বিনী নক্ষত্রে মেষ সংক্রান্তি না হইয়া এক্ষণ তাহার প্রায় ৮ দিন পূর্ব্বে বর্ষারম্ভ হইয়া থাকে।

শাস্ত্রোক্ত কার্য্য লোপ সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন—

মেষাদৌ শর্করা দেয়া বারিপূর্ণাচ গর্গরী। এই ঘটোৎসর্গ কার্য্য যথার্থ বিষুবৎ সংক্রান্তি দিবসে না হওয়াতে কার্য্য লোপ হইতেছে। পাশ্চত্য নিয়ম অনুসারে তাঁহারা ক্রান্তিপাতকে মেষাদি বলেন, কিন্তু হিন্দুমতে মেষাদি মেষ নামক নক্ষত্র পুঞ্জের প্রারম্ভ এবং সূর্য্য ঐ নক্ষত্র পুঞ্জের প্রারম্ভে প্রায় ৩০ শে চৈত্রই আসিয়া থাকে, অতএব আমরা প্রায় ঠিক সময়েই উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকি। তাহাতে কার্য্য লোপ হওয়ার সম্ভব কিছুমাত্র দেখা যাইতেছে না।

অয়নাংশ সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন, আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদগণ অয়নাংশ গণনা না করাতে তাঁহাদের স্ফুটগণনা (corrected longitude) ভ্রমাত্মক। পাশ্চাত্য নিয়মে ক্রান্তিপাত হইতে গ্রহের স্ফুট স্থান গণনা করিলে অয়নাংশ (precession) না ধরাতে ভ্রম হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন স্থির-নক্ষত্র হইতে গণনা করিলে ক্রান্তিপাতের যেরূপ গতি কেন না থাকুক, তাহাতে অয়নাংশ না ধরিলে ভ্রম হইতে পারে না। আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদদিগের মধ্যে অনেকেই ক্রান্তিপাতের গতির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন এবং যে স্থানে অয়নাংশ গণনা না করিলে ভুল হয়, সেই স্থানে অয়নাংশ ধরিয়া গণনা করিয়াছেন। যথা সূর্য্য সিদ্ধান্ত চন্দ্র ও সূর্য্যের সমক্রান্তি স্থির করা উপলক্ষে লিখিয়াছেন।

ভাস্করেন্দ্বোর্ভ চক্রান্তশ্চক্রার্দ্ধাবধিসংস্থয়োঃ
দৃক্‌তুল্যসাধিতাংশাদিযুক্তয়োঃস্বাবপক্রমৌ
সূর্য্য সিদ্ধান্ত ১১ অঃ ৬ শ্লোক।

ক্রান্তি (Declination) বিষুবৎ ও রাশিচক্রের অবচ্ছেদ বিন্দু, অর্থাৎ ক্রান্তিপাত স্থানের উপর নির্ভর করে বিধায় দৃক্‌তুল্য শব্দ ব্যবহার করিয়া স্পষ্টতঃ অয়নাংশ ধরার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

স্ফুটস্থান গণনা মেষাদি অর্থাৎ চ বিন্দু হইতে করা হয় বিধায় ক্রান্তিপাত খ যে স্থানে কেন না থাকুক, তাহার গণনা নিষ্প্রয়োজন।

ক্রান্তিপাত হইতে যে সকল গণনা করা হয়, সমুদায়ই আপেক্ষিক; কারণ ক্রান্তিপাত স্থিরবিন্দু নহে। অতএব গণনার সময় উহার অবস্থান স্থির না হইলে ঐ সকল গণনাদ্বারা বিশেষ ফল দর্শিতে পারে না। কাজেই পাশ্চাত্য গণনাতে অয়নাংশের নিতান্ত প্রয়োজন।

হিন্দুরা স্থিরবিন্দু চ হইতে সকল বিষয় গণনা করিয়াছেন। অতএব ঐ সকল গণনার ফল সর্ব্বদাই সমান থাকিবে এবং ইহাতে অয়নাংশ গণনা করা অনাবশ্যক। অতএব

যাঁহারা বলেন অয়নাংশ না ধরাতে হিন্দু-দিগের গণনা ভ্রমাত্মক, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমরা একমত হইতে পারি না।

তাঁহারা অশ্বিনীতে বর্ষারম্ভ সম্বন্ধে বলেন সূর্য্য প্রায় ৮ই বৈশাখ অশ্বিনী নক্ষত্রে (arietes) আইসেন। অতএব মেষ সংক্রান্তি ৩০শে চৈত্র ধরাতে প্রায় ৮দিন পূর্ব্বে ধরা হয়। অশ্বিনী যে ঐ নক্ষত্রটি বা একটি বিন্দু মাত্র তাহা হিন্দুদিগের মত নহে। অশ্বিনী বলিলে হিন্দু মতে একটি বিন্দু না বুঝাইয়া, কতকথানি স্থান বুঝায় এবং একএক নক্ষত্র-গত স্থানের পরিমাণ রাশিচক্রের ২৭ভাগের ১ভাগ। রাশিচক্রকে মেষের আরম্ভ বিন্দু চ হইতে সমান ২৭ ভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহার প্রত্যেক ভাগকে নক্ষত্র বলা হয়। উহার এক এক ভাগে যে নক্ষত্রপুঞ্জ আছে তন্মধ্যে যে টি প্রধান তাহার নামানুসারে ঐ ভাগের নাম রাখা হইয়াছে। যথা যে ভাগে অশ্বিনী নক্ষত্র (arietes) প্রধান সেই ভাগের নাম ১ অশ্বিনী। এইরূপ ২ ভরণী ৩ কৃত্তিকা, ৪ রোহিণী, ৫ মৃগশিরা, ৬ আর্দ্রা, ৭ পুনর্ব্বসু, ৮ পোষ্যা, ৯ অশ্লেষা, ১০ মঘা, ১১ পূর্ব্বফল্গুনী, ১২ উত্তরফল্গুনী, ১৩ হস্তা, ১৪ চিত্রা, ১৫ স্বাতী, ১৬ বিশাখা, ১৭ অনুরাধা, ১৮ জ্যেষ্ঠা, ১৯ মূলা, ২০ পূ-র্ব্বাষাঢ়া, ২১ উত্তরাষাঢ়া, ২২ শ্রবণা, ২৩ ধনিষ্ঠা, ২৪ শতভিষা, ২৫ পূর্ব্ব ভাদ্র পদ, ২৬ উত্তর ভাদ্র পদ ও ২৭ রেবতী। এই সাতাশ নক্ষত্রে সমস্ত রাশিচক্র বিভক্ত হ-ইয়াছে অতএব একএক রাশিতে ২$\frac{1}{8}$ নক্ষত্র, যথা অশ্বিনী ভরণী ও কৃত্তিকার একপাদে
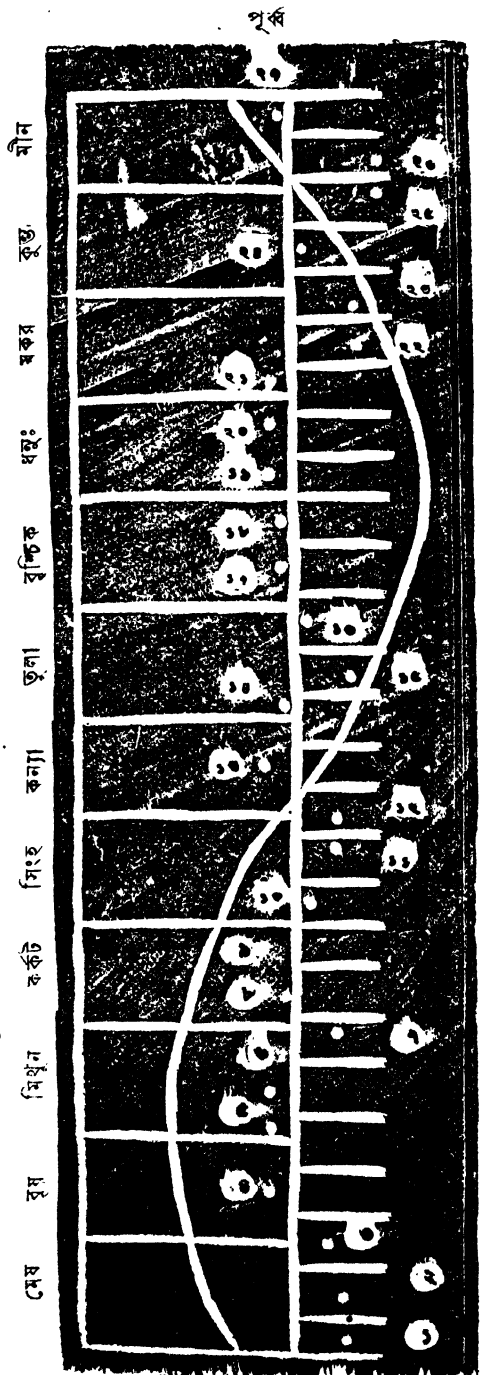
মেষ রাশি। এইরূপ কৃত্তিকার তিন পাদ রোহিণী ও মৃগশিরার অর্দ্ধেক বৃষ রাশি। ইত্যাদি—এক এক নক্ষত্রের মান ১৩ অংশ ২০ কলা *। এই স্থানের প্রারম্ভবিন্দুতে সূর্য্য আসিলেই সূর্য্য অশ্বিনীতে আসিল বলা যায়।

এক রাশি অর্থাৎ রাশিচক্রের ৩০ অংশ অতিক্রম করিতে সূর্য্যের যে সময় আবশ্যক, তাহার নাম এক সৌরমাস। মাসের নাম ঠিক সূর্য্যের অবস্থান হইতে রাখা হয় নাই; যদিচ কেহ কেহ বলেন অতি প্রাচীন সময়ে বর্ষারম্ভ আশ্বিন মাসে হইত এবং মাসের প্রারম্ভে সূর্য্য যে নক্ষত্রে অবস্থান করিত তাহার নাম হইতে মাসের নাম রাখা হইয়াছিল। যথা বর্ষারম্ভে সূর্য্য অশ্বিনী নক্ষত্রে থাকিত অতএব প্রথম মাসের নাম আশ্বিন, দ্বিতীয় মাসের প্রারম্ভে সূর্য্য কৃত্তিকাতে থাকিত অতএব দ্বিতীয় মাসের নাম কার্ত্তিক ইত্যাদি। তাঁহারা আরও বলেন, সেই সময়ে গণনা অতিস্থূল ছিল এবং পশ্চাদ্বর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্গণ যখন দেখিলেন প্রাচীন কালের ভ্রমাত্মক গণনাতে পূর্ণ সাত মাসের পার্থক্য জন্মিয়াছে, তখন তাঁহারা আশ্বিন হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত সাত মাস ত্যাগ করিয়া বৈশাখ মাসে বর্ষারম্ভ করিয়া তাঁহাদের গণনা প্রচলিত করেন। এই মত কতদূর সত্য বলাযায় না, কিন্তু অভিধানাদিতে বৈশাখ প্রভৃতি মাসের ব্যুৎপত্তি দেখিলে দেখা যায় ‘ বিশাখা নক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী যস্মিন্ মাসে স বৈশাখঃ’ অর্থাৎ যে মাসে পূর্ণিমা দিবস চন্দ্র বিশাখা নক্ষত্রে থাকে তাহার নাম বৈশাখ। এইরূপ জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়া হইতে আষাঢ় শ্রবণা হইতে শ্রাবণ, ভাদ্রপদ হইতে ভাদ্র, অশ্বিনী হইতে আশ্বিন, কৃত্তিকা হইতে কার্ত্তিক, মৃগশিরা হইতে মার্গ শির্ষ, পোষ্যা হইতে পৌষ, মঘা হইতে মাঘ, ফল্গুনী হইতে ফাল্গুন এবং চিত্রা হইতে চৈত্র কথিত হইয়া থাকে।

* ভভোগোঽষ্টশতী লিপ্তাঃ * * সূর্য্যসিদ্ধান্ত ২অঃ ৬৪ শ্লোক।

যে রাশি যে নক্ষত্রের যে পাদে আরম্ভ হয় তাহার একখণ্ডা (table) নিম্নে দেওয়া গেল :—

	রাশি	নক্ষত্র	পাদ
১	মেষ	অশ্বিনী	প্রথম
২	বৃষ	কৃত্তিকা	দ্বিতীয়
৩	মিথুন	মৃগশিরা	তৃতীয়
৪	কর্কট	পুনর্ব্বসু	চতুর্থ
৫	সিংহ	মঘা	প্রথম
৬	কন্যা	উঃ ফল্গুনী	দ্বিতীয়
৭	তুলা	চিত্রা	তৃতীয়
৮	বৃশ্চিক	বিশাখা	চতুর্থ
৯	ধনুঃ	মূলা	প্রথম
১০	মকর	উঃ আষাঢ়া	দ্বিতীয়
১১	কুম্ভ	ধনিষ্ঠা	তৃতীয়
১২	মীন	পূঃ ভাদ্রপদ	চতুর্থ

এই খণ্ডার প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায় আশ্বিন মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ হইলে চতুর্থ মাস পৌষ, নবম জ্যৈষ্ঠ ও একাদশ শ্রাবণ। উক্ত নিয়ম অনুসারে পুনর্ব্বসু, মূলা ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্র হইতে কথিত হয় নাই। অত-

এব বোধ হয় অমরসিংহ প্রভৃতি যে ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন তাহাই ঠিক।

এক রাশির সীমান্ত রেখাতে সূর্য্য যে কোন সময়ে আসিতে পারে এবং সূক্ষ্ম গণনাতে ঐ সময়কে পূর্ব্বমাসের শেষ এবং পর মাসের প্রারম্ভ অর্থাৎ সংক্রান্তি বলা যায়। কিন্তু সাধারণ ব্যবহারের জন্য সংক্রান্তি দিবসকে পূর্ব্ব মাসের অন্তর্গত মনে করিয়া পরদিন প্রাতঃকাল হইতে পর মাসের গণনা আরম্ভ করা হয়। জ্যোতিষী গণনাতে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত দিন গণনা না করিয়া, অর্দ্ধ রাত্রি হইতে অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত অথবা মধ্যাহ্ণ হইতে মধ্যাহ্ণ পর্য্যন্ত দিন গণনা করা যায়। উহার কারণ এই যে সকল ঋতুতে সূর্য্যোদয়ের সময় সমান থাকে না। কিন্তু যাম্যোত্তর রেখাতে (meridian) প্রায় এক সময়েই সূর্য্য আসিয়া থাকে। হিন্দুমতে অর্দ্ধরাত্রি হইতে দিবসের গণনা আরম্ভ হয়, অতএব কোন দিন অর্দ্ধ রাত্রির পরে যদি সংক্রান্তি হয়, তবে শাস্ত্রমত সংক্রান্তি কৃত্য পরদিন অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পরে হওয়ার ব্যবস্থা। কোন কোন পঞ্জিকাকার উক্ত পরদিনকে সংক্রান্তি দিন ধরিয়া তৎপর দিন হইতে পর মাসের গণনা করিয়া থাকেন। ইহাদিগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে সংক্রান্তি যদি ৪৫ কি ততোধিক দণ্ডে (কিম্বা .৭৫ কি ততোধিক ভগ্ন দিনে) হয়, তবে তাহাকে পূর্ণ এক দিন মনে করিতে হইবে।

রাশিচক্র পূর্ণবৃত্ত না হওয়াতে সূর্য্য সর্ব্বদা পৃথিবী হইতে সমান দূরে থাকে না। যখন সূর্য্য শীঘ্রোচ্চ শ তে থাকে, তখন পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত নিকটে এবং যখন মন্দোচ্চ ম তে তখন অপেক্ষাকৃত অধিকতর দূরে থাকে। যখন সূর্য্য শীঘ্রোচ্চে থাকে তখন তাহার গতি শীঘ্র এবং মন্দোচ্চে গতি মন্দ থাকে। অতএব শীঘ্রোচ্চের নিকটে এক রাশি অতিক্রম করিতে যে সময়ের আবশ্যক মন্দোচ্চের নিকটে তদপেক্ষা অধিক সময় লাগে। সুতরাং শীঘ্রোচ্চের নিকটে মাসের যে মান তদপেক্ষা মন্দোচ্চের নিকটে মাসের মান অধিকতর হইবে। এইক্ষণ শীঘ্রোচ্চ উত্তরায়নের নিকটে এবং মন্দোচ্চ দক্ষিণায়ণের নিকটে। তদ্‌গতিকেই পৌষ ও তন্নিকটবর্ত্তী মাসের মান অপেক্ষা আষাঢ় ও তন্নিকটবর্ত্তী মাসের মান অধিক। সূর্য্য ৩৬৫.২৪৬৩৭৪ দিনে ৩৬০ অংশ পরিভ্রমণ করে, অতএব তাহার দৈনিক মধ্যগতি $\frac{৩৬০}{৩৬৫.২৫৬৩৭৪}$ অংশ বা ৫৯ কলা, ৮.২ বিকলা এবং এক মাসের মধ্যমান $\frac{৩৬৫.২৫৬৩৭৪}{১২}$ = ৩০.৪৩৮০৩১ দিন। প্রত্যেক মাসের স্ফুটমান (corrected length) স্থির করিতে হইলে প্রত্যেক রাশি পরিভ্রমণ করিতে সূর্য্যের বাস্তবিক যে সময়ের আবশ্যক তাহা স্থির করিতে হইবে। প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সূর্য্য বৃত্তাভাসে পরিভ্রমণ করে বলিয়া মনে করিতেন না, প্রত্যেক গ্রহের কক্ষা (orbit) একটি পূর্ণ বৃত্ত মনে করিতেন। গ্রহটি ঠিক ঐ বৃত্তের পরিধির উপর না চলিয়া অপর একটি ক্ষুদ্রতর বৃত্তের কেন্দ্র কক্ষার উপর পরিভ্রমণ করে এবং গ্রহ এই ক্ষুদ্র বৃত্তের পরিধিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে।

শেষোক্ত বৃত্তের ব্যাস সর্ব্বদা সমান থাকে না, স্থানে স্থানে অল্প পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। চন্দ্র ও সূর্য্য সম্বন্ধে সূর্য্যসিদ্ধান্ত বলেন—

"রবের্ম্মন্দপরিধ্যংশা মনবঃ শীতগোরদাঃ।
যুগ্মান্তে বিষমান্তে চ নখলিপ্তোনিতাস্তয়োঃ।"

সূর্য্যসিঃ ২ অঃ ৩৪ শ্লোক।

রবির মন্দপরিধির মান যুগ্মপদান্তে (at the end of an even quadrant) ১৪ অংশ এবং চন্দ্রের ৩২ অংশ। বিষম পদান্তে প্রত্যেকের ২০ কলা ন্যূন।

এই মন্দ কি শীঘ্র পরিধির কেন্দ্র যে সময়ে কক্ষার যে অংশ পরিভ্রমণ করে গ্রহও ঠিক সেই সময়ে মন্দ কি শীঘ্র পরিধির সেই অংশ পরিভ্রমণ করে। এই দ্বিতীয় বৃত্তের অবতারণা করিয়া (System of Epicycle) টলেমি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীশ দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদগণও গ্রহের স্ফুট স্থান (true longitude) স্থির করিতেন।

এই মতে যদিচ ফল প্রায় শুদ্ধ হইয়া থাকে তথাপি যখন গণিতবিজ্ঞানদ্বারা দেখাযায় গ্রহগণ পূর্ব্বোক্ত উপবৃত্তে ভ্রমণ না করিয়া এক বৃত্তাভাসে পরিভ্রমণ করে এবং ঐসকল বৃত্তাভাসের উৎকেন্দ্র (eccentricity) অল্প হওয়া গতিকে প্রাচীন মতে গণনার সহিত ফল প্রায় সমান হইয়া থাকে; তখন ঐ নিয়ম ত্যাগ করিয়া আধুনিক নিয়মে সকল গণনা দেওয়াই উচিত বোধ হইতেছে।

আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদগণ মনে করেন সূর্য্যের সঙ্গে একটি নক্ষত্র তাহার মধ্য গতিতে এক বৃত্তের উপর পরিভ্রমণ করে। এই বৃত্তের ব্যাস কক্ষার বৃহত্তম ব্যাসের সমান এবং সূর্য্য ও নক্ষত্র এক যোগে শীঘ্রোচ্চ হইতে রওয়ানা হইয়া থাকে। প্রথমে সূর্য্যের গতি মধ্যগতি অপেক্ষা অধিক হওয়াতে নক্ষত্র সূর্য্যের পশ্চাতে থাকে এবং ক্রমে সূর্য্যের গতি হ্রাস হইয়া উভয়ে একত্র মন্দোচ্চ প্রবেশ করে। মন্দোচ্চ অতিক্রম করিলে সূর্য্যের গতি মধ্যগতি অপেক্ষা ন্যূন থাকা বশতঃ নক্ষত্র সূর্য্যের অগ্রে চলে এবং সূর্য্যের গতি ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া পুনঃ উভয়ে একত্র শীঘ্রোচ্চে প্রবেশ করে।
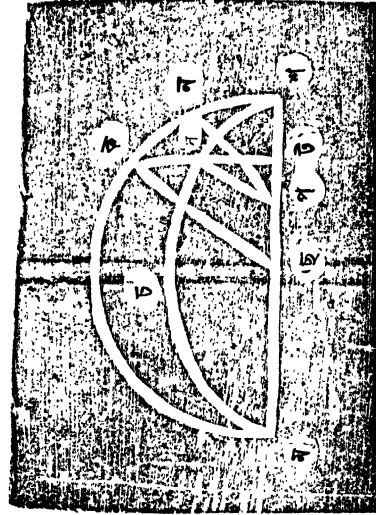
মনে কর ম স শ রাশিচক্র, মী ন শ বৃত্ত, চ কেন্দ্র, প পৃথিবী, স সূর্য্য, ন মধ্যগতিবিশিষ্ট নক্ষত্র, ম মন্দোচ্চ (apogee), শ শীঘ্রোচ্চ (perigee)

শ = শ প স = স্ফুট শৈঘ্রকেন্দ্র (true anomaly)

ম—শ প ন = মধ্যকেন্দ্র (mean anomaly)

ক—কছশ=উৎকেন্দ্র (eccentric anomaly)
ট—কক্ষার উৎকেন্দ্র (eccentricity)
গ—মধ্য গতি, স=সময়, শ ছ=র

যেহেতু প স সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করিবে।

$$\frac{\text{শপস}}{\text{পূর্ণবৃত্তাভাস}} = \frac{\text{স}}{\text{বর্ষমান}} \quad \text{ম} = \text{স}.\text{গ}$$

ইহা হইতে * $\text{ম} = \text{ক} - \frac{৩৬০}{২π}\text{উ} \times \text{জ্যাক}$ (১)

পুনঃ গ × স × কোটি জ্যা শ = ছ ট—ছ প

$$\therefore \frac{\text{র}(১-\text{উ}^২)}{১+\text{উ কোটিজ্যা শ}} = \text{র কোটিজ্যাক} - \text{র}.\text{উ} +$$

$$\therefore \text{কোটিজ্যা শ} = \frac{\text{কোটিজ্যা ক} - \text{উ}}{১ - \text{উ কোটিজ্যা ক}}$$

$$\frac{১-\text{কোটিজ্যা শ}}{১+\text{কোটিজ্যা শ}} = \frac{১+\text{উ}}{১-\text{উ}} \cdot \frac{১-\text{কোটিজ্যা ক}}{১+\text{কোটিজ্যা ক}}$$

$$\therefore \text{কোটি}\frac{\text{শ}}{২} = \sqrt{\frac{১+\text{উ}}{১-\text{উ}}}\ \text{কোটি}\ \frac{\text{ক}}{২} \cdots (২)$$

অতএব দেখা যায় (১) ও (২) দ্বারা মধ্য কেন্দ্র ম জানা থাকিলে স্ফুট কেন্দ্র শ স্থির করা যাইতে পারে এবং শ জানা থাকিলে স বা স × গ অর্থাৎ স সময় স্থির করা যাইতে পারে। উক্ত দুই নিয়ম (১), (২) হইতে একবারে শ স্থির করিতে হইলে $\text{শ} = \text{ম} + [(২\text{উ} - \frac{\text{উ}^৩}{৪})\ \text{জ্যাম} + \frac{৫}{৪}\text{উ}^২\text{জ্যা ২ম} + \frac{১৩}{১২}\text{উ}^৩\ \text{জ্যা ৩ম}]\ ৫৭.২৯$ এই নিয়মে গণনা করিতে হইলে শ হইতে চ এর দূরত্ব জানা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মেইন সাহেব স্থির করিয়াছেন ইং ১৮০০ সনের ১লা জানুয়ারি ক্রান্তিপাত হইতে মন্দোচ্চের দূরত্ব ৯৯ অংশ ৩০ কলা ২৯ বিকলা। ক্রান্তিপাতের বার্ষিক গতি ৫০.২২ বিকলা এবং মন্দোচ্চের বার্ষিক গতি ১১.২৫ বিকলা ইহাদের সমষ্টি ৬১.৪৭ বিকলাকে ৮৫ দ্বারা গুণ করিয়া ১ অংশ ২৭ কলা ৫ বিকলা হয়। এই রাশি পূর্ব্ব রাশিতে যোগ করিয়া ১৮৮৫ ইং সনের ১লা জানুয়ারি মন্দোচ্চের দূরত্ব ১০০ অংশ ৫৭ কলা ৩৪ বিকলা হইল। অতএব বর্ত্তমান শকের ৩০শে চৈত্রের জন্য আরও প্রায় ১৬ বিকলা যোগ করিয়া ১০০ অংশ ৫৭ কলা ৫০ বিকলা হইল।

এইক্ষণ ক্রান্তিপাত হইতে চ এর দূরত্ব স্থির করিতে পারিলেই হয়। সূর্য্য সিদ্ধান্ত অশ্বিনী প্রভৃতি ভগণের (star) ধ্রুব (longitude from চ) স্থির করা সম্বন্ধে বলেন।

'প্রোচ্যন্তে লিপ্তিকা ভানাং স্বভোগোঽথ দশাহতঃ। ভবন্ত্যতীত ধিষ্ণ্যানাং ভোগলিপ্তা যুতা ধ্রুবাঃ।
অষ্টার্ণবাঃ ....'

৮ ম অঃ ১। ২ শ্লোক।

ভগণের কলা বর্ণিত হইতেছে, স্বকীয় ভোগকে দশদ্বারা গুণ করিবে ; তাহাতে অতীত নক্ষত্রের ভোগ কলা যোগ করিলেই সেই নক্ষত্রের ধ্রুব পাওয়া যাইবে। অশ্বিনীর ভোগ ৪৮।

অশ্বিনীর ভোগ ৪৮ কে দশদ্বারা গুণ

* ক এই স্থলে অংশের, সংখ্যা।

† এই স্থলে জ্যা = Sine কোটি জ্যা = cosine কোটি = (tangent) ভুজ = cotangent

করিয়া ৪৮০ কলা বা ৮ অংশ পাওয়া গেল, অশ্বিনীর পূর্ব্বে অতীত নক্ষত্র নাই অতএব চ হইতে অশ্বিনীর দূরত্ব ৮ অংশ হইল। ধ্রুব শব্দের ব্যাখ্যাতে কোন পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ বলেন ধ্রুব ক্রান্তিবৃত্ত (declination circle) দ্বারা গণনা করা হয় এবং উহার ইংরেজী প্রতি শব্দ (polar longitude) এইরূপ মনে করিয়া অশ্বিনীর (B Arietes) স্ফুট স্থান (true longitude from চ) প্রায় ১২ অংশ গণনা করা হইয়াছে। এক নক্ষত্রের মান ১৩ অংশ ২০ কলা অতএব অশ্বিনীভ (B Arietes) অশ্বিনী নক্ষত্রের শেষ হইতে ১ অংশ ২০ কলা অন্তরে আছে। তিনি আরও বলেন ধ্রুব শব্দে নভোমণ্ডলের মেরু (pole) কে বুঝায়, অতএব মেরু হইতে বৃত্ত টানিয়া স্ফুট স্থান (longitude) স্থির হয় বলিয়া উহাকে ধ্রুব বলা হইয়াছে। এই যুক্তি ঠিক হইলে সূর্য্য চন্দ্রাদির স্ফুট স্থানকেও ধ্রুব বলা যাইতে পারিত; কিন্তু তাহা কোথাও দেখা যায় না। ধ্রুব শব্দের অর্থ স্থির (constant) প্রত্যেক ভ (star) ও মেষের প্রারম্ভ চ উভয়ই স্থিরবিন্দু তদ্‌গতিকেই তাহাদের আপেক্ষিক দূরত্বও সর্ব্বদা স্থির। অতএব চ হইতে প্রত্যেক ভ এর দূরত্বকে ধ্রুব বলা হইয়াছে। পাশ্চাত্য মতে অশ্বিনী ভ এর (B Arietes) স্ফুট স্থান ক্রান্তিপাত হইতে গণনা করিলে তাহার পরিমাণ প্রায় ৩২ অংশ ৪৭ কলা হয় অতএব ইহা হইতে ১২ অংশ বিয়োগ করিয়া ক্রান্তিপাত হইতে চএর দূরত্ব এইক্ষণ ২০ অংশ ৪৭ কলা হয়।

মন্দোচ্চ স্ফুট ১০০ অং ৫৭ কলা ৫০ বিকলা হইতে ২০ অংশ ৪৭ কলা বিয়োগ করিয়া চ হইতে মন্দোচ্চের স্ফুট ৮০ অংশ ১০ কলা ৫০ বিকলা হইল এবং শীঘ্রোচ্চের স্ফুট ২৬০ অংশ ১০ কলা ৫০ বিকলা হয়। অতএব শীঘ্রোচ্চ হইতে চ এর দূরত্ব ৩৬০ অংশ—(২৬০ অং ১০ ক. ৫০ বি) = ৯৯ অংশ ৫০ কলা ১০ বিকলা হয়। সূর্য্যের পক্ষে উ = ·০১৬৭৯, গ = .৯৮৫৬১, ৬৬৬ । উ = .৯৬১৫৭।

$$\sqrt{\frac{১+উ}{১—উ}} = ১·০১৬৯৩ \text{ এবং } \frac{১}{১·০১৬৩} =$$

·৯৮৩৩৫।

$$কোটি\frac{ক}{২} = ·৯৮৩৩৫ \times কোটি\frac{শ}{২} \cdots (১)$$

$$\therefore স \times গ = ম = ক — .৯৬১৫৭ জ্যাক \cdots (২)$$

এই দুই নিয়ম (১), (২) হইতে সূর্য্য চ কি অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট বিন্দুতে কোন্ সময়ে আইসে তাহা স্থির হইতে পারে। শ হইতে সময় স্থির করিতে হইলে, যদি

$$কোটি\frac{শ}{২} = চ \text{ তবে}$$

$$স = .২৯৩১ চ — .০২৭২চ^{৩} — .০৪৩১চ^{৫} \cdots (৩)$$

$$শ = ম + (১.৯২৪৯ জ্যা ম + .০১২১ জ্যা ২ম)$$

অংশ ....(৪)

(৩) দ্বারা বর্ষ পরিমাণ স্থির হইতে পারে।

ক্রমশঃ।

শ্রীরাজকুমার সেন, এম, এ।

জাতীয় অনুরাগ ও স্থায়ী একতা।

আর্য্যনিবাস পৌরাণিক ভারতবর্ষ যেমন চিরদিনই কাব্য ও বিজ্ঞানের কমনীয় বিলাস-ক্ষেত্র ছিল, তেমন উহা একসময়ে বীরত্ব ও পুরুষকারের অপূর্ব্ব লীলাভূমি বলিয়া জগতে আপনার গৌরব বিস্তার করিয়াছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের অলোকসামান্য বীরচরিত্র সমূহকে, ইচ্ছা হয়, কাব্যের কৃত্রিম রাজ্যে রাখিয়া দেও; কিন্তু রাজস্থানের বংশগৌরব-সংরক্ষণচেষ্টা, মহারাষ্ট্রের সদর্প সমুত্থান ও পঞ্জাবের ধর্ম্মোদ্দীপ্ত অনল-প্রতিভা ইতিহাসের আধুনিক পৃষ্ঠায় যে জ্বলন্ত চিত্র রাখিয়া গিয়াছে, তাহাই ভারতবর্ষকে প্রকৃত বীরভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার জন্য যথেষ্ট হইবে। আজি ব্রিটেনের অমিত প্রতাপে ভারতের বীরনামে কলঙ্কের রেখা পড়িয়াছে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ভারতবর্ষে ব্রিটেনের অভ্যুদয়-সময়ে বীরত্ব ও কাপুরুষতায় কোন দিনও সমরাভিনয় হয় নাই; তখন জ্ঞানের আলোকে ও অজ্ঞানের অন্ধকারে, একনায়কতায় ও স্বাতন্ত্র্যে, এবং স্বার্থশূন্য স্বজাতিপ্রেম ও পরশ্রীকাতর স্বার্থপরতায় প্রকৃত সংগ্রাম হইয়াছিল। যদি বিজয়লক্ষ্মী শুধুই বীরত্বের অনুসরণ করিত, তবে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যপ্রকারে লিখিত হইত, সন্দেহ নাই। ব্রিটিশজাতির ভারতবিজয়ের মূলদেশে সকল ষড়যন্ত্র, সকল নায়কতা ও সকল মস্তিষ্ক পরিচালনা যে পরিমাণ দ্রষ্টব্য, সকল বীরত্ব সেই পরিমাণ দ্রষ্টব্য নহে। স্বদেশপ্রীতিবিহীন ভারতসেনা ব্রিটিশ-নিয়োগে স্বজাতির রক্তপাত করিয়া ব্রিটিশ নায়কের কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছে, আর ভারতের পরস্পরদ্বেষী নরপতিকুল ভ্রাতৃ-শোণিত-পানাশয়ে উন্মত্ত হইয়া ব্রিটিশ রাজশিরে বিজয়মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। ইহাই ভারতবর্ষের অধঃপতনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস; গৌরবে কিংবা পরাভবে, ভারতবর্ষ কোন দিনও বীরত্বের অভাব অনুভব করে নাই।

এইরূপ জ্বলন্ত বীরত্ব বর্ত্তমান থাকিতেও ভারতবর্ষ পরপদানত হইল কেন, এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর মনে উদিত হয়; সেই উত্তর ভারতবর্ষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য। ভারতবাসীর ধর্ম্মশাস্ত্র তাহাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দীন দুঃখী ও কীট পতঙ্গাদির জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা দিয়াছে, কিন্তু উহা তাহাকে তাহার প্রতিবেশীকে ভালবাসিতে কিংবা তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করিতে শিক্ষা দেয় নাই। উহা তাহাকে সংসারের অসারত্ব অনুভব করিয়া বচনে নিরভিমানী ও বিনয়ী হইতে শিক্ষা দিয়াছে; কিন্তু যে অভিমান মনুষ্যকে বিশেষ প্রয়োজনেও

অপরের নায়কত্ব স্বীকারে কুণ্ঠিত করে, উহা তাহাকে সে অভিমান পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা দেয় নাই। স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতায় আপাততঃ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, কিন্তু স্বাতন্ত্র্যই যে স্বাধীনতার প্রকৃত সংহর্ত্তা, ভারতবর্ষের নৃপতিকুল তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

ভারতবর্ষে বৈদেশিক কোন প্রবলজাতির অভ্যাগম না হইলে এদেশের ইতিহাস চক্রের ন্যায় নিয়ত আবর্ত্তন করিতে থাকিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজন্যবর্গ পরস্পর দ্বন্দ্ব কলহে হীনবীর্য্য হইয়া অবশেষে কএকটি প্রবল নরপতির করকবলে কিয়দ্দিন পড়িয়া থাকিত, আবার ঐ সমস্ত প্রবল নরপতি পরস্পর দ্বন্দ্ব কলহে শক্তিহীন হইয়া উল্লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গকে মস্তকোত্তোলন করিতে সমর্থ করিত। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের পরিণাম ভবিষ্যত-কুক্ষি-নিহিত; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে যতদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততদিন ভারতের ইতিহাস চক্রের ন্যায় আবর্ত্তন না করিয়া ঋজুরেখায় গমন করিতে থাকিবে। যে স্বাতন্ত্র্যে ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, ব্রিটিশ একাধিপত্যে সেই স্বাতন্ত্র্যের কার্য্যক্ষেত্র ক্রমশঃই বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। জাতি ও ব্যক্তি সমূহের কঠিন স্বাতন্ত্র্য ব্রিটেনের মর্ম্মস্পর্শী তেজে বিগলিত হইয়া জাতীয় জীবনরূপ এক সাধারণ প্রবাহে ধীরে ধীরে মিলিত হইতেছে। তিনটি কারণে এই শুভ ফল সজ্ঘটিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, কোন প্রবৃত্তির পরিচালনা দীর্ঘকাল স্থগিত থাকিলে, উহা আপনিই দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ভারতীয় জাতি সমূহের পরস্পর-বিদ্বেষ, পরিচালনার সুযোগ অভাবে, এই প্রকার নিস্তেজ হওয়াতে পরস্পর প্রীতি-সংস্থাপনের পন্থা অপেক্ষাকৃত সুগম হইয়া উঠিতেছে। দ্বিতীয়তঃ ঐ সমস্ত জাতি এক বৈদেশিক পরাক্রান্ত জাতির পরাধীনতারূপ সাধারণ যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইয়া কোন কোন বিষয়ে পরস্পর সহানুভূতি সূত্রে সম্বদ্ধ হইতেছে। আর তৃতীয়তঃ ইংরেজ জাতির উন্নত সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ ভারতবাসীর অন্তঃকরণের উপর কার্য্য করিয়া উহাতে অন্যান্য জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ-বাৎসল্য ও স্বজাতি প্রেমের বাঞ্ছিত বীজ বপন করিতেছে।

এই সহানুভূতির অঙ্কুরোদ্গম যে নিতান্তই আশাপ্রদ, ইহা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এদেশে বীরত্বের কোনদিনও অভাব ছিল না, আজিও যে অভাব নাই, আফগানিস্থান ও আফ্রিকার সমরাঙ্গনে সে দিনমাত্র তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাই বাঞ্ছনীয় যে সেই বীরত্ব ও পুরুষকার অন্যায় স্বার্থের ইঙ্গিতে স্বদেশের রক্তপাত না করিয়া যেন স্বদেশের গৌরব রক্ষার জন্য নিয়োজিত হয়। এই জন্য ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন প্রদেশ সমূহে পরস্পর জাতীয় গৌরব প্রবল হওয়া আবশ্যক। উল্লিখিত সহানুভূতিই সেই জাতীয় অনুরাগের সূক্ষ্ম অঙ্কুর, সুতরাং উহা আমাদের নিকট

এত আশাপ্রদ। আমাদের এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে জাতীয় অনুরাগের প্রকৃত কার্য্য স্থায়ী একতা বন্ধন, কিন্তু শুদ্ধ একমাত্র একতাবলে কি রাজনৈতিক কি সামাজিক, কোন প্রকার উন্নতিই সংসাধিত হইতে পারে না। ধূমরাশি পুঞ্জীকৃত হইলে তাহা বৃষ্টিতেই পরিণত হইয়া যায়; অসংখ্য মেষ শাবক একীভূত হইলে তাহা মাংসলোলুপ সিংহের আতঙ্কের পরিবর্ত্তে আনন্দই বর্দ্ধন করে। বস্তুতঃ কোন কার্য্য সংসাধনের নিমিত্ত যেমন ব্যক্তি সমূহের মধ্যে পরস্পর একতা থাকা আবশ্যক, তেমন প্রত্যেকের অভ্যন্তরে সারবত্তা থাকা প্রয়োজনীয়। একতা বাহ্যিক দেহ মাত্র, সারবত্তা রূপ প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা শক্তিমান হয়। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে জাতীয় অনুরাগ সৃজনের জন্য যেরূপ যত্ন করা প্রয়োজন, সেই অনুরাগকে কার্য্যে ফলবান করিবার জন্য ব্যক্তিগত সারবত্তা উপার্জ্জন ও পরিবর্দ্ধনেও সেইরূপ যত্ন করা কর্ত্তব্য।

অনেক স্বদেশ-বৎসল ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন জাতির মধ্যে জাতীয় অনুরাগ সৃজন সম্বন্ধে একেবারেই আশা-শূন্য। তাঁহারা মনে করেন যে ভারতবর্ষ এত অসংখ্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং ইহাদের ভাষা, আচার ও প্রকৃতিগত বৈষম্য এত প্রবল, যে ইহাদের মধ্যে পরস্পর-অনুরাগ কল্পনা করাও বাতুলের কার্য্য। কিন্তু আমরা এবিষয়ে আশাশূন্য নহি,— ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ চিত্র আমাদের নিকট অন্যরূপে প্রতীয়মান হয়। ধর্ম্মে ঐক্য থাকিলেই যে জাতীয় অনুরাগ জন্মে না, আবার ধর্ম্মে পার্থক্য থাকিলেও যে জাতীয় অনুরাগ জন্মিতে পারে, ইউরোপের সাম্রাজ্য সমূহ তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। ভাষার ঐক্যও যে জাতীয় অনুরাগের কারণ নহে, ইংলণ্ড ও আমেরিকা কিংবা ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। আমরা জাতীয় অনুরাগের অন্য কারণ নির্দ্দেশ করি। আমাদের মতে জাতীয় অনুরাগ, ব্যক্তিগত অনুরাগের ন্যায়, দীর্ঘকাল ব্যাপী কতকগুলি প্রিয় স্মৃতির সংঘর্ষ মাত্র। যদি দুই দেশের অধিবাসীগণ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও বহুকাল ধরিয়া একই সুখে দুঃখে অবস্থান করিয়া আসিয়া থাকে এবং যদি একই কার্য্যক্ষেত্রে একই উদ্দেশ্য কিংবা নিয়তির পরবশ হইয়া এবং একের বলদ্বারা অন্যে অনুপ্রাণিত হইয়া দীর্ঘকাল জীবন যাপন করে, তবে তদ্দরুণ যে প্রীতিকর স্মৃতিরাশি সঞ্চিত হইতে থাকে তাহাই প্রকৃত জাতীয় অনুরাগের মূল। ইয়র্ক শায়ার আর কেণ্টে জাতীয় অনুরাগ কি জন্য? না, উভয়ের বহুযুগের স্মৃতি রাজপরিবার রূপ এক সাধারণ স্তম্ভে জড়িত। উভয়েই রাজ পরিবারে সমান আসক্ত। রাজসিংহাসন বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে উভয়ই এক সাধারণ বিপদ অনুভব করিয়া এক সাধারণ উৎসাহে সিংহাসন রক্ষায় ব্যস্ত হইয়াছে। আবার রাজা যখন বিপন্মুক্ত হইয়াছেন, তখন উভয়ই সমান আদর ও স-

মান পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। ইয়র্ক যখন কেণ্টের কথা মনে করে, তখন বহুযুগের প্রিয় কথা তাহার মনে জাগরূক হয়; আবার কেণ্ট যখন ইয়র্কের কথা মনে করে তখন বহুপ্রিয় স্মৃতিতে তাহার মন আপ্লুত হয়। এই প্রকার দীর্ঘকালব্যাপী প্রীতিজনক স্মৃতিরাশি উভয়ের মধ্যে জাতীয় অনুরাগ সংস্থাপন করিয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ব্রিটিশ অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে সম্পূর্ণই ইহার বিপরীত চিত্র লক্ষিত হইবে। ভারতবর্ষের এইরূপ অবস্থা ছিল না যে এক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের জাতীয় অনুরাগ হইতে পারে। প্রত্যেক দেশ এমন কি প্রত্যেক নগর অন্য প্রদেশ কিংবা নগরের কথা স্মরণ করিলে, পূর্ব্বকার হিংসা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, বিসম্বাদ প্রভৃতি বিষাদের কথাই মনে জাগরূক হইবে, পরস্পর সহানুভূতি, সহায়তা, বান্ধবতা প্রভৃতি আনন্দনজক কোন স্মৃতি মনের ত্রিসীমায়ও স্থান পাইবে না। ভারতবর্ষের অবস্থা এক্ষণে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে উল্লিখিত বিষাদজনক স্মৃতি-রাশি ধীরে ধীরে নির্ব্বাপিত হইবে এবং তৎস্থলে একই কার্য্যক্ষেত্রে দীর্ঘকাল কার্য্য করায় অনেক আনন্দজনক স্মৃতির উদয় হইবে, আর সেই স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় অনুরাগ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। কেণ্ট ও ইয়র্কশায়ারে যে প্রকার জাতীয় অনুরাগ লক্ষিত হয়, ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে সে প্রকার জাতীয় অনুরাগ প্রত্যাশা করা যায় না। কেন না কেণ্ট ও ইয়র্কশায়ার উভয়েরই স্মৃতিরাশি রাজসিংহাসনরূপ এক সাধারণ কেন্দ্রনিবদ্ধ। ভারতবর্ষের জাতি সমূহ সাধারণ কেন্দ্রে আকৃষ্ট নহে, প্রত্যুত উহা হইতে বিশ্লিষ্ট। কিন্তু কেন্দ্র হইতে এইরূপ যুগপৎ বিশ্লেষণে পরস্পরের মধ্যে একরূপ আকর্ষণ সংস্থাপিত হইতেছে, সকলেই এক নিয়তির অধীন হইয়া একই সুখে দুঃখে কালযাপন করিতেছে। যদি এই ভাবে অবস্থান করিয়া ইহারা দীর্ঘকাল একত্র কার্য্য করে, তবে তদ্দরুণ ধীরে ধীরে অনেক আনন্দজনক স্মৃতির উদয় হইবে, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে জাতীয় অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। এই শুভফল সজ্ঘটনের জন্য ব্রিটিশ আধিপত্য এদেশে দীর্ঘকাল প্রবল থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এক্ষণেও বঙ্গদেশে ও পঞ্জাবে সদ্ভাব সংস্থাপিত হয় নাই;—এক্ষণেও হিন্দু ও মুসলমানে ভয়ানক বৈরভাব বিদ্যমান আছে। এই বৈরভাব যদি দীর্ঘকাল অসন্ধুক্ষিত অবস্থায় থাকে, এবং যদি শিক্ষার বিস্তারে উভয় জাতির ধর্ম্মান্ধতা দূরীভূত হয়, তাহা হইলে সদ্ভাব সংস্থাপনের পথ প্রশস্ত হইবে। উভয় জাতির একধর্ম্মাবলম্বী হওয়া আবশ্যক নহে; কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে বৈরভাব আছে, যদি দীর্ঘকাল তাহা প্রশমিত অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ যদি দীর্ঘকাল তাহা চরিতার্থ করিবার সুযোগ না দেওয়া হয়, তবে প্রকৃতির অখণ্ড নিয়মে তাহা আপনা আপনি নিঃশেষিত হইবে। এইরূপ বৈরভাব বিদূরিত হইতেও অনেক সময়ের আ-

বশ্যক, সন্দেহ নাই। ইহার পর দীর্ঘকাল একত্র কার্য্য করিতে পারিলে আমাদের মধ্যে জাতীয় অনুরাগ জন্মিবে। বলা বাহুল্য যে কেবল মাত্র এক অবস্থায় অবস্থান করিলেই জাতীয় অনুরাগ জন্মা সম্ভব নহে। ঐরূপ জড়বৎ অবস্থানে কোনরূপ প্রিয় স্মৃতির উদয় হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আয়র্লণ্ডের অবস্থার সঙ্গে আমাদের অবস্থার অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু তথাপি আয়র্লণ্ডের প্রতি আমাদের জাতীয় অনুরাগ হওয়া অসম্ভব। কার্য্য হইতেই স্মৃতির উদ্ভব হয়। যদি বঙ্গদেশ কার্য্যবিষয়ে আয়র্লণ্ডের ন্যায় বম্বে হইতে পৃথক থাকে, তবে বম্বের প্রতি বঙ্গদেশের অনুরাগ জন্মিবে না। কিন্তু আমাদের ভরসা এই যে ইংরেজশাসন দীর্ঘকাল এদেশে স্থায়ী হইলে প্রত্যেক দেশের সহিত প্রত্যেক দেশের বাণিজ্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে এবং রাজনৈতিক অনেক ব্যাপারেও সকলকে অনেক সময়েই একত্র কার্য্য করিতে হইবে। এইরূপ দীর্ঘকাল একত্র কার্য্য করিলে তদ্দরুণ প্রিয়স্মৃতিরাশি সঞ্চিত ও জাতীয় অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

উপরে যাহা উল্লিখিত হইল তাহার সার মর্ম্ম এই যে, আমাদের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য স্থায়ী একতার প্রয়োজন, স্থায়ী একতা জাতীয় অনুরাগের উপর নির্ভর করে, জাতীয় অনুরাগ আনন্দজনক স্মৃতির সংঘর্ষ মাত্র, এবং স্মৃতি কার্য্যবিষয়ক ঐক্য হইতে সমুদ্ভূত হয়। অনেকে হয় ত মনে করিতে পারেন যে আমার তর্কে হেত্বাভাস ঘটিয়াছে, কারণ আমি বলিতেছি যে স্থায়ী একতার মূল কারণ কার্য্য বিষয়ক ঐক্য এবং ইহাতে ঐক্যকেই একতার কারণ নির্দ্দেশ করা হইতেছে। কিন্তু একটু অনুধাবন করিলে দৃষ্ট হইবে যে আমার তর্কে ঐরূপ কোন দোষ ঘটে নাই। প্রত্যেক রাজনৈতিক বৃহৎ সমাজই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজে বিভক্ত থাকে; ইহারা, প্রথমতঃ পরস্পরের প্রতি অনুরাগ বশতঃ নহে, কিন্তু অবস্থার নিপীড়নে সময়ে সময়ে একত্র হইতে বাধ্য হয়। তখন যে প্রয়োজনে ইহারা একত্র হইয়াছিল, সেই প্রয়োজন সংসাধিত হইয়া গেলে, ইহারা আবার পূর্ব্ববৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই প্রয়োজনের ঐক্য স্মৃতিরূপে প্রত্যেকের অন্তঃকরণে বিদ্যমান থাকে, এবং সেই স্মৃতি যত সঞ্চিত হইতে থাকে, ততই অনুরাগ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই অনুরাগ প্রবল হইলেই তখন স্থায়ী একতা জন্মে; প্রয়োজনের অস্থায়ী একতা অনুরাগের স্থায়ী একতায় পরিণত হয়। ভারতবর্ষে জাতিসমূহের দৈনিক বিসম্বাদে উল্লিখিত প্রয়োজনের অস্থায়ী একতাও বিদ্যমান ছিল না। ইংলণ্ডের একাধিপত্যে এক্ষণে সেই প্রয়োজনের অস্থায়ী একতা সংঘটিত হইতেছে। ব্রিটিশ আধিপত্য যত দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকিবে, এইরূপ ঘটনার সংখ্যাও তত বাড়িতে থাকিবে; এবং তজ্জনিত স্মৃতি সঞ্চিত হইয়া অনুরাগের স্থায়ী একতা সংস্থাপন করিবে।

স্থায়ী একতা ও অস্থায়ী একতায় প্রভেদ এই যে, অস্থায়ী একতা কোন একটি

নির্দ্দিষ্ট সাধারণ অমঙ্গল নিরাকরণে সমর্থ হইতে পারে, কিন্তু কার্য্য উদ্ধার হইয়া গেলে পুনরায় স্বাতন্ত্র্য প্রবল হইয়া নূতন অমঙ্গল আহ্বান করিবে। স্থায়ী একতা স্বাতন্ত্র্যের বিনাশেই সমুদ্ভূত হয়, সুতরাং উহা চির-দিনই পরস্পরের মঙ্গলার্থে নিযুক্ত রহিয়া সাধারণ-উন্নতি সংসাধন করিতে থাকে। দুই ব্যক্তি প্রবল শত্রুতা বশতঃ পরস্পর কাটাকাটি করিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলে, হয়ত উহারা তন্মুহূর্ত্তের একতায় কারাগার ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিতে পারে, কিন্তু পুনরায় সেই অপরিশোধিত শত্রুতা বশতঃ বিসম্বাদে লিপ্ত হইয়া সম্ভবতঃ ইহারা অচিরেই আবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে। কিন্তু যদি দীর্ঘকাল ইহারা কারাগারের শাসনে থাকিয়া, একত্র কার্য্য করিতে বাধ্য হয়, তবে যেমন একদিকে তাহাদের শত্রুতা, দীর্ঘকাল পরিতৃপ্তির সুযোগ অভাবে, ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া অবশেষে নিঃশেষিত হইবে, তেমন দীর্ঘকাল পরস্পরের সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হওয়ায় উভয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে অনুরাগ সঞ্চারিত হইতে থাকিবে। এই প্রকার স্থায়ী একতা প্রতিষ্ঠিত হইলে তখন উভয়ে কারাগার ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিলেও পরস্পর বিসম্বাদ করিয়া ইহাদিগের পুনরায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। ব্যক্তি সম্পর্কে যে কথা, জাতি সম্পর্কেও কড়ায় ক্রান্তিতে তাহাই প্রযুজ্য হয়।

গদ্যকাব্য ও ছন্দঃ।

শ্রব্যদৃশ্যভেদে কাব্য দ্বিবিধ। যাহা অভিনয়োপযোগী সুতরাং দৃশ্যপ্রধান, তাহাই দৃশ্যকাব্য এবং যাহা কেবল শ্রোতব্য, তাহাই শ্রব্যকাব্য। শ্রব্যকাব্য গদ্যময় ও পদ্যময় ভেদে দ্বিবিধ। কিন্তু কাব্য বলিলে সাধারণতঃ কবিনির্ম্মিত পদ্যে নিবদ্ধ প্রবন্ধই বুঝায় এবং ছন্দোবদ্ধ পদাবলীই পদ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কাব্য বলিলে সাধারণতঃ পদ্য প্রবন্ধ বুঝাইবার কারণ এই যে, রচনাকালে কবিহৃদয়ে ভাবরাশি যখন উচ্ছ্বসিত হয়, তখন তাহা ভাবের আবেগানুযায়ী একপ্রকার ছন্দোগতিতেই প্রবাহিত হইয়া থাকে। তৎকালে তাহা মুখে ব্যক্ত করিলেও একপ্রকার স্বর-সমন্বিত হইয়াই পরিব্যক্ত হয়। যে ভাষাতে যেরূপ ভাববেগ প্রকাশিত হউক না কেন, তাহা ছন্দোময় হইবে। এজন্য পুত্রশোকাতুরা জননী যেস্বরে বিনাইয়া বিনাইয়া ক্রন্দন করেন, তাহা ছন্দোনুসারী হইয়া থাকে। কুমারসম্ভবে রতিবিলাপের বিয়োগিনীচ্ছন্দে আমরা বিলাপানুকারী স্বরই যেন শুনিতে পাই। সেই বিলাপে যখন কন্দর্পপত্নীর মোহবিবশদশা এবং মোহাবসানেই তাহার আলুলায়িতকুন্তলে, ধূলিলুণ্ঠিত শরীরে

কারুণ্যপূর্ণ হাহাকারধ্বনি মানসপটে প্রত্যক্ষ করি, তখন কে না হৃদয়ঙ্গম করিবে, যে তৎকালে কালিদাসের হৃদয়ে যেরূপ ভাবের আবেগ উপস্থিত হইয়াছিল, তদনুরূপ স্বরভঙ্গি স্বয়মুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিয়োগিনীচ্ছন্দে উপনীত করিয়াছে ও তাহাতেই তাঁহার পদাবলী গ্রথিত করিতে নিয়োজিত করিয়াছে। কে না স্বীকার করিবে যে, চেদীশ্বরের সপক্ষ নৃপতিগণ যখন রোষাবেশে সমর-সজ্জায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন মহাকবি মাঘ তাদৃশ ভাবাবেগে উন্মত্ত হইয়াই তদীয় কাব্যের পঞ্চদশসর্গোল্লিখিত উদ্‌গতাচ্ছন্দে উপনীত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক কবির হৃদয়ে ভাব ও আবেগের প্রাবল্য কণ্ঠোচ্চারিত স্বররূপে যখন ব্যক্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে, তৎকালে উক্তবিধ স্বরলহরীই বাক্যে নিয়মিত হইয়া ছন্দের আকার ধারণ করিয়াছে। ভাবোত্থিত স্বরানুসারে তৎকালোদিত পদ সমূহের নিয়ম ও নিবন্ধনরূপ ছন্দও ক্রমে এরূপ মার্জ্জনা ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিল্প-পারিপাট্য প্রাপ্ত হইয়াছে যে, ঐরূপ শিল্প-কৌশলের সম্ভাবনা দেখিলে এক্ষণে কেহ আর ছন্দের উপলব্ধি করিতে পারেন না। ছন্দ বলিলেই এক্ষণে বর্ণের সমসংখ্যতা, স্বরের হ্রস্বদীর্ঘানুক্রমতা ও অন্ত্যবর্ণের বিবিধ মিলনাদি স্মৃতিপথে উপস্থিত হয়। ঐরূপ ছন্দের শ্রুতিমাধুর্য্য আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে এরূপ বিমুগ্ধ করিয়াছে যে আমরা হৃদয়াপেক্ষা শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারাই সমধিকরূপে রসগ্রহ করিতে শিখিয়াছি। এইরূপে যথায় উক্তরূপ ছন্দ নাই, তাহা কাব্য নহে এবং যথায় উক্তবিধ ছন্দ আছে, তাহাই কাব্য, এরূপ সংস্কার আমাদিগের হৃদয়ে আস্পদ লাভ করিয়াছে। এই সংস্কারে অনেকটুকু ভ্রান্তি প্রবিষ্ট হওয়ায় তাহার নিরসন চেষ্টা এক্ষণে একান্ত প্রয়োজনীয়, সন্দেহ নাই।

ঐরূপ ছন্দোবদ্ধ হইলেই যে তাহা কাব্য হয় না, তাহা বুঝাইতে প্রয়াস পাইতে হইবে না। কারণ তাহা হইলে ভাষা-পরিচ্ছেদ ও পঞ্চদশী প্রভৃতিকেও কাব্য পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। এক্ষণে কাব্য হইলেই যে তাহাতে হ্রস্বদীর্ঘের যথাক্রম সংস্থান ও অন্ত্যবর্ণের একতাদিরূপ ছন্দের সদ্ভাব একান্ত আবশ্যক নহে, তাহাই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর পদ্যের প্রচলনাবধি আমাদিগের এই বোধ অনেকাংশে লব্ধপ্রসর হইয়াছে। যদিও তাহাতে পয়ারের রীতিক্রমে বর্ণসংখ্যাদি নিয়মিত হইয়াছে; তথাপি ভাব ও আবেগের প্রবাহকে যথেচ্ছ পরিবর্দ্ধিত হইতে দেওয়াতে উহাই যে ছন্দের জীবন, তাহাও অনেকাংশে প্রমাণিত হইয়াছে। উদ্বেলিত হৃদয় হইতে ঐরূপ ভাব ও আবেগের প্রবাহ ঐরূপে গদ্যেও তরঙ্গায়মাণ হইয়া প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, সুতরাং তাহাতেও ছন্দের সত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য। সহৃদয় পাঠক, কমলাকান্তের দপ্তর, রজনী, উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম প্রভৃতি গ্রন্থে উহার প্রচুর প্রমাণ পাইতে পারিবেন। সুতরাং গদ্যেও যে কাব্য রচিত হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত গদ্যে এইরূপ ছন্দের সম্ভাব আরও সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। আমরা বহু উদাহরণ প্রয়োগে তাহা বিশদীকৃত করিতেছি। যথা অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে, রাজা দুষ্মন্ত প্রিয়ার প্রত্যাখ্যান-ক্লেশে কাতর হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বয়স্য মাধব্যকে কহিতেছেন—

সখে! সর্ব্বমিদং স্মরামি শকুন্তলায়াঃ প্রথমদর্শনবৃত্তান্তং, কথিতবানস্মি ভবতে। স ভবান্ প্রত্যাদেশসময়ে মৎসমীপগতো-নাসীৎ, কিন্তু পূর্ব্বমপি ন ত্বয়া কদাচিৎ সঙ্কীর্ত্তিতং তত্রভবত্যানাম। কচ্চিদহমিব বিস্মৃতবাংস্তমপি?

যখন নিরপরাধা দুহিতার পূর্ণগর্ভাবস্থায় রামচন্দ্র কর্ত্তৃক অরণ্যনির্ব্বাসনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি জনক নিদারুণ আত্মনির্ব্বেদ প্রকাশ করিতেছেন, তখন কবির লেখনী কি ক্ষোভ-গম্ভীর-ভাব উদ্গীরণ করিতেছে—

কষ্টমেবং নামজরসা দুঃখেন চ দুরাসদেন ভূয়ঃ পরাকসান্তপন প্রভৃতিভিস্তপোভিরাত্তরসধাতুরনুপযুজ্যমানোনাদ্যাপি মে দগ্ধদেহঃ পততি! অন্ধতামিস্রাহ্যসূর্য্যানাম তে লোকাস্তেভ্যঃ প্রতিবিধীয়ন্তে যে আত্মঘাতিন ইত্যেব মৃষয়ো মন্যন্তে। অনেক সংবৎসরাতিক্রমেঽপিচ প্রতিক্ষণ পরিভাবনাস্পষ্টনির্ভাসঃ প্রত্যগ্রইবদারুণো নমে দুঃখসংবেগঃ প্রশাম্যতি। অয়ি মাতর্দেবযজনসম্ভবে দেবিসীতে! ঈদৃশস্তে নির্ম্মাণভাগঃ পরিণতঃ যেন লজ্জয়া স্বচ্ছন্দ মাক্রন্দিতুমপি ন শক্যতে। হাহা পুত্রি! ইত্যাদি।

আবার কন্যার দোষাশঙ্কায় অগ্নিপরীক্ষা বৃত্তান্ত শ্রবণে আত্মাবমাননাবোধে যখন জ্বলন্ত ক্রোধানলে উদ্দীপ্ত হইয়াছেন, তখনকার ভাব দেখুন।

আঃ কোয়মগ্নির্ণামাস্মৎ প্রসূতিপরিশোধনে? কষ্টমেবংবাদিনা জনেন রামপরিভূতা অপি বয়ং পুনঃপরিভূয়ামহে।

স্থানান্তরে—

অহো দুর্ম্মর্য্যাদতা পৌরাণাং, অহো রামস্য রাজ্ঞঃ ক্ষিপ্রকারিতা।

কোথাও পরস্পর অপরিচিত কুমারদ্বয়ের সন্নিধিমাত্রে বান্ধবপ্রেমাতিশয় সঞ্জাত হইতে দেখিয়া ভাবাভিভূত বৃদ্ধ সুমন্ত্রের উক্তি—

ভূয়সা জীবিধর্ম্ম এষ, যত্রসময়ী কস্যচিৎকচিৎ প্রীতিঃ; যত্র লৌকিকানামুপচার স্তারামৈত্রকংবা চক্ষুরাগ ইতি, তমপ্রতিসংখ্যেয়মনিবন্ধনং প্রেমাণ মামনন্তি।

স্থানান্তরে ঐরূপ অপরিচিত কুমারদর্শনে বাৎসল্যাভিভূত রামচন্দ্রের হৃদয়োন্মাথী বিতর্ক—

তৎকিমেকপদ এব দুঃখ বিশ্রামং দদাত্যু পস্নেহয়তিচ কুতোপিনিমিত্তাদন্তরাত্মানং? অথবা স্নেহশ্চ নিমিত্তসব্যপেক্ষ ইতি বিপ্রতিষিদ্ধমেবৈতৎ।

দগ্ধহৃদয়! কোয়মাকস্মিকস্তে স্নেহপারিপ্লবো বিকারঃ। ইত্যাদি ইত্যাদি।

উল্লিখিত উদাহরণ সমূহে দৃষ্ট হইবে যে কবিগণের উদ্বেলিত হৃদয় হইতে ভাবপ্রবাহ যেরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কবি সেইরূপেই তাহাকে সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন,

এবং তাহাতেই কি অপূর্ব্ব ছন্দোমাধুর্য্য প্রতিপদে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। উহা পাদচতুষ্টয়ে বা বর্ণসাম্যে অথবা স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘতানুক্রমে গ্রথিত না হইলেও ভাবাবেগের ও তদুৎপন্ন স্বরলহরীর অনুকারে উহাতে পদবিন্যাস অনেকাংশে নিয়মিত হইয়াছে। উহাতে যাদৃচ্ছিক পদপ্রয়োগের অবসর নাই। পদগুলি আবেগানুসারে উৎপন্ন ও স্বরানুসারে পরিমিত এবং যথোৎপন্নরূপে স্থাপিত হইয়া, অপরিবর্ত্তসহ হইয়াছে। এই নিমিত্ত সংস্কৃত প্রাকৃতাদিভাষায় সুন্দর গদ্যরচনা বিলক্ষণ দুরূহ। কিন্তু নিপুণ ব্যক্তির হস্তে উহা স্বাভাবিকের ন্যায় নির্গত হইয়া সমধিকতর শোভা ধারণ করে। যথা অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে নানা স্থানে,—

'প্রিয়ংবদে! কস্যেদমুশীরানুলেপনং মৃণালবন্তিচ নলিনীদলানি নীয়ন্তে?'

'কন্নুখলু নিরস্তবিঘ্নৈস্তপস্বিভিরনুজ্ঞাতঃ খিন্নমাত্মানং বিনোদয়ামি। নচ প্রিয়াদর্শনাদৃতে শরণমন্যৎ।'

'অহো প্রবাতসুভগোয়ং বনোদ্দেশঃ।'

'হলা সউন্তলে, অবি সুহাঅদি দে ণলিণীপত্তবাদো?

'সহি, অদোজ্জেব নিব্বন্ধো। সিনিদ্ধজণসংবিভত্তং হি দুখ্খং সজ্জবেঅণং ভোদি।'

'এখদাব বীসখা হোহি, ণহি তাদিসা আকিদিবিসেসা গুণবিরহিণো হোন্তি।'

'অণসূএ পেক্খদাব, বামহত্থবিণিহিদবঅনা আলিহিদা বিঅ পিঅসহী তগ্গদাএ চিন্তাএ অত্তাণম্পি ণ বিভাবেদি, কিং উণ আগন্তুঅং?'.

কাদম্বরীগ্রন্থে—

'ইতি পরিসমাপিতাহারাং, নির্ব্বর্ত্তিতসন্ধ্যোচিতাচারাং, শিলাতলে বিশ্রব্ধমুপবিষ্টাং নিভৃতমুপসৃত্য নাতিদূরে সমুপবিশ্য মুহূর্ত্তমিব স্থিত্বা চন্দ্রাপীড়ঃ সবিনয়মবাদীৎ। ভগবতি! ত্বৎপ্রসাদপ্রাপ্তিপ্রোৎসাহিতেন কুতূহলেনাকুলীক্রিয়মাণো মানুষতাসুলভো লঘিমা বলাদনিচ্ছন্তমপি মাং প্রশ্নকর্ম্মণি নিযোজয়তি। জনয়তিহি প্রভুপ্রসাদলবোপি প্রাগল্‌ভ্যমধীরপ্রকৃতেঃ। স্বল্পাপ্যেকদেশাবস্থানকালকলা পরিচয়মুৎপাদয়তি। অণুরপ্যুপচারপরিগ্রহঃ প্রণয়মারোপয়তি। তদ্‌ যদি নাতিখেদকরমিব, ততঃ কথনেনাত্মানমনুগ্রাহ্যমিচ্ছামি।'

দশকুমারচরিতে—

'শ্রুত্বাতু ভুবনবৃত্তান্তমুত্তমাঙ্গনা বিস্ময়বিকসিতাক্ষী সস্মিতমিদমভাষত, দয়িত, ত্বৎপ্রসাদাদদ্যমে চরিতার্থা শ্রোত্রবৃত্তিঃ, পক্বমিদানীং ত্বৎপাদপদ্মপরিচর্য্যাফলং। অস্তু চ ত্বৎপ্রসাদস্য কিমুপকৃত্য প্রত্যুপকৃতবতী ভবেয়ং। অভবদীয়ং হি নৈব কিঞ্চিৎ মৎসম্বদ্ধং।'

'ইতি প্রিয়োরসি প্রাবৃড়িব নভস্যুপাস্তীর্ণগুরুপয়োধরমণ্ডলা, প্রৌঢ়কন্দলীমুকুলমিব রূঢ়রাগরূষিতং চক্ষুরুল্লাসয়ন্তী, বর্হিবর্হাবলীবিড়ম্বিনা কুসুমচন্দ্রকশারেণ মধুকরকুলব্যাকুলেন কেশকলাপেন, স্ফুরদরুণকিরণকেশরকরালং কদম্বমুকুলমিব কান্তস্যাধরমণিমধীরমাচুচুম্ব। তদারম্ভস্ফুরিতয়াচ

রাগবৃত্ত্যা ভূয়োঽপ্যাবর্ত্ততাভিমাত্রচিত্রোপচারশীফরো রতিপ্রবন্ধঃ।'

'অহমস্মি সোমরশ্মিসম্ভবা সুরতমঞ্জরী নাম সুরসুন্দরী।'

'পাতিতশ্চ কোপিতেন কোঽপি তেন ময়ি শাপঃ, পাপে ভজস্ব লোহজাতিমজাতচৈতন্যা সতীতি।'

'অস্মিন্নেব ক্ষণে নাতিপ্রৌঢ়পুন্নাগমুকুলস্থূলানি মুক্তাফলানি সহ সলিলবিন্দুভিরম্বরতলাদপতন্।' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমরা সহস্র পদ্যগ্রন্থে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া উল্লিখিত গদ্যময় বাক্যামৃত গুলি রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি।

ভাববেগোত্থিতস্বরে সমকালোদিত পদাবলীর নিবন্ধনই যে ছন্দের মূলপ্রকৃতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, বেদের ঋক্ সমূহই তৎপক্ষে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রকৃতির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিরসার্দ্র চিত্তে যে ভাবরাশি সমুত্থিত হইয়াছিল, স্বরতরঙ্গানুসারে তাহাই অবিকল নিবদ্ধ হইয়া ঋকের আকার ধারণ করিয়াছে। উহাই জগতে প্রথম ছন্দের আবির্ভাব। উহারই উত্তরোত্তর মার্জ্জনা ও পারিপাট্যসাধনে যুগযুগান্তরে কাব্যোক্ত ছন্দগুলি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থবিদ্যাবিনোদ।

গীত।

১। রাগিণী বেহাগ।—
আড়া ঠেকা।

সহেনা যাতনা প্রাণে,
প্রভো দয়াময়,
পদতরি দানে দীনে
রাখ এসময়।
বিশাল ভব-পাথার,
তাহে ভীষণ আঁধার,
আঁধারে আলোক তুমি,
ভয়ের অভয় ॥
যে জগতে চন্দ্র হাসে,
কুসুমে সুষমা ভাসে,
বিহঙ্গ সম্ভাষে প্রেমে,—
সবই সুখময়।
সে সুখ জগতে আমি,
হে নাথ,—হে অন্তর্যামি,
কর্ম্ম-দোষে যাই ভেসে
বিনে পদাশ্রয় ॥

২। প্রসাদী সুর।

দে রে, তেল দে রে, মন,
জ্ঞান-দীপিকায়।
জ্বালা ভক্তির আলো মুক্তির আশায় ॥
অন্ধকারে ঘু'রে, ঘু'রে
যাবি কোথা বল্ না আমায়।
পথে কাঁটা আছে, কূপ রয়েছে,
লাগবে ধাঁধা মায়ার ধূলায়।
তোর ভাঙ্গা লাটী, পিছ্‌লে মাটী,
টল টল পা ভবের নেশায়।
তাই আবার বলি—যাস্‌নে ভুলি,
—জ্বালা রে দীপ, জ্বালা ত্বরায়।

শান্তিনিকেতন
১২৯১। ২১এ অগ্রহায়ণ

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। "ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী; অর্থাৎ ভারতের জাতীয়, সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, ধর্ম্ম ও নানা বিষয়ক গীত-সংগ্রহ। শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত; ও শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা"।

এই গ্রন্থের কলেবর বার পেজি ফরমার পঞ্চাশ ফরমা। ইহাতে প্রায় এক সহস্র সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থের পরিচয়ের জন্য আমরা নিম্নে ইহার সংক্ষিপ্ত সূচি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। প্রকাশকের চক্ষু কতদিকে চালিত হইয়াছে এই সূচি পাঠে তাহা বিদিত হইবে।

সংক্ষিপ্ত সূচি।

"(১) জাতীয় সঙ্গীত—উদ্দীপনা, শোচনা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা সূচক। এবং জন্মভূমি, বঙ্গভাষা, মুদ্রশাসন আইন, স্বায়ত্ত শাসন, লর্ড রিপণ, দিল্লীদরবার ইত্যাদি বিষয়ক।

"(২) সামাজিক সঙ্গীত—নারীজাতির হীনাবস্থা, বাল্যবিবাহ ও বৈধব্য, বহুবিবাহ ও কন্যাপণ, সুরাপান, জাতিভেদ, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও দেশাচার বিষয়ক।

"(৩) পৌরাণিক সঙ্গীত—দক্ষযজ্ঞ, শিবের বিবাহ, আগমনী, শুম্ভনিশুম্ভ যুদ্ধ, ধ্রুব-প্রহ্লাদ চরিত্র, হরিশ্চন্দ্র ও নলোপাখ্যান, সাবিত্রী ও শকুন্তলোপাখ্যান, শ্রীমন্ত সংবাদ ও ব্রজ বৃত্তান্ত।

"(৪) ঐতিহাসিক সঙ্গীত—রামের রাজ্যাভিষেক ও বনবাস, লঙ্কা সমর, সীতার বনবাস, অভিমন্যুবধ, পার্থপরাজয়, পৃথ্বিরাজচরিত্র, রজঃপুতবীরত্ব, বাল্মীকি, শাক্যসিংহ, সিপাহীবিদ্রোহ, সিরাজউদ্দৌলার পতন, রামমোহন রায়, গুরুগোবিন্দ, চাঁদ কবি, নিমাইসন্যাস, তাজমহল ইত্যাদি বিষয়ক।

"(৫) ধর্ম্মবিষয়ক—ব্রহ্মসঙ্গীত, রাম প্রসাদী, রামদুলালী ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তির শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীত। বাউলের ও বৈরাগ্য বিষয়ক ভজন ও কীর্ত্তনাদি এবং কাঙ্গাল ফিকীরচাঁদ ফকিরের গান।

"(৬) নানা বিষয়ক সঙ্গীত,—বৃন্দাবন মঞ্জরী, মৃত গুইকোঁয়ার মলহর রাওর নির্ব্বাসন, ভিক্টোরিয়া গীতি, পুরুরাজ, প্রিন্স নেপোলিয়ানের মৃত্যু, ইউজিনির খেদ, তৃতীয় নেপোলিয়ান, কেশব বাবুর মৃত্যু, রহস্যজনক ও অন্যান্য ভাবের সঙ্গীত।

"(৭) ইহা ব্যতীত কতিপয় হিন্দি, গুজরাটী এবং উড়িয়া সঙ্গীতও এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে।"

ইহা বলা অনাবশ্যক যে, এই গ্রন্থ একখানি অতি মূল্যবান্ সংগ্রহ। যে গ্রন্থে প্রায় সহস্র সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যদি তন্মধ্যে সকল গুলিই সুখ-সৌন্দর্য্য-শূন্য অকর্ম্মণ্য বস্তু বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে দেশশুদ্ধ লোকের যেরূপ নিন্দা, সং-

গ্রন্থকারের নিন্দা তেমন নহে। বস্তুতঃ এই ভারতীয় সঙ্গীতমুক্তাবলী সঙ্গীতসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রের নিকটেই সমাদৃত হইবার যোগ্য সামগ্রী। বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় এই সংগ্রহ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য কিরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বুঝান কঠিন। আমাদের এই নিমিত্ত ভরসা আছে যে,যাঁহারা তাঁহার এই পরিশ্রমের উপযুক্ত প্রতিদান করিতে ইচ্ছা করেন,তাঁহারা গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত সমস্ত অংশের উপরই একবার নয়নাবর্ত্তন করিবেন।

সুযোগ্য সংগ্রহকার তাঁহার এই গীত-সংগ্রহকে মুক্তাবলী নামে অভিহিত করিয়াছেন। যদি কেহ এই নামের ভাষ্য করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সে ন্যায় ও নীতি উভয়ই রক্ষা করিয়া এইরূপ বলিতে পারে যে, ইহাতে জারা মুক্তা, সাচ্চা মুক্তা ও ঝুটা মুক্তা ত্রিবিধ মুক্তাই স্থান লাভ করিয়াছে। যে সকল গীতে রস নাই, কিন্তু রস-মাধুরী-শূন্য ঔষধের গুণ আছে, আমরা সে গুলিকে জারামুক্তা বলিলাম। ঝুটা ও সাচ্চার ব্যাখ্যান করা অনাবশ্যক। কেন না বাঙ্গালায় এইক্ষণ জহরীর অভাব নাই। সংগ্রহকার আপনিও এ পার্থক্য চিনিয়া লইতে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ। অথবা এইরূপ গ্রন্থন-বৈচিত্র্য সম্পর্কে কোন দোষ ধরাই সঙ্গত নহে। কোন একটি সুকুমারমতি বালিকা কাচ, কাঞ্চন ও মণি এই তিন পরস্পর-বিভিন্ন বস্তুকে মালার একই সূত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন বলিয়া কবি পাণিনির একটি সূত্র * স্মরণ পূর্ব্বক এইরূপে তাহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—

> কাচং মণিং কাঞ্চন মেক সূত্রে
> গ্রথ্নাতি বালা নচ তৎ বিচিত্রম্।
> বিশেষবিৎ পাণিনিরেকসূত্রে
> শ্বানং যুবানং মঘবানমেব।

যাঁহারা নবকান্ত বাবুর গ্রন্থন-নৈপুণ্য সম্পর্কে দোষ ধরিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহাদিগের নিকটও কবির ঐ কফিয়ৎই আমাদিগের কৈফিয়ৎ।

২। "গৃহিণীর কর্ত্তব্য। বঙ্গমহিলাগণের গৃহকার্য্যশিক্ষোপযোগী উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ। শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত।"

৩। "গৃহ মুকুর বা গৃহিণীগণের কর্ত্তব্য বিধি। প্রথমভাগ। শ্রীরামদয়াল সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।"

৪। "গৃহ লক্ষ্মী (অর্থাৎ প্রকৃত গৃহ লক্ষ্মী হইতে যে সকল গুণশিক্ষা আবশ্যক, স্ত্রীর নিকট কথোপকথনচ্ছলে স্বামীর তদ্বিষয়ক উপদেশ।) কএক খানা পত্র ও উত্তর প্রণেতা শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত।"

এই তিন খানি পুস্তক স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে,এবং তিন খানিতেই স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী অনেক ভাল ভাল কথা আছে। কিন্তু বিষয়ের গাম্ভীর্য্য এবং লেখার প্রগাঢ়তার প্রতি দৃষ্টি করিলে, এই তিন খানির মধ্যে 'গৃহিণীর কর্ত্তব্য' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গৃহ মুকুরও প্রশংসার্হ। উহার মূল

* শ্বযুবমঘোনামতদ্ধিতে ৬। ৪। ১৩৩

হইতে উপক্রমণিকা ভাগটি লেখকের গুণপনার অধিকতর পরিচায়ক, উহার রচনাও মধুর। 'গৃহ লক্ষ্মী' বিষয়াংশে মন্দ নহে, কিন্তু বিষয়-বিন্যাসের বিধানাংশে সুরুচির পরিচায়ক হয় নাই। ইহার কোন কোন প্রবন্ধ পরিত্যক্ত হইলেই পুস্তকের অধিকতর প্রশংসা হইত, এবং যে সকল প্রবন্ধ ইহার মধ্যে প্রশংসাযোগ্য তাহারও পুনঃশোধন আবশ্যক। আমরা এই তিন খানি পুস্তক হইতে নিয়ে তিন চারিটি পংক্তি তুলিয়া দিলাম। পাঠকবর্গ নিজ নিজ চিত্তের রুচি ও গতি অনুসারে বিচার করিয়া লউন।

'গৃহস্থাশ্রমবাসীর গৃহ একটি সুখময় শান্তি নিকেতন—একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, একটি প্রধান শিক্ষাস্থান, একটি প্রেমপূর্ণ স্বর্গবাস। গৃহিণীরাই তাহার অবলম্বন ও জীবন।' ইত্যাদি—গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

'পরিষ্কার নীলাকাশে পূর্ণিমার চন্দ্র যেমন, মনোহর উদ্যানে ফুল্ল গোলাপ ফুলটি যেমন, তেমনি গৃহীর গৃহে সচ্চরিত্রা গৃহিণী। এই মরণশীল জগতে আসিয়া যদি একটি পবিত্র হৃদয় বানাইয়া লইয়া না যাইতে পারিলে, জগতে আসিয়া যদি উন্নতির পথ দেখিতে না পাইলে, তবে কিসের চক্ষু।'—গৃহ মুকুর।

'স্বামী। বেশ যা হউক, এলে, তবু ভাল।

স্ত্রী। কেন?

স্বামী। কখন এসে হা ক'রে তীর্থের কাকের মত ব'সে রয়েছি, এ সময় আর তোমার হয় না।

স্ত্রী। রাগ কর কেন ভাই, ওখানে মা, খুড়ী, পিসী, তাঁদের সম্মুখ দিয়া কেমন করিয়া ঘরে আসিব?

স্বামী। আর তোমার ভগ্নীপতি আসিলে মা, খুড়ী, পিসী, তাঁদের সম্মুখ দিয়া হাসিতে হাসিতে পান হাত ক'রে যেতে পার?

স্ত্রী। সে রকম ক'রে যেতে তুমি আমায় কবে দেখেছ? আর যেন গেলুম—তাতে দোষ?

স্বামী। না, যত দোষ—যত লজ্জা স্বামীর কাছে যাইতে।

স্ত্রী। বাপুরে—বাপুরে? একটু আস্তে কথা কওনা, লোকে যে বেহায়া বলিবে।'—গৃহলক্ষ্মী।

আমরাও বলি, বালিকাদিগকে জোর করিয়া বেহায়া না বানানই ভাল। শিক্ষা এক কথা, আর শিক্ষার ভাণ আর এক কথা। বঙ্গীয় বালকবালিকারা এই দুইয়ের পার্থক্য না বুঝিলে এ সমাজের ভবিষ্যৎ কখনও ভাল হইবে না।

৫। "ভূগোল বোধ। শ্রীমতিলাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য তিন আনা।" বাঙ্গলায় এইক্ষণ ভূগোল গ্রন্থের অভাব নাই, কিন্তু আমরা বালকশিক্ষার উপযোগী যে সকল 'ভূগোল' দেখিয়াছি তন্মধ্যে এখানি মুদ্রণের পরিপাট্যে ও বিষয়বিন্যাসের নৈপুণ্যে বিশেষ প্রশংসার্হ। গ্রন্থকার শিক্ষাবিভাগের নিকট এই পুস্তক সম্পর্কে উৎসাহ পাইবার যোগ্য।

প্রাচীন ভারত।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

স্ত্রীগণের সামাজিক অবস্থা।

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন 'স্ত্রীকে দিবা-রাত্রি আপন অধীনে রাখিবে, নিয়মিত বিশ্রাম-সময়েও তাহাদিগকে স্বেচ্ছামত কোথাও যাইতে দিবে না; তাহাকে বাল্যকালে পিতা, যৌবনে পতি, বার্দ্ধক্যে পুত্র রক্ষা করিবেন; তিনি কোন কালেই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে পারিবেন না। যে পিতা উপযুক্ত কালে কন্যা সম্প্রদান না করে, যে স্বামী উপযুক্ত কালে স্ত্রী সহবাস না করে এবং যে পুত্র মাতার বার্দ্ধক্যে তাঁহার সেবা না করে তাহারা তিন জনই সমাজে অতিশয় নিন্দনীয় হয়; স্ত্রীলোককে সকল প্রকার আমোদ ও ভোগ-স্পৃহা হইতে নিবৃত্ত করিবে, কেননা তাহা না করিলে পরিবার মধ্যে ভয়ানক ক্লেশোৎপত্তি হয়; এই জন্য স্বামী যতই কেন দুর্ব্বল হউন না স্ত্রীকে সতত ন্যায়সঙ্গত শাসনে রাখিবেন। যিনি স্ত্রীকে সকল প্রকার পাপ হইতে রক্ষা করেন, তিনি পুত্র, পরিবার, আচার, কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ও আপনাকে রক্ষা করেন সন্দেহ নাই। স্বামী স্ত্রী সংসর্গে তাঁহারই গর্ভে এই পৃথিবীতে পুত্ররূপে দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্য স্ত্রীর অপর নাম জায়া; স্ত্রী স্বামীর সমুদায় গুণবিশিষ্ট পুত্র উৎপাদন করেন বলিয়া তাঁহাকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করা কর্ত্তব্য—তাঁহাকে বল পূর্ব্বক বশীভূত করিতে কেহই সমর্থ নহে, এই জন্য স্ত্রীকে ধনের আয় ও ব্যয়, দৈনন্দিন আহারীয় প্রস্তুত, স্ত্রীকার্য্যসাধন এবং গৃহস্থিত তৈজস পাত্রাদির তত্ত্বাবধারণ করিতে দিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিবে। যে পর্য্যন্ত না স্ত্রী নিজ অনুরক্তি দ্বারা বশীভূত হইতেছেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক সতত দৃষ্টি রাখিয়া গৃহ মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও তিনি প্রকৃত পক্ষে রক্ষিতা নহেন। মদ্যপান, অসৎসংসর্গ, স্বামী হইতে দূরে গমন, ক্রীড়া, অসাময়িক নিদ্রা, এবং পরগৃহে বাস বিবাহিতা স্ত্রীলোকের এই ছয়টিই ভয়ানক দোষাবহ। স্ত্রীলোকের স্বভাব, তাহারা কোন পুরুষের রূপবা গুণ বা বয়স বিবেচনা না করিয়াই তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হয়; অন্যের প্রতি আসক্তি, বিভিন্নস্বভাববিশিষ্ট ও পরস্পরে স্নেহের অভাব জন্য তাহারা শীঘ্রই স্বামী হইতে পার্থক্য অবলম্বন করে; তথাপি স্বামী তাহার বিপরীত স্বভাব অবগত হইয়াও তাহাকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। কেন না স্ত্রীজাতি অতিদুর্ব্বল। মনু এমন সকল স্ত্রীলোকের জন্য মনোনীত শয্যা, আসন, অলঙ্কার, খাদ্য, এবং ক্রোধ প্রদর্শন, সামান্য

প্রলোভন, ক্ষতি করনেচ্ছা, ও বিরুদ্ধাচরণ ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্ত্রীগণের বেদে অধিকার নাই, এইজন্য তাঁহারা বেদাদি বিরহিত হইয়া স্বস্ব অপবিত্র জীবন রক্ষা করুক। বেদে তাহাদের যথার্থ স্বভাব সম্বন্ধে অনেক কীর্ত্তিত হইয়াছে* তাহাতে লিখিত আছে যে 'যে পবিত্র রক্ত, মাতা অন্য লোকের গৃহে সতত গমন ও নিজ কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হেতু কলুষিত করিয়াছেন সেই শোণিত পিতা পবিত্র করিতে পারেন এবং স্ত্রী স্বামীর অবিশ্বাসিনী হইয়া যতই কুচিন্তা মনে স্থান দিউন না কেন, তৎসকল হইতেই তাহাদের পবিত্রতা রক্ষিতও হইতে পারে;—কারণ তাহা সম্পূর্ণ কুলটাবৃত্তি নহে, তাহার সূত্রপাত মাত্র। পুরুষের যে সকল গুণ আছে কখন কখন বিবাহিতা স্ত্রী সমুদ্র পতিত নদীর ন্যায় সেই সমস্ত গুণেরই অধিকারিণী হন; যথা অক্ষমালা ও সুরঙ্গী নীচবর্ণীয়া হইয়াও সর্ব্বগুণান্বিত বশিষ্ঠ ও মন্দপালের সহিত সংযুক্তা হইয়া তাঁহাদের স্বামীর সর্ব্ব-গুণেরই অধিকারিণী হইয়াছিলেন।

যে গৃহে স্ত্রী পুরুষে পরস্পর সদ্ভাব আছে সে গৃহে দুঃখ কখনই স্থান প্রাপ্ত হয় না—অনুদিনই সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয়। স্ত্রীর সন্তান উৎপাদন, তাহাদের পোষণ ও গৃহকর্ম্মের তত্ত্বাবধারণ প্রধান গুণ বলিয়া অভিহিত; কেবল ইহা হইতেই পুত্র, সুচারু গৃহকর্ম্ম, সযত্ন মনোনিবেশ, সংবাস এবং স্বর্গীয় মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। যে স্ত্রী সর্ব্ব প্রকারে স্বামীর বশীভূত তিনি স্বর্গে তাঁহার সহিত অতুলানন্দে কাল যাপন করেন এবং ইহকালে সাধ্বী বলিয়া সকলেরই নিকট সম্মানিত হন; কিন্তু যিনি স্বামীর প্রতিকূলাচারিণী তিনি ইহকালে ঘৃণিত ও পরকালে নানা প্রকার অসহ্য ব্যাধিদ্বারা পীড়িত, ও কুক্কুরী হন*।' 'কোন পুরুষ কোন স্ত্রীকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিলেও যদি সেই স্ত্রী দোষজনক ব্যাধিগ্রস্তা, কিংবা পূর্ব্বরজোবতী কি চতুরতা সহকারে সমর্পিতা হয়; তাহা হইলে তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। প্রকাশ না করিয়া যদি কেহ সদোষ কন্যাকে নির্দ্দোষ বলিয়া অন্যে প্রদান করে তাহা হইলে স্বামী সম্প্রদাতার নামে অভিযোগ করিতে পারেন। যদি স্বামীকে কোন কারণ বশতঃ বিদেশ গমন করিতে হয়, তিনি তাঁহার স্ত্রীকে উপযুক্ত মত খাদ্য প্রদান করিয়া যাইবেন, কেননা অনাহার জনিত ক্লেশ বশতঃ পবিত্রা স্ত্রীও প্রলোভনের বশীভূত হইতে পারেন; খাদ্য প্রদান করিয়া গেলে স্ত্রী তাহা হইতেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, কিন্তু যদি না দিয়া যান তাহা হইলে তাঁহাকে নির্দ্দোষ শিল্পকর্ম্ম দ্বারা পোষণ করিতে হইবে। স্বামী যদি ধর্ম্মার্থ অন্যত্র গমন করেন, তাহা হইলে আট বৎসর, জ্ঞানার্জ্জনার্থ হইলে ছয় বৎসর, আনন্দ উপভোগার্থ হইলে তিন বৎসর, অপেক্ষা করিয়া স্ত্রী তাঁহার অনুগামিনী

* মনুসংহিতা ৯ অধ্যায় ১২ হইতে ৩০ শ্লোক।

হইবেন। স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধস্বভাববিশিষ্টা হইলে স্বামী এক বৎসর দেখিয়া তাহার নিকট হইতে তাহার নিজের সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া পরে তাহার সহবাস পরিত্যাগ করিবেন; যে স্ত্রী স্বামীর মদ্যপান, ক্রীড়াসক্তি কিংবা তাঁহাকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করে তাহাকে সমুদায় অলঙ্কার ও গৃহসামগ্রী হইতে বঞ্চিত করা ও তিনমাসের জন্য গৃহ বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে; কিন্তু যে উন্মাদ, ভয়ানক পাপী, নপুংসক, পুরুষত্ববিহীন কিংবা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত দেখিয়া অবজ্ঞা করে তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্করণ কিংবা সম্পত্তিচ্যুত করা হইবে না। স্ত্রী মদ্যপায়িনী, নীতিবিরহিতকার্য্যকারিণী স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন কারিণী আরোগ্য-আশা-শূন্য ব্যাধিগ্রস্তা ক্ষতিকারিণী বা অপরিমিত ব্যয়কারিণী হইলে তৎক্ষণাৎ ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিবে। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে আট বৎসর, মৃতবৎসা হইলে দশ, কন্যামাত্র প্রসব করিলে একাদশ বৎসরে ও অপ্রিয়বাদিনী হইলে অবিলম্বে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যদার পরিগ্রহ করিবে; কিন্তু স্ত্রী ব্যাধিগ্রস্তা হইয়াও যদি প্রিয়বাদিনী ও পবিত্রা হন, তবে তাঁহার সম্মতিক্রমে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিলেও কখন তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন বা কর্কশ ব্যবহার করা হইবে না; যদি কোন স্ত্রী অন্যদার গ্রহণ জন্য ক্রোধবশতঃ গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যায়, তাহাকে তৎক্ষণাৎ গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে, কিংবা সকলের সমক্ষে বর্জ্জন করিবে; স্ত্রী নিবারিত হইয়াও যদি মদ্যপান করে কিংবা রঙ্গালয়ে জনসমূহের সহিত মিশ্রিত হয় তাহা হইলে তাহার ছয় সুবর্ণ রক্তিকা দণ্ড হইবে।

দ্বিজাতিগণ স্বজাতি ভিন্ন অন্য জাতীয়া কন্যা বিবাহ করিতে পারেন; কিন্তু স্বজাতীয়ারাই তাঁহার সমুদায় গৃহকর্ম্ম ও ধর্ম্মকার্য্য সমাধা করিবেন—স্বজাতীয়া স্ত্রী উপস্থিত থাকিতে স্বামী যদি সেই কর্ম্মের ভার অন্যা স্ত্রীতে ন্যস্ত করেন, তাহা হইলে সমাজে তিনি চণ্ডাল হইতেও ঘৃণিত। স্বজাতীয়, সুন্দর, সুবিদ্বান যুবা প্রাপ্ত হইলে কন্যা বয়স্থা না হইলেও তাহাকে সম্প্রদান করিবে, কিন্তু বয়স্থা হইলেও যদি গুণান্বিত পুরুষ না দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহাকে কুকর্ম্মাচারী পুরুষকে প্রদান করা অপেক্ষা আমরণ গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে, এরূপ করিলেও তাহার পিতাকে কোন দোষ স্পর্শ করিবে না। অপর দিকে কন্যা বয়স্থা হইয়াও তিন বৎসর কাল অভিভাবকের অপেক্ষা করিবে, পরে স্বজাতীয় মধ্যে আপন মনোমত স্বামী নির্ব্বাচন করিয়া লইতে প্যারে। এরূপ করিলে সেই স্ত্রীর কিংবা স্বামীর কিছুমাত্র দোষস্পর্শ করিবে না। কিন্তু যে কন্যা এইরূপে আপন স্বামী মনোনীত করিয়া লন, তিনি পিতা, মাতা কিংবা ভ্রাতৃপ্রদত্ত অলঙ্কারাদি লইয়া যাইতে পারিবেন না—করিলে তাহা চুরি বলিয়া গণ্য হইবে। যে পুরুষ বয়স্থাতিরিক্ত কন্যা বিবাহ

করিবেন, তাঁহাকে কন্যার পিতাকে কোন যৌতুক প্রদান করিতে হইবে না, কেন না উক্ত পিতা কন্যার বয়স অতিক্রম জন্য তাহার উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব নষ্ট করিয়াছেন। ত্রিংশৎবৎসর বয়স্ক পুরুষ দ্বাদশ বৎসর বর্ষীয়া কন্যা ও চতুর্ব্বিংশতি বৎসরবয়স্ক যুবা অষ্টম বর্ষীয়া কন্যার পাণি গ্রহণ করিবেন ; দেবপ্রেরিতা কন্যা পবিত্রা হইলেও যদি বিবাহ না করা যায়, তবে তাঁহাকে আজীবন যত্নে পালন করিবে, কেন না তাহা হইলে দেবতারা সন্তুষ্ট হন। কেবল মাতা ও পিতা হইবার জন্য স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্ট হইয়াছে, এই জন্য স্বামী স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। বিবাহার্থ কোন পুরুষ কন্যাকে যৌতুক প্রদান করিয়া যদি মৃত্যু মুখে পতিত হন, তাহা হইলে কন্যার মতানুসারে তাঁহার ভ্রাতা তাহাকে বিবাহ করিতে পারেন ; কিন্তু কোন পিতাই কন্যা সম্প্রদান করিয়া বরের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিবেন না, কেন না তাহা হইলে কন্যা বিক্রয় করা হয়। কি পুরা কি ইদানীন্তন কালে কোন হিতাহিতজ্ঞানবিশিষ্ট পিতাই একবার একজনকে বাগ্দান করিয়া অন্যকে কন্যা সম্প্রদান করেন নাই ; স্ত্রী পুরুষের ধর্ম্ম সংক্ষেপে বলিতে গেলে "মৃত্যু পর্য্যন্ত উভয়ের প্রতি উভয়ের বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকুক এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত ; স্ত্রী ও পুরুষের সর্ব্বদা একত্রে থাকা উচিত, তাহা না হইলে পরস্পরের স্নেহের অপবহু হইবার সম্ভাবনা *।"

*মনুসংহিতা ৯ অধ্যায়; ৭২—১০২ শ্লোক।

বৃদ্ধ মনু স্ত্রীলোককে কখনই বিশ্বাস করেন নাই ; তাঁহার মতে স্ত্রীজাতি অতি অবিশ্বাসিনী ; তিনি রাজধর্ম্ম বিষয়ক প্রস্তাবে বলিয়াছেন যে, "রাজা গুপ্ত পরামর্শ করিবার সময় নির্ব্বোধ, মূক, অন্ধ, বধির, অনুকরণকারী-পক্ষী, স্থবির, স্ত্রী, নাস্তিক, ব্যাধিগ্রস্ত এবং বিকলাঙ্গ মনুষ্য প্রভৃতিকে পরিহার করিবেন ; কারণ যাহারা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ বশতঃ ইহলোকে লোকের ঘৃণিত তাহারা গুপ্ত পরামর্শ প্রকাশ করিয়া দিতে পারে ; এইরূপ অনুকরণকারী-পক্ষী আবার সকল অপেক্ষা স্ত্রীলোক—এই জন্য বিশেষযত্ন পূর্ব্বক তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে (৭। ১৪৯—১৫০) আবার, রাজা যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবেন তখন তিনি যেন স্ত্রীলোকগণের বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করেন, না হইলে কোনরূপ অস্ত্র বস্ত্রের মধ্যে থাকিতে পারে (৭। ২১৯) অন্য এক স্থলে বলিয়াছেন "এজগতে মনুষ্যকে কুপথগামী করাই স্ত্রীজাতির স্বভাব, এই জন্য স্ত্রীলোক কখন অন্য স্ত্রী দ্বারা সুরক্ষিত হইতে পারে না ; ইহাদের এরূপ ক্ষমতা আছে যে, তাহারা কেবল হিতাহিতজ্ঞানশূন্য মনুষ্য নয়, জ্ঞানী ব্যক্তিকেও ধর্ম্মপথভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয় ; তজ্জন্য অতি নির্জ্জন স্থানে কখন আত্মীয়া স্ত্রীলোকের সহিত উপবেশন করিবে না, কেন না ইন্দ্রিয় সকল স্ত্রীলোকের মন হইতে ধর্ম্মভয় চ্যুত করিতে সমর্থ (২ ২১৩—১৫)।" এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন " স্ত্রী দোষ করিলে তাঁহাকে বেত্রা-

ঘাত দ্বারা সংশোধন করিবে (৮। ২৯৯)।"

স্ত্রীলোকের কতকগুলি দোষের উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের গুণগুলির উল্লেখ না করিলে পক্ষপাতিত্বের কার্য্য করা হয়; এজন্য মনু হইতেই আমরা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক কয়টি প্রদান করিলাম ;—

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দ্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যাভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমিপ্সুভিঃ॥৫৫
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলক্রিয়াঃ॥৫৬
শোচন্তি জাময়োযত্র বিনশ্যন্ত্যাশু তৎকুলং।
ন শোচন্তিতু যত্রৈতাবর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥৫৭
জাময়োযানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্বা হতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥৫৮
তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষুচ॥৫৯
সন্তুষ্টোভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্রবৈ ধ্রুবং ৬০।৩ অ

অর্থাৎ "সৌভাগ্য কামনা করিলে বিবাহিতা কন্যাকে তাহার পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, দেবর সকলেরই মান্য করা এবং অলঙ্কারে ভূষিত করা কর্ত্তব্য। যে স্থানে স্ত্রীগণকে সন্তুষ্ট রাখা হয় তথায় দেবতাগণ প্রসন্ন থাকেন, এবং অসন্তুষ্ট করিলে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানই বিফল হয়। যে পরিবারে স্ত্রীগণ শোক করে, সে পরিবার শীঘ্রই উৎসন্ন হয়, কিন্তু যেখানে তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন, সে পরিবারের সৌভাগ্য দৈনন্দিন বর্দ্ধিত হয়। এই জন্য সৌভাগ্যেপ্সু লোকেরা উৎসবে ও সৎকার্য্যে তাঁহাদিগকে অশন, বসন ও ভূষণ দিয়া পূজা করিবে। যে কুলে স্বামী স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট, এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট সে কুলে কল্যাণ চিরস্থায়ী।" মনু এই স্থলে আরও লিখিয়াছেন যে, "যদি স্ত্রী উত্তমরূপে সজ্জিত না হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবেন না এবং তাহা হইলে পুত্রোৎপাদন অসম্ভব ; স্ত্রী সুন্দর অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইলে সমুদায় গৃহ তাঁহার প্রভায় ভূষিত হয়, না হইলে সমুদায়ই অলঙ্কারশূন্য। ঘৃণিত বিবাহ, পূজা-বিহীনতা, বেদপাঠ-কাতরতা, ও ব্রাহ্মণ-অবজ্ঞা এই কয়টি কারণ বশতঃ প্রধান পরিবারও অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় (৩। ৬১—৬৩)" উদ্ধৃত অংশ দ্বারা বিলক্ষণ অবগত হওয়া যাইতেছে যে, পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকের প্রতি সকলেই সদ্ব্যবহার করিতেন—তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে সুখে রাখিতেন—নিজ অমঙ্গল জন্য কেহ কখন তাঁহাদিগকে নিতান্ত দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন করিতেন না। মহর্ষি মনু আরও বলিয়াছেন, "মাতা, পিতা অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক পূজনীয়া—আর স্ত্রী আপনার দেহ।" যখন এমন সকল বিধান পরিদৃষ্ট হইতেছে, তখন ইহা নিশ্চয় যে কেহ কখন অকারণে তাঁহাদিগকে কষ্ট দিতেন না।

এক্ষণে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে ভগবান মনু যাহা বলিয়াছেন তাহা পাঠক বর্গের বিদিতার্থ উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"তিনি সতত প্রসন্নচিত্তে থাকিবেন এবং উত্তমরূপে গৃহকর্ম্ম সম্পাদন, অতি যত্নে গৃ-

হস্থিত দ্রব্যের তত্ত্বাবধারণ ও পরিমিতরূপে ব্যয় করিবেন; তাঁহার পিতা তাঁহাকে যাঁহার করে সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহাকে সতত মান্য করিবেন, এমন কি তাঁহার মৃত্যুর পরও তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবেন না; বিবাহকালে মন্ত্রোচ্চারণে কন্যার সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয়; যখন স্বামী বেদবিহিত মত বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করেন, তখন স্ত্রীকে এজগতে চিরকাল ও পরলোকে সুখী করেন সন্দেহ নাই। স্বামী আচারচ্যুত, অন্যস্ত্রী অনুরক্ত, সদ্‌গুণ বিহীন হইলেও সাধ্বী স্ত্রী তাঁহাকে দেববৎ পূজা করিবেন; স্বামী ব্যতীত স্ত্রীর কোন ধর্ম্ম কর্ম্মে অধিকার নাই এবং যে স্ত্রী স্বামীর যেমন পূজা করেন, স্বর্গে তাঁহার সেইরূপ স্থান হয়; স্বর্গে স্বামীসহবাসেচ্ছুক স্ত্রী, স্বামীর মৃত্যুর পরও তাঁহার প্রতি কখন অনাচরণ করিবেন না। স্বামী মৃত হইলে তিনি অন্য পুরুষের নাম পর্য্যন্তও মুখে আনিবেন না এবং পবিত্র পুষ্প ও ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া আপনার দেহ কৃশ করিবেন ও মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি ক্ষতি স্বীকার, কঠিন ব্রত, ভোগাভিলাষত্যাগ ও ধর্ম্ম কর্ম্মে সতত আস্থা প্রদর্শন করিবেন। যেমন ব্রহ্মচারীগণ অপুত্রক হইয়াও স্বর্গগমনের অধিকারী হন, তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য্যায় অবস্থিতা স্ত্রী অপুত্রবতী হইয়াও স্বর্গ গমনের সম্পূর্ণ অধিকারিণী; কিন্তু বিধবা স্ত্রী, পুত্র কামনায় যদি অন্য পুরুষ আশ্রয় করেন, তাহা হইলে তিনি ইহকালে ঘৃণিত ও নিন্দিত এবং পরকালে স্বামীসহবাসে বঞ্চিত হন; স্বামী ভিন্ন পুত্র অন্য কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইলে সে পুত্র তাঁহারও নহে এবং উৎপাদকেরও নহে; এই জন্য বিধবাবিবাহ সর্ব্বপ্রকারে নিষিদ্ধ। যে স্ত্রী তাহার স্বামীর নিম্নশ্রেণীত্ব জন্য ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া পুরুষান্তর গ্রহণ করে, সে ইহজগতে লোকের ঘৃণিত ও পরপূর্ব্ব নামে আখ্যাত এবং পরজন্মে কুক্কুরী ও নানারূপ পীড়ায় পীড়িত হয়; আর যিনি স্বামীর সর্ব্বপ্রকারে বশীভূত তিনি স্বর্গে স্বামীর গৃহ প্রাপ্ত হন এবং এজগতে সাধ্বী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন (৫। ১৫০—১৬৫)।"

এই উদ্ধৃত অংশগুলি দর্শন করিলেই সমাজে স্ত্রীলোকের অধিকার উত্তমরূপ অবগত হওয়া যায়। এক্ষণে ভগবান মনুর মতের সহিত অন্যান্য সংহিতাকারগণের মতের সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইতেছে; আমরা স্ত্রী সম্বন্ধে এক একটি বিষয় ধরিব ও সে বিষয়ে সকলের মত কি তাহাই লিপিবদ্ধ করিব। সমাজে স্ত্রীলোকের প্রয়োজন সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন;—

উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনং।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনং॥

অর্থাৎ সন্তানোৎপাদন, তাহাদের পালন ও গৃহকর্ম্মের তত্ত্বাবধারণ জন্যই স্ত্রী সৃষ্ট হইয়াছেন। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে স্ত্রী কেবল ভোগের জন্য নহে, তাঁহাদের উপর গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে, এবং ইহাই সকল মুনির মত। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা মনুর মত পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। অন্যান্য সংহিতাকার-

গণ তাহার অধিক আর কিছুই বলেন নাই; এবিষয়ে সকলেরই একমত। স্ত্রীলোকের গৃহকর্ম্ম সম্বন্ধে বহ্নিপুরাণে একটি সুন্দর অংশ আছে আমরা তাহা এইস্থলে গ্রহণ করিলাম;—

সা শুদ্ধা প্রাতরুত্থায় নমস্কৃত্য পতিং সুরং।
প্রাঙ্গণে মণ্ডনং দদ্যাৎ গোময়েন জলেন বা
গৃহকৃত্যং চ কৃত্বাচ স্নাত্বা গত্বা গৃহং সতী।
সুরং বিপ্রং পতিং নত্বা পূজয়েদ্গৃহদেবতাং॥

গৃহকৃত্য সুনির্ব্বর্ত্ত্য ভোজয়িত্বা পতিং সতী।
অতিথীন্ পূজয়িত্বাচ স্বয়ং ভুঙ্ক্তে সুখং সতী॥

অর্থাৎ স্ত্রী শুদ্ধা হইয়া প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্বামীকে প্রণাম করিবেন; পরে গোময় বা জল দ্বারা প্রাঙ্গণে মণ্ডন দিবেন; এই রূপে গৃহকর্ম্ম সমাধানান্তর স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পতিকে প্রণাম পূর্ব্বক গৃহ দেবতার পূজা করিবেন; অনন্তর সমুদায় গৃহকার্য্য (রন্ধন ইত্যাদি) সমাধা করিয়া পতিকে ভোজন করাইবেন ও পরে অতিথি সৎকার করিয়া নিজে সুখে ভোজন করিবেন। ইহা গৃহকর্ম্মের একটি সুন্দর উদাহরণ সন্দেহ নাই।

এক্ষণে স্ত্রীলোকের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে সকলের মত প্রদর্শিত হইতেছে; এসম্বন্ধে মনুর মত পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে; তিনি আরও বলিয়াছেন পরপত্নী ভগ্নী স্বরূপ; আপস্তম্ভ বলিয়াছেন উহাদিগকে মাতৃবৎ দেখিবে—অনেক পরবর্ত্তী চানক্য পণ্ডিতও এই কথা বলিয়াছেন। অন্য একজন বলিয়াছেন পুত্র ও কন্যায় কিছু মাত্র প্রভেদ নাই বরং কন্যা সৎপাত্রে সম্প্রদান করিলে পরলোকে তাঁহার মঙ্গল হয়। গরুড়পুরাণে আছে স্ত্রীলোক অবধ্য; তাহাকে কোন প্রকার শারিরীক কষ্ট দিবে না। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে, 'যে যে স্থলে স্ত্রীলোকের পাদস্পর্শ হয় পৃথিবী সেই সেই স্থলেই মনে করেন—আমার আর ভার নাই, আমি পবিত্রকারিণী হইলাম'; অন্য স্থলে 'সোম তাঁহাদিগকে শৌচ প্রদান করিয়াছেন—গন্ধর্ব্ব তাঁহাদিগকে সুমধুর বাক্য দিয়াছেন ও অগ্নি তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র করিয়াছেন—এই জন্য স্ত্রীলোক সর্ব্বপ্রকারেই পবিত্র।' যখন স্ত্রী সম্বন্ধে এমন উদারমত রহিয়াছে তখন যে সমাজে তাঁহাদিগকে সকলেই সস্নেহ ব্যবহার করিতেন ইহা নিশ্চয়। এক্ষণে তাঁহাদিগের স্বাধীনতা ছিল কিনা তাহাই দেখা যাইতেছে। অতি পূর্ব্বকালে তাঁহারা স্বাধীন ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়; কেন না তদানীন্তন যোষিদ্গণ স্বাধীন ভাবে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া তাহার কার্য্যাদি পরিদর্শন ও ক্রিয়াদি সম্পাদন করিতেন। ঋগ্বেদ উল্লিখিত রথবীতিই তাহার প্রমাণ *। তাঁহারা রথারোহণে ভ্রমণ করিতেন এবং বিচারস্থলে উপস্থিত হইয়া স্বকার্য্যাদি সাধন করিতেন †। রামায়ণে দৃষ্ট হয় অসূর্য্যম্পশ্যা জানকী সকলের

* ঋগ্বেদ, ৫ মণ্ডলে ৬১ রথবীতির উপাখ্যান।

† ঋগ্বেদ ১ মণ্ডল ১১৬—১২৪।

সমক্ষে সহস্র জনাকীর্ণ প্রশস্ত রাজবর্ত্ম দিয়া গমন করিয়াছেন; রামচন্দ্র প্রথমতঃ যদিও এজন্য মনে মনে ব্যথিত হইয়াছিলেন তথাপি বিপদ, বিবাহ, স্বয়ম্বর, যজ্ঞ ও স্বামী সঙ্গে তাঁহারা সকলের সমক্ষে উপস্থিত হইতে পারেন এই বচনটি স্মরণ করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তও হইয়াছিলেন; তাহাহইলেই দেখা যাইতেছে রামায়ণের সময়েও তাঁহাদের অনেকটা স্বাধীনতা ছিল; মহাভারতে স্ত্রী স্বাধীনতার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়; দ্রৌপদী পাণ্ডবগণের সহিত বনে বনে ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর ভ্রমণ করেন; তদ্ব্যতীত তিনি অবাধে নানাঋষির সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেন,তাহাতে তাঁহার কোন দোষস্পর্শ হয় নাই। তাহাতে সাবিত্রী, দেবযানী প্রভৃতি আরও কত স্ত্রীলোক সন্দর্শন করিতে পাওয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। তৎকালে প্রায় সকল রাজাই সস্ত্রীক সিংহাসনে বসিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন; এই সকল দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে, সে সময়ে তাঁহারা নিতান্ত অবরোধবর্ত্তিনী ছিলেন না। অরুন্ধতি সর্ব্বদাই সপ্তর্ষি গণের নিকট থাকিতেন; আবার স্মৃতিগ্রন্থে 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ' এই ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু স্ত্রী যজ্ঞস্থলে উপস্থিত না হইলে, কি প্রকারে তাহা সম্পন্ন হইত? যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন;—

ক্রীড়া শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনং।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা॥

স্বামী বিদেশ গমন করিলেই স্ত্রীর প্রতি এই নিয়ম; নচেৎ তিনি গৃহে থাকিলে এই সকল করিতে পারিতেন এই শ্লোকে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতার সহিত তাঁহাদের পরিধেয়েরও কিঞ্চিৎ সামঞ্জস্য আছে, এই জন্য এই স্থলে তাঁহাদের পরিধেয় বসনের বিষয় কিঞ্চিৎ বিবৃত করা যাইতেছে; বস্ত্র বিষয়ে দেখিতে গেলে অবগুণ্ঠনই আমাদের প্রথম লক্ষ্যস্থানীয় হয়; এক্ষণে দেখা যাউক পূর্ব্বকালে অবগুণ্ঠন প্রথা ছিল কিনা? অনেকে বলিয়া থাকেন পুরাকালে ইহা প্রচলিত ছিল না, ভারতে যবনাধিকারের সময় হইতেই ইহা সমাজে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে—সেই সময় হইতেই ভারত-ললনার বদনমণ্ডল অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত; ইহা পূর্ণমাত্রায় সত্য না হইলেও অংশতঃ বটে,তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কেননা যবন অত্যাচারের পূর্ব্বেই আমরা অবগুণ্ঠনের দর্শন লাভ করি। তবে তদানীন্তন অবগুণ্ঠনেও ইদানীন্তন অবগুণ্ঠনে যে অনেক প্রভেদ আছে তাহা স্বীকার্য্য এক্ষণকার কুল কামিনীরা যেমন পিঞ্জরাবরুদ্ধা স্বহস্তপ্রতিপালিত পক্ষীর নিকটেও অবগুণ্ঠন দিয়া থাকেন, তখনকার তাঁহারা সেরূপ করিতেন না—অপরিচিত সভাস্থল ব্যতীত প্রায়ই তাঁহাদের মস্তক অনাবৃত থাকিত; শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজন, দেবর, ননান্দৃ প্রভৃতি স্বসম্পর্কিত কিংবা যাহার সহিত স্নেহ, মমতা কি প্রীতির কোনরূপ সম্বন্ধ আছে এমন সকল ব্যক্তির নিকট কখন তাঁহারা অবগুণ্ঠন প্রদান করিতেন

না; এসকলেরই সহিত তাঁহারা নিরবগুণ্ঠনে স্বাধীনভাবে কথোপকথন করিতেছেন; তাহাতে তাঁহাদেরে কোনই দোষ স্পর্শ করিত না—কিংবা সমাজে কোনপ্রকারে নিন্দিত হইতে হইত না। আবার দেখাযায় তাঁহারা কখন কখন অপরিচিত পুরুষের সহিতও অম্লানবদনে কথা কহিতেছেন; মহাভারতের দময়ন্তী দেব প্রেরিত নিষধরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া অকপটহৃদয়ে তাঁহার প্রত্যেক কথার সদুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন; কৃষ্ণা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রভৃতি তেজঃপুঞ্জ তাপসগণের সন্নিধানে রাজনীতি সংক্রান্ত নানা কথা লইয়া তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন; রামায়ণের ইন্দুমতী স্বয়ম্বর স্থলে মরালগমনে সকল রাজার নিকট উপস্থিত হইয়াও অনিন্দিতা রহিয়াছেন; সিন্ধুরাজতনয়া সাবিত্রী পতিঅন্বেষণে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, বনে বনে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়াও মাননীয়া রহিয়াছেন; কালিদাসের শকুন্তলা বহুজনসমাকীর্ণ অদৃষ্ট-পূর্ব্ব দুষ্মন্তের রাজসভায় আগমন করিয়া সামান্য অবগুণ্ঠন ব্যবহার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি তপোবনে দুষ্মন্তের প্রথম সন্দর্শনকালে অবগুণ্ঠন আদৌ ব্যবহার করেন নাই; প্রত্যুত দুষ্মন্তের যথাবিধি সৎকার করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিতা হন নাই; ভবভূতির জনক-তনয়া পাদপকণ্ঠলগ্না বাতান্দোলিতা ব্রততীর ন্যায় রামচন্দ্রের কণ্ঠলগ্না থাকিয়াও রাজদূত, লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্রাদির সহিত স্বচ্ছন্দ আলাপ করিয়াছেন; এই সকল দর্শন করিলে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয় যে, তৎকালে অবগুণ্ঠন প্রথা প্রচলিত থাকিলেও ইদানীন্তন কালের ন্যায় ছিল না, এবং তদানীন্তন স্ত্রীলোকগণ আধুনিক ললনাদিগের মত পিঞ্জরাবরুদ্ধা থাকিতেন না—তাঁহাদের কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীনতা ছিল,—তাঁহারা সময়ে সময়ে ইতস্ততঃ গমনাগমনও করিতে পারিতেন। কিন্তু মন্বাদি শাস্ত্রকারগণের সময় হইতেই তাঁহাদের স্বাধীনতা নষ্ট করিবার বহুল চেষ্টা হইয়াছে এবং সে সকল যে কেবল শাস্ত্রমধ্যেই নিহিত ছিল এমন বোধ হয় না; সেই সময় হইতেই শনৈঃ শনৈঃ তাঁহাদের স্বাধীনতা লোপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। "স্ত্রীলোককে স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে" ইহা সকল সংহিতাকারই স্পষ্টাক্ষরে বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে মহর্ষি মনুর মত পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে—যাজ্ঞবল্ক্যও সেই কথা বলেন; নারদ বলেন "যদি স্বামীর বংশ নির্ম্মূল হয়—অথবা কেহই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সমর্থ না হয় তবে সে পিতৃকুল আশ্রয় করিবে; পিতৃকুলধ্বংস হইলে রাজা তাহাকে রক্ষা করিবেন আর এরূপ স্ত্রী অপবিত্রা হইলেও রাজা তাহাকে রক্ষা করিবেন।" বৃহস্পতি বলেন "শ্বশ্রূ অথবা অন্য কোন বয়স্থা স্ত্রীলোক তরুণী রমণীর রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন" কিন্তু মনু বলিয়াছেন "স্ত্রীজাতি মাত্রেই অবিশ্বাসিনী, এই জন্য স্ত্রীলোকে রমণীর রক্ষণাবেক্ষণ না করে।" বিষ্ণু বলিয়াছেন "স্বামী বিদেশ গমন করিলে স্ত্রী শরীরসংস্কার ও পরগৃহে গমন পরিত্যাগ করি-

বেন,” তিনি আরও বলিয়াছেন “গৃহের দ্বারদেশ বা গবাক্ষ ইত্যাদি স্থানে অবস্থিতি করা স্ত্রীলোকের অন্যায়—কোন কর্ম্মেই স্ত্রী লোকের স্বাধীনতা নাই।” ব্যাস নিজ সংহিতায় লিখিয়াছেন “ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ লাভে স্ত্রী ও পুরুষ সর্ব্বদা একমনা হইবে ও একরূপ নিয়ম করিয়া চলিবে; স্ত্রীর পক্ষে ত্রিবর্গ সাধনের আর কোন স্বতন্ত্র পথ নাই; শাস্ত্রবিধির ভাবার্থ সংগ্রহ অথবা তাহাদিগকে দ্বেষ করিয়াও স্বতন্ত্র পথের উল্লেখ দেখা-যায় না।” ব্যাস আরও বলিয়াছেন “স্ত্রীলোক কথনই উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবেন না।” দক্ষ বলেন “পত্নী যদি পতির মন বুঝিয়া চলেন এবং তাঁহার বশীভূতা হন তাহা হইলে গৃহাশ্রমের তুল্য আশ্রম আর নাই এবং সেই স্ত্রীর দ্বারাই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ লাভ হয়; কিন্তু স্নেহবশতঃ যদি তাঁহাদিগকে তাঁহাদের স্বেচ্ছামত ব্যবহার করিতে নিবারণ না করা যায়, তবে উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় পশ্চাৎ তাঁহারা কষ্টের কারণ হন;” শংখ বলিয়াছেন “স্ত্রী না বলিয়া কাহারও বাটীতে যাইবেন না; কোথাও যাইতে হইলে উত্তরীয় ছাড়িয়া যাইবেন না; দ্রুতপদে গমন করিবেন না; পরপুরুষের সহিত কথা কহিবেন না; বণিক, প্রব্রজিত, বৃদ্ধ ও বৈদ্যকেও নাভি দেখাইবেন না; বিস্তৃত বস্ত্র পরিধান করিবেন—অনাবৃত শরীরে কথন থাকিবেন না ইত্যাদি।” গৌতম বলিয়াছেন “ধর্ম্মকার্য্যেও স্ত্রী স্বাধীনা নহেন” বশিষ্ঠও এই কথা বলিয়াছেন। স্বামী যে সকল কার্য্য করিতে সঙ্কল্প করিবেন, স্ত্রীর তাহাই করণীয়; যথা কাশীথণ্ডে লিখিত আছে ‘যত্র যত্র রুচির্ভর্ত্তুস্তত্র প্রেমবতী সদা’ আরও ‘স্ত্রীভির্ভর্ত্তৃবচঃ কার্য্যমেষধর্ম্ম সনাতনঃ’ অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর অনুজ্ঞা মত কার্য্য করিবেন ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। শাস্ত্রকারগণের এই সকল বচন দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীগণের স্বাধীনতা কোন প্রকারেই ঋষিগণের সম্মত নহে; তাঁহারা ইহাঁদিগকে সর্ব্বদা পিঞ্জরাবরুদ্ধা করিয়া রাখিতে চাহিতেন, কিন্তু সকল সময়েই যে তাঁহাদের মত গ্রহণীয় হইত, এমন বোধ হয় না; কেন না সংহিতা সকল বিধিবদ্ধ হইবার পরও আমরা স্ত্রীস্বাধীনতার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই; সমাজে তাহা প্রচলিত না থাকিলে কথনই আমরা তাহা দেখিতে পাইতাম না।

এক্ষণে পবিত্রা স্ত্রী সম্বন্ধে সংহিতাকারগণের মত প্রদর্শিত হইতেছে। এসম্বন্ধে মনুর মত পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে; কাশীখণ্ড বলেন যে, ‘যে যে স্থলে পবিত্রা স্ত্রীলোকের পাদস্পর্শ হয়, পৃথিবী সেই সেই স্থানেই মনে করেন যে আমার আর ভার নাই, আমি পবিত্রকারিণী হইলাম; কাত্যায়ন বলেন “সৌভাগ্যবতীর মুখ প্রাতঃকালে দর্শন করিলে সমস্ত দিন মঙ্গলময় হয়,’ ব্যাস বলিয়াছেন ‘পবিত্রা স্ত্রী নির্ম্মল ছায়ার ন্যায় পতির অনুগতা থাকে ও স্বামীর হিতকর কার্য্য সখীর ন্যায় ও আদিষ্ট কার্য্য দাসীর ন্যায় সম্পন্ন করে,’ দক্ষ কহিয়াছেন “পত্নী যদি পতির মন বুঝিয়া চলেন

ও তাঁহার বশীভূতা হন, তাহা হইলে গৃহাশ্রমের তুল্য আশ্রম আর নাই, এবং সেই স্ত্রীর দ্বারাই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ ফল লাভ হয় ;' 'অনুকূলকারিণী, মিষ্টভাষিণী, কার্য্যদক্ষা, সাধ্বী, জিতেন্দ্রিয়া স্ত্রী দেবী, তিনি মানবী নহেন ; যাহার স্ত্রী অনুকূলকারিণী তাঁহার এই স্থানেই স্বর্গ—পরস্পর এরূপ অনুরাগ স্বর্গেও দুর্লভ ; গৃহে বাস সুখের জন্য, সে সুখের পত্নীই মূল ; অনুকূলা, মিষ্টভাষিণী, দক্ষা, সাধ্বী, পতিব্রতা রমণীই লক্ষ্মী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ;' কেহ কেহ বলিয়াছেন 'লজ্জাশীলা গৃহকার্য্যতৎপরা, পতিপরায়ণা স্ত্রীলোকের স্বামী হওয়া সামান্য পুণ্যের কার্য্য নহে ;' 'স্ত্রী যদি বাধ্য ও বশীভূত হইলেন, তবে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে প্রভেদ কি ?' 'প্রিয়বাদিনী ও কলহশূন্যা নারীই লক্ষ্মীর আবাসভূমি।' বিষ্ণুসংহিতার শেষভাগে লক্ষ্মী ও নারায়ণের কথোপকথনস্থলে নারায়ণ অন্যান্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া শেষ লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিরূপ স্ত্রীলোকের গৃহে থাকিতে ভাল বাস ? তাহাতে লক্ষ্মী নিম্নোদ্ধৃত উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন ;—

নারীষু নিত্যং সুবিভূষিতাসু পতিব্রতাসু প্রিয়বাদিনীসু ।
অমুক্তহস্তাসু সুতান্বিতাসু সুগুপ্তভাণ্ডাসু বলিপ্রিয়াসু ।
সম্মৃষ্টবেশ্মাসু জিতেন্দ্রিয়াসু কলিব্যপেতাসু বিলোলুপাসু ।
ধর্ম্মব্যপেক্ষিতাসু দয়ান্বিতাসু স্থিতা সদাহং মধুসূদনে তু ॥

অর্থাৎ 'নিত্য উত্তমরূপে বিভূষিতা, পতিব্রতা, প্রিয়বাদিনী, ব্যয়কুণ্ঠিতা, পুত্রবতী, অর্থসঞ্চয়ে যত্নবতী, দেবগণের পূজাপ্রিয়া, গৃহমার্জ্জনতৎপরা, জিতেন্দ্রিয়া, কলহবিরতা লোভবিহীনা, ধর্ম্মকর্ম্মে অভিনিবিষ্টা, দয়ান্বিতা, রমণীতে আমি বাস করি, মধুসূদন যেমন আমার প্রিয়—ইঁহারাও সেইরূপ। লক্ষ্মীর এই উত্তর প্রদানেই পবিত্রা স্ত্রীগণের কার্য্য সম্যক অবগত হওয়া যাইতেছে ; এরূপ রমণী যে পুরাকালে অনেক ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই এবং এক্ষণেও যে দুর্লভ তাহাও নহে। স্ত্রী এইরূপ গুণসংযুক্তা হইলেই এই দুঃখময় সংসার কি সুন্দর—ইহার মূর্ত্তি কি রমণীয় কি প্রীতিপ্রদ ; কাহার না ইচ্ছা হয় এমন মনোমুগ্ধকারী সংসারাশ্রমে প্রবেশ করি ! কিন্তু স্ত্রী দুষ্টা হইলে, এই বসন্তের অনিল, গ্রীষ্মের কুসুমঘ্রাণ স্বর্গের সোপান—চিরস্বর্গবাসের পথ প্রদর্শক, সুখস্বর্গের আদর্শ এই লোভনীয় গৃহাশ্রম, কণ্টকসমাকীর্ণ গহনকানন, ও জীবিতাবস্থার বিভীষণ নিরয় স্বরূপ। সে গৃহীর শ্রী কিছুতেই নাই—তাহাকে ইহলোকেই যমযন্ত্রণা ও নরকভোগ করিতে হয়'—তাহার জীবন্মৃত্যু উভয়ই তুল্য ; দুষ্ট চরিত্রাগণ সম্বন্ধে সংহিতাকারগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন এক্ষণে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে।

দক্ষ বলিয়াছেন 'যদি রমণী সদা ক্ষিপ্তা হন এবং স্ত্রীপুরুষের মন যদি এক না হয়, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা দুঃখ আর নাই ; জলৌকা কেবল রক্ত শোষণ করে কিন্তু দুষ্টা

স্ত্রী ধন, বিত্ত, বল, মাংস, বীর্য্য ও সুখ শোষণ করিতে থাকে ;' কাত্যায়ন বলিয়াছেন 'প্রাতঃকালে দুর্ভগার মুখ দেখিয়া উঠিলে সে দিন বিবাদ বিসংবাদেই যায়।' দুষ্টা স্ত্রী সম্বন্ধে মনুর মত পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে ; যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন ;—

সুরাপি ব্যাধিতাধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ম্বদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা॥

অর্থাৎ মদ্যপায়িনী, ব্যাধিতা, ধূর্ত্তা, বন্ধ্যা, অর্থঘ্না, অপ্রিয়বাদিনী, কন্যামাত্র প্রসবিনী পুরুষদ্বেষিণী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিবে। মনু এক স্থানে বলিয়াছেন 'স্ত্রী যদি পিতৃধনগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া পতির অবহেলা বা অন্য পুরুষ আশ্রয় করে, তবে রাজা সেই স্ত্রীকে সর্ব্বসমক্ষে কুক্কুরদ্বারা ভক্ষণ করাইবেন এবং সেই পুরুষকে উত্তপ্ত লৌহকটাহে নিক্ষেপ করিয়া জীবিত দগ্ধ করিবেন (৮।৩৭১—৭২)।' স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে তাঁহার পিতৃধনে অধিকার নাই —তাহাদের ইহকালও নাই, পরকালও নাই; কিন্তু শাস্ত্রকারেরা এরূপ স্ত্রীলোকেরও ভরণপোষণ ব্যবস্থা করিয়াছেন ; যথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন ;—

হৃতাধিকারাং মলিনাং পিণ্ডমাত্রোপজীবিনীং।
পরভূতামধঃশয্যাং বাসয়েদ্ব্যভিচারিণীং॥

যাজ্ঞবল্ক্য বোধ হয় স্ত্রীগণ নিতান্ত দুর্ব্বল ও নিঃসহায়, এই জন্যই এইরূপ বিধান দিয়াছেন ; তাঁহার উদ্দেশ্য, যদি এরূপ করিয়াও তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হয়। সেই জন্যই পুনরায় অন্য এক স্থলে বলিয়াছেন, 'অধিবিন্নাস্ত ভর্ত্তব্যা মহাদনোন্যথা ভবেৎ।' মিতাক্ষরা বলিয়াছেন 'দুষ্টা স্ত্রী স্বামীর সহিত সহবাস করিতে ও গৃহকর্ত্রী হইতে পারিবে না।' ব্যাস বলিয়াছেন 'অদুষ্টাং পতিতাং ভার্য্যাং ত্যক্ত্বা পততি ধর্ম্মতঃ ;' অদুষ্টা পতিতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। রঘুনন্দন পবিত্রা স্ত্রীত্যাগেরই প্রায়শ্চিত্য বিধান করিয়াছেন, সুতরাং অপবিত্রা স্ত্রীত্যাগ তাঁহার মতে কর্ত্তব্য। চাণক্য বলিয়াছেন 'সসর্পেযুগৃহে বাসং মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ' অপ্রিয়বাদিনীর সহিত একত্রে বাস সর্প সহিত বাসের তুল্য। এই সকল দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে দুষ্টা স্ত্রী পুরাকালে রীতিমত শাসিত হইত।

মনু বলিয়াছেন 'স্ত্রীলোককে বেত্রাঘাত দ্বারা শাসনে রাখিবে ; শংখ বলিয়াছেন :—

লালনীয়া সদা ভার্য্যা তাড়নীয়া তথৈবচ।
লালিতা তাড়িতাচৈব স্ত্রী শ্রীর্ভবতি নান্যথা॥

অর্থাৎ স্ত্রীগণ সর্ব্বদা লালনীয়া এবং তদ্রূপই তাড়নীয়া ; কেন না এরূপ করিলেই স্ত্রী শ্রী (লক্ষ্মী) স্বরূপা হন।' দক্ষ বলিয়াছেন 'প্রথম অবধিই স্ত্রীলোককে শাসনে রাখা কর্ত্তব্য। এই সকল দৃষ্টেই তদানীন্তন কালে সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থা উত্তম রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতেছে ; ইহার উপর আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই ; তবে এক্ষণে বিধবাগণ সমাজে কি প্রকার স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাই প্রদর্শন করা যাইতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

আর্য্য পঞ্জিকা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চ যদি একের কম না হয় তবে (৩) দ্বারা সময় শুদ্ধরূপে স্থির হইতে পারে না। কারণ চ এর সপ্তমাদি শক্তি ত্যাগ করা হইয়াছে এবং চ একের অধিক হইলে ঐ সকল রাশি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে।

পাশ্চাত্য নৌ পঞ্জিকা (nautical almanac) হইতে গণনা করিলে দেখা যায় ইংরাজি ১৮৮৫ সনের ১লা জানুয়ারি মধ্যাহ্নের .৩৪৬৪ দিনাংশ পূর্ব্বে সূর্য্য শীঘ্রোচ্চে ছিল। গ্রীনউইচ হইতে ঢাকার দেশান্তর (longitude) ৯০½ অংশ ধরিয়া দেখা যায় গ্রীণউইচে মধ্যাহ্ন সময়ে ঢাকা অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা ২ মিনিট বা .২৫১৪ দিনাংশ। প্রাচীন রীত্যনুসারে অর্দ্ধরাত্রি হইতে গণনা করিলে .৭৫১৪ দিনাংশ হয়। অতএব অর্দ্ধরাত্রি হইতে গণনা করিয়া ১৮৮৫ সনের ১লা জানুয়ারি ঢাকাতে .৪০৫০ সময়ে সূর্য্য শীঘ্রোচ্চে আসিয়াছিল। এক উচ্চাবর্ত্তের মান ৩৬৫.২৫৯৫৪৪ দিন, অতএব প্রত্যেক বৎসরের জন্য উক্ত রাশি যোগ করিয়া অভীপ্সিত বর্ষের কোন্ সময়ে সূর্য্য শীঘ্রোচ্চে আসিবে তাহা স্থির হইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রাচীন মতে একটি উপবৃত্তের অবতারণা করিয়া গ্রহদিগের স্ফুট স্থান গণনা করা হয়। সেইরূপ গণনা করার যে প্রণালী তাহার সারাংশ নিম্নে প্রকটিত হইল।

মনে কর ম ন শ গ্রহ কক্ষা, স উপবৃত্তে গ্রহের সংস্থান, প কক্ষাতে উহার স্ফুট

স্থান। প ন এর উপর স চ লম্ব। প পৃথিবী ন মধ্যগতিবিশিষ্ট নক্ষত্র। স ন ম প শ এর সমান্তরাল ন প শ = ম (মধ্যকেন্দ্র) অতএব সচ = জ্যা সনচ = জ্যা নপশ = জ্যাম নকপ ও সচপ দুই সদৃশ ত্রিভুজ, অতএব নক =

$$\frac{\text{সচ} \times \text{পক}}{\text{পস}} = \frac{\text{সচ} \times \text{পক}}{\sqrt{(\text{পচ}^2 + \text{সচ}^2)}} = \frac{\text{জ্যাম} \times \text{ত্রিজ্যা}}{\sqrt{(\text{জ্যা}^2\text{ম} + \text{ত্রিজ্যা}^2)}}$$

এইরূপে নক স্থির করিয়া শক অর্থাৎ গ্রহের স্ফুট স্থান স্থির করা যাইতে পারে। * এই মতে গণনার জন্য সূর্য্যসিদ্ধান্তাদি গ্রন্থে ৩ অংশ ৪৫ কলা অন্তর প্রথম হইতে ৯০ অংশ

* সূর্য্যসিদ্ধান্ত ২ অঃ ৪১। ৪২ শ্লোক দেখ।

পর্য্যন্ত সকল কোণের জ্যা পিণ্ড (Sine) দেওয়া আছে। প্রাচীন মতে ব্যাসার্দ্ধকে ভাজক মনে করিয়া মাত্র একটি রেখা টানিয়া জ্যাদি প্রকাশ করা হইত। ত্রিজ্যা শব্দে ত্রিরাশি বা ৯০ অংশের জ্যা বুঝায়। উপরোক্ত ক্ষেত্রে সনচ এক সমকোণ হইলে সচ=সন ব্যাসার্দ্ধ, অতএব ব্যাসার্দ্ধ ত্রিজ্যার সমান এবং উহার কোণগত পরিমাণ ৫৭.২৯৫৭৭৯৫ অংশ=৩৪৩৭.৭৪৬৭৭ কলা। ইহাকে সূর্য্যসিদ্ধান্ত ৩৪৩৮ কলা ধরিয়াছেন।

আধুনিক নিয়মে গণনা করিতে হইলেও ঐরূপ জ্যাদি পিণ্ড জানা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিধায় প্রথম হইতে ৯০ অংশ পর্য্যন্ত প্রতি অংশের জ্যা (Sine) কোটিজ্যা (Cosine) কোটি (tangent) ও ভুজ (cotangent) এর এক খণ্ড পর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল। যদি কোণ ৯০ অংশের অধিক এবং ১৮০ অংশের ন্যূন হয়, তবে উহা ১৮০ হইতে বিয়োগ করিয়া জ্যা ভিন্ন সমুদায় ঋণাত্মক (negative) রূপে নিতে হইবে ; ১৮০ ও ২৭০ অংশের মধ্যে স্থিত হইলে ১৮০ বিয়োগ করিয়া জ্যা ও কোটি জ্যা ঋণাত্মক এবং কোটি ও ভুজ ধনাত্মক রূপে নিতে হইবে ; আর ২৭০ ও ৩৬০ অংশের মধ্যে স্থিত হইলে কোটি জ্যা ভিন্ন সমুদায় ঋণাত্মক রূপে নিতে হইবে। বাম পার্শ্বোক্ত কোন কোণ হইলে উপরে লেখা অনুসারে জ্যাদি ধরিবে এবং দক্ষিণ পার্শ্বোক্ত কোন কোণ হইলে নীচের লেখা অনুসারে জ্যাদি ধরিবে। যথা ৩০ অংশের জ্যা .৫ এবং ৬০ অংশের জ্যা .৮৬৬০২৫। পূর্ণ সংখ্যক অংশ না হইয়া ভগ্নাংশ থাকিলে তাহার পার্শ্বস্থ জ্যাদির অন্তর নিয়া অনুপাত দ্বারা কত যোগ কি বিয়োগ করিতে হইবে তাহা স্থির করিবে। যেমন ৩০ ও ৩১ অংশের জ্যার অন্তর .০১৫০৩৮ কে ২ দ্বারা ভাগ করিয়া .০০৭৫১৯, ৩০ অংশের জ্যাতে যোগ অথবা ৩১ অংশের জ্যা হইতে বিয়োগ করিয়া ৩০ ½ অংশের জ্যা ৫.০০৭৫১৯ হইল।

১৮০৭ শকের মেষ সংক্রান্তি গণনা করিতে শ (শীঘ্রোচ্চ হইতে সূর্য্যের স্ফুট) =৯৯.৮৩৬১ অংশ, শ/২=৪৯.৯১৮০৫।

৫০ অংশের কোটি=১.১৯১৭৫৪
৪৯ " " =১.১৫০৩৬৮

১ অংশের অন্তর .০৪১৩৮৬

শেষোক্ত অন্তরকে ভগ্নাংশ .৯১৮০৫ দ্বারা গুণ করিয়া উক্ত ভগ্নাংশের জন্য অন্তর .০৩৭৯৯৪ পাওয়া গেল। তাহা ৪৯ অংশের কোটিতে যোগ করিয়া শ/২ এর কোটি ১.১৮৮৩৬২ হইল। উহাকে .৯৮৩৩৫ দ্বারা গুণ করিয়া ক/২ এর কোটি ১.১৬৮৫৭৬ পাওয়া গেল। খণ্ড দেখিলে দেখা যায় এই রাশি ৪৯ ও ৫০ অংশের কোটির মধ্যস্থিত এবং ৪৯ এর কোটি হইতে উহাদের অন্তর .০১৮২০৮ হয়। এই অন্তরকে এক অংশের অন্তর .০৪১৩৮৬ দ্বারা ভাগ করিয়া ৪৯ অংশের উপর .৪৩৯৯ ভগ্নাংশ পাওয়া গেল। অতএব ক/২=৪৯.৪৩৯৯ এবং ক=৯৮.৮৭৯৮ হইল। ক ৯০ ও ১৮০ অংশের মধ্য স্থিত বিধায় ১৮০ হইতে ক বিয়োগ করিয়া ৮১.১২০২ অংশের জ্যা ধন ভাবে নিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে ৮১ ও ৮২ অংশের জ্যার

ভুজজ্যা, কোটিজ্যা। কোটি ও ভুজ খণ্ড।

কোণঅংশ	ভুজজ্যা	কোটিজ্যা	কোটি	ভুজ	
১	.০১৭৪৫২	.৯৯৯৮৪৮	.০১৭৪৫৫	৫৭.২৮৯৯৬	৮৯
২	.০৩৪৮৯৯	.৯৯৯৩৯১	.০৩৪৯২১	২৮.৬৩৬২৫	৮৮
৩	.০৫২৩৩৬	.৯৯৮৬৩০	.০৫২৪০৮	১৯.০৮১১৪	৮৭
৪	.০৬৯৭৫৬	.৯৯৭৫৬৪	.০৬৯৯২৭	১৪.৩০০৬৭	৮৬
৫	.০৮৭১৫৬	.৯৯৬১৯৫	.০৮৭৪৮৯	১১.৪৩০০৫	৮৫
৬	.১০৪৫২৮	.৯৯৪৫২২	.১০৫১০৪	৯.৫১৪৩৬৪	৮৪
৭	.১২১৮৬৯	.৯৯২৫৪৬	.১২২৭৮৫	৮.১৪৪৩৪৬	৮৩
৮	.১৩৯১৭৩	.৯৯০২৬৮	.১৪০৫৪১	৭.১১৫৩৭০	৮২
৯	.১৫৬৪৩৪	.৯৮৭৬৮৮	.১৫৮৩৮৪	৬.৩১৩৭৫২	৮১
১০	.১৭৩৬৪৮	.৯৮৪৮০৮	.১৭৬৩২৭	৫.৬৭১২৮২	৮০
১১	.১৯০৮০৯	.৯৮১৬২৭	.১৯৪৩৮০	৫.১৪৪৫৫৪	৭৯
১২	.২০৭৯১২	.৯৭৮১৪৮	.২১২৫৫৭	৪.৭০৪৬৩০	৭৮
১৩	.২২৪৯৫১	.৯৭৪৩৭০	.২৩০৮৬৮	৪.৩৩১৪৭৬	৭৭
১৪	.২৪১৯২২	.৯৭০২৯৬	.২৪৯৩২৮	৪.০১০৭৮১	৭৬
১৫	.২৫৮৮১৯	.৯৬৫৯২৬	.২৬৭৯৪৯	৩.৭৩২০৫১	৭৫
১৬	.২৭৫৬৩৭	৯৬১২৬২	.২৮৬৭৪৫	৩.৪৮৭৪১৪	৭৪
১৭	.২৯২৩৭২	.৯৫৬৩০৫	.৩০৫৭৩১	৩.২৭০৮৫৩	৭৩
১৮	.৩০৯০১৭	.৯৫১০৫৬	.৩২৪৯২০	৩.০৭৭৬৮৪	৭২
১৯	.৩২৫৫৬৮	.৯৪৫৫১৯	.৩৪৪৩২৮	২.৯০৪২১১	৭১
২০	.৩৪২০২০	.৯৩৯৬৯৩	.৩৬৩৯৭০	২.৭৪৭৪৭৭	৭০
২১	.৩৫৮৩৬৮	.৯৩৩৫৮০	.৩৮৩৮৬৪	২.৬০৫০৮৯	৬৯
২২	.৩৭৪৬০৭	.৯২৭১৮৪	.৪০৪০২৬	২.৪৭৫০৮৭	৬৮
২৩	.৩৯০৭৩১	.৯২০৫০৫	.৪২৪৪৭৫	২.৩৫৫৮৫২	৬৭
২৪	.৪০৬৭৩৭	.৯১৩৫৪৫	.৪৪৫২২৯	২.২৪৬০৩৭	৬৬
২৫	.৪২২৬১৮	.৯০৬৩০৮	.৪৬৬৩০৮	২.১৪৪৫০৭	৬৫
২৬	.৪৩৮৩৭১	.৮৯৮৭৯৪	.৪৮৭৭৩৩	২.০৫০৩০৪	৬৪
২৭	.৪৫৩৯৯১	.৮৯১০০৭	.৫০৯৫২৫	১.৯৬২৬১১	৬৩
২৮	.৪৬৯৪৭২	.৮৮২৯৪৮	.৫৩১৭০৯	১.৮৮০৭২৭	৬২
২৯	.৪৮৪৮১০	.৮৭৪৬২০	.৫৫৪৩০৯	১.৮০৪০৪৮	৬১
৩০	.৫০০০০০	.৮৬৬০২৫	.৫৭৭৩৫০	১.৭৩২০৫১	৬০
৩১	.৫১৫০৩৮	.৮৫৭১৬৭	.৬০০৮৬১	১.৬৬৪২৮০	৫৯
৩২	.৫২৯৯১৯	.৮৪৮০৪৮	.৬২৪৮৬৯	১.৬০০৩৩৫	৫৮
৩৩	.৫৪৪৬৩৯	.৮৩৮৬৭১	.৬৪৯৪০৮	১.৫৩৯৮৬৫	৫৭
৩৪	.৫৫৯১৯৩	.৮২৯০৩৮	.৬৭৪৫০৯	১.৪৮২৫৬১	৫৬
৩৫	.৫৭৩৫৭৬	.৮১৯১৫২	.৭০০২০৮	১.৪২৮১৪৮	৫৫
৩৬	.৫৮৭৭৮৫	.৮০৯০১৭	.৭২৬৫৪৩	১.৩৭৬৩৮২	৫৪
৩৭	.৬০১৮১৫	.৭৯৮৬৩৬	.৭৫৩৫৫৪	১.৩২৭০৪৫	৫৩
৩৮	.৬১৫৬৬১	.৭৮৮০১১	.৭৮১২৮৬	১.২৭৯৯৪২	৫২
৩৯	.৬২৯৩২০	.৭৭৭১৪৬	.৮০৯৭৮৪	১.২৩৪৮৯৭	৫১
৪০	.৬৪২৭৮৮	.৭৬৬০৪৪	.৮৩৯১০০	১.১৯১৭৫৪	৫০
৪১	.৬৫৬০৫৯	.৭৫৪৭১০	.৮৬৯২৮৭	১.১৫০৩৬৮	৪৯
৪২	.৬৬৯১৩১	.৭৪৩১৪৫	.৯০০৪০৪	১.১১০৬১৩	৪৮
৪৩	.৬৮১৯৯৮	.৭৩১৩৫৪	.৯৩২৫১৫	১.০৭২৩৬৯	৪৭
৪৪	.৬৯৪৬৫৮	.৭১৯৩৪০	.৯৬৫৬৮৯	১.০৩৫৫৩০	৪৬
৪৫	.৭০৭১০৭	.৭০৭১০৭	১.০০০০০০	১.০০০০০০	৪৫
	কোটিজ্যা	ভুজজ্যা	ভুজ	কোটি	কোণ অংশ

অন্তর .০০২৫৮ কে .১২০২ দ্বারা গুণ করিয়া .০০০৩১ কে ৮১ অংশের জ্যা .৯৮৭৬৮৮ তে যোগ করিয়া ক এর জ্যা .৯৮৭৯৯৮ হইল। ইহাকে .৯৬১৫৭ দ্বারা গুণ করিয়া .৯৫০০৩ পাওয়া গেল। উহা ক হইতে বিয়োগ করিয়া (২) দ্বারা ম=৯৭.৯২৯৮ হইল। এই রাশিকে সূর্য্যের দৈনিক গতি .৯৮৫৫দ্বারা ভাগ করিয়া স=৯৯.৩৭০৭ দিন পাওয়া গেল।

১৮০৭ শকের সমুদায় সংক্রান্তি গণনা করিয়া তাহার ফল নিম্নে দেওয়া গেল।

সংক্রান্তির নাম	শ	ক	ম	স	মাসের মান	প্রাচীনমতে মাসের মান
শক ১৮০৭						
মেষ	৯৯.৮৭৬১	৯৮.৮৭৯৮	৯৭.৯২৯৮	৯৯.৩৭০৭		
বৃষ	১২৯.৮৩৬১	১২৯.০৮০৬	১২৮.৩৩৪২	১৩০.২২২৫	৩০.৮৫১৮	৩০.৯৪৭০
মিথুন	১৫৯.৮৭৬১	১৫৯.৪৮১৮	১৫৯.১৪৪৭	১৬১.৪৮৬২	৩১.২৬৩৭	৩১.৪২৭৫
কর্কট	১৮৯.৮৩৬১	১৮৯.৯৭১২	১৯০.১৩৭৭	১৯২.৯৩৫২	৩১.৪৪৯০	৩১.৬৪৩১
সিংহ	২১৯.৮৩৬১	২২০.৪৬১০	২২১.০৮৯০	২২৪.৩৪২০	৩১.৪০৬৮	৩১.৪৬৮৫
কন্যা	২৪৯.৮৩৬১	২৫০.৭৬৪৮	২৫১.৬৭২৬	২২৫.৩৭৫৬	৩১.০৩৩৬	৩১.০০৫৬
তুলা	২৭৯.৮৩৬১	২৮০.৭৮৭২	২৮১.৭৩১৭	২৮৫.৮৭৬৮	৩০.৫০১২	৩০.৪২৭৮
বৃশ্চিক	৩০৯.৮৩৬১	৩১০.৫৭২৮	৩১১.৩০৩২	৩১৫.৮৮৩৪	৩০.০০৬৬	২৯.৮৮০৮
ধনুঃ	৩৩৯.৮৩৬১	৩৪০.১৬৫০	৩৪০.৪৯১২	৩৪৫.৫০১০	২৯.৬১৭৬	২৯.৪৮৩৬
মকর	৯.৮৩২৯	৯.৬৭৭০	৯.৫১৫৩	৯.৬৫৫৪	২৯.৪১৩৯	২৯.৩১৯২
কুম্ভ	৩৯.৮৩২৯	৩৯.২১৯০	৩৮.৬১১০	৩৯.১৭৯১	২৯.৫২৩৭	২৯.৪৫৬৪
মীন	৬৯.৮৩২৯	৬৮.৯২৮২	৬৮.০৩০৯	৬৯.০৩১৯	২৯.৮৫২৮	২৯.৮৩৪১
মেষ	৯৯.৮৩২৯	৯৮.৮৭৬৮	৯৭.৯২৬৮	৯৯.৩৬৭৬	৩০.৩৩৫৭	৩০.৩৬৭৫
				বর্ষমান	৩৬৫.২৫৬৪	৩৬৫.২৫৮৪

পৌষ মাসের মান স্থির করিতে ঔচ্চ বর্ষের মান ৩৬৫.২৫৯৫ হইতে ধনুঃ সংক্রান্তি বিয়োগ করিয়া মকর সংক্রান্তি যোগ করা হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় প্রাচীন মতে গণনা করিলে এক বর্ষে মাত্র .০০২ দিন অর্থাৎ ৭ পলের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। মাসের মানে অধিক পার্থক্য দেখা যায় তাহা যে আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ দিগের গণনার ভ্রম হইয়াছে তাহা নহে। উহার কারণ এই যে শীঘ্রোচ্চ ক্রমেই মেষের দিকে সরিয়া আসিতেছে এবং যেহেতু শীঘ্রোচ্চের নিকটে সূর্য্যের গতি শীঘ্র এবং মন্দোচ্চের নিকটে মন্দ, মাসের মান এক দিকে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং অপর দিকে কমিতেছে।

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে ১৮৮৫ সনের ১লা জানুয়ারি বৃহস্পতি বার ঢাকাতে অর্দ্ধ রাত্রি হইতে গণনা করিয়া দিবা .৪০৫০ সময়ে সূর্য্য শীঘ্রোচ্চে ছিল এবং উহার ৯৯.৩৭০৭ দিন পরে মেষ সংক্রান্তি হইবে। অতএব ১০ই এপ্রিল শুক্রবার পূর্ব্ব, অর্দ্ধ

রাত্রি হইতে .৭৭৫৭ সময়ে অর্থাৎ সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে মেষ সংক্রান্তি হইবে। প্রাচীন মতে গণনা করিলে শনিবার প্রাতঃকাল হইতে গণনা করিয়া ৪৭ দণ্ড ৩২ পলে মেষ সংক্রান্তি হয়। যুগ পরিবর্ত্তনে এই এক দিনের পার্থক্য বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

জ্যোতিঃশাস্ত্রে দিন গণনা অর্দ্ধরাত্রি হইতে হইয়া থাকে; কিন্তু সাধারণ ব্যবহারে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত দিন গণনা করা হয়। অতএব সূর্য্যোদয়ের সময় কিরূপে স্থির হইতে পারে তাহা জানা আবশ্যক। সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সময় স্থির করিতে প্রথম সূর্য্যের ক্রান্তি (declination) স্থির করিতে হইবে। মনে কর ক্র=ক্রান্তি, অ=বিষুবদ্ ও রাশিচক্রের অবনতি (২৩.৪৫৭০৬ অংশ)। এই অবনতি বর্ষে বর্ষে কিছু কমিয়া থাকে, কিন্তু উহার হার এত সূক্ষ্ম যে এক বৎসরে .০০০৩৮ অংশ অপেক্ষা অধিক হইবে না। ক্রান্তিপাত হইতে সূর্য্যের দূরত্ব=দ। ক্রান্তিপাতের পশ্চিমাভিমুখ গতি বশতঃ বর্ষে বর্ষে এক সময়ে সূর্য্যের দূরত্ব সমান থাকিবে না। এক এক বৎসরে .০১৩৯৫ অংশ যোগ করিয়া স্ফুট দ পাওয়া যাইবে।

জ্যাক্র=জ্যা অ × জ্যা দ

এই নিয়মে অভীপ্সিত সময়ে সূর্য্যের ক্রান্তি স্থির করা যাইতে পারে।

মনে কর ককেন্দ্র (pole) সক্ষ ক্ষিতিজ বৃত্ত (harizon) স সূর্য্য, কস=৯০—ক্র, কক্ষ=লম্ব (colatitude)=৯০—অক্ষাংশ (latitude) স কক্ষ কোণ ৩৬০ অংশ হইলে এক অহোরাত্র বা ৬০ দণ্ড হয়। অতএব ন যদি নত দণ্ড বা নাড়ীর সংখ্যা হয় তবে সকক্ষ=৬ন। অতএব কোটি জ্যা সকক্ষ=কোটি কস × ভুজ কক্ষ অতএব কোটি জ্যা ৬ন=কোটি ক্র × কোটিঅক্ষ (৫)। ঢাকার অক্ষাংশ (latitude) ২৩.৭৫ এবং উহার কোটি .৪৩৪৮৫২। ১৮০৭ শকের মেষ সংক্রান্তি দিন সূর্য্যোদয় স্থির করিতে হইলে সেই দিন ক্রান্তিপাত হইতে সূর্য্যের দূরত্ব ২০.৭৯৭২ অংশ এবং উহার জ্যা .৩৫৫০৫৩। অ=২৩.৪৫৭৫৬ এবং উহার জ্যা = .৩৯৮০৪৬ ইহাদিগের গুণ ফল জ্যাক্র=.১৪১৩২৭ অতএব ক্র=৮.১২৪৮ অংশ এবং কোটি ক্র=.১৪২৭৬৮। এইক্ষণ (৫) দ্বারা কোটি জ্যা ৬ন.= —.১৪২৭৬৮ × .৪৩৪৮৫২ = —.০৬১৯৩২।
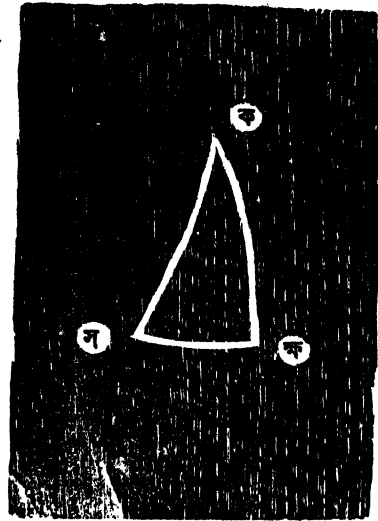
৮৬.৩৯১৮ অংশের কোটি .০৬২০৪৩ এই স্থলে ঋণাত্মক বিধায় ৬ন=১৮০—৮৬.৩৯১৮

= ৯৩.৬০৮২, ন = ১৫.৬০১৩ অর্থাৎ মধ্যাহ্ন হইতে ১৫.৬০১৩ দণ্ড পূর্ব্বে সূর্য্যোদয় এবং ১৫.৬০১৩ দণ্ড পরে সূর্য্যাস্ত হইবে। অতএব উক্ত তারিখে ঢাকাতে দিনমান ৩১.২০২৬ দণ্ড অর্থাৎ ৩১ দণ্ড ১১ পল হইল। প্রাচীন মতে যে সকল পঞ্জিকা গণনা করা হয় তাহাতে দিনমান ৩১ দণ্ড ৫ পল আছে। তাঁহারা কলিকাতা অঞ্চলের অক্ষাংশ ধরিয়া গণনা করেন বিধায় এই ৬ পলের পার্থক্য ঘটিয়াছে। কারণ ঢাকা অপেক্ষা কলিকাতা বিষুবদ্বৃত্তের নিকটবর্ত্তী অতএব ঢাকাতে দিনমান হ্রাস বৃদ্ধি হওয়ার হার কলিকাতা অপেক্ষা অধিক। সুতরাং দিনমান বৃদ্ধির সময় ঢাকাতে দিনমান অধিক এবং হ্রাসের সময় কম হইবে।

অর্দ্ধরাত্রি হইতে গণনা করিলে মেষ সংক্রান্তি দিবস ১৪.৩৯৮৭ দণ্ডে সূর্য্যোদয় এবং ৪৫.৬০১৩ দণ্ডে সূর্য্যাস্ত হইবে। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে উক্ত তারিখে .৭৭৫৭ দিনাংশে সংক্রমণ হইবে। এই রাশিকে ৬০ দ্বারা গুণ করিয়া দণ্ড করিলে ৪৬.৫৪২ হয়। অতএব প্রাচীন গণনার ২৯শে চৈত্র, ইংরাজি ১৮৮৫ সনের ১০ই এপ্রিল শুক্রবার প্রাতঃকাল হইতে ৩২.১৪৩৩ দণ্ডে অর্থাৎ ৩২ দণ্ড ৮ পল ৩৬ বিপলে অথবা রাত্রি ৫১ পল ৫৫ বিপলে সূর্য্য মেষের প্রারম্ভ বিন্দুতে আসিবে এবং ঐ সময় যথার্থ মেষ সংক্রান্তি হইবে।

পৃথিবীকে কেন্দ্র মনে করিয়া জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের গতির (geocentric motion) বিষয় আলোচনা করাই আর্য্য জ্যোতিঃ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। অতএব সূর্য্যকে গ্রহ-শ্রেণীভুক্ত করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। প্রাচীন সময়ে যে সকল গ্রহ ও উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাদিগকে দূরত্ব অনুসারে সংস্থাপন করিলে তাহাদিগের ক্রম শনি, বৃহস্পতি মঙ্গল, সূর্য্য, শুক্র, বুধ ও চন্দ্র হয়। এই সকল গ্রহকে এক এক দিনের অধিপতি মনে করিয়া তাহার বার বলা হয়। যথা যে দিনের অধিপতি শনি তাহাকে শনিবার বলা যায় ইত্যাদি। রাশির অর্দ্ধেককে হোরা বলে এবং ১২ রাশিতে ২৪ হোরা হয়। পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনের গতিকে এই ২৪ হোরার সমুদয় প্রতিদিন ক্ষিতিজে উদিত হইয়া থাকে উপরোক্ত ৭ গ্রহকে পর্য্যায় ক্রমে ঐ সকল হোরার অধিপতি মনে করিলে প্রথম অষ্টম, পঞ্চদশ, ও দ্বাবিংশ হোরার অধিপতি শনি, দ্বিতীয়, নবম, ষোড়শ ও ত্রয়োবিংশ হোরার অধিপতি বৃহস্পতি তৃতীয়, দশম, সপ্তদশ, ও চতুর্ব্বিংশ হোরার অধিপতি মঙ্গল, চতুর্থ, একাদশ, অষ্টাদশ ও পঞ্চবিংশ হোরার অধিপতি সূর্য্য ইত্যাদি। পঞ্চবিংশ হোরা দ্বিতীয় দিবসের প্রথম হোরা। অতএব যে দিবস প্রথম হোরার অধিপতি শনি তাহার পর দিবস প্রথম হোরার অধিপতি সূর্য্য হইবে। পুনঃ সূর্য্য হইতে ক্রমে গণনা করিলে পঞ্চবিংশ হোরার অধিপতি চন্দ্র হয়, অতএব তৃতীয় দিবসীয় প্রথম হোরার অধিপতি চন্দ্র। এইরূপ ক্রমে গণনা করিয়া দেখা যাইবে চতুর্থ দিবসীয় প্রথম

হোরার অধিপতি মঙ্গল, পঞ্চম দিবসীয় বুধ, ষষ্ঠ দিবসীয় বৃহস্পতি, এবং সপ্তম দিবসীয় শুক্র হইবে। এইরূপ যে দিবসের প্রথম হোরার অধিপতি যে গ্রহ সেই দিবসকে উক্ত গ্রহেরই বার বলিলে তাহাদের ক্রম শনি, রবি (সূর্য্য) সোম (চন্দ্র), মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র হয়। অষ্টম দিবস হইতে পুনঃ শনি আদি হইবে। আর্য্যগণ সূর্য্যকে সর্ব্বপ্রধান মনে করিয়া রবি হইতে বার গণনা করিয়াছেন এবং ১ রবি, ২ সোম, ৩ মঙ্গল, ৪ বুধ, ৫ বৃহস্পতি, ৬ শুক্র ও ৭ শনি ধরিয়া থাকেন।
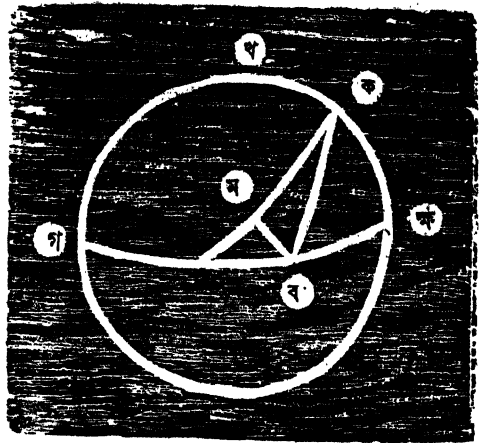
রাশি চক্রের যে রাশি যখন ক্ষিতিজে (horizon) থাকে তখন সেই লগ্নের উদয় বলা হয়। যথা যে সময়ে মেষ রাশি ক্ষিতিজে থাকে সেই সময় মেষোদয় বা মেষ লগ্ন বলা হয়। পৃথিবীর আবর্ত্তনের গতিকে এক অহোরাত্রে প্রত্যেক রাশিই একবার ক্ষিতিজে থাকে। সূর্য্য যখন যে রাশিতে অবস্থিত থাকে তখন সেই লগ্নের উদয় প্রাতঃকালে হইয়া থাকে এবং তাহার সপ্তম লগ্ন সূর্য্যাস্তের সময় উদিত হয়। কোন লগ্নের মান স্থির করিতে সেই রাশির প্রান্তদ্বয়ের নতাসু (hour angles) যদি ন, ন´ এবং উদয়াসু (Right ascensions) উ উ´ হয় তবে লগ্নের মান ম = উ´ — উ — (ন´ — ন).

কারণ, মনে কর কখগ যাম্যোত্তর বৃত্ত (meridian) খ খমধ্য (Zenith) ক কেন্দ্র (pole) ম ও ব কোন রাশির প্রান্তদ্বয়,

গঘক্ষ ক্ষিতিজ (horizon) খকম = ৬ (ন — ম)
খকব = ৬ন´
৬ (উ´-উ) = মকব = ৬ন´ — ৬(ন — ম)
ন স্থির করার নিয়ম পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। উ স্থির করিতে হইলে কোটি উ = কোটিজ্যা অ × কোটি দ এই নিয়মে স্থির করিতে হইবে। মেষের প্রারম্ভ বিন্দুতে দ = ২০.৭৯৭২ অংশ এবং উহার কোটি = .৩৭৯৮২৯, কোটি জ্যা অ = .৯১৭৩২৫ ইহাদের গুণ ফল = .৩৪৮৪২৭। শেষোক্ত রাশি ১৯.২০৬৮ অংশের কোটি। এই কোণকে ৬ দ্বারা ভাগ করিয়া দণ্ডে বা নাড়ীতে প্রকাশ করিলে উ = ১/৬ × ১৯.২০৮৬ = ৩.২০১৪ দণ্ড। এই প্রণালীতে উদয়াসু এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মে নতাসু স্থির করিয়া (৬) দ্বারা লগ্নমান স্থির করার ফল নিম্নে দেওয়া গেল।

শক১৮০৭	নতাসু	উদয়াসু	নতাসুর অন্তর	উদয়াসুর অন্তর	লগ্নমান
মেষ	১৫.৬০১২	৩.২০১৪	.৫৮৩২	৪.৮৫৭৯	৪.২৭৪১
বৃষ	১৬.১৮৪৪	৮.০৫৯৩	.৬০০২	৫.২৭৪২	৪.৬৭৪০
মিথুন	১৬.৭৮৪৬	১৩.৩৩৩৫	–.১১১২	৫.৪১৫৪	৫.৫২৬৬
কর্কট	১৬.৬৭৩৪	১৮.৭৪৮৯	–.৫৯১৫	৫.১১৬৯	৫.৭০৮৪
সিংহ	১৬.০৮১৯	২৩.৮৬৫৮	–.৮১৬৮	৪.৭২৫২	.৫৪২০
কন্যা	১৫.২৬৫১	২৮.৫৯১০	–.৮৬৬৫	৪.৬১০৪	.৪৭৬৯
তুলা	১৪.৩৯৮৬	৩৩.২০১৪	–.৫৮৩০	৪.৮৫৭৯	.৪৪০৯
বৃশ্চিক	১৩.৮১৫৬	৩৮.০৫৯৩	–.৬০০৪	৫.২৭৪২	.৮৭৪৬
ধনুঃ	১৩.২১৫২	৪৩.৩৩৩৫	.১১১৪	৫.৪১৫৪	.৩০৪০
মকর	১৩.৩২৬৬	৪৮.৭৪৮৯	.৫৯১৫	৫.১১৬৯	৪.৫২৫৪
কুম্ভ	১৩.৯১৮১	৫৩.৮৬৫৮	.৮১৬৮	৪.৭২৫২	৩.৯০৮৪
মীন	১৪.৭৩৪৯	৫৮.৫৯১০	.৮৬৬৩	৪.৬১০৪	৩.৭৪৪১
					৬০.০০০০

অতএব দেখাযায় মাত্র সূর্য্য গতিদ্বারা আর্য্যপঞ্জিকাতে বর্ষ, মাস, তারিখ, দিনমান, বার ও লগ্ন স্থির হয়। ইহাদিগের মধ্যে প্রথম দুটি সূর্য্যের বার্ষিক গতি হইতে এবং অপর চারিটি তাহার আহ্নিক গতি হইতে গণনা করা হয়।

সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্রেরও দুইপ্রকার গতি আছে (১) পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে (২) স্বকীয় মেরুদণ্ডে আবর্ত্তিত হইতেছে। চন্দ্রের গতি সূর্য্যের ন্যায় তত সূক্ষ্ম নহে, চন্দ্র প্রায় ২৭⅓দিনে একবার পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আসে। উহার আবর্ত্তনও ঠিক ঐ সময়ে পূর্ণ হইয়া থাকে, কারণ চন্দ্র যেস্থানে কেন না থাকুক তাহার একদেশই সর্ব্বদা পৃথিবীর দিকে থাকে। যেমন এক ব্যক্তি যদি দক্ষিণ মুখ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং অপর এক ব্যক্তি উত্তর মুখ হইয়া তাহাকে বেষ্টন করে, তবে শেষোক্ত ব্যক্তি যখন দক্ষিণে থাকিবে তখন তাহার সম্মুখ, পূর্ব্বে থাকিলে বামপার্শ্ব উত্তরে থাকিলে পৃষ্ঠদেশ এবং পশ্চিমে থাকিবে দক্ষিণ পার্শ্ব প্রথমোক্ত ব্যক্তির দিকে থাকিবে। কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি যদি বেষ্টন করার হার মতে একটু একটু বামপার্শ্বে আবর্ত্তিত হয় তবে সর্ব্বদাই তাহার মুখ প্রথমোক্ত ব্যক্তির দিকে থাকিবে। সেইরূপ চন্দ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করার সঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় মেরুদণ্ডে একটু একটু আবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া আমরা সর্ব্বদাই চন্দ্রের একদেশ দেখিতে পাই। চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় পদার্থ নহে, উহা পৃথিবীর ন্যায় যখন সূর্য্যালোকে আলোকিত হয়, কেবল তখনই দেখা যাইতে পারে। একটি গোল পদার্থের মাত্র অর্দ্ধেক এক সময়ে আলোকিত হইতে পারে, অতএব চন্দ্রের যে অর্দ্ধেক সূর্য্যদ্বারা আলোকিত হয়, যদি ঠিক সেই অর্দ্ধেক পৃথিবীর দিকে থাকে, অর্থাৎ যদি পৃথিবী ও

সূর্য্য চন্দ্রের এক দিকে সমসূত্রে থাকে, তবে চন্দ্রকে সম্পূর্ণ গোল দেখাযায় এবং সেই দিনকে আমরা পূর্ণিমা বলি। সূর্য্য দ্বারা চন্দ্রের যে অর্দ্ধেক আলোকিত হয়, যদি তাহার বিপরীত অন্ধকারাচ্ছন্ন অর্দ্ধেক পৃথিবীর দিকে থাকে অর্থাৎ পৃথিবী ও সূর্য্য যদি চন্দ্রের বিপরীতদিকে সমসূত্রে থাকে তবে আমরা চন্দ্রের কিছুই দেখিতে পারি না। ঐ দিনকে অমাবস্যা বলে। অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্রের যে অংশ দেখা যায় তাহা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এবং পূর্ণিমা হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ঐ অংশ ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে। এক অমাবস্যা হইতে অপর অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে সময় তাহাকে এক চান্দ্রমাস বলে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে চন্দ্র প্রায় ২৭½ দিনে একবার পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আসে এবং ২৭½ দিনে সূর্য্য যে প্রায় ২ অংশ পূর্ব্বদিকে সরে তাহা অতিক্রম করিয়া সূর্য্যের সঙ্গে সমসূত্র হইতে আরও ২ দিনের আবশ্যক। অতএব এক চান্দ্রমাসের মান প্রায় ২৯½ দিন। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব ২৪০০০০ মাইল এবং সূর্য্যের দূরত্ব ৯২০০০০০০ মাইল। সাধারণ ভাবে মনে রাখার জন্য পৃথিবীর বিষুবদ্ ব্যাসার্দ্ধ ৪০০০ মাইল ধরিয়া চন্দ্রের দূরত্ব উহার ৬০ গুণ এবং সূর্য্যের দূরত্ব এই শেষোক্ত রাশির ৪০০ গুণ মনে করা যাইতে পারে। চন্দ্র ২৭·৩২১৬৬৬ দিনে একবার পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া থাকে অতএব উহার দৈনিক মধ্যগতি ১৩.১৮ অংশ।

যে সৌরমাসে চান্দ্র মাস আরম্ভ হয়, তাহার নাম অনুসারে চান্দ্রমাসের নাম দেওয়া হয়। যথা বৈশাখ মাসে যে চান্দ্রমাস আরম্ভ হয় তাহাকে বৈশাখ বলে। সৌরমাস অপেক্ষা চান্দ্রমাসের মান ন্যূন অতএব এক সৌরমাসে ২ চান্দ্র মাস আরম্ভ হইতে পারে। এইরূপ হইলে পূর্ব্বমাস কে মল বা অধিমাস বলিয়া ত্যাগ করিতে হয়। এক সৌরবর্ষে ৩৬৫ দিন এবং এক চান্দ্রবর্ষে ২৯½×১২=৩৫৪ দিন। ইহাতে দেখাযায় এক বর্ষে ১১ দিনের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে এবং উহা পূর্ণ একমাসে পরিণত হইতে প্রায় ২⅔ বৎসরের আবশ্যক। অতএব প্রায় ২⅔ বৎসরে এক এক মলমাস হইয়া থাকে।

এক চান্দ্রমাসকে সমান ২ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক এক ভাগকে পক্ষ বলে। অমাবস্যার পর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যে পক্ষ তাহাকে শুক্ল এবং পূর্ণিমার পর অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে পক্ষ তাহাকে কৃষ্ণপক্ষ বলাযায়। এক পক্ষের ১৫ ভাগের একভাগকে অর্থাৎ এক চান্দ্রমাসের ৩০ অংশকে এক চান্দ্রদিন বা তিথি বলে। তিথি দিগের নাম যথা ১। ১৬ প্রতিপদ, ২। ১৭ দ্বিতীয়া, ৩। ১৮ তৃতীয়া, ৪। ১৯ চতুর্থী, ৫। ২০ পঞ্চমী, ৬। ২১ ষষ্ঠী, ৭। ২২ সপ্তমী, ৮। ২৩ অষ্টমী, ৯। ২৪ নবমী, ১০। ২৫ দশমী, ১১। ২৬ একাদশী, ১২। ২৭ দ্বাদশী, ১৩। ২৮ ত্রয়োদশী, ১৪। ২৯ চতুর্দ্দশী, ১৫ পূর্ণিমা, ৩০ অমাবস্যা। উহার ১ হইতে ১৫ শুক্ল পক্ষ এবং ১৬ হইতে ৩০ কৃষ্ণপক্ষ।

চন্দ্র ও সূর্য্যস্ফুটের অন্তর ৩৬০ অংশ হইলে এক চান্দ্রমাস হইল। অতএব এক তিথির মান উহার ৩০ ভাগের একভাগ অর্থাৎ ১২ অংশ।* কোন তিথির মান স্থির করিতে হইলে চন্দ্রস্ফুট কলা হইতে সূর্য্যস্ফুট কলা বিয়োগ করিবে এবং প্রস্তাবিত তিথির অতীত ও গম্য ভোগ কলাকে ৬০ দ্বারা গুণ করিয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের দৈনিক গতির অন্তর দ্বারা ভাগ করিলেই উক্ত তিথির স্থিতি দণ্ড পাওয়া যাইবে।

অর্কোন চন্দ্রলিপ্তাভ্যস্তিথয়ো ভোগভাজিতাঃ।

গতা গম্যাশ্চ ষষ্টিঘ্না নাড্যো ভুক্ত্যন্তরোদ্ধৃতাঃ॥

সূর্য্যসিদ্ধান্ত ২অঃ ৬৬ শ্লোক

চন্দ্রের ভুক্তি অর্থাৎ দৈনিক মধ্য গতি ১৩.১৮ অংশ এবং সূর্য্যের .৯৮৫৫ অংশ। উহাদের অন্তর ১২.১৯৪৫ দ্বারা ভাগ করিয়া স্থিতি দণ্ড স্থির করিতে হইবে।

তিথিকে সমান ২ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক এক ভাগকে করণ বলে। করণ ১১টি, তাহাদের নাম যথা বব, বালব, কৌলব, তৈতিল, গর, বণিজ, বিষ্টি, শকুনি, চতুষ্পদ, কিংস্তুঘ্ন, নাগ। ইহাদিগের মধ্যে শকুনি, নাগ, চতুষ্পদ ও কিংস্তুঘ্ন এই চারিটিকে ধ্রুব এবং অপর ৭টিকে চর করণ বলে।† কারণ প্রথম চারিটি কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর শেষার্দ্ধে, অমাবস্যা ও শুক্লা প্রতিপদের প্রথমার্দ্ধে সর্ব্বদা স্থিররূপে অবস্থিত থাকে এবং অপর সাতটি শুক্লা প্রতিপদের শেষার্দ্ধ হইতে পর্য্যায়ক্রমে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়া থাকে। আমাদের দেশীয় পঞ্জিকাতে চর করণ ৭টিকে ক্রমে ১,২,৩,৪,৫,৬,০ দ্বারা এবং ধ্রুবকরণ ৪টিকে তাহাদের আদ্যক্ষর শ, না, চ ও কিং দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কোন্ তিথির কোন্ অর্দ্ধকে কি করণ বলা হয় তাহার একখণ্ডা নিম্নে দেওয়া গেলঃ—

তিথ্যঙ্ক	প্রথমার্দ্ধে যে করণ	শেষার্দ্ধে যে করণ
১	কিংস্তুঘ্ন	বব
২,৯,১৬,২৩	বালব	কৌলব
৩,১০,১৭,২৪	তৈতিল	গর
৪,১১,১৮,২৫	বণিজ	বিষ্টি
৫,১২,১৯,২৬	বব	বালব
৬,১৩,২০,২৭	কৌলব	তৈতিল
৭,১৪,২১,২৮	গর	বণিজ
৮,১৫,২২	বিষ্টি	বব
২৯	বিষ্টি	শকুনি
৩০	নাগ	চতুষ্পদ

চন্দ্র ও সূর্য্য স্ফুটের অন্তরকে যেরূপ তিথি বলে তাহাদিগের সমষ্টিকে সেইরূপ যোগ বলা হয়। এক২ যোগের মান ১৩ অংশ ২০ কলা অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য্য স্ফুটের সমষ্টি ৩৬০ অংশকে সমান ২৭ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক এক ভাগকে যোগ বলা হয়। যোগদিগের নাম যথা ১ বিষ্কুম্ভ, ২ প্রীতি, ৩ আয়ুষ্মান্, ৪ সৌভাগ্য, ৫ শোভন, ৬ অতিগণ্ড, ৭ সুকর্ম্মা, ৮ ধৃতি, ৯ শূল, ১০

* "থাগ্নিশৈলাস্তথা তিথেঃ"

সূর্য্যসিদ্ধান্ত ২অঃ ৬৪ শ্লোক

† সূর্য্যসিদ্ধান্ত ২অঃ ৬৭, ৬৮, ৬৯, শ্লোক দেখ।

গণ্ড, ১১ বৃদ্ধি, ১২ ধ্রুব, ১৩ ব্যাঘাত, ১৪ হর্ষণ, ১৫ বজ্র, ১৬ অসৃক, ১৭ ব্যতিপাত, ১৮ বরীয়ান্, ১৯ পরিঘ, ২০শিব, ২১ সিদ্ধ, ২২ সাধ্য, ২৩ শুভ,২৪ শুক্র, ২৫ ব্রহ্ম, ২৬ ইন্দ্র, ২৭ বৈধৃতি। কোন যোগের অতীত ও গম্য কলা রাশিকে ৬০ দ্বারা গুণ করিয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের দৈনিক গতির সমষ্টি ১৪.১৬৫৫দ্বারা ভাগ করিলে উক্ত যোগের স্থিতিদণ্ড পাওয়া যাইবে।*

রাশিচক্রকে অশ্বিনী আদি ২৭ ভাগে বিভক্ত করার কথা যে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহার যে ভাগে যখন চন্দ্র থাকে তখন তাহাকে সেই নক্ষত্র বলা যায়। যথা, যে সময়ে চন্দ্র অশ্বিনীতে থাকে তখন অশ্বিনী নক্ষত্রের ভোগ বলা যায়। কোন নক্ষত্রের স্থিতিদণ্ড স্থির করিতে হইলে চন্দ্রস্ফুট হইতে ঐ নক্ষত্রের অতীত ও গম্য ভোগকলা রাশিকে ৬০ দ্বারা গুণ করিয়া চন্দ্রের দৈনিক গতি ১৩.১৮দ্বারা ভাগ করিলে উহার স্থিতি দণ্ড পাওয়া যাইবে।

এইক্ষণ দেখা যায় তিথি, নক্ষত্র, করণ ও যোগ স্থির করিতে চন্দ্রস্ফুট না জানিলে পারা যায় না। অতএব আধুনিক মতে চন্দ্রস্ফুট স্থির করার নিয়ম নিম্নে প্রকটন করা গেল।

চন্দ্রের স্ফুটস্থান গণনা করা অপেক্ষাকৃত কঠিন; কারণ পৃথিবী ও সূর্য্য উভয়ই চন্দ্রকে আকর্ষণ করে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অবস্থানের পার্থক্য হওয়া বশতঃ চন্দ্রকক্ষার বিশেষ বিশেষ স্থানের গতির সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। বর্ষে বর্ষে যখন পৃথিবী ও সূর্য্য পুনঃ সমাবস্থ হইতেছে তখন এক বৎসরের গতি ধরিয়া গণনা করিলে ভ্রম হওয়ার সম্ভব অল্প। শীঘ্রোচ্চের গতি দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে বটে কিন্তু পূর্ণ বৎসরের জন্য উহার পূর্ব্বাভিমুখ গতি ৩৮ অংশ ধরা যাইতে পারে।

রাশিচক্রের সঙ্গে চন্দ্রকক্ষার যে দুই অবচ্ছেদ-বিন্দু তাহাদিগকে পাত কহে। ঊর্দ্ধ পাতকে (ascending node) রাহু এবং নিম্নপাতকে (descending node) কেতু বলে। রাহু কেতুর গতি বিপরীত অর্থাৎ পশ্চিম দিকে এবং উহার বার্ষিক মান ১৯ অংশ ২০ কলা।

রাশিচক্রের সঙ্গে চন্দ্রকক্ষার যে অবনতি তাহাও দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে কিন্তু বার্ষিক মধ্যমান ৫ অংশ ৮ কলা ও ৪০ বিকলা ধরা যাইতে পারে।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীরাজকুমার সেন গুপ্ত।

* সূর্য্যসিদ্ধান্ত ২ অঃ ৬৫ শ্লোক দেখ।

কৈলাস বাবুর সম্বন্ধনির্ণয়ের সমালোচনার প্রতিবাদ।

গত ষষ্ঠ সংখ্যার বান্ধবে 'সম্বন্ধনির্ণয়' নামক গ্রন্থের সমালোচনপাঠে, যুগপৎ বিস্মিত এবং দুঃখিত হইলাম। তত্ত্বানুসন্ধিৎসু সমদর্শী সমালোচকের পক্ষপাতিতা এবং একদর্শিতাই ইহার কারণ। প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া বোধ হইল সমালোচক যেন অন্যায় প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া, একমাত্র বৈদ্যজাতির নিন্দাবাদ করিবার জন্যই লেখনী ধারণ করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে এরূপ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করা না করা উভয়ই সমান। কিন্তু সমালোচক এক স্থানে লিখিয়াছেন ;—'ঐতিহাসিক কূটপ্রশ্ন লইয়া, আমরা বিজ্ঞমণ্ডলীর সহিত তর্ক করিতে অপ্রস্তুত নহি।' এই জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রতিবাদচ্ছলে গুটি দুই কথা না বলিলে ভাল দেখায় না। সমালোচক শূদ্র জাতির বিবরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তাহা হইতে বিরত হইয়া, বৈদ্য জাতির উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন কেন? হইতে পারে ইহার কোন নিগূঢ় কারণ আছে। কিন্তু এতৎ সম্পর্কে অনুমানের সিদ্ধান্তও অনেকের অপ্রীতিকর হইবে, এই আশঙ্কায় আমরা তাহা হইতে ক্ষান্ত রহিলাম।

লেখক বল্লাল সেনকে অম্বষ্ঠকুলোদ্ভব স্বীকার করেন। তাঁহার মতে অম্বষ্ঠ বৈদ্য নয়, একজাতীয় কায়স্থ এবং বল্লাল কায়স্থ। তাঁহার এই ভ্রম অপনোদন করা বর্ত্তমান প্রতিবাদের এক প্রধান উদ্দেশ্য।

কৈলাসবাবু প্রবন্ধের প্রারম্ভে কর্ম্মভেদে শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করিয়াছিলেন ; কিন্তু যেই বৈদ্যজাতির কথা উঠিল, অমনি ওঁং বিষ্ণু বলিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, বৈদ্যগণ কোন মূল বর্ণের অন্তর্গত নহে। বস্তুতঃ সুযুক্তির বশবর্ত্তী হইলে, সকলেই একথা স্বীকার করিবেন যে, কর্ম্মভেদে বর্ণবিভাগ হইয়াছে। সমাজগঠনের প্রথমাবস্থায়, একই জাতি যদি কর্ম্মভেদে চারিবর্ণ হইতে পারিল, তবে উত্তরকালে কর্ম্মভেদে যে, আবার সেই চারি বর্ণই বহুল বিভিন্নবর্ণে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। তথাচ শাস্ত্রানুরোধে বৈদ্যগণ একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, তাঁহারা মূল চারিবর্ণের কোনবর্ণের অন্তর্গত নহেন, স্মৃতি, পুরাণ ও মনুর বচন দৃষ্টে দেখাযায় যে, আদৌ মূল চারিবর্ণ ছিল ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। এতদ্ অতিরিক্ত যত শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই হয় অনুলোমজ, নয় প্রতিলোমজ বি-

বাহোৎপন্ন। প্রথমোক্তশ্রেণী সঙ্করপদবাচ্য কি না, নিম্নলিখিত শাস্ত্রীয় প্রমাণ হইতে, পাঠকগণই তাহার সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন। মাহিষ্য, বৈদ্য, (অম্বষ্ঠ) করণ এবং কায়স্থ ইহারা সকলেই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত।

'ব্রাহ্মণস্যানুলোম্যেন স্ত্রিয়োনাস্তি স এ. বতু।
দ্বেভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্যান্যে বৈশ্যস্যৈকা প্রকীর্ত্তিতা॥
আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেনযজ্জন্মসজ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ॥'
নারদ-সংহিতা।

অনুলোম বিবাহক্রমে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা, শূদ্রা, তিন স্ত্রী; ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা, শূদ্রা, দুই স্ত্রী এবং শূদ্রের শূদ্রা, একমাত্র স্ত্রী হইতে পারে। অনুলোমবিবাহোৎপন্ন সন্তান বিধিসিদ্ধ; কিন্তু প্রতিলোমবিবাহজাত সন্তান বর্ণসঙ্কর।

ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়াং অম্বষ্ঠোনামজায়তে।
নিষাদঃ শূদ্র কন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে'।
মনু—১০ অধ্যায় ৮ ম শ্লোক।

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য কন্যাতে অম্বষ্ঠের জন্ম; শূদ্র কন্যাতে নিষাদের জন্ম, তাহার অপর নাম পারশব।

'বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোহাম্বষ্ঠ উচ্যতে।
কৃষ্যা জীবোভবেত্তস্যতথৈবাগ্নেয় বৃত্তিকঃ
ধ্বজিনী জীবিকা চৈব চিকিৎসা শাস্ত্রজীবকঃ।' উশনাঃ।

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে বিধিপূর্ব্বক অম্বষ্ঠের জন্ম হইয়াছে। কৃষি, আগ্নেয়, সেনাপত্য, চিকিৎসা এই সকল তাহার বৃত্তি।

'বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশস্ত্রিয়াং।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোপিবা॥ যাজ্ঞবল্ক্য।

ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাবসিক্তের এবং বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠের জন্ম।

সূতানামশ্ব সারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং।
মনু ১০ অধ্যায় ৪৭ শ্লোক।

সূত জাতির অশ্বসারথ্য এবং অম্বষ্ঠের চিকিৎসা বৃত্তি।

অম্বষ্ঠঃ—পুং, দেশ বিশেষঃ। বিপ্রাদ্বৈশ্যায়া মুৎপন্নঃ। ইতি মেদেনী॥
অয়ং চিকিৎসাবৃত্তিঃ বৈদ্য ইতি খ্যাতঃ। ইত্যমর টীকায়াং ভরতঃ।

'সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু যুগেষু ব্রাহ্মণাঃকিল।
ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বিট শূদ্র কন্যকা উপযেমিরে॥
তত্র বৈশ্য সুতায়াং যে জজ্ঞিরে তনয়া অমী।
সর্ব্বেতে মুনয়ঃ খ্যাতা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ॥
তেষাং মুখ্যোঽমৃতাচার্য্য স্তস্যাবম্বাকুলেহিতৎ।
অম্বষ্ঠ ইত্যসাবুক্ত স্ততোজাতিপ্রবর্ত্তনাৎ।
অম্বষ্ঠাস্তেন তে সর্ব্বে দ্বিজাবৈদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অথ রুক্‌প্রতিকারিত্বাদ্ভিষজস্তে, প্রকীর্ত্তিতাঃ।

সত্যেবৈদ্যাঃ পিতু স্তুল্যাস্ত্রেতায়াঞ্চ তথা-
স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে ক্ষত্রবৎ প্রোক্তাঃ কলৌবৈশ্যো-
পমাঃস্মৃতাঃ॥
বাচস্পত্য অভিধান এবং শব্দকল্পদ্রুমে
উদ্ধৃত।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে ব্রাহ্মণগণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন। বৈশ্যার গর্ভজাত পুত্রগণ বেদবেদাঙ্গপারগ হইয়াছিল। তন্মধ্যে অমৃতাচার্য্য অম্বাকুলে অর্থাৎ মাতৃকুলে অবস্থান করেন বলিয়া, অম্বষ্ঠ নামে অভিহিত হন। রোগ প্রতীকার করিতেন বলিয়া ইঁহারা বৈদ্য আখ্যা প্রাপ্ত হন। সত্য ত্রেতাতে ইঁহারা পিতৃতুল্য; দ্বাপরে ক্ষত্রিয় তুল্য এবং কলিতে বৈশ্য তুল্য।

'বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠোহি মুনি-
সত্তমঃ।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টোমুনি-
পুঙ্গবৈঃ॥ পরাশরঃ।

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য কন্যায় উৎপন্ন অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের চিকিৎসার্থ মুনিগণ কর্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

'বেদাজ্জাতোহি বৈদ্যঃ স্যাদম্বষ্ঠোব্রহ্মপু-
ত্রকঃ।

শঙ্খ। কৈলাস বাবুর মতে এটি প্রক্ষিপ্ত বচন। (স্বার্থে ইতি শেষঃ।)

'ব্রহ্মা মূর্দ্ধাভিষিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রাবিশা-
বপি।
অমী পঞ্চদ্বিজা এষাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবং॥
হারীতঃ।

ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ইহারা পাঁচজন দ্বিজ এবং যথাপূর্ব্ব ইহাদের শ্রেষ্ঠতা।

'সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ॥
শূদ্রানাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ
স্মৃতাঃ॥ মনু ১০ অ ৪১ শ্লোক।

দ্বিজাতির সমানবর্ণা স্ত্রীতে ও অনন্তরজা স্ত্রীতে যে ছয় পুত্র উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্রিয়; বৈশ্য হইতে বৈশ্যাতে বৈশ্য; ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে ও বৈশ্যাতে মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে মাহিষ্য এই ছয়পুত্র দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কারার্হ।

'আয়ুর্ব্বেদোপনয়নাদ্বৈদ্যো দ্বিজ ইতি
স্মৃতঃ।' বৈদ্যকেঽগ্নিবেশঃ।

বাহুল্য পরিহার করিয়া ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হইবে যে, বৈদ্য এবং অম্বষ্ঠ বিভিন্ন নয়; ইহারা দ্বিজ এবং উপনয়ন সংস্কারার্হ। শাস্ত্রীয় প্রমাণ, অভিধান, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য কায়স্থগণের কুলজীগ্রন্থ, মহারাজ রাজবল্লভের নীত পাতি, (ইহাতে হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের মত সংগৃহীত হয়) তৎপর রাজা শ্যামাশঙ্কর রায় ও অম্বষ্ঠ সম্মিলনী সভার গৃহীত পাতি, অম্বষ্ঠ সম্পাদিকা এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ নিচয় ও চিরপরম্পরাগত শ্লোক এবং কিম্বদন্তী হইতে নিঃসংশয় প্রমাণিত হইবে যে, অম্বষ্ঠগণই ব্যবসায়ের

অভিধেয় বৈদ্য আখ্যায় অভিহিত হন। বৈদ্য বলিতে প্রথমতঃ কোন জাতিবিশেষকে বুঝাইত না; চিকিৎসক মাত্রকেই বৈদ্য বলিত। পরে উত্তরকালে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রানুশীন যখন একমাত্র অম্বষ্ঠজাতিতে সীমাবদ্ধ হইল, তখন তাঁহারা বৈদ্যসংজ্ঞায় সাধারণ্যে পরিচিত হইলেন। কৈলাস বাবু এপর্য্যন্ত স্বীকার করেন যে, বল্লাল সেন অম্বষ্ঠ কুলোদ্ভব। অম্বষ্ঠ এবং বৈদ্য যখন পৃথক জাতি না হইয়া একই জাতি বলিয়া স্থিরীকৃত হইল, তখন বল্লালকে বৈদ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা বোধ হয় অযুক্ত হইবে না। এসম্বন্ধে বিস্তর স্বাধীন প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু আবশ্যকতা নাই। যেহেতু আমরা এখন দেখাইব যে, কি করণ, কি কায়স্থ, কি শূদ্র ইহারা কেহই দ্বিজপদবাচ্য নহে; সুতরাং অম্বষ্ঠ নামেরও অধিকারী নয়।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, মূল চারিবর্ণের বহির্ভূত কোন বর্ণ নাই। কায়স্থ এবং শূদ্র যদি একই জাতি হয়, তবে আর কায়স্থের অদ্বিজত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতে হয় না। কেহ কেহ কায়স্থ এবং শূদ্রকে অভিন্ন জাতি বলিতে পারেন; কিন্তু আমরা সর্ব্বাংশে সেই মতের পরিপোষক নহি। তবে যদি করণ এবং কায়স্থ এক জাতি হয়, তথাপি ইহারা দ্বিজ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কারণ করণ জাতি বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে উদ্ভূত। সুতরাং অম্বষ্ঠ হইতে নিকৃষ্ট এবং সর্ব্বাংশে শূদ্রবৎ। মনু বলিয়াছেন,—

'হীনজাতি স্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তোদ্বিজাতয়ঃ।
'কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানিশূদ্রতাম্॥' মনু ৩ অধ্যায় ১৫ শ্লোক।

দ্বিজগণ মোহ বশতঃ হীন জাতীয়া স্ত্রী অর্থাৎ শূদ্রা বিবাহ করিলে সসন্তান শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়।

ইহা হইতেই দেখা যায় যে, করণ জাতি শূদ্র হইতে কোন অংশেও শ্রেষ্ঠ নয়।

এখন কায়স্থ জাতি যদি করণ এবং শূদ্র এতদুভয়ের কোন শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত না হয়, তবে তৎসম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার আমার অধিকার নাই। কারণ কায়স্থ জাতির সমস্ত কুলজীগ্রন্থ আমি অধ্যয়ন করি নাই। এবং কৈলাস বাবুর ন্যায় স্বমত প্রাবল্যানুরোধে একমাত্র অনুমান সম্বলে সমস্ত কুলজীগ্রন্থ অগ্রাহ্য করা কিংবা শাস্ত্রীয় বচন মাত্রকেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উপেক্ষা করিয়া দাম্ভিকতার পরিচয় প্রদান করা আমার ইচ্ছা নয়। বারান্তরে কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষরূপ সমালোচনের বাসনা রহিল। আপাততঃ প্রত্যক্ষ সত্য যাহা দেখিতে পাই, তৎসম্বন্ধে গুটি দুই কথা বলিয়া আমরা নিরস্ত হইব।

ইদানীং আমাদের দেশে কায়স্থ, কৃত্রিম কায়স্থ এবং শূদ্র ইহারা পরস্পর সংমিশ্রিত হইয়া এক জাতি হওয়াতে কে কায়স্থ, কে কৃত্রিম কায়স্থ এবং কে শূদ্র তাহা নির্দ্ধারণ করা অতি সহজ নয়। আজি কালি ইহা সাধারণতঃই দৃষ্ট হয় যে, অনেক শূদ্রও আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় প্রদান

করিয়া থাকে। বস্তুতঃ দেখাও যায় যে, অনেক শূদ্র চাপরাস গ্রহণ করিয়া দু টাকার অর্থসংস্থান করিতে পারিলেই, নিজ নামের পদবী পরিবর্ত্তন অথবা নূতন পদবী সংযোজন করিয়া কায়স্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইতে প্রয়াস পায়। সম্ভবতঃ কোন কুলীন কায়স্থের কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দেয়, এবং কএকদিন পরে সর্ব্বতোভাবেই ভদ্র কায়স্থ বলিয়া সমাজে পরিগণিত হয়। আমাদের দেশে এই শ্রেণীর কায়স্থের এবং এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সমাজ এই ভাবে চলিতে থাকিলে, কতিপয় বৎসর মধ্যেই দেখিতে হইবে যে শূদ্রবংশ সমূলে নির্ব্বংশ হইয়া, কায়স্থ জাতি রাবণের বংশের ন্যায় অগণ্য হইয়া পড়িয়াছে। সিংহ মহাশয়ের মতে পাশ্চাত্য বেদব্যাস কাউচেল এলফিন্‌ষ্টোন প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইতিহাস লেখকগণ যে 'কায়স্থগণ খাটি শূদ্র, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, বর্ণিত অবস্থা তাহার এক প্রধান কারণ। বস্তুতঃ কায়স্থ জাতি শূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠতর হইলেও শূদ্রাদির সহিত ক্রিয়াকর্ম্মজনিত যে পতিত এবং শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাহারও কাহারও মতে শূদ্র জাতি এদেশের আদিম অসভ্যবন্য জাতি; সুতরাং এবম্বিধ শূদ্রগণের সহিত ক্রিয়াম্বিত কায়স্থ জাতিকে পতিত জাতি ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? এরূপ জাতি দ্বিজ শব্দের অধিকারী হইতে পারে কি না পাঠকগণ তাহা সিদ্ধান্ত করিবেন। আর এক শ্রেণীর কায়স্থ আছে, তাহারা নিখুত শূদ্র। পূর্ব্ব পুরুষের নাম 'কায়স্থ' ছিল বলিয়া তাহারা কায়স্থ পরিচয় প্রদানে কায়স্থের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। অগ্নি পুরাণে লিখিত আছে;—

'আদৌ প্রজাপতের্জ্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ।
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্ব্বো বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে॥
পাদাচ্ছূদ্রশ্চ সম্ভূতঃ ত্রিবর্ণস্য চ সেবকঃ।
হীম নামা সুতস্তস্য প্রদীপস্তস্য পুত্রকঃ।
কায়স্থস্তস্য পুত্রোঽভূৎ বভূব লিপিকারকঃ।
কায়স্থস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বিখ্যাতা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্ত শ্চিত্র সেনঃ বিচিত্রশ্চ তথৈবচ।
চিত্রগুপ্তো গতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগসন্নিধৌ।
চিত্র সেনঃ পৃথিব্যাং বৈ ইতি শূদ্রঃ প্রচক্ষ্যতে।'

অগ্নিপুরাণ; জাতিমালা; শব্দকল্পদ্রুম।

কৈলাস বাবু পশ্চিম দেশীয় চিত্রগুপ্তের সন্তান গণকে যে অম্বষ্ঠ কায়স্থ বলিতে চান, অগ্নিপুরাণের এই বচন হইতেই তাঁহার সেই ভ্রম অপনীত হইবে। ইহা হইতে ইহাও স্থিরীকৃত হয় যে, লিপিকারক কায়স্থগণ বিশুদ্ধ শূদ্র চিত্রসেনের সন্তান। সুতরাং এই শ্রেণীর কায়স্থগণকেও দ্বিজ বলা যাইতে পারে না। অগ্নিপুরাণের অযাথার্থ্য সম্বন্ধে কৈলাস বাবু যে কি বলিবেন, জানি না। কিন্তু এখন ইহা হইতে এই মীমাংসা করা যাইতে পারে যে, আমাদের দেশীয় কায়স্থশ্রেণীর অধিকাংশ ভাগ শূদ্র। যাঁহারা শূদ্র নন, প্রকৃত কায়স্থ, তাঁহারাও

শূদ্র সংশ্রবে পতিত। কারণ জাতি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে যে, তাহারা শূদ্র হইতে কোন অংশেও শ্রেষ্ঠ নয়। যখন এই তিন শ্রেণীরই শূদ্রত্ব স্থিরীকৃত হইল, তখন ইহারা অম্বষ্ঠ কিংবা দ্বিজ শব্দ বাচ্য নহে। বল্লাল সেন অম্বষ্ঠ ছিলেন, সুতরাং তিনি এই তিন শ্রেণীর কোন শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। এখন কৈলাস বাবুর অপর তর্ক বল্লালসেন চন্দ্রবংশীয় ছিলেন, সুতরাং বৈদ্য নহেন। কায়স্থ হইলে কিন্তু চন্দ্রবংশীয় হইতে পারিতেন। আগামী বারের প্রবন্ধে আমরা কৈলাস বাবুর উক্ত তর্কের মীমাংসা করিব।

নিম্ন লিখিত বচন হইতেও অনুমিত হয় যে, বল্লাল সেন কায়স্থগণ হইতে পৃথক জাতীয় ছিলেন।

'অথ বল্লাল ভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ।
কুরুতেতি প্রযত্নেন কুলশাস্ত্রনিরূপণং।
আদিশূরানীতান্ বিপ্রান্ শূদ্রাংশ্চৈব তথাপরান্।
এতেষাং সন্ততীঃ সর্ব্বা আনয়ৎ স নিজালয়ে। কায়স্থ কুলগ্রন্থ।

এই বচনে বল্লালকে অম্বষ্ঠ কুলোদ্ভব বলিয়া আদিশূর আনীত পঞ্চ কায়স্থ হইতে পৃথক করা হইয়াছে। এভিন্ন যখন আমরা দেখিতে পাই যে, চক্রপাণি দত্ত (চক্রদত্ত গ্রন্থ প্রণেতা) বৈদ্যকুলোদ্ভব সেন নৃপতির রাজসভাতে ছিলেন, তখন সেই সেন নৃপতি যে এই বংশীয় ছিলেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। কৈলাস বাবু যদি ইহাকে রাজ বল্লভের সমকাল বর্ত্তী কি পরবর্ত্তী প্রমাণ করিতে চান, তবে আমরা নাচাড়।

আরও দেখুন—

রাজা বল্লাল সেনঃ প্রকৃতিসুচতুরঃ
পুণ্যবানৈক ধাতা,
সদ্বিদ্বান্ বৈদ্যবংশঃ প্রথিতগুণযশঃ
সত্যবাক্ শুদ্ধচেতাঃ।
মর্য্যাদাস্থাপিতাচ দ্বিজকুলভিষজা—
—সম্ভ্য বর্ণস্য যেন,
রাজাত্রাজাধিরাজো জয়তি জয়
মহারাজ কার্য্যপ্রবীণঃ॥
বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের
কুলগ্রন্থ।

এসকল লেখাও বৈদ্যদিগের চতুরতার পরাকাষ্ঠা বলিয়া সিংহ মহাশয় কুতর্ক করিবেন না?

বল্লালের দিল্লীতে রাজত্ব সম্বন্ধে কৈলাস বাবু যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, এইস্থলে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। কারণ সেটি একটি দীর্ঘ স্বতন্ত্র প্রবন্ধ সাপেক্ষ। এখন মোটামোটি তাঁহার প্রবন্ধের অবশিষ্ট ভাগ পর্য্যালোচন করিয়া আমরা আজ এই প্রতিবাদের উপসংহার করিব।

সমালোচক লালমোহন বাবুকে পুনঃ২ বৈদ্যদিগের—'ময়াকেল' 'উকীল' প্রভৃতি বিশেষণ বাচ্যে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি নিজে কিন্তু শূদ্রদিগের ময়াক্কেলী বা উকীলী কিছুই করেন নাই! লালমোহন বাবুর অপরাধ, তিনি শাস্ত্রানুশীলন, অনুসন্ধান এবং গবেষণার ফল যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, নিরপেক্ষ ভাবে তাহাই, স্বকৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সত্যের অপব্যবহার করিয়া লেখনীর কুপরিচালন করেন নাই। সমালোচক মাত্রেরই অপেক্ষাকৃত ধীর, সমদর্শী এবং যুক্তি পরবশ হওয়া প্রয়োজনীয়।

লেখকের দ্বিতীয় লক্ষ্য মহারাজ রাজবল্লভ এবং রাজবল্লভের বংশ। রাজ বল্লভের বিশেষণ 'বৈদ্য কুলাঙ্গার' এবং পরক্ষণেই টিপ্পনীতে আবার তাঁহার ছোট খাট একটি শ্রাদ্ধ! সমালোচকের বংশে এরূপ কতজনা কুলাঙ্গার জন্ম ধারণ করিয়াছে জানি না। তবে বিশেষণটি আমার মতে একটু অযুক্ত হইয়াছে। 'বৈদ্যকুলে জলন্তাঙ্গার' হইলে বরং লেখকের সম্বন্ধে পদটি অর্থযুক্ত হইত। রাজবল্লভের জীবনী, যাহা তিনি পূর্ব্বে লিখিয়াছেন ; এবং 'সম্বন্ধ নির্ণয়' যাহা বান্ধবে লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতেই দেখা যায় যে, কৈলাস বাবু পূর্ব্ব শত্রুতা এখনও বিস্মৃত হন নাই। ইনি বলিতেছেন 'রাজবল্লভের বংশজগণ তাহাদিগকে বল্লাল বংশ বলিয়া পরিচয় প্রদান করে।' এরূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপ সুস্থমনা ব্যক্তির মুখে সম্ভবে না। এখনও রাজবল্লভের প্রপৌত্র এবং সুবিস্তৃত বংশ বিদ্যমান। ইহারা কোন্ বংশ বলিয়া পরিচয় প্রদান করে, বিক্রমপুরের পাঠকগণ তাহা সিংহ মহাশয়ের নিকট শুনিতে চান না। ইহাদের আদি পুরুষের নাম বলভদ্র সেন।

'বৈদ্যগণের কখনও উপবীত ছিল না। 'রাজবল্লভ পণ্ডিত মণ্ডলীর পাদপদ্মে' 'দশলক্ষ টাকা ঢালিয়া দিলেন, অমনি 'নূতন নূতন বচন এবং উপবীতের ব্যবস্থা 'বাহির হইল।' মনুষ্যের কি ভ্রম! তখন কিন্তু রাজবল্লভ বেচারী কায়স্থদিগকে দশ টাকা দিলেই সব আপদ চুকিয়া যায়। তাহা না করাতেই আজ এ অনর্থ। বৈদ্য গণের উপবীত ছিল কিনা তাহা আমরা প্রথমেই প্রদর্শন করিয়াছি। এস্থলে কেবল আমরা এইমাত্র বলিতে চাই যে, তৎকালে ধর্ম্ম এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্যে টাকা দ্বারা সমস্ত ভারতের মত সংগ্রহ করা এত সহজ ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে ত্রিপুরা সংসৃষ্ট পণ্ডিতগণের অবস্থাও লেখক একবার স্মরণ করিলে পারেন। ইহাও তাঁহার মনে করা উচিত ছিল যে, রাজবল্লভ স্বীয় বিধবা দুহিতার পুনর্ব্বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করিতে যাইয়া কিরূপ লজ্জিত এবং অপদস্থ হইয়াছিলেন। হইলে কি হইবে? ইতিহাস লেখকের মতবিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে তাহা ইতিহাসই নয় ; কুলজীগ্রন্থ তাঁহার অনুমান বিরুদ্ধ হইলে, তাহা অধুনিকতায় অপ্রামাণ্য ; শাস্ত্রীয় বচন বিপরীত সিদ্ধান্ত করিলে তাহা প্রক্ষিপ্ত। বস্তুতঃ স্বীয় মত প্রবল করিতে যাইয়া, যাহারা যুক্তি, ইতিহাস এবং পৌরাণিক গ্রন্থের মস্তকে পদাঘাত করে, সেই সকল দুর্দ্দমনীয় পণ্ডিতের সহিত তর্ক করাও যে কথা, নাস্তিকের সহিত ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তর্ক করাও সেই কথা। মূর্খ জনেরা এই সকল পণ্ডিতকে বরং সহজে প্রবুদ্ধ করিতে পারে। রাজবল্লভের জীবনী লিখিতেও লেখক বিদ্যাবুদ্ধির চূড়ান্ত দৌড় প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই।

প্রবন্ধ লেখক কৈলাস বাবু উপসংহারে যদিও একটু অনুগ্রহ প্রকাশে বৈদ্য জাতিকে আপ্যায়িত করিয়াছেন, তথাপি সেখানেও প্রকৃত মূল সূত্র তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হয় নাই। তিনি যত কিছু শাস্ত্র মন্থন করিয়াছেন, তাহা কুলজীগ্রন্থ এবং ইতিহাস হইতে সর্ব্বাংশে অকাট্য এবং অতীব প্রাচীন। এক বক্ নন; অপর বকলাও। আমরাও মার্শম্যান, কাউয়েল এলফিন্‌ষ্টোন প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে যে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বেদ বাক্য দুই একটি উল্লেখ করিতে না পারি, তাহা নহে। শাস্ত্রালোচনাতে উহা ত্যাগ করাই সঙ্গত বোধ হইতেছে।

কেশ ও শ্মশ্রু প্রভৃতি।

স্বাভাবিক অলঙ্কার সমূহের মধ্যে কেশ মনুষ্য জাতির অপূর্ব্ব অলঙ্কার। কি স্বর্ণাভ কুন্তল, কি নিবিড়মেঘকৃষ্ণ কুন্তল, রুচিভেদে নানা জাতির নানা মত হউক, কুন্তলের অলঙ্কারিতা সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। এই স্বাভাবিক শোভার উন্নতিকল্পে কতকাল ধরিয়া কত পারিপাট্যই বিহিত হইতেছে। ইহার অধিবাসন ও চাক্‌চিক্য সম্পাদনার্থ কত দ্রব্যই প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইতেছে। নবাব আমির ওমরাহ প্রভৃতিরা কত প্রয়াসে অভিপ্রেত কেশবিন্যাস অভ্যস্ত করিতেন। বাবরি চুলের কথা এখন প্রায় কথামাত্রে পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি ইংরেজ রাজের অনুকরণে কেশের কতরূপ বিন্যাস-ভঙ্গিই আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। রাজ্যবিপ্লবের সঙ্গে কবরীবন্ধন সম্বন্ধে কত বিপ্লবই উপস্থিত হইয়াছে। কেশবিন্যাসের এরূপ উৎকর্ষসাধন আমাদিগের প্রাচীন আর্য্যজাতির অধিকারকালেও বর্ত্তমান ছিল। পূর্ব্বপিতৃগণ যে জটাভার ধারণ করিতেন, তাহার শোভা বর্ণনেও বহু কবির বহুতর কবিতা পরিপূরিত হইয়াছে। মুণ্ডিতমুণ্ডের শিখাগ্রভাগও দেবপূজার নির্ম্মাল্য পুষ্পে বর্জ্জিত দৃষ্ট হইত না। বালকগণের কেশোপরি ময়ুরপুচ্ছ, কঙ্কপত্র প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। বিভবশালী বিলাসগণ কেশ শোভার্থ নানারূপে কেশোপরি পুষ্পরাশি ধারণ করিতেন। * বিলাসিনীগণের তো কথাই নাই। তাঁহাদিগের কেশপাশ গন্ধ তৈলে নিষিক্ত ও সুরভি ধূপধূমে বাসিত হইত, অলকাবলী কুন্দ মন্দারাদি পুষ্পে অনুবিদ্ধ হইত, কবরী মালাদাম ও কদম্বাদি পুষ্পগুচ্ছে সুশোভিত হইত। †

---

* তেহস্য মুক্তাগুণোন্নদ্ধং মৌলিমন্তর্গতস্রজং। প্রত্যূপুঃপদ্মরাগেণ প্রভামণ্ডল শোভিনা। রঘুবংশ, ১৭ সর্গ। ২৩ শ্লোক।

† জালোদ্গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশসং-

গুরুগৃহে অধ্যয়ন সমাপ্তি পূর্ব্বক সমাবর্ত্তন স্নান করিয়া যাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইতেন, বিহার নামক যাগবিশেষ ব্যতিরেকে তাঁহাদিগকে আর মস্তক মুণ্ডন করিতে হইত না। যথা শ্রুতিঃ। ন সমাবৃত্তা বপেয়ুঃ অন্যত্র বিহারাৎ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া যিনি দার পরিগ্রহাদি করিবেন, তাঁহার বেশ, ভূষা, সৌন্দর্য্য সকলেরই প্রয়োজন। কেশ এইরূপ উৎকৃষ্ট ভূষণ ও সৌন্দর্য্যমধ্যে পরিগণিত থাকায়, উৎকট অপরাধ ও উপপাতকাদি স্থলেই মস্তক মুণ্ডন বিহিত হইয়াছে। শক, জবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব প্রভৃতি দেশীয় ক্ষত্রিয়দিগেরও গুরুতর অপরাধ বশতঃ সর্ব্বমুণ্ডন, অর্দ্ধমুণ্ডন প্রভৃতি দণ্ডবিহিত হইয়াছিল। বিধবাদিগের বিলাসসৌন্দর্য্যের প্রয়োজনাভাব বলিয়া তাহাদিগের সর্ব্বদাই সর্ব্বমুণ্ডন বিহিত হইয়াছে। যথা কাশীখণ্ডে। বিধবাকবরীবন্ধো ভর্ত্তৃবন্ধায়জায়তে। শিরসোমুণ্ডনং তস্মাৎ কার্য্যং বিধবয়া সদা। কিন্তু সধবাদিগের সর্ব্বদা অলঙ্কারের প্রয়োজন বশতঃ গোহত্যাদি পাপেও তাহাদিগের অঙ্গুলিদ্বয় মাত্র কেশচ্ছেদন বিহিত হইয়াছে। যথা মদন পারিজাত ধৃত বচন। সধবানান্তু নারীণামলঙ্কারায় সর্ব্বদা। কেশসন্ধারণং প্রোক্তং প্রায়শ্চিত্তে দ্বিজোত্তমৈঃ। ভবদেবভট্টধৃত। বপনং নৈবনারীণাং নানুব্রজ্যাজপাদিকং। ন গোষ্ঠে শয়নং তাসাং নচাদধ্যাদ্ গবাজিনং। সর্ব্বান্ কেশান্ সমুদ্ধৃত্যচ্ছেদয়েদঙ্গুলিদ্বয়ং।

কেশ, শ্মশ্রু প্রভৃতি মনুষ্যের কেবল ভূষণ নহে, উহার ধারণে যথেষ্ট উপকারও আছে। মহর্ষি ব্যাস কহিয়াছেন, ' কেশ শ্মশ্রু ধারয়তামগ্র্যাভবতি সন্ততিঃ। অর্থাৎ কেশ, শ্মশ্রু ধারণ করিলে উৎকৃষ্ট সন্তান হয়। একথা যুক্তিমূলকও বটে। সদ্বৈদ্যেরা বলিয়া থাকেন যে শুক্রধাতুর অভ্যুদয় কালেই শ্মশ্রু আদির অভ্যুদয় দেখাযায় এবং ঐ ধাতুর অবসন্নতার সহিতই শ্মশ্রু আদিরও চরম দশা দেখা গিয়া থাকে। অতএব উহাদিগের কার্য্যকারণ ভাব কল্পনা অসঙ্গত নহে।

আন্তরিক অশুচিভাব বা কোনরূপ বিষাদ উপস্থিত হইলে, সৌন্দর্য্যসাধনে মনোযোগ থাকে না, শোকাদিস্থলে বরং সৌন্দর্য্য সাধক পদার্থের বিনাশে শোকচিহ্ন ধারণেই ইচ্ছা জন্মে। পিতৃ মাতৃ বিয়োগে তজ্জনিত শোকের প্রবলাবস্থায় কাহার সুপরিচ্ছদ পরিধান করিতে ও কেশবেশাদি করিতে প্রবৃত্তি থাকে? এই নিমিত্তই বোধ হয়, অশৌচ মাত্রে ক্ষৌরকর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। কিন্তু শোকাদিজনিত প্রবল অশুচিভাবের উদয়ে যেরূপ সৌন্দর্য্যবিদ্বেষ জন্মে, সাধারণতঃ অশুচিভাবে তাহা তাদৃশ জন্মে না বলিয়া, জননাশৌচে মুণ্ডনের প্রচার নাই; এবং সৌন্দর্য্য স-

---

স্কারধূপৈঃ। পূর্ব্বমেঘ। ৩২ শ্লোক। এবং উত্তর মেঘ দ্বিতীয় শ্লোক, রঘুবংশ ৬ষ্ঠ সর্গের ২৩ শ্লোক, ৭ ম সর্গের ৬ ষ্ঠ শ্লোক ও কুমার সম্ভব-সপ্তম সর্গের ১৪ শ শ্লোক প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

মুণ্ডনের প্রচার নাই। এবং সৌন্দর্য্য সম্পাদক—না পদার্থ থাকিতে কেশশ্মশ্রু প্রভৃতিরই বপন বিধানের তাৎপর্য্য এই যে, উহাদিগের বপনে যেমন অনায়াসে সৌন্দর্য্যের হানি হইয়া থাকে, সেইরূপ কিয়দ্দিন পরেই পুনর্ব্বার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে উহাদিগের আবির্ভাব.হইতে পারে।

যাঁহারা কাম্য কেশ ধারণ করিয়া থাকেন, সাধারণ অশৌচে মুণ্ডন বিধায়ক বচন দ্বারা তাঁহাদিগের কেশ ধারণের প্রতিষেধ হয় না। সেরূপ ব্যবহারও প্রচলিত নাই। এই নিমিত্ত যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাদি স্থলে বা দেবোদ্দেশে কেশ ধারণ করেন, সাধারণ অশৌচেও তাঁহাদিগকে কেশ শ্মশ্রাদি মুণ্ডন না করিতেই দেখা যায়। এই নিমিত্তই ‘মুণ্ডয়েৎ সর্ব্বগাত্রাণি’ ইত্যাদি ও ‘দারকর্ম্মমৃতস্থতকেষুচ’ ইত্যাদি বচনে সাধারণতঃ মুণ্ডন বিধান থাকিলেও বিষ্ণু লিখিত ‘প্রয়াগে তীর্থযাত্রায়াং পিতৃমাতৃবিয়োগতঃ। কচানাং বপনং কার্য্যং বৃথা ন বিকচোভবেৎ। এবং কালিকা পুরাণে লিখিত, ‘গঙ্গায়াং ভাস্করক্ষেত্রে পিত্রোশ্চ মরণং বিনা। বৃথা ছিনত্তি যঃ কেশান্ তর্মাহুর্ব্রহ্মঘাতকং। অর্থাৎ প্রয়াগে তীর্থযাত্রা ও পিতৃমাতৃ বিয়োগ ব্যতিরেকে কেশ বপন করিতে নাই, করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়, ইত্যাদি বিশেষ বচনের আবশ্যকতা হইয়াছে। অর্থাৎ সাধারণ বচন দ্বারা যাবতীয় কাম্যকেশধারীদিগের মুণ্ডনের নিষেধ বোধিত হওয়ায় বিশেষ বচন দ্বারা কএকটি মাত্রস্থলে পুনর্ব্বার তাঁহাদিগের মুণ্ডন বিধান করা হইয়াছে।

আমাদিগের বাঙ্গালাদেশীয় শাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপক মণ্ডলীর কেশ শ্মশ্রাদির বপন প্রথার কারণ অনুসন্ধান করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, ঐ ঐ পদার্থ ধারণে বৈধকর্ম্মানুষ্ঠান কালে সর্ব্বদা অপবিত্রতা ঘটে বলিয়া উক্তরূপ রীতি প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু এ যুক্তি সুসঙ্গত নহে। কারণ তাহা হইলে অন্ততঃ কান্যকুব্জ ও মিথিলা প্রদেশবাসী প্রভৃতি ইহাদিগের মূল পুরুষদিগেরও ঐরূপ প্রথা প্রচলিত থাকিত। অপিচ, ‘দেহাচ্চৈব চ্যুতা মলাঃ’ কেশশ্মশ্রু, লোম, নখাদি পদার্থ দেহ হইতে বিচ্যুত হইলেই মলরূপে পরিগণিত হয়, এরূপ শাস্ত্রেও আছে। অধিক কি, শৌচপ্রস্তাবে মনু এরূপও বলিয়াছেন যে, শ্মশ্রুলোম মুখপ্রবিষ্ট হইলেও তাহা উচ্ছিষ্ট হয় না। যথা, নোচ্ছিষ্টং কুর্ব্বতে মুখ্যা বিপ্রুষোহঙ্গে পতন্তি যাঃ। ন শ্মশ্রূণি গতান্যাস্যং ন দন্তান্তরধিষ্ঠিতং। মনুসংহিতা, পঞ্চমাধ্যায় ১৪১ শ্লোক। অতএব উক্ত প্রথার অন্য কোন বীজ থাকিতে পারে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতটিকে আমি অন্যতর কারণরূপে অনুমান করি। ব্রাহ্মণজাতির যাজন, অধ্যাপনাদি প্রধান বৃত্তি হওয়ায় ও তন্নিবন্ধন গুরু, পুরোহিত রূপে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা অন্তঃপুরে, সমাজে সর্ব্বত্র গতায়াত করিতে হওয়ায় তাঁহাদিগের কেশবেশাদি বিলাসশূন্যতারই সর্ব্বথা প্রয়োজন হইত। তদনুসারেই তাঁহাদিগের ভোজ্য, ব্যবহার্য্য, যাবতীয় দ্রব্য নিয়ত হইয়াছে। কেশ শ্ম-

শ্মশ্রাদি ধারণ না করা অপেক্ষা ধারণ করায়, যে সৌন্দর্য্যাধিক্য আছে, তদ্বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই এবং তৎকালে বিলাসদ্রব্যের বাহুল্য না থাকায় ঐসকল দ্রব্যও বোধ হয় বিলাস দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। সুধীগণ কারণান্তর অনুসন্ধান করিবেন।

শ্রীশারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদ।

সম্বন্ধ নির্ণয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কায়স্থ—লালমোহন বাবু তিলি, মালী, তাম্বুলী প্রভৃতির সহিত কায়স্থ জাতিকে নবশাখ শ্রেণীতে স্থান দান করিয়াছেন।

এস্থলে আমাদের একটি গল্প মনে হইল। কলিকাতা সহরতলীর কোন এক ব্রাহ্মণের বাটীতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও সদ্গোপ প্রভৃতি কতকগুলি লোকের আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। বাটীতে স্থানের নিতান্ত অভাব,সুতরাং প্রথমতঃ ব্রাহ্মণেরা আহার করিলেন। তৎপর আবার আসন পড়িল, বাটীর কর্ত্তা কায়স্থদিগকে ডাকিয়া গেলেন। কায়স্থের পর সদ্গোপ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ আহার করিয়াছিলেন। সেই স্থলে জনৈক অর্দ্ধ শিক্ষিত সদ্গোপ ছিলেন। তিনি আপনাকে অপমানিত বোধে বাটীতে আসিয়াই জনৈক বন্ধুর দ্বারা এক পুস্তক প্রকাশ করিলেন, তাহার নাম "কায়স্থ সদ্গোপ সংহিতা" নব সংহিতাকার নির্ণয় করিলেন যে, 'সদ্গোপ' বিশুদ্ধ আর্য্য বংশজ ও কায়স্থগণ অধমজাতি।

লালমোহন বাবু ঐরূপ কোন অবস্থায় পড়িয়া কায়স্থদিগের প্রতি বিকৃত কটাক্ষ করিয়াছেন কি না তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু বটবৃক্ষনিবাসী কোন মহাপুরুষের কৃপা কণা যে লালমোহন বাবুর উপর বৃষ্টি হইয়াছিল, তৎপক্ষে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণকুলের চূড়ামণি নবদ্বীপ-পতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার যজ্ঞস্থলে যে জাতিকে ক্ষত্রিয়ের আসন প্রদান করিয়াছিলেন, লালমোহন বাবু স্বজ্ঞানে কখনই সেই জাতিকে নবশাখ শ্রেণীতে গ্রথিত করেন নাই। কায়স্থদিগকে সমর্থন করিয়া 'কায়স্থ কৌস্তুভ' 'কায়স্থসংহিতা' প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইলে পর, বৈদ্যবংশীয় কতকগুলি লোক উন্মত্ত হইয়া কায়স্থদিগকে গালিগালাজ আরম্ভ করিলেন।* নিজে পুস্তক লিখিলেন, কেহবা স্বয়ং অক্ষম বা অন্য কারণ বশতঃ বন্ধুদিগকে অনুরোধ করিলেন। ক্রমে শ্বেত, পীত,

* শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের লিখিত 'বঙ্গীয়সেন রাজ' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াও বৈদ্যগণ স্থির থাকিতে পারেন নাই।

নীল, কপিশ হরিৎবর্ণ বিশিষ্ট বহুসংখ্যক ত্রাহ্ম মুখমণ্ডল হইতে অসুরের ন্যায় ভ্রূকুটি ও দন্ত বিকাশ করিয়া বাহির হইল। লাল মোহন বাবু ইহা অস্বীকার করিবেন কি? যাহাহউক এই সকল কথা পরিত্যাগ করা যাউক। কায়স্থদিগের সম্বন্ধে স্বীয় মত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আমরা স্মৃতি ও পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করিব। কিন্তু পূর্ব্বে পাঠকদিগকে কএকটি কথা বলিয়া লইতেছি।

কেবল মান্দ্রাজ ব্যতীত আমরা সমস্ত ভারত নিবাসী কায়স্থদিগের বিবরণ যাহা অবগত হইতে সক্ষম হইয়াছি, তদ্দ্বারা ইহাই নির্ণীত হইতেছে যে, তিন প্রকার কায়স্থ আছে। যথা অম্বষ্ঠ কায়স্থ, করণ কায়স্থ ও চন্দ্রসেনী কায়স্থ। এই তিনটি শ্রেণী হইতে অনেক শাখা প্রশাখা হইয়াছে।

চন্দ্রসেনী কায়স্থ মহারাষ্ট্র দেশেই অধিক পরিমাণ দৃষ্ট হয়। তাহারা পৌরাণিক প্রমাণ অবলম্বন করিয়া বলেন যে, পরশুরামের ভয়ে যেসকল গর্ভবতী রমণী ব্রাহ্মণদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদেরই সন্তান সন্ততী।

করণ কায়স্থ উড়িষ্যায় অধিক। ভগবান মনু বলেন যে, বৈশ্যপুরুষ ও শূদ্রা রমণী হইতে করণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। মনু স্থানান্তরে আরও একটি করণ জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। সেই করণকে তিনি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় শ্রেণীতে গণনা করিয়াছেন। প্রথমোক্ত করণের জাতীয় ব্যবসা 'ধনধান্যাধ্যক্ষতা, রাজসেবা, দুর্গ ও অন্তঃপুর রক্ষা' ইত্যাদি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অম্বষ্ঠ কায়স্থ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেই অধিক দৃষ্ট হয়। মনুর মতে ব্রাহ্মণের ঔরসে ও বৈশ্য রমণীর গর্ভে ইহাদের উৎপত্তি। প্রায় ৪০ বৎসর গত হইল আগ্রা নগরী হইতে 'শব্দার্থ চিন্তামণি' নামে এক খণ্ড বৃহৎ সংস্কৃত অভিধান প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই গ্রন্থে 'অম্বষ্ঠ' শব্দের অর্থ স্থলে লিখিত আছে, 'কায়স্থ জাতিবিশেষ।' উত্তর পশ্চিমদেশে ও উড়িষ্যায় আমরা যেসকল অম্বষ্ঠ কায়স্থের দর্শন পাইয়াছি তাঁহারা সকলে চিত্রগুপ্তের বংশজ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। মনু এক স্থলে অম্বষ্ঠকে চিকিৎসা ব্যবসায়ী বলিয়াছেন। এই অম্বষ্ঠ সেই অম্বষ্ঠ কি না তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশে এক শ্রেণীর কায়স্থগণ চিকিৎসাব্যবসায়ী। তাহাদের নামের অন্তে উপাধির ন্যায় 'বৈদ্য' শব্দ সংযুক্ত হইয়া থাকে। হয়ত মনু তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলিয়াছিলেন। আমাদের দেশীয় বৈদ্যগণ যদি কায়স্থ আখ্যা ধারণ করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে তাঁহারা মনুর লিখিত অম্বষ্ঠ আখ্যার অংশভাগী হইতে পারেন, নচেৎ নহে।

মনু একবারও কায়স্থ শব্দ উল্লেখ করেন নাই। বোধ হয় তাঁহার সময়ে কায়স্থ শব্দ সৃষ্ট হয় নাই। সম্ভবতঃ পরশুরামের বিপ্লবের পর এই শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল।

মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ আমাদের দেশের প্রধান ও প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকার। ইহাদের মধ্যে বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস ও উশনা এই চারিজনই কায়স্থশব্দের উল্লেখ করিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় প্রথম অধ্যায়ের ৯১ হইতে ৯৫ শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণসঙ্করের বিবরণ লিখিত আছে, তাহাতেও করণ ও অম্বষ্ঠের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভগবান বিষ্ণু স্বীয় সংহিতায় ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণসঙ্করের কথা লিখিয়াছেন। উশনা ঠাকুর দেড়পাতা এক সংহিতা লিখিয়াছেন তাহার আদ্যোপান্তই কেবল বর্ণসঙ্করের কথা। উশনা সকল জাতিরই উৎপত্তি লিখিয়াছেন, কেবল কায়স্থদিগকে গালিগালাজ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, কাকেরের "কা" যমের "য়" ও স্থপতির "স্থ" এই তিনটি অক্ষর দ্বারা "কায়স্থ"; কি চমৎকার ব্যাখ্যা! আমাদের বোধ হইতেছে যে, কোন সুচতুর কায়স্থ দ্বারা উশনা ঠাকুর বিলক্ষণ জব্দ হইয়াছিলেন, তাহাতেই ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া দেড়পাতা সংহিতা লিখিয়া শত্রুতা মিটাইয়াছেন। আমরা প্রাচীনকাল হইতে দেখিতেছি যে, রাজদরবারে কেবল কায়স্থগণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এক্ষণ যদিচ ভিন্ন জাতীয় মানবগণ বিদ্যাভ্যাস করিয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছেন তথাপি ইংরাজরাজত্বের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধিকরণের প্রতি নেত্রপাত করিলে দৃষ্ট হইবে যে, পাঁচজন দেশীয় মানব তাহাতে উপবেশন করিয়াছেন, তাঁহাদের দুইজন ব্রাহ্মণ ও তিনজন কায়স্থ। প্রাচীন আর্য্যরাজসভায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মধ্যে প্রায়ই কলহ চলিত। ব্রাহ্মণকুলজ কহ্লন পণ্ডিত কাশ্মীরের ইতিহাস লিখিয়াছেন। কিন্তু যে নরপতি কায়স্থমন্ত্রিগণের বাধ্য হইয়াছেন, পণ্ডিতবর তাঁহারই কুৎসা গাইয়াছেন। এজন্যই বোধ হয় ধর্ম্মের নামগন্ধ শূন্য দেড় পাতা এক সংহিতা লিখিতে যাইয়া উশনা ঠাকুর লিখিয়াছেন :—

কাকাল্লৌল্যং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতেরথকৃন্তনং।
আদ্যাক্ষরাণিসংগৃহ্য কায়স্থ ইতিকীর্ত্তিতঃ॥
৩৫ শ্লোক।

ধর্ম্মসংহিতায় এই সকল কথা সন্নিবেশিত হওয়ার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না।

ভগবান যম লিখিয়াছেন।—

রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটোবরুড়এবচ।
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চসপ্তৈতেচান্ত্যজাঃস্মৃতাঃ॥
যমসংহিতা, ৫৪ শ্লোক।

ব্যাসদেব স্বীয় সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে অন্ত্যজ শ্রেণীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সে স্থলে তিনি এক চমৎকার কাণ্ড করিয়াছেন। তিনি 'কৈবর্ত্ত' এই তিনটি অক্ষর উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে 'কায়স্থ' শব্দ বসাইয়া দিয়াছেন। আমরা এজন্য মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নিন্দা করিতেছি না। তাঁ-

হার ন্যায় দৌহিত্র দ্বারা মাতামহ কুলের এরূপ সামান্য উপকার অবশ্যই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। *

ভগবান বিষ্ণু স্বীয় সংহিতায় লিখিয়াছেন যে লেখ্য (দলিল) তিন প্রকার। তন্মধ্যে 'রাজ সাক্ষিক'ই প্রথম। তাঁহা এইরূপ 'রাজাধিকরণে তন্নিযুক্ত কায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতঃ রাজসাক্ষিকম্।' বোধ হয় রেজেষ্টরিকরা দলিল।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য রাজধর্ম্ম বর্ণনে বলিয়াছেন :—

চাটতস্করদুর্ব্বৃত্ত মহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড়ামানাঃ প্রজারক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চবিশেষতঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, প্রথমঅধ্যায়
৩৩৬ শ্লোক।

ইহা ভিন্ন অন্যকোন সংহিতায় কায়স্থ শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। মনু, গৌতম, উশনা প্রভৃতি সংহিতায় বর্ণসঙ্কর বা মিশ্র জাতির উৎপত্তি বৃত্তান্ত যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তদাবলম্বনে আমরা নিম্ন লিখিত তালিকা প্রস্তুত করিলাম।

সঙ্করবর্ণ।

অনুলোম

প্রথমশ্রেণী	পিতা	মাতা
মূর্দ্ধাবষিক্ত	ব্রাহ্মণ	ক্ষত্রিয়া।
মাহিষ্য	ক্ষত্রিয়	বৈশ্যা।
করণ	বৈশ্য	শূদ্রা।
দ্বিতীয় শ্রেণী		
অম্বষ্ঠ	ব্রাহ্মণ	বৈশ্যা।
নিষাদ	ঐ	শূদ্রা।
উগ্র	ক্ষত্রিয়	ঐ।
প্রতিলোম		
সূত	ক্ষত্রিয়	ব্রাহ্মণী।
মাগধ	বৈশ্য	ক্ষত্রিয়া।
বৈদহ	ঐ	ব্রাহ্মণী।
অয়োগব	শূদ্র	বৈশ্যা।
ক্ষত্তা	ঐ	ক্ষত্রিয়া।
চণ্ডাল	ঐ	ব্রাহ্মণী।

মনুর মতে নিম্নলিখিত জাতিগণ ব্রাত্য,—

ক্ষত্রিয়।
ঝল্ল।
মল্ল।
নিচ্ছিবি।
নট।
করণ। *
খস।
দ্রবিড়।

আরও অনেক প্রকার বর্ণসঙ্কর ও ব্রাত্য জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সে সকলের এস্থলে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে আমরা পুরাণের আলোচনা করিব।

অগ্নি পুরাণোক্ত জাতি মালায় লিখিত আছে :—'ব্রহ্মার পাদপদ্ম হইতে তিন বর্ণের সেবক শূদ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার

---

* কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের জন্মদাতা লিখিয়া গিয়াছেন :—

অম্বষ্ঠোগণকশ্চৈব ভট্টঃকরণ এবচ।
রাজপুত্রস্তথা শ্রেষ্ঠাজাতয়ো বর্ণ সঙ্করাঃ॥

* এই করণ বর্ণসঙ্কর করণ হইতে স্বতন্ত্র।

পুত্র হীম। হীমের পুত্র প্রদীপ। তৎপুত্র কায়স্থ। কায়স্থের তিনপুত্র যথা চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র। চিত্রগুপ্ত দেব লোক, চিত্র সেন নরলোক ও বিচিত্র নাগলোকে গমন করিলেন। চিত্র সেনের বংশাবলী নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।
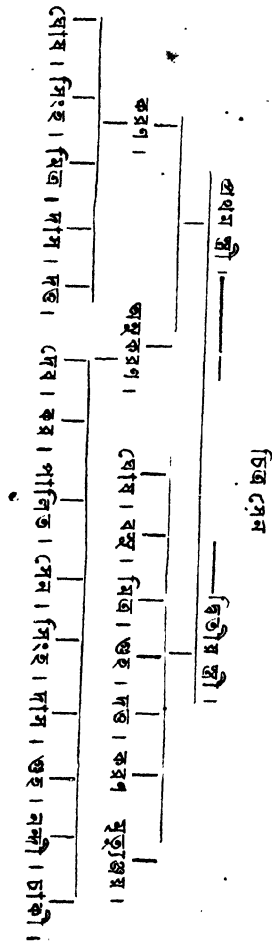
পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে লিখিত আছে,—

সৃষ্ট্যাদৌ সদসৎকর্ম্ম গুপ্তয়ে প্রাণিনাংবিধি
ক্ষণংধ্যানাস্থিতস্যাস্য সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ।
দিব্যরূপঃ পুমান্‌হস্তে মসীপাত্রঞ্চলেখনী।
চিত্রগুপ্ত ইতিখ্যাতো ধর্ম্মরাজ সমীপতঃ॥
প্রাণিনাং সদসৎকর্ম্ম লেখায় স নিরূপিতঃ।
ব্রাহ্মণাতীন্দ্রিয়জ্ঞানীদেবাগ্ন্যোর্যজ্ঞভুকসবৈ॥
ভোজনাচ্চ সদাতস্মাদাহুতির্দীয়তে দ্বিজৈঃ।
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থ বর্ণ উচ্যতে॥
নানাগোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থ ভুবিসন্থিবৈ।

এতদ্দ্বারা নির্ণীত হইতেছে যে, ধ্যানমগ্ন ব্রহ্মার কায় হইতে এক সুন্দর পুরুষ বিনির্গত হইলেন। তিনি প্রাণীগণের সদসৎ কর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিবার জন্য চিত্রগুপ্ত আখ্যা ধারণ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের সমীপে নিযুক্ত হইলেন। ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান স্বরূপ পুরুষকে ব্রহ্মা দেবাগ্নিমধ্যে যজ্ঞভাগ অর্পণ করিয়াছিলেন, এজন্য ব্রাহ্মণেরা পূজা ও ভোজনকালে তাঁহাকে আহুতি দিয়া থাকেন। ব্রহ্মকায় হইতে উৎপন্ন বলিয়া তিনি কায়স্থ নামে বিখ্যাত হইলেন। তদ্বংশীয় কায়স্থগণ নানা গোত্রে বিভক্ত হইয়া ভূতলে বাস করিতেছেন।

স্কন্দ পুরাণের মতে পরশুরামের ভয়ে ভীত গর্ভবতী ক্ষত্রিয় রমণী ব্রাহ্মণদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া যে সন্তান প্রসব করেন তাহারাই কায়স্থ।

স্মৃতি ও পুরাণে এই জাতির পক্ষে ও বিপক্ষে যাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল। এক্ষণ আমাদের দেখা উচিত প্রাচীনকাল হইতে কায়স্থ জাতি আর্য্য সমাজে কিরূপ গণ্য হইয়াছিল।

ভগবান মনু শূদ্রদিগের জন্য বিচারাসনের দ্বার চিরকালের তরে রুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মৃচ্ছকটীক নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই সময়ে বিচারকদিগের দুইজন সহযোগী (আধুনিক জুরী) থাকিত, তাহার একজন বৈশ্য ও দ্বিতীয় ব্যক্তি কায়স্থ। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যদি কায়স্থগণ শূদ্র বলিয়া গণ্য হইত, তাহা হইলে সেই সময় একজন ব্রাহ্মণের বিচার করিবার জন্য একজন কায়স্থকে বিচারাসনে দেখিতে পাইতাম না।

নাটকাদিগ্রন্থে সুন্দর সাময়িক সামাজিক চিত্র ও লোকের মনের ভাব অজ্ঞাতসারে প্রকাশ হইয়া পড়ে। এজন্যই আমরা মৃচ্ছকটীক নাটক হইতে একথাটি উদ্ধৃত করিলাম।

নৈষধকার শ্রীহর্ষ ১২। ১৩শত বৎসরের প্রাচীন লোক তাহার সময়ে কায়স্থগণকে কিরূপ বিবেচনা করা হইত তাহা তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। তিনি দময়ন্তীর সয়ম্বর সভায় উপস্থিত যমরাজার বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, 'চিত্রগুপ্তঃ কায়স্থ উচ্চৈগুর্ণ'।—টীকাকার নারায়ণ ভট্ট কায়স্থ শব্দের টীকা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, "কায়ে—দেহে তিষ্ঠতি—কায়স্থ। কায়স্থ যে তিন বর্ণের সেবক শূদ্রজাতি ইহা শ্রীহর্ষ কিংবা টীকাকারের মনেও হয় নাই। অধিকন্তু টীকাকার কায়স্থকে 'গণক' অর্থাৎ জ্যোতির্ব্বিৎজাতি বিশেষ ও রাজকর্ম্মচারী লিখিয়াছেন।*

৮২৯ বৎসর গত হইল কালিঞ্জরপতি চন্দ্রবংশীয় কীর্ত্তিবর্ম্মদেব জনৈক ব্রাহ্মণকে একখানা গ্রাম দান করিয়াছিলেন। সেই গ্রামে তাহার কুটুম্ব ও কায়স্থ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোক বাস করিতেন। শাসনপত্রে রাজা ঐ গ্রামবাসী 'কুটুম্ব, কায়স্থ' প্রভৃতি মহাত্মাগণের প্রতি আদেশ ঘোষণা করিয়াছেন। লালমোহন বাবু স্মরণ রাখিবেন, আপনি অদ্য যে জাতিকে নবশাখ শ্রেণীতে গ্রহণ করিয়াছেন,৮২৯ বৎসর পূর্ব্বে জনৈক চন্দ্রবংশীয় রাজা সেই জাতিকে 'মহৎ' বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনকালে আর্য্যনরপতিগণ ক্ষত্রিয় ও কায়স্থদিগকে যে ভূমি দান করিতেন, তাহাকে 'মহত্মারণ' বলিত।

'ঠাকুর' উপাধি আর্য্যসমাজে অতি গৌরবাত্মক, অদ্যাপি এই উপাধিটি কায়স্থদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে, যথা 'বসুঠাকুর' 'ঘোষঠাকুর' ইত্যাদি। কায়স্থদ্রোহীগণ ইহা পাঠ করিয়া অবশ্যই বলিবেন যে, কায়স্থগণ আপনাকে আপনি 'ঠাকুর' বলিয়া বলিতে পারে। তাহাতে সাধারণের কি আসিয়া যায়। কিন্তু তাম্রশাসন আলোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, রাটোড়বংশীয় কান্যকুব্জপতি গোবিন্দচন্দ্র দে-

---

* নৈষধ চরিত, চতুর্দ্দশ সর্গ ৬৭ শ্লোক ও তাঁহার টীকা দেখ। টীকাকারের লেখা পাঠ করিয়া ইহাই বোধ হয় যে, পরশুরামের অত্যাচারের কালে যেসকল গর্ভবতী রমণী ব্রাহ্মণদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সন্তানই কায়স্থ বলিয়া খ্যাত হন।

বের শাসনপত্রে স্পষ্টাক্ষরে 'কায়স্থঠাকুর' লিখিত আছে। এই শাসনপত্র ৮৪৫ বৎসরের প্রাচীন। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে প্রায় ৯ শতাব্দী পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় কায়স্থগণ ঠাকুর উপাধি ধারণ করিতে অধিকারী ছিলেন।

গোয়ালিয়ার পতি মহারাজাধিরাজ ভুবন পাল দেবের শাসন পত্রে তাহার গুণানুবাদ স্থলে লিখিত হইয়াছে। 'কায়স্থ বংশ বিপিনাম্বুধরঃ প্রহৃষ্টা।' এই শাসনপত্র ৭৮৯ বৎসরের প্রাচীন। সেই সময় যদি আর্য্য সমাজে কায়স্থ নীচজাতি বলিয়া গণ্য হইত, তাহা হইলে এইরূপ বর্ণনার কোন আবশ্যকতা ছিল না।

বুন্দেলখণ্ড প্রদেশ এক সময় কায়স্থ রাজন্যবর্গের শাসনাধীন ছিল। তাঁহাদের শাসনপত্র পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় 'বর্ম্ম দেব' উপাধিধারণ করিতেন, যথা 'যশোবর্ম্ম দেব' 'জয়বর্ম্ম দেব' ইত্যাদি। খ্রীষ্টাব্দের দশম ও একাদশ শতাব্দীতে তাঁহারা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

কঙ্কণ ব্রাহ্মণপ্রধান দেশ। এই দেশের অধিপতি শ্রীমৎ অপরাদিত্য দেবের প্রধান মন্ত্রী কায়স্থ ছিলেন।

গুরক্ষপুরের নিকট মহারাজ জয়াদিত্যের যে শাসনপত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে রাজকর্ম্মচারী নাগ দত্তের বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে যে 'নির্ম্মল কায়স্থ কুলজাত শ্রীনাগ দত্ত'।

খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীতে ত্রিকলিঙ্গাধিপতি মহারাজ জয়জয়ের 'সন্ধি বিগ্রহি' কায়স্থ ছিলেন, অন্যান্য শাসনপত্র পাঠ করিয়া বোধ হয় এই পদটি কায়স্থদিগের এক চাটিয়া ছিল। এইরূপ অনেক শাসন পত্রে কায়স্থ রাজকর্ম্মচারীদিগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এস্থলে তাহার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। রাজ্য শাসন, বিচার কার্য্য, লিপি ও জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা প্রভৃতি প্রাচীন কাল হইতে কায়স্থ জাতির জাতীয় ব্যবসা। সংগ্রাম ক্ষেত্রে আমরা সেই প্রাচীন কাল হইতে কায়স্থ জাতিকে দণ্ডায়মান দর্শন করিতেছি।

তন্ত্র ও অন্যান্য গ্রন্থে কায়স্থ জাতির যেরূপ বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও এস্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

আচারনির্ণয় তন্ত্রে লিখিত আছে ;—

'ককারং ব্রাহ্মণং বিদ্যাদাকারং নিত্য সংজ্ঞকং। আয়স্তু নিকটং জ্ঞেয়ং তত্র কায়েহি তিষ্ঠতি॥

'ক' শব্দের ব্রহ্মবিদ্যমান, 'আ'= ব্রহ্ম নিত্য, 'আয়'= ব্রহ্ম নিকট আছেন। এই জ্ঞান যাঁহার কায়ে আছে তিনিই কায়স্থ।

আচার নির্ণয় তন্ত্রের মতে কায়স্থের অপর নাম 'মসীশ'। * উক্ত তন্ত্রের মতে এই জাতি ক্ষত্র ও বৈশ্যের তুল্য—'মসীশায়াদীক্ষিতায় ক্ষত্র বৈশ্যোপমায়চ'। এজন্যই কোন স্মৃতিকার বলেন ;—

গঙ্গা ন তোয়ং কণকং নধাতু—
তৃণং ন দর্ভঃ, পশবো ন গাবঃ।

* জাত্যামসীশাঃ কায়স্থা ব্রাহ্মণেশ্বর মানসাঃ
মহা বিদ্যোপাসকাশ্চ গুণতঃ ক্ষত্রিয়োপমাঃ॥

প্রাজপতেঃ কায়সমুদ্ভবাচ্চ
কায়স্থবর্ণা ন ভবন্তি শূদ্রাঃ॥

বিজ্ঞান তন্ত্রে লিখিত আছে ;—

ব্রহ্মোবাচ—

নাম্না ত্বং চিত্রগুপ্তোঽসি মমকায়াদভূর্যতঃ।
তস্মাৎ কায়স্থ বিখ্যাতির্লোকে তব ভবিষ্যতি॥
কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়োবর্ণ ন তু শূদ্রঃ কদাচন।

ব্যোমসংহিতায় লিখিত আছে ;—

ব্রহ্মকায়সমুদ্ভূতঃ কায়স্থো বর্ণসংজ্ঞকঃ।
কলৌহি ক্ষত্রিয়স্তস্য জপযজ্ঞেষু রাজনং॥

মহর্ষি আপস্তম্ভ বলেন ;—

বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়াজাতাঃ কায়স্থাজগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রোভূমিমণ্ডলে॥
চৈত্ররথসুতস্তস্য যশস্বীকুলদীপকঃ।
ঋষিবংশে সমুদ্ভূতো গৌতমো নাম সত্তমঃ॥
তস্যশিষ্যো মহাপ্রাজ্ঞ শ্চিত্রকুটাচলাধিপঃ।
আপস্তম্ভ শাখা।

লালমোহন বাবু কায়স্থদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ বিকৃত কটাক্ষ করিয়াছেন। অন্যান্য কোন কোন লেখকও ঐরূপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। এজন্য আমরা কতকগুলি বচন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। এক্ষণ কায়স্থ ও বৈদ্যদিগের সম্বন্ধে আমরা স্বীয়মত প্রকাশ করিব। ধর্ম্মশাস্ত্রকার ও পুরাণকর্ত্তাগণ যাহাই বলুন না কেন, আমাদের বিবেচনায় প্রাচীন আর্য্যসমাজে জাতি ও বর্ণভেদ প্রথা ছিল না। পরে গুণ ও কার্য্য অনুসারে জাতিভেদ হয়। কায়স্থ লিপিব্যবসায়ীদিগের সাধারণ আখ্যা। কতকগুলি ক্ষত্রিয়, অম্বষ্ঠ ও করণ এই ব্যবসা অবলম্বন করিয়া কায়স্থ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পশ্চাৎ কায়স্থ একটি জাতীয় আখ্যা হইয়া উঠিল। সমস্ত ভারতনিবাসী আর্য্যগণ মিশ্রবংশজ। তদনুসারে কায়স্থ ও বৈদ্যগণ সেই শ্রেণীর অন্তর্গত।

বৈদ্য ও কায়স্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা শাস্ত্রে নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্তই কি সত্য! সত্য কি কখনও দুই প্রকার হইতে পারে?—না, কখন না। শাস্ত্রকারদিগকে নমস্কার। তাঁহারা যখন যাহার প্রতি সদয় হইয়াছেন তখনই তাহাকে স্বর্গে তুলিয়াছেন। আবার যাহার প্রতি নির্দ্দয় হইয়াছেন, তাহাকে নরকে নিক্ষেপ করিতে এক মুহূর্ত্তও গৌণ করেন নাই। এক মহর্ষি যাহাকে বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠবর্ণ লিখিয়াছেন, অন্য মহাত্মা তাহাকেই 'জারজ, অন্ত্যজ, অধম' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা অপমানিত করিয়াছেন। এসকলের মর্ম্ম কি কেবল তাঁহাদের খামখেয়ালি নহে? কেবল পরকে নির্য্যাতন করিব, ইহাই কি তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল না? যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কৈবর্ত্ত রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া অন্ত্যজ জাতীয় রমণী শুকীর গর্ভে শুকদেবের জন্মদান করিয়াছিলেন। তিনিও আবার বর্ণসঙ্করের বর্ণনা করিয়াছেন। যে বশিষ্ঠ বেশ্যাগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া শূদ্রা রমণী অক্ষমালার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিও কি বর্ণসঙ্করের নিন্দা করিতে পারেন? মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ যেরূপ বর্ণসঙ্করের বর্ণনা করিয়াছেন, যদি তাহা সত্য হইত, তাহা হইলে বশিষ্ঠ, কানদ, ব্যাস মন্দপাল, শুক প্রভৃতি ঋষিপুঙ্গবগণ

কথনই ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন না। এ-জগতে অনন্তকাল প্রতিভার পূজা হইয়াছে ও হইতে থাকিবে। যে দিবস ভারতের সৌভাগ্য (বৌদ্ধ) সূর্য্য অস্তমিত হইল, সেই দিবস ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনী ভারত গগণ অন্ধকার করিল। ব্রাহ্মণেরা সেই অন্ধকারে বসিয়া শাস্ত্রের মধ্যে অশাস্ত্র পূর্ণ করিয়া ভারতের সর্ব্বনাশের সূচনা করিতে লাগিলেন। আমরা ইহা অনেকবার বলিয়াছি যে, বৌদ্ধবিপ্লবের পূর্ব্বে আমাদের যে ধর্ম্মশাস্ত্র ছিল, তাহা আর এক্ষণ নাই। আমরা শাস্ত্রনিন্দুক নহি, প্রকৃত শাস্ত্রকে অনন্তকাল পূজা করিব। কিন্তু যেস্থলে শাস্ত্রের মধ্যে অশাস্ত্রীয়তা বা খামখেয়ালি দেখিব, তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছিঁড়িয়া সমুদ্রজলে বিসর্জ্জন করিতে একটুকুও ক্ষুব্ধ হইব না। শাস্ত্রের যেঅংশে প্রকৃতিদত্ত মানবস্বাধীনতা ও প্রতিভা বিনষ্ট করিবার জন্য কুবুদ্ধি কূটমার্গে পরিচালিত হইয়াছে, সেই অংশ ছিঁড়িয়া অগ্নিতে দগ্ধ করা উচিত।

বৈদ্য জাতির সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব। আমাদের বিবেচনায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ ও বৈদ্য এক জাতীয়। তাহার প্রমাণ ও যুক্তি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

১। অম্বষ্ঠগণ ভারতের সর্ব্বত্রই কায়স্থ শ্রেণীর অন্তর্গত। বঙ্গদেশীয় বৈদ্যগণ যদি প্রকৃতপক্ষে অম্বষ্ঠ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারাও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত।

২। বৈদ্য বলিয়া ভারতের অন্য কোন প্রদেশে এক ভিন্নজাতীয় লোক নাই। মহারাষ্ট্র দেশে কতকগুলি কায়স্থ চিকিৎসাব্যবসায়ী। আমাদের পদবীর ন্যায় (যথা ঘোষ, বসু, দত্ত, সেন,) তাহাদেরও নামের অন্তে বৈদ্য * শব্দ সংযুক্ত রহিয়াছে। বোধ হয় বঙ্গদেশেও এইরূপই ছিল। ক্রমে চিকিৎসাব্যবসায়ী কায়স্থগণ 'বৈদ্য' নামে এক স্বতন্ত্র জাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৩। লালমোহন বাবু কুলপঞ্জিকার বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, চিকিৎসক ধন্বন্তরির তিন পুত্র, সেন, দাস ও গুপ্ত। সেনের চারি পুত্র, দাসের তিন পুত্র ও গুপ্তের পাঁচ পুত্র। ক্রমে ইঁহারা স্ব-

---

*মহারাট্টা দেশীয় কায়স্থগণ ২৬ গোত্রজ। তাহাদের ৪১ টি পদবী আছে যথা, ১ গরুড়, ২ গুপ্ত, ৩ বহির, ৪ দল্লী, ৫ নাচনি, ৬ কানাট, ৭ দিক্ষিত, ৮ গড়করী (দুর্গরক্ষক), ৯ রাওরা, ১০ ক্ষিপ্রে, ১১শঠে ১২ জয়বন্ত, ১৩ শৃঙ্গারপুরে, ১৪ জাবলে, ১৫ কর্ণাটকী, ১৬ প্রধান, ১৭ রণদিবে, (রণবিজয়ী,) ১৮ স্থলে, ১৯ সাতপুতে, ২০ পাটণকর, ২১ তাম্ব্রণে, ২২ ফণাস, ২৩ খাটিক, ২৪ বেন্দ্রে, ২৫ বৈদ্য, ২৬ পংগুলে ২৭ কৌড়রে, ২৮ লিখিতে, ২৯ বিবাদে, (রাজদূত), ৩০ দবলে, ৩১ বাঘুলে, ৩২ চিত্রে, ৩৩ মোহিলে, ৩৪ বোথারে, ৩৫মুখে ৩৬ উলকন্দ, ৩৭ ভিসে, ৩৮ চৌবল, (চারিপ্রকার সৈন্যের নায়ক), ৩৯ থলে, ৪০ তিরেকর, ৪১ দেউপাত্র।

(একখণ্ড মহারাট্টা সাময়িক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করা গেল।)

জাতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্নজাতীয় দেব, দত্ত, ধর, কর প্রভৃতি বংশে বিবাহ করিলেন। সেই সেই বংশীয়া রমণীর গর্ভে যেসকল সন্তান হইল, তাঁহারা মাতামহের গোত্র ও পদবী প্রাপ্ত হইলেন। এইক্ষণ কথা হইতেছে এই সকল ভিন্নজাতীয় দেব দত্ত, কর কোন্ শ্রেণীর লোক। বৈদ্যগণ যে স্বর্ণবণিক প্রভৃতি জাতির সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহা কোন মতেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। আমরা বিবেচনা করি ইহাঁরা স্বয়ং কায়স্থ বলিয়া কায়স্থের সহিত পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। অদ্যাপি বাঙ্গালার কোন কোন প্রদেশে কায়স্থ বৈদ্যে বিবাহ প্রচলিত রহিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই দুই শ্রেণীতে বহুকাল যাবৎ আদান প্রদান হইয়া আসিতেছে। এমতাবস্থায় আমরা অবশ্যই বলিতে পারি, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ ও বৈদ্য একজাতি, কার্য্যানুসারে মেলবন্ধন দ্বারা দুই পৃথক্‌শ্রেণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভাই কায়স্থ! ভাই বৈদ্য! রাগ করিও না, পুরাতত্ত্বালোচনা দ্বারা যাহা আমাদের সত্য বলিয়া হৃদয়ে ধারণা হইয়াছে, তাহাই তোমাদিগকে উপহার অর্পণ করিলাম। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের পরেই কায়স্থ ও বৈদ্য।

The improved position of some of the mixed races appears from the importance, which is attached to the Kayasthas and Vaidyas. The former as writers, and the latter as physicians, are undoubtedly reckoned as *gentlemen.* They occupy in Bengal a rank second only to Brahmins. The priest look-up to them, as the Rishis of yore looked up to the Khetriyas. (K. M. Banerjee.)

তাই বলিতেছিলাম, ভাই কলহ পরিত্যাগ করিয়া, আইস আমরা পরস্পরের সাহায্যে উন্নতির পথে ধাবিত হই। কলহ করিয়া অধঃপাতে গেলে কি হইবে? প্রাচীন ভারতে গুণের দ্বারা জাতিভেদ হইয়াছিল। ইহা শাস্ত্রকারগণ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তবে তাহার পূর্ব্বপুরুষ শূদ্রার গর্ভজাত ‘তোমার পূর্ব্বপুরুষ বৈশ্যার গর্ভজাত’ ‘আমার পূর্ব্বপুরুষ ক্ষত্রিয় ছিলেন,’ এই সকল অকর্ম্মণ্য কথা লইয়া গণ্ডগোল করিলে, কিছুই হইবে না। সকলেই মনুর সন্তান।

When Adam delt Eve spen
Who was then a gentleman.

লালমোহন বাবু আদিশূর বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন প্রভৃতির সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী সকলেই জানেন, ও ঘোষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণের সঙ্গে ‘ডিট্’ দেওয়া আমাদের স্বভাবের বিপরীত কার্য্য। এইসকল বিষয় লইয়া আমরা লালমোহন বাবুর সহিত কলহ করিতে ইচ্ছা করি না, কারণ তিনি ঐতিহাসিক জগতে বালক মাত্র।

If an offence come out of the Truth, better is it that the offence come, than the truth be concealed. (Jerome)

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

সরস্বতী পূজা।

১

জাগো মা, জাগো মা, জাগো মা আমার,
শ্বেত-পদ্মাসনে, ক্ষিরোদ বাসিনি,
জাগো মা, জাগো মা, উঠ একবার,
অরবিন্দমুখী অমর নন্দিনি ;
মরমবেদনা হায় রাখি একধারে,
দেখ চেয়ে, আজি পুন বৎসর অন্তরে
সেবিছে চরণ তব ভারত দুঃখিনী।
প্রতিগৃহে আজ, বাজিছে মধুরে,
আমরি কি মধুর বাদন !
পীযূষ বরষি, এস্রার, সেতার,
বাঁশী বীণ শ্রুতি-বিমোহন।
গাইছে ললিত, কণ্ঠ সুললিত,
তানে তানে মোহিছে পরাণ,
নানাজাতি ফুল হাসিছে উল্লাসে,
অনীল বিভোর লয়ে ঘ্রাণ ;
দিক আমোদিত অগুরু সুবাসে,
ধূপ ধুনা সুগন্ধসঞ্চারে।
বাজে ঢাক ঢোল প্রতিধ্বনি তার
বিদারি শূন্য ছুটিছে দূরে।
চেয়ে দেখো, আজিও মা তব নামগুণে
মৃতে পরকাশ ক্ষণ জীবনলক্ষণ,
মাঘ-শীত সঙ্কুচিত তুহিনার্ত্ত দেশে
আজো তব নামে বহে মলয় পবন।
অদ্যাপি ও নামে, 'কুহু' 'কুহু' বলি,
কোকিলা পঞ্চমে ধরে গো তান,
শোভে মনোরম নিকুঞ্জ শোভায়,
পত্রহীন, শুষ্ক কাননস্থান
মনসরসীতে, শ্বেত শতদল,
এখনো আপনি ফুটেগো সতি,
না যেতে হিমানী, সরস বসন্ত,
এখনো জগতে করে গো গতি।
যুবা বৃদ্ধ শিশু, অদ্যাপি সকলে,
তব সাধনায় ক্ষণেক জাগে
অদ্যাপি তোমার, চরণ সরোজে,
দেয় পুষ্পাঞ্জলি ভকতিযোগে।
এস গো, এস গো তবে,
কবি-কণ্ঠ-বিহারিণি,
করুণনয়নে, আর্য্যভূমি পানে,
চাহ একবার, অয়ি বরাননে,
ধর সে জ্ঞানদা-মূর্ত্তি,—
মন-তিমির-নাশিনী।
ভারত, ধরিত্রী দেহে তোমার অচেনা নহে
ভাবুকের বিলাস উদ্যান ;—
এত সেই কবি-কুঞ্জ—
তোমারি বিহার স্থান !
এই পুণ্য দেশে, ভুলেছ, জননি,
ওপদ পরশে দস্যু রত্নাকর
পে'ল অমরতা,—দেবারাধ্য ধন ;
হ'ল সে বাল্মীকি রতন আকর,
অমৃত রচিয়া, বিশ্ব কাঁদাইয়া
উচ্ছ্বাসে কাঁদিল মুনি ;
রামসীতা সনে, তুমিও আপনি,
কত না কেঁদেছ, বাণি ॥

এই কুঞ্জবাসে, পড়ে কি, তা, মনে ?
দৃঢ় স্নেহ-পাশে বাঁধিল তোমায়
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, নাচিলে গো তুমি
করধৃত তাঁর, পুতুলের প্রায়।
কবি কালিদাস, ভবভূতি আর,
সেবি ও চরণ দ্বয়
এনশ্বর পুরে, নশ্বর শরীরে,
অজড় অমর হয়।
খনা, লীলাবতী যতেক রমণী
সেবায় তোষিল,জ্ঞানদে, তোমায়,
স্ত্রীজন-সুলভ চাপল্যকৌমার্য্য
কঠোর সাধনে ত্যজিল হেলায়।
এই পুণ্য ধামে পথিকের বেশে
আত্রেয়ী তাপসবালা,
তব অনুরাগে উন্মাদিনী যেন
অগস্ত্য আশ্রমে গেলা।
অহো কি গৌরব ছিল গো তোমার!
ওচরণ রজ লভিয়ে মাথায়
ফল মূলাহারী, চির-ধারী ঋষি
অতুলিত শক্তি ধরিত ধরায়!
চে'ত না সম্পদ, বিশ্বের ঐশ্বর্য্য
চরণে লুটাত আসি,
দমিত অসুর, শাসিত রাজেন্দ্রে,
পাতার কুটীরে বসি।
হায় রে সে দিন নাহি আর্য্য ভূমে,
ভক্তি-রসে মাতি এবে কেহ আর,
পূজে না তোমায়, ভুলেছে সে মন্ত্র,—
সে মহাসাধনা স্মরণে কাহার
নাহিক আজিকে ; স্বর্ণ ভূমি আজি
শ্মশান সদৃশ হায়,
চেতন-বিহীন জীব-কুলবাস
জীয়ন্তে মৃতের প্রায়।
অনাহারে ক্ষীণ দারিদ্র্য-লাঞ্ছনে
লাঞ্ছিত সবাই, প্রাণ-রক্ষা দায়,
'হা অন্ন' 'হা অন্ন' মুখে হাহাকার
লুপ্ত জ্ঞান-তৃষা উদর-জ্বালায়!
হায় মা আজিকে মুষ্টি ভিক্ষাতরে
ভারত ভিখারী প্রায়
দাসত্বের লাগি, সারদে, তোমার,
করুণা সম্প্রতি চায়।
আজি ক্ষুণ্ণপ্রাণ অভাব তাড়নে,
ডুবিয়ে কলঙ্কে, দহি অপমানে,
নয়নে আঁধার দেখি,সভয়ে মা তোরে ডাকি,
চাবে না কমলা ফিরে বাঙ্গালের পানে,
দুখীর জননী তুমি, বিদিত ভুবনে।
হের আজি পুন, ভকত-বৎসলে,
ভারত-ললনা পূজিছে তোমার
রাজীব চরণ, যুগযুগান্তরে,
দেহ পদছায়া নাশো দুঃখভার।
যতেক বিনোদ বালা
গাঁথিল বিনোদ মালা,
পবিত্র হৃদয় হ'তে
আহরি কুসুম দল।
লহ মালা মা ভারতি,
দুখিনী ভারত-সতী,
আনিয়াছে মালাগাঁথি
মাখিয়া নয়ন জল।
ভারত মানসপদ্মে জেগে থাক বাণি
কর, মাত, মৃত দেহে অমৃত-সিঞ্চন
আবার বাঁচিবে তবে ভারত দুঃখিনী,
হবে সে আবার তোর প্রিয় নিকেতন।

শ্রীহরঃ—

সংক্ষিপ্ত-সমালোচন।

১। 'সৌভাগ্য-সোপান। শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র দাস গুপ্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রণীত।' প্রাতরুত্থান, সময়ের ব্যবহার, আত্মাবলম্বন ও পরিশ্রম ইত্যাদি নীতিগর্ভ বিষয়ে এই পুস্তকে ত্রিশটি প্রবন্ধ আছে। পুস্তকের লেখা মোটের উপরে মন্দ নহে। কিন্তু ইহাতে অন্যদীয় লেখা হইতে উদ্ধৃতির ভাগই অধিক। গ্রন্থের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্রই 'হাণ্টার বলিয়াছেন,' 'জনসন বলিয়াছেন,' 'এডিসন বলিয়াছেন,' 'কালিদাস বলিয়াছেন,' 'ইমারসন বলিয়াছেন,' এইরূপ উদ্ধৃতিবোধক, উক্তি পুনঃ পুনঃ সম্মুখে পড়িল। ইহা পাঠকের একটুকু বিরক্তিকর। গ্রন্থকার নিজে কি বলিতেছেন, পাঠক তাহা শুনিতেও ইচ্ছুক হইতে পারে। এইরূপ লেখা স্থলবিশেষে মন্দ নহে। ইহার নিদর্শন (Smiles) স্মাইল কৃত গ্রন্থাবলী। কিন্তু গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় কিংবা প্রতি প্যারেগ্রাফেই যদি সামান্য ও অসামান্য সকল কথার প্রসঙ্গে পরকীয় লেখার উদ্ধৃতি থাকে, এবং তাহাতেই গ্রন্থের কলেবর পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে পাঠসময়ে কাহারই সুখবোধ হয় না। যাহা হউক, এসকল দোষসত্ত্বেও এই পুস্তক কিয়ৎপরিমাণে বালকশিক্ষার উপযোগি হইয়াছে।

২। 'চারু-নীতি-পাঠ। শ্রীকালীকৃষ্ণ দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত'। একদিকে চারুপাঠ, আর এক দিগে নীতি পাঠ, ইহার মধ্যে চারুনীতিপাঠ। কিন্তু মধ্যে বলিয়া ইহা যে নীতিপাঠ অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসনীয় হইয়াছে, এমন কথা বলিতেছি না। অথচ ইহা অপাঠ্যও নহে। যে সকল পুস্তক বঙ্গীয় বিদ্যালয়সমূহে 'পাঠ্য' বলিয়া গৃহীত হইতেছে, ইহা তাহার মধ্যে নিবিষ্ট হইবার অযোগ্য নহে।

৩। 'জীবন-সঞ্চার। শ্রীযোগেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত'। জননেন্দ্রিয়ের ব্যবহার ও অপব্যবহার সম্বন্ধে যে সকল কথা বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেরই জানা আবশ্যক, এই পুস্তকে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু লেখা সকল স্থলে উপযুক্ত প্রণালীতে হয় নাই।

৪। 'বৈজ্ঞানিক দাম্পত্য-প্রণালী; অর্থাৎ বিবাহ, ইন্দ্রিয়সেবন ও সন্তান উৎপাদন বিষয়ে বিজ্ঞানের বিধি এবং অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবনের প্রতিফল ও প্রতিকার, ইন্দ্রিয় সংযমন, নারীজাতির জননেন্দ্রিয়ের ব্যাধি ইত্যাদির বিবরণ সংগ্রহ। ঢাকা মেডিকেল স্কুলের কেমিকেল এসিস্‌টাণ্ট শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত'। বিবাহবিষয়ে বিজ্ঞানের নিকট কি ব্যবস্থা পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিক দাম্পত্যপ্রণালীতে তাহাই সবিস্তার লিখিত হইয়াছে। লেখক

সমাজের শুভাভিলাষী তাহার আর সন্দেহ নাই। তিনি এই পুস্তক লেখা উপলক্ষে বিস্তর পরিশ্রমও স্বীকার করিয়াছেন।

৫। 'ঢপ সঙ্গীত : (চারিখণ্ডে সমাপ্ত) প্রথম খণ্ড। অক্রূরসংবাদ। ৺মধুসূদন কিন্নর বিরচিত। শ্রীমহিমচন্দ্র বিশ্বাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত'। বাঙ্গালা ভাষা যখন অস্ফুট-সৌন্দর্য্য বালিকার মত আধ আধ মধুরস্বরে কথাটি মাত্র কহিতে আরম্ভ করিয়াছেন, প্রসিদ্ধনামা মধুসূদন সেই সময়ের গায়ক। তিনি সেই সময়ে যেরূপ মধুমাখা পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন, এখনও তাহা অনেকের অনুকরণযোগ্য হইতে পারে। আমরা নিম্নে তাঁহার তিন ভাবের তিনটি গীত তুলিয়া দিলাম। বোধ হয় তিনটি গীতই পাঠকের প্রীতিকর হইবে।—

রাগিণী দেওগিরী। তাল ঢিমা তেতালা।

যাচ্ছ যদি গোকুলে।
ব'লো তায় যেওনা ভুলে,
পাষাণ চাপা মায়ের বুকে,
স্বচক্ষেতে দেখে গেলে॥
যত দ্বারী করে বন্ধন,
তত ডাকি আয় কৃষ্ণধন,
মনে নাই দুঃখিনীর বেদন,—
হ'য়ে যশোদার ছেলে॥
জনকের যন্ত্রণা ব'লো
শুনে হবে সুখজনক,—
পাসরি র'য়েছে জনক,
গোকুলে পেয়েছে জনক;
ঐ দেখ দাঁড়ায়ে পায়ে,
আরও প্রহার পায়ে পায়ে,
দিনান্তে না খেতে পেয়ে,
বাঁচে কেবল কৃষ্ণ বলে॥
ব'লো তারে ভাল করে,
গিয়াছে খুব ভাল ক'রে,
মাতা পিতা হত্যাপাতক
কিছুই না মনে করে,
সূদন বলে ও দেবকী
ওকথা আর বলিব কি,
চিরকাল ত এমনি দেখি
পাতকী তোমার ছেলে॥

রাগিণী মঙ্গল-বিভাষ। তাল ঢিমা তেতালা।

রাই তুমি অমূল্য মালা,
গাঁথিছ যার কারণে।
মথুরায় তার মালাবদল
হবে না জানি কা'র সনে॥
কেন গাঁথ চিকণ মালা,
ছেড়ে যাবে চিকণ কালা,
শেষে কেবল ঐ মালা
জপমালা হবে মনে॥
মালা হেরে হবে জ্বালা,
মর্‌বি প্রাণ জ্বলে—
শেষে মালা ভেসে যাবে
নয়নের জলে,—
কেন গাঁথ বনমালা,
দিতে হবে বনে মালা,
মথুরায় সব চাঁদের মালা,
মতির মালা দিবে এনে॥
কাল হারাবি মোহন মালা
মালা পরিবে কে—
কাঁদিবি বলে মদন মোহন,
মরিবি সেই দুঃখে,—

রথ লয়ে এসেছে মুনি
হ'রে নিতে মাথার মণি,
সূদন বলে বিনোদিনি!
বৃথা মালা গাঁথ কেনে॥

রাগিণী পরজ। তাল—মধ্যমান।

ও মন-রথ রাখ, রথ রাখ থাক
বারেক ফিরিয়ে দেখ,
আর হবে না দেখা দেখি,
দেখি দেখি, দেখ দেখ॥
ত্যজ্য করি মনোরথ,
আরোহিলে মুনিরথ,
আমরা কেবল অবিরত,
কাঁদতে রত চেয়ে দেখ॥
একবার মনে করেছিলাম
হয় গিয়ে হয় ধরি,
হেরিয়ে তুরঙ্গ রঙ্গ
আতঙ্কেতে মরি—
একবার ভাবি ধরি চক্র,
ঘুচাই অক্রূর মুনির চক্র
এখন দেখি চক্রীর চক্র,
তুমি এত চক্র রাখ॥
আবার ভাবি মরি গিয়ে
মিছে কেন ভাবি,
পরে ভাবি সে ভাবনা
আমরা কেন ভাবি—
কি করি বুঝে না যে মন
মন তোমার পাষাণ কেমন,
সূদন কয় কথা কেমন—
বলেছিলেন যা'ব না ক॥

শেষোদ্ধৃত গীতটি ভারতব্যাপী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা এবং বৈষ্ণব-কবিকুঞ্জের কল্পলতা, প্রেমগতপ্রাণা প্রেমময়ী রাধিকার উক্তি। এই গীতের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তি অর্থাৎ 'বারেক ফিরিয়ে দেখ,—আর হবে না দেখা দেখি—দেখি দেখি,দেখ দেখ'—এই কথাকটি অতি উচ্চশ্রেণীর কবির যোগ্য। এগীত গুলিতে যেসকল দোষ দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে অনুপ্রাস বহুল্যই প্রধান। 'হয় গিয়ে হয় ধরি'—এরূপ বাঙ্গালা এখন আর লোকের প্রীতিকর হইতে পারে না। কিন্তু মধুকান যে সময়ের কবি ছিলেন, সে কালে এইরূপ অনুপ্রাসেই লোকের বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং অনুপ্রাসের মুন্সীয়ানাতেই কবির প্রশংসা ও কবিত্ব-শক্তির পরীক্ষা হইত। সুতরাং মধুসূদনের এই দোষ পরিমার্জ্জনীয়। সাধারণ পাঠক সমাজের রুচি লেখকদিগের উপরে এখনও যখন অপরিসীম আধিপত্য করিতেছে, তখন সাহিত্যের প্রথম বিকাশসময়ে উহার আধিপত্য যে একবারে অনুল্লঙ্ঘনীয় হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

আমরা উপসংহারে বাবু মহিমচন্দ্র বিশ্বাসকে ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য মনে করি। যদি তাঁহার প্রযত্নে মধুসূদনের সকল গুলি গীত সাবধানে সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে বঙ্গদেশের একশ্রেণীস্থ পাঠক যে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিবে,তাহার সন্দেহ নাই; এবং যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রত্যেক স্তর পরীক্ষা করিয়া উহার গঠন ও বিকাশের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও বিশেষরূপে উপকৃত হইবেন।

প্রাচীন ভারত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বিধবা।

অতি পূর্ব্বকালে আর্য্যসমাজে বিধবার বিবাহ প্রচলিত ছিল বলিয়াই বোধ হয়; কেন না আমরা কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকে একটি শ্লোক দেখিতে পাই;—

উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকমিতাসুমেতমুপ শেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তমে তৎপত্যুর্জনিত্বম-ভিমম্বভূব। ৬ অঃ

শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন "উঠ! মৃতব্যক্তির নিকট পড়িয়া কেন? মৃত পতি পরিত্যাগ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ কর; এবং বিবাহ ইচ্ছায় যিনি তোমার হস্ত ধারণ করিয়াছেন তাঁহাকে বিবাহ কর *।" তদানীন্তনকালে এইরূপ প্রথা ছিল যে, নববিধবা স্ত্রী পতির চিতার বাম পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিত এবং উপরোক্ত বচনটি বলিয়া তাহার মৃত পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিংবা কোন আত্মীয় তথা হইতে তাহাকে উঠাইয়া নিজে বিবাহ করিতেন; অথর্ব্ববেদেও এপ্রথাকে দূষণীয় বলা হয় নাই †। মনুও অনাঘ্রাত বালিকার পুনরায় বিবাহ যুক্তিযুক্ত বলিয়াছেন (৯। ১৭৬); কিন্তু তিনি অনেক স্থলেই ইহার নিষেধক ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন;—তথাপি বিধবার গর্ভজাত সন্তানকে "পৌনর্ভব" সন্তান নামে অভিহিত করিয়া দ্বাদশ পুত্রের অন্তর্নিবিষ্ট করায় ইহাই প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, তাঁহার সময়ে বিধবার বিবাহ সমাজে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। তিনি বিধি ব্যবস্থার দ্বারা ইহা নিবারণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে সম্যক কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; কেন না তাঁহার অনেক পরবর্ত্তী কালেও ইহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব অবলোকন করি। আমরা দেখিতে পাই, রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালী রাজার পত্নী তারা, নিজ পতির মৃত্যুর পর, স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবকে এবং রাবণপত্নী মন্দোদরী বিভীষণকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মহাভারতেও ইহার অভাব নাই; দময়ন্তী নলরাজার অন্বেষণার্থ দ্বিতীয়বার স্বয়ম্বর ঘো-

* See Funeral ceremonies of Ancient India. Journal of the Asiatic Society No IV, 1870.

† See ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায় P. 79

বগা দিয়াছিলেন ; যদি পুনর্ব্বিবাহ প্রচলিত না থাকিত, তাহা হইলে কথনই এরূপ পরিদৃষ্ট হইত না। পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির জন্ম এইরূপে। আবার তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন নাগরাজের বিধবা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ; যথা মহাভারত ভীষ্মপর্ব্বে ;—

অর্জ্জুনস্যাত্মজঃ শ্রীমান্ ইরাবান নাম বীর্য্যবান।
সুতায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেনধীমতা॥
ঐরাবতেন যা দত্তা হ্যনপত্যা মহাত্মনা।
পত্যৌ হতে সুপর্ণেন কৃপণাদীনচেতসা॥
ভার্য্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃকামবশানুগাং॥

অর্থাৎ নাগরাজকন্যার গর্ভে অর্জ্জুনের ইরাবান নামে এক শ্রীমান,বলসম্পন্ন পুত্র জন্মে; গরুড় কর্ত্তৃক ঐ কন্যার প্রথম পতি বিনষ্ট হইলে, নাগরাজ ঐরাবত সেই দুঃখিতা অপুত্রবতী কন্যা অর্জ্জুনকে প্রদান করিলেন। তিনিও কামপরতন্ত্র হইয়া,সেই বিবাহার্থিনী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্রেও অনাঘ্রাত বিধবার বিবাহ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে *। নারদসংহিতায় এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোক কটি পরিদৃষ্ট হয়, যথা,—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥
অষ্টৌবর্ষাণ্যপেক্ষেত ব্রাহ্মণীপ্রোষিতং পতিং।
অপ্রসূতাসু চত্বারি পরতোহন্যং সমাশ্রয়েৎ॥
ক্ষত্রিয়া ষট্ সমাস্তিষ্ঠেৎ অপ্রসূতা সমাত্রয়ং
বৈশ্যাপ্রসূতা চত্বারি দ্বেবর্ষেত্বিতরাবসেৎ॥
ন শূদ্রায়াস্মৃতঃ কালঃ এষ প্রোষিতযোষিতাং।
জীবতি শ্রূয়মানেতু স্যাদেষ দ্বিগুণোবিধিঃ॥
অপ্রবৃত্তৌতু ভূতানাং দৃষ্টিরেষ প্রজাপতেঃ।
অতোহন্যগমনে স্ত্রীণাং এষ দোষো ন বিদ্যতে॥

অর্থাৎ স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মৃত হইলে, সংসার-ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে, ক্লীব অথবা পতিত হইলে স্ত্রীগণের পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্রবিহিত; স্বামী অনুদ্দেশ হইলে,ব্রাহ্মণী আট বৎসর, কিন্তু অপুত্রবতী হইলে চারি বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া, অন্য পতি আশ্রয় করিবেন ; ক্ষত্রিয়া ছয় বৎসর, সন্তান না থাকিলে তিন বৎসর ; বৈশ্যা চারি বৎসর, অপ্রসূতা হইলে দুই বৎসর ; এবং শূদ্রার প্রতীক্ষার সময় নির্দ্দিষ্ট নাই। কিন্তু স্বামী অনুদ্দেশ হইলেও যদি জীবিত আছেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, তবে পূর্ব্বোক্ত কালের দ্বিগুণকাল প্রতীক্ষা করিবেন, প্রজাপতির এই মত ; এই জন্য এইরূপ রমণী গণের অন্য পতি আশ্রয় দোষাবহ নহে। পরাশরও বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়াছেন। আমরা নির্ণয়সিন্ধুধৃত কাত্যায়ন বচনে দেখিতে পাই ;—

সতু যদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এববা।
বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রোবা দাসোদীর্ঘাময়োপিবা।

* মহানির্ব্বাণতন্ত্র। ৯। ৬৭।

উঢ়াপি দেয়া চান্যর্থে সহাভরণভূষণা॥

অর্থাৎ যাহার সহিত বিবাহ দেওয়া যায় সে ব্যক্তি যদি অন্য জাতীয়, পতিত, ক্লীব, যথেচ্ছাচারী, সগোত্র, দাস অথবা চির রোগগ্রস্ত হয়, তবে বিবাহিতা কন্যাকেও অলঙ্কারাদিতে ভূষিতা করিয়া অন্য পাত্রে প্রদান করিবে। আরও,—

কুলশীলবিহীনস্য পিণ্ডাদি পতিতস্যচ।
অপস্মারি বিধর্ম্মস্য রোগিণাং বেশধারিণাম্।
দত্তামপি হরেৎ কন্যাং সগোত্রোঢ়াং তথৈবচ॥

উদ্বাহতত্ত্বধৃত বশিষ্ঠবচন।

অর্থাৎ কুলশীলবিহীন, পিণ্ডাদি পতিত অপস্মার রোগগ্রস্ত বিধর্ম্মী, চিররোগী, বেশধারী অথবা সগোত্র পুরুষকে কন্যা প্রদান করিলেও তাঁহাকে হরণ করিবে, অর্থাৎ অন্য পাত্রে প্রদান করিবে। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—

অদ্ভির্বাচাচ দত্তায়াং ম্রিয়েতাথো বরো যদি
ন চ মন্ত্রোপনীতা স্যাৎ কুমারী পিতুরেবষা॥
যাবচ্চেদাহৃতা কন্যা মন্ত্রৈর্যদি ন সংস্কৃতা।
অন্যস্মৈ বিধিবদ্দেয়া যথা কন্যা তথৈবসা॥

বশিষ্ঠসংহিতা ১৭শ অধ্যায়।

মনে মনে কিংবা বাক্য বা জল দ্বারা দত্ত হইলে পরও যদি মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত হইবার পূর্ব্বে ঐ বরের মৃত্যু হয়—তবে সে কন্যা তাহার পিতারই কুমারী থাকিবে; বিবাহার্থ আহৃতা কন্যা যে পর্য্যন্ত মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃতা না হন, সে পর্য্যন্ত বিধিপূর্ব্বক তাঁহাকে অন্যবরে প্রদান করা যাইবে, কেন না সে কন্যা পূর্ব্বেও যে প্রকার ছিল, তখনও সেই প্রকার। মনু বলিয়াছেন;—

সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাৎ গতপ্রত্যাগতাপিবা।
পৌনর্ভবেন ভর্ত্রাসা পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥

১৭৬

কুল্লূকভট্ট ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; 'সা স্ত্রী যদ্যক্ষতযোনিঃ সত্যন্যমাশ্রয়েৎ তদা পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা পুনর্বিবাহাখ্যসংস্কার মর্হতি। অর্থাৎ সেই স্ত্রী যদি অক্ষতযোনি হইয়া অন্য ব্যক্তিকে আশ্রয় করে, তবে এই পতি কর্ত্তৃক সেই স্ত্রী পুনর্ব্বিবাহ নামক সংস্কার প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বকালে 'পুনর্ভূ' শব্দ প্রচলিত ছিল; বিবাহিতা স্ত্রী যদি অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে তবে সেই স্ত্রী পুনর্ভূ নামে আখ্যাত হইত, মনু বলিয়াছেন;—

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা সা পৌনর্ভব উচ্যতে॥ ১৭৫

অর্থাৎ পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা কিংবা বিধবা স্ত্রী স্বেচ্ছাক্রমে পুনর্ভূ অর্থাৎ অন্য কর্ত্তৃক বিবাহিতা হইয়া যে পুত্র উৎপাদন করে, সেই পুত্র পৌনর্ভব পুত্র নামে অভিহিত হয়। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন;—

যাচক্লীবং পতিতমুন্মত্তং ভর্ত্তারমুৎসৃজ্য।
অন্যং পতিম্ বিন্দতে মৃতে বা সা পুনর্ভূর্ভবতি॥ ১৭ অঃ

অর্থাৎ যে স্ত্রী ক্লীব, পতিত, উন্মত্ত পতিকে পরিহার করে, কিংবা পতির মৃ-

ত্যুর পর অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে সেই স্ত্রী পুনর্ভূ হয়। বিষ্ণু বলিয়াছেন ;—

অক্ষতা ভূয়ঃ সংস্কৃতা পুনর্ভূঃ।

বিষ্ণু সংহিতা ১৫ অঃ

অক্ষতযোনি অর্থাৎ রজস্বলা হয় নাই এমন স্ত্রীর যদি পুনর্ব্বার বিবাহ-সংস্কার হয়, তবে সেই স্ত্রী পুনর্ভূ হয়। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন ;—

অক্ষতাচ ক্ষতাচৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতাপুনঃ।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১ ম অঃ।

অর্থাৎ অক্ষতযোনি বা ক্ষতযোনিই হউক, যে স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহসংস্কার হয়, সেই স্ত্রীই পুনর্ভূ। পুরাকালে যে বিধবার বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহা উপ-রোক্ত প্রমাণ সকল দৃষ্টেই বিলক্ষণ প্রতীয়-মান হইতেছে। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুল শাস্ত্র মন্থন করিয়া বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা সপ্রমাণ করিয়াছেন ; ফলতঃ পূর্ব্বকালে সমাজে যে বিধবাবিবাহের প্রচলন ছিল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে তাহার বি-রুদ্ধে যেসকল প্রমাণ আছে তাহাই প্রদ-র্শন করা যাইতেছে।—

সপ্তপৌনর্ভবা কন্যা বর্জ্জনীয়াঃকুলাধমাঃ।
বাচাদত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা।
উদকস্পর্শিতা যাচ, যাচপাণিগৃহীতিকা।
অগ্নিংপরিগতাযাচ, পুনর্ভূপ্রভবাচযা।
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তিকুলম-
গ্নিবৎ॥

উদ্বাহতত্ত্ব।

অর্থাৎ বাক্যদত্তা, মনোদত্তা, কৃতকৌ-তুকমঙ্গলা অর্থাৎ যাহার হস্তে বিবাহের সূত্র বন্ধন করা হইয়াছে, উদকস্পর্শিতা, যাহাকে যথাবিধি দান করা গিয়াছে, পাণিগৃহীতিকা, অগ্নিপরিগতা বা যাহার কুশণ্ডিকা হইয়াছে এবং পুনর্ভূপ্রভবা অর্থাৎ যাহার পুনর্ভূর গর্ভে জন্ম হইয়াছে, এই সাত প্রকার পৌনর্ভবাকন্যা বর্জ্জন ক-রিবে, কাশ্যপ উক্ত এই সাতপ্রকার কন্যা বিবাহিতা হইলে, সেই কন্যা অগ্নির ন্যায় পতিকুলকে ভস্ম করে।

পরস্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন করা হয়, সে সন্তান উৎপাদকের নহে ; তাহা সেই ক্ষেত্রস্বামীর, যথা পরাশর বলিয়া-ছেন ;—

ওঘবাতাহৃতং বীজং যথাক্ষেত্রে প্ররো-
হতি।
ক্ষেত্রী তল্লভতে ফলং নবীজীভাগমর্হতি॥
তদ্বৎ পরস্ত্রীয়াঃ পুত্রৌ দ্বৌ সুতৌকুণ্ডগো-
লকৌ।
পত্যৌজীবতি কুণ্ডস্যাৎ মৃতে ভর্ত্তরিগো-
লকঃ॥

অর্থাৎ বায়ু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বীজ যদি ক্ষেত্রে পতিত হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্র-স্বামীই তাহার ফলভোগ করেন ; সেই রূপ পরস্ত্রী হইতে উৎপন্ন পুত্র জন্মদাতার নহে। এই পুত্র দুই প্রকার,—পিতার জীবিত অবস্থায় জাত কুণ্ড এবং মৃত অবস্থায় জাত গোলক নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে মহর্ষি মনুও এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন ‘ যেমন গোবৎস গো-স্বামীর, উৎপাদকের নহে—এবং ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য

ক্ষেত্রস্বামীর;-সেইরূপ পরস্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র জন্মদাতার নহে;' এসম্বন্ধে মনু আরও অনেক কথা বলিয়াছেন; কিন্তু তৎসমুদায় উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা নাই; পাঠক দেখিতে ইচ্ছা করিলে, মনুসংহিতা নবম অধ্যায় ৪৮ হইতে শ্লোক গুলি দর্শন করিবেন। দ্বিজগণের পক্ষে অনুমতি প্রদান করিয়া পুত্রোৎপাদন অবৈধ (৯।৬৪)। বিধবার বিবাহ মনুর মতে যুক্তিসিদ্ধ নহে; তিনি বলিয়াছেন;—

ন বিবাহ বিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥
৯।৬৫

বিবাহ বিধায়ক শাস্ত্রে এমন উক্তি নাই যে, বিধবা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ হয়। তিনি অন্যস্থানে বলিয়াছেন;—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নাকন্যাসু ক্বচিন্নৃণাং লুপ্ত ধর্ম্ম ক্রিয়াহিতাঃ॥
৮।২২৬

অর্থাৎ বিবাহের যে সকল মন্ত্র আছে, তাহা কন্যার প্রতিই প্রযুজ্য, অকন্যাগণের নহে; যাহার কন্যাত্ব নষ্ট হইয়াছে, তাহার ধর্ম্মবিবাহের অধিকার লোপ হইয়া যায়।

বিধবার বিবাহ কলিযুগে অতিশয় নিষিদ্ধ হইয়াছে; কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবর্ত্তক মহর্ষি পরাশর বিধবার বিবাহ যুক্তিযুক্ত বলিয়াছেন বটে, কিন্তু বিধবার ব্রহ্মচর্য্যে জীবনযাপন সর্ব্বোৎকৃষ্ট একথা পদে পদে উল্লেখ করিয়াছেন; তাঁহার অভিপ্রায় বিধবার বিবাহ নাহাত না হয়। তবে নিতান্ত কুমারী অবস্থায় যে সকল স্ত্রী বিধবা হন, তাঁহাদের সেই কালেই বিবাহ দেওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ছিল বলিয়াই আমরা বুঝিতে পারি। বিধবা বিবাহ নিষেধক আমরা শত শত প্রমাণ উল্লেখ করিতে পারি; আমরা তাহার কিয়দংশ এই প্রস্তাবের গোমাংস শীর্ষক স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছি; এজন্য এস্থলে তাহাদের আর সবিস্তার উল্লেখ করিলাম না; কেবল পাঠকগণের স্মরণার্থ বিধবা বিবাহ নিষেধক পংক্তি গুলি পুনরুদ্ধৃত করিলাম;—

ঊঢ়ায়া পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।

কলিযুগে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ উপযুক্ত নহে।

দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তি র্দত্তা কন্যা নদীয়তে।

কলিযুগে দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন ও দত্তা কন্যার পুনর্দান নিষিদ্ধ।

দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্যচ।

কলিযুগে দত্তা কন্যাকে পুনরায় অন্যপাত্রে দান করিবে না।

সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যা হরং স্তাং চৌরদণ্ড ভাক।

কন্যাকে একবার মাত্র দান করা যায়; দান করিয়া হরণ করিলে, চৌরদণ্ডের উপযুক্ত হয়। মনু বলিয়াছেন 'কন্যা একবার মাত্র প্রদান করা যায়।'

এই সকল দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, বিধবা বিবাহ কখনই সমাজে সম্যক রূপে প্রচলিত এবং তাহা শাস্ত্রকারগণের অনুমোদিত হয় নাই। তবে যে তাঁহারা এরূপ বিবাহ স্থলবিশেষে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা কেবল সমাজের অনু-

রোধে; কেন না সমাজে তখন ইহা কদাচিৎ স্থান পাইয়াছিল। বিধবার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দেশ সম্বন্ধে ঋষিগণের মত সন্দর্শন করিলে, ইহাই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, তাঁহারা বিধবা বিবাহের নিতান্ত বিরোধী ও অন্যান্য কঠোর ব্রতানুষ্ঠানের সম্যক পক্ষপাতী ছিলেন। মহর্ষি মনু ইহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ স্থলে বলিয়াছেন যে, 'স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন; স্বামীর ধন পাইলে তাঁহার পারলৌকিক কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন এবং স্বামীর কুলে বাস করিবেন। যদি পতিবংশ নির্ম্মূল হয়, তবে পিতৃকুল আশ্রয় করিবেন, তাহা না থাকিলে রাজার আশ্রয়ে থাকিবেন; স্বামীর বংশীয় কেহ বর্ত্তমান থাকিলে পিতৃবংশীয় কাহাকেও ধনদান করিবেন না', ইত্যাদি পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। বিষ্ণু নিজ-সংহিতায় বলিয়াছেন 'স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী হয় কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন, না হয় পতির সহগামিনী হইবেন;' এই সহমরণ প্রথা মন্বাদির গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; তাহা পরে বিবৃত হইবে। কেশববৈজয়ন্তী গ্রন্থপ্রণেতা নন্দকুমার এই স্থলে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাখ্যা ও স্বীয় মত পরিপোষক কাশীখণ্ড হইতে কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন; কাশীখণ্ডকার বলেন 'বিধবারা ভূমি শয্যায় শয়ন করিবেন—অসময়ে আহার করিবেন—পরিতৃপ্তি পূর্ব্বক আহার করিলে তাঁহাদের নরকদর্শন হয়—একবার মাত্র ভোজন করিবেন' ইত্যাদি। কিন্তু স্মৃতিকারগণের ব্রহ্মচর্য্য ইহা হইতে অনেক বিভিন্ন। এসম্বন্ধে মহর্ষি মনুর মত আমরা বেদপাঠকারী ব্রহ্মচারীর বর্ণন সময়ে ব্যক্ত করিয়াছি; বেদ পাঠের সময় ব্রাহ্মণগণ যেরূপ শুদ্ধাচারে থাকেন, তাহাই ইহাদের ব্রহ্মচর্য্য। বিধবাগণের আহার সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন 'ইহারা পবিত্র পুষ্প ও ফল মূলাদি ভক্ষণ করিয়া আপনাদের শরীর কৃশ করিবেন।' পরাশর বলিয়াছেন;—

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ॥

অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যু হইলে যে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে, সে দেহান্তে ব্রহ্মচারীগণের ন্যায় স্বর্গে গমন করে। বিষ্ণু স্বকীয় সংহিতার শেষে যে তিনটি শ্লোক দিয়াছেন, তাহাতেই স্ত্রীজাতির সকল সময়ের কার্য্যই এক প্রকার একত্রে দর্শন করা যায়; এই জন্য এই স্থলে তাহা গ্রহণ করিলাম।

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপাসনং।
পতিং শুশ্রূয়তে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥
পত্যৌ জীবতি যা যোষিদুপবাসং ব্রতংচরেৎ।
আয়ুঃ সা হরতে পত্যুর্নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বয়ং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

অর্থাৎ স্ত্রীগণের পৃথক যজ্ঞ, ব্রত কিংবা উপাসনা কিছুতেই অধিকার নাই; যিনি পতির শুশ্রূষা করেন, তিনিই স্বর্গগমনের অধিকারিণী। পতি জীবিত থাকিতে যে স্ত্রী উপবাসব্রত গ্রহণ করে, সে পতির আয়ুঃ

ক্ষয় করে এবং তাহার নিজের নিশ্চয়ই নরক দর্শন হয়; আর স্বামীর মৃত্যুর পর যে স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি অপুত্রবতী হইলেও স্বর্গগমন করিতে সমর্থা হন। তদানীন্তন সমাজে বিধবাগণের অবস্থা এক প্রকার প্রদর্শিত হইল, এক্ষণে সহমরণ প্রথা সম্বন্ধে কিছু দেখিতে হইতেছে; প্রাচীন কালে সতীদাহপ্রথা সমাজে স্থান পাইয়াছিল কি না, এক্ষণে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ

পৃথিবীর অবিকল ছবি।

চন্দ্রলোকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। সেই যন্ত্রসহযোগে চন্দ্রলোক-নিবাসী কোন পণ্ডিত দৃষ্টিপাত করিয়া পৃথিবী পরিদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্য কথা সকল একখানি নোটবুকে লিখিত ছিল। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিবার সময়ে নোটবুকখানি পড়িয়া যায়। পড়বি ত পড়, আমাদের টেবিলের উপরই পড়্। আমরা অমনি হুঁকা রাখিয়া বহিখানি খুলিয়া নকল করিতে বসিয়া গেলাম যথা—

"৩রা মাঘ, ১২৯৯ সাল। ইউরোপ।—পবিত্র ভূমি, consecrated ground, পৃথিবীতে স্বর্গ, স্বাধীনতার মঞ্জুকুঞ্জবন। হিন্দুস্থানের কাশী শিবের ত্রিশূলের উপরে, কিন্তু ইউরোপ কামানের উপরে স্থিত। এদেশের লোক শ্বেতবর্ণ, ভোজনে রাক্ষস, পরিশ্রমে কলবিশেষ, বাহুবলে সিংহ। ইহারা পাণ্ডিত্যে দিগ্বিজয়ী, বুদ্ধিতে শৃগাল, রাজনীতিতে চাণক্য, যুদ্ধবিদ্যায় ইন্দ্রজিৎ। ইহাদের ১৫ আনা লোক ধর্ম্ম জানে না ও মানে না, তথাপি ইহারা বিদেশে ধর্ম্ম প্রচার করে, কিন্তু কাঁধে বন্দুক, হাতে বাইবেল। ইহারা দাসত্ব প্রথার বিরোধী, কিন্তু আপনারা ফ্যাশনের দাস। ইহারা আবার অপরাপর দেশীয় লোককে প্রকারান্তরে দাস করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা সমস্ত পৃথিবীর কর্ত্তা। পৃথিবীতে আর যে অন্যান্য রঙ্গের মানুষ আছে, তাহারা ইহাদের ভোগ্যবস্তু। এই খণ্ডে ইংলণ্ড নামে একটি দেশ আছে। অপর অনেক দেশের লোক এই দেশীয় লোকের দাস। চীনারা ইংরাজদের ভারতবর্ষীয় অহিফেণের দাস, ভারতবর্ষ বিলাতী কাপড়ের, বিলাতী মদের ও পীলা ফাটার ভয়ের দাস। ইজিপ্ট বিলাতী সোণার বেণেদের কেনা গোলাম। কিন্তু এদেশটিও তুরস্কের ন্যায় "বেওয়ারিস," (তবে ইংরেজেরা জোর ক-

রিয়া পোষ্যপুত্র পদে আপনাদিগকে অভি-
ষিক্ত করিয়াছেন,দেখাযাউক,শেষ কি হয়।
এখন ঢের উমেদার দাঁড়াইয়াছে।) যে
হিসাবে কর্ত্তা রাঁধুনি ব্রাহ্মণের দাস, সেই
হিসাবে ইংরাজেরা এক মুষ্টি ময়দার জন্য
অন্যান্য দেশের দাস। যতক্ষণে আমে-
রিকা, ইজিপ্ট ও ভারতবর্ষ হইতে গম বা
ময়দা যাইবে, ততক্ষণে ইংরেজদের উনানে
হাঁড়ি চড়িবে। ইংলণ্ড ভদ্রলোকের ন্যায়
প্রতিদান করে। গমের বদলে টীনের খে-
লনা; সূতার বদলে কাপড়, (বিলাতী হাই
কোর্ট পাছাপেড়ে শাড়ী বাঙ্গালিদের বড়
প্রিয় জিনিষ।) পাটের পরিবর্ত্তে চট। চা-
উলের পরিবর্ত্তে রম দিয়া থাকে। ইংলণ্ডে
লণ্ডন নামে একটি প্রধান নগর আছে।
লোকালয়ের মধ্যে যেমন চন্দ্রলোক, ম-
হানগরী গণের মধ্যে তেমনি লণ্ডন শ্রেষ্ঠ।
এই সহরে একটি মহাসভা আছে, এই স-
ভায় প্রায় প্রতিরাত্রে "কবির লড়াই"
হয়।

ইংলণ্ড দেশে ভিক্টরিয়া নামে অতি সৌ-
ম্যমূর্ত্তি ও পবিত্রপ্রকৃতি একটি দেবতা আ-
ছেন। দেশ বিদেশের ভাল লোকেরা তাঁহার
পূজা করে। কিন্তু কতকগুলি প্রভুত্বপ্রিয়
ও পৌরুষবাদী স্বার্থপরলোক তাঁহার পূজার
নামে পাণ্ডাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, নানা
জাতির উপর ছটা ঘুরাইয়া বেড়ায়। এই
পাণ্ডাদিগের মধ্যে ভাললোকও আছে,
মন্দলোকও আছে, কিন্তু তাহাদের সাধারণ
নাম কন্সারবেটিব। ভিক্টরিয়া দেবীর
স্বজনেরাও যথাবিহিত ভোগ পাইয়া
থাকেন। এই দেবতা ইংরেজদের রাণী,
ভারতবাসীর মহারাণী। কিন্তু ইংরে-
জদের রাজপরিবার প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ
জাতীয় নহে, জর্ম্মণজাতীয়। এই রাজ-
পরিবারের গৃহভাষা জর্ম্মণভাষা। এদে-
শের ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের লোকে
'চীনালণ্ঠনে' চড়িয়া অনেকবার চন্দ্র-
লোকে উঠিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারে
নাই। বোধ হয় এই ঘটনা হইতে 'বামন
হইয়া চাঁদেহাত' প্রবাদ ভারতবর্ষের কোন
কোন প্রদেশে প্রচলিত হইয়াছে।

'তুরস্ক ইউরোপের 'বেওয়ারিস্' ভূমি।
ক্রমে ক্রমে অনেকেই এই দেশের খানিকটা
খানিকটা কাড়িয়া লইয়াছেন। যে টুকু
বাকি আছে, কালক্রমে তাহাও বিভক্ত
হইবে, কিন্তু মুড়াটিভাগের বেলা কুরুক্ষেত্র
না বাধিলে বাঁচি। ভবিষ্যতে কন্‌ষ্টান্টি-
নোপল বা ইউরোপের কুরুক্ষেত্র ভূমি হয়।
যেমন হিন্দুর পক্ষে কাশী, মুসলমানের পক্ষে
মক্কা, যিহুদীর পক্ষে যিরুজালেম, তেমনি
গ্রীক খ্রীষ্টিয়ানদিগের পক্ষে কন্‌ষ্টান্টিনো-
পল। রুশীয় ভল্লুক গ্রীক খ্রীষ্টিয়ান।

ফরাসীরা বড় বোকা, ইহাদের ঘরের
কোণে বাঘ বসিয়া, ছোঁ মারিয়া আছে,
অথচ ইহারা বিদেশে শৃগাল তাড়াইয়া
বেড়ায়। বাঘ ত ইহাই চায়, যখন উহারা
শৃগাল তাড়াইতে তাড়াইতে অনেক দূরে
গিয়া পড়িবে, তখন বাঘ উহাদের ছানা
ধরিয়া খাইবে, ফরাসীনারীরা দেবরাজের
অপ্সরা তুল্যা সুন্দরী। ফরাসী সোমরস
চন্দ্রলোকস্থিত সুধারসের ন্যায় আস্বাদ।

'৫ই মাঘ, সাল ঐ। এসিয়া খণ্ড।—এই খণ্ডে ভারতবর্ষ নামে প্রকাণ্ড একটি দেশ আছে। দেবগণের মধ্যে যেমন ইন্দ্র, পর্ব্বতগণের মধ্যে যেমন হিমালয়, জাতিগণের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, * নারীগণের মধ্যে যেমন রম্ভা, বর্ত্তমান সুন্দরীগণের মধ্যে যেমন মিসেস্ ল্যাংট্রি, (Ms Langtry) দেশগণের মধ্যে ভারতবর্ষ তেমনি শ্রেষ্ঠ। প্রাতঃকালে যেমন লোকে চক্ষু মর্দ্দন করিতে করিতে উঠে, এদেশের লোক তেমনি করিয়া যুগান্তের মোহনিদ্রা হইতে উঠিয়া বসিতে চাহিতেছে; ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, শয্যাকণ্টক হইয়াছে, আর বিছানায় থাকিতে পারে না; কিন্তু উঠিতে চাহিলে কি হইবে, ঐ দেখ, একখানি ফর্শা হাত! কি জানি কি এক মোহন মন্ত্রে,—কি জানি কেমন এক যাদু করিয়া আবার ঘুম পাড়াইতেছে! কিন্তু ভারতবাসী চালাক ছেলের মত, এক একবার চক্ষু মেলিতেছে, মাথা তুলিতেছে; ঐ দেখ, সেই আবার যাদুর হাতে হাত বুলাইয়া কে যেন কখনও স্নিগ্ধ, কখনও বিষদিগ্ধ কণ্ঠে বলিতেছে, 'ঘুমা, যাদু, ঘুমা; এখনও কাক ডাকে নাই।' এদিকে কিন্তু উঠানে রৌদ্র আসিয়াছে।

এদেশের লোকেরা ইংরাজী সকল জিনিষই ভালবাসে। ইংরাজী ভাষা, ইংরাজী বিদ্যা, ইংরাজী মদ ও খানা, ইংরাজী জুতা ও ছাতি, এদেশের প্রিয় সামগ্রী। এদেশের লোক সর্ব্ববিষয়ে ইংরাজদের দাস। ইংরাজেরা ইহাদের কাপড় যোগায়; তুলা কিন্তু ইহাদের। ইংরাজেরা ইহাদের মদ যোগায়; চাউল কিন্তু ইহাদের। ইংরাজেরা ইহাদের বেতন যোগায়; টাকা কিন্তু ইহাদের। ইংরাজেরা ইহাদের লবণ যোগায়, লাভ কিন্তু লিবরপোলের।

'বঙ্গদেশ।—ভারতের রত্নভাণ্ডার। সিমলা যেমন বড় লাটের, দার্জ্জিলিং যেমন ছোট লাটের, বঙ্গদেশ তেমনি মা লক্ষ্মীর প্রিয় স্থান। এই দেশের লোক বাঙ্গালি। এদেশে আগে ব্রাহ্মণ ছিল, এখন সে জাতি লোপ পাইয়াছে।† যেমন মোল্লাজী খাঁজী, মুন্সিজী; তেমনি তাহারা মুকুরজী, চাটুরজী, ও বোনারজী হইয়াছে। এখন ভারতের ব্রাহ্মণ ইংরাজ। সর্ব্বপূজ্য দেবতা। বাঙ্গালিদের বুদ্ধি আছে, সাহস নাই; বিদ্যা আছে, চর্চ্চা নাই; ইচ্ছা আছে, উদ্যোগ নাই; দেশহিতৈষিতা আছে, একতা নাই।

বাঙ্গালিদের ঘরে ঘরে এক দেবতা আছে, তাহার নাম স্ত্রী। এই স্ত্রী দেবতা বাঙ্গালিদের সেবিং ব্যাঙ্ক্, লোহার সিন্দুক, মাথার মণি, চিন্তার বিষয়, পাছে এই গৃহ দেবতা পলাইয়া যান ‡, এই ভয়ে ইহারা দেবতাদের পায়ে 'মল্' নামে এক প্রকার বেড়ি দিয়া রাখে। বোধ হয়, এদেবতা

* চন্দ্রলোকে তবে ব্রাহ্মণ আছে; তবে লুচিও আছে। রাহা।

† একথা মানি না, কারণ এখনও লুচি আছে; লুচি থাকিতে ব্রাহ্মণ লোপ পাইবে না। রাহা।

‡ বোধ হয় হিন্দুবাঙ্গালী এই বর্ণনার লক্ষ্য নহে। বাঃ সঃ

বড়ুই চঞ্চলা, তাই বাঙ্গালিরা ইহাদেরে ক-য়েদীর মতন করিয়া রাখে। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশেও এই প্রকার রীতি।

সমস্তটা নকল করিয়া উঠিতে পারি নাই, যতটা বাকি রহিল, বারান্তরে লিখিয়া পাঠাইব। সমস্তটা নকল না করিয়া খাতা খানি হাত ছাড়া করিব না।

রাহা—

ধূমকেতু।

পুরাকালের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ধূমকেতু দেখিলে বড়ই ভীত হইতেন। ধূমকেতু অমঙ্গল ভিন্ন কদাপি মঙ্গলের নিদান নহে, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। কথিত আছে যৎকালে রোমসৈন্য জেরুসালেম অবরোধ করে, তখন একবৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রতিরাত্রিতে প্রোক্ত নগরীর উপর একটা ধূমকেতু দেখা যাইত। বর্ব্বর রাজ এলারিক কর্ত্তৃক রোমনগর ধ্বংস হওয়ার কিছু পূর্ব্বে তরবারির আকারের একটা ধূমকেতু নগরের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। একদা ব্রিটন রাজ য়্যাম্‌ব্রোসিয়স্ তাঁহার প্রবল শত্রু ভটির্জার্ণের পুত্রগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহাদের অনুসরণ করেন। তাঁহার ভ্রাতা ইউটর তাঁহার অনুপস্থিতি সময়ে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। একদিন ইউটর দেখিলেন আকাশে একটা ধূমকেতু উঠিয়াছে। তাহা দেখিতে সর্পের মত ; তাহার মুখ হইতে দুইটা তীক্ষ্ণ জিহ্বা নির্গত হইয়া একটা উত্তর ও অপরটা পূর্ব্বাভিমুখে নির্দ্দেশ করিতেছে। ইউটর ভীত হইয়া পারিষদবর্গকে ডাকাইয়া এই ঘটনার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা তাৎপর্য্য বলিবেন কি, সকলেই ভয়ে জড় সড়। নগরে মার্লিন নামে একজন দৈবজ্ঞ ছিল, তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে বলিয়া সকলেই বিশ্বাস করিত। তাহাকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিল ' মহারাজ, রাজা য়্যাম্ব্রোসিয়স্ নিহত হইয়াছেন ; পূর্ব্বাভিমুখে যে শিখা রহিয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে আপনি অচিরাৎ পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবেন ; উত্তরাভিমুখী শিখার তাৎপর্য্য এই যে আপনার পুত্র ও পৌত্রগণ ব্রিটন রাজ্যে রাজত্ব করিবে। অতএব সত্বর অগ্রসর হইয়া শত্রু নিপাত করুন ; সকলেই আপনার বশে আসিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এই কটি ভবিষ্যদ্বাণীর একটিও ব্যর্থ হয় নাই। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এই বিবরণ ঘটনার পর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। জুলিয়স্ সিজারের মৃত্যুর বৎসর একটা ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল। রোম সম্রাট বেস্পাসিয়ানের মৃত্যুর একবৎসর পূর্ব্ব হইতে একটা ধূমকেতু দেখা যাইত। অমাত্যগণ তাঁহাকে

নিয়মিত কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করার পরামর্শ দিলে, তিনি কহিয়াছিলেন 'একজন রাজাও কি ইতর লোকের ন্যায় শুইয়া মরিবে? তাহার দাঁড়াইয়া মরাই উচিত'। অন্য দিন পারিষদেরা লঘুস্বরে ধূমকেতুর কথা কহিতেছিলেন। সম্রাট শুনিতে পাইয়া বলিলেন, 'দেখ, এই চুলওয়ালা তারাটা পার্থিয়ার রাজার অনিষ্ট করিবে, আমার নহে; কারণ তাহারই মাথায় চুলের বোঝা, আর, আমার মাথায় টাক'। অবশেষে মৃত্যুকালে তিনি কহিয়াছিলেন 'আমার বোধ হয় এতক্ষণে আমি দেবতা হইতে যাইতেছি'। বস্তুতঃ মহৎ লোক মরিয়া ধূমকেতু হয়, এ বিশ্বাস অনেকেরই ছিল। বোডিন নামে একজন পণ্ডিত লিখিয়াছেন, 'বড় লোক সৎকার্য্য করিয়া মরিলে ধূমকেতুর আকারে চারিদিকে প্রভা বিস্তার করিয়া স্বর্গে চলিয়া যান; সুতরাং পৃথিবী, তাঁহাদের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হওয়াতে, দুর্ভিক্ষ মরক প্রভৃতির ক্রীড়াস্থল হইয়া উঠে'।

'I reflect upon the idea of Democritus, and I am led to believe with him that comets are the souls of illustrious persons, which after having lived upon the earth for a long succession of ages, ready at last to perish, are borne along in a sort of triumph or are called to the starry heavens, as brilliant lights. This is why famine, epidemic maladies, and civil wars follow the apparition of comets; cities and nations then find themselves deprived of the help of those excellent leaders who strove to allay their intestine troubles.

Bodin, quoted by Guillemin.

ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা শুভকর ও অশুভকর এই দুই প্রকার ধূমকেতুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। ফল কথা, শুভ ও অশুভ এই দুই প্রকারেরই ঘটনাবলী পৃথিবীতে সর্ব্ব সময়ে বিরাজ করিতেছে; সুতরাং ধূমকেতুর আবির্ভাব সময়েও কোন না কোন দেশে ঐ প্রকার ঘটনা অবশ্যই ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু অশুভ ঘটনা লোকের মন যতদূর আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, শুভ ঘটনা তত নহে। এই জন্য উৎপীড়িত দেশের লোক তাহাদের অমঙ্গল ধূমকেতুর আবির্ভাবের পরই ঘটিল বলিয়া ধূমকেতুকেই তাহার কারণ মনে করে। ভারতবর্ষীয়েরা তেমন স্থূলদর্শী ছিলেন না; তাঁহারা শুভ ও অশুভ এই উভয় প্রকার পরিবর্ত্তনই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ডাং কার্ণ কর্ত্তৃক মুদ্রিত বৃহৎ সংহিতার ৭০ পৃষ্ঠায় আছে—

হ্রস্বস্তনুঃ প্রসন্নঃস্নিগ্ধস্তৃজুরচিরসংস্থিতঃশুক্লঃ।
উদিতোবাপ্যভিবৃষ্টঃ সুভিক্ষসৌখ্যাবহঃ
কেতুঃ॥ ৮

উক্তবিপরীতরূপো ন শুভকরো ধূমকেতুরুৎপন্নঃ।

ইন্দ্রায়ুধানুকারী বিশেষতো দ্বিত্রিচূলো
বা॥ ৯

যে ধূমকেতু হ্রস্ব, অনতিস্থূল, দেখিতে মনোজ্ঞ, ঔজ্জ্বল্যাতিশয়ে নয়নের অপ্রীতিকর নহে, যাহার আকার বক্র নহে, যাহা বহুকালব্যাপিয়া আমাদের নয়নপথে না থাকে, যাহার বর্ণ শুভ্র ও যাহার উদয় মাত্রে বৃষ্টি হয় তাহার প্রভাবে পৃথিবী শস্যবতী ও লোক সুখী হয়। যে ধূমকেতুর লক্ষণ ইহার বিপরীত, বিশেষতঃ যাহার আকার ইন্দ্রধনুর ন্যায় ও যাহার দুই কি তিন শিখা থাকে তাহা কখনও পৃথিবীর শুভকর হয় না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, যেমন ধূমকেতুর আবির্ভাব সময়ে শুভ বা অশুভ ঘটনা হওয়াতে ধূমকেতুকে তাহার কারণ বলে, তেমনি যখন সূর্য্য চন্দ্রাদিরও তৎকালে সদ্ভাব ছিল তখন তাহাদিগকেও ঐ সকল ঘটনার কারণ বলিয়া কেহ নির্দ্দেশ করে নাই কেন? ইহার উত্তর অতি সহজ। সূর্য্যচন্দ্রাদির গতির বিবরণ তৎকালেও সুন্দর পরিজ্ঞাত ছিল। কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে সূর্য্য বা চন্দ্র কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে পৃথিবীর কোন্ স্থানের উপর থাকিবে তাহা সকলেই বলিতে পারিত; এবং বহুকাল দেখিতে দেখিতে তাহাদের সম্বন্ধে লোকের এমন জ্ঞান জন্মিয়াছিল যে, সেই নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্য বা চন্দ্র যে স্থানের উপরে আছে তথায় কোন প্রকার দুর্ঘটনা হইলে সূর্য্য বা চন্দ্রকে তাহার কারণ তো বলিতই না, বরং ঐ ঘটনা তখন না ঘটিলেও সূর্য্য বা চন্দ্র ঐ সময়ে ঐ স্থানের উপরই থাকিত এরূপ ধারণাই অনেকের হইত। ধূমকেতু আকস্মিক; উহা সর্ব্বদা দেখা যায় না; বিশেষ, গ্রহগণের কক্ষা নিরূপণ যেমন সহজ, ধূমকেতুর তেমন নহে; কাযেই একটা ধূমকেতু উদিত হইলেও কিয়ন্মুহূর্ত্ত পরে উহা কোন স্থান অধিকার করিবে তাহা কেহ বলিতে পারিত না। সেই জন্য চন্দ্র সূর্য্যাদি যেমন তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কক্ষাতে নিয়ত, ধূমকেতু তেমন কোন কক্ষাতে নিয়ত নহে এবং উহার যথেচ্ছ গমনের ক্ষমতা আছে, ইহাই সাধারণের বিশ্বাস ছিল। দুইশত বৎসরের অধিক হয় নাই ইউরোপ ধূমকেতুর কক্ষা নিরূপণ করিতে শিখিয়াছে। পূর্ব্ব কালে ভারতবর্ষেও ধূমকেতুর কক্ষা নিরূপণ প্রণালী ছিল না। বরাহ মিহির স্বপ্রণীত বৃহৎ সংহিতায় স্পষ্ট কহিয়াছেন।—

দর্শনমস্তময়ো বা ন গণিতবিধিনাস্য শক্যতে জ্ঞাতুং।
দিব্যান্তরিক্ষ ভৌমা স্ত্রিবিধাঃস্যুঃ কেতবো যস্মাৎ। বৃং সং ৬৯ পৃং

ধূমকেতুর আবির্ভাব ও তিরোধান সময় গণনা দ্বারা স্থির করা যায় না, কেন না ইহারা দিব্য আন্তরিক্ষ ও ভৌম এই তিন প্রকারক। উদ্ধৃত শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের সহিত প্রথমার্দ্ধের কার্য্য কারণ সম্বন্ধ ভাল বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, প্রথমার্দ্ধের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। পূর্ব্বতন আর্য্যপণ্ডিতেরা কেতু কক্ষা গণনা করিতে পারিতেন; বরাহমিহিরের সময়ে সে সকল গণনা লোপ পাইয়া আসিতেছিল, একথাও সঙ্গত নহে; কেন না পূর্ব্ব পণ্ডিতগণকে লক্ষ্য করিয়া মিহির স্বয়ং

বলিতেছেন—

শত মেকাধিকমেকে সহস্রমপরে বদন্তি-
কেতূনাং।
বহুরূপমেকমেব প্রাহমুনি র্নারদঃকেতুং ॥৫
বৃং সং ৬৯ পৃং।

কেহ বলেন কেতুর সংখ্যা একশত এক; কেহ বা বলেন এক সহস্র। নারদ মুনির মতে কেতু একটির অধিক নাই; উহাই এক এক সময়ে এক এক রূপে আবির্ভূত হয়।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা গ্রন্থাদিতে সহস্রস্থলে কেতুর উদয় ও আকৃতির আপাততঃ বিভিন্ন বর্ণনা দেখিয়া রূপভেদ হইতে ব্যক্তিভেদ কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে কেতু সংখ্যা সহস্র। আবার যাঁহারা ঐ সহস্র কেতুর কতকগুলির বর্ণনায় সৌসাদৃশ্য দেখিয়া উহাদিগকে একই কেতুর আবির্ভাবান্তর মনে করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে কেতু সংখ্যা একশত এক। নারদমুনি উহাদের এত সাদৃশ্য দেখিলেন যে, আপাততঃ রূপভেদসত্ত্বেও তিনি উহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারিলেন না। তবেই হইল কেতুবিশেষ দৃষ্টপূর্ব্ব কি না,ইহা স্থির করিতে হইলে আর্য্যগণ কেতুর আকৃতির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন। কিন্তু এরূপ করিতে গেলে সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক হইবে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে মতভেদও বিলক্ষণ ঘটিয়া উঠিবে। আমাদের জীবনে আমরা যে কটি ধূমকেতু দেখিয়াছি তাহা হইতেই শিখিয়াছি,ধূমকেতুর পূর্ব্বদিনের আকার পরদিনই অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; সুতরাং একই সময়ে সকলে না দেখিলে কোন নির্দ্দিষ্ট ধূমকেতুর আকার বিষয়ে সকলের মত একপ্রকার হইবে না; কাযেই যাহাদের আকার ভিন্ন কেতু চিনিবার অন্য উপায় নাই, তাহারা একই কেতুর বিভিন্ন পরিচয় দিবে। ধূমকেতুর আকার কতদূর পরিবর্ত্তিত হইতে পারে শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যে ধূমকেতু উদিত হইয়াছিল ৭ই অক্টোবর তাহার উর্দ্ধভাগে দুইটি শৃঙ্গ ও অধোভাগে শৃঙ্গ দুইটি সম্মিলিত হওয়াতে তাহার আকার সুগঠিত অঙ্গুলির অগ্রভাগের মত দৃষ্ট হয়। তখন সারভাগ (nucleus) শৃঙ্গদ্বয়ের সম্মিলন স্থানে ছিল। ১১ই অক্টোবর তাহার আকার প্রায় একটি বৃত্তের মত এবং সারভাগ কেন্দ্রস্থলে দৃষ্ট হয়। শৃঙ্গ ছিল না, বৃত্তের নিম্নভাগ অপেক্ষা উর্দ্ধভাগ গাঢ়তর বোধ হইয়াছিল এবং তথায় বৃক্ষপত্রে যেমন পঞ্জরাস্থির ন্যায় রেখা থাকে তদ্বৎ তিনটি রেখা ছিল। ১৫ই অক্টোবর ঐ রেখা তিনটি শৃঙ্গাকারে অধোদিকে দেখা যায় ও অধোভাগ অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিত বলিয়া বোধ হয়। ২১শে অক্টোবর সারভাগ বৃন্তস্থলে গিয়া কেতুর আকার একটি ত্রিপত্র বিশিষ্ট পুষ্পকলিকার ন্যায় হইল। পরদিন দেখা গেল কলিকা বিকশিত মহাপ্রভাশালী কুসুমাকারে পরিণত হইয়াছে। তৎপর দিনও পুষ্পবৎই দেখা গেল কিন্তু সেদিন একটি পত্র লুপ্ত হইয়া অপর দুইটি উজ্জ্বলতর ও বর্দ্ধিতায়তন হইয়াছে। ২৬শে অক্টোবর কেতুর আর সে আ-

কার নাই তৎপরিবর্ত্তে একটি মনোহর পঞ্চকোণ ও পঞ্চরেখাবিশিষ্ট পত্রের আকার হইয়াছে। সারভাগ তখনও বৃন্তস্থলেই আছে। ২৮শে অক্টোবর উহার আকার একটি সুদীর্ঘ বর্ষাফলকের ন্যায় হয় ; সারভাগ ফলকের মূলদেশে ছিল। ২৯শে অক্টোবর আকার আবার অঙ্গুলির অগ্রভাগের ন্যায় হয়, কিন্তু এবারে পূর্ব্ববৎ শৃঙ্গ দেখা গেল না। তৎপর ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে হইতে ২৮শে জানুয়ারি পর্য্যন্ত যে আকৃতি ছিল, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যেন সাগরসৈকতে কোন জলচর পক্ষিবিশেষের একটি অণ্ড পড়িয়া আছে এবং তাহার স্বচ্ছ শরীরমধ্য দিয়া গর্ভস্থ বিহঙ্গমদেহেরও কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতেছে। ৩১শে জানুয়ারী অণ্ড অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট হইয়াছে। ১১ই ফেব্রুয়ারী আর অণ্ড নাই ; তদ্গর্ভস্থ পক্ষী তখন পরিণতদেহ হইয়াছে ; সে তাহার আভাময় পুচ্ছ ও পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া আমাদের নয়নপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে; এইরূপে ক্রমে দূর হইতে দূরতর প্রদেশ অতিক্রম করিয়া যে মাসে সুদূর গগণপ্রান্তে অদৃশ্য হইল।

উল্লিখিত বিবরণপাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ধূমকেতুর পরিচয়ে আকারের উপর নির্ভর করা যায় না ; আর্য্যগণ তাহাই করিতেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে এত মতভেদ। ফ্লামারিঁও নামে একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত কহেন, কাল্ডীয় পণ্ডিতেরা ধূমকেতু গ্রহগণের ন্যায় সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করে এ কথা অবগত ছিলেন। কাল্ডীয় ও মিসরদেশীয় পণ্ডিতগণ সম্বন্ধে গিলেমিন্ কহেন—

"That they regarded comets as stars subjected to regular movements, and not as simple meteors, we may believe, if it be true that they were in possession of means for predicting their return. Passages in Diodorus Siculus prove that the Chaldean and Egyptian astronomers hazarded such predictions ; but so far as our means enable us to judge, there is reason to suppose that these predictions were based upon particular beliefs, more astrological than astronomical."

Guillemin's Comets P. 86.

এক্ষণে কষ্টানুমানের মরীচিকা ছাড়িয়া আপ্তবাক্যের নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করিলে দেখা যাইবে যে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহাত্মা নিউটন সর্ব্বপ্রথম ধূমকেতুর গতির প্রকৃততত্ত্ব ইউরোপে প্রচার করেন। তাঁহারই সমকালীন হ্যালি (Hal ley) নামক অপর একজন পণ্ডিত, ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে যে ধূমকেতু দৃষ্ট হয়, নিউটনের প্রণালী অনুসারে তাহার কক্ষা স্থির করিয়া প্রচার করেন যে এই ধূমকেতু ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় দেখা যাইবে। নিউটন বা হ্যালি কেহই এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল কিনা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু জগৎ দেখিয়াছে, বিজ্ঞানের মহিমা কতদূর ম-

হান্! জগৎ দেখিয়াছে প্রতিভার গভীরতা কতদূর দুরবগাহ! জগৎ দেখিয়াছে পর-লোকগত মহাত্মদ্বয়ের অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিবার জন্যই যেন, তাঁহাদের প্রতি-ভার প্রভা দেখাইবার জন্যই যেন, সুবর্ণ-প্রভায় মণ্ডিত হইয়া ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সেই ধূমকেতু আবার দেখা দিল। সেই হইতে প্রতি ৭৬ বৎসর পর বিশ্ববিনাশন মহাকা-লের (লজ্জায়ই যেন) অদৃশ্যহস্ত অমর-প্রতিভার বিজয়কেতন স্বকীয় অম্বর-রাজ্যে উড়াইয়া দেয়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই ধূম-কেতু আবার আসিয়াছিল ; আমরা উ-পরে ইহারই বিবরণ দিয়াছি। ১৯১১ খ্রী-ষ্টাব্দে ইহার পুনরায় আসিবার কথা।

যখন সকলে বুঝিল যে ধূমকেতুর য-থেচ্ছ উদয় বা গতি হইতে পারে না, ইহারাও অপরাপর গ্রহাদির ন্যায় স্ব স্ব কক্ষা বিশেষে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে নিয়ত, তখন ভ্রান্ত ভয় সুতরাং কমিয়া গেল। হ্যালির সময় হইতে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অনেকগুলি ধূমকেতুর কক্ষা ও আবর্ত্তনকাল নিরূপণ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৮ টি মাত্র দশবৎ-সরের ন্যূনকালে একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। দশটির আবর্ত্তনকাল গড়ে ৭৫ বৎসর। ৩০টির আবর্ত্তন কাল গড়ে প্রায় ৫০০০০ বৎসর। আর কতকগুলি আছে যাহারা একবার মাত্র অমাদের নয়নপথে আসিয়া অনন্ত আকাশে অনন্তকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে। বহু যুগযুগান্তরেও আর এপথে ফিরিয়া আসিবে না। যে গুলির আবর্ত্তন অল্প সময়ে নির্ব্বাহ হয়, পণ্ডিতেরা পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের আবি-র্ভাবকাল গণনাদ্বারা স্থির করিয়া রাখেন। কখন কখন এরূপও হয় যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে ধূমকেতু আসিল না। তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে ধূমকেতু নিজ গতি বশতঃ কোন বৃহৎ গ্রহের সমীপস্থ হইলে তাহার আকর্ষণে উহার কক্ষা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; সুতরাং পুরাতন কক্ষায় অনুসন্ধান করিলে সে ধূমকেতু অবশ্যই পাওয়া যাইবে না। দেবগুরু বৃহস্পতির এইরূপকক্ষা পরিবর্ত্তন ক্ষমতা পণ্ডিতেরা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

কখন বা একটি ধূমকেতু দুই বা বহু-ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ১৮২৬ খ্রী-ষ্টাব্দে যে ধূমকেতু আবিষ্কৃত হয় (Biela's Comet) তাহার আবর্ত্তন কাল কিঞ্চি-দূন ৭ বৎসর। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ ধূম-কেতু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের চক্ষের উপরই দুইভাগ হইয়া পড়িল ; তদবধি উহা দুই ভাগেই বিভিন্ন কক্ষায় চলিতেছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে যখন উহার পুনরায় আসিবার স-ময় হয় তখন পণ্ডিতেরা বহু অনুসন্ধান ক-রিয়াও উহার দেখা পাইলেন না। কিন্তু নিরূপিত সময়ে ধূমকেতুর পরিবর্ত্তে অ-নেকগুলি উল্কাপাত হইয়াছিল (Encyclopœdia Brtannica 9th Edition)।

পূর্ব্বে বরাহ মিহির সম্বন্ধে যাহা উল্লি-খিত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়-মান হয় যে ভারতবর্ষে বরাহ মিহিরের স-ময়েও ধূমকেতুর দর্শন বা অন্তময় গণনার নিয়ম কেহ অবগত ছিল না। অথচ বা-

চম্পত্য বৃহদভিধানে কেতুশীর্ষক প্রবন্ধে পরাশর সংহিতা হইতে যে কএকটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে লিখিত আছে—

'কপাল কেতু রুদয়তে অমাবস্যায়াং পূর্ব্বস্যাং দিশি সধূম্রার্চ্চিশিখো নভসো বিষয়ার্দ্ধচরোদৃশ্যতে। পঞ্চবিংশবর্ষশতং প্রোষ্যত্রীংশ্চ পক্ষান্ স্থতির্যস্য' ইত্যাদি।

'অথ দক্ষযজ্ঞে রুদ্রক্রোধোদ্ভবঃ কালকেতুঃ ত্রীণিবর্ষশতানি নবচ মাসান্ প্রোষ্য উদয়তে। পূর্ব্বেণ বৈশ্বানর মার্গেহমৃতময়স্য মণিকেতোশ্চারান্তে শ্যাবরুক্ষ তাম্রারুণাং শূলাকার সদৃশীং শিখাংকৃত্বা নভসস্ত্রিভাগচারী' ইত্যাদি।

'চলকেতুঃ পঞ্চদশবর্ষশতং প্রোষ্য পশ্চিমেনাঙ্গুলিপর্ব্বমাত্রাং শিখাং দক্ষিণাভিনতাংকৃত্বা কালকেতোশ্চারান্তে নভসস্ত্রিভাগ মনুচরন্ যথা যথোত্তরাং ব্রজতি তথাতথা শূলাগ্রাকারাং শিখান্দর্শয়ন্ ব্রাহ্মং নক্ষত্র মুপস্পৃশ্য মনাক্ ধ্রুবং ব্রজন্ রাশিং সপ্তর্ষিং সংস্পৃশ্য নভসোর্দ্ধমাত্রং দক্ষিণ মনুপরিক্রম্য অস্তংব্রজতি'।

'উদ্দালক শ্বেতকেতুর্দশোত্তরং বর্ষশতং প্রোষ্য পূর্ব্বস্যাং দক্ষিণাভিনতশিখোর্দ্ধরাত্র কালে দৃশ্যঃ। তেনৈবসহ দ্বিতীয়ঃ কঃ প্রজাপতিপুত্রঃ গ্রহকেতুর্যূপসংস্থায়ী যুগপদ্দৃশ্যেত,।

'শ্বেতকেতুঃ পঞ্চদশবর্ষশতং প্রোষ্য' ইত্যাদি।

'রশ্মিকেতুঃ প্রোষ্যবর্ষশতং উদিতঃ কৃত্তিকাসু.'

'ভবকেতুস্ত্রয়োদশচতুর্দ্দশাষ্টাদশ বর্ষান্তাৎ'। ইত্যাদি।

"সংবর্ত্তকেতুর্বর্ষসহস্রমষ্টোত্তরং প্রোষ্য পশ্চিমেন অস্তংগতে সবিতরি" ইত্যাদি

অর্থাৎ কপালকেতু নামক ধূমকেতু পঁচিশ শত বৎসর পর পর অমাবস্যা তিথিতে উদিত হইয়া তিনপক্ষ পর অস্তমিত হয়। কালকেতু তিনশত বৎসর ৯ মাস পর উদিত হয়। চলকেতু পঞ্চদশশত বৎসর অন্তর পশ্চিম দিকে উদিত হইয়া অভিজিৎ নক্ষত্রমধ্য দিয়া উত্তরাভিমুখে যাইয়া ধ্রুবের দিকে অগ্রসর হয় ও সপ্তর্ষি মণ্ডল স্পর্শ করিয়া দক্ষিণদিকে প্রত্যাগমন করে। উদ্দালক শ্বেতকেতু ১১০ বৎসর পর উদিত হয় ও সেই সঙ্গে অভিজিৎ নক্ষত্রে গ্রহকেতু নামে যূপাকার আর একটি ধূমকেতু দেখা যায়। ১৫০০ বৎসর পর শ্বেতকেতুর উদয় হয়। রশ্মিকেতু ১০০ বৎসর পর কৃত্তিকা নক্ষত্রে উদিত হয়। ভবকেতু ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ বা অষ্টাদশ বৎসর পর দেখা যায়। সংবর্ত্তকেতু ১০০৮ বৎসর পর সন্ধ্যার সময় পশ্চিম দিকে উদিত হয়। ইত্যাদি

ইহা হইতে কি বুঝিতে হইবে? পরাশর কেতুকক্ষা গণনা জানিতেন এরূপ অনুমান হয় কি?—না; ইহাতে যে সকল আবর্ত্তনকাল দেওয়া হইয়াছে সেগুলি গণনালব্ধ এরূপ প্রমাণ নাই; বিশেষ বরাহমিহিরের বাক্যে অশ্রদ্ধা করার কোন কারণ দেখি না; এবং প্রাচীন গ্রন্থ সূর্য্যসিদ্ধান্তেও কেতুকক্ষা গণনার কোন কৌশল নাই। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, আর্য্যগণ ধূমকেতুর পরিচয়ে আকৃতির উপরই নির্ভর করিতেন;

অতএব এই সকল আবর্ত্তনকাল মহর্ষি পরাশরের প্রত্যক্ষলব্ধ এরূপ বলাই যুক্তিসঙ্গত। পাঠক এরূপ মনে করিবেন না যে, মহর্ষি পরাশর ২৫০০বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, সুতরাং কপালকেতুর দুইবার উদয় প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার আবর্ত্তনকাল ২৫০০ বৎসর ৪৫ দিন স্থির করিয়া গিয়াছেন। কপালকেতুর যে উদয় ভারতবাসী প্রথম প্রত্যক্ষ করিয়াছিল সেই উদয়ে কোন ঋষি তাহার উদয়ের তিথি দিক প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন তৎপর যখন মহর্ষি পরাশর কথিত আকৃতির একটি ধূমকেতু অমাবস্যা তিথিতে সেই পুর্ব্বদিকেই উদিত হইতে দেখিলেন, তখন তিনি তাহাকে কপালকেতুই মনে করিলেন ও পুর্ব্বলিখিত উদয়কাল হইতে তাৎকালিক উদয়কালের সাময়িক ব্যবধান গণনা করিয়া তাহার আবর্ত্তনকাল ২৫০০ বৎসর তিন পক্ষ নির্দ্ধারিত করিলেন। কালডিয়া ও মিসর দেশের পণ্ডিতেরাও নাকি কতকগুলি ধূমকেতুর আবর্ত্তনকাল দিয়া গিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে গিলেমিন্ কহেন, ঐ সকল আবর্ত্তন কাল ফলিতজ্যোতিষের অন্ধবিশ্বাস হইতে লব্ধ গণিতজ্যোতিষের প্রণালী হইতে নহে।(Guillemin's Comets page 36)। ইহার অর্থ যদি এইরূপ হয় যে প্রথম আবির্ভাব "নবগ্রহের" যে সংস্থান বিশেষে হইয়াছিল, দ্বিতীয় ও পরবর্ত্তী সমুদায় আবির্ভাব সেই সংস্থান ফিরিয়া আসিলেই হইবে এই প্রকার বিশ্বাস হইতে আবর্ত্তন কাল নিরূপিত হইয়াছে, তাহা হইলে আমরা অনায়াসে দেখাইতে পারি যে, এ আপত্তি পরাশরের কথার প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। ঐ প্রকার গ্রহগণের সংস্থান পরাশরের গণনার মূল হইলে ২৫০০ বৎসর তিন পক্ষের পর চন্দ্র সূর্য্যেরও পুর্ব্বসংস্থান ফিরিয়া আসিবে অর্থাৎ আবার অমাবস্যা হইবে। অথচ পাঠক একটুকু পরিশ্রম স্বীকার করিলেই দেখিতে পারিবেন ২৫০০ বৎসর তিন পক্ষের পর একই তিথি ফিরিয়া আসিতে পারে না; সুতরাং কপালকেতুর আবর্ত্তনকাল ২৫০০ বৎসর তিন পক্ষ হইলে অব্যবহিত দুই উদয় অমাবস্যাতে হইতে পারে না। প্রথম উদয় অমাবস্যাতে হইলে দ্বিতীয় উদয় কৃষ্ণা তৃতীয়ার শেষ ভাগে কিংবা চতুর্থীর প্রারম্ভে হওয়ারই সম্ভাবনা*।

* ২৯.৫৩০৫৯ দিনে এক চান্দ্রমাস (lunation) হয়। অতএব ৩০৯২৩ চান্দ্রমাসে কত দিন হয় স্থির করিতে হইলে এই উভয়ের গুণফল নির্ণয় কর। গুণফল = ৯১৩১৭৪.৪৩৪৫৭ দিন। পৃথিবীর কক্ষার কোন নির্দ্দিষ্ট বিন্দু অতিক্রম করিয়া পুনরায় উহাতে আসিতে সূর্য্যের যে সময় লাগে তাহাকে আর্য্যপণ্ডিতেরা বৎসর কহিতেন, অতএব আর্য্যবৎসর ইউরোপীয় বৎসর অপেক্ষা বড়; আর্য্যমতে উহার পরিমাণ ৩৬৫.২৪৮৭৫ দিন; ইহাকে ২৫০০ দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলের সহিত ৪৫যোগ করিলে ৯১৩১৯১.৮৮৪৬ দিন পাওয়া যায়। সুতরাং ২৫০০ বৎসর তিন পক্ষে ৩০৯২৩ চান্দ্রমাস অপেক্ষা ১৭.৪৫ দিন অধিক হইতেছে। অর্থাৎ গত অমাবস্যা হইতে ২৫০০ বৎসর তিন পক্ষ গত হইলে অমাবস্যা গত

জ্যোতির্ব্বিৎ গণনা চতুর পরাশর২৫০০বৎসর পর পুনরায় অমাবস্যা হইবে কি না এসহজ কথার উত্তর দিতে গিয়া প্রায় ১৮ দিনের ভুল করিয়া বসিলেন এ বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে। যে সকল গ্রহের গতি জানা ছিল তাঁহাদের সম্বন্ধে আর্য্যেরা যে সকল গণনা রাখিয়া গিয়াছেন তৎসমুদায় আজিও আমাদের বিস্ময়ের সামগ্রী; বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাদের কোথাও কিছু ভ্রম দেখাইতে পারিবে না, আর আজি পরাশর চন্দ্রের গতির গণনায় এত বড় একটা ভুল করিয়া বসিয়াছেন একথা কিরূপে বিশ্বাস করিব। সাধারণতঃ দেখা যায়, লোকে আবিষ্কৃত সত্য অবিচারিত ভাবে গ্রহণ করে কিন্তু স্বকীয় নবাবিষ্কারের প্রতি সর্ব্বদাই সন্দিহান হয়; একবারের স্থলে দশবার বিবেচনা না করিয়া সে আবিষ্কার কখনও প্রচার করিতে সাহসী হয় না। এত বড় ভ্রম লিপিবদ্ধ করার পূর্ব্ব পরাশর অবশ্যই আপন গণনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। এই জন্যই বলিয়াছি পরাশর কেতুর দুই অব্যবহিত আবির্ভাবের সাময়িক অন্তর হইতেই সকল আবর্ত্তনকাল স্থির করিয়াছিলেন। পরাশর মধ্যে মধ্যে বৃদ্ধ গর্গের উল্লেখ করিয়াছেন; 'বৃদ্ধ' বিশেষণে বোধ হয় গর্গ পরাশরের বহুকালের পূর্ব্বের লোক †।

সম্ভবতঃ কপালকেতুর প্রথমাবির্ভাব বিবরণ গর্গ প্রণীত গ্রন্থে আছে; দ্বিতীয় আবির্ভাব সময়ে গর্গ হইতে তাহার সাময়িক অন্তর গণনা করিয়া পরাশর কপালকেতুর আবর্ত্তনকাল স্থির করিয়াছেন। এই গণনায় উভয়ের অন্তর ২৫০০ বৎসর কি না এবং এবং দ্বিতীয় আবির্ভাব কোন্ তিথিতে হইল এই দুইটি বিষয়েই অধিক দৃষ্টি থাকার কথা; প্রথমাবির্ভাব' অমাবস্যাতে কি অন্য কোন্ তিথিতে হইয়াছিল সে চিন্তা পরাশরের না হওয়াই সম্ভব। অতএব এই বিবরণ হইতে, আমার বিবেচনায় আমরা দুইটি সত্য নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে পারি, প্রথম—পরাশরের ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে কপাল কেতুর আর একবার আবির্ভাব হইয়াছিল।

দ্বিতীয়—সেই আবির্ভাবের বিবরণ পরাশর 'বৃদ্ধ' গর্গ বা অপর কোন 'বৃদ্ধের' গ্রন্থে দেখিয়াছিলেন। বিজ্ঞানবিৎ পাঠক এস্থলে আপত্তি করিতে পারেন, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আর্য্যেরা কেতুকক্ষাগণনা জানি-

---

হইয়া আরও ১৭.৪৫দিন গত হইবে সুতরাং শুক্ল পক্ষ গত হইয়া কৃষ্ণাতৃতীয়াও গতপ্রায় হইবে।

† হইতে পারে গর্গ নামে দুই ব্যক্তি ছিলেন; তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর ব্যক্তিকে বৃদ্ধ গর্গ বলা হইয়াছে, ইহাতেও আমাদের পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তের কোন ব্যাঘাত হইতেছে না। গর্গ বা অপর যে কেহ কপালকেতুর প্রথমাবির্ভাব বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহারই তিথিগণনায় ভ্রান্তি হইয়াছিল, পরাশর সে ভ্রান্তি লক্ষ্য করেন নাই সুতরাং অব্যবহিত দুই উদয় অমাবস্যাতে হইল বলিয়া ভবিষ্যৎ তাবৎ উদয় অমাবস্যাতে হইবে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

তেন না ; এবং কেতু চিনিবার উপায় কক্ষা গণনা ভিন্ন আর হইতে পারে না ; সুতরাং এই উভয় কেতুই যে কপালকেতু তাহার প্রমাণ নাই। নাই বা থাকিল, স্বীকার করিলাম যেন পরাশরের সময়ে কপালকেতু না আসিয়া ললাটকেতু আসিয়াছিল, তাহাকেই পরাশর ভ্রমে পড়িয়া কপালকেতু বলিয়াছেন। তাহাতেও কিন্তু পরাশরের ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে কোন একটি ধূমকেতুর বিবরণ মুনি বিশেষ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন এসিদ্ধান্ত অক্ষুণ্ণই রহিল। পরাশরের ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বেও ভারতে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিলক্ষণ চর্চ্চা ছিল এসিদ্ধান্ত অক্ষুণ্ণই রহিল। খ্রীষ্টের ১২০০ বৎসর পরেও ইউরোপ সামান্য একটি ধূমকেতুর উদয়ে ভয়ে নয়ন নিমীলিত করিত আর পরাশরের ২৫০০ শত পূর্ব্বেও ভারত ধূমকেতুর উদয়ে বিহ্বল না হইয়া তাহার উদয় তিথি, গতি ও স্থিতিকাল বৈজ্ঞানিকের চক্ষে নিরীক্ষণ (observe) করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিত এসিদ্ধান্ত অক্ষুণ্ণই রহিল। পরাশর কোন্ সময়ের লোক একথাও এখানে জানার প্রয়োজন হইতেছে। যুধিষ্ঠির ও পরাশর সমকালীন একথা সকলেই স্বীকার করিবেন ; অতএব যদি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা গোল না বাধাইতেন তবে বরাহ মিহিরকে সাক্ষী মানিয়া বলিতে পারিতাম যুধিষ্ঠির বরাহ মিহিরের ২৫৬৬ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।* পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গণনায় ভ্রান্তি না দেখাইয়া সে কথা বলিতে পারিতেছি না ; অথচ তাহা দেখাইতেও বিস্তর আয়াস ও সময়ের প্রয়োজন। অতএব সম্প্রতি তাঁহাদের গণনা মূলেই (in its principles) ভ্রান্ত এই মাত্র বলিয়া তর্কের অনুরোধে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত মানিয়া নেওয়া যাউক। পরাশর খ্রীষ্টের পর ও বরাহ মিহির খ্রীষ্টের ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন স্বীকার করিলেও দেখা যায় খ্রীষ্টের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বহুল চর্চ্চা ছিল। অতএব ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র কাল্‌ডীয় জ্যোতিষের অনুকরণে রচিত, পাশ্চাত্য "মহামহোপাধ্যায়"গণের একথা কতদূর যুক্তিসঙ্গত পাঠক বিচার করিবেন।

আমরা কথায় কথায় মূল কথা ছাড়িয়া অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি। কক্ষাগণনা প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতেই কেতু হইতে লোকের ভয় কমিয়া গেল বলিতেছিলাম। কথাটা কিয়দংশে সত্য, সম্পূর্ণ নহে। যেমন ভ্রান্ত ভয় অজ্ঞের মন হইতে দূরে গেল, তেমনি বিজ্ঞানসম্মত অন্য প্রকারের ভয় বৈজ্ঞানিকের মনে উপস্থিত হইল। গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, অনেকগুলি ধূমকেতুরই আয়তন এত বৃহৎ যে তাহাদের শিখা পৃথিবীর কক্ষার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যুড়িয়া ফেলিলেও শিখার প্রায় পঞ্চমাংশ চন্দ্রের

* আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্যরাজ্ঞশ্চ ॥
বৃহৎসংহিতা, সপ্তর্ষিচার তৃতীয় শ্লোক।

কক্ষারও বাহিরে থাকিবে। এবং যখন পৃথিবী ও কেতু উভয়েই সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে তখন কোন না কোন সময়ে কোন নির্দ্দিষ্ট ধূমকেতু পৃথিবীর সন্নিহিত হইবে। সেই সময়ে ধূমকেতুর সহিত পৃথিবীর অভিঘাত হইলে এক্ষুদ্র পৃথিবীর অস্তিত্ব কোথায় থাকে!! আর অভিঘাত না হইলেও ঈদৃক্ বৃহদায়তন পদার্থের সান্নিধ্যই প্রচুর অশুভকর তাহাতে সন্দেহ কি? হইতে পারে ইহার আকর্ষণ বলে পৃথিবী সূর্য্য প্রদক্ষিণ পরিত্যাগ করিয়া উপগ্রহ রূপে কেতুরই প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে। এতদূর না ঘটিয়া যদি পৃথিবীর মেরুদণ্ড কিয়দংশেও দিগ্‌ভ্রষ্ট হয় তাহাতেও সমূহ বিপদ। মেরুদণ্ডের পরিবর্ত্তনে বিষুব রেখার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এবং বিষুবরেখা ভিন্ন অপর স্থান হইতে মেরুদণ্ডের উপর পাতিত লম্ব পৃথিবীর কেন্দ্র স্পর্শ করিতে পারে না, এই জন্য পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তন প্রভাবে অপরাপর স্থানের জলরাশি বিষুব রেখার অভিমুখে ধাবিত হয়। সুতরাং বর্ত্তমান বিষুবরেখার স্থানচ্যুতি ঘটিলে সাগরও স্থানচ্যুত হইয়া দেশ ডুবাইয়া ফেলিবে ও যাবদীয় পশু পক্ষীর বিপদ ঘটাইবে; অধিকন্তু কেতুর অগ্নিময় শিখার প্রচণ্ড উত্তাপে প্রাণিগণের প্রাণনাশ হওয়াও বিচিত্র নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই প্রকার নানা ভয় আশঙ্কা করিয়াছিলেন।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ ই সেপ্টেম্বরে যে ধূমকেতু উদিত হইয়াছিল তাহার আবির্ভাবের কিছু দিন পূর্ব্বে লালাঁদি নামক একজন ফরাশী জ্যোতির্ব্বিৎ তথাকার বিজ্ঞানসভায় কোন কোন ধূমকেতু পৃথিবী ধ্বংস করিতে পারে এই বিষয়ে এক রচনা পাঠ করিতে প্রতিশ্রুত হন। রচনার বিষয় শুনিয়াই লোক ভয়ে অধীর হইয়া পড়িল; লাঁলাদির বাটীতে প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোকের যাতায়াত হইতে লাগিল; তিনি পরিশেষে লোকের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া রচনা মুদ্রিত করিয়া দিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল ৮টি ধূমকেতুর ক্ষমতা এমন যে তাহাদের কোনটি পৃথিবীর ৪০০০০ মাইল মধ্যে আসিলেই সমুদ্র স্থানচ্যুত হইয়া পড়িবে; কিন্তু এইরূপ ঘটনা ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ঘটিবে না। আমরা জানি ১৭৯৩ এর পর ও প্রায় শতবর্ষের মধ্যে ঘটে নাই। এবিষয়ে অনুমান নিষ্প্রয়োজন। কেননা ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে একটি ধূমকেতু (Lexele's comet) বৃহস্পতির কএকটি উপগ্রহের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছিল ইহা প্রত্যক্ষই দেখা গিয়াছে। তাহাতে বৃহস্পতি বা তাহার উপগ্রহগণের কোন অনিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক স্বয়ং কেতুরই কক্ষা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। এই ঘটনা হইতে আমাদের অনেকগুলি ভয়ের নিরাকরণ হইতেছে, কিন্তু শিখার উত্তাপের আশঙ্কা এখনও করিতে পারি। সৌভাগ্য বশতঃ সে বিষয়েও আমাদের নিরাতঙ্ক হওয়ার অনেকগুলি কারণ আছে, এখানে তাহার একটির মাত্র উল্লেখ করিব। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবী একটি ধূমকেতুর শিখার

মধ্যে কএকখণ্টা কাল ছিল অথচ তাহাতে তাহার কোন অনিষ্ট হয় নাই। এবিষয়ে এক জন ফরাশী জ্যোতির্ব্বিৎ কহেন "not only the Earth, but the moon also, entered the tail of the comet on the morning of June 30, and at 6.12 p. m. on that day our globe was plunged in it to a depth of 273000 miles."

Guillemin's World of Comets p.489

এক্ষণে ধূমকেতুর স্বরূপ সম্বন্ধে কএকটি কথা বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব। ধূমকেতুর শিখা বাষ্পময়, উহার মধ্য দিয়া বিপরীতদিকের তারাগুলি সুন্দর দেখাযায়। বাষ্পময় বলিয়াই এত আয়তন হইলেও উঁহাতে পদার্থ অতি অল্পই আছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন ধূমকেতুর শিখার পদার্থ একত্র করিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে ওজন করিলে কয়েক সেরের অধিক ওজন্ হইবে না। একই ধূমকেতুর ৩। ৪টি শিখার কথা শুনা গিয়াছে, পরন্তু উহাদের শিখাসম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,উহা সূর্য্যের বিপরীত দিকেই প্রায় দেখা যায়। আমাদের পুরাণে আছে 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্'; কেতুর শিখা সূর্য্যের বিপরীতদিকে কেন যাইবে ইহার কারণ দেখাইতে গিয়া কেপ্লর,গ্যালিলিও, অয়লর, নিউটন, লাপ্লাস, হর্শেল, টিণ্ডাল প্রভৃতি মুনিরাও আপনাদের মুনিত্ব ষোল আনাই বজায় রাখিয়াছেন।

আমরা এস্থলে হর্শেলের মতের মাত্র উল্লেখ করিব। তিনি কহেন সৌর কিরণে কেতুপৃষ্ঠ হইতে আদৌ বাষ্পাকার একপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয় ও পরক্ষণেই তাহা কিরণের অপসারণী শক্তিবলে বিপরীতদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া শিখার আকারে কেতুর সঙ্গে চলিতে থাকে।

"...it (tail) is neither more nor less than the accumulation of a sort of luminous vapour, darted off in the first instance towards the Sun, as if it were something raised up, and as it were exploded by the Sun's heat out of the kernel, and then immediately and forcibly turned back and repelled from the Sun."

পণ্ডিতেরা বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে সৌর কিরণে এরূপ অপসারণী শক্তির সম্ভাব কল্পনা যুক্তির অনুমোদিত; আকর্ষণীশক্তি হইতে ইহার পার্থক্য এই যে ইহার ক্রিয়া অপসারিত ও অপসারকের সমসূত্রে হয় না এবং তাহাদের উভয়ের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ও দূরত্বের বিপরীতবর্গ অনুসারে (directly as the surfaces and inversely as the square of the distance) সেই শক্তির তারতম্য হইয়া থাকে।

ধূমকেতুর সারভাগ (nucleus) সাধারণতঃ স্বচ্ছই হইয়া থাকে কিন্তু পঙ্কিল (opaque) সারভাগও কখন কখন দেখা যায়। ইহার সমর্থনে অ্যারাগো দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। পাঠক তৎকৃত Popular Astronomy গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের

৫৯৯ পৃষ্ঠে অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যি-শুখ্রীষ্টের মৃত্যুর দিন পৌর্ণমাসী তিথিতে যে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল পঙ্কিল ধূমকেতু বিশেষের ব্যবধানই তাহার কারণ।

ধূমকেতুর আলোক স্বকীয় নহে। বুধ বৃহস্পতি শুক্র প্রভৃতি গ্রহের ন্যায় ধূমকেতুও সৌর আলোকে আলোকিত হয়। তে-জোময় পদার্থ দূরে গিয়া অন্তর্হিত হইলে তাহার আয়তন কমিয়া সূক্ষ্মতা হেতুই অন্ত-র্হিত হয় কদাচ ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস হেতু নহে; কিন্তু দেখা যায় ধূমকেতুর তাহা না হইয়া ক্রমে ঔজ্জ্বল্য কমিতে থাকে; ইহা হইতে ধূমকেতু পরকীয় আলোকে আলোকিত এরূপ অনুমান হয়।

"...a self luminous body ought to have exactly the same brightness when viewed either with the naked eye, or in a telescope of determinate optical power, whatever be the distance at which it is placed with respect to the observer. ...The greater number of observed comets...have disappeared by a gradual diminution of their light.......this mode of disappearance is irreconcilable with the existence of an intrinsic light. Comets, then derive their light from the sun"

Arago, Astronomy Vol I. P 634.

বরাহ মিহির কেতুর দীপ্তিকে খদ্যোত ও মণিরত্নাদির দীপ্তির সহিত তুলনা করি-য়াছেন *। অতএব বোধ হয় কেতুর তেজ নাই দীপ্তিমাত্র আছে একথা তিনি জানি-তেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে যখন পৃথিবী কেতু বিশেষের শিখার অন্তঃস্থ ছিল তখন এই কারণেই আমাদের কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট হয় নাই।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে যে ধূমকেতু প্রথম দেখা গিয়াছিল, এবং যাহা প্রতি চতুর্থ বৎসর ফিরিয়া আসে (Encke's Comet) তাহার আবর্ত্তনকাল ক্রমেই কমিয়া আসি-তেছে। সূর্য্যহইতে দূরত্ব না কমিলে কোন গ্রহ বা কেতুর আবর্ত্তকাল কমিতে পারে না। অতএব এই ধূমকেতু ক্রমেই সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতেছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে কালে এই ধূমকেতু সূর্য্যের পৃষ্ঠে নিপতিত হইবে এরূপ আশঙ্কাও হইতে পারে। কোন কোন পণ্ডিত বি-শেষতঃ সর্ উইলিয়ম টম্‌সন্ অনুমান করেন যে, সূর্য্য প্রচণ্ডতাপের আধার বটে কিন্তু এতকাল যাবৎ সৌরতাপ চতুর্দ্দিকে বিকিরণ হইতেছে তাহাতে ও সূর্য্যের তেজস্বিতার

---

* অহুতাশেহনলরূপং যস্মিংস্তৎ কেতুরূপ মেবোক্তম্।
খদ্যোত পিশাচালয় মণিরত্নাদীন্ পরিত্যজ্য॥
বৃহৎ সংহিতা।

বলা বাহুল্য আর অল্প অগ্রসর হইলেই এই পণ্ডিত কেতুর আলোকের নিদান অ-বধারণ করিতে পারিতেন। গ্রহাদি সৌর আলোকে আলোকিত একথা ইনি জা-নিতেন।

কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই ইহার কারণ আর কিছুই নহে, মধ্যে মধ্যে এই প্রকার কেতু পাত হওয়াতেই তাহার বিনষ্ট তাপের পরিপূরণ হয় * নচেৎ এতদিনে সূর্য্য তেজোহীন আভাহীন হইয়া নির্ব্বাপিত হইয়া যাইত আমরা মনোহর চন্দ্রালোকে 'হরিতশষ্প শোভিত' প্রান্তর দেখিতে পাইতাম না, শুক্র প্রভৃতি গ্রহ নিবিয়া যাইত, আমরা অনন্ত অন্ধকার ভোগ করিতে রহিতাম; কিন্তু সে পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিসান ক্রমে নহে কেননা সৌর আলোকই জীবের জীবন।

উপসংহারে আর্য্যগণের একটি আচারের উল্লেখ করিব। সকলেই জানেন কেহ হাঁচি দিলে নিকটে যিনি থাকেন তাঁহাকে 'জীব' এই কথাটি বলিতে হয়। এআচারের মূল কি? ভারতে কোন্ সূত্রে এআচার আরম্ভ হইল জানি না; তবে কিন্তু এইরূপ আচার বিশেষ ইউরোপেও আছে; সেখানে 'জীব' না বলিয়া 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন্' এই কথাটি উচ্চারণ করে। ৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে, একটা ধূমকেতুর আবির্ভাব সময়ে, এক প্রকার প্রবল রোগ দেখা দেয়। ঐ রোগে মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে হাঁচি হইত; সুতরাং হাঁচি হইলেই রোগীর বান্ধবেরা তাহার জীবিতাশা পরিত্যাগ করিয়া 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন' ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিত। সেই হইতে হাঁচি হইলেই 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন্' বলিবার রীতি চলিয়া আসিয়াছে *, আমরা এরূপ বলিতে

---

* পাঠক মনে করিবেন না কেতুর প্রচণ্ডতরতাপ সূর্য্যতাপে মিলিয়া সূর্য্যতাপ বর্দ্ধিত করে। কেতু সূর্য্যাপেক্ষা তেজস্কর হওয়া দূরে থাকুক উহা সৌর আলোকে আলোকিত একথা আমরা পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন বেগবান পদার্থের বেগ সহসা নিরুদ্ধ হইলে ঐ বেগ তাপে পরিণত হয়। বেগ অধিক হইলে উত্তাপও অধিক হইবে। সূর্য্যের সমীপস্থ হইয়া কেতু যে কিরূপ বেগে চলিতে থাকে তাহা আমাদের চিন্তারও অতীত। যদি সূর্য্যের সহিত অভিঘাত হইয়া কেতুর বেগ নিরুদ্ধ হয় তাহা হইলে সৌর উত্তাপ অবশ্যই বর্দ্ধিত হইবে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তখন উত্তাপ এত অধিক হইবে যে পৃথিবীর প্রাণিবর্গ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া যাইবে। সে অনুমান অমূলক। উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার পূর্ব্বেই বহুতর নূতন মেঘখণ্ড জন্মিয়া চন্দ্রাতপ রূপে বায়ু মণ্ডলে বিরাজ করিবে ও সৌর তেজের তীব্রতা কমাইয়া ফেলিবে।

* Another comet, that of 590, was, according to some authors, the occasion of a ridiculous custom which is no less extensively diffused among all the nations of Christendom. The year of this comet a frightful plague prevailed, which was alleged to be due to its influence. While the malady was at its height, a sneezing was frequently followed by death;

চাই না যে ভারতীয়েরা এই রীতি ইউরোপ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। সে বিষয়ে যখন প্রমাণ নাই তখন নির্বাক্ থাকাই উচিত। কিন্তু পাঠক এই উভয় আচারের সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। 'জীব' পদের অর্থ 'বাঁচিয়া থাকে'; মারাত্মক দুর্ঘটনা বিশেষের আশঙ্কা না করিলে বক্তার একথার তাৎপর্য্য থাকে না। ভারতীয়েরা এআচার ইউরোপ হইতে গ্রহণ নাও করিতে পারেন। কিন্তু যে দুর্ঘটনা ইউরোপে এই আচারের জনক ভারতবর্ষেও তদনুরূপ কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া এই রীতির সৃষ্টি করিয়াছে এরূপ অনুমান নিতান্ত অসংলগ্ন নহে। মানব সর্ব্বত্রই মানব; অতএব যে ঘটনা পরম্পরা হইতে স্থান বিশেষের মানবের চিত্তবৃত্তি কোন নির্দ্দিষ্ট প্রকার হইল ঐ সকল ঘটনা অপর স্থানে ঘটিয়া তথাকার মানবেরও চিত্তবৃত্তি ঐ প্রকার করিবে বিচিত্র কি!

শ্রীসা, রা—

---

whence the saying *God bless you!* with which, since that time, every sneezer is saluted.

Arago's Astronomy Vol I. P 659

আর্য্য পঞ্জিকা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা পাশ্চাত্য বর্ত্তমান জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের মত অবলম্বন করিয়া চন্দ্র স্ফুট গণনা করার জন্য নিম্নোক্ত রাশি সকল গ্রহণ করিব। ইহাতে পূর্ব্বে যে যে রাশির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইতে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যাওয়ার কারণ এই যে পৃথিবী ও সূর্য্য উভয়ের আকর্ষণ হেতু চন্দ্রের গতি এত পরিবর্ত্তনশীল যে মেইন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ দিগের সময় চন্দ্রকক্ষার বিশেষ২ স্থানের যেরূপ গতি ছিল আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তাহা হইতে কিছু কিছু পার্থক্য অবলোকন করিয়া নিম্নোক্ত রাশি সকল প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব আর্য্যগণ কত কত যুগ পূর্ব্বে যাহা স্থির করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে আমাদের গণনার ফলের কিছু কিছু পার্থক্য দেখিয়া পাঠকগণ বিস্মিত হইবেন না। বরং বর্ত্তমান সময়ের অত্যুৎকৃষ্ট যন্ত্রাদি ভিন্নও সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে আর্য্যগণ স্বকীয় প্রণালীতে যেসকল গণনা করিয়াছেন তাহার ফল হইতো আধুনিক প্রণালীতে গণনার ফলের সামান্য পার্থক্য দেখিয়া তাঁহাদিগের সাধুবাদ করিবেন সন্দেহ নাই।

চন্দ্রকক্ষার উৎকেন্দ্র (eccentricity)= .০৫৪৯০৮০৭

মধ্য হরিজ (horizontal parallax)= ৫৭· কলা ৩ বিকলা

বৃহত্তম ঐ .... ১ অংশ ১.৪৮কলা

ক্ষুদ্রতম ঐ .... ৫৩.৮৬ ঐ

চন্দ্রের ব্যাসার্দ্ধ .... ৩১.০৮ ঐ

চন্দ্রকক্ষার মধ্য অবনতি ... ৫ অংশ ৮ ঐ

" বৃহত্তম ঐ ... ৫ অংশ ১৩ ঐ

" ক্ষুদ্রতম ঐ ... ৫ অংশ ৩ ঐ

চান্দ্রমাসের মধ্যমান=...২৯.৫৩০৫৯ দিন

নাক্ষত্রিক পরিভ্রমণ (siderial revolution) ২৭.৩২১৬৬ দিন

পাতের মধ্য পরিভ্রমণ (বিপরীত) ৬৭৯৩. .৩৯১ দিন=১৮.৫৯৯৭ বর্ষ

পাতের বার্ষিক মধ্য বিপরীত গতি ১৯অংশ ২১.৩ কলা

" দৈনিক ঐ =৩.১৭৭৩ কলা

চন্দ্রোচ্চের বার্ষিক মধ্যগতি =৪০ অংশ ৪০.৫২ কলা

" দৈনিক ঐ =৬ কলা ৪০.৯ বিকলা

চন্দ্র কক্ষাকে বৃত্তাভাস মনে করিয়া চন্দ্রস্ফুট গণনা করিলে নিম্নোক্ত তিন প্রকার সংশোধন করা আবশ্যক।

(১) চন্দ্র, সূর্য্য ও চন্দ্রোচ্চের পরস্পর সংস্থান দ্বারা। এই সংশোধনের পরিমাণ=

৭৬.৪৫ [জ্যা ২ (চ—স)—ম] কলা

(২) চন্দ্র ও সূর্য্যের পরস্পর সংস্থান দ্বারা। উহার পরিমাণ=৩৯.৫১ জ্যা২ (চ—স) কলা

(৩) সূর্য্যের শৈঘ্রকেন্দ্র (anomaly) দ্বারা। উহার পরিমাণ=১১.১৫ জ্যাম′ কলা।

এই স্থলে চ=চন্দ্র মধ্য (mean longitude)

স=সূর্য্য মধ্য

ম=চন্দ্রের মধ্যকেন্দ্র (mean anomaly)

ম′=সূর্য্যের ঐ

অতএব চন্দ্রস্ফুট=চ+[৩৭৭.৩১৮ জ্যাম+ ৭৬.৪৫ জ্যা [২(চ—স)—ম]+৩৯.৫১ × জ্যা২ (চ—স)—১১.১৫ জ্যাম′] কলা

আমরা এই নিয়মে ১৮০০ শকের যথার্থ মেষ-সংক্রান্তি দিবসের অর্থাৎ ইংরাজি ১৮৭৮ সনের ১০ই এপ্রেল ঢাকাতে অর্দ্ধ রাত্রির সময় যে চন্দ্র স্ফুট ছিল তাহা গণনা করিব।

উক্ত সময়ে চ=৯৮ অংশ ১২ কলা ৩৬ বিকলা

স=১৫৮ " ৮ " ৩ "

চন্দ্রোচ্চ=১৪৯ " ৩৪ " ৩৩ "

অতএব ম=৩০৮ " ৩৮ " ৩ "

সূর্য্যোচ্চ=২৬০ " ৯ " ৪১ "

অতএব ম′=৯৭ " ৫৮ " ২২ "

২ (চ—স)=২০০ অংশ ৯ কলা; ২ (চ—স)—ম=২৫১ অংশ ৩০ কলা;

৩৩৭.৩১৮ জ্যাম=৩৩৭.৩১৮ × .৭৮১১৩= —২৯৪.৭৩

৭৬.৪৫ জ্যা [২ (চ—স)—ম]= —৭৬.৪৫ × .৯৪৯২১=—৭২.৫৭

৩৯.৫১ জ্যা ২ (চ—স)=৩৯.৫১ × .৩৪৪৭৪৪=—১৩.৬২

—১১.১৫ জ্যাম=১১.১৫ × ৯৯০৮৮৬= —১১.০৫

—৩৯১.৯৭ কলা

=(৬ অংশ ৩১.৯৭ কলা)

এই রাশি চ হইতে বিয়োগ করিয়া চন্দ্র স্ফুট ৯১ অংশ ৪০ কলা ৩৮ বিকলা বা ৩ রাশি ১ অংশ ৪০ কলা ৩৮ বিকলা হইল। অর্থাৎ উক্ত সময়ে চন্দ্র কর্কট রাশিতে ১ অংশ ৪০ কলা ৩৮ বিকলা ভোগ করিয়া ছিল।

উক্ত সময়ে সূর্য্য স্ফুট = ম + ১.৯২৪৯ জ্যাম + .০১২১ জ্যা ২ ম

= ম + ১.৯০৪১২৩ — .০০৩২৩৩

= ৩৬০ অংশ ২ কলা ১৮ বিকলা

৩৬০ অংশ ত্যাগ করিয়া সূর্য্য স্ফুট মাত্র ২ কলা ১৮ বিকলা হইল।

চন্দ্র ও সূর্য্য স্ফুটের অন্তর ৯১ অংশ ৩৮ কলা ২০ বিকলা এবং উহাদিগের সমষ্টি ৯১ অংশ ৪২ কলা ৫৬ বিকলা হইল।

দেশান্তর ৯০½ অংশ এবং অয়নাংশ ২০ অংশ ৪১ কলা ৯ বিকলা ধরিয়া পাশ্চাত্য নৌপঞ্জিকার সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় এই ফল ঠিক হইয়াছে।

চন্দ্রের তাৎকালিক দৈনিক গতি ১৩ অংশ ৪১.৫ কলা এবং সূর্য্যের ৫৮.৮ কলা। অতএব উহাদিগের সমষ্টি ১৪ অংশ ৪০.৩ কলা এবং অন্তর ১২ অংশ ৪২.৭ কলা।

তিথি—এক তিথির মান ১২ অংশ অতএব চন্দ্র ও সূর্য্য স্ফুটের অন্তর ৯১ অংশ ৩৮.৪ কলা ৮ তিথির মান ৯৬ অংশ হইতে ৪ অংশ ২১.৬ কলা ন্যূন হইল অর্থাৎ শুক্লা অষ্টমীর গম্য অংশাদি ৪ অংশ ২১.৬ কলা। এই রাশিকে ৬০ দ্বারা গুণ করিয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের তাৎকালিক গতির অন্তর ১২ অংশ ৪২.৭ কলা দ্বারা ভাগ করিলে অষ্টমীর স্থিতি দণ্ডাদি ২০ দণ্ড ২৪ পল পাওয়া যায়। উক্ত তারিখে রাত্রিমান ২৮ দণ্ড ৫০ পল; উহার অর্দ্ধ ১৪ দণ্ড ২৫ পল বিয়োগ করিয়া ৫ দণ্ড ৫৯ পল পাওয়া গেল। অতএব পর দিন বেলা ৫ দণ্ড ৫৯ পল পর্য্যন্ত অষ্টমী ছিল।

নক্ষত্র—এক নক্ষত্রের মান ১৩ অংশ ২০ কলা অতএব চন্দ্র স্ফুট ৯১ অংশ ৪০.৬৩ কলা ৭ নক্ষত্রের মান ৯৩ অংশ ২০ কলা হইতে ১ অংশ ৩৯.৩৭ কলা ন্যূন অর্থাৎ পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের গম্য অংশাদি ১ অংশ ৩৯.৩৭ কলা। এই রাশিকে ৬০ দ্বারা গুণ করিয়া চন্দ্রের তাৎকালিক গতি ১৩ অংশ ৪১.৫ কলা দ্বারা ভাগ করিলে পুনর্ব্বসুর স্থিতি দণ্ডাদি অর্দ্ধ রাত্রির পর ৭ দণ্ড ৩৫ পল হয়। উক্ত তারিখে অর্দ্ধরাত্রির মান প্রাতঃকাল হইতে ৪৫ দণ্ড ৩৫ পল, অতএব প্রাতঃকাল হইতে গণনা করিয়া পুনর্ব্বসুর মান ৫২ দণ্ড ৫০ পল হইল।

যোগ—এক যোগের মান ১৩ অংশ ২০ কলা চন্দ্র ও সূর্য্য স্ফুটের সমষ্টি ৯১ অংশ ৪১.৯৩ কলা ৭ যোগের মান ৯৩অংশ ২০ কলা হইতে ১ অংশ ৩৭ কলা ন্যূন অর্থাৎ সপ্তম যোগ সুকর্ম্মার গম্য অংশাদি ১ অংশ ৩৭ কলা এই রাশিকে ৬০ দ্বারা গুণ করিয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের তাৎকালিক গতির সমষ্টি ১৪ অংশ ৪০.৩ কলা দ্বারা ভাগ করিলে সুকর্ম্মার স্থিতি অর্দ্ধরাত্রির পর ৬ দণ্ড ৩৬ পল পাওয়া যায়। অর্দ্ধ রাত্রির মান ৪৫ দণ্ড ৩৫ পলের সহিত উহা যোগ করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সুকর্ম্মার মান ৫২ দণ্ড ১১ পল হয়।

উক্ত তারিখে প্রাতঃকালে শুক্লাসপ্তমীর শেষ ভাগ ছিল, তৎপরে অষ্টমীর প্রথমার্দ্ধে বিষ্টি করণ এবং শেষার্দ্ধে বব করণ।

প্রাচীন মতে যে সকল পঞ্জিকা গণনা করা হয় তাহাতে দেখা যায় উক্ত তারিখে অ-ষ্টমী ৫৪ দণ্ড ৫ পল, পুনর্ব্বসু নক্ষত্র ৪৭ দণ্ড ২ পল এবং সুকর্ম্মা যোগ ৫১ দণ্ড ৪০ পল। অতএব আধুনিক গণনা হইতে যোগে অর্দ্ধ দণ্ড নক্ষত্রে প্রায় ৬ দণ্ড এবং তিথিতে প্রায় ১২ দণ্ডের পার্থক্য ঘটিয়াছে। সর্ব্বদাই যে এত পার্থক্য হইবে তাহা নহে, আমরা পরে শ্রাবণ মাসে গ্রহণ গণনা করার সময় দে-খিব পূর্ণিমার স্থিতি সম্বন্ধে মাত্র ২ দণ্ড ৪৪ পলের পার্থক্য। যাহা হউক ইহা যদি সংশোধন করা না হয় তবে আর্য্যঋষিদি-গের ব্যবস্থা অনুসারে অনেক কার্য্যই নষ্ট হওয়ার গতিক। যেমন আমরা যে অষ্টমী গণনা করিয়াছি তাহাতে বাসন্তী অষ্টমী পূজা ছিল। ঐ পূজা যথার্থ গণনামতে পূর্ব্ব দিন না হইয়া পরদিন হওয়া উচিত ছিল।

চন্দ্র পাত ১৮.৫৯৯৭ বৎসরে একবার বিপরীত দিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে রাশিচক্রকে পরিভ্রমণ করে অতএব উহার বার্ষিক মধ্যগতি (১৯ অংশ ২১ কলা ১৮.৩ বিকলা) এবং দৈনিক মধ্য গতি—৩.১৭৭৩ কলা। ১৮০০ শকের যথার্থ মেষ সংক্রান্তি দিবস অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৭৮ সনের ১০ই এপ্রিল ঢাকাতে অর্দ্ধ রাত্রির সময় রাহুর মধ্য (mean longitude) ৩১৯ অংশ ২১.৪৫৭ কলা। ইহা হইতে এক এক দিনের জন্য ৩.১৭৭৩ কলা বি-য়োগ করিয়া অভীপ্সিত সময়ের রাহু-মধ্য স্থির করা যাইতে পারে।

মনে কর রাহু মধ্য = র

সূর্য্যমধ্য = স

তবে রাহু স্ফুট (true longitude) = র + ৯০.৪৩ জ্যা২ (স—র) কলা হইবে। চন্দ্র কক্ষার মধ্য অবনতি (mean inclination) ৫ অংশ ৮ কলা; উহার সঙ্গে ৫ কোটি জ্যা ২ (স-র) কলা যোগ করিলে স্ফুট অবনতি (true inclination) পা-ওয়া যাইবে।

১৮০০ শকের মেষসংক্রান্তি দিবস ঢা-কাতে অর্দ্ধ রাত্রির সময়।

স = ৩৫৮ অংশ ৮.০৫ কলা
র = ৩১৯ " ২১.৪৫ কলা

অন্তর = ৩৮ অংশ ৪৬.৬ কলা
২

১৯ অংশ ৩৩ কলা

এই শেষোক্ত রাশির জ্যা = .৯৭৬৪৪৮ এবং কোটি জ্যা = .২৩৪৮৩৪। রাহু স্ফুট = র + ৯০.৪৩ × .৯৭৬৪৪৮ কলা = র + ৮৮.৩ কলা = ৩২০ অংশ ৪৯.৭ কলা।

স্ফুট অবনতি = ৫ অংশ ৮ কলা + ৫ × .২৩৪৮৩৪ কলা = ৫ অংশ ৯.১৭ কলা।

অন্যান্য গ্রহের স্ফুট স্থান গণনা ক-রার জন্য পূর্ব্ব নিয়মে গ্রহকক্ষাকে বৃত্তাভাস মনে করিয়া তাহাদের স্ফুটকেন্দ্র (true anomaly) এবং ব্যাসার্দ্ধ স্থির করিবে। এই প্রকার সৌরকেন্দ্রিক স্ফুট (heliocentric longitude) স্থির করিয়া গ্রহ স্থান হ-ইতে রাশিচক্রের উপর লম্ব পাত কর। এই

লম্বের মান সৌরকেন্দ্রিক বিক্ষেপ (latitude)। গ্রহকক্ষার অবনতি দ্বারা এই বিক্ষেপ ল স্থির করার নিয়ম পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। সূর্য্য হইতে গ্রহের দূরত্ব যদি ব এবং লম্বের অবচ্ছেদ বিন্দুর দূরত্ব যদি ব´ হয় তবে—

ব´=ব কোটি জ্যাল

এইক্ষণ মনে কর কোন গ্রহের

সৌরকেন্দ্রিক স্ফুট= গ

ভূকেন্দ্রিক ঐ = গ´

পাতের ঐ = র

সূর্য্যের ঐ = স

সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব = ১

অতএব ব´+কোটি জ্যা (গ—স) + জ্যা (গ-স) × ভুজ (গ´—গ) = ০ এই সমীকরণ দ্বারা গ´ স্থির করা যাইতে পারে।

প্রত্যেক গ্রহ বক্রী হওয়ার পূর্ব্বে এবং পরে এক এক বার স্থির (stationary) থাকে। গ্রহ স্থিরভাবে থাকার সময় পৃথিবী ও গ্রহের সৌরকেন্দ্রিক স্ফুটের অন্তর অ হইলে কোটি জ্যা অ [ব—√ব+১] = √ব।

এই সমীকরণ দ্বারা কোন সময় বক্রী হয় এবং কোন সময় বক্রগতি ত্যাগ করে তাহা স্থির হইতে পারে।

গ্রহস্ফুট গণনার জন্য যে যে আবশ্যকীয় বিষয় তাহার একখণ্ডা নিম্নে দেওয়া গেল।

১৮০০ শকের মেষসংক্রান্তি দিবস (১০ই এপ্রিল ১৮৭৮ ইং)

গ্রহের নাম	সৌরকেন্দ্রিক মধ্য	দৈনিক মধ্যগতি	শীঘ্রোচ্চ	বার্ষিক গতি	ঊর্দ্ধপাত	বার্ষিক গতি	অবনতি	বার্ষিক পরিবর্ত্তন	উৎকেন্দ্র	মধ্যদূরত্ব (পৃথিরদূরত্ব১)	নাক্ষত্রিক পরিভ্রমণ
	অং. ক. বি.	বিকলা	অং. ক. বি.	বিকলা	অং. ক. বি.	বিকলা	অং. ক. বি.	বিকলা			দিন
বুধ	৯৮.২৮.৮.৫	১৪৭৩২.৪	৫৪.২৮.৩৫	+৫.৮	২৫.৭৪.৯.৮	—১০	৭.০.১৩.২	+.১৮	.২০৫৬১৮	.৩৮৭০৯৯	৮৭.৯৬৯৩
শুক্র	২০৯.৪৫.২৩	৫৭৬৭.৬	১০৮.৪১.১৫	—৩.২৪	৫৪.২৭.১৬	—২০.৫	৩.২৩.৩২.৭	+.০৭	.০০৬৮৩৩	.৭২৩৩৩২	২২৪.৭০০৮
মঙ্গল	৭৪.৫৮.৩৭.৫	৮৮৬.৫	৩১২.৪৩.৫৮	+১৫.৪৬	২৭.২৯.৪১	—২৫.২	১.৫১.৪.৩	—.০১	.০১৬৭৭১	১.৫২৩৬৯১	৬৮৬.৯৭৯৭
বৃহস্পতি	২৭৬.৪৪.৫৩.৫	২৯৯.১	৩৫১.২৫.৬	+৬.৬৫	৫৮.৫.৪২	—১৫.৯	১.১৮.৩৩.৮	—.২৩	.০৯৩২৬২	৫.২০২৭৯৮	৪৩৩২.৪৮৪৮
শনি	৩৩৯.০.৩৮	১২০.৫	৬৯.৩৪.৮	+১৯.৩১	৯১.৩১.২৪	—১৯.৫	২.২৯.২৩.৮	—.১৫	.০৫৫৯৯৬	৯.৫৩৮৮৫২	১০৭৫৯.২১৯৮

গ্রহণ।

ছাদকো ভাস্করস্যেন্দুরধঃস্থো ঘনবদ্ভবেৎ।
ভূচ্ছায়াং প্রাঙ্মুখশ্চন্দ্রো বিশত্যস্য ভবে-
দসৌ॥

সূর্য্যসিদ্ধান্ত ৪ অঃ ৯ শ্লোক

চন্দ্র নিম্নদেশে থাকিয়া মেঘের ন্যায় সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে তাহাতে সূর্য্য গ্রহণ হয়। পূর্ব্বগামী চন্দ্র পৃথিবীর ছায়াতে প্রবেশ করিলে ঐ ছায়া চন্দ্রের অচ্ছাদক হয় এবং তাহাতে চন্দ্রগ্রহণ হয়।

ভানোর্ভার্দ্ধে মহীচ্ছায়া তৎতুল্যেহর্কেসমে
হপিবা।
শশাঙ্ক পাতেগ্রহণং কিয়দ্ভাগাধিকোনকে॥

সূর্য্যসিদ্ধান্ত ৪ অঃ ৬ শ্লোক

সূর্য্য হইতে ১৮০ অংশদূরে পৃথিবীর ছায়া। চন্দ্রপাত যদি ঐ ছায়া কিংবা সূর্য্যের সমান হয় তবে গ্রহণ হইবে এবং অল্প কিছু ন্যূনাধিক হইলেও হইবে।

চন্দ্র যদি রাশিচক্রে পরিভ্রমণ করিত,তবে প্রত্যেক অমাবস্যাতে চন্দ্র সূর্য্যকে এবং প্রত্যেক পূর্ণিমাতে ভূচ্ছায়া চন্দ্রকে আচ্ছাদন করিত অর্থাৎ প্রত্যেক অমাবস্যাতে সূর্য্যগ্রহণ এবং প্রত্যেক পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ হইত। কিন্তু চন্দ্রকক্ষা রাশিচক্র হইতে ভিন্ন, অতএব চন্দ্র যখন পাতে অর্থাৎ রাশিচক্রের উপর আসে অথবা তন্নিকটবর্ত্তী হয় তখন গ্রহণের সম্ভাবনা।

পক্ষান্তকাল প্রভবস্যতুল্যাঃ
স্ফুটস্যভানোঃ স্ফুটসৈংহিকেয়ঃ।
তৎসপ্তমে বা গ্রহণং রবীন্দোঃ
দিগ্বিশ্বভাগৈরধিকোহপি হীনঃ॥

অমাবস্যার সময় সূর্য্যস্ফুটে ও পাত স্ফুটে ১০ অংশ ন্যূনাধিক হইলে সূর্য্যগ্রহণ আর পৌর্ণমাসীতে চন্দ্রস্ফুটে ও পাত স্ফুটে ১৩ অংশ ন্যূনাধিক হইলে চন্দ্রগ্রহণ হয়।

বাস্তবিক সূর্য্যস্ফুটে ও পাত স্ফুটে যদি ১৩ অংশ ৪২ কলার ন্যূনাধিক হয় তবে সূর্য্যগ্রহণ নিশ্চয়ই হইবে আর ১৮ অংশ ৩৬ কলার মধ্যে হইলে চন্দ্র যদি শীঘ্রোচ্চের নিকটে (অর্থাৎ পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী) থাকে তবে গ্রহণ হইবে নচেৎ হইবে না। তদ্রূপ সূর্য্যস্ফুট ও পাতস্ফুটে ৯ অংশের পার্থক্য হইলে নিশ্চয়ই চন্দ্রগ্রহণ হইবে আর ১২ অংশ ৩০ কলার পার্থক্য থাকিলে অবস্থা মতে হইতেও পারে না হইতেও পারে।

ভত্রিপাদান্তরে রাহোঃ কেতোর্ব্বাসংস্থিতো
রবিঃ।
চতুষ্পাদান্তরে চন্দ্রস্তদাসংভাব্যতে গ্রহঃ॥
যস্মিন্নৃক্ষে রবিস্তস্মাচ্চতুর্দ্দশ গতঃ শশী।
পূর্ণিমা প্রতিপৎ সন্ধৌ রাহুনা গ্রস্যতেশশী
কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়ায়াং মাসর্ক্ষং যদি জায়তে
ততস্ত্রয়োদশেসূর্য্যোরাহুনা গ্রস্যতে রবিঃ॥

গ্রহণ গণনা আয়াস সাধ্য বলিয়া গ্রহণ হওয়া সম্ভব কি না পূর্ব্বে স্থির করার জন্য উপরের শ্লোক কয়টি দেওয়া হইয়াছে। উহাদিগের তাৎপর্য্য যথা—

সূর্য্য যে নক্ষত্রের যে পাদে থাকিবে সেই নক্ষত্রের সেই পাদের পূর্ব্বাপর তিন পাদমধ্যে এবং চন্দ্র যে নক্ষত্রের যে পাদে থাকিবে তাহার পূর্ব্বাপর চতুষ্পাদ মধ্যে যদি রাহু কিম্বা কেতু থাকে তবে গ্রহণের সম্ভাবনা।

যে-নক্ষত্রে রবি থাকিবে ঐ নক্ষত্র হইতে গণনা করিয়া চতুর্দ্দশ নক্ষত্রে যদি চন্দ্র থাকে তবে পূর্ণিমা ও প্রতিপৎ সন্ধিতে চন্দ্রগ্রহণ হইবে।

কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে যদি মাস নামক নক্ষত্র প্রাপ্ত হয় এবং ঐ নক্ষত্র হইতে গণনা করিয়া ত্রয়োদশ নক্ষত্র যে দিবস হয় সেই দিবস সূর্য্যগ্রহণ হইবে।

পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে সমুদায় গণনা করা হইয়া থাকে; কিন্তু দর্শন প্রকৃতরূপে উহার পৃষ্ঠদেশের কোন স্থান হইতে হয়। অতএব কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের জন্য গণনা করিতে হইলে পৃথিবীর কেন্দ্র ও উক্ত স্থান এই উভয়কে দৃষ্টগ্রহের কেন্দ্রের সহিত সরল রেখা দ্বারা সংযোজনা করিলে তাহাদের মধ্যে যে কোণ হয় তাহা জানা আবশ্যক। এই কোণকে হরিজ (parallax) বলে। উহা স্থির করার জন্য প্রথম পৃথিবী হইতে গ্রহের দূরত্ব স্থির করিতে হইবে।

মনে কর দ=দূরত্ব, ব=কক্ষার ব্যাসার্দ্ধ শ=গ্রহের স্ফুটকেন্দ্র (true anomaly)

$$\text{তবে দ} = \frac{\text{ব}(১-\text{উ}^২)}{১+\text{উ কোটি জ্যাশ}}$$

এইক্ষণ পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ প এবং হরিজ হ ধরিলে দ×জ্যাহ=প। চন্দ্রের পক্ষে উ =.০৫৪৯, ব=৬০ প

$$\text{অতএব জ্যাহ} = \frac{১+.০৫৪৯\ \text{কোটি জ্যাশ}}{৫৯.৮২}$$

সূর্য্যের ব্যাসার্দ্ধ শীঘ্রোচ্চে ১৬ কলা ১৭.০৮ বিকলা এবং মন্দোচ্চে ১৫ কলা ৪৫.৫ বিকলা। মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে সূর্য্যের ব্যাসার্দ্ধ অনুপাত দ্বারা স্থির করিতে হইবে।

চন্দ্রের ব্যাসার্দ্ধ আশ্বিন ও তন্নিকটবর্ত্তী মাসেই কিছু অধিক পরিবর্ত্তিত হয়। আশ্বিন মাসে শীঘ্রোচ্চে চন্দ্রের ব্যাসার্দ্ধ ১৬ কলা ৪৫ বিকলা এবং মন্দোচ্চে ১৪ কলা ৪০ বিকলা হয়। চৈত্র মাসে শীঘ্রোচ্চে ১৬ কলা ২০ বিকলা এবং মন্দোচ্চে ১৪কলা ৪৯ বিকলা হইয়া থাকে। মধ্যবর্ত্তী কোন মাসে অনুপাত দ্বারা স্থির করিতে হইবে।

চন্দ্রের বিক্ষেপ (latitude) ল স্থির করার জন্য মনে কর অ=চন্দ্রকক্ষার অবনতি এবং চ=চন্দ্রস্ফুট হইতে রাহু বা কেতুস্ফুটের অন্তর। তবে জ্যাল=জ্যা অ ×জ্যাচ।

এইক্ষণ দেখা যায় পৌর্ণমাসীতে সপ হইতে চন্দ্রের দূরত্ব যদি ছায়ার ও চন্দ্রের ব্যাসার্দ্ধ চম হইতে ন্যূন হয় তবেই চন্দ্রগ্রহণ হইবে। অমাবস্যাতে যদি ঐ দূরত্ব ছায়ার অপর ভাগের ও চন্দ্রের ব্যাসার্দ্ধ শন অপেক্ষা ন্যূন হয় তবে সূর্য্যগ্রহণ হইবে।

মনে কর স সূর্য্য, প পৃথিবী, শশ′ চ′ চক চন্দ্রকক্ষা, খচঙকঘ ভূচ্ছায়া, চ′খ′খক ক উপচ্ছায়া। ঠ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান এবং ট চন্দ্রকক্ষার সঙ্গে সঠএর অবচ্ছেদ।

মনে কর স সূর্য্যের ব্যাসার্দ্ধ, হ চন্দ্রের হরিজ, হ′ সূর্য্যের হরিজ।

ভূচ্ছায়ার ব্যাসার্দ্ধ=চপম=পচখ—পঙচ= পচখ—সপগ—পগখ=হ—স—হ′

উপচ্ছায়ার ব্যাসার্দ্ধ=চপম=পচখ+পঘখ

= পচথ + গপঘ + পগঘ = হ + স + হ´
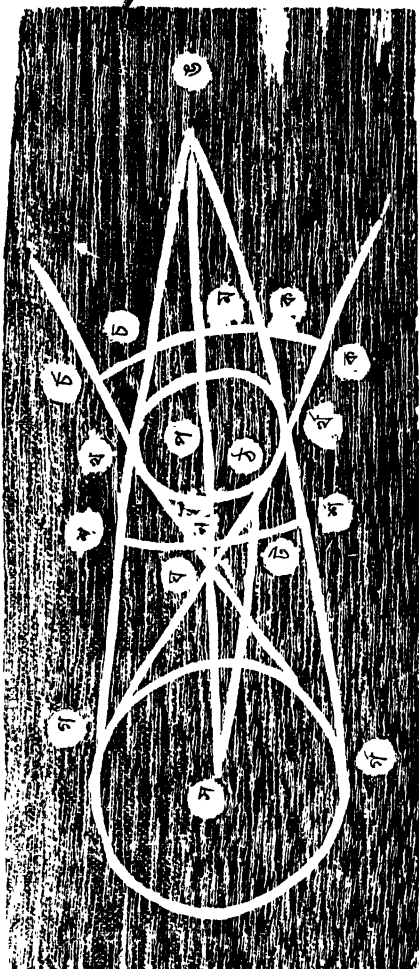
ছায়ার পূর্ব্বাংশ শন এর ব্যাসার্দ্ধ = নপশ

= সপগ + গপশ = পশথ — পগশ = স + হ — হ´

আর্য্য মতে ছায়ার ব্যাসার্দ্ধ স্থির করার নিয়ম

স্ফুটেন্দু ভুক্তি ভূব্যাস গুণিতা মধ্যয়োদ্ধৃতা।
লব্ধং সূচী মহী ব্যাস স্ফুটার্ক শ্রবণান্তরং॥
মধ্যেন্দুব্যাস গুণিতং মধ্যার্ক ব্যাস ভাজিতং।
বিশোধ্য লব্ধং সূচ্যাং তুতমোলিপ্তাস্ত পূর্ব্ববৎ॥

চন্দ্রের স্ফুট ভুক্তি পৃথিবীর ব্যাস দ্বারা গুণ করিয়া তাহার মধ্য ভুক্তি দ্বারা ভাগ করিলে সূচী অর্থাৎ পৃথিবীর স্ফুট ব্যাস পাওয়া যায়। এই ভূব্যাস ও সূর্য্য বিম্ব ব্যাসের অন্তরকে মধ্য চন্দ্র বিম্ব ব্যাস (৪৮০) দ্বারা গুণ ও মধ্য সূর্য্য বিম্ব ব্যাস (৬৫০০) দ্বারা ভাগ করিবে। এই ভাগ ফল উক্ত সূচী হইতে বিয়োগ করিলে চন্দ্র কক্ষাতে ভূচ্ছায়া পাওয়া যাইবে। উহার কলা পূর্ব্ববৎ ১৫ দ্বারা ভাগ করিয়া স্থির করিবে।

ভূব্যাস হীনং রবি বিম্বমিন্দু কর্ণাহতং ভাস্কর কর্ণ ভক্তং।
ভূবিস্তৃতি লব্ধ ফলেন হীনা ভবেৎ কুভাবিস্তৃতি বিন্দুমার্গে। সিদ্ধান্ত শিরোমণি।

এইক্ষণ মনে কর গ = প্রতি দণ্ডে চন্দ্রের তাৎকালিক গতি

গ´ = বিক্ষেপে ঐ—

স´ = প্রতিদণ্ডে সূর্য্যের তাৎকালিক গতি

অ = ছায়া ও চন্দ্র কেন্দ্রের দূরত্ব

ন = নাড়ী বা দণ্ডের মান

অতএব অ² = (ল + নগ)² + (গ — স)²ন²

এই সমীকরণে অ কে ছায়া ও চন্দ্রের ব্যাসার্দ্ধের সমষ্টির সমান মনে করিলে গ্রহণের আরম্ভ ও শেষ সময় স্থির হইবে; উহাদিগের অন্তরের সমান মনে করিলে পূর্ণগ্রাস আরম্ভ ও মোচনের সময় স্থির হইবে; চন্দ্র ব্যাসার্দ্ধের সমান মনে করিয়া গ্রহণের মধ্য স্থির হইবে।

ইংরাজি ১৮৭৮ সনের ১২ই আগষ্ট যে গ্রহণ হয় তাহা আমরা এই নিয়মে গণনা করিব।

পর দিন বেলা ১ দণ্ড ৪৬ পলের সময় পৌর্ণমাসী ত্যাগ হয়। উক্ত সময়ে—

চন্দ্র স্ফুট=৩২০ অংশ ৫ কলা

সূর্য্য স্ফুট=১৪০ অংশ ৫ কলা।

চন্দ্রোচ্চের স্ফুট=১৬৩ অংশ ২৩ কলা

অতএব শ=১৫৬ অংশ ৪২ কলা এবং উহার কোটি জ্যা=.৯১৮৪১৮

$$জ্যা\ হ = \frac{১—.০৫৪৯ \times .৯১৮৪১৮}{৫৯.৮২}$$

$= \frac{১}{৬৩} = .০১৫৮৭৩$

অতএব হ=৫৪ কলা ৫৬ বিকলা

সূর্য্যের হরিজ হ=৮.৮ বিকলা

র=৩১২ অংশ ৪৭ $\frac{১}{২}$ কলা, স=১২২ অংশ ২৭ কলা

উহাদিগের অন্তরের দ্বিগুণ ৩৮৯ অংশ ২১ কলা।

উহার জ্যা=.৩৫২৯১৭ এবং কোটি জ্যা=.৯৩২৭৮১

রাহুর স্ফুট=র—৯৫.৪৩×.৩৫২৯১৭ কলা

=র—৩১.৫৯ কলা

=৩১২ অংশ ১৬.৮৮ কলা

চন্দ্রকক্ষার মধ্য অবনতি ৫ অংশ ৮ কলা।

উহার স্ফুট অবনতি=৫ অংশ ৮ কলা+৫×.৯৩২৭৮১ কলা

=৫ অংশ ১২ কলা

জ্যাল=জ্যা অ×জ্যা শ=.০৮৭১×.১২১

=.০১০৫২৯ অতএব ল=৩৬ কলা ৩২ বিকলা।

বিক্ষেপে চন্দ্রের প্রতিদণ্ডে গতি

গ´=১কলা ৮ বিকলা

রাশিচক্রে চন্দ্রের প্রতিদণ্ডে গতি গ=১২ কলা ১১ বিকলা

রাশিচক্রে সূর্য্যের প্রতিদণ্ডে গতি স=৫৭.৫ বিকলা

সূর্য্যের ব্যাসার্দ্ধ স´=১৫ কলা ৪৯.৬ বিকলা।

চন্দ্রের ঐ চ=১৪ কলা ৫৯ বিকলা

ভূচ্ছায়ার ঐ হ—স+হ´=৫৪ কলা ৫৬ বিকলা—(১৫ কলা ৪৯.৬ বিকলা)+৮.৮ বিকলা=৩৯ কলা ১৪.৪ বিকলা।

উহার ৫০ ভাগের একভাগ যোগ করিয়া ভূচ্ছায়া ধরিতে হয়, কারণ যে যে সূর্য্যরশ্মি পৃথিবীর অত্যন্ত নিকট দিয়া যায় তাহা বায়ুদ্বারা এবং অন্যান্য কারণে নষ্ট হয় বলিয়া ভূচ্ছায়াকে কিছু বর্দ্ধিত করিয়া লইতে হয়। অতএব ভূচ্ছায়াতে ৪৭ বিকলা যোগ করিয়া ৪০ কলা ১ বিকলা হয়।

অতএব ভূচ্ছায়া ও চন্দ্র ব্যাসার্দ্ধের সমষ্টি=৫৫.৩ কলা উহাদিগের অন্তর ২৫ কলা

গ=১২.১৮ কলা

গ´=১.১৩ কলা

স´=.৯৬ কলা

উপচ্ছায়ার ব্যাসার্দ্ধ=হ+স+হ´=৭০.৯ কলা অতএব $অ^২=(৩৬.৫৩+১.১৩ন)^২+(১২.১৮—.৯৬)^২ন^২=১৩৩৪.৪৪+৮২.৫৬ন+১.২৭৬ন^২+১২৫.৮৮ন^২=১২৭.১৬ন^২$

অ^২=১২৭.১৬ন^২ + ৮২.৫৬ ন + ১৩৩৪.৪৪

∴ ন^২ + .৬৫ন + ১০.৪৯—.০০৭৮ অ^২ = ০

অতএব২ন = —.৬৫ ± √(.৪২ + ৪১.৯৬—.০৩১২ অ^২)

এইক্ষণ মনে কর অ = উপচ্ছায়া ও চন্দ্রের ব্যাসার্দ্ধের সমষ্টি = ৮৫.৮ কলা অতএব ২ন = ½(-.৬৫ ± √১৮৮.৪২) = ½(-.৬৫ ± ১৩.৭২)

ন = —৭.১৮ বা + ৬.৫৩

অর্থাৎ উপচ্ছায়ার সঙ্গে সংযোগ পূর্ণিমা ত্যাগের ৭ দণ্ড ১০পল পূর্ব্বে এবং মোচন ৬ দণ্ড ৩২পল পরে। পর দিন বেলা ১দণ্ড ৪৬ পলে পূর্ণিমা ত্যাগ হয় অতএব ৫দণ্ড ২৪পল রাত্রি থাকিতে উপচ্ছায়া স্পর্শ হয়। পুনঃ মনে কর অ = ছায়া ও চন্দ্র ব্যাসার্দ্ধের সমষ্টি ৫৫.৩ কলা

অতএব ২ন = .৬৫ ± √৫৪.৬৬ = —.৬৫ ± ৭.৩৯ন = —৪ বা + ৩.৩৭

অর্থাৎ ছায়ার সঙ্গে সংযোগ পৌর্ণমাসী ত্যাগের ৪দণ্ড পূর্ব্বে অর্থাৎ ২দণ্ড ১৫পল রাত্রি থাকিতে এবং মোচন ৩দণ্ড ২২পল পরে। অ এর সমান ২৫কলা ধরিলে ন অসম্ভব হয় অতএব পূর্ণগ্রাস হইয়াছিল না।

সূর্য্য গ্রহণ পৃথিবীর জন্য সাধারণ ভাবে গণনা করিতে ভূচ্ছায়ার পরিবর্ত্তে তাহারা পূর্ব্বাংশের ব্যাসার্দ্ধ স + হ—হ´ ব্যবহার করিয়া ঠিক চন্দ্র গ্রহণের ন্যায় গণনা করিলেই হইবে কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের জন্য গণনা করিতে হইলে উক্ত স্থানের অক্ষাংশ জানিতে হইবে। প্রথম সাধারণ ভাবে গ্রহণের আরম্ভ এবং মোচনের সময় স্থির করিয়া তন্মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে গ্রহণের অবস্থা স্থির করার জন্য ঐ সময়ে উক্ত স্থানের পক্ষে চন্দ্র ও সূর্য্যের স্ফুট, বিক্ষেপ, হরিজ, লম্বন (parallax in latitude) এবং ব্যাসার্দ্ধ স্থির করিবে উক্ত স্থান সূর্য্যকেন্দ্রের সঙ্গে যোগ করিলে যে রেখা হয় তাহার চন্দ্র-কক্ষার সঙ্গে অবচ্ছেদ-বিন্দু ট। এইক্ষণ চন্দ্র যখন গঠগ´ এই সূচীর মধ্যে আসিবে তখনই ঠ তে গ্রহণ দেখা যাইবে। চন্দ্র কক্ষাতে এই সূচীর ব্যাসার্দ্ধ সূর্য্য-ব্যাসার্দ্ধের সমান। অতএব সঠ হইতে চন্দ্রকেন্দ্রের দূরত্ব যখন চন্দ্র ও সূর্য্য ব্যাসার্দ্ধের সমষ্টির সমাস হইবে তখন গ্রহণ আরম্ভ হইবে এবং অপর দিকে অর্থাৎ গঠ এর দিকে হইলে তখন মোচন হইবে।

কোন নির্দ্দিষ্টস্থানের অক্ষাংশ(latitude) = অ´

নতাংশ (hour angle) = ন´

ক্রান্তি (declination) = ক্র´

পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ = প´

তবে ভূকেন্দ্রিক নতাংশ ন এবং ক্রান্তি ক্র হইতে ন´ ও ক্র´ স্থির করিতে

$$\text{ভুজ ন}' = \text{ভুজন} - \frac{\text{প}'\text{জ্যা} \times \text{হকোটিজ্যা অ}}{\text{কোটি জ্যা} \times \text{ক্রজ্যা ন}} \quad (১)$$

$$\text{ভুজক্র}' = \text{জ্যান}'\left\{\frac{\text{ভুজক্র} \mp \text{প}'\text{জ্যাহজ্যাঅ}}{\text{জ্যান} \mp \text{কোটিজ্যাক্রজ্যান}}\right\} \quad ২$$

এই দুই সমীকরণ দ্বারা স্থির করিবে। উক্ত স্থান হইতে চন্দ্রের দূরত্ব দ´ এবং ব্যাসার্দ্ধ ব´ হইলে ভূকেন্দ্রিক দূরত্ব দ এবং ব্যাসার্দ্ধ ব হইতে

$$\text{দ}'\text{জ্যাব}' = \text{দজ্যাব} \quad (৩)$$

দ্বারা ব´ স্থির হইতে পারে।

(১), (২), (৩) দ্বারা কোন স্থানের অমাবস্যা ত্যাগের সময় সূর্য্য ও চন্দ্রের ক্রান্তি নতাংশ উদয়াংশ (Right ascension) এবং ব্যাসার্দ্ধ স্থির করিতে হইবে। ঐ সময়ের পূর্ব্বে এবং পরে প্রতি দণ্ড কিম্বা অর্দ্ধ দণ্ডের জন্যও ঐরূপ করিয়া রাখিতে হইবে। এইক্ষণ গ্রহণ আরম্ভ সময়ে উভয়ের ক্রান্তির ও উদয়াংশের অন্তর যদি ক ও খ এবং তাহাদের ক্রান্তি ক্র ও ক্র´ হয় তবে চন্দ্র সূর্য্যের ব্যাসার্দ্ধের সমষ্টি স ধরিয়া স = ক² + খ² কোটি জ্যাক্র × কোটি জ্যাক্র´। অতএব পূর্ব্বে যে ক্রান্তি ও উদয়াংশ স্থির করা হইয়াছে তন্মধ্যে যে দণ্ডের জন্য উক্ত সমীকরণ সিদ্ধ হইবে সেই দণ্ড গ্রহণ আরম্ভের সময় জানিবে।

শ্রীরাজকুমার সেন গুপ্ত

পৌরাণিক আলেখ্য।

হারাণো রত্ন।

কুশাসনে বসি কৌশল্যা মহিষী
দিনান্তে একটি বার,
গ্রাস দুই অন্ন মুখে দিতেছিল,
হৃদয়ে দুঃখের ভার।
ক্ষীণহস্তে তুলি একবার অন্ন
মুখের নিকট লয়,
হস্ত কাঁপি, হায়, মুখের গরাস
ভূতলে পতিত হয়!
সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক গণ্ড দ্বয় বহি
অবিরল বহে ধারা,—
হৃদয়-আকাশে উদয় হয় সে
অভাগীর ধ্রুব তারা!
কত দিন হ'ল হৃদয়-মালঞ্চে
ফুটে না সুখের ফুল!
কত দিন হ'ল শ্মশান অযোধ্যা!
—শ্মশান সরযূ কূল!

সচকিত ভাবে দাসীরে সম্বোধি
কহিলা কৌশল্যা রাণী,—
যালো, দাসি, যালো, যালো দেখে আয়
আজ কি রব শুনি?
এক যুগ হ'তে অযোধ্যা নগরী
পড়ে আছে মৃত প্রায়;
ঝির ঝির বহে জীবন-প্রবাহ,
—যেন শুষ্ক স্রোতঃ, হায়!
উৎসাহ, আনন্দ, আমোদ, আহ্লাদ,—
সব হইয়াছে শেষ,—
ঘোর মন্বন্তরা যেন গ্রাসিয়াছে
সমগ্র অযোধ্যা দেশ!
যালো, দাসি, যালো, যালো দেখে আয়
কিসের এ গণ্ডগোল;
'রাম! রাম!' শব্দে পুরবাসী কেন
করিছে আনন্দ রোল।
হায়, দাসি, মোর হারাণো রতন

বুঝি আজ ফিরে এল!
বুঝি কৌশল্যার কাল বিভাবরী
আজ সুপ্রভাত হ'ল!"

দাসী কহে "মাগো, কৈ গণ্ডগোল?
কৈ 'রাম! রাম' ধ্বনি?
আমার শ্রবণে কোন কোলাহল
আমিত নাহিক শুনি।
নিদ্রায় জাগ্রতে, যখন তখন,
মাগো, তুমি এই মত,
'রাম এলো' বলি কাঁদিয়া আপনি
কাঁদাও পুরস্ত্রী যত।"
"স্পষ্ট 'রাম' ধ্বনি শুনিতেছি আমি"
রোষ ভরে রাণী কয়,
"তুই কি শুনিবি, বনবাসী রাম
তোর ত তনয় নয়।
বাক্য ছটা রাখ্, কথা শোন্ দাসি,
একবার দেখে আয়,
এমন উতলা আমার হৃদয়
কখন(ও) হয় নি, হায়!"
আলু থালু বেশ হেন কালে এক
দৌড়িয়া আসিয়া দাসী
কহে "মাগো, আজ পোহাইল তব
সুদীর্ঘ দুঃখের নিশি!
হারাণো রতন রামচন্দ্র তব,"—
শেষ না হইতে কথা,—
"কি কহিলি?" বলি অন্ন ঠেলি ফেলি
—বাঁধমুক্ত স্রোতঃ যথা,
ঊর্দ্ধশ্বাসে রাণী, যেন পাগলিনী,
অঞ্চল ধূলি লুটায়,
এলাইত কেশ উড়িছে পশ্চাতে,
বহির্দ্বার দিকে ধায়।
দৌবারিকগণ সসম্ভ্রমে সব
দূরে দাঁড়াইল সরি।
লজ্জা, নিন্দা, ভয়, মর্য্যাদার জ্ঞান,
—সমস্ত আজ পাসরি;
মুখে 'রাম!' শব্দ বিশৃঙ্খল বেশ,
চক্ষে বহে শতধারা,
অদূর জনতা লক্ষ্যি রাজমাতা
ধায় পাগলিনী পারা!

সত্যব্রত রাম, লক্ষ্মণ সুমতি,
সীতা, পতিগত প্রাণ,
পদব্রজে সবে রাজপুরী মুখে
হইছেন আগুয়ান।
পরিধান পূত গৈরিক বসন,
শিরে রুক্ষ জটাভার,
বদন মণ্ডলে অপরূপ জ্যোতিঃ,
অপাঙ্গে আনন্দ ধার!
বেড়ি তাঁহাদিগে থৈ থৈ করে
মস্তকের সিন্ধু যেন,
'জয় জয় রাম!' 'জয় জয় সীতা!'
'জয় জয় লছ্মন!'
আকাশ পাতাল ধ্বনিত করিয়া
মুহুর্মুহু উঠিতেছে;—
অন্তর আবেগে লোকসিন্ধু যেন
ঘন ঘন আন্দোলিছে।

অভাগিনী মাতা চক্ষু জল মুছি
চাহিলা সম্মুখ পানে;
জনতা সম্মুখে হেরিলা তাঁহার
তিনটি হারাণো ধনে।

বিলুপ্ত হইল বাহ্যজ্ঞান, হায়!
বাহু প্রসারিয়া রাণী
ধাইল সে দিকে,— লজ্জাভয় হীনা
যেন ঘোর উন্মাদিনী।
বক্ষের বড়নে বাহু দ্বয়ে মাতা
বক্ষে বাঁধি দাঁড়াইল,—
মার চক্ষু জলে বক্ষঃ শ্রীরামের
আহা ভাসিয়া চলিল!
মুখে কথা নাই, স্পন্দন শরীরে
কি জানি কি ভাবে ভোর!
মায়া! তুই ধন্য সংসার মাঝারে!
কে বোঝে মহিমা তোর?
নিষ্পন্দ, নীরব দাঁড়ায়ে দু'জনা,—
পাষাণ প্রতিমা প্রায়,
বনবাস ক্লেশ, বৈধব্য যন্ত্রণা
চিন্তার দংশন হায়,
বিপুল জনতা, রাজ্য সিংহাসন,
অযোধ্যা, পৃথিবী জ্ঞান,—
এক অভিনব ভাবের হিল্লোলে
সব হ'ল অন্তর্দ্ধান।
ক্রমে ক্রমে রাণী প্রাণের লক্ষ্মণে,
অভাগিনী জানকীরে,
অতি স্নেহ ভরে আলিঙ্গন করি
চলিলা আবাসে ফিরে।

গৃহে গিয়া রাণী দাসীগণে ডাকি
গদ গদ ভাষে কয়,—
"কোষাগার হতে যাগো, দাসি, আন
মূল্যবান বস্ত্রচয়।
জানকীর জন্য আন্‌গে গো শাটী,
মনোহর মূল্যবান,
ভাল ভাল যত অলঙ্কার আছে
সব শীঘ্র করে আন।
বল্‌গে লো দাসি প্রধান সচীবে
আমার আদেশ বাণী,—
'অদ্যকার দিন অকাতরে দান
করিতে কহিলা রাণী।
ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, দীন, দুঃখী যত
যেন পূর্ণ দান পায়,
একটিও প্রাণী নিরাশ হইয়া
যেন নাহি ফিরে যায়।
অযোধ্যার প্রজা যেন চির দিন
এই দিন মনে রাখে,
এই ভাবে আজ অকাতরে দান
করিতে কহিবে তাঁকে।'"

তখন কৌশল্যা শ্রীরাম লক্ষ্মণে
এক কোলে বসাইলা,
অন্য কোলে সেই জনম দুঃখিনী
জানকীরে স্থান দিলা।
আহা, কি শোভারে! স্নেহের নিকটে
বয়স বিচার নাই;
কৌশল্যার কোলে তিনটি রতন
তাইরে দেখিতে পাই!

অপার আনন্দে বিভোর তখন
কহিলা কৌশল্যা রাণী,—
"আজ যে এমন সুপ্রভাত হবে
স্বপনেও নাহি জানি।
তোমাদের হায়, আশা-পথ চেয়ে
কত দিন হ'ল গত,
কিন্তু দিন দিন প্রতারিত হৈনু

মুগ্ধ তুষিকার মত!
আজ চতুর্দ্দশ বরষ হইল
অযোধ্যা আঁধার করি
গিয়াছ তোমরা; সেই অন্ধকার
আজ দূর হ'ল, মরি!
এত দিন এই অযোধ্যা নগরে
ছিল না আনন্দরব,
হাট, মাঠ, ঘাট শ্মশান সদৃশ,—
যেন শূন্য শূন্য সব!
চিরহাস্যময়ী প্রকৃতি সুন্দরী
তাহারও মলিন বেশ;—
যেন পদ্মালয়া তেয়াগি এ স্থান
চলি গেলা অন্য দেশ!
এই দীর্ঘকাল যে কষ্টে কাটিল
কৌশল্যা রাণীর, হায়,
অন্তর্য্যামী যিনি তিনিই জানেন,
কাজ নাই সে কথায়!
বনে বনে তোরা কত কষ্ট যেন
পাইলি রে বাছাধন!—
জানকি! মা তোর দুঃখ মনে হ'লে
শূন্য দেখি ত্রিভুবন!
রাজার নন্দিনী, রাজকুলবধূ,
পরম যতনে ছিলি,
কণ্টকিত পথে বনে বনে ভ্রমি
কত কষ্ট, মালো, পেলি!
কত কষ্ট পেলি অশোক কাননে
বিপক্ষ পুরীর মাঝে!—
রঘুকুলবধূ, তোর অঙ্গে কি মা
গৈরিক বসন সাজে?
চাঁচের চিকুর জটাবদ্ধ তোর,
পথশ্রমে ক্লান্ত কায়,
সোণার বরণ হইয়াছে কালি
মৃগাক্ষি নিস্তেজ, হায়!

হেন কালে দাসী রাখিল সম্মুখে
নানাবিধ অলঙ্কার,
মহামূল্য শাটী, চারু পরিচ্ছদ,
সুগন্ধ তৈলের ভার।
রাণীর আদেশে শ্রীরাম লক্ষ্মণ
ভিন্ন স্থানে উঠি গেলা;
স্বহস্তে কৌশল্যা সীতার বরাঙ্গ
সাজাইতে আরম্ভিলা।
পরম যতনে পরম কৌশলে
জটাবন্ধ মুক্ত করি
সুরভি তৈলেতে মার্জ্জিত করিয়া
বাঁধিলা চারু কবরী।
মণি, মুক্তা, হীরা জড়িত ভূষণ,—
যা' হ'তে কিরণ ক্ষরে,
যে অঙ্গে যা' শোভে একে একে রাণী
পরাইলা যত্ন করে।
স্বর্ণ কাজ করা নীলাভ ঘাঘরা,
হীরক সর্ব্বত্র জ্বলে,
গৈরিক বসন ছাড়াইয়া রাণী
পরাইলা কুতূহলে।
কাঁচুলি আটিয়া অমূল্য ওড়না
ফেলিলা বক্ষের পর;—
দাঁড়াইলা সীতা ভুবন মোহিনী!
অন্ধকারে চন্দ্রকর!!
ক্রমে ক্রমে রাণী শ্রীরাম লক্ষ্মণে
সাজাইলা যত্ন করি;—
কোলে করি এই তিনটি প্রতিমা
বসিলা কৌশল্যা মরি!

পুরনারীব্রজ শঙ্খ বাজাইয়া
মুহুর্মুহুঃ উলু দিল!
'জয়! জয়!'' নাদে কানন, কন্দর,
আকশ ধ্বনিত হ'ল!!

শ্রীদীনেশচরণ বসু।

ব্যবহার্য্য পাত্র।

আমাদের প্রয়োজন বিশেষে নানারূপ পাত্র ব্যবহৃত হয়। পাকপাত্র, ভোজন-পাত্র ও পানপাত্রাদির সহিত শরীরের বিশেষ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। কিসে শরীরের ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়, তাহা মনুষ্য মাত্রেরই আলোচ্য বিষয়। অতএব স্বাস্থ্য লাভার্থী ব্যক্তি-মাত্রেরই এসকল বিষয়ের দোষ গুণ বিচার করা অবশ্য কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। আমরা সচেতন শরীরটি লইয়াই সংসার ক্ষেত্রে উপস্থিত হই। সচেতন অবস্থা পর্য্যন্তই সুখ সৌভাগ্য ভোগ করিয়া থাকি। চেতনাবিহীন হইলেই সংসারের সমস্ত সংশ্রব পরিত্যক্ত হয়। এ অবস্থায় শরীর কি? কিসে তাহা রক্ষা পায়? কিসেই বা তাহার অপকার হয়? এসকল বিষয় মনুষ্য মাত্রকেই জানিয়া শুনিয়া রাখিতে হয়। অন্যথা নিজের, পরিজনের, সমাজের ও দেশের অসাধারণ অপকারের সম্ভাবনা।

হিন্দুশাস্ত্র দৃষ্টে জানা যায় যে সত্যযুগে স্বর্ণপাত্র ও ত্রেতাতে রৌপ্য পাত্র ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বিদেশীয় দস্যুগণের পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠনে এবং বিদেশীয় রাজগণের অবিশ্রান্ত অত্যাচারে ভারতবর্ষ যেরূপ ঘোর দারিদ্রতায় অভিভূত হইয়াছে, তাহাতে আপাততঃ স্বর্ণ রৌপ্য পাত্রের প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। স্বর্ণ রৌপ্যের ব্যবহার্য্য পাত্র করা দূরে থাকুক, এই হতভাগ্য জাতির অধিকাংশ লোক নিজ নিজ পত্নী কিংবা কন্যার যৎসামান্য অলঙ্কার প্রস্তুত করিতেও এখন আর স্বর্ণ রৌপ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ নহে। ইহা বুঝিয়াই বোধ হয় ভবিষ্যদ্দর্শী শাস্ত্রকারেরা কলিযুগে কোনও প্রকার পাত্র নির্ণয় করিয়া যান নাই *। সুতরাং যাহা নির্দ্দোষ ও সংগ্রহোপযোগী, তাহাই কলিযুগের লোকদিগের ব্যবহার্য্য-পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এ অবস্থায় ব্যবহার্য্য পাত্রদোষে আমাদের শরীরের কোনও অপকার হইলে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কারণ, নির্দ্দোষ পাত্র বর্ত্তমান থাকিতে, ইচ্ছা পূর্ব্বক অপকারী পাত্র ব্যবহার করিয়া কোন্ আত্মঘাতী ব্যক্তি নিজের ও প্রিয়জনের শরীর ও জীবন হীন ও ক্ষীণ

* কলিযুগে ভোজনপাত্র নির্ণয়োনাস্তি।

করিতে অভিলাষী হইবেন? অতএব ব্যবহার্য্য পাত্রের দোষগুণের উপর সর্ব্বদা সাধারণের স্বাস্থ্য কতদূর নির্ভর করে তাহা বিবেচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

এদেশে স্বর্ণপাত্রের ব্যবহার অতি বিরল। অকৃত্রিম স্বর্ণপাত্র, তীব্র দ্রাবকবিশেষদ্বারা কলঙ্কিত হয়; কিন্তু তাদৃশ দ্রাবক, আহার্য্য বস্তু মধ্যে নিহিত নাই। সুতরাং ভোজ্যবস্তু ও পানীয় দ্রব্যাদি সুবর্ণপাত্রে কলঙ্কিত হইবার প্রায় সম্ভাবনা নাই। ইউরোপীয়েরা সময়ে সময়ে যে সোণার কলাই করা পাত্রে পানীয় দ্রব্য বা সোডাওয়াটার প্রভৃতি পান করে, তাহা দূষণীয় নহে। ঝালা বিহীন বিশুদ্ধ রৌপ্যপাত্র সম্বন্ধেও ঠিক্ ঐ কথা; কিন্তু সাবধান থাকা আবশ্যক যে, স্বর্ণকারেরা সোণা ও রূপাতে তামা ও দস্তা প্রভৃতি খাইত দিয়া থাকে। ঝালার জন্য যেসকল সোণা রূপা ব্যবহার করে, তাহাতে অধিক খাইত না দিলে ঝালিয়া উঠিতে পারে না। তাদৃশ পাত্র স্বাস্থ্যের অবনতি সাধন করে। এদেশে তাম্র, পিত্তল, কাংস, রূপদস্তা (জর্ম্মাণ সিলভার), লৌহ ও মৃণ্ময় পাত্রাদিই অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হয়। অগ্রে এই গুলিরই দোষগুণ বিচার করা কর্ত্তব্য। এইগুলি শরীরের উপর কিরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহা জানিলেই এবিষয় স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

তাম্রপাত্র। দ্রব্যগুণ ও ভৈষজ্যতত্ত্ব পাঠে জানাযায় যে, তাম্রপাত্রে রন্ধন ভোজন ও পানাদি করিলে, তাম্রধাতু ক্রমশঃ শরীরস্থ হইয়া বিষক্রিয়া প্রকাশ করে। আহার্য্য দ্রব্যের তৈলাক্ত বস্তু ও অম্লাদি সংযোগে তাম্রপাত্র বিষময় হইয়া থাকে। তাহাতে শরীর শীর্ণ মলিন ও দুর্ব্বল হয়; এবং উদরে শূল বেদনা, মাঢ়ির অন্তভাগ রক্তবর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য ও উদরাময় প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। সির্কা (ভিনিগার) সংস্পর্শে তাম্রপাত্র এত বিষাক্ত হয় যে, তদ্দ্বারা মৃত্যু হইতে পারে। জল ও বায়ুর অম্লজান সংস্রবে তাম্রপাত্র কলঙ্কিত ও বিষাক্ত হয় এবং সেই কলঙ্ক জীবননাশক হইয়া থাকে। এজন্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরা তাম্রপাত্রে জলপান নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যতঃ সে নিষেধ রক্ষা পাইতেছে না। কারণ অনেককেই তাম্রকুণ্ডের জল পান করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ অনেক পদার্থ সংযোগেই তাম্রপাত্র ন্যূনাধিক পরিমাণে কলঙ্কিত হয়, আবার যে কোন প্রকারেই তাম্রকলঙ্ক উৎপন্ন হউক না কেন, তাহা অতীব স্বাস্থ্য হানিকর ও সময়ে সময়ে প্রাণনাশক হইয়া থাকে।

রন্ধন ও ভোজনাদি কার্য্যে তাম্রপাত্র ব্যবহার অতি দূষণীয় জানিয়া, যবন, ম্লেচ্ছ ও তদনুকারী অর্ব্বাচীনেরা টিনদ্বারা আবরণ অর্থাৎ কলাই করাইয়া রন্ধন পাত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহাতেও বিপদাশঙ্কা দূরীভূত হইতে পারে না। কারণ কলাই চিরস্থায়ী নহে, কিয়দ্দিন পরে কলাই উঠিয়া গেলে, তাম্রস্ফুটিত হয় এবং তখন নানাদ্রব্য সংযোগে বিষাক্ত হইয়া,

শক্তি অনুসারে জীবনে অভিঘাত করিতে থাকে। তর্কস্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে কলাই উঠিয়া গেলেই, পুনর্ব্বার কলাই করা হয়, এযুক্তি বড় কার্য্যকর নহে। কারণ,গৃহী বা গৃহিণীরা প্রত্যহ পাকপাত্রাদির তত্ত্বাবধান করেন না। অনেকস্থলে এগুলি পাচক পাচিকার হস্তেই ন্যস্ত থাকে। তাহারা কাজ বুঝাইয়া যাইতে যত ব্যস্ত, প্রভুর স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যের বিচার করিতে তত সমর্থ বা চিন্তিত নহে। সামান্যরূপ কলাই উঠিলে, অনেকেই তাহা জানিতে পারেন না এবং ব্যয়াদি প্রযুক্ত অনেকে সে বিষয়টি জানিয়াও জানিতে চাহেন না। খাদ্যদ্রব্য স্পষ্ট বিস্বাদু হইলেই, সে বিষয়ে মনোযোগী হন। আবার ক্রমশঃ তাম্রস্বাদ গ্রহণ করাতে, সহসা বিস্বাদ অনুভব করাও সম্ভবপর নহে। গৃহস্বামী বা গৃহিণীরা, প্রত্যহ দুইবেলা আলোকসমীপে নিয়মিতরূপে পাত্রপরীক্ষা করিলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানের উত্থিত কলাই, সাধারণ চক্ষে দেখিতে পান না। যাহা দেখাযায়, সে স্থলে কেবল তাহারই প্রতিবিধান সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানের কলাই উঠিয়া গেলেও, সাধারণ দৃষ্টিতে দ্রষ্টব্য নয়, কেবল অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যেই দর্শনীয়, তাহার প্রতিবিধান একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রাকৃতিক নিয়ম কিন্তু কিছুতেই কাহাকে ক্ষমা করেন না। তাঁহার কার্য্য চলিবার সম্ভাবনা হইলেই, সেই কার্য্য অপ্রতিহত প্রভাবে চলিবেই চলিবে। এইরূপে অল্প অল্প করিয়া বিষ প্রবিষ্ট হইলেও ক্রমশঃ শরীর রুগ্ন ও ভগ্ন হইতে পারে। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব সুবিখ্যাত জজ অনারেবল দ্বারিকানাথ মিত্র অচিকিৎস্য কর্কট (কেন্সার) রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। কলিকাতার কোন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার প্রকাশ করেন যে, কলাইকরা তাম্রপাত্রে দ্বারিকানাথের রন্ধনকার্য্য সর্ব্বদা নির্ব্বাহিত হইত, ঐ পাত্রের নানা স্থান হইতে কলাই উঠিয়া যাওয়াতে, খাদ্যদ্রব্যের সহিত যে অননুভবনীয় তাম্রকলঙ্ক তাঁহার শরীরস্থ হয়, তাহাই তাদৃশ ভয়ানক রোগোৎপাদনের নিদান। এত সাবধানতা,এত ক্ষতি ও এত প্রাণনাশ সম্ভাবনা স্থলে, নিতান্ত প্রতিজ্ঞারূঢ় ব্যক্তি ভিন্ন, তাম্রপাত্র ব্যবহার করিতে কাহার প্রবৃত্তি হয়?

পিত্তলপাত্র। ভাগ বিশেষ তাম্র ও দস্তা একত্র গলাইয়া লইলে, পিত্তল উৎপন্ন হয়। পিতলে তামা থাকাতে, যে সকল দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এখন দস্তার দোষগুণ বিচার করা কর্ত্তব্য। ভৈষজ্য বিদ্যাপাঠে জানাযায় যে, কোনও প্রকারে বহুকাল দস্তাধাতু শরীরস্থ হইলে, শরীর শীর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ, ও দুর্ব্বল হয় এবং জিহ্বা সমল, কোষ্ঠ কঠিন, শূলবেদনা, উদর স্ফীতি, চর্ম্মের শুষ্কতা ও পায়ে সোথ ইত্যাদি পীড়া প্রকাশ পাইতে পারে। ডাঃ ওসনেসি, দস্তাবিষাক্ত তিনটি রোগীর বিবরণী প্রকাশ করেন। তাহার একটি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিল এবং দস্তাবিষাক্ত হইয়া ডাঃ

চিভার্সের চিকিৎসাধীনে ছিল, দক্ষতার সহিত নিয়মিত চিকিৎসাতেও ৮দিনের পর মৃত্যু হয়। সুতরাং পিত্তলের পাত্র ব্যবহার করিলেও,স্বাস্থ্যহানি ও পীড়া হইয়া থাকে। ঘৃতাদি স্নৈহিক (তৈলাক্ত) বস্তু সংযোগে পিত্তল পাত্র হইতে হরিতবর্ণ একরূপ পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা অত্যন্ত বিষাক্ত।

কাংসপাত্র। তামা ও রাঙ (টিন) সংযোগে কাঁসা প্রস্তুত হয়। আবার, সীস ও রাঙ একত্র মিশ্রিত করিয়া, পাত্র ঝালিবার পাইন প্রস্তুত করে। কখন কখন কাঁসার সহিতও সীস থাইত দেয়। রাঙ, অল্পমাত্রায় মানব শরীরের অপকারক নহে। কেবল অধিক মাত্রাতে দ্রব্যান্তর সংযোগেই পক্ষাঘাত জন্মাইতে পারে; কিন্তু সীস ধাতু, অত্যন্ত অপকার করে। কারণ, সীসেতে অম্ল রসাদি সংলগ্ন হইলেই, উহা বিষাক্ত হইয়া উঠে। যে কোনও প্রকারে শরীরে সীস প্রবেশ করিলেই, অপকার করে। অতএব সীসধাতু সংযুক্ত পাত্রে পানভোজনাদি করিলে, শরীর বিষাক্ত হয়। সীস নির্ম্মিত ভাটিতে যে সুরা প্রস্তুত হয়, তাহা পান করিয়া অনেকে বিষাক্ত হইয়াছে। মেঃ পল্, বিশেষ পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, পিতা বা মাতা সীস ব্যবহার করিলে, অনেকস্থলেই গর্ভপাত হয়। যে সকল দ্রব্য সংযোগে সীসঘটিত লবণ প্রস্তুত হয়, সে গুলি আরও যাতনাদায়ক বিষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সীসধাতু, অল্পমাত্রায় ক্রমশঃ কিছুদিন শরীরস্থ হইলে, মুখ, তালু ও নাসারন্ধ্রের শুষ্কতা উপস্থিত হয়। প্রস্রাবের হ্রাস, কোষ্ঠকাঠিন্য, পিত্ত ও অম্লরসের স্বল্পতা প্রযুক্ত মলের বর্ণবৈলক্ষণ্য, পাকাশয়ের ক্লেশ, উদরে বেদনা ও ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি উদ্বেগ উপস্থিত হয়। তখন মাঢ়ির অন্তর্ভাগ, ওষ্ঠ ও গণ্ডের অভ্যন্তর প্রদেশ নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়। জিহ্বায় সর্ব্বদা মিষ্ট ও কসায় আস্বাদ এবং নিশ্বাসে একরূপ দুর্গন্ধ বোধ হয়। শরীরের, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলের শীর্ণতা হয় এবং চক্ষু অস্বচ্ছ পীত বর্ণ হইয়া থাকে। রক্ত-সঞ্চালক ধমনীগণের গতিমান্দ্য ও সংকোচন হয় এবং মানসিক বিষণ্ণতাদি জন্মাইয়া থাকে। অনেক স্থলে এতাদৃশী অবস্থায়ই কিছু দিন অতিবাহিত হয়; আবার অনেক স্থলে সীসশূল, সীস-পক্ষাঘাত ও বিবিধ মস্তিষ্কীয়-রোগ উপস্থিত হইয়া, সীসগ্রস্ত লোকদিগকে অশেষ যাতনায় নিপাতিত করে।

সীসের কুঁজায় জল রাখিয়া পান করিলে বা সীসনলে পানীয় জল বাহিত হইলে, সময়ে২ অত্যন্ত অপকার হয়। আবার, যেসকল পাত্র সর্ব্বদা পরিষ্কারের সুবিধা নাই, তাদৃশ সীস-পাত্র হইতে জল গ্রহণ করিয়া পান ও ব্যবহার করিলে, অধিক অপকার হইয়া থাকে। লাবণিক পদার্থ বিহীন পরিষ্কৃত জল, সীসপাত্রে ব্যবহার করিলে, রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রভাবে একরূপ বিষাক্ত বস্তু (জলের অম্লজান সহযোগে সীস অক্সাইড্ অব্ লেড্ হওয়াতে), উৎপন্ন হইয়া,শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। ডাঃ চিভার্স্ বলেন, "প্রায় ১৮ বৎসর অতীত হইল, এক রোগীর গৃহে ঔষধ প্রস্তু-

ত্তের আবশ্যক হওয়াতে, একটি সীস কুঁজা হইতে জল লইয়া দেখেন যে, ঐজল ঔষধের সহিত মিশিয়া দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ হইয়া গেল। পরে পরীক্ষায় জানা গেল যে, ঐ জলে অধিক পরিমাণে অক্‌সাইড্ অব্ লেড্ (জলের অম্লজান ও সীস মিশ্রিত বস্তু) বর্ত্তমান রহিয়াছে। যদি ঐ রোগী সেই মিশ্রিত ঔষধ পান করিত, তবে নিশ্চয়ই মরিয়া যাইত। ঐ সীস-কুঁজায় অর্দ্ধসের পরিমাণ জল, একসপ্তাহ কাল ছিল, তাহাতেই এত বিষাক্ত হইয়াছিল।'' তিনি আরও বলেন যে, ''অন্য এক রোগী পায়ের দুর্ব্বলতার চিকিৎসা করিতে আসেন। তাঁহাকে পা চালাইতে বলিয়া দেখা গেল যে, একটি পেশী স্বকার্য্য সাধনে অসমর্থ হইয়াছে। ইহার কোনও কারণ স্থির করিতে না পারিয়া, পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসায় জানা গেল যে, তিনি অনেক দিন হইতে সীস কুঁজায় জল রাখিয়া জলপান করেন। তাঁহার মাঢ়িতে সীসরেখা ছিল না, স্বাস্থ্যও উত্তম ছিল; এজন্য প্রায় অন্য চিকিৎসা না করিয়া, প্রধানতঃ কেবল সীস কুঁজার জল পানই নিষেধ করিয়া ছিলাম, তাহাতেই তিনি আরোগ্য লাভ করেন।''

কলিকাতায় প্রথম যখন সীসের নল প্রস্তুত হয়, এবং তৎপ্রবাহিত কলের জল ব্যবহৃত হয়, তখন তথাকার একটি বালকের সীস বিষাক্ততার লক্ষণ দেখাযায়। তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। তদ্দৃষ্টে ডাঃ পামার ১৮৭০ সনের জুন মাসে কলের জল অনেক পরীক্ষা করেন। পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া কলিকাতার জষ্টিসদিগকে বলেন যে, ''ঐ সীসনলের জলের ১০ লক্ষ ভাগে ৫৭ ভাগ ($\frac{৫৭}{১০০০০০০}$) সীসধাতু বর্ত্তমান আছে। কেহ ১ গণ্ডূষ জলপান করিলে, তৎসহ ($\frac{৩}{১০}$ গ্রেণ) ১ রত্তির ১০ ভাগের ৩ ভাগ সীসশর্করা (সীসের সহিত অম্লজান ও শির্কা মিশ্রিত একরূপ বস্তু) উদরস্থ হয়। এই সীস, শরীরে সঞ্চিত হইয়া বিষক্রিয়া করে। ঐ বালক, এইরূপে বিষাক্ত হইয়াই প্রাণত্যাগ করে। এজন্য তিনি তাঁহাদিগকে সীসনল ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অতএব পিত্তল ও কাংসপাত্র ব্যবহার করা যে কতদূর অনিষ্টকর, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।

রূপদস্তার পাত্র।—তামা, উপরজত (নিকল্) ও দস্তা মিশ্রিত করিয়া, রূপদস্তা (জর্ম্মন্ সিল্বর্) প্রস্তুত করে। ইহাদ্বারাও কাঁটা, চামচে, মুখনল, গ্লাস ও রেকাব প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাতেও তামা এবং দস্তা সংযুক্ত থাকাতে, শরীরের হানি করিয়া থাকে। ফলতঃ যে সকল পাত্র অম্ল সংযোগে কলঙ্কিত হয় কিংবা অম্ল ও স্নৈহিক পদার্থ সকল যে যে পাত্রে থাকিলে বিস্বাদ ও বিবর্ণ হয় এবং যে যে পাত্র শ্বেত বস্ত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিলে বস্ত্রে নীলাভ দাগ পড়িয়া থাকে, সেই পাত্রগুলি রন্ধন ভোজনাদি কার্য্যে কখনই ব্যবহার্য্য নহে।

লৌহপাত্র।—প্রচলিত পাত্রমধ্যে লৌহ পাত্রই প্রশংসনীয়, কিন্তু তাহাতে অম্ল পাক করিলে, কিঞ্চিৎ অপকার করিতে পারে। অতএব চীনে বাসনের কলাই করা নানা

রূপ লৌহপাকপাত্রাদি ব্যবহার করিলে, সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইতে পারে। ইহাও সুলভমূল্যেই বিক্রীত হয়. কেবল আলস্য ত্যাগ করিয়া কিনিয়া লইলেই, অপকারের নিবৃত্তি হইতে পারে।

মৃণ্ময়পাত্র।—মেটে হাঁড়ি সর্ব্বত্রই সুলভ, সুতরাং সকলেই ব্যবহার করেন। খাদ্যদ্রব্যে যে সকল বস্তু নিহিত থাকে, তদ্দারা মৃৎপাত্রের কোনও প্রকার বিকৃতি হইতে পারে না। এজন্য সাধারণের পক্ষে মৃৎপাত্রই প্রশস্ত পাত্র বলিয়া গণ্য, কিন্তু এগুলি অধিক সচ্ছিদ্র। এই সকল ছিদ্রমধ্যে খাদ্যদ্রব্যের তরলাংশ প্রবিষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই প্রবিষ্ট তরল বস্তু গুলি কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই নষ্টীভূত ও স্বাস্থ্যহানিকর হয়। পরে এই সকল পদার্থে পোকা জন্মাইয়া নর্দ্দমার আকৃতি বিশিষ্ট হয়। অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে, তাহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইতে পারে। এঅবস্থায় ঐ হাঁড়ি ব্যবহার করিলে, অপকারের সম্ভাবনা। কারণ, তৎস্পর্শে বিশুদ্ধ খাদ্যও দূষিত ও স্বাস্থ্যহানিকর হয়। বোধ হয়, এজন্যই সূক্ষ্মদর্শী মহর্ষিগণ মৃৎপাত্রে একবার পাকাদি করিলেই, তাহা পরিত্যাগ করিতে ও পুনর্ব্বার নূতন হাঁড়ি ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন। এটি অতীব সুব্যবস্থা ছিল। পরাধীনতাদি দোষে যেমন অন্যান্য বিষয়ের অবনতি-ক্রমে হিন্দুব্যবস্থার অনেক গুলি সুনিয়ম উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে, তেমন এবিষয়টিও প্রায় লঙ্ঘন করা হইয়াছে। যত্যাচার ব্যতীত অন্যান্য স্থলে প্রায়ই এনিয়ম অতিক্রান্ত হয়। হায়, অসম্যক্‌দর্শী সমাজ সংস্কারকদিগের দোষে কত কুপ্রথার যে প্রশ্রয় বাড়িয়াছে, তাহা সহজে বলিয়া শেষ করা যায় না। যাঁহারা শাস্ত্রশাসনমাত্রকেই কুসংস্কারের কার্য্য মনে করেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, শাস্ত্রের শাসন উপেক্ষা করিয়া, এবিষয়ে আমাদিগকে কত অপকার সহ্য করিতে হইতেছে। দেশীয়গণ! অগ্রে সবিশেষ জানিয়া শুনিয়া লও, পরে কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। অন্যথা পদে পদে এইরূপ বিড়ম্বনা হইবে, সন্দেহ নাই।

প্রস্তর-পাত্র, চীনপাত্র ও কাচপাত্রাদি কতকগুলি নির্দ্দোষ পাত্র এদেশে অতি অল্পই ব্যবহৃত হয়। এগুলিরও দোষগুণ বিচার পূর্ব্বক ব্যবহার্য্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইলে, সকলেরই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

প্রস্তর পাত্র।—ঘনবিধায় উত্তম প্রস্তর পাত্রে পানভোজনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, কোনও অপকারের সম্ভাবনা নাই। উগ্রদ্রাবক ব্যতীত খাদ্যদ্রব্যদ্বারা প্রস্তর কলঙ্কিত হয় না। সুতরাং ইহাদ্বারা পাকপাত্রও করা যাইতে পারে; কিন্তু রন্ধন পাত্রের অগ্নিসংলগ্ন স্থান, সমান পুরু না হইলে, উত্তাপে ফাটিয়া যায়; অথচ তেমন সমান পুরু প্রস্তরের পাকপাত্র প্রস্তুত করা সহজ কথাও নহে; এজন্য ইহা সর্ব্ব সাধারণের ব্যবহার্য্য পাত্র হইতে পারে না। একরূপ নিকৃষ্ট পাতর আছে, তাহাকে বালুয়া পাতর বলে। সেগুলিও অত্যন্ত ছিদ্রবিশিষ্ট বিধায়, মৃৎপাত্রের ন্যায় অপকারী জানিবে।

চীনেবাসন।—চীনে বাসনে সর্ব্বপ্রকার

ব্যবহার্য্য পাত্রই প্রস্তুত হয়। ইহা যেরূপ সুন্দর, তেমনই অতীব পরিষ্কার ও নিষ্কলঙ্ক। কোনও প্রকার খাদ্য দ্রব্যদ্বারা চীনপাত্র কলুষিত হয় না এবং চিরকাল অত্যন্ত পরিষ্কৃত থাকিতেও পারে। যে কারণে মহর্ষিগণ মৃৎপাত্রের প্রত্যহ পরিবর্ত্তন ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহাতে সে দোষের লেশমাত্রও নাই। ইহা একরূপ কর্দ্দমাকার বস্তু ও অগ্নিপ্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হয়। সুতরাং ইহা জাতিপাতকর বলিয়া কাহারও সন্দেহের কারণ নাই। ইহা মৃৎপাত্র অপেক্ষাও টেঁকসই অথচ দুর্ম্মূল্যও নহে; সুতরাং চীনপাত্র ব্যবহার করিতে কাহারও আপত্তি করা, অবিবেচকতা মাত্র।

কাচপাত্র।—একপ্রকার প্রস্তর চূর্ণ ও ভস্ম সংযোগে উত্তম কাচ নির্ম্মিত হয়। কাচের মত পবিত্র দ্রব্য জগতে আর নাই বলিলেই হয়। ইহা যে যে দ্রব্যদ্বারা নির্ম্মিত,তাহা কাহারও পক্ষে অপবিত্র বলিয়া স্থির করার সাধ্য নাই। উগ্র দ্রাবকাদি দ্বারাও ইহা কলঙ্কিত হয় না। ইহা সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার্য্য পাত্রেরই সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কেবল ভঙ্গপ্রবণ বলিয়া সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়। অসাবধানতা দোষে যেমন কাঁস, পিতল, পাতর ও লৌহাদির সুদৃঢ় পাত্র সকলও ভাঙ্গিয়া যায়, তেমন অসতর্কতাস্থলে কাচপাত্রও ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। বিশেষ এই যে, কাচপাত্র সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়; কিন্তু ঐ গুলি গুরু আঘাতে ভগ্ন হইয়া থাকে। মৃৎপাত্রও কেবল কম ভঙ্গপ্রবণ নহে। তবে স্বল্পমূল্য বলিয়া কি লোকে তাহা সদাই অযথা ভাঙ্গিয়া ফেলে? বরং তাহার উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিতেই দেখা যায়। অতএব কাচপাত্র ব্যবহার প্রথা প্রচলিত হইলে যে, সে বিষয়ে লোকের সামান্য সাবধানতা হইবে না, ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। মুসলমানেরা অনেকেই চীনপাত্র ও কাচপাত্র সর্ব্বদা ব্যবহার করেন। আমরা কি তাঁহাদের অপেক্ষাও অসাবধান? শুনা যায় যে,টফ্‌গ্লাস নামে ফ্রান্‌সে একরূপ স্থিতিস্থাপক কাচ প্রস্তুত হইয়াছে। তদ্দ্বারা রন্ধনপাত্র, ভোজনপাত্র, পানপাত্র ও অন্যান্য নানা প্রকার ব্যবহার্য্য পাত্রাদি নির্ম্মিত হইতেছে। ইহাও কাচের ন্যায় সুপরিষ্কৃত এবং মল ধরিলেও সহজেই দূর করা যায়। কিন্তু সাধারণ কাচের ন্যায় ভঙ্গপ্রবণ নহে। অতএব প্রয়োজন হইলেই, এদেশেও তাদৃশ পাত্রের প্রাচুর্য্য হইতে পারে।

পত্র ও বল্কল পাত্র।—যাঁহারা উপরিউক্তরূপ ভোজন ও পানপাত্রাদি সংগ্রহ করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের পক্ষে নিত্য নূতন মৃৎপাত্রে রন্ধন এবং কদলী ও পদ্মপত্রে ভোজন সুপ্রশস্ত। কদলী বৃক্ষের বল্কলেও নির্দ্দোষ পান ভোজনপাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। এত সহজ সুবিধা সত্ত্বেও পাত্র দোষে আমাদের এত অনিষ্ট সম্পাদিত হয়, এটি বড়ই লজ্জাকর ব্যাপার।

যাহারা আপনার, আত্মপরিবারের ও স্বদেশীয় লোকের জীবনের অসাধারণ মঙ্গলের নিমিত্ত, এই সামান্য বিষয়েও যথোচিত যত্ন চেষ্টা করিতে না পারেন, তাঁ-

হাদের সংসারী হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। মনুষ্য মাত্রেই সুখের জন্য ব্যস্ত, কিন্তু কি উপায়ে কোন বিষয়ে সুখী হওয়া যায়, তাহা না জানিয়া সংসার ক্ষেত্রে সুখ আকাঙ্ক্ষা করিলে সুখের পরিবর্ত্তে বরং পদে পদে দুঃখই হইয়া থাকে! সুসুপ্ত দেশীয়গণ কি আত্মসুখ সুবিধার নিমিত্ত একবার চক্ষুরুন্মিলন করিতে অবকাশ পাইবেন?

সভ্যদেশে শরীরের উন্নতির নিমিত্ত কেহ কোনও প্রকার নূতন পথ প্রদর্শন করিলে, সর্ব্বসাধারণে তাঁহার কত প্রশংসা করেন এবং কত প্রকারে তাঁহাকে উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করেন। প্রদর্শিত পথে কে অগ্রে অগ্রসর হইবেন, তজ্জন্য ব্যতিব্যস্ত হন! আর এই হতভাগ্য দেশের লোক, তাদৃশ বিষয়ের লেখকের নিজের কোনও প্রকার দায় মনে করিয়া, নীরবে উপেক্ষা করিয়া থাকেন! যত দিন এই ভাব থাকিবে, তত দিন বাঙ্গালির শরীরের উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

শ্রীভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাবীর জাতির উপাখ্যান

মুলতান প্রদেশে মহাবীর নামক এক অতি পুরাতন সম্ভ্রান্ত জাতি বাস করিত। মুসলমানদিগের অনুকরণে ইহারা আপনাদিগকে মাহবীর বলিত; কিন্তু ইহাদের প্রকৃত জাতীয় নাম মহাবীর। নাদির সাহ কর্ত্তৃক ইহারা প্রথম পরাজিত হয়। ১৮৬০ সালে ইংরেজ জাতি ইহাদের রাজ্য করকবলিত করে। বহুকালের পরাধীনতায় ও বিজাতীয় অত্যাচারে ইহাদের সংখ্যা দিন দিনই হ্রাস পাইয়া আসিতেছিল। লর্ড লিটনের স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর আর ইহাদের নাম শ্রুতিগোচর হয় নাই। বোধ হয় এই সময়েই মহাবীর বংশের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছিল।

মহাবীর জাতির আচার ব্যবহার ভারতবর্ষীয় অন্যান্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, এমন কি উহার অনেকগুলি আমাদের বিপরীত। আমরা ইহাদের সকল আচার ব্যবহার অবগত নহি; কিন্তু মহাবীর বংশীয় কোন গ্রন্থকার উহার কতিপয় আচার ও তৎসমর্থন যে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থ আমরা তাহা হইতে কিয়দংশ নিয়ে অনুবাদ করিয়া দিলাম। বাহুল্যভয়ে কএকটি প্রয়োজনীয় আচারের বিষয় মাত্র প্রকাশ করা গেল;—

"মস্তকমুণ্ডন ও মুখচিত্রন—আমাদের পূজ্যপাদ মহাবীর ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, তোমরা মস্তক সর্ব্বদা মুণ্ডিত রাখিবে এবং মুখমণ্ডল নানাবিধ সুচারু চিত্র দ্বারা অঙ্কিত করিবে। আজি কালিকার ইংরেজী ফেশিয়নে শিক্ষিত নব্যযুবকগণ এবংবিধ আচারকে অসভ্যতার পরাকাষ্ঠা মনে করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহার গভীর অর্থ এই

যে; মস্তক আমাদের বৃত্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের নিবাসস্থল, এবং তোমার মস্তিষ্কের কোন্ ভাগ অধিক বিকশিত তাহা দেখিয়াই তোমার কোন্ প্রবৃত্তি বলবতী, এবং কোন্ প্রবৃত্তি দুর্ব্বল সুতরাং পরিবর্দ্ধনীয়, তাহা সহজে জানিতে পারা যায়। মহাবীর ঋষিগণ ইহা জানিয়াই মস্তক মুণ্ডিত রাখিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, কেন না কে কি প্রকৃতির লোক, তাহা জানিতে না পারিলে সমাজে মহদনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে। মুখচিত্রন সম্পর্কে ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক কেম্বে বলিয়াছেন যে, মুখচিত্রনের সজীবতা হেতু মহাবীরগণ মধ্যে চিত্রবিদ্যার বিলক্ষণ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। অতএব দেখ হে যুবকগণ তোমরা যে ইংলণ্ডের দোহাই দিয়া আজি পশুর ন্যায় মুখমণ্ডল অচিত্রিত রাখিয়াছ, সেই ইংলণ্ড মুখচিত্রনের শতমুখে প্রশংসা করিতেছেন। বস্তুতঃ মুখচিত্রন পরিত্যাগের পরেই যে মহাবীর জাতির চিত্রবিদ্যার অবনতি হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

"বৃদ্ধ বিবাহ। একদিকে যবন জাতির অপর দিকে হিন্দুজাতির বিবাহপদ্ধতি দেখিয়া কেহ কেহ বলিতেছেন বিবাহ শৈশবে কিংবা যৌবনে হওয়া কর্ত্তব্য; ঋষিগণ অতিবৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিবার রীতি প্রচলন করিয়া যে কি পরিমাণ মনস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন বর্ত্তমান শিক্ষাভিমানী যুবকগণ তাহার কি বুঝিবে? যে জন-সংখ্যার বিরুদ্ধে মেল্‌থাস চিৎকার করিয়া গিয়াছেন, বৃদ্ধবিবাহ ভিন্ন কিসে তাহা সহজে নিবারিত হইতে পারে? শৈশবে কিংবা যৌবনে বিবাহ করিলে প্রবৃত্তির আবেগে লোক অনেক সময় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়; কিন্তু যখন প্রবৃত্তিতে ভাটা লাগে, তখন একমাত্র কর্ত্তব্য জ্ঞানই প্রবল থাকে। এই জন্যই মহাবীর ঋষিগণ বাল্যবিবাহ ও যৌবন-বিবাহকে পাশব সংযোগ বলিয়া সর্ব্বথা পরিহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

"পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহ নিষেধ। মহাবীর সমাজে স্ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যুর পর ভর্ত্তান্তর পরিগ্রহ করিতে পারে; কিন্তু পুরুষ স্ত্রীর মৃত্যুর পর ভার্য্যান্তর পরিগ্রহ ককরিতে পারে না। যবনের আচার দেখিয়া অনেকে ইহাকে কুসংস্কার বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখিয়াছেন। কিন্তু মহাবীর ঋষিগণ এই আচরণ প্রচলন করিয়া কি গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। স্ত্রীলোক ও পুরুষ এই উভয়ের মানসিক বল কাহার অধিক? অবশ্য পুরুষের, সুতরাং যদি পুরুষ ও স্ত্রী এই উভয়ের কাহারও দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ হয়, তবে পুরুষেরই হওয়া কর্ত্তব্য; কারণ স্ত্রীলোক সামাজিক শাসন দ্বারা নিষিদ্ধ হইলে মনের দুর্ব্বলতা বশতঃ সহজেই পাপে পতিত হয়। হিন্দুশাস্ত্রে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া তাহাদের হাট বাজার বেশ্যায় পরিপূর্ণ; কিন্তু মহাবীর জাতির মধ্যে কয়টি বারাঙ্গনা দেখিতে পাও? ইংলণ্ডের কোন এক সুপ্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন যে একটি কৃষক বসিয়া থাকিলে তাহাতে তত ক্ষতি হয় না, কিন্তু একখানি

ভূমি পতিত থাকিলে বহু অনিষ্ট হইতে পারে। আমরা আর অধিক কিছুই বলিব না; পাঠক উক্ত কবির উক্তি হইতে মহাবীর ঋষিগণের গভীর তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করিয়া লউন।

"জাতিভেদ। মহাবীর জাতি উত্তম, মধ্যম ও নিকৃষ্ট এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। উত্তমজাতি নিকৃষ্ট জাতির স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিতে পারে, কিন্তু নিকৃষ্ট জাতি কখনও উৎকৃষ্ট জাতির স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিতে ক্ষমবান নহে। নব্য যুবকগণ বলিবেন যে উত্তমজাতি স্বার্থ পরবশ হইয়া স্বকীয় গতায়াতের সুবিধা সম্বর্দ্ধন ও নিকৃষ্ট জাতিকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যেই ঐরূপ বিধি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক ইহার গভীর বৈজ্ঞানিক অর্থ আছে। যাঁহারা তাড়িত বিজ্ঞান পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন যে, একটি তাড়িত পূর্ণ বস্তুর নিকট অন্য আর একটি বস্তু রাখিলে শেষোক্তটির অভ্যন্তরে বিপরীত তাড়িত জন্মিয়া থাকে। উত্তম জাতির অভ্যন্তরে উত্তম তাড়িত বিদ্যমান আছে; সুতরাং তাহার স্পৃষ্ট অন্নে স্বভাবতঃই নিকৃষ্ট তাড়িত জন্মিবে; এই নিকৃষ্ট তাড়িত-পূর্ণ বস্তু নিকৃষ্ট জাতি আহার করিলে তাহার বিলক্ষণ অপকার হওয়ার সম্ভবনা। কিন্তু নিকৃষ্ট জাতির স্পৃষ্ট অন্নে উত্তম তাড়িত জন্মিয়া থাকে, সুতরাং তাহা সকলেরই ভোজ্য। সত্যবটে মহাবীর ঋষিগণের লেবরেটরি ছিল না, কিন্তু তাঁহারা ধ্যান-নিমিলিত নেত্রে ইহার সকলই দেখিতে পাইতেন।"

এই রূপে গ্রন্থকার সামাজিক, রাজনৈতিক, ও ধর্ম্মবিষয়ক বহু প্রকার কৌতূহলোদ্দীপক আচারের উল্লেখ ওতৎসমর্থন করিয়া প্রবন্ধটি পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু স্থানাভাব হেতু, বিশেষতঃ তৎসমুদায় স্বদেশানুরাগী বঙ্গীয় লেখকদিগের মত-বিরোধী ও বিরক্তিজনক হইবে বলিয়া এই স্থানেই বিরত হওয়া গেল ইতি— অনুবাদক।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। ত্রিশূল—গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ ধর তিনটি গভীর শোকে হৃদয়ে আহত ও অভিভূত হইয়া ত্রিশূল নামক এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। কাব্য আকারে অতি ক্ষুদ্র হইলেও ভাবগৌরবে গৌরবান্বিত বস্তুর মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য হইয়াছে। ইহা পাঠ করিবার সময় হৃদয় উছলিয়া উঠে, চক্ষু অশ্রুজলে আপ্লুত হয়; বস্তুতঃ বাবু দীননাথ ধরের এই পুস্তক খানি পড়িবার সময়ে আত্মসংযমের জন্য অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা অনেকবার অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছি। কবিসমাজের আদিগুরু আদি কবি বাল্মীকি রামায়ণরূপ সুদীর্ঘ শোকসঙ্গীত গাইবার পূর্ব্বে

সংসারকে ইহা জানাইয়াছেন যে,শোক হইতেই শ্লোকের সৃষ্টি অথবা শোকই শ্লোক,

"শোকার্ত্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা।"

যাঁহারা কবিবর নাইটের ন্যায় শোকের আগুণে পুড়িয়া পুড়িয়া সেই পোড়া মনের পোড়া কথা মুখে ফুটাইতে যত্নবান্ হইয়াছেন, তাঁহারাই উপরিধৃত শ্লোকার্দ্ধের গভীর অর্থ অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু শুধু শোকগদ্গদগলিতাক্ষরেই যে এই পুস্তক খানির গৌরব নিবদ্ধ রহিয়াছে এমন নহে। ইহার রচনাও স্থানে স্থানে একান্ত হৃদয়হারিণী ও চিত্তস্পর্শিনী। আমরা নিম্নে ইহার একটি স্তবক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক এইটি পড়িলেই কবির নৈপুণ্য ও কবিহৃদয়ের তদানীন্তন অবস্থার পরিচয় পাইবেন।

শরত-নিশীথনভঃ হইতে যেমন,
কালমেঘ কালবেশে, আকাশ পথেতে এসে,
একে একে গ্রাস করে নক্ষত্রশোভন॥
এহৃদি কাননে হায়! শিশু শারী শুক যায়,
আপন মনেতে নাচে গায় সর্ব্বক্ষণ।
তেমতি করিছে কাণ্ড কৃতান্ত দুর্জ্জন॥
ব্যাধের বেশেতে আসি, সেদিন সে বনে পশি
শুক এক লয়ে যায় কাল নিরদয়।
আসুরিক কাণ্ডে করি দলিত হৃদয়॥
আবার আসিয়া আজ, প্রবেশি সে বনমাঝ,
বাঁধিয়া লইয়া গেল, শারিকা একটি।
কে জানে কবে যে পুনঃ, আসি সেই নিদারুণ
ধরি লয়ে যাবে কোন্ হৃদয়পাখীটি॥

২। আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনী। (আয়ুর্ব্বেদীয়-চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিক পত্র এবং সমালোচন) চিকিৎসক-শিরোমণি শ্রীযুক্ত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয়ের অনুমতি অনুসারে শ্রীযুক্ত কবিরাজ অন্নদাপ্রসাদ সেন এবং শ্রীযুক্ত কবিরাজ কালীপ্রসাদ সেন এবং শ্রীযুক্ত কবিরাজ কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয়গণের তত্ত্বাবধানে শ্রীভগবতীপ্রসন্ন সেন কবিরাজ ও শ্রীহরিপ্রসন্ন সেন কবিরাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ১৭নং কুমারটুলী হইতে প্রকাশিত।—আমরা এই মাসিক প্রবন্ধের প্রথম পাঁচ সংখ্যা উপহার পাইয়া যার পর নাই আপ্যায়িত হইয়াছি এবং ইহা পড়িয়া বুঝিয়াছি যে, আমাদিগের এখনও পুনরুত্থান ও পুনরুজ্জীবনের আশা আছে। লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র আর্য্যজাতির অপ্রতিম কীর্ত্তিস্তম্ভ, অনন্যসাধারণ মনস্বিতা ও মানসী শক্তির নিদর্শন। উহা এইক্ষণ আছে কি নাই, এই ভাবে পড়িয়া আছে, স্বার্থকনাম-সঞ্জীবনী সেই আয়ুর্ব্বেদের পুনঃসঞ্জীবনে কৃতসংকল্প। ইহার এই মহান্ লক্ষ্য সংসিদ্ধ হউক। যাঁহারা এই উপব্রতে ব্রতী, তাঁহারা সকলেই কৃতী ও মহারথী বলিয়া পরিচিত। যদি মাটির গুণে তাঁহাদিগের মনের শক্তি দুর্ব্বল হইয়া না পড়ে এবং দেশীয় ধনিসন্তানেরা তাঁহাদিগের প্রতি সমুচিত উৎসাহদানে কুণ্ঠিত না হন, তাহা হইলে ভরসা আছে, আয়ুর্ব্বেদ পুনরায় বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত ও প্রপূজিত হইবে।

দেবীপ্রসন্ন বাবুর গ্রন্থাবলী।*

কয়েকটী মহৎ উদ্দেশ্য দেবীপ্রসন্ন বাবুর হৃদয়ে পরিপোষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল। পাঠকদিগকে সেই কয়েকটী উদ্দেশ্যের সহিত পরিচিত করিবার নিমিত্ত, এবং পাঠকদিগের দ্বারা সেই কয়েকটী উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, দেবী বাবু তাঁহার এই কয়েক খানি নবেল প্রণয়ন করিয়াছেন। উদ্দেশ্য গুলির নামকরণ করিতে হইলে সাধারণতঃ উহাদিগকে "ভারত উদ্ধার" "সমাজ সংস্কার" "ধর্ম্মপ্রচার" প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। গ্রন্থগুলি প্রায় একই প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এক খানির সমালোচনা করিলে অন্য কয়েক খানির সমালোচনা তাহা হইতে অনুমিত হইতে পারে। আমরা এই হেতু শুদ্ধ শরৎচন্দ্রের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

দেবী বাবুর ভাষা অনেক সময়ে প্রাঞ্জল ও উদ্দীপনার উপযোগী। তাঁহার হৃদয়ে ভাবের যে প্রবল প্রবাহ প্রবাহিত হয়, তাঁহার ভাষাতে সেই সেই প্রবাহের ছায়া উপলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু দেবী বাবু ভাষার পরিপাটিতা সম্বন্ধে নিতান্ত অমনোযোগী। "স্বর্ণলতা...দর্পণ সম্মুখে রাখিয়া সুচিকণ কবরী পুঞ্জ (?) একত্রিত করিয়া সুদীর্ঘ বেণী পৃষ্ঠদেশে ছাড়িয়া দিলেন। বেণী পৃষ্ঠদেশ অতিক্রম করিয়া পা পর্য্যন্ত ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় পড়িয়া দুলিতে লাগিল।" যিনি এইরূপ রচনা করিতে পারেন, তিনি যে লিপিকুশল নহেন, তাহা বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু দেবী বাবুর ন্যায় অসাবধান লেখক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা তাঁহার কলমের আগায় আসিয়া উপস্থিত হয় তিনি তাহাই লিখিয়া দেন। তাহাতে বঙ্গভাষার সহস্র দুর্দ্দশা হইলেও দেবী বাবু সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন না। "আমার ভালবাসিত বস্তু" "সুগন্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা সর্জ্জিত পানের খিলি" "বিন্ধ্যবাসিনী আমার শৈশব-সহচরী, যৌবনের ভুজঙ্গিনী, বৃদ্ধবয়সের অধর্ম্মিণী" "এই অপরূপ—তুমি কতদিন এই ভাবে অতিবাহিত করিবে" "মাঝিরা যদৃচ্ছাক্রমে নৌকা বাহিয়া যাইতে লাগিল" প্রভৃতি যে সমস্ত দুর্ব্বিসহ শল্য দেবী বাবু মাতৃভাষার বক্ষে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বঙ্গবাসী সকলেই নিন্দা করিবে সন্দেহ নাই। "ভালবাসিত" ও "সর্জ্জিত" এইরূপ ক্রিয়ার পাণিনি কে?

* শরৎচন্দ্র, ১ম ও ২য় ভাগ;—বিরাজমোহন;—সন্ন্যাসী,—ভিখারী।

" বৃদ্ধ বয়সের অধর্ম্মিণী " ইহার অর্থ কি ? দেবী বাবুর অর্থ এই—" যে আমার বৃদ্ধ বয়সে আমাকে অধর্ম্মপথে লইয়া যাইবে।" কিন্তু কোন মল্লিনাথ দেবীবাবুর পদবিন্যাস হইতে দেবীবাবুর অর্থসংগ্রহ করিতেন ! "অপরূপ" ইহার অর্থ আশ্চর্য্যজনক, আশ্চর্য্য বা কুরূপ। দেবীবাবু " অপরূপ " " অপরূপ রূপ " এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার পর "রূপ অতিবাহিত" করা কিরূপ বাঙ্গালা ? " যদৃচ্ছাক্রমে " দেবীবাবু কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। দেবী বাবু অনেক স্থলে সুলেখকতার ও লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। এজন্য তাঁহার ভ্রান্তিগুলিকে অসাবধানতার ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। বঙ্গভাষা বেওয়ারিষী মাল নহে। ইহার ব্যাকরণ আছে, অভিধান আছে, বিধি নিষেধ আছে। যিনি এ সমস্ত অবজ্ঞা বা অবহেলা করিবেন, তিনি মাতৃভাষার নিকট গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইবেন।

দেবী বাবু ভাষা সম্বন্ধে যেরূপ অসাবধান, ভাব সম্বন্ধেও সেইরূপ। তাঁহার পুস্তকে পবিত্র, অপবিত্র, সুপক্ক, অপক্ক, অৰ্দ্ধপক্ক ভাব সমস্ত চারি দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তাঁহার মনে যে ভাবের উদয় হয় তিনি তাহাই কাগজে কলমে লিখিয়া ফেলেন। গ্রন্থের এক পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত উদার ও মহান্ ভাব দৃষ্ট হয় " শরৎচন্দ্রকে নিঃস্বার্থভাবে ভাল বাসিতে চেষ্টা কর ; দেখিবে তাহাকে না দেখিলেও তোমার মন অস্থির হইবে না"। আবার সেই পৃষ্ঠাতেই একটি বঙ্গীয়া কুলকামিনী বলিতেছে—"কিছুকাল পরে যখন আমার যৌবনফুল মলিন হইয়া আসিতে লাগিল, তখন দেখিলাম আর ভ্রমর নাই, আর গুঞ্জরণ (?) নাই, তখন আর আমার পানে কেহই ফিরিয়া চাহিত না। একটু টান্ যাই আসিল, অমনিই চলিয়া গেল"। এক পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—"তুমি আমাকে মন দেও আর না দেও আমার মন তোমাকে দান করিলাম, ইহাতে যদি সুখ না থাকে তবে সুখ সংসারে আর নাই"। ইহারই পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে " বিন্ধ্যবাসিনীর এমন সাধের যৌবনফুল (যাহা জীবনে একবার ভিন্ন আর ফুটে না) অস্পৃশ্য ভাবে (?) মলিন হইল ; ভ্রমর গুঞ্জরিল (?) না। মধুকর মধুপান করিল না।"

"এই চিন্তাবিহীন দেশে গল্পছলনে (?) দর্শন শিক্ষা দেওয়া" দেবী বাবুর উদ্দেশ্য। কিন্তু দেবী বাবুর দার্শনিক চিন্তাতেও তাঁহার অসাবধানতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'আশার ছলনা' নামক পরিচ্ছেদটি পাঠ করিলে ইহার কতক কতক আভাস পাওয়া যায়। দেবী বাবু 'আশার ছলনা' এই কথার ব্যাখ্যা করিতেছেন।

১ম লক্ষণ। 'যে আশা মৃগতৃষ্ণিকার স্বপ্ন দেখাইয়া অসময়ে কাহারও জীবননাশের কারণ হয়, তাহা আশার ছলনা।'

২য়। 'যে আশা জীবননাশের অবশ্যম্ভাবী কারণ তাহা আশার ছলনা।'

৩য় লক্ষণ। আশার পর নৈরাশ্য আসে।

'আমরা সৃষ্টির এই মন্ত্রকে আশার ছলনা বলি'।

৪র্থ লক্ষণ। 'নিজ জীবনে প্রত্যক্ষীভূত না হইলে কিছুই বিশ্বাসযোগ্য নহে। বিশ্বাস কর—নিশ্চয় আশার ছলনে জড়িত হইবে।'

৫ম লক্ষণ। 'অসাময়িক আশার কুহকজাল কতক্ষণ মনুষ্যের মনে সুখ বিতরণ করিতে পারে?...মন আবার নৈরাশ (?) হয়। 'মন অপূর্ণ থাকিতে পারে না। আশার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। নৈরাশ্য উপস্থিত হইল। ইহাকে আশার ছলনা বলিব না ত কি বলিব?'

প্রথম দুইটি লক্ষণ অনুসারে বোধ হয় যে পৃথিবীতে একরূপ আশা আছে যাহা মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী কারণ এবং ঐ আশাকেই দেবী বাবু আশার ছলনা বলিয়া অভিহিত করেন।

তৃতীয় লক্ষণ অনুসারে আশার ছলনা সৃষ্টির এক মন্ত্র। অর্থাৎ সকল আশাই আশার ছলনা।

৪র্থ লক্ষণ অনুসারে সুস্পষ্ট প্রমাণবিহীন যে আশা তাহাই আশার ছলনা। সুতরাং এখানেও আশার ছলনা আশার প্রকার ভেদ মাত্র।

৫ম লক্ষণ অনুসারে আশার নিয়মই এই যে ইহা আশার ছলনায় পরিণত হয়। অর্থাৎ আশার ছলনা প্রাকৃতিক নিয়ম।

এক্ষণে 'এই চিন্তাবিহীন দেশের' অধিবাসীরা দেবী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—'মহাশয়—আপনার দর্শন অনুসারে আশার ছলনা নিয়ম কি ব্যভিচার? আপনি কখনও আশার ছলনাকে আশার প্রকারভেদ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, আবার কখনও ইহাকে সৃষ্টির মন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। যাহা সৃষ্টির মন্ত্র তাহা সকল সময়েই একরূপ। অর্থাৎ যদি মনুষ্যমাত্রেই আশা করিতে গিয়া আশার ছলনায় নিপতিত হয়, তাহা হইলে আশার ছলনা আশার নিত্যসহচর। যাহা আশার নিত্যসহচর তাহা আশার প্রকারভেদ হয় কিরূপে?'

অন্যরূপে প্রকাশ করিতে হইলে দেবী বাবুর 'আশার ছলনা'র ব্যাখ্যায় এইরূপ দৃষ্টান্ত দিতে পারা যায়। মনে করুন দেবী বাবু চতুষ্পদ গোরুর লক্ষণ করিতেছেন।

দেবী বাবু একবার বলিতেছেন—'এক প্রকার তৃণভোজী গোরু আছে তাহারাই চতুষ্পদ'।

দেবী বাবু পুনরপি বলিতেছেন—'গোরু হইলেই চতুষ্পদ হয় ইহা সৃষ্টির মন্ত্র।'

যদি চিন্তাবিহীন মনুষ্য এই সমস্ত গভীর চিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্য না দেখিতে পায়, তাহা হইলে দেবী বাবু তাহাদিগকে দোষ দিতে পারেন না।

'আশার ছলনা' সহজ কথা। ইহা লইয়া দর্শন শাস্ত্রের এত ঘাঁটাঘাঁটি না করিলেও চলিত। কিন্তু কথায় কথায় দর্শন শাস্ত্রের অবতারণা করা দেবী বাবুর অভ্যাস। শরৎচন্দ্রে শরৎচন্দ্র হইতে দিনী চাকরাণী পর্য্যন্ত সকলেই দার্শনিক। দিনী চাকরাণী এক স্থলে বিচার করিতেছে—"আপনাকে যে ভালবাসে সে আপনার প্র-

কাহেশ্যই ভালবাসার কাজ করে, আপনার মন বাঁধিবার জন্য প্রকাশ্যে ভালবাসার ফাঁদ পাতে, আপনি সেই ফাঁদে পড়িয়া ভাবেন সেই ভালবাসার উচ্চ আদর্শ—অতএব আপনার মনস্তুষ্ট (?) হউক বা না হউক অর্থাৎ আপনি তাহাকে ভালবাসেন বা না বাসেন এবিষয়ে যাহার মন নাই সেই আপনার জন্য গোপনে এই সকল সামগ্রী রাখিয়া যায়—আপনার ভালবাসার অর্থে সে ব্যক্তির ভালবাসা "না ভালবাসার' মধ্যে গণ্য।"

আমরা দিনী চাকরাণীর তার্কিকতার সম্পূর্ণ প্রশংসা করি। অহো দিনি চাকরাণি! যদি তুমি চাকরাণীগিরি না করিয়া নদিয়ায় বা ভাটপাড়ায় টোল খুলিতে তাহা হইলে তোমা দ্বারা 'এই চিন্তাবিহীন দেশের' পরম মঙ্গল সাধিত হইত।

গল্প রচনাতেও দেবী বাবুর অসাবধানতার ও অধৈর্য্যের চিহ্ন পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের গল্পটি মোটামুটির উপর প্রীতিকর বটে। ইহার কতকগুলি শাখা প্রশাখা বন জঙ্গল বাদ দিলে ইহা আরও প্রীতিকর হইতে পারিত।

চরিত্র বিন্যাসে লেখকের দক্ষতা অল্প বলিয়া বোধ হয়। দেবী বাবু তাঁহার নিজের মনের ভাব, নিজের মনের অবস্থা লইয়া এত ব্যস্ত যে, অন্যের মনোভাব, অন্যের অবস্থা প্রভৃতি তিনি কিছুই পর্য্যালোচনা করিতে পারেন না। কবির পক্ষে এ গুণ প্রশংসনীয়। কবি ভিন্ন নিজের কথা এত তন্ন তন্ন করিয়া, এরূপ গম্ভীর অথচ প্রবলভাবে অন্য কেহ বিচার করিতে পারে না। কিন্তু নাটককার ও উপন্যাসলেখক উভয়েরই এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। অন্যের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না পারিলে, অন্যের মনোভাব, তাহার অবস্থা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা না করিতে পারিলে নাটককার বা উপন্যাসলেখক হওয়া যায় না। দেবী বাবু এ বিষয়ে মনোযোগ করিলে তাঁহার চরিত্র-বিন্যাস প্রীতিকর হইতে পারিত। তাঁহার শরৎচন্দ্রে কেবল একটা মাত্র চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। সেই চরিত্রটি শরৎচন্দ্র। নলিনী, বিন্ধ্যবাসিনী, নীরদা, প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান পাত্রই শরৎচন্দ্রের ছায়া অবলম্বন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। যাঁহারা শরৎচন্দ্র হইতে বিভিন্ন, তাঁহারা গ্রন্থে ভাল করিয়া প্রস্ফুটিত হইতে পারেন নাই। দেবী বাবুর এইরূপ নানা দোষ সত্ত্বেও কয়েকটি কারণে দেবী বাবুর প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

১ম। দেবী বাবুর সারল্য। তিনি অকপটহৃদয় নিঃশঙ্ক উদ্দাম যুবকের ন্যায় তাঁহার মনের সকল ভাবগুলিই পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করেন। মনের সব কথা খুলিয়া লিখিতে পারা সামান্য সাহস ও সামান্য সততার কার্য্য নহে।

২য়। দেবী বাবুর দেশানুরাগ। দেবী বাবু দেশভক্ত। জন্মভূমির প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রগাঢ়, অকপট ও অসীম। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গীরণের ন্যায় তাঁহার হৃদয় হইতে দেশানুরাগসূচক ভাব সমূহের উদ্গীরণ হইয়া থাকে।

৩য়। দেবী বাবুর অধ্যবসায়। যিনি উপর্য্যুপরি এতগুলি পুস্তক প্রচার ও প্রণয়ন করিতে পারেন, তাঁহার কার্য্যক্ষমতার আমরা বিশেষ প্রশংসা করি।

৪র্থ। দেবীবাবুর সদিচ্ছা। যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু মহৎ বা উদার, দেবীবাবুর নিকট তাহাই স্তবনীয়। আর যাহা কিছু অসৎ, বা পাপদিগ্ধ, বা স্বার্থপরতা লিপ্ত, তাহাই দেবীবাবুর চক্ষুঃশূল।

৫ম। দেবী বাবুর হৃদয়ের চাঞ্চল্য। দেবী বাবুর হৃদয়ে ভাবতরঙ্গ অতি প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়। ঐ তরঙ্গ কূল অতিক্রম করিয়া কোন দিকে কখন কি ভাবে বহিয়া যায় তাহা অবধারণ করা কঠিন হইয়া উঠে।

যাঁহার হৃদয়ে এতগুলি সদ্‌গুণ, তাঁহার ভাষা, ভাব, চরিত্র বিন্যাস, গল্পরচনা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। কারণ এক সাবধানতার অভাবে এই সমস্ত সদ্‌গুণের কার্য্যকারিতা বিলুপ্ত হইতে পারে।

শ্রীনীঃ—

আত্ম-সঙ্গীত।

১

থাকি নিরজনে,
গভীর আঁধারে,
ভুলিয়া সংসার, জগত সৃজন;
মায়া, মোহ, ভয়, আশার বন্ধন,
সুখের পিপাসা, জীবের নিরাশা,
আসে না অন্তরে,
সদামগ্ন জীবন্ত-স্বপনে।

২

শত সূর্য্য তারা, অনন্ত জগত,
জীবের মহিমা, প্রেমের প্রতিমা,
ভাসি ভাসি যায় প্রলয় সাগরে;
সুরম্য অতীত,
স্বপনে গঠিত,
গেল। যায় মিলাইয়া অনাদি তিমিরে।

৩

আঁধারে,—আন্ধারে,
—অকূল আঁধারে—
ভাসি আত্মময়,—আত্মভাবে লয়,
রূপ রস ঘ্রাণ, প্রকৃতি বন্ধন,
সংসারের গতি, জীবন পোষণ,
ভুলি যাই জড় নিকেতন।
স্বপনে বলিয়া যাই,
স্বপনে আপনা পাই,
সদা ধাই শূন্য পারাবার
খুজিতেছে অনন্ত-দোসর।

৪

অনন্ত-পুরুষ চাই,
অনন্ত-মহিমা পাই,
অনন্ত-জ্ঞানের সিন্ধু অন্তরের আশা;

অক্ষয় অনন্ত-ভাষা,
পূরিছে অনন্ত তৃষা,
অনন্ত বিকাশ ভিন্ন কিছু নাই, নাই ;
অণুর (ও) অন্তরে লীন অনন্ত-পরাণ !
গ্রহ, তারা, চন্দ্র, জ্যোতি,
জীবন, পবন, গতি,
অনন্ত অসীমকাল, অনন্ত গগণ,
অনন্ত প্রস্থানে সব করিছে গমন।

৫

অনন্ত-প্রকৃতি,
—অনন্ত-মূরতি—
ঝরে শত মুখে অনন্ত সঙ্গীত ;
গ্রহ ধূমকেতু, নক্ষত্র তপন,
সুচারু চন্দ্রমা, অযুত কিরণ
শুভ্র ছায়া পথ,—গায় অবিরত
অনাদি নিক্বণে অক্ষয় সঙ্গীত ;
মুগ্ধ শ্রুতি পথ,
মুগ্ধ বিশ্বচিত,
মুগ্ধ মন্ত্রে আকাশ মোহিত,
শুনি প্রাণে শব্দ অনাহত।

৬

সকলি অনন্তময়,
সকলি অনন্তে লয়,
অসীম-আকাঙ্ক্ষা বীজ রোপিত অন্তরে,
কেন ভাসি এ ক্ষুদ্র সংসারে ?
জলেতে ডোবে না প্রাণ,
সমীরে দোলে না মন,
ক্ষিতি মনে নাহি সম্মিলন,
এ ধরার নাহি আত্মজন।

৭

একটি জীর্ণ কুটীরে,
লোকালয় হতে দূরে,
থাকি নিরজনে, নাহি বন্ধুজন
পৃথিবীর সনে মোর হয়না মিলন।
সংসার জানে না মোরে,
আমিও জানি না তারে,
—নহি শূন্য আত্ম-অভিমান—
যদিও অজ্ঞাত, নই ধূলির সমান।

৮

নহি ক্ষুদ্র পদরেণু,
'নই গো নীচ কীটাণু,
প্রকৃতি সুসঙ্গ সুখে নই আকুলিত,
আপনার চিন্তস্রোতে আপনি বাহিত।
চন্দ্র সূর্য্যগ্রহ তারা, উজ্জল কিরণ,
কেউ নয় আমার কারণ ;
বিদ্যুৎ, অশনিপাত, সাগরকল্লোল,
শরত বসন্ত শোভা, সুরঞ্জিত ফুল,
উষাসুসমীর, মত্ত আশার নিশ্বাস,
সুকণ্ঠ মৃদুলধ্বনি, মৃদুল পরশ,
সংসারের দ্রব্যে যত,
সুশোভিত, সুরঞ্জিত,
আমারে ভুলাতে চায়,
নিশি দিন যত্ন পায়,
নিরাশ অন্তরে সব পলকে লুকায়।

৯

থাকি নিরজনে,
গভীর আঁধারে,
ভুলিয়া সংসার, জগত স্বজন,
মায়া, মোহ, ভয়, আশার বন্ধন,
সুখের পিপাসা, জীবের নিরাশা,
আসে না অন্তরে,
আছি একা এজীর্ণ কুটীরে।

বন পুষ্প।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ত্রিকূট পর্ব্বতের পাদ ধৌত করিয়া একটি ক্ষুদ্র স্রোত বহিয়া যাইতেছে। বেলা দ্বিপ্রহর, তথাপি, পর্ব্বতের এবং পরাসর উপবনের নিবিড় বৃক্ষরাজীর ছায়ায় সূর্য্যালোক তাহাতে অবিদ্ধ রহিয়াছে। স্থান শ্যামলতাময় এবং শীতলতা পূর্ণ। ঈষৎ মৃদু বাতাসে তরুপত্র প্রকম্পিত হইতেছে। এই সময়ে চারিটি বালিকা, আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। একটি বালিকা অপর একটিকে ডাকিয়া বলিল, "মায়া, আজ, আসিতে২ বড় দূরে আসিয়া পড়িলাম, আমাদের নিত্যকার যেস্থান সেইত ভাল ছিল।" মায়া বলিল, "না শ্যামলী, এইত ভাল, দেখ না, এই গাছে আমরা ঝুলানি খেলিব,—এ আর দূর কি, এক দৌড়ে বাড়ী যাওয়া যায়।"

শ্যাম,—তা বেশ, ঝুলানী যে খেলিবে, রশি কৈ? তাত সেই গাছেই আছে।

মায়া,—তাইত লো, আমরা কি অহম্মুক। আচ্ছা, যা, নাহল রশি, আমাদের চার জনের ওড়না দিয়ে রশির কাজ হইবে এই কথা শুনিয়া অমনি আর দুইজন একযোগে বলিয়া উঠিল, 'ওড়না তুমি দিবে।'

.. দাও তুমি রাজার মেয়ে একখানি যাবে, দশ খানি হবে, তোমার কি, আমরা ভাই তা দিব না। মায়া হাসিয়া বলিল, আচ্ছা আমার যদি একখান গেলে দশ খানা হয়, তবে তোমাদেরও হবে। এই কথায় শ্যামলী হাতে তালী দিয়া হাসিয়া উঠিল, সেই সঙ্গে২ অবশিষ্ট তিন জনও হাসিয়া উঠিল। যেখানে ইহারা ঝুলন খেলিবার ব্যবস্থা করিতেছে, ঠিক উহারই কিছু দূরে, ধীরে২ একটি বন্য মহিষ অন্য দিগে চলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ করতালী এবং হাস্যরব শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। ইহা মায়ার চক্ষে পড়িল,—মায়া সভয়ে বলিল 'চুপ কর আজ মরিলাম। ঐ দেখ জঙ্গল হ'তে মহিষ আসিতেছে।' শ্যামলী বলিল, 'ঐ মহিষ এদিকেই আসিবে, চল আমরা ছুটিয়া পালাই।' প্রাণভয়ে সকলেই দৌড়িতে লাগিল, মহিষও তাহাদিগকে দৌড়াইতে দেখিয়া, মহাবেগে দৌড়াইতে লাগিল,—মায়ার দৌড়াইবার অভ্যাস কম, তাহার উপর ভয়, সুতরাং অধিক দৌড়িতে না পারিয়া পড়িয়া গেল,—তাহার সঙ্গিনীগণ, আর পশ্চাৎ চাহিল না, প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিল। ইত্যবসরে মহিষ উর্দ্ধকর্ণ ও উর্দ্ধপুচ্ছ করিয়া প্রবলবেগে মায়ার নিকটবর্ত্তী হইল, এমন সময় হঠাৎ কে প্রভূত বলশালী হস্তে মহিষের শৃঙ্গ ধরিয়া এরূপ আকর্ষণ করিল যে মহিষ পড়িয়া গেল, মহিষের পতনশব্দে মায়ার ক্ষণিক

ভীতিপূর্ণ মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল,—চাহিয়া দেখিল, এক পরম সুন্দর যুবক মহিষাশূরের বিশাল স্কন্ধে তরবারী বসাইয়া দিয়াছে। ভয়ঙ্কর পশু ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। এখনও মায়ার উঠিবার শক্তি নাই, ভাবিতেছে একি স্বপ্ন! না চক্ষুর ভ্রম হইয়াছে। যুবক ক্ষণকালের মধ্যেই মহিষ বধ করিয়া,মায়াকে ধরিয়া তুলিল, মায়া, নিতান্ত ভয়বিকলা হইয়া চতুর্দ্দিগে শূন্য দৃষ্টি করিতে লাগিল, যুবক বলিল,—ভয় নাই ঐ দেখ,তোমার শত্রু বিনাশ করিয়াছি, মায়া চাহিয়া দেখিল,—যথার্থ, ঐ মহিষের ভীষণ ছিন্ন মুণ্ড পতিত রহিয়াছে—এখনও তাহার স্কন্ধ দিয়া অজস্র রুধির প্রবাহিত হইতেছে। যুবক পুনরায় বলিল, যদি একাকী যাইতে ভয় হয়,বসিয়া থাক, আমি এই নদীর জলে আমার তরবারী এবং হস্ত ধুইয়া আসি। মায়া, যুবকের দিকে চাহিল, পরে মাথা নোয়াইয়া বলিল 'আচ্ছা'।—মায়া নিতান্ত বালিকা নহে,—বয়স ত্রয়োদশ বৎসর, যৌবন কুসুমের মঞ্জরী মানসক্ষেত্রে এবং দেহে কেবল সমুদিত হইয়াছে। বালা যুবকের প্রশান্ত বদনমণ্ডল দেখিয়া এই প্রথম শিহরিল—ভাবিতে লাগিল, আহা কি শক্তি, কি মনোহর মূর্ত্তি, একি এদেশের লোক, এমন নিষ্কলঙ্ক-শ্বেতপাষাণের মত বর্ণ, আকর্ণলম্বিত নীলাভ কৃষ্ণ মহোজ্জ্বল চক্ষু, প্রশস্ত ললাট দেশ, বিলম্বিত কুন্তল, রাগরঞ্জিত অধর, আমি দেখি নাই। এমন সময়ে তরবারী ধৌত করিয়া যুবক উপস্থিত হইয়া বলিল 'চল।' মায়া তাহার মুখপানে কিছু কাল চাহিয়া যেন, স্খলিতস্বরে' বলিল 'কেন? কোথায়?' যুবক ইহাতে একটু হাসিয়া বলিল, চল তোমাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসি। মায়া 'আচ্ছা' বলিয়া যুবকের সহিত চলিতে লাগিল, মায়া যুবকের দিকে চায়, যুবক মায়ার মুখপানে চায়, যখন চারিচক্ষু একত্র হয়, উভয়ে লজ্জিত হয়, উভয়েই মৃদু হাসিয়া হাসিয়া মুখ ফিরায়, এই ভাবে ইহারা চলিতে লাগিল, সুতরাং গমন ধীরে ধীরে হইতে লাগিল, উভয়েরই মনের ইচ্ছা পথ যেমন ফুরায় না। অনেকক্ষণ উভয়ে নীরব। যুবক প্রথমে কথা বলিল। আজি তোমার প্রাণ গিয়াছিল, আমি রক্ষা করিয়াছি। পুরস্কার কি দিবে বল। মায়া বলিল, যাহা চাও বাবাকে বলিয়া তাই দিব, তুমি জাননা, আমার বাবা রাজা। যুবক বলিল, যা চাহিব তাই কি তিনি দিবেন তুমি জান? মায়া বলিল, আমি তাই লইয়া দিব। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, 'বাপ্পা বাপ্পা'—যুবক ফিরিয়া দেখিল, মণ্ডলীক ডাকিতেছে, তখন দাঁড়াইল, মণ্ডলীক বলিল, দেখ বাপ্পা, আমি তোমার আশ্রয়দাতা, এবং তোমাকে আমি সন্তানের অধিক স্নেহ করি, তুমি আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়াছ, আমরা ভীল, আমাদের ধর্ম্ম এই, যে আমাদের প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গে আমরা তাহার প্রাণ বিনাশ করি। তোমার প্রাণ বিনাশ করিব'। মায়া বলিল, 'ভীল দস্যু, চোর, তার আবার ধর্ম্ম?' পরে যুবককে তাড়াতাড়ি চলিতে

বলিয়া আবার মণ্ডলীককে ক্রোধ পূর্ব্বক বলিল, 'থাক, বাবাকে বলিয়া কাল তোমার মাথা লইব।' মণ্ডলীক হাসিয়া বলিল 'মা, তুমি কি আমার বাপ্পাকে এত ভাল বাস?' মণ্ডলীকের কথা শেষ না হইতেই যুবক বলিল, ' আমি কি প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়াছি বল।' মণ্ডলীক বলিল, 'এই তরবারি আমার পূর্ব্বপুরুষের। আমরা প্রতিজ্ঞা বদ্ধ, এই পবিত্র তরবারী পশুরক্তে কলুষিত করিব না, যে করিবে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বিনাশ করিব। তাহা তুমি করিয়াছ।' 'করিয়াছে বেশ করিয়াছে, আরো করিবে, দেখি তুমি কেমন করিয়া ইহার প্রাণ বিনাশ কর' এই বলিয়া মায়া বিষম ক্রুদ্ধ হইল। ক্রোধের আবেগে তাহার গণ্ড বহিয়া অশ্রুপাত হইতে লাগিল। যুবক মায়াকে কিছু বলিতে নিষেধ করিয়া স্বহস্তের তরবারী মণ্ডলীকের হস্তে দিয়া বলিল—মণ্ডলীক, তুমি আমার আশ্রয়দাতা, পিতৃতুল্য,তোমাকে আমি প্রতিজ্ঞা-ভ্রষ্ট করিব না। ত্রিসংসারে আমার কেহ নাই, আমার শোকে কান্দিবে, আমার এমনও কেহ নাই—যদি কেহ থাকে তবে তুমি, পিতামাতা ভাই ভগিনী কেমন জানি না, সংসারে আসিয়া তাঁহাদের মুখ দর্শন করি নাই, তুমিই পিতার মত রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছ, স্নেহ করিয়াছ, অস্ত্র শিখাইয়াছ, আমি তোমার। প্রস্তুত আছি, এখনই—আমার শিরঃচ্ছেদ করিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষাকর।' মায়া এই কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। পরে যুবকের এবং মণ্ডলীকের মধ্য দেশে দাঁড়াইয়া বলিল, " মার দেখি!" মণ্ডলীক হাঁসিয়া বলিল, "বাপ্পা এই দেখ তোমার জন্য কান্দিবার লোক আছে।" যুবকের নাম বাপ্পা, বাপ্পা বলিল, 'মণ্ডলীক আমাকে বধ করিয়া এই বালিকাকে পৌছাইয়া দিবে।' মায়া কান্দিতে লাগিল। মণ্ডলীক বলিল 'আজ নয়, কাল প্রভাত কালে একলিঙ্গের মন্দিরে আসিও,—আমি আর এক খানি তরবারী লইয়া যাইব। যে অস্ত্রশূন্য তাহাকে আমরা আক্রমণ করি না।' এই বলিয়া দ্রুতবেগে মণ্ডলীক প্রস্থান করিল। বাপ্পা মায়াকে বলিল,—" দেখ আর আমার জন্য তোমার বাবার কাছে কিছু চাহিতে হইবে না।" মায়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বাপ্পার মুখপানে চাহিয়া রহিল। বাপ্পা বলিল " দেখ ত কে আসিতেছে?" মায়া চাহিয়া দেখিল, শ্যামলিরা তিন জন আবার আসিতেছে, দেখিয়া বলিল 'ওরা আমারই সঙ্গিনী'—বাপ্পা তড়িৎ বেগে নিবিড় পরাসর উপবনে অদৃশ্য হইল। মায়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পর দিন প্রভাত সময়ে, বাপ্পা, সেই ত্রিকুট পর্ব্বতের শিখর দেশে দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরাভিমুখে গমন করিল। ত্রিকুট পর্ব্বতের দৃশ্য শোভা অতি মনোহর। ইহার চতুর্দ্দিগ সুবৃহৎ পরাসর-বনে বেষ্টিত, পর্ব্বতের নাভিদেশ হইতে কুল কুল রবে একটী ক্ষুদ্র প্রস্রবণনিঃসৃত হইয়া যেন নিরন্তর

তাহার পাদমূল ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বনের বহু প্রাচীন তরুরাজী বীরপুরুষের ন্যায় যেন, পবিত্র ভূধরের প্রহরায় নিযুক্ত আছে। কোন স্থানে শত শত পলাস তরু এবং পারিজাত প্রভৃতি, কুসুম সজ্জিত হইয়া দিক্ আলোকিত করিয়াছে। কোথাও, সন্ধ্যাতীত চম্পক এবং নাগ-তরুগণ সুগন্ধ বিতরণ করিতেছে, বনফুল, বনফল, বনের সৌরভ, পরাসরের তাহাতে অভাব নাই,—এই বনে বনপুত্রগণ—সতত মৃগয়ার জন্য আগমন করে, এবং পরিশ্রান্ত কলেবরে, তরুরাজীর শীতল ছায়ায়, প্রস্রবণের পবিত্র জল পানে, বনফুলের সুরভি গন্ধে এবং নানা জাতী বনফলের সুখদ আস্বাদনে, পরিতৃপ্ত হয়। ফলতঃ এরূপ মনোহর এবং পবিত্র স্থান দুর্লভ। এই প্রকৃত শান্তির আশ্রয়, এই মুনিজন-লোভনীয়, এবং তাপসের বাঞ্ছিত স্থান। বনের এক দেশ দিয়া পর্ব্বতারোহণ করিবার পরিষ্কার একটি পথ আছে—সেই পথ মণ্ডলাকারে ত্রিকুটকে প্রদক্ষিণ করিয়া ব্যাপিত রহিয়াছে। পর্ব্বতের অর্দ্ধেক পথ উঠিলেই মহাদেব মন্দিরের দ্বার দেশে আসিয়া উপস্থিত হওয়া যায়। মন্দির অতি বিচিত্র এবং অদ্ভুত। সুদৃশ্য না হইলেও সুবৃহত এবং সুদৃঢ়। শ্বেত প্রস্তরে ইহা গঠিত হইয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ অতি সুপ্রশস্ত, চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শ্বেত প্রস্তরময় স্তম্ভ সারিসারি রহিয়াছে। মধ্য দেশে এক প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ বিরাজিত, বেদীর নিম্নদেশে অনতিদূরে সুবৃহৎ এক ধাতুময় বৃষ শুইয়া আছে *। বাপ্পা এক লিঙ্গের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখে, মণ্ডলীক পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইয়াছে। বাপ্পাকে দেখিয়া মণ্ডলীক বলিল, 'আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই।' দুইখানি অসি আনিয়া একখানি তা-

* এই স্থান উদয়পুর হইতে পাঁচক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। হিন্দুদিগের ইহা তীর্থ স্থান, এখনও বৎসরের মধ্যে নয় দিন শিবের পূজা অতি সমারোহ সহকারে হইয়া থাকে। বর্ত্তমান রাণারা ইহার পূজক। অদ্যাপি মন্দিরে এক লিঙ্গ এবং ধাতুময় বৃষভ বর্ত্তমান আছে। কেবল মন্দিরের স্থানে স্থানে বিপক্ষের আক্রমণ এবং অত্যাচারচিহ্ন লক্ষিত হয় এবং শূন্যগর্ভ ধাতব বৃষের একদেশে একটি বৃহৎ ক্ষতও দৃষ্ট হয়। প্রথিত আছে, তাতারগণ যখন এই রাজ্য আক্রমণ করে, তখন এই পবিত্র গৃহ গোরক্তে কলুষিত করিয়াছিল। এবং কৃত্রিম বৃষের অভ্যন্তরে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনায় উহার একদেশ ক্ষত করে। এই মন্দির কতকালের অদ্যাপি তাহা কেহ ঠিক করিতে পারেন নাই। এরিয়ান বলেন ইহা গ্রীকগণের সময়ে গঠিত এবং উপাস্য ও গ্রীক দেবতা। এই গ্রীকগণ বহুকাল পাঞ্জাবের নিকট রাজ্য করেন। রাজা আপেলডোউস এবং ডিমিট্রিয়স ও মিনণ্ডর প্রভৃতির রাজধানীর নাম (Sagala) সগল। ৫৬২ খৃষ্টাব্দেরপর ইহারা কি নামে কি আচার ব্যবহারে সর্ব্বথা হিন্দুর সহিত মিশিয়া যায়।

হার হস্তে অর্পণ করিয়া বলিল, 'দেবাদিদেব শূলপানিকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াও।' মণ্ডলীক স্বয়ং ও প্রণাম করিয়া বলিল, 'মহাদেব, ন্যায়দ্বন্দের বিচার তুমি করিও, আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছি।' মণ্ডলীক,অসাধারণ বলবান, ভীল জাতির মধ্যে তাহার মত পরাক্রমশীল আর কেহ ছিলনা, সে আপন বাহুবলে সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব এবং অসাধারণ ক্ষমতায় বৈদেশিক সোলাঙ্কীবংশীয় রাজাকে বধ করিয়া সামন্ত শ্রেণী ভুক্ত হইয়া রাজাশূন্য রাজ্যের শাসন করিত। সকলে তাহাকে ভীলরাজ বলিত। ইদর, নগেন্দ্র রাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইলেও, ইদরের সর্ব্বময় কর্ত্তা মণ্ডলীক। মণ্ডলীক দ্বন্দযুদ্ধে কত বীরপুরুষের জীবন লইয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহার সাহস শিক্ষা পরাক্রম শারীরিক বল—সকলই অসাধারণ। কখন তাহার অন্তরে ভয় বা আশঙ্কার উদয় নাই। কিন্তু আজ শিশুর সহিত যুদ্ধ করিতে অকস্মাৎ তাঁহার অবিচলিত হিমালয় হেন বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল। মণ্ডলীকের বয়স আটত্রিশ বৎসর, লৌহসম তাঁহার শরীর ও হস্তপদ কঠিন, এই কঠিন দেহ অকস্মাৎ আশঙ্কার তাড়িতে প্রকম্পিত করিল। এদিগে, মাত্র পোনের বৎসরের যুবা বাপ্পা নির্ভয়ে নিশংসয়ে অসি হস্তে দাঁড়াইয়া—মণ্ডলীকের সঙ্কেত প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। মণ্ডলীক, অসি চমকাইয়া বলিল, 'বাপ্পা সাবধান হও।' উভয়ে যুদ্ধ হইতে লাগিল। মণ্ডলীক আজ বুঝিতে পারিল যে বালক দেবশক্তিসম্পন্ন। উভয়ের অসির সংঘাতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, এবং অসিঘাত শব্দ মন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইয়া দ্বিগুণিত অনুভূত হইতে লাগিল। উভয়েই উভয়ের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। উভয়েই সাবধান, উভয়েই বলবান, উভয়েই অস্ত্রে নিপুণ। উভয়েই মনে করিতে লাগিল আজ্ কাহারই নিস্তার নাই। কিন্তু হঠাৎ মণ্ডলীকের দক্ষিণচরণ একটি পুষ্পের উপর পতিত হইয়া, মসৃণ পাষাণে পদ বিচলিত হইল,—এই সুযোগে বাপ্পার অসি মহা বেগে তাহার-বিপুল স্কন্ধে পতিত হইল,—এই আঘাতেই মণ্ডলীক ছিন্ন শির হইত, কিন্তু পিছলিয়া পড়িবায় আঘাত ঠিক স্কন্ধে না পড়িয়া কিঞ্চিত বক্রভাবে স্কন্ধ হইতে বাম হস্তের কিয়দংশ নামিয়া পড়িল। মণ্ডলীক অশক্ত হইয়া শিব পদতলে লুটাইল। তখন বাপ্পার তরুণ হৃদয় বিচলিত হইল, অসি ফেলাইয়া কান্দিয়া উঠিল,—'হায়রে আশ্রয় দাতার প্রাণবিনাশ করিলাম'। মণ্ডলীক করুণ স্বরে বলিল, 'বাপ্পা দুঃখ করিওনা, আনন্দিত হও, অদ্যাবধি কতশত বীরপুরুষ এই মণ্ডলীকের অসিঘাতে প্রাণ দিয়াছে—তাহার লেখা যোখা নাই, তুমি যুদ্ধে আজ্ তাহাকে নিহত করিলে।—ইহা হইতে, বালক তুমি, তোমার গৌরবের বিষয় আর কি আছে? আশীর্ব্বাদ করি তুমি বাহু বলে পৃথিবী বিজয়ী হও। মণ্ডলীকের অস্ত্রশিক্ষার গুণ পৃথিবীর বীরপুরুষেরা দেখুক।' বাপ্পা বলিল 'পিতঃ তোমার মনোবাঞ্ছা কি বল, সাধ্য হইলে আমি পূর্ণ করিব?' মণ্ডলীক, হা-

সিয়া বলিল,'আমার মনোবাঞ্ছা আর কিছু নাই,—তবে একটি মাত্র । তোমাকে ব-লিতে চাহি, যদি রাখ?' বাপ্পা বলিল 'শিব সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি অবশ্য তোমার কথা রাখিব।'—ইহা শুনিয়া মণ্ড-লীকের বদন প্রসন্ন হইল, বলিল,—'আমি জানিয়াছি একদিন তুমি অসির প্রতাপে লোকের অসাধ্য কাজ করিবে, কিন্তু এই দুর্ভাগা মণ্ডলীক যে তোমাকে, অসিচালনা তীরচালনা প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছে একথা ভুলিও না।' বাপ্পা উৎসাহ সহকারে বলিল 'একথা ভুলিলে ধর্ম্মে পতিত হইব।' এমন সময় মণ্ডলীকের কণ্ঠ শুকাইতে লাগিল,—বলিল,'আমাকে জলপান করাও' বাপ্পা আর কিছু না পাইয়া শিবার্চ্চনার তাম্রঘট লইয়া তীরবেগে, প্রস্রবণের জল আনিতে গমন করিল। জল লইয়া আসিবার কালে, কে যেন তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতে লাগিল—বাপ্পা ফিড়িয়া দেখিল,—মায়া,—মায়া বলিল 'দাড়াও দা-ড়াও শুনি'। কিন্তু বাপ্পা তাহার কথায় কর্ণ-পাত ও করিল না, তড়িৎ বেগে আসিয়া গতাশু মণ্ডলীককে করপুটে জলপান ক-রাইতে লাগিল। ইত্যবসরে মায়া তথায় উপনীত হইল। মায়া দেখিয়া বিস্মিত হইল, কেননা শিশুর হস্তে এরূপ বীরপুরু-ষের পতন হইয়াছে, ইহা এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু গত দিবসের মহিষ যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়া পরক্ষণেই ইহা তত অ-সম্ভব বোধ হইল না। মায়া বলিল মণ্ডলীক কে তোমার এদশা করিল, মণ্ডলীক একটু হাসিয়া বলিল, যাহাকে তুমি ভাল বাসি-য়াছ, যাহার প্রাণ রক্ষার জন্য আমার প্রাণ সংহার করিতে আসিয়াছ। মায়া লজ্জিতা হইল, তাহার জ্যোতিঃপূর্ণ বিশাললোচনে অশ্রুবিন্দুও দেখাদিল, বাপ্পা চাহিয়া দে-খিল, ব্রীড়াবনতমুখী মায়া, একখানি ক্ষুদ্র অসি হস্তে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। এমন সময় মণ্ডলীক, বাপ্পাকে নিকটে আসিতে বলিল, বাপ্পা তাহার মুখের কাছে কর্ণ স্থাপন করিলে মণ্ডলীক অনেক কথা বলিল,পরে বড় করিয়া বলিল, বাপ্পা আমাকে অর্দ্ধপথে আনিয়া রাখিয়াছ। যন্ত্রণার একশেষ হইতেছে। প্রহরেকের মধ্যে যে মরিব বোধ হয় না,কিন্তু বাঁচিব না নিশ্চয় কথা ;—ইহার যে ঔষধ আছে শীঘ্র দাও, ভাল হই। বাপ্পা বাষ্পাকুললো-চনে বলিল পিতঃ প্রাণপণে শুশ্রূষা করি-তেছি, কি ঔষধ দিলে ভাল হইবে জানি না, বল এখনি দৌড়িয়া যাই আনিগে। মণ্ডলীক হাসিয়া উত্তর করিল,' বালক জান না, বীরের ভাষা ভিন্ন, ঔষধি ভিন্ন, পন্থাও ভিন্ন ; তোমার তরবারী হাতে লও আমি ঔষধির কথা বলিয়া দি, বাপ্পা তরবারী গ্রহণ করিল। তখন মণ্ডলীক ব-লিল, অমোঘ ঔষধি লইয়াছ, এখন আ-মাকে সেবন করাও, বাপ্পা কিছু বুঝিতে পারিল না, বলিল কি করিব। মণ্ডলীক বলিল লঘুহস্তে একবারে শরীর হইতে আমার মস্তক কাটিয়া দুইভাগ কর। বাপ্পা কাঁদিতে লাগিল, মণ্ডলীক বলিল, কান্দি-ওনা বীরপুরুষের দুঃখ, ক্রন্দন, ভয় ও

শোক থাকেনা, যখন বীরের ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছ তখন কাঁদিবে কেন? এস, শীঘ্র আমার সুহৃদের ব্যথিতের এবং পুত্রের কাজ কর, তুমি কি আমার যন্ত্রণা দেখিয়া সুখী হইতেছ? বাপ্পা ইহা শুনিয়া লজ্জিত হইল, মুহূর্ত্তেক পরেই হর হর শব্দ করিয়া মণ্ডলীকের মস্তক দেহ হইতে ছুটিয়া পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মণ্ডলীক, সহচর অনুচর গণের নিকট বলিয়া আসিয়াছিল "যদি ডের প্রহর বেলা হইবার পূর্ব্বে আমি ফিরিয়া না আসি, তবে নিশ্চয় জানিবে আমি নাই, দুই প্রহরের সময় এক-লিঙ্গের মন্দিরে আমার তত্ত্ব করিও।' এই জন্যই বাপ্পার কাণে কাণে যখন মণ্ডলীক অনেক কথা বলিল, তখন একথাও বলিয়াছিল যে, 'আমার সমাধির জন্য ব্যস্ত না হইয়া তুমি শীঘ্র মন্দির পরিত্যাগ করিও, নতুবা বিপদ সম্ভাবনা।' সুতরাং মণ্ডলীকের মস্তকোচ্ছেদন করিয়া বাপ্পা মন্দির ত্যাগ করিয়া পরাসরে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে মায়াও আসিল। বেলা এখনও একপ্রহরের অধিক হয় নাই। বাপ্পা মায়াকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি জন্য আসিয়াছ? মায়া বলিল কাল যে ভয়ঙ্কর কথা শুনিয়া গিয়াছিলাম তাহাতে কি নিশ্চিন্ত থাকা যায়। বাপ্পা বলিল 'ও বুঝিয়াছি, কাল যে তোমাকে বাচাইয়াছি এইজন্য আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়াছে।' একথা মায়ার নিকট মিষ্ট বোধ হইল না, এমন কি তাহার মনেও বেদনা লাগিল,—কিছু কাল পরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হইনাই, বা সেজন্য তোমাকে ভাল বাসি বলিয়া আসিও নাই। বাপ্পা বলিল, 'তবে কি মনে করিয়া আসিয়াছ?' মায়া বলিল, 'শিব দেখিতে আসিয়াছি' দেখিলাম, এখন চলিয়া যাই,—এই বলিয়া আর এক পথে চলিল, বাপ্পা তখন মায়ার হাত ধরিয়া হাসিয়া বলিল 'যেওনা।' সখীদিগের কি আত্মীয় স্বজনের হাত কত গায় লাগে, কতজনে হাত ধরে, মায়ার এরূপ স্পর্শ সুখ ত জন্ম ভরিয়া হয় নাই। মায়া একটু ঈষদ্ হাসিয়া দাঁড়াইয়া মনে মনে ভাবিল, বাপ্পা স্বর্গের অমৃত মাখিয়া কি আমার হাত ধরিয়াছে। মায়ার সুকোমল হাত ধরিয়া বাপ্পাও জীবনের মধ্যে এক অচিন্তনীয় সুখানুভব করিল। উভয়েই বালক এবং বালিকা, কাহারও মনে কুটিলতা নাই, সুতরাং বয়োধিক নর নারীর মত ইহাদের রসের কথায়, সুখের কথায়,ধন দৌলতের কথায়, কুলমানের কথায় ভাল বাসার ভিত্তি সংস্থাপিত হয় নাই, বিধিকৃত ইহা ঘটিয়াছে। সুতরাং বালকের ন্যায়ই খোলা খুলি করিয়া ইহারা ভাল বাসার কথা শেষ করিল। বাপ্পা বলিল 'কাল হ'তে আমি তোমারে বড়ই ভাল বাসিয়াছি,তোমার মুখ খানি বড়ই সুন্দর।' মায়া বলিল 'এ তোমার ঐ মুখের কাছে কি এমুখ?'বাপ্পা বলিল,'তা যা হোক্ কালকার কথা তোমার মা বাবার কাছে বলিয়াছ?" মায়া বলিল, 'না, তোমার কথা

বলিতে লজ্জা করিল,—আরও এক কারণে বলি নাই, বলিলে,অমি আসিতে দিবেনা।'

বাপ্পা, 'তোমার সখীদের কাছে বলিয়াছ?'

মায়া, 'না, বলিতে চাহিয়াছি,বলিনাই।' এই সময়ে একপাল হরিণ শিশু, এবং দুইটি হরিণী কিছু দূর দিয়া চলিয়া গেল, মায়া বলিল ঐ রকম হরিণ শিশু পাইলে আমি পুষি।' 'ও তুমি ঐ রকম চাও, আচ্ছা এখনই তোমাকে দিব, আমার সঙ্গে এস?' এই বলিয়া বাপ্পা নিবীড় জঙ্গলের দিগে চলিল, শিবের শিবানীর ন্যায় মায়াও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল,কিছু দূর যাইয়া বাপ্পা বলিল, এই দেখ, গাছ কাটিয়া কেমন, চারিটি গাছের সঙ্গে উচু করিয়া মাচা বান্ধিয়াছি। দেখ নীচে উপরে কত বৃক্ষের শাখা ও লতায় কেমন দিব্য নিকুঞ্জ হইয়াছে। দেখ ভিতরে যাহা আছে আমরা দেখিতে পাইনা। তুমি পাষাণের গৃহে থাক, এই আমার গৃহ, মায়া বলিল, কিরূপে ওখানে যাওয়া যায়? বাপ্‌পা আনন্দিত হইয়া বলিল তুমি যাবে আচ্ছা চল তবে? এই বলিয়া অসি কটিদেশে বান্ধিয়া, বসিয়া মায়াকে বলিল, আমার কান্ধে উঠিয়া শক্ত করিয়া মাথাধর, তথায় জন মানব আসিবার সম্ভাবনা নাই; মায়া তাহাই করিল, বাপ্‌পা অনায়াসে নিকুঞ্জ মঞ্চে আরোহণ করিল। মায়া দেখিল কুঞ্জ অতি প্রশস্ত ৩।৪ জন লোক.সুখ সচ্ছন্দে সেখানে থাকিতে পারে। শুষ্ক শৈবাল দলের উপর মৃগ চর্ম্ম দ্বারা অতি সুন্দর শয্যা প্রস্তুত রহিয়াছে। বালীশও মৃগ চর্ম্মের। একপার্শ্বে ১০।১২টি চর্ম্মথলিয়া ঝুলিতেছে। ইহার কোন কোনটায়,বাটুল রহিয়াছে,কোনকোনটায় ফল রহিয়াছে। এক পার্শ্বে এক বোঝা তীর, এবং একখানি ধনুক ও একখানি বাটুলী আছে। আর এক পার্শ্বে চারিটি বল্লম, একখানি কুঠারী ও একখানি দা, রহিয়াছে। বাপ্‌পা বাটুল দ্বারা কত গুলিন সুপক্ক ফল পাড়িয়া মায়াকে খাইতে দিল, আপনিও আহার করিতে লাগিল। মায়া তাহা অমৃতজ্ঞানে খাইতে লাগিল। বাপ্‌পা হাসিয়া বলিল, 'মায়া, যোগীর, যোগিনী হইবার সাধ হয়?' মায়া যে রাজকন্যা ক্ষণ কালের জন্য সে ভুলিয়া গিয়াছে, সে বলিল, আমার যদি রাজার ঘরে জন্ম হ'তো, তা হলেও, এ হতে অধিক সুখী হতেম্ না। বাপ্‌পা হাসিয়া বলিল, বেশ, তবে তুমি আমারই হও, তুমি রাজার কন্যা একথা যেন আর তোমার মনে হয় না। মায়া চমকিয়া উঠিয়া বলিল, 'ও যেন কত বেলা হয়েছে,বাপ্পা,আমারে নামাইয়া দাও' বাপ্‌পা বলিল, বল তুমি আমাকে বিবাহ করিবে কি না? মায়া, আশাতিরিক্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, আমি তোমারই আর কাহাকেও বিবাহ করিবনা।

বাপ্পা, ঠিক্ বলিলে?

মায়া, ঠিক্ বলিলাম।

তখন বাপ্‌পা মায়াকে ক্রোড়ে করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চন্দ্রমুখি, এই তোমাকে বিবাহ করিলাম। মায়া লজ্জায় এবং সুখে বাপ্‌পার গণ্ডে মাথা লুকাইল। বাপ্‌পা,

তাহার পর কুঞ্জ হইতে তাঁহাকে নামাইয়া দিয়া, একটি মৃগশাবক ধরিয়া তাহার ক্রোড়ে দিয়া, সঙ্গে করিয়া বনের বাহিরে দিয়া আসিল। মায়া দ্রুতগতি বাটীর দিগে ধাবিতা হইল।

বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকারা মনে করিতে পারেন, হিন্দুকুমারীর স্বেচ্ছাচার, বনবিহার, একাকিনী ভ্রমণ সম বয়সিনী ও সম বয়সি লইয়া ঝুলানী খেলন, ইহা সম্ভব পর নহে! গ্রন্থকার ৭২৮ খৃষ্টাব্দের ক্ষত্রিয় রমণীর কথা লিখিতেছেন, স্মতরাং তিনি ক্ষমার্হ। যদি ক্ষমা না করেন তবে, চাঁদ কবির কবিতা, এবং রাজবারা প্রদেশের সাধারণ প্রাচীন গাথা পাঠ করিবেন। টডের রাজস্থান, মরিসের হিন্দু স্থান, ও নারায়ণ স্মফী অরঙ্গাবাদীর চিতোর রাজ বংশাবলী প্রভৃতি গ্রন্থেও, এবিষয়ের বিস্তর উল্লেখ আছে।

শ্রীউঃ—

বউ কথা কও।*

অনুকরণ।

"মানিনী তোমার বউ কথা নাহি কয়?
তাই পাখি কেঁদে কেঁদে সাধিছ তাহায়?
বার বার শতবার কর অনুনয়,
তবুও তোমার প্রিয়া ফিরে নাহি চায়?
জগৎ কাঁদিছে পাখী তোমায় শুনিয়া।
বড়ই নিষ্ঠুরা বুঝি তোমার সে পিয়া?"

মাইকেল।

এত আকুলতা কেন ওহে খগবর?
করেছে করেছে মান কিভয় তোমার?
তুমিও কর না মান মানের উপর।
মান কোরে মান ভাঙ্গা চির ব্যবহার॥

ছি ছি পাখী তব চিত্ত বড়ই কোমল।
না পার করিতে মান প্রণয়িনী সনে?
প্রণয় উচ্ছাসে তব হৃদয় বিকল?
'প্রিয়া প্রিয়া' বিনা আর কিছু নাহি মনে?

"আ আরে বউ
বিনাইয়ে নানা ছাঁদে, পতি পায় পড়ি কাঁদে
শতধারে আহা তার চোখে পড়ে লউ।
তবুও না ভাঙ্গে মান আরও করে অপমান
তুমিত নিঠুরা বড় আ আলো বউ॥

দুষ্টের নিকটে জব্দ শিষ্টে পেলে কর স্তব্ধ
কারো কাছে বিষ তুমি কারো কাছে মউ
রূপগর্ব্বে মটমট সদা চাও কটমট
প্রণাম তোমার পায় আ আলো বউ॥

* কয়েক দিন হইল ভূতপূর্ব্ব বঙ্গ-কবিদের পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কাশীদাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতি অনেক কবি উপস্থিত ছিলেন। কবিতার বিষয় ছিল—"বউ কথা কও।"

শাশুড়ী ননদী যারা। ভয়ে জড় সড় তারা
বাঘিনীর মত তুমি রাঙ্গাচোখো চাউ।
ওগো দেবী মহামায়া দিও দাসে পদছায়া
আর জন্মে হই যেন গরবিণী * বউ ॥'
ভারতচন্দ্র।'

* "গাউনপরা" ইতি পাঠান্তর।

প্রাচীন ভারত।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

সতীদাহ।

পরবর্ত্তী ঋষিগণ ও সংহিতা সকলের টীকাকারগণ বিধবার যত কঠোর ব্রত নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, অতি প্রাচীন ঋষিগণ তত নহেন। প্রাচীন ঋষিগণের ব্যবস্থায় সতীদাহ ব্যবস্থিত হয় নাই—ইহার বিন্দু বিসর্গও তাঁহারা জানিতেন কি না সন্দেহ। বোধ হয় এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য মন্বাদি শাস্ত্রকারগণের মনে ভ্রমেও উদিত হয় নাই। তাহা হইলে এবিষয়ে তাঁহারা কখন কিছুই না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না; কিন্তু পরবর্ত্তী প্রায় সকল ঋষিই সতীদাহের প্রাধান্য মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ইহার আদি কোথায়? কোন্ সময় হইতে এই নিষ্ঠুর প্রথা ভারতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে? দেখি অতি প্রাচীনতম গ্রন্থে ইহার কোন আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না? প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিলেই ঋগ্বেদ আমাদের মনে সর্ব্ব-প্রথমে সমুদিত হয়; এক্ষণে দেখা যাউক ঋগ্বেদে ইহার কোন উল্লেখ আছে কি না? আমরা উক্ত বেদে একটি শ্লোক দেখিতে পাই—তাহা এই;—

ইমা নারীরবিধবা সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সম্ম্শন্তাং।
অনশ্রবো অনমীবা সুখেবা আরোহন্তুজনয়ো যোনিমগ্রে ॥

ঋগ্বেদে। ১০ মণ্ডল, ১৮ ঋক ॥

অর্থাৎ "অবিধবা স্ত্রী, যাহার মনোমত স্বামী আছে, তিনি চক্ষে অঞ্জন লেপন করিয়া, শুষ্ক চক্ষে, অপীড়িতা এবং শ্রদ্ধান্বিতা হইয়া অগ্রে গৃহে প্রবেশ করুন।" এই শ্লোকটি পরবর্ত্তী কালে অতিশয় বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং ইহার অর্থও সম্পূর্ণ রূপে বিভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই বিপর্য্যস্ত শ্লোক দর্শন করিয়াই পরবর্ত্তী ঋষিগণ সতীদাহের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন; ইহার কি প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য আমরা নিম্নে সেই পরিবর্ত্তিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিলাম;—

ইমানারীরবিধবাঃ সপত্নীরঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু।
অনস্বরোঽনমীবা সুরত্না আরোহন্তু জলযোনিমগ্নে ॥

রঘুনন্দনোদ্ধৃত পাঠ।

কোলব্রুক সাহেব আবার এই শ্লোক বি-

ভিন্ন, আকৃতিতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; তাহা এই ;—

ইমানারীর্‌অবিধবাঃ সুপত্নীর্‌ অঞ্জনেন সর্পিষা। সংবিশন্তু বিভাবসুং।
অনসরোনারিরা সুরত্না আরোহন্তু জল যোনিম্‌ অগ্নে ॥

তিনি ইহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন "স্ত্রীলোক যাহাতে বিধবা না হন, এই জন্য সাধ্বী স্ত্রী অঞ্জন গ্রহণ ও ঘৃত মাখিয়া অগ্নিতে আসিবার উদ্যোগ করিবেন ; নশ্বর, অপুত্রবতী, এবং বিধবা না হইবার জন্য উত্তম রত্নাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া তাঁহাকে অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিতে দাও—যাহার আদি জল।"

এক্ষণে যত কিছু গোলযোগ কেবল মাত্র একটি শব্দের বিপর্য্যয় ও অন্য একটি শব্দের দ্ব্যর্থ জন্য হইতেছে। "অগ্রে" এই শব্দটি স্থানে অগ্নে হইয়াছে ; এবং অবিধবা শব্দের অর্থ "যাঁহারা বিধবা নহেন," আবার পরবর্ত্তী ঋষিগণ ইহার অর্থ "যাহাতে বিধবা না হন" এইরূপ করিয়াছেন। এই দুইটি শব্দের জন্যই এত গোলযোগ। কিন্তু শ্লোকটি আমরা সর্ব্ব-প্রথমে যেরূপ উদ্ধৃত করিয়াছি—সেইরূপই যে ছিল, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই—কেননা ভরদ্বাজ, বৌধায়ন প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণ উহার যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে উহাই স্পষ্ট উপলব্ধি হয় ; তাঁহারা ঐ শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, "মৃত্যুর দশম দিবস পরে, মৃত ব্যক্তির জ্ঞাতিগণ, নগরের প্রান্ত দেশে একত্রিত হইয়া, বিধি পূর্ব্বক অগ্নি পূজা করিবেন—পরে তাহার নিকট আত্মীয়গণ উক্ত শ্লোক উচ্চারণ করিয়া রমণীগণকে অঞ্জন ইত্যাদি ধারণ করিতে অনুজ্ঞা করিয়া গৃহে লইয়া যাইবেন।" বাস্তবিক ঋগ্বেদের সময়ে ইহার এই প্রকারই অর্থ ছিল ; বৈদিক সময়ের পরেও এই প্রথার প্রচলন হয় নাই ; কেন না ভগবান্‌ মনু এই নিষ্ঠুর প্রথার কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই ; তাঁহার সময়ে এই বিষম প্রথা প্রবর্ত্তিত থাকিলে তিনি কখনই তদুল্লেখে ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না। পরবর্ত্তী কালে উক্ত শ্লোকের ঐ প্রকার বিপর্য্যয় জন্য অর্থের ব্যতিক্রম হওয়ায়, সেই বিপর্য্যস্ত শ্লোকের প্রাধান্যে কত শত রমণী অকালে প্রজ্বলিত চিতায় আত্ম সমর্পণ করিয়া তৎকালে সতীত্বের একশেষ দেখাইয়া গিয়াছেন! যদিও এ প্রথা অতীব ঘৃণনীয় তথাপি অন্য কোন্‌ দেশীয়া যুবতী একাল পর্য্যন্ত সতীত্বের এ প্রকার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে সমর্থা হইয়াছেন,—কোন্‌ দেশে স্ত্রী, স্বামীর সহিত চিরস্বর্গবাস করিবার জন্য অবলীলাক্রমে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় দেহ সমর্পণ করিয়া জীবিত দগ্ধ হইয়াছেন? ধন্য ভারত-ললনাকুল! তোমরাই সতীর অগ্রগণ্যা ; তোমাদের নিকট হইতেই আধুনিক সুসভ্য অন্যান্য রমণীকুল সতীত্বের বিমল সুখের আভাস প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন ; তোমাদের এই বিমল কীর্ত্তিস্তম্ভ চিরকালের তরে বিশুদ্ধ সুবর্ণ অক্ষরে উজ্জ্বল হীরক-আভায় বিভূষিত হইয়া জগতিস্থ সমুদায় ললনা-

গণের অন্তরে সতীত্বের অসাধারণ গুণ নিহিত করিবে এবং তাহা হইতেই তাঁহারা সতীর কার্য্য শিক্ষা করিবেন। অধুনাতন নবীনা সম্প্রদায়ও গতজীবিতা আর্য্য রমণীগণের কথঞ্চিৎ পদানুসরণ করিয়াই এক্ষণে সতীর প্রধান বলিয়া কীর্ত্তিত; ভরসা করি এই সুনাম তাঁহারা চিরকাল মস্তকে বহন করিবেন এবং তাঁহাদের এই সুযশোবার্ত্তা সমীরণপথে খেলিতে খেলিতে সকলেরই কর্ণকুহরে চিরকাল অমৃত ঢালিবে।

ঋগ্বেদের সময়ে সতীদাহ আর্য্যসমাজে প্রচলিত ছিল না তাহা দেখিয়াছি; পরে দুইটি শব্দের গোলযোগ হওয়ায় যত কিছু অনিষ্ট ঘটিয়াছে; পণ্ডিতবর কাউয়েল (Cowell) সাহেব ও এই কথা বলেন। * মহর্ষি মনু নিজ সংহিতায় এ প্রথার কিছু মাত্র উল্লেখ করেন নাই; † তিনিই সর্ব্ব প্রাচীন সংহিতাকার; তিনি স্বামীর মৃ-

* But the careful editing of the text by European scholarships has disclosed the fact that no such authority exists in the original text. The Sanskrit runs simply thus :—"May these women who are not widows, who have good husbands, who are mothers, enter with *unguents* and clarified butter ; without tears, without sorrow, let them first go up into the dwelling." It is these last words, "*arohantu yonim agre*," which have been altered into the fatal variant "*arohantu yonim agneh*," "let them go up into the place of fire ;" but there is no authority whatever for this reading. The verse, in fact, is not addressed to widows at all. A succeeding verse in the same hymn, which was addressed to the widow at the funeral, expressly bids her "to rise up and come to the world of living beings," and the ceremonial *Sutras* direct that she is then to be taken home.

Prof. E. B. Cowells's Foot note to Elphinstone's History of India P. 50.

† It is singular that the practice of self-immolation by fire, which is stated by Mr Colebrooke (Transactions of the Royal As. Society. Vol. I. P. 458) to have been authorised by the Vedas, and is related by the ancients to have been practised by Calanus, is nowhere mentioned in the code.

Mr Colebrooke in As. Rs Vol. IV. P. 213. quoted from modern Hindu works the verse of a Vedic hymn which has been supposed to authorise *Sati* ; it is found in the second hymn of the second *anuvaka* of the tenth *mandala* of the Rigveda.

ত্যুর পর স্ত্রীর কর্ত্তব্য কার্য্য সম্বন্ধে কেবল এই বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন যে, “পবিত্র পুষ্প ও ফল মূলাদি ভক্ষণ করিয়া সাধ্বী আপনার দেহ ক্লশ করিবেন— অন্যপুরুষের নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিবেন না;” রামায়ণের সময়েও এপ্রথা স্থান প্রাপ্ত হয় নাই—কেন না সমগ্র রামায়ণে ইহার একটিও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে না; মহাভারতের সময় হইতেই ইহার প্রারম্ভকাল ধরিতে হইবে—কেন না মহাভারতেই ইহার প্রথম দৃষ্টান্ত সন্দর্শন করি; পাণ্ডু মহিষী মাদ্রি স্বামী সঙ্গে চিতারোহণ করিয়াছিলেন। সহগমনের এই প্রথম প্রামাণিক দৃষ্টান্ত; ইহার পূর্ব্বে ইহার কোন ব্যবস্থাই প্রকটিত হয় নাই বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু পরবর্ত্তী কালে যখন তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে সমাজে অনেক রমণী এই রূপে স্বামী সঙ্গে চিরকাল স্বর্গবাস জন্য জ্বলন্ত চিতায় আত্ম সমর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হইল তখন আর তৎসম্বন্ধে বিধি ব্যবস্থা না হইলে চলে না; তাই পরবর্ত্তী সংহিতাকারগণ উক্ত প্রথার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। মাদ্রিই প্রথম সতী; এবং তিনি যে পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন জন্যই জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয়। এপ্রথা যতই কেন দূষণীয় ও নিষ্ঠুর হউক না, প্রথমে যাঁহারা ইহার পথ প্রদর্শন করেন তাঁহারা যে, পরকালে স্বামীসহ চিরস্বর্গবাসের জন্য এরূপ করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এবং ইহা যে সুন্দরী ভারতললনার অসামান্য পতিপরায়ণতার জ্বলন্ত নিদর্শন, তাহাতেও অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মহর্ষি মনু ভিন্ন যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস, বিষ্ণু, দক্ষ প্রভৃতি সকল পরবর্ত্তী স্মৃতিকারগণই সহমরণ প্রথার অনুমোদন ও নানাগুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। দক্ষ বলিয়াছেন ‘সর্পগ্রাহী ব্যাধ যেমন, বল পূর্ব্বক বিবর হইতে সর্পকে উত্তোলন করে, সহমৃতা নারীও সেইরূপ আপনার স্বামীকে উদ্ধার করিয়া তাহার সহিত স্বর্গে চিরকাল সুখে বসবাস করে।’

তিস্রঃ কোট্যাহর্দ্ধ কোটিচ যানি রোমাণি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে, ভর্ত্তারং যোনুগচ্ছতি ॥

মনুষ্য শরীরে যে সার্দ্ধ তিনকোটি রোম আছে, যে স্ত্রী স্বামীর সহমৃতা হয়, সে তত বৎসর স্বর্গে বাস করে। এই রূপে অনেকেই ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সতীদাহ প্রথা সেকেন্দরের ভারতাক্রমণের সময় অতি দেশব্যাপী হইয়া উঠিয়াছিল; এবং মহানির্ব্বাণতন্ত্র প্রণয়নের সময় ইহা সমাজের মহানিষ্টকর ও কুফলদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল, তাই উক্ত তন্ত্রে ইহা অতি ঘৃণিত ও ভয়ানক পাপকর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; ইহাতে লিখিত হইয়াছে

পঞ্চবর্ষাধিকান্ মর্ত্ত্যান্ দাহয়েৎ পিতৃকাননে।
ভর্ত্রা সহকুলেশানি ন দহেৎ কুলকামিনীং।
তব স্বরূপা রমণী জগত্যাচ্ছন্নবিগ্রহা।
মোহাদ্ভর্ত্তৃশ্চিতারোহাৎভবেন্নরকগামিনীং
মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৯ অধ্যায় ৭৯। ৮০ শ্লোক।

সতীদাহের বিরুদ্ধে এই সকল উপদেশ বাক্য দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে, উহা সময়ে সমাজের অতিশয় অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল, তাই বহু পরবর্ত্তি ঋষিগণ বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু উহা পবিত্রা ভারত ললনাগণের ধর্ম্মভাবপূর্ণ হৃদয়-মন্দিরে এরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, মহা পরাক্রমশালী ব্রিটিশ সিংহও তাহা সহজে নিবারিত করিতে পারেন নাই; তাঁহাকে এজন্য বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে।

যাহা হউক পূর্ব্বতন স্ত্রীসমাজ সম্বন্ধে স্মৃতিকার ও অন্যান্য ঋষিগণের উপরিধৃত বর্ণনার পর, আর আমাদের মন্তব্য দিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। উহাতেই জলন্ত ফটোগ্রাফির ন্যায় পূর্ব্বকার স্ত্রী চরিত্র সুন্দর রূপে চিত্রিত হইয়াছে; তবে এই মাত্র বলি যে, তাঁহারা যে স্ত্রীলোকের যেরূপ চিত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা অতীব রমণীয়। উপরে সবিস্তারে যাহা বর্ণনা করা গিয়াছে, তাহার সার সংগ্রহ করিয়া এই স্থলেই এই প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম। প্রাচীন কালে পুত্র ও কন্যায় কিছু মাত্র প্রভেদ ছিল না। পুত্রকে যে প্রকারে বিদ্যাভ্যাস করান হইত, কন্যাকেও তদ্রূপ শিখাইবার নিয়ম ছিল; অতি প্রাচীন কালে যদিও বিবাহের কোন বিশেষ নিয়ম ছিল না, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে পিতাই উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতেন, উপযুক্ত পাত্র না হইলে সম্প্রদাতার পাপ সঞ্চয় করা হইত; আবার কন্যাগণ কখন কখন স্বেচ্ছাগত বিবাহও করিতেন। স্ত্রী গৃহকার্য্য সমুদয়ই সম্পন্ন করিতেন। তদ্ব্যতীত তাঁহাকে সংসারের আয় ব্যয় হিসাব ও তাহা হইতেই ধনসঞ্চয় করিতে হইত, তাঁহাদের কি ধর্ম্মকার্য্য, কি উৎসব, কি সমাজ কিছুতেই স্বাধীনতা ছিল না; স্বামীর শুশ্রূষাই তাঁহাদের সারব্রত মধ্যে গণ্য ছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর পর পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যে জীবনাতিবাহিত করাই সারধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; কিম্বা স্বামীর প্রজ্বলিত চিতায় জীবিত দগ্ধহইতেন সামান্যতঃ এই সকলই তখনকার রমণীগণের করণীয় ছিল।

ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, তদানীন্তন আর্য্য রমণীগণ কখনও সভ্য জাতীয়া স্ত্রী হইতে কিছুতেই নিম্ন পদস্থা থাকেন নাই, প্রত্যুত উন্নতা ছিলেন; এপর্য্যন্ত কোন সভ্যজাতীয়া রমণীই এরূপ পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাই বলি ধন্য ভারত; যিনি এরূপ সদ্‌গুণশালী রমণীরত্নচয় প্রসব করিয়াছেন;—এপর্য্যন্ত অন্য কোন রমণীই তাঁহাদের সমকক্ষা হইতে পারিলেন না—কখন হইবেন এ আশা নাই, আশা করা যাইতে পারে না। তাই পুনরায় বলি ধন্য ভারত, ধন্য ভারত ললনাকুল; অধুনাতন আর্য্য রমণীগণ যদিও স্বর্গস্থিতা, অকলঙ্কা জগৎশুদ্ধকারিণী সেই পূর্ব্বতন আর্য্যরমণীগণের সমতুল্যা নহেন, তত্রাপি পৃথিবীস্থ অন্য কোন্ জাতীয়া রমণী এক্ষণও তাঁহাদের সহিত তুলনায় আসিতে পারেন? এক্ষণেও তাঁহারা

পবিত্রতায় 'সমকক্ষবিহীনা,' ইহা আধুনিক ভারতের সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে। আর নবীনা ভারত ললনা গণেরও সামান্য আহ্লাদ ও গৌরবের বিষয় নহে। তাইবলি ধন্য ভারত ললনাকুল! আর আমরাও এমন পবিত্রা রমণীর সহিত একত্রে বাস করিতেছি, তাহাও আমাদিগের সামান্য গৌরবের কথা নহে। আমরাও আমাদের গৌরব করিবার অন্য কিছু নাথাকিলেও কেবল এই জন্যই আপনাদিগকে মহা গৌরবান্বিত জ্ঞান করি। আশা করি ইহারা চিরকালই এইরূপ রমণীকুলের শীর্ষস্থানীয়া থাকুন; ইহাদের হইতেই যেন সকল জাতীয়া সকল রমণী আপনাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্ব্বাচন করিয়া লন।

ইতি প্রথম প্রস্তাব।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

জাতিভেদ।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের আলোচ্য প্রশ্ন সমূহের মধ্যে জাতিভেদসম্পর্কেই সর্ব্বাধিক আন্দোলন হইয়াছে। হিন্দু রীতি নীতির মধ্যে ইহাই বিদেশীয়ের চক্ষু অধিকতর আকর্ষণ করিয়াছে। পর্টুগিজগণ যখন এদেশে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহারা জাতিভেদ সংসৃষ্ট অপূর্ব্ব ও বিস্ময়জনক আচার ব্যবহার নিরীক্ষণ করিয়া ইহার Casta আখ্যা প্রদান করেন। তদবধি Caste system নামক একটা কথা ইউরোপ ও আমেরিকার ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে। অসভ্য ফিউজিয়ান হইতে সুসভ্য আমেরিক পর্য্যন্ত প্রত্যেক সমাজেই শ্রেণী বিভাগ পরিলক্ষিত হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় জাতিভেদ প্রথা বিদেশীয়ের চিত্তে যেরূপ কৌতূহল জন্মাইয়াছে, এত আর কিছুই নহে। মিগাস্থিনিশ, এরিয়ান, ষ্ট্রাবো প্রভৃতি পুরাতন লেখকগণ ভারতবর্ষীয় জাতিভেদের উল্লেখ করিয়াছেন, ও তৎসম্পর্কে অনেক হাস্যজনক কথা বলিয়াছেন। আধুনিক ইউরোপীয় লেখকগণও ভারতবর্ষীয় রীতি নীতির বিষয় লিখিতে যাইয়া প্রথমেই জাতি ভেদের কথা উল্লেখ করেন। জেম্স্ ষ্টুয়ার্ট মিল ইহার অভ্যন্তরে অসভ্যতা ও ভণ্ডামী বই আর কিছুই দেখিতে পান নাই। মুইর, উইলশন প্রভৃতি লেখকগণ গালাগালির দিকে না যাইয়া এতৎসম্পর্কে ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হাণ্টার, মোক্ষমূলর প্রভৃতি লেখকগণ ইহার মধ্যেও প্রশংসা করিবার অনেক সামগ্রী দেখিতে পাইয়াছেন।

আধুনিক দেশীয় লেখকদিগের মধ্যেও এবিষয় নিয়া আজিকালি বড় আন্দোলন যাইতেছে। এক পক্ষ জাতিভেদের ঘোর-

তর বিরোধী এবং সমূলে ইহার উচ্ছেদ সাধন করিতে ইচ্ছুক। অপর পক্ষ ইহার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী এবং ইহাকে সর্ব্বাবয়বে বজায় রাখিতে যত্নবান। যাঁহারা সমূলোৎপাটনে ইচ্ছুক, তাঁহারা ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে সহায় করিয়া লইতেছেন। যাহারা সর্ব্বাবয়বে বজায় রাখিতে যত্নবান, তাঁহারা অনুকূল স্থলে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন, প্রতিকূল স্থলে নূতন বিজ্ঞান প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন। কিন্তু উভয় পক্ষই অনেকটা দিশেহারার ন্যায় বাদানুবাদ করিতেছেন। কি যে আক্রমণ করিতে হইবে, আর কি যে সমর্থন করিতে হইবে, এবিষয়ে তাঁহাদের স্পষ্ট ধারণা নাই ; সুতরাং কোন মীমাংসায় পৌঁছা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব।

যাঁহারা জাতি ভেদ আক্রমণ করিতেছেন, তাঁহাদের লক্ষ্য কি, অধিকতর স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত। তাঁহাদের অনেকে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন যাহা হইতে অনুমান হয় যে, সমাজে কোন প্রকার শ্রেণী বিভাগ তাঁহারা অনুমোদন করেন না। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তবে ইহাঁরা সমগ্র পৃথিবীর শ্রেণী বিভাগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান,—শুধু ভারতবর্ষীয় জাতি ভেদের বিরুদ্ধে নহে। কিন্তু এইরূপ অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা শ্রেণী বিভাগের আবশ্যকতা স্বীকার করেন, অথচ ভারতবর্ষীয় জাতিভেদ অনুমোদন করেন না। ইহাঁদের কর্ত্তব্য, শ্রেণী বিভাগ ও ভারতবর্ষীয় জাতিভেদে কি কি বিষয়ে পার্থক্য, স্পষ্ট করিয়া তাহা প্রদর্শন করেন। এ বিষয়টি অস্পষ্ট রাখায় ফল এই হইয়াছে যে, যখন তাঁহারা ভারতবর্ষীয় জাতি ভেদের উপর আক্রমণ করেন, তখন অন্যে মনে করে যে তাঁহারা শ্রেণী বিভাগের উপর আক্রমণ করিতেছেন ; এবং এই শেষোক্ত ব্যক্তিরা শ্রেণী বিভাগের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াই নিশ্চিন্ত হন যে প্রতিপক্ষকে যথেষ্ট জব্দ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, যাঁহারা জাতি ভেদ সমর্থন করিতেছেন, তাঁহাদেরও স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত, তাঁহাদের লক্ষ্য কি ? শুধু শ্রেণী বিভাগ সমর্থনই কি তাঁহাদের উদ্দেশ্য ? না, ভারতবর্ষীয় জাতি-ভেদ-প্রথায় শ্রেণী বিভাগ ব্যতীত আরও যে সমস্ত রীতি নীতি বুঝায়, তৎসমূহের সমর্থনও তাঁহাদের উদ্দেশ্য ? অপিচ, ভারতবর্ষীয় জাতি-ভেদ প্রথা বহু রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। মনুসংহিতার জাতিভেদে আর বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজের জাতিভেদে বহু বিষয়ে প্রভেদ লক্ষিত হয়। মনুসংহিতার জাতি ভেদের প্রধান লক্ষণ এই যে (১) দ্বিজ বর্ণত্রয়ের শিক্ষা বিষয়ে যে অধিকার ছিল, শূদ্রের সে অধিকার ছিল না। (২) বর্ণানুসারে অপরাধীর দণ্ড বিধান হইত। (৩) উচ্চবর্ণের পুরুষ নিম্ন বর্ণের কন্যা বিবাহ করিতে পারিত, কিন্তু নিম্ন বর্ণের পুরুষ উচ্চ বর্ণের কন্যা বিবাহ করিতে পারিত না। (৪) এক জাতীর পক্ষে অপর জাতির বৃত্তি অবলম্বন করিতে স্বাধীনতা ছিল না। (৫) যদিও ম্লেচ্ছান্ন ভোজন সর্ব্বথা নিষিদ্ধ ছিল, তথাপি উচ্চ বর্ণ নিম্ন বর্ণের পক্কান্ন কিম্বা স্পৃষ্টান্ন ভোজন করিলে

জাতিচ্যুত হইত না। (৬) নিম্নবর্ণের উচ্চবর্ণে উন্নমিত হইবার অধিকার ছিল না। বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজের জাতিভেদ প্রথার প্রধান লক্ষণ এই যে (১) দ্বিজ ও শূদ্র শিক্ষাবিষয়ে সমান অধিকারী। (২) বর্ণানুসারে অপরাধীর দণ্ডবিধান হয় না। (৩) একবর্ণের ব্যক্তি অপর বর্ণে বিবাহ করিতে পারে না। (৪) এক জাতি অপর জাতির বৃত্তি অবলম্বন করিতে পায় না। (৫) উচ্চ বর্ণ নিম্নবর্ণের পক্কান্ন কিংবা স্পৃষ্টান্ন ভোজন করিলে জাতিচ্যুত হয়। (৬) নিম্নবর্ণের উচ্চবর্ণে উন্নমিত হইবার অধিকার নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মনুসংহিতার জাতিভেদের যে ছয়টি লক্ষণ উপরে নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজে তাহার দুইটি মাত্র বিদ্যমান আছে, আর সকল গুলিরই ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এই ব্যতিক্রমের কতক বৈদেশিক শাসনের ফল, যথা শিক্ষায় সমানাধিকার ও দণ্ডে বর্ণবিচার রাহিত্য; এবং কতক সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থার ফল, যথা অনুলোমবিবাহে, ও নিম্নবর্ণের স্পৃষ্টান্ন ভোজনে, জাতিচ্যুতি। যাহারা জাতিভেদ সমর্থন করেন, তাঁহারা ঝাকের উপর ঢেলা না মারিয়া যদি স্পষ্ট করিয়া বলেন কোন্ লক্ষণগুলির তাঁহারা সমর্থন করেন, এবং কোন্ গুলির সমর্থন করেন না, তাহা হইলে তাঁহাদের সঙ্গে তর্ক করিতে প্রতিপক্ষগণের অনেকটা সুবিধা হয়। ইষু ধার্য্য না করিয়া জটিল মোকদ্দমার বিচার নিস্পত্তি হওয়া কখনও সম্ভব নহে। সুতরাং নিম্নলিখিত বিচার্য্য বিষয়ে সমর্থনকারিদের কি মত, তাঁহাদের স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত।

১। আমাদের সমাজের এক্ষণে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহা বিপর্য্যস্ত করিয়া মনুসংহিতার প্রণালীতে সমাজের পুনর্গঠন করা উচিত কি না?

২। শিক্ষায় ও অপরাধীর দণ্ডে বর্ণবিচার, অনুলোম-বিবাহ, নিম্নবর্ণের স্পৃষ্টান্নভোজনে জাতিরক্ষা, বৃত্ত্যন্তর পরিগ্রহনিষেধ, মনুর সময়ে সুনীতি না কুনীতি ছিল?

৩। যদি সুনীতি হইয়া থাকে, তবে উহাদের যে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, তাহা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক না অমঙ্গলজনক হইয়াছে?

৪। ঐ সকল্ রীতি সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী কি না?

৫। যদি উপযোগী হয়, তবে উহাদিগকে পুনঃপ্রচলন করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত কি না? এবং যে রীতি প্রচলিত আছে, তাহার ব্যত্যয় আবশ্যক কি না; আবশ্যক হইলে ব্যত্যয় করা যায় কি না?

৬। যতদূর ব্যত্যয় ঘটিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট, আর যেন না ঘটে, ইহাই তাহাদের অভিপ্রায় কি না?

৭। পুরাতন রীতিসমূহ যেন পুনঃ প্রচলিত হইতে পারে, এই ভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের চেষ্টা করা উচিত, না সমাজের যে অবস্থা আছে; তদুপযোগী রীতি প্রচলনের চেষ্টা করা উচিত?

৮। যদি কেহ বলে যে, জাতিভেদের

সকলই ভাল, কেবল শিক্ষায়,দণ্ডে, বিবাহে ও ভোজনে বর্ণবৈষম্য অন্যায় ও পরিহার্য্য, তবে তাঁহার বিরুদ্ধে তাঁহাদের কোন কথা বলিবার আছে কি না?

যে পর্য্যন্ত এই সকল প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর না পাওয়া যাইবে, সে পর্য্যন্ত জাতিভেদ সম্পর্কে উভয় পক্ষ কোন মীমাংসায় পৌঁছিতে পারিবেন না।

আমরা দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, সমর্থনকারিগণ অনেক সময় তাঁহাদের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য অসৎপথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহারা জাতিভেদ সমর্থন করিতেছেন বলিয়া প্রথমে স্পষ্টতঃ কিংবা ভাবতঃ পাঠকের নিকট বিজ্ঞাপন দেন। অবশেষে জাতিভেদ সংসৃষ্ট দুইটি কি একটি মাত্র আচারের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হন। যে সকল আচারের অনুমোদন করিতে তাহারা অক্ষম, সে গুলিকে অননুমোদনীয় কিংবা সে গুলির অনুমোদন তাঁহাদের বুদ্ধি ও ক্ষমতার অতীত বলিয়া স্বীকার করিতে তাঁহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি হয় না; তাই তাঁহারা উহাদিগকে চাপা দিয়া রাখিয়া যান। অসাবধান পাঠক, ইহাতে সহজেই প্রতারিত হইয়া, মনে করে যে, জাতিভেদের সর্ব্বাঙ্গীন সমর্থন হইয়াছে। আমরা এইরূপ চতুরতাকে অসাধুতা না বলিয়া থাকিতে পারি না। লেখক যদি বিচারকের উচ্চ আসন পরিত্যাগ করিয়া উকীলের নিম্ন আসন পরিগ্রহ করেন, তবে তাঁহার কথায় কখনও শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না। দোকানদার যেমন ক্রেতার নিকট জিনিষের এবং কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা যেমন বরপক্ষীয়ের নিকট কন্যার নির্দ্দোষাংশ মাত্র প্রদর্শন করিয়া সদোষাংশটুকু ঢাকিয়া রাখিতে যত্নশীল হন, অনেক লেখক সেইরূপ কোন তর্কিত বিষয়ের যে টুকু সযৌক্তিক সেইটুকুই মাত্র পাঠকের নিকট উপস্থাপন করিয়া অযৌক্তিক অংশটুকু গলাবাজীদ্বারা ছাপাইয়া রাখিতে চেষ্টা পান। সাহিত্যক্ষেত্রে এইরূপ দোকানদারী বড়ই দোষাবহ ও অনিষ্টজনক। আমরা এখানে দুইটি মাত্র উদাহরণ দিয়া ক্ষান্ত হইব। বর্ত্তমান চৈত্র মাসের নবজীবনে 'জাতি' নামক একটি প্রবন্ধে লেখক জাতিভেদের সমর্থন করিয়াছেন। এইরূপ অসার, বাচালতাপূর্ণ, শিক্ষার বিকৃত অভিনয়যুক্ত প্রবন্ধ নবজীবনের ন্যায় পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে দেখিয়া বস্তুতঃই দুঃখিত হইয়াছি। প্রবন্ধের মূল যুক্তি বিষয়ে আমরা এস্থলে কিছুই বলিব না। কিন্তু সেই যুক্তিদ্বারা ভিন্ন জাতিতে বিবাহ-নিষেধ ব্যতীত জাতিভেদ সংসৃষ্ট অন্য আচার সমূহের কিপ্রকার সমর্থন হয়, লেখক তাহা প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, সেই সকল আচারসমূহে যে কাহারও আপত্তি আছে, ইহাও তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। অথচ তিনি অশিক্ষিত পাঠককে (কারণ শিক্ষিত পাঠকের জন্য অবশ্যই এই প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই) বুঝিতে দিয়াছেন, এবং সম্ভবতঃ নিজেও মনে করিয়াছেন যে, জাতিভেদ প্রথার যথেষ্ট সমর্থন হইয়াছে। উক্ত সংখ্যক নবজীবনে এই

একই বিষয়ে "শক্তিতন্ত্র কেবল বৈষম্য" নামে আর একটি অতি উপাদেয় সারগর্ভ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। লেখক ইহাতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সামাজিক সুখদুঃখের সাম্যসম্পাদনের নিমিত্ত এক জাতির পক্ষে ভিন্ন জাতীয় বৃত্তি পরিগ্রহ নিষেধ অতি সাধু ব্যবস্থা। এবং এই পর্য্যন্ত প্রমাণ করিয়াই তিনি ভঙ্গিক্রমে পাঠককে বুঝিতে দিয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় জাতিভেদ প্রথা অতি উৎকৃষ্ট সামাজিক নিয়ম। ভিন্ন জাতির বৃত্তিপরিগ্রহনিষেধ ভিন্ন ভারতবর্ষীয় জাতিভেদে যে আরও বহু আচার ব্যবহার বুঝায়, তাহা তিনি পাঠকের নিকট খুলিয়া বলা আবশ্যক বা সঙ্গত মনে করেন নাই। তিনি জাতিভেদ সংসৃষ্ট ঐ একটি মাত্র আচারেরই সমর্থন করিবেন, যদি ইহা স্পষ্ট বলিয়া লইতেন, তবে তাঁহার প্রতি কাহারও অশ্রদ্ধা হইত না। কিন্তু তিনি বিলক্ষণ জানেন যে ঐরূপ স্পষ্ট করিয়া না বলিলে অসাবধান পাঠক তাঁহাকে জাতি ভেদের সর্ব্বাঙ্গীন সমর্থনকারী বলিয়া বুঝিয়া লইবে; সুতরাং ন্যায়পরতার অনুরোধে তাঁহার বলা উচিত ছিল তিনি কোন্ কোন্ আচারের অনুমোদন করেন, কোন্ কোন্ আচারের অনুমোদন করেন না।

অনেকে হয়ত বলিবেন যে জাতিভেদের মূলনীতি সমর্থন করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য, উহার চতুর্দ্দিগে যে সকল আচার জড়িত হইয়াছে, তাহার সকল গুলির সমর্থন করা উদ্দেশ্য নহে। ইহার উত্তর এই যে জাতিভেদের মূলনীতি লইয়া কেহ তর্ক করে না। জাতিভেদের মূলনীতি যদি কিছু থাকে, তবে তাহা শ্রেণী বিভাগ। সমাজে শ্রেণী বিভাগের আবশ্যকতা লইয়া কে কবে আপত্তি করিয়াছে? যদি দুই এক ব্যক্তি বা করিয়াই থাকে, তাঁহার উত্তর দিবার জন্য সমস্ত পৃথিবীই রহিয়াছে। এই শ্রেণীবিভাগের চতুর্দ্দিকে যে সকল আচার জড়িত হইয়াছে, তাহা লইয়াই প্রকৃত বিবাদ। আক্রমণকারীরা যদিও অসাবধনতা বশতঃ এই দুই এর মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য করিয়া লন নাই, তথাপি ঐ সমস্ত আচারই যে তাঁহাদের আক্রমণের লক্ষ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐ সমস্ত আচার রহিত হইলে, জাতিভেদের যাহা কিছু থাকিবে, তাহাতে কাহারই কোন আপত্তি থাকা সম্ভব নহে। আক্রমণকারীরা বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। কেহ উহার একটি আচার অনুমোদন করেন, কেহ বা আর একটি আচারের অনুমোদন করেন, কেহবা একাধিক আচারের অনুমোদন করিয়া থাকেন। কাহারও মত এই যে সমাজে শ্রেণীবিভাগ থাকা শুধু আবশ্যক নহে, উহা স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য, কিন্তু শ্রেণীবিভাগ বংশ-গত না হইয়া কার্য্যগত হওয়া উচিত। যাঁহারা বংশগত শ্রেণীবিভাগ অনুমোদন করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকের এইরূপ মত যে একজাতিকে অপর জাতির বৃত্তি অবলম্বন করিতে স্বাধীনতা দেওয়া গর্হিত, কিন্তু এক জাতির স্পৃষ্টান্ন অন্য জাতির ভোজনে নিষেধ অত্যন্ত অবিধেয়। আবার কাহারও মত এই যে, যে

সকল জাতির নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় আছে, তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ না হওয়াই ভাল; কিন্তু যেসকল জাতির কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় নাই, তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ নিষেধ অনাবশ্যক। কেহ বলিতেছেন জাতিভেদ সংক্রান্ত সমস্ত আচার ব্যবহারই অসভ্যতার পরিচায়ক; কেহ বলিতেছেন উহা পুরাতন সমাজের পক্ষে সঙ্গত ছিল, কিন্তু আধুনিক সমাজের পক্ষে অপ্রযোজ্য হইয়া পড়িয়াছে। কেহবা এখনও উহার কোন কোন আচার রাখিতে চান, কেহবা উহাকে সমূলে উৎপাটন করিতে পারিলে সুখী হন। আক্রমণকারীগণ এইরূপ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত; কিন্তু সমর্থনকারীগণ ইহাদের কাহাকেও সন্তোষজনক উত্তর দিতে সক্ষম হইতেছেন না।

জাতিভেদ সমর্থন কিম্বা আক্রমণ করিতে যাওয়ার পূর্ব্বে আরও একটি কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য। এই জাতি-ভেদ সম্পর্কিত আন্দোলন উপলক্ষে, আর্য্য ঋষিগণ অকারণ অনেক গালি পাইতেছেন, আবার অকারণ অনেক প্রশংসাও পাইতেছেন। আক্রমণকারী বলিতেছে "এই ভণ্ড তপস্বী বেটারা ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য শূদ্রজাতির উপর যত কঠোর নিয়ম প্রচার করিয়াছে।" সমর্থনকারী বলিতেছে "অহো, আর্য্য ঋষিগণ এই জাতি ভেদ প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া কি অসাধারণ মনস্বিতারই পরিচয় দিয়াছেন।" ইহাদের উভয়ের কথা দ্বারাই এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে আর্য্য ঋষিগণই জাতি ভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, এবং তাঁহারাই ইহার ফলাফলের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। কিন্তু হিন্দু রাজত্ব সময়ে ভারতবর্ষ কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বা সমিতির প্রণীত ব্যবস্থা দ্বারা অনুশাসিত হইয়াছে কিনা, তাহাতে গভীর সন্দেহ আছে। ইহা নিশ্চয় যে সামাজিক অবস্থা সম্পূর্ণ অনুকূল না হইলে মনুসংহিতা বা পরাশর সংহিতার ন্যায় ব্যবস্থাশাস্ত্র কোন সমাজে প্রচারিত হওয়া অসম্ভব। ইহা এইক্ষণে প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে মনুসংহিতা ষ্টিফেন্স্ পেনাল কোডের ন্যায় কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বা সমিতি-প্রণীত ব্যবস্থাশাস্ত্র নহে, যে সমস্ত আচার ব্যবহার তৎকালে সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহারই সারসংগ্রহ মাত্র। যদি ইহাই প্রকৃত হয়, তবে মনুকে শাস্ত্রপ্রণেতা ঠিক করিয়া তাহার উপর একদিকে যে পরিমাণ মনস্বিতা ও অপরদিকে যেপরিমাণ অসাধুতা আরোপিত হইয়াছে, তাহার অনেকটা লাঘব হওয়া উচিত। যদি ঐ সকল আচার তৎকাল এবং ভবিষ্যত কালের জন্য শ্রেয়ঃ হয়, তবে মনুর এই বলিয়া প্রশংসা হওয়া উচিত যে তিনি ঐ আচার গুলি বহুস্থান হইতে একত্র সংগ্রহ করিয়া যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। আর যদি উহারা অতীব গর্হিত হইয়া থাকে, তবে তাঁহার এই বলিয়া নিন্দা হওয়া উচিত যে তিনি ঐ সমস্ত গর্হিত আচারের সঙ্গে তাঁহার নিজের শ্রদ্ধেয় নাম সংযুক্ত করিয়া অত্যন্ত অনুচিত কার্য্য করিয়াছেন। এক জাতির পক্ষে অন্য জাতির বৃত্তি অবলম্বন অকর্ত্তব্য, কিম্বা এক জাতির লোকের অন্য জাতিতে বিবাহ করা দূষণীয়, ইহা কি

কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিনে কোন শাস্ত্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া তার পর দিন হইতে প্রচার করিয়াছিলেন? যদি তাহা না হয়, তবে শাস্ত্রকার সাম্যনীতি কিম্বা বীজশুদ্ধির তত্ত্ব অবগত হইয়াই ঐ সকল বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এইরূপ কথা বলা হয় কেন? তর্কের জন্য সমর্থনকারীগণ অবশ্যই বলিতে পারেন যে যদিও উল্লিখিত আচারদ্বয় শাস্ত্র প্রণয়নের পূর্ব্বেও কুত্রাপি প্রতিপালিত হইত, তথাপি শাস্ত্রকার উহাদের বিশেষ উৎকর্ষ অনুভব করিয়া উহাদিগকে সমাজে সর্ব্বত্র প্রচলিত ও চির প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই শাস্ত্র মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা স্বীকার করি যে, যে সকল আচার পূর্ব্বে স্থলবিশেষে অনুসৃত হইত, তৎসমুদায় শাস্ত্রে গৃহীত হইবার পর অধিকাংশ স্থলেই প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু কোন আচার কোন দার্শনিক নীতি দ্বারা সমর্থিত হয় বলিয়াই যে উহা কোন দূরদর্শী শাস্ত্রকার দার্শনিক নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে।

কোন আচার দুই উপায়ে সমাজে প্রচলিত থাকিতে পারে; ১ম, বিধি বা শাস্ত্রের অনুশাসন দ্বারা, ২য়, প্রবৃত্তি বা সংস্কারের অনুশাসন দ্বারা। যথা ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র একাসনে বসিয়া আহার করেনা, এখানে শাস্ত্রের অনুশাসন। ইংলণ্ডে কোন ভদ্রলোক কোনক্ষুদ্র চর্ম্মকারের সঙ্গে একাসনে বসিয়া আহার করিবে না, ইহা প্রবৃত্তির অনুশাসন। এই উভয় অনুশাসনে প্রভেদ এই যে, প্রবৃত্তির অনুশাসন সামাজিক অবস্থার ফল, এবং সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু শাস্ত্রের অনুশাসন যে পর্য্যন্ত শাস্ত্রের কর্ত্তৃত্ব থাকে, এবং শাস্ত্র পরিবর্ত্তিত না হয়, সেই পর্য্যন্তই অক্ষুণ্ণ রহে—কোনরূপ সামাজিক পরিবর্ত্তনে উহার ব্যত্যয় ঘটে না। সম্ভবতঃ কোন শাস্ত্র প্রণয়নের পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণ, বিদ্যা ও ক্ষমতার অভিমানে, অক্ষম ও নীচাশয় শূদ্রের সহিত একাসনে বসিতে স্বীকৃত হইত না। কিন্তু যদি কোন শাস্ত্রের শাসন বর্ত্তমান না থাকিত, তবে শূদ্রজাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এত দিনে এই ব্যবস্থা নিশ্চয়ই বিদূরিত হইয়া যাইত। সুতরাং যাহারা এই ব্যবহারকে পুরাতন সময়ের উপযুক্ত এবং আধুনিক সময়ের অনুপযুক্ত মনে করেন, তাঁহারা শাস্ত্রকারগণকে এই বলিয়া দোষী করিতে পারেন যে, যদিও শাস্ত্রকারগণ ঐ ব্যবহার প্রবর্ত্তনা করিয়া না থাকুন, তথাপি উহা যে অবস্থার পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিতেছে না, ইহা তাঁহাদিগেরই কার্য্যফল।

সমর্থনকারীদিগের মধ্যে এরূপ অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা কথায় কথায় বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া থাকেন, এবং অবশেষে নিজেরাই বিজ্ঞানের মুণ্ডপাত করেন। ইহাঁদের উদ্দেশ্য অর্দ্ধশিক্ষিত স্কুলের ছাত্র এবং আফিসের কেরাণীদিগকে প্রতারিত করা। কিন্তু ইহাঁদের জাঁকজমক দেখিয়া কোন কোন অসাবধান বিজ্ঞলোককেও বিভ্রমে পতিত হইতে দেখা যায়। আমরা এই দলের অনেক ব্যক্তিকে বক্তৃতায় ব-

লিতে শুনিয়াছি ও কাগজে লিখিতে দেখিয়াছি যে, ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্রের বিবাহ ও ভোজন নিষেধের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণের শরীরে শূদ্র হইতে উৎকৃষ্ট কিংবা অধিক পরিমাণে তাড়িত অথবা চৌম্বক শক্তি বিদ্যমান আছে। শূদ্র যে অন্ন স্পর্শ করে, তাহাতে ঐ শক্তি প্রবিষ্ট হয়, এবং সেই অন্ন ব্রাহ্মণ ভোজন করিলে ব্রাহ্মণের শক্তি বিকৃত হয়। লেখক মনে করিলেন তিনি বিজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি যে পদে পদে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর শ্রাদ্ধ করিতেছেন, একটু অনুধাবন করিলেই তাহা প্রতীয়মান হইবে। জীবশরীরে চৌম্বক শক্তির কার্য্য, বিজ্ঞান অতি সামান্যই আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে। বিজ্ঞান এই মাত্র আভাস পাইয়াছে যে একব্যক্তির চৌম্বকশক্তি অন্য ব্যক্তির উপরে সময়ে সময়ে কার্য্য করে। কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতির শরীরে একরূপ চৌম্বক শক্তি, শূদ্র জাতির শরীরে আর একরূপ চৌম্বক শক্তি কি না, বিজ্ঞান তাহা জানে না। শূদ্রের চৌম্বকশক্তি তাহার স্পৃষ্টান্নে প্রবিষ্ট হয় কি না, বিজ্ঞান তাহা জানে না। প্রবিষ্ট হইলেও, সেই অন্ন ব্রাহ্মণ ভোজন করিলে তাহার রক্তের উপর কোন কার্য্য করে কি না, বিজ্ঞান তাহা জানে না। দুই ব্যক্তির শক্তি সংযোগে যে নূতন শক্তির উদ্ভব হয়, তাহার প্রকৃতি কি, বিজ্ঞান তাহা জানে না। সুতরাং দেখা যায় যে, লেখক যে বিজ্ঞানের নামে আস্ফালন করিতেছেন, সেই বিজ্ঞান তাঁহাকে কোন বিষয়েরই উত্তর দিতে অক্ষম। লেখক পথিমধ্যে তাড়িত কিম্বা চৌম্বক নামক একটা বৈজ্ঞানিক শব্দ প্রাপ্ত হইয়া তাহার উপর এক কল্পনার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং অর্দ্ধশিক্ষিত যুবকদিগের নিকট উহাকেই বৈজ্ঞানিক কীর্ত্তি বলিয়া প্রচার করিতেছেন। জাতিভেদের কোন কোন আচারের সমর্থনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি থাকা নিতান্তই সম্ভব, কিন্তু যে ভাবে বঙ্গীয় লেখকগণ তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক বিদ্যাবত্তা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা নিতান্তই হাস্যাস্পদ ও বিরক্তিজনক।

ভারতবর্ষীয় জাতিভেদের গুণাগুণ সম্বন্ধে আমাদের যাহা সরল বিশ্বাস, আমরা তাহা লিখিতে বাসনা করি। কোন একটা সামাজিক প্রথা বহুকাল প্রচলিত থাকিলে উহা সমাজের অন্যান্য প্রথার সঙ্গে অনেক বিষয়ে এইরূপ ভাবে জড়িত হয় যে সমগ্র সমাজের কিয়ৎপরিমাণ পরিবর্ত্তন না হইলে, উহার পরিবর্ত্তন দুঃসাধ্য। এইজন্য জাতিভেদ সমাজের অন্যান্য প্রথার সঙ্গে কিরূপ জড়িত হইয়াছে; আমরা যথা সাধ্য তাহা প্রদর্শন করিব। কোন একটি নিয়ম যদি নিরবচ্ছিন্ন অনিষ্ট জনক হয় তবে তাহা কখনও দীর্ঘকাল সমাজে প্রচলিত থাকিতে পারে না। হয় ফলভোগীগণ সেই নিয়মকে পরাজিত করে, অথবা আপনারাই পরাজিত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে সামাজিকগণ কোন অনিষ্টজনক নিয়মকে পরিবর্ত্তন করিতে অশক্ত হইলে আপনাদের অবস্থা ধীরে ধীরে

এইরূপ ভাবে গঠন করিয়া লয় যে ঐ নিয়ম অমঙ্গলের পরিবর্ত্তে মঙ্গল উৎপাদন করে। এই জন্য জাতিভেদ প্রথা আপাততঃ অত্যন্ত কুনিয়ম বলিয়া বোধ হইলেও উহা হইতে সমাজে অনেক মঙ্গলজনক ফল প্রসূত হইয়াছে, দেখিতে পাই। অনেকে এই সকল মঙ্গলজনক ফল দেখিয়াই জাতিভেদকে সুপ্রথা বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন। কিন্তু এইরূপ হইতে পারে যে এই সমস্ত সুফলে জাতিভেদের কোন গৌরব নাই। প্রচলিত নিয়মের সঙ্গে অবস্থামিলনের চেষ্টাই ইহার কারণ। যাহা হউক, সাধারণের এবিষয়ে উপযুক্ত ধারণা জন্মিতে পারে, আমরা এজন্য জাতিভেদের সুফল ও কুফল উভয়েরই উল্লেখ করিব। আমরা আলোচনার জন্য জাতিভেদ সংসৃষ্ট নিম্ন লিখিত বিষয় গুলি গ্রহণ করিলাম।

১। শ্রেণী বিভাগ।

২। একজাতির পক্ষে অন্যজাতির বৃত্তি পরিগ্রহ নিষেধ।

৩। একজাতির স্পৃষ্টান্ন অন্য জাতির ভোজন নিষেধ।

৪। অপরাধীর দণ্ডে বর্ণবৈষম্য।

৫। শিক্ষায় বর্ণবৈষম্য।

(ক্রমশঃ)

একজন হিন্দুর কথা।

অতি প্রাচীন কাল হইতে বিদ্যা, বিভব বীর্য্য, ও বিনয়াদি গুণে, হিন্দুগণ, জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন। কালচক্রের কুটিল আবর্ত্তনে, তাহাদের পূর্ব্ব গৌরব মন্দীভূত হইয়াছে সন্দেহ নাই; তথাপি নানা দেশীয় পণ্ডিতগণ তাহাদের বেদ, স্মৃতি, দর্শণ, পুরাণ, এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ. নিরতিশয় আগ্রহের সহিত, পাঠকরিয়া উপকৃত হইতেছেন। তন্মধ্যে কেহ বা গুণে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের যশোগান করিতেছেন; কেহবা ইচ্ছা বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক, ঈর্ষ্যা বা অজ্ঞতা নিবন্ধন, নানাবিধ অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তাঁহাদের নিন্দায় ব্যাপৃত হইতেছেন। যাহাহউক, ইহা সত্য যে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই উহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। হস্তী মৃত কি জীবিত, উভয় অবস্থায়ই এক অমুপেক্ষিত জন্তু। যে প্রকার দীর্ঘকাল ব্যাপী বিদেশীয় জাতির উৎপীড়নে, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি এবং সমাজের সংস্থিতির বিপর্য্যয়ে, অন্যান্য জাতি জাতান্তরে পরিণত বা বিলুপ্ত হইয়াছে, তাদৃশ প্রতিকূল দশায় পতিত হইয়াও যাঁহারা স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছেন যিনিই যাহা বলুন, তাহাদের মধ্যে যে একটু মহাপ্রাণতা আছে—আমরা ইহা অস্বীকার করিতে পারি না। কুশীলবের সহিত সমরে, শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায়, বর্ত্তমান সময়ে, নানা দুর্ব্বিপাকে, জীবন-স-

মরে এজাতি মূর্চ্ছাপন্না—কত পিপীলিকায় ইহার গাত্রে দংশন করিতেছে; কখন বা স্বয়ংই স্বীয় অঙ্গে আঘাত করিয়া ক্ষত বিক্ষত হইতেছে; তথাপি যাহাদের নাড়ী জ্ঞান আছে, তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন—আনাড়ী লোকের ব্যবস্থায় অনেক অনিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার জীবনে কোন আশঙ্কা নাই, অচিরে কি বিলম্বে সুস্থতা লাভ করিবে সন্দেহ নাই, এবং এখন রুগ্নদশায় ইহার সৌন্দর্য্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া যাহারা ভ্রূভঙ্গি করিতেছেন, আমরা প্রত্যাশা করি তখন তাহারা ইহার মনোহর আকার দর্শনে বিমুগ্ধ হইবেন।

পরন্তু আক্ষেপের বিষয় এই আমাদের মধ্যে কতিপয় সরলমতি তরলচিত্ত ব্যক্তি হিন্দুসমাজের প্রাগুক্ত সাময়িক দশা দর্শনে নিরাশ হইয়া ইতি মধ্যেই জাত্যন্তরাবলম্বনের ভূমিকা করিয়াছেন; আশ্চর্য্য কি? কোন কোন সম্প্রদায়ে এইরূপ ঘটিয়া থাকে শুনিতে পাই যে স্বামীর উৎকটপীড়া দর্শন করিলেই স্ত্রী বিবাহান্তরের উপক্রমণিকায় প্রবৃত্ত হয়।

যাহাহউক, বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দুজাতির যাহাতে উপকার হয়, আমরা যথামতি ক্রমে তাহা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। হিন্দু পাঠক মহাশয়গণ তৎপাঠে প্রীতি ও উপকার বোধ করেন পরম সৌভাগ্য। যদি কেহ না করেন তাহাতে দুঃখিত হইলেও আমাদের বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। হিন্দু সম্প্রদায়ের, বর্ত্তমান দশায়, সমাজ সংস্থিতি, রাজনীতি ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রায় কোন কথাই সকলের নিকট উপাদেয় বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। কারণ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ। মনুষ্য বুদ্ধিজীবী সন্দেহ নাই; শাস্ত্রেও তাহাই বলে যথা;

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষ্বপি দ্বিজাতয়ঃ
উদ্‌যোগ ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

ভৌতিক পদার্থ মধ্যে জন্তু; জন্তুগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবী; বুদ্ধিজীবি মধ্যে মনুষ্য এবং মনুষ্য মধ্যে দ্বিজ জাতি শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু মনুষ্য বুদ্ধিজীবী হইলেও তাহার বুদ্ধি সংস্কার-নামক এক অন্ধভাবের অনুবর্ত্তিনী; হিন্দুরমণী যেমন স্বামীর অভিপ্রায় অনুসারেই প্রায় সমুদায় কার্য্য করিয়া থাকেন, বুদ্ধিও তদ্রূপ সাধারণতঃ সংস্কার অনুসারেই বিষয়ের দোষগুণ বিচার করিয়া থাকে। গান্ধারী দেবী যেমন ভর্ত্তার অন্ধতা নিবন্ধন অন্ধবেশ ধারণ করিয়াছিলেন; মানববুদ্ধিও তদ্রূপ সংস্কারের অনুকরণে অন্ধের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। এই সংস্কারই পরিণত হইলে, বাসনা বা 'দোষ' বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়া থাকে। যে সমাজে এই সংস্কার অধিকাংশে একরূপ, সে সমাজেই, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজ সংস্থিতি প্রভৃতি বিষয়ে, কোন প্রস্তাব সাধারণ্যে উপাদেয় বা হেয় বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে।

যে জাতিতে উহা নানারূপ, বা পর-

স্পর বিপরীত, তথায় প্রাগুক্ত কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, প্রায়শই পাঁচ জনে উহার সমর্থন এবং অন্য পাঁচ জনে উহার প্রতিবাদ করিবে, পাঁচ জনে উহাকে যে পরিমাণে উপাদেয় জ্ঞান করিবে অপর পাঁচ জনে আবার সেই পরিমাণে হেয় জ্ঞান করিবে, ইহা অপরিহার্য্য।

হিন্দুদিগের দিন পঞ্জিকায়, এখন যেমন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেরই সর্ব্ব দিন লিখিত থাকে, তাহাদের চিত্ত ক্ষেত্রেও তদ্রূপ নানাবিধ বিজাতীয় সংস্কার বিরাজ করিতেছে। পাশ্চাত্য আলোক সংস্পর্শে, দিবাবসানে, মেঘমালা যেমন নানাবর্ণ ধারণ করে, প্রাগুক্ত সংস্কার বলে, হিন্দুসমাজও তদ্রূপ বিবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে; উক্ত কারণে অহিফেন-ব্যবসায়ী বণিক্ সংপ্রদায় যেমন স্বাধীন বাণিজ্যের কাহিনী গাণ করিয়া চীন প্রভৃতি দেশের উপকার সাধন করিতেছেন, রেসিডেণ্ট সাহেবেরা যেমন অনেক সময় উপদেশ প্রদানে, ভারতীয় মিত্র ও করদ রাজগণের যথা শক্তি সম্মান বৃদ্ধি করিতেছেন, কত গুলি হিন্দু সন্তানও, তদ্রূপ, পাশ্চাত্য আলোক, ঊনবিংশ শতাব্দী, সভ্যতা-বিস্তার প্রভৃতি বড় বড় শব্দ উচ্চারণ করিয়া স্বদেশের উন্নতি সাধনে ও গৌরব বর্দ্ধনে বদ্ধ পরিকর হইয়াছে। অন্য হিন্দুগণ আবার উহাতে বাধা প্রদান করিতেছে, তাঁহারা কিছুতেই তাহাদের মত অনুসরণ করিতেছেন না।

এই প্রাগুক্ত সম্প্রদায় মধ্যে কেহ অবজ্ঞা ক্রমে বা ঘটনা বলে, প্রকৃত বান্ধবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে উপহাস ও দ্বেষ করে এই প্রকার লোকের অনুকরণ ও অনুবর্ত্তন করিতেছেন। কেহবা ত্রিশঙ্কুর ন্যায় অন্তরেই অবস্থান করিতেছেন; কেহবা শূর্পনখার ন্যায় একবার রামচন্দ্রের আবার কুমার লক্ষণের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু কোন স্থানেই অভীষ্টসিদ্ধি হইতেছে না। কেবল বিড়ম্বনা মাত্র সার। কেহবা নদী স্রোতের ন্যায় কখন এপার কখনও ও পার কখন বা মধ্য দিয়া চলিতেছেন। অপর সম্প্রদায় আবার হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান রুগ্নদশায়, অনুরক্ত শুদ্ধচিত্ত দক্ষ ভৃত্যের ন্যায় নিরত পার্শ্বে অবস্থান করিয়া, তাহার পরিচর্য্যা এবং শুশ্রূষা করিতেছেন ও উৎসুকনেত্রে তাহার আরোগ্য প্রতীক্ষা করিতেছেন।

এই প্রকার সংস্কার ভেদে, স্বার্থ-বৈলক্ষণ্যে ও শিক্ষা-তারতম্যে, ভিন্ন ভাবাপন্ন সমাজের নিকট, ধর্ম্ম, আচার, নীতি, ও সমাজ সংস্থিতি প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে, কোন প্রবন্ধ বা গ্রন্থ উপনীত হইলে, তাহার কাগজ মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতি ভিন্ন অন্য বিষয়ে, যে উহা সকলের নিকট উপাদেয় বলিয়া পরিগৃহীত হইবে এইরূপ প্রত্যাশা করা অনুচিত।

জাতীয় শিক্ষার অভাব সমাজস্থ ব্যক্তিগণের সংস্কারভেদের, সংস্কারভেদ মতভেদের, মতভেদ সমাজবিভাগের, সমাজবিভাগ উহার শক্তিহ্রাসের কারণ। তখন সমাজ স্বীয় স্বার্থরক্ষায় অক্ষম, সুতরাং অন্যের নিকট পরাভূত, অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত

হয়। তাদৃশ অবস্থায় বিহঙ্গমগণ যেমন ক্ষীণফলবৃক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষান্তর আশ্রয় করে, তদ্রূপ তরলচিত্ত স্বার্থপর ব্যক্তিগণও স্বীয় সম্প্রদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য সংপ্রদায়ে প্রবেশ করে; সমাজ ভগ্ন হইয়া পড়ে।

পৃথিবীর সকল লোক, তত্ত্বজ্ঞানী হইবে;—লোকের ঈর্ষা, কাম,ক্রোধ একেবারে সংসার পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে, যখন প্রত্যেক ব্যক্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বলিতে পারিবে

"সমোহহংসর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ"

আমি সকল প্রাণি সম্বন্ধেই সমান; কোন ব্যক্তিই আমার দ্বেষ ও অনুরাগের (পক্ষপাত) পাত্র নহে;—এইরূপ অবস্থা পৃথিবীতে কখনও ঘটিবে কি না বলিতে পারি না; যদিও বটে, তথাপি বর্ত্তমান সময়ে তদনুসারে যিনি কার্য্য করিতে ইচ্ছু, তাহাকে মস্তিষ্ক রোগগ্রস্ত বলিতে হইবে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ের সিদ্ধান্ত এই যে—পৃথিবীতে দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, রাজ্যে রাজ্যে, পরস্পর স্বার্থভেদনিবন্ধন, বিসংবাদ চলিতেছে এবং সম্ভবত চিরকাল এই প্রকার চলিবে। এবম্বিধ অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি, স্বীয় দেশ, জাতি ও রাজ্যের ন্যায়োপেত স্বার্থ রক্ষার জন্য দায়ী এক এক জন সৈন্য বা সেনাপতি স্বরূপ, কায়মনোবাক্যে যিনি যতদূর ঐ স্বার্থরক্ষায় কৃতকার্য্য তিনি ততদূর দেশ জাতি ও রাজ্যের শ্লাঘ্য সন্তান।

যখন প্রতিদ্বন্দ্বী ভূপালদ্বয়ের সংগ্রামে, কোন সেনা বা সেনাপতি, দুর্ব্বল প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া, তদীয় প্রতিপক্ষ প্রবল ভূপালের পক্ষ অবলম্বন করে, তখন তাহাকে কেহই সৎপুরুষ বলিয়া প্রশংসা করিতে পারে না, প্রত্যুত লোকে তাহাকে অকৃতজ্ঞ, কাপুরুষ বলিয়া নিন্দাই করিয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, নিজ সম্প্রদায়ের বিপৎ-সঙ্কুল অবস্থায়, যে ব্যক্তি উহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হয়; প্রাগুক্ত সৈন্য বা সেনাপতি অপেক্ষা তাহার অপরাধ কোন অংশে ন্যূন নহে। আক্ষেপের বিষয়;—যাহাদের উপর আমাদের দেশের ভাবি মঙ্গল ও অমঙ্গল নির্ভর করিতেছে, তাহাদের মধ্যে, কয়জনে ইহা চিন্তা করিয়া স্বীয়জীবন কর্ত্তব্য পথে পরিচালিত করিতেছেন? এই প্রবন্ধে এতদ্বিষয়ে অধিক প্রপঞ্চ করিবার অবসর নাই। বারান্তরে আমাদের এই বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বোধ হয় এই সকল বিভিন্ন সংস্কারজনিত অনিষ্টাশঙ্কা করিয়াই, মহর্ষি মনু দ্বিজ জাতির একরূপ মানসিক সংস্কার রক্ষার জন্য, বেদপাঠ নিত্যকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদানন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
সজীবন্নেব শূদ্রত্ব মাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ।

যে দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া শাস্ত্রান্তরের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, সে শীঘ্রই সবংশে শূদ্রত্ব লাভ করে।

শঙ্খ বলিয়াছেন।—

"নবেদ মনধীত্য অন্যাং বিদ্যামধীয়িত ;
অন্যত্র বেদাঙ্গস্মৃতিভ্যঃ"।

বেদ অধ্যয়ন না করিয়া, বেদাঙ্গ এবং স্মৃতি ভিন্ন অন্য বিদ্যা অধ্যয়ন করিবে না।

এই নিয়মের অন্য তাৎপর্য্য থাকিতে পারে বটে, কিন্তু জাতীয় একতা রক্ষা ইহার এক প্রধান প্রয়োজন সন্দেহ নাই।

মুসলমান বিদ্যার্থিমাত্রেই, কোরাণ, এবং বিদ্যার্থি খৃষ্টানমাত্রেই বাইবল পাঠ করিয়া থাকেন—ইহাদ্বারা তাহাদের একরূপ জাতীয় সংস্কার সম্পন্ন হইয়া একতার পরিপোষণ করিতেছে। হিন্দুদিগের মধ্যে তাদৃশ কোন গ্রন্থের অধ্যয়ন প্রচলিত না থাকায় তাহাদের চিত্ত, একরূপে সংস্কৃত হইতেছে না ; সুতরাং তাহাদের ঐকমত্য লাভ একান্ত আয়াসকর হইয়া উঠিয়াছে। আমরা অনেক সময় দুঃখিতচিত্তে দর্শন করি যে, স্বদেশীয় রীতিক্রমে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ও নিরবচ্ছিন্ন পাশ্চাত্য আলোকে আলোকিত সভ্যগণ যেন পরস্পর ভিন্নপথে ও ভিন্নলক্ষ্যে ধাবিত হইতেছেন ; এই প্রকার পরস্পর অসামঞ্জস্য কিরূপে অপনীত হইতে পারে, ভরসা করি দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমরাও হিন্দুজাতি সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এই বিষমসমস্যার সিদ্ধান্ত করিতে যত্ন করিব। পরন্তু বিভিন্ন-সংস্কারসম্পন্ন পাঠক মহাশয়গণের নিকট আমাদের চিরকালের জন্য নিবেদন এই—

মান্যান্ প্রণম্য বিহিতাঞ্জলিরেষভূয়ো
ভূয়োবিধায় বিনয়ং বিনিবেদয়ামি।
দূষ্যং বচো মম পুনর্নিপুণং বিভাব্য
ভাবাববোধবিহিতো ন ভুনোতি দোষঃ।

অনুমানদীধিতি।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

জমা—খরচ।

অনেক ভাবিলাম, কিন্তু তথাপি আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের জন্য একটি শ্রুতিমধুর, প্রাণ-স্পর্শি ও রসপূর্ণ নাম খুঁজিয়া পাইলাম না। যে দেশের বক্তা ও শ্রোতা, লেখক ও পাঠক সকলেই রসের সমুদ্রে দিবারাত্রি হাবুডুবু খাইতেছে,—যে দেশে পথ্য পাচন ও কটুকষায় ঔষধাদির বিজ্ঞাপনেও কাব্যের নবরস উছলিয়া পড়িতেছে, সে দেশে এইরূপ 'নীরস নিঠুর' জমা খরচের কথা যে,কাহারই চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিবে না, তাহা আমি বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারি। কিন্তু বুঝিয়াও যে নিবৃত্ত হইলাম না, তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। সেই কারণ এই যে,—জমা খরচের কথা বাহিরে যতই কঠোর হউক না কেন, ভিতরে উহা বড় মধুর। যাঁহারা একটুকু ধৈর্য্য,

একটুকু সহিষ্ণুতা মাত্র অবলম্বন করিয়া এই বিশ্বব্যাপি গভীরতত্ত্বের বাহিরের আবরণটি অতিক্রম করিতে পারিবেন, আমি শপথপূর্ব্বক বলিতে পারি, তাঁহারা ইহার অভ্যন্তরে এক অনির্ব্বচনীয় রসের আস্বাদ পাইয়া চরিতার্থ হইবেন। কারণ, স্বাস্থ্য, সুখ ও জীবনের গতি, সমাজের উন্নতি ও অবনতি, রাজ্য ও সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান এবং এই বিশ্বযন্ত্রের নিত্যবিবর্ত্ত, এই সমস্তই জমা খরচের কথা। আমার এই সিদ্ধান্ত সত্য কি মিথ্যা, এস ক্রমে ক্রমে আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি।

প্রথমতঃ স্বাস্থ্য, সুখ ও জীবনের গতি এই তিনটি দ্বারাই পরীক্ষা করিয়া লও। এই তিন নামতঃ পৃথক্ হইলেও পরস্পর বড় ঘনিষ্ঠ। সুতরাং ইহাদের কথা লইয়া এক সঙ্গে বিচার করিলে, বিচারশৃঙ্খলার কোনও রূপ বিপর্য্যয় হইবার শঙ্কা নাই।

স্বাস্থ্য, সুখ ও জীবনের গতি এই তিনের সহিত জমা খরচের কোনও সম্পর্ক আছে কি? চিকিৎসক বলিবেন,—আছে। কেন না, তিনি শত সহস্র পরীক্ষায় দেখিয়াছেন যে, যাহার জমা অপেক্ষা খরচ বেশী, সে ঋণগ্রস্ত;—যে ঋণগ্রস্ত, সে চিন্তায় জীর্ণ এবং যে চিন্তার আগুণে চিরজীর্ণ, সে ঔষধের অসাধ্য। সুতরাং স্বাস্থ্যভঙ্গের সহিতই তাহার সুখভঙ্গ এবং সুখভঙ্গের সহিতই তাহার জীবনের নিত্য কিংবা নৈমিত্তিক গতির ক্রমভঙ্গ। ঘরের গৃহিণীও বলিবেন,—আছে। কারণ, তিনি দেখিয়াছেন যে, ঘরে যখন খাবার না থাকে,—ক্রোড়ের শিশু যখন অন্নের জন্য লালায়িত হয় এবং প্রাপক যখন তাহার খাতাপত্র লইয়া প্রহরীর মত দ্বারে বসিয়া চীৎকার করে, তখন সিদ্ধৌষধ সুবাসিত তিলতৈলেও গাত্রদাহ শীতল হয় না,—রসের কথায়ও মুখে হাসি ফোটে না এবং বসন্তের সমীর, ভ্রমরের গুঞ্জন, অথবা বাসন্তী পূর্ণিমার বিলাসময়ী জ্যোৎস্না ইহার কিছুতেই তখন শরীর কি মন স্নিগ্ধ রাখিতে পারে না। স্বাস্থ্য, সুখ ও জীবনের গতির সহিত জমা খরচের যে অতি নিকট সম্পর্ক আছে, আরও অনেকে অনেক প্রকারে এ-কথায় সাক্ষ্যদান করিতে পারেন। কারণ, জমার অঙ্ক খরচ অপেক্ষা অধিক না হইলে, হাতে অর্থ থাকে না, অর্থ না থাকিলে স্বাস্থ্যরক্ষা কিংবা সুখের উপযোগি প্রয়োজনীয় বস্তুরও আহরণ হয় না,—শরীরে ও মনে সামর্থ্য থাকে না, সমাজশক্তির সঞ্চালন বিষয়ে ক্ষমতা রহে না,—স্নেহ মমতা ও দয়া প্রভৃতি মনোবৃত্তিনিচয় ফুটিয়াও ফুটিবার অবকাশ পায় না, এবং জীবনের স্রোত সুনীতির সুখাবহ পথে প্রবাহিত হইতে পারে না। এ সকল কথা সকলেই জানে, সকলেই বুঝে, সকলেই পরকে বুঝায়। কিন্তু স্বাস্থ্য, সুখ ও জীবনের সহিত জমা খরচের ইহা অপেক্ষাও নিগূঢ়তর সম্পর্ক আছে। আমি পাঠককে সেইটিই সংক্ষেপে বুঝাইতে যত্নবান্ হইব।

স্বাস্থ্য কি? বিজ্ঞান বহুশতাব্দীর পরীক্ষায় ইহা জানিতে পারিয়াছে যে, জীবনী-

শক্তির জমা খরচের সাম্যের নাম স্বাস্থ্য এবং এবিষয়ে যাহার জমা খরচে মিল আছে, সেই সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ। যখন ক্ষুধা লাগে, তখন আমরা খাই; যখন তৃষ্ণা বোধ হয়, তখন আমরা পান করি এবং শরীর যখন নিদ্রার আলস্যে অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন আমরা চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া থাকি। কিন্তু কেন আমাদের ক্ষুধা লাগে, কেন আমরা আহার করি,—কেন তৃষ্ণাতুর হইয়া জল পানে জীবন জুড়াই,—কেন বিশ্বের সকল সুখ ও সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়া মায়াময়ী নিদ্রার ক্রোড়ে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিবার জন্য অধীর হই, তাহা আমরা বুঝি কি? বুঝিলে আমরা প্রতিক্ষণেই অনুভব করিতাম যে, এসকল কার্য্য জীবনগত জমাখরচের প্রাকৃত প্রক্রিয়া,সুতরাং কোনও মতেই অবহেলার বিষয় নহে। তুমি হাসিতেছ অথবা কাঁদিতেছ, গায়ের জোড়ে আস্ফালন করিতেছ, দূরপথ হাটিয়া যাইতেছ,—নাচিয়া গাহিয়া দিন কাটাইতেছ, অথবা গভীর নিশীথে দীপালোকের সম্মুখে বসিয়া বর্ণের সহিত বর্ণ যোজনা দ্বারা বিনা সুতে হার গাঁথিতেছ। ইহার প্রত্যেক কার্য্যেই তোমার তহবিল হইতে অল্প বা অধিক পরিমাণ খরচ হইতেছে। আবার তুমি বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া শীতল হইতেছ, পান ভোজনে পুষ্টি লাভ করিতেছ, অথবা প্রিয়সমাগমে পুলকিত হইয়া জ্যোৎস্নায় বসিয়া প্রকৃতির পরিবর্ত্তশীল সৌন্দর্য্য ধ্যান করিতেছ। ইহার প্রত্যেক কার্য্যেই তোমার তহবিলে অল্প বা অধিক পরিমাণে জমা হইতেছে। এইরূপে তোমার জীবনের খাতায় জমা ও খরচের কার্য্য প্রতি মুহূর্ত্তে ও প্রতিক্ষণেই কিরূপ অবিরত ও অব্যাহত চলিতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখ।

প্রাচীনেরা এই সকল কথার অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং এই জন্যই তাঁহাদিগের মধ্যে প্রাণায়াম ও কুম্ভকাদি যোগ এবং সংযত জীবনের এত আদর। কিরূপে শরীরের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় এবং মনের প্রত্যেক বৃত্তিকে সংযমের অধীন করিয়া অতিক্রিয়া ও অতিক্ষয় হইতে বিনিবৃত্ত রাখা যায়, তাঁহারা অশেষ প্রকারে ইহার আলোচনা করিয়াছিলেন; এবং তাঁহারা সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ ভাবে দীর্ঘজীবী হইয়া জীবনের চরম সময়েও যে, সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার ও নানাবিধ সারগর্ভ সন্দর্ভ রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ইহা দ্বারাই তাঁহারা তাঁহাদিগের শক্তি-সাম্যের পরীক্ষা দিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা আধুনিক আয়ুর্ব্বিদ্যার প্রধান অবলম্বন, তাঁহারাও এই তত্ত্ব পরিগ্রহ করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই (moderate living অর্থাৎ) সংযত ও নিয়মিত জীবনের ফলব্যাখ্যায় তাঁহাদিগের এত উৎসাহ ও এত আদর। তাঁহারা স্বাস্থ্য, সুখ ও জীবন-রক্ষা বিষয়ে নানারূপ দৃষ্টান্ত ও নানাবিধ উদাহরণ যোগে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, ও লিখিতেছেন, তাহার সার কথা,—জমা খরচ। তাঁহারা আমাদিগকে জমা খরচের হিসাব বুঝাইতেই প্রাণপণে প্রয়াসপর রহিয়াছেন। কিন্তু আমরা ক-

দাচিৎ কখনও বুদ্ধিতে বুঝিলেও কার্য্যতঃ সেই জমা খরচের নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলি কি? আমরা প্রবৃত্তির দুর্ব্বার বেগে এক ঘণ্টায় এক দিনের জীবন এবং সুতরাং একমাসে দুই বৎসরের জীবন অতিবাহিত করিয়া তর তর বেগে বহিয়া যাইতে ইচ্ছা করি, এবং জীবনী শক্তির স্বাভাবিক স্ফুরণে ও আহারাদির পরিশোধনে আমাদিগের তহবিলে যাহা কিছু উপচয় হয়, আমরা আকাঙ্ক্ষার আবেগে তাহার বিশগুণ বল অপচয় করিয়া,—আমাদিগের জমা অপেক্ষা খরচ বাড়াইয়া. অচিরেই ফেইল হইয়া পড়ি। স্বাস্থ্য, সুখ ও জীবনের গতির সহিত জমা খরচের যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, বোধ হয় পাঠক এইক্ষণ তাহা ভাল রূপে বুঝিতে পারিয়াছেন।

এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, সমাজের উন্নতি ও অবনতিরও সার কথা জমা ও খরচ। গৃহস্থের যেমন গৃহস্থালী, সমাজের তেমন সামাজিকতা। একজন লইয়া আত্মতন্ত্র, সমাজ লইয়া সমাজতন্ত্র। এক জনের স্বতন্ত্র জীবনেও যে বিধি ব্যবস্থা, সমাজের সম্মিলিত জীবন লইয়াও আয় ও দায় অথবা সামাজিক শক্তির উপচয় ও অপচয় সম্পর্কে সেই বিধি ব্যবস্থা। সমাজের তহবিলে স্বাস্থ্য চাই, সুখ চাই,—ধন-বল, জন-বল, বাহুবল, বুদ্ধি-বল, জ্ঞান-বল ও ধর্ম্মবলের নিত্য নূতন সঞ্চয় চাই। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তেই সমাজের এই সমস্ত শক্তির আংশিক অপচয় হইতেছে। সুতরাং প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তেই যদি সমাজের তহবিলে এই সমস্ত শক্তির আংশিক উপচয় না হয়, তাহা হইলে ক্রমে সমাজ দুর্ব্বল ও কালে সমাজ দেউলিয়া হইয়া পড়ে,—এবং যাহারা দেউলিয়া পড়ে, তাহারা যেমন হয় কাহারও গলগ্রহ হইয়া ঘৃণিত জীবন যাপন করে, না হয় একেবারে উচ্ছিন্ন যায়, দেউলিয়া সমাজও হয় কোনও প্রবলতর সমাজের পদানত হইয়া কোনও প্রকারে জীবিত থাকে, না হয় পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয়।

ভারতীয় আর্য্য সমাজের তহবিলে যাহা কিছু বুদ্ধিবল ও বাহুবল ছিল, ভারত-প্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে তাহা প্রায় নিঃশেষ খরচ হয়। ইহার পরিণাম-ফল বীরপ্রসবিনী ভারতবক্ষে মুসলমানের বিজয়-পতাকা। আবার, ইংরেজ যখন লাল ফিতা, লাল সুতা, ও লাল রঙের নানাবিধ কাচের সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া এবং হাতে টুপি, কাখে ব্যাগ, চ'খে মিষ্ট চাহনি এবং মুখে মিষ্ট কথার মধু লইয়া এদেশে বাণিজ্য করিতে আইসে, তখন ভারতবাসী মুসলমান-সমাজ সামাজিক তহবিলের সমস্ত শক্তি ভোগবিলাসের রসোল্লাসে লুটাইয়া দিয়া প্রায় ফেইল হইয়া বসিয়া আছে। ইহার পরিণামফল পলাসির যুদ্ধ অথবা পাঁচশত ইংরেজের নিকট পঞ্চাশত সহস্র মুসলমানের পরাভব।

সমাজের পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ লইয়াও জমা খরচের এই কথা। এদেশের ব্রাহ্মণ-সমাজের তহবিল যখন জ্ঞানে গুণে ও ব্রহ্মণ্য তেজে পরিপূর্ণ, তখন ব্রাহ্মণই এদেশের

সর্ব্বতঃ প্রতিষ্ঠিত প্রভু এবং সর্ব্বময় কর্ত্তা। তখন বনে রহিয়া, বাকল পরিয়া একাহারে ব্রাহ্মণ জীবন যাপন করিয়াছে; তথাপি সমগ্র দেশের সামাজিক জীবন তাহারই আদেশে গঠিত, চালিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত হইয়াছে;—রাজা, মহারাজ ও মহারাজাধিরাজ রাজেন্দ্র-সদৃশ ব্যক্তিরা তাহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছে,—স্বয়ং বাসুদেবের বক্ষ ভৃগুপদলাঞ্ছনে শোভা পাইয়াছে। এইক্ষণ, সেই ব্রাহ্মণ দেউলিয়া পড়িয়া, ব্রহ্মণ্য তহবিলের সকল ধন খোয়াইয়া, কোথাও পাচক, কোথাও ধাবক, কোথাও ভণ্ড স্তুতিপাঠকের কদর্য্য বৃত্তি অবলম্বনে কষ্টে স্রেষ্টে জীবন নির্ব্বাহ করিতেছে এবং হায় কি ছিলাম,—হায় কি হইয়াছি, ব্রহ্মগায়ত্রীর এই নীরব বিলাপে বিষাদ ও কলঙ্কের নীরব গীত গাইতেছে। পক্ষান্তরে হস্তী কর্ত্তৃক পদতলে দলিত হইলেও যাহাদিগের গৃহপ্রবেশ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ ছিল, তাহারা ধন-বলে বলীয়ান্ হইয়া এইক্ষণ সমাজের উপর প্রভুত্ব করিতেছে এবং কোনও শাস্ত্রে যাহাদিগের অধিকার ছিল না, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার লাভ করিয়া সমাজ-শক্তির উপর সোওয়ার হইয়া বসিয়া আছে, সমাজের উপর বিধি ব্যবস্থা চালাইতেছে। জমা খরচের নিয়ম এমনই অনুল্লঙ্ঘনীয়। মধু থাকিলেই মাছি যোটে। যেখানে মধু নাই, মাছির কথা দূরে থাকুক, পিপীড়াও সেখানে ভুলিয়া পদচারণা করে না।

রাজ্য ও সাম্রাজ্যাদির উত্থান ও পতন যে, প্রায়শঃ জমা খরচের কথা, ইহা বুঝাইবার জন্য কোনও ক্লেশ পাইতে হইবে না। যাঁহারা ইউরোপীয় ইতিহাসে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইহা জানেন যে, ইউরোপ যে কয়টি রাষ্ট্রবিপ্লবে বিকম্পিত হইয়াছে, ইতিহাস যে সকল রাষ্ট্রবিপ্লবের কথা লইয়া অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের ন্যায় সুদীর্ঘ বীরসংগীত গাইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তেরই আদিমূল জমা খরচের অসাম্য।

প্রথম চার্ল্‌স্ অনেক বিষয়েই অতি চারুচরিত্র পুরুষ ছিলেন। যাঁহারা রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হন, তাঁহাদিগের গার্হস্থ্য জীবন প্রায়শঃই নানারূপ গর্হিত আচারে কলঙ্কিত হয়। কিন্তু চার্ল্‌স্ এবিষয়ে সর্ব্বাংশেই তদানীন্তন রাজ-সমাজের রীতি বহির্ভূত রমণীয় রত্ন স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার জীবন পতিপত্নীর পবিত্র প্রেমের দৃষ্টান্ত স্থল। রাজমহিষী হেন্‌রিয়েটাকে তিনি যেরূপ প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতেন, অনেক দুঃখীও তাহার দুঃখ-সঙ্গিনীকে সেরূপ ভালবাসিতে পারে না। বন্ধুতায় তিনি চিরদিনই দৃঢ়ব্রত, ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং বিশ্বাসপরায়ণ ছিলেন। যাহাদিগকে একবার তিনি বন্ধু বলিয়া জানিতেন, বন্ধু বলিয়া সম্মান করিতেন, সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সকল সময়ে এবং জীবনের সকল অবস্থাতেই তিনি তাহাদিগের সম্পর্কে বন্ধুতার ধর্ম্ম রক্ষা করিতেন। ইহাতে যদি ঘোরতর বিঘ্ন বিপত্তির শঙ্কা থাকিত, তাহাও তাঁহাকে ভীত কিংবা বিচলিত করিতে

পারিত না। তাঁহার প্রকৃতিতে একদিকে যেমন রাজোচিত গরিমা ছিল, আর একদিকে তেমনই মনুষ্যোচিত মাধুরী ছিল। তাঁহার গরিমাও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মাধুরীর মিশ্রণে সকল সময়েই মধুর বলিয়া প্রতিভাত হইত। যে তাঁহার সন্নিহিত হইত, সেই তাঁহার প্রিয় সম্ভাষণে পুলকিত, এবং তাঁহার প্রীতির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া চিরদিনের তরে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিত। তাঁহার পার্শ্বচর ভৃত্যবর্গ তাঁহাকে পিতা মাতা ও পরম সুহৃদ্ জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু একাধারে এত গুণের সমাবেশ সত্ত্বেও তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার রাজলক্ষ্মী, তাঁহার জীবন ও জীবনের সকল আশা ও সকল ভরসা রাষ্ট্রবিপ্লবের ভয়ঙ্কর কোলাহলে কলকলায়মানা রক্তগঙ্গায় ভাসিয়া গেল কেন?—ইতিহাস তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনা তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া পরিশেষে এই প্রশ্নের এই উত্তর করিয়াছে যে, তাঁহার জমা খরচে মিল ছিল না। তিনি তাঁহার ভাল মন্দ সকল আকাঙ্ক্ষারই সন্তর্পণ করা আবশ্যক মনে করিতেন। সুতরাং তাঁহার সেই সমুদ্রতুল্য ভাণ্ডারও নিত্যশোষণে শুকাইয়া গেল। অভাবে পড়িলে যে আত্মশাসন ও আত্মসংযম করিতে হয়, ইহা শৈশবে কেহ তাঁহাকে শিখায় নাই, যৌবনে কেহ তাঁহাকে জানাইতে সাহস পায় নাই। সুতরাং অভাবও যতই বাড়িতে লাগিল, তাঁহার প্রকৃতি ও নীতিও ততই উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। আর, অসীম রাজশক্তিরও যে একটা সীমা আছে, ইহা স্বপ্নেও তিনি জানিতেন না। তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে বলেন নাই, তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীও প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে একথা বলিতে পারিতেন না। সুতরাং তিনি তাঁহার অন্যায্য ও অবৈধ অভাব পূরণের জন্য প্রজার উপর অত্যাচার করিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠিত হইলেন না। ইহার প্রথম ফল পার্লেমেণ্টের সহিত বিরোধ, তার পর প্রজার বিদ্বেষ ও প্রজাবান্ধব দেশ হিতৈষিদিগের বিরাগ, তার পর রাষ্ট্রবিপ্লব ও ক্রমওয়েলের অভ্যুদয়, তার পর যুদ্ধবিগ্রহ ও পরাভব,—তার পর প্রজার দরবারে রাজার বিচার এবং সেই বিচারে রাজার প্রাণদণ্ড। প্রথম হইতে শেষ তক কারণের সহিত কার্য্যফল স্তরে স্তরে গ্রথিত, গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে অনুস্যূত।

আমি যে কথা চার্ল্সের জীবন-চরিত হইতে বুঝাইতে যত্ন করিলাম, শোচনীয়-কীর্ত্তি ষোড়শ লুইর চরিত-সমালোচনে তাহা অধিকতর পরিস্ফুট হইবে। ষোড়শ লুইর ইতিহাস ও ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাস প্রায় এক কথা। তদীয় ইতিবৃত্তে ইহা শুধু অনুমিত নহে, কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত ও রক্তাক্ষরে লিখিত হইয়া রহিয়াছে যে, যাহা এক সময়ে রাজকীয় জমা খরচের গোলযোগ বলিয়া উপেক্ষিত রহে, তাহাই কালে জন-ভয়ঙ্কর ও জনবিপ্লাবক রাষ্ট্রবিপ্লবে পরিণত হয়, এবং মনুষ্য যত কেন সাধু, সুশীল ও সুনীতিপরায়ণ হউক না, তাহার জমা খরচে যদি বৈষম্য ঘটে,—তাহার খরচ যদি জমাঃ

হিসাব উল্লঙ্ঘন করিয়া উপরে উঠে, তাহা হইলে পরিণামে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ও জীবন লইয়াই টানাটানি পড়ে।

মনুষ্য বলিয়া বিচার করিলে, কোথায় কয়টি মনুষ্য আছে, যাহাদিগকে ষোড়শ লুইর সহিত তুলনায় সমান করিতে পারি? তাঁহার স্নিগ্ধ মধুর প্রশান্ত চরিত্র চিন্তা করিলে, বস্তুতঃই তাঁহার প্রতি হৃদয়ে প্রগাঢ় স্নেহের সঞ্চার হয়। ক্রোধ কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না, এবং তিনি কখনও কাহাকেও কটু কিংবা কদক্ষর বলিয়া নিপীড়িত করিতেন না। তাঁহার হৃদয় পরের সুখে হাসিত ও পরের দুঃখে কাঁদিত। তিনি পরার্থ প্রাণত্যাগও শ্লাঘার বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। তিনি যারপরনাই আশ্রিতবৎসল ছিলেন। তাঁহার অনুজীবীদিগের মধ্যে কেহ কদাচিৎ কোনও রূপ উৎকট ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে, তিনি তাহার জন্য অশ্রুজলে আপ্লুত হইতেন এবং তাহার শয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া স্বজনের ন্যায় তাহার পরিচর্য্যা করিতেন। তাঁহার প্রকৃতিতে স্বার্থপরতা ও স্বসুখানুবর্ত্তিতার গন্ধ মাত্রও ছিল না। রাজপুত্রেরা প্রায়শঃই ভোগবিলাসী হইয়া থাকে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীরা বিলাস-সুখের সপ্ত সমুদ্র শোষণ করিয়াও চিত্তে তৃপ্তিলাভ করেন নাই। কিন্তু তিনি সংযতমতি বিবেকীর ন্যায় অত্যল্প সুখেই পরিতৃপ্ত রহিতেন এবং সেই সামান্য সুখও যাহাতে অন্যদীয় অসুখ, অশান্তি, অবমাননা কিংবা মনঃক্ষোভের কারণ না হয়, সে বিষয়ে তিনি সর্ব্বদাই নিতান্ত সাবধান রহিতেন। রাজার এক ধর্ম্ম ন্যায়পরতা। ষোড়শ লুই তাহাতে রাজসমাজের পূজাস্থানীয় ছিলেন। তিনি তাঁহার দুঃখদগ্ধ জীবনে কোন দিনও কাম, ক্রোধ কিংবা লোভ মোহাদির অধীন হইয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই, এবং যে ন্যায়ের নাম লইয়া তাঁহাকে শাসন করিয়াছে, সে মর্ম্মঘাতিনী তিক্তকথা বলিলেও তিনি কস্মিন্ কালে প্রত্যুত্তরে তাহাকে তিক্ত বলিতে উন্মুখ হয়েন নাই। রাজার আর এক ধর্ম্ম প্রজারঞ্জন এবং বোধ হয় ইতিহাসের বর্ণবিচিত্র চিত্রপটে এ বিষয়ে ষোড়শ লুইর উপমাস্থল অতি অল্প আছে। তিনি প্রজাকে প্রায় তাঁহার আত্মজপুত্রের সমান জানিতেন, এবং প্রজার চিত্তরঞ্জনের জন্য সর্ব্বপ্রকার লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা ভোগও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। প্রজা তাঁহার মাথায় এক সময়ে প্রীতির পুষ্প বৃষ্টি করিয়াছে, আর এক সময়ে বিদ্বেষের ধূলি বর্ষণ করিয়াছে। তিনি উভয়ই সন্তানের আবদার বলিয়া অবিচলিত চিত্তে মাথা পাতিয়া লইয়াছেন। কিন্তু হায়! যিনি এক শরীরে এত গুণের আধার ছিলেন, তাঁহার আশার তরণী পরিশেষে আঁধারে ডুবিল কেন? যিনি প্রাণান্তেও কাহাকে কটু বলেন নাই, তাঁহাকে প্রথমতঃ সশরীর দৃশ্য জীবনে তার পর অশরীর ঐতিহাসিক জীবনে এত কটূক্তি সহিতে হইয়াছে কেন? যিনি

ন্যায়ের কঠোর শাসনে ও রাজধর্ম্মবিধানে এক ফোটা রক্তপাত করিতে হইলেও শতবার শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হইতেন, সেই শান্ত সুস্থির সৌম্য পুরুষের ছিন্নগ্রীবা হইতে শেষে অজস্রধারায় রক্তবৃষ্টি হইয়াছিল কেন? ইতিহাসের উত্তর—জমা খরচ।

ঐতিহাসিকেরা ফরাশি রাষ্ট্র বিপ্লবের অনেকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু সেই কারণ পরম্পরার মূল-কারণ ফরাশি রাজ্যের ঋণ। ষোড়শ লুই নিজে অতি মিতব্যয়ী ছিলেন। অপব্যয়ের যে সকল জলৌকা বিলাসীদিগের তৃষার্ত্ত শরীরে সুশীতল তুষার খণ্ডের ন্যায় সংলগ্ন হইয়া প্রথমে রক্ত, তার পর মাংস, তার পর কলিজা ধরিয়া টান দেয়, তাদৃশ কোন কিছুই তাঁহাকে কোনও দিন শোষণ করে নাই। কিন্তু প্রসিদ্ধনামা চতুর্দ্দশ লুইর সময় হইতে রাজ্যে ও রাজসংসারে এত প্রকার অপব্যয়ের পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল, এবং ষোড়শ লুইর অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা তাঁহার বৃথাভিমান, বৃথা পৌরুষ ও বিকৃত ভোগতৃষ্ণার পরিতর্পণের জন্য ঋণের উপর ঋণ করিয়া ফরাশি রাজাকে এমন ভাবে ডুবাইয়া গিয়াছিলেন যে, ষোড়শ লুই কিছুতেই আর শেষে চক্ষে পথ দেখিলেন না। তিনি স্বভাবতঃ যেরূপ শান্ত ও সুশীল ছিলেন, যদি কার্য্যে সেইরূপ অটল অচল ও দৃঢ়ব্রত হইতেন, তাঁহার প্রকৃতিতে একদিকে যেমন কমনীয় কোমলতা ছিল, যদি আর একদিকে সেইরূপ বজ্রকল্প কাঠিন্য থাকিত, যদি শুধু নিরুপদ্রব শান্তি সুখের জন্যই লালায়িত না হইয়া তিনি কার্য্যক্ষেত্রের কণ্টকজালা সহিয়া লইতেও শিক্ষালাভ করিতেন,—তিনি লোকরঞ্জন করিতে যেরূপ উৎসুক ছিলেন, রাজনীতির কঠোরব্রত পরিরক্ষণেও যদি তদনুরূপ দীক্ষিত হইতেন, —যার হাতে যখন পড়িলেন, তারই তখন মনোরঞ্জন করিতে হইবে, এই বাসনা যদি তাঁহাকে একবার উত্তরে, একবার দক্ষিণে, একবার পূর্ব্বে,একবার পশ্চিমে দোদুল্যমান না রাখিত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার আয়ব্যয়ের সাম্য স্থাপন করিয়া তাঁহার পিতামহ ও প্রপিতামহের পাপার্জ্জিত ঋণ পরিশোধ ও রাজ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাতে এসকল গুণের অণুমাত্রও সম্পর্ক ছিল না। তিনি ভাল মানুষটির মত ভালবাসিতে জানিতেন, ভাল কথা কহিতে পারিতেন, কিন্তু ভারবহনক্ষম পুরুষের মত প্রতিজ্ঞার উপর দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেন না। স্তুতি নিন্দা এবং যশ ও অপযশের অতি মৃদুমন্দ সমীর-সঞ্চালনেই তিনি দণ্ডে দণ্ডে এক একদিকে ঢুলিয়া পড়িতেন। ইহার প্রথম ফল আয়-ব্যয়-ঘটিত নীতির নিত্য নূতন ব্যবস্থা, তার পর নিত্য নূতন লোকের উপদেশ গ্রহণ, তার পর তদানীন্তন ফ্রান্সের ত্রিমূর্ত্ত * জাতীয় সভার

* The States General composed of the three Orders, Viz. the Nobles, the Clergy and the Commons.

উদ্বোধন ও অধিবেশন,—তার পর বিশ্বত্রাসি রাষ্ট্রবিপ্লব এবং মেরাবো, মেরা, ডেণ্টন ও রবিসপীয়র প্রভৃতি বিপ্লবনায়কদিগের ক্রমিক অভ্যুদয়, তার পর ঝঞ্ঝাবাত, রক্তবৃষ্টি, ভূকম্প ভূবিদার,—তার পর প্রমত্ত প্রকৃতির উন্মাদ নৃত্য, তার পর প্রজার দরবারে রাজার বিচার,—তার পর সগোত্র বান্ধবে, সপরিবারে সপুত্র ষোড়শ লুইর শিরশ্ছেদ। অহো কি কষ্ট! অহো কি পরিণাম! কিরূপ ক্ষুদ্র বীজে কি বৃহৎ ফল! কিরূপ অল্লারম্ভে কি ভয়ঙ্কর অবসান! কিন্তু কার্য্যকারণের এমনই সম্বন্ধ। সৃষ্টির এক দিক্ হইতে আর এক দিক্ যদি উলটিয়া যায়, তথাপি কার্য্যকারণের অতি সূক্ষ্ম সম্বন্ধসূত্র ছিন্ন হয় না। বাইবলের এক স্থলে এইরূপ উপদেশ আছে যে, এক পুরুষে যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তৃতীয় কিংবা চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত তাহার পরিণাম ফলের ভোগ হইয়া থাকে। কিন্তু ষোড়শ লুইর জীবন কাহিনীতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, এক পুরুষের কর্ম্মফল ক্রমশঃ চতুর্দ্দশ পুরুষের দুঃখদুর্ভোগেও পর্য্যবসিত হয় না। কারণ, যেমন অতিদর্পে লঙ্কার অধঃপতন, অতিদানে বলির বন্ধন এবং অতিমানে দুর্য্যোধনের নিধন, সেইরূপ অতিব্যয়ে, অতিচারে এবং শক্তি সমৃদ্ধির অতিক্ষয়ে আধুনিক বসুন্ধরার ভূষণসদৃশ বোরবন বংশের সমূল ধ্বংস ও রাজ্যনাশ। বোরবনেরা এক সময়ে লঙ্কার রাবণসদৃশ ছিল।

পুরাতন ইতিহাসের দুইটি পরিচ্ছেদ বলিলাম, এইক্ষণ নূতন ইতিহাসের একটি পরিচ্ছেদ অতি সংক্ষেপে সমালোচনা করিব। বঙ্গীয় পাঠকবর্গের মধ্যে সকলেই ইহা বিশিষ্ট রূপে অবগত আছেন যে, যে মিসর দেশ লইয়া এইক্ষণ এত হঙ্গাম—এত যুদ্ধ বিগ্রহ এবং সপ্তকাণ্ড রামায়ণের এত নূতন অভিনয় হইতেছে, সেই মিসর দেশ এক সময়ে শস্যসম্পদ্ ও সুখসমৃদ্ধিতে পৃথিবীতে মধুরভাণ্ডার ছিল। সেই মিসরের ললাটে এইক্ষণ এত যে লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা ঘটিতেছে, ইহার কারণ কি?—কোথায় মিসর আর কোথায় বৃটন? কি জাতি, কি নীতি, কি ধর্ম্ম অথবা কর্ম্মপদ্ধতি কিছুতেই এই দুইয়ের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ নাই। সম্বন্ধ নাই, তথাপি বৃটনই এইক্ষণ মিসরের ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধী। সম্বন্ধ নাই, তথাপি মৈসর দুর্গমালা বৃটন সেনায় পরিপূরিত, মৈসরী শস্যভূমি বৃটনের পদতলে বিদলিত। এই দুর্ভোগ ও দুর্দ্দশার প্রকৃত কারণ কোথায়? আরবি পাশা স্বজাতির নিকট স্বদেশ হিতৈষী ও স্বজাতিবৎসল বলিয়া সম্মানিত ছিল। কি কারণে সে নির্ব্বাসিত হইল? গর্ডন পাশার ন্যায় উদারমতি ও তেজস্বিপ্রকৃতি বীর কি কারণে মেধির কোপাগুণে গিয়া পুড়িয়া মরিল? উত্তর—মিসরে এতদিন যাহা হইয়াছে, এখনও যাহা হইতেছে এবং মিসর উপলক্ষে অবস্থার শাসনে ও প্রয়োজনের নিপীড়নে ভবিষ্যতেও যাহা হইবে, তাহার একমাত্র কারণ মিসরাধিপতির জমাখরচের উচ্ছৃঙ্খলা। মিসরের খেদিব আর পাঁচ প্রকারে ভাল মানুষ হ-

ইতে পারেন, কিন্তু তিনি জমা খরচের হিসাবে নিতান্তই অকৃতী, অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য। তিনি তাঁহার আয়ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিয়া সংসার চালাইতে পারেন না, এই হেতু কতকগুলি ইংরেজ ও কতকগুলি ফরাশি বণিকের নিকট তাঁহার ঋণ হয়। এই ঋণের সূত্রে তাঁহার এক মুরুব্বি ইংরেজ ও আর এক মুরুব্বি ফরাশি। কেন না যে যাহার মহাজন, সে সকল দেশে ও সকল স্থলে স্বভাবতঃই তাহার কর্ত্তা, তাহার প্রভু, তাহার অভিভাবক ও মুরুব্বি বলিয়া পৃষ্ঠের উপর সোওয়ার হইয়া বসে। কিন্তু, যেহেতু ইংরেজের নিকটই খেদিব অধিকতর ঋণী, অতএব ইংরেজই তাহার শ্রেষ্ঠতর মুরুব্বি। খেদিবের রাজগী এক প্রকার তালুকদারি, এবং তাঁহার প্রকৃত জমিদার ও প্রকৃত অভিভাবক তুর্কের সুলতান। কিন্তু তুর্কের সুলতান সৈন্য সমৃদ্ধিতে অতি বড় পরাক্রান্ত হইলেও তিনি ঋণের দুর্ব্বহ ভারে জরাজীর্ণ হইয়াছেন। ইউরোপে তিনি এইক্ষণ (The sick man) অর্থাৎ রুগ্ন পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি এইক্ষণ পরকে আর কি রক্ষা করিবেন? তাঁহার আত্মরক্ষাই সুকঠিন। সুতরাং তিনি তাঁহার ভূত ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া, মিসর রাজ্যের উপর তাঁহার যে চিরপ্রতিষ্ঠিত পুরাতন মুরুব্বিয়ানা ছিল, তাহা ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন; এবং দেখ চাহিয়া ইংরেজ মিসর রাজ্যের উপর এই কয় বৎসর ধরিয়া কিরূপ মুরুব্বিয়ানা করিতেছেন!

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এবং সংসারের গতি, নীতি পর্য্যালোচনা করিয়াই, আমি বৃদ্ধ আজি বৎসরের অবসান সময়ে সুখী দুঃখী, সবল দুর্ব্বল, সধন নির্ধন সকলকে প্রীতির নির্ভরে সমস্বরে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছি,—হে সৌম্য, হে সমৃদ্ধ, হে সুবোধ, হে সুধীর, সময় বড় দ্রুতগতি বহিয়া যাইতেছে, সময় থাকিতে একবার আপনার জমাখরচ দেখ। তুমি কি সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ রহিয়া পৃথিবীতে সুখশান্তির দীর্ঘ জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা কর? তাহা হইলে জমাখরচ দেখ। তুমি কি পিতৃঋণ ও মাতৃঋণ, দেবঋণ ও দেশের ঋণ পরিশোধ করিয়া মনুষ্যের মধ্যে মনুষ্য হইতে ইচ্ছা কর। তাহা হইলে জমা খরচ দেখ। তুমি রাজা, রুশের জার,—তোমার যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। হয় লোভে, না হয় মনঃক্ষোভে তোমার ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ভেরীর ভৈরবনাদ তোমার সিংহনাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া দিগন্ত নিনাদিত করিতেছে। পৃথিবী সৈনিকের পদভরে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, অস্ত্র শস্ত্রের ঝনৎকারে চিত্ত চমকিয়া উঠিতেছে, চক্ষে ধাঁধা লাগিতেছে। তোমার পরাক্রমের আর সীমা নাই। কিন্তু অতি বিনীতভাবে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি তোমার জমা খরচ খুলিয়া দেখিয়াছ কি?—যাহারা জমা খরচ না দেখিয়া যুদ্ধে যায়, শুনিয়াছি তাহারা পরিশেষে নিভৃত নিবাসে বসিয়া শান্তি শতক

পাঠ করে। সুতরাং না দেখিয়া থাকিলে এই বেলাই তোমার দেখিয়া লওয়া উচিত। আর তুমি ভোগ পিয়াসী, বিলাসী,—তোমাকেও প্রিয়ভাবে জিজ্ঞাসা করি, তুমি এই যে তোমার ছয় দাঁড়ের লালডিঙ্গী দৌড়াইয়া সারি গাইয়া যাইতেছ,—তৃষ্ণার তাড়নে তটস্থ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সখের ডিঙ্গায় সুখের পাল উড়াইতেছ, তুমি তোমার জমা খরচ দেখিয়াছ কি?—যদি জমা খরচ না দেখিয়া থাক, তাহা হইলে এই বেলা কূলে ফিরিয়া আইস, এবং জমা খরচ যাচাই করিয়া আপনার শক্তির সীমা নির্দ্দেশ কর। তুমি মান চাও, মহত্ব চাও, সুখ চাও, সখ চাও, অথবা প্রীতি ও দয়া দাক্ষিণ্যাদি বৃত্তির পরিতৃপ্তি চাও, ইহার সকলের সহিতই জমা খরচের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তুমি আপনার চক্ষে আপনি ধূলি নিক্ষেপ করিতে পার, কিন্তু তাহাতে জগতের চক্ষু, জগদালোক সূর্য্য অন্ধীভূত হইবে কেন? আমি তোমার ইতিহাস হইতে দুই একটি উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি। তোমাকে লইয়া বিজ্ঞানের আলোচনা করি নাই। কিন্তু যদি তুমি বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইতে, তাহা হইলে দেখিতে পাইতে যে, প্রকৃতির এই বিশ্বভাণ্ডারের সমস্ত বিভাগই জমা খরচের সূক্ষ্ম সূত্রে সূত্রিত, জমা খরচের অটল ভিত্তির উপর বিধৃত। এই নিখিল সংসারে অনন্তের অনন্ত শক্তি যে অনন্ত ভাবে লীলা করিতেছে, যোগ বিয়োগের অনুল্লঙ্ঘনীয় বিধিই তাহার জীবন। ফুলটি যে ফোটে, ফলটি যে পড়ে তাহাও জমা খরচ অর্থাৎ উপচয় ও অপচয়ের নিয়মাধীন।

নৈমিষাশ্রম
৩১শে চৈত্র ১২৯১ } শ্রীজ্ঞানানন্দ সরস্বতী।

একদিন।

হৃদয়-মন্দিরে প্রাণ,
দেবীর চরণতলে
ছিল ঘুমাইয়া।
বিজন-মন্দিরে সেই
প্রাণীমাত্র নাহি ছিল
দিতে জাগাইয়া॥
অতীত পূজার বেলা,
অনশনে ক্লান্ত প্রাণ
ঘুমে অচেতন।
ধূলায় প'ড়েছে ঢলি,
পাষাণে ললাট পড়ি
স্বেদ ঝরে ঘন॥
কাতর বদন খানি
মুদিত নয়ন দু'টি
গেছে কিছু খু'লে।
দুই প্রান্তে অশ্রু-জল
ধারা দিয়ে পড়িতেছে
দেবী-পদমূলে॥
দেবীর প্রতিমা খানি
বিরাজিত সিংহাসনে

পাষাণ-মূরতি।
এক করে সুধাভাণ্ড,
আর করে বরাভয়,
ওষ্ঠে ঝরে প্রীতি ॥
সুগোল উন্নত গ্রীবা,
ঈষদ্ বঙ্কিমে নত
তাহে দু'নয়ন।
পল্লবে আবৃত আধ,
আধ বিকসিত মৃদু
স্নেহে অচেতন ॥
সেই দৃষ্টি বিগলিয়া
প্রাণের অধরে মম
পড়িতেছে ধীরে।
পূর্ণিমার আলো যেন
গিয়াছে মিশিয়া, শুষ্ক
সরসীর নীরে ॥
অনাবৃত নেত্র-পথে
পশিয়া সে ভাতি, মম
প্রাণের অন্তরে।
স্বপনের চন্দ্র মত
উজলিয়া অন্তঃস্থল,
স্বপন বিতরে ॥
অতীত পূজার বেলা,
তথাপি নীরবে প্রাণ
আজ কি কারণ?
একে তার ক্ষীণ দেহ,
তাহে ঘোর তপস্যায়
সদা নিমগন!
কি জানি কি হ'ল ভাবি,
মন্দিরের দ্বার ঠেলি,
হেরিনু গোপনে।
দেখিনু নিদ্রিত প্রাণ,
ওই ভাবে আছে পড়ি
দেবীর চরণে ॥
অস্থির হইনু আমি,
প্রাণের সে দশা বুকে
সহিল না আর।
'প্রাণ—প্রাণ—প্রাণ' বলি,
বিষম-কাতর-স্বরে
করিনু চীৎকার ॥
শিহরি উঠিয়া বসি
উন্মাদের মত প্রাণ,
চৌদিকে হেরিল।
শিহরি উঠিলা দেবী,
পাষাণ-নয়নে তাঁর
স্নেহ মিলাইল ॥

ঈশান।

সংক্ষিপ্ত-সমালোচন।

১। "শ্রীশ্রী চৈতন্য শিক্ষামৃত। নীতি, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, মুক্তি, ভক্তি ও প্রীতি সম্বন্ধীয় মহাপ্রভুর উপদেশ। শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ দাসানুদাস শ্রীকেদার নাথ দত্ত প্রণীত। কলিকাতা বৈষ্ণব ডিপজিটরীর নিমিত্ত বৈষ্ণব সভা হইতে প্রকাশিত।"

আমরা এই অভিনব গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া অপরিসীম আনন্দ লাভ করিয়াছি।

গ্রন্থকার বৈষ্ণব ধর্ম্মে রীতিমত দীক্ষিত ও রীতিমত শিক্ষিত। এই গ্রন্থ তাঁহার সেই দীক্ষা ও সেই সাধু শিক্ষার সংমিশ্রণের ফল। ভক্তিই বৈষ্ণব ধর্ম্মের সারসর্ব্বস্ব। গ্রন্থকার সেই ভক্তিতত্ত্বরূপ সুধা রসের স্বাদ গ্রহণ করিয়া সাধারণে্য তাহা বিলাইতে যত্নবান্ হইয়াছেন ; ইহা দেখিয়া আমরা যারপর নাই সুখী হইয়াছি।

বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মের দুইটি মূর্ত্তি বিরাজমানা রহিয়াছে। উহার এক মূর্ত্তি চৈতন্য দেবের সমসাময়িক বৈষ্ণব, চৈতন্য প্রেমমুগ্ধ, চৈতন্যপন্থী রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী এবং বিশ্বনাথ, কর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের গ্রন্থ পটে ;— উহার আর এক মূর্ত্তি বঙ্গদেশের হাটে, ঘাটে, মঠে, মন্দিরে, বাজারে ও বন্দরে। যাঁহারা চৈতন্য প্রবর্ত্তিত, ভক্তিতত্ত্বনিহিত, নিগূঢ় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মর্ম্মার্থ পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, বাবু কেদারনাথ দত্তের এই গ্রন্থ তাঁহাদের উপকারে আসিবে। কীর্ত্তনের সময়ে সকলেই সর্ব্বদা এইরূপ শুনিয়া থাকেন,—

'তোরা কে নিবি লুট লু'টে নে,
নিমাই চাঁদের প্রেমের বাজারে।'

এই প্রেম কি? কিরূপে ইহা লুটে নিতে হয়? কিরূপে ইহার বাজার মিলে?

আবার,—

'জগাই মাধাই দু ভাই ছিল,
তারা ভক্তির ঘাটে মুক্তি পেল।'

সেই ভক্তি কি পদার্থ? কোথায় তাহার ঘাট? কিরূপে সেই ঘাটে যাইয়া পঁহুছা যায়? কি প্রকারে,—কিরূপ প্রক্রিয়ায় মনুষ্য সেই ভক্তির ঘাটে মুক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে! গ্রন্থকার স্পষ্টাক্ষরে এ সকল প্রশ্নের উত্থাপন না করিয়াও এই গ্রন্থে বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই সকল তত্ত্বরহস্য লইয়াই নানাবিধ গভীর কথার অবতারণ করিয়াছেন এবং ভক্তি ও প্রীতিই যে ধর্ম্মের প্রধান সাধন, তাহা পাঠককে বুঝাইতে বিশিষ্ট রূপ যত্নবান্ হইয়াছেন। আমরা পুনরপি বলি, তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ ধন্য বাদার্হ।

দার্শনিকতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে ভাষা প্রায়শই একটুকু দুর্ব্বোধ হইয়া পড়ে। এই পুস্তকের ভাষাও এই জন্যই একটুকু দুর্ব্বোধ হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সর্ব্ব সাধারণকে শিক্ষা দেওয়াই যখন শিক্ষামৃতের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন ইহার ভাষার প্রতি আরও একটুকু বেশী দৃষ্টি রাখিলে, বোধহয় সে উদ্দেশ্য অধিকতর সফল হইত। ইহার একস্থলে লিখিত আছে,—

'শ্রীকৃষ্ণ চরিতামৃতের যে অবিদ্বৎ প্রতীতি তাহা অবলম্বন করিয়া যত বিবাদ উপস্থিত হয়। বিদ্বৎ প্রতীতিতে কোন বিবাদ নাই। যাঁহাদের পরমার্থ লাভের বাসনা আছে, তাঁহারা বিদ্বৎ প্রতীতি সত্বর লাভ করুন। বৃথা অবিদ্বৎ প্রতীতি লইয়া বিবাদ করত যথার্থ স্বার্থ হানি স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি?'

এ কথা অতি উপাদেয় বটে। কিন্তু সকলেই ইহা বুঝিবে কি? যে ধর্ম্ম এদেশে মধুর মৃদঙ্গধ্বনির সহিত গৃহে গৃহে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল,—যে ধর্ম্ম হাঁড়ি, ডোম,

চণ্ডাল অবধি সকলকেই সমান স্বরে সমান আদরে আহ্বান করিয়াছে, কীর্ত্তনের কমনীয় প্রাঙ্গণ * যে ধর্ম্মের প্রচার ক্ষেত্র, সুধাবর্ষি সংগীতই যে ধর্ম্মের প্রচারক,—ভক্তি যে ধর্ম্মের পরম লক্ষ্য এবং ভালবাসাই যাহার প্রাণ, বোধহয় সেই ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব সাধারণের হৃদয়গ্রাহিণী সুখবোধ্য সরল ভাষায় নিবদ্ধ হইলে, উদ্দেশ্যের সিদ্ধিবিষয়ে অধিকতর আনুকূল্য হয়। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিষয় বড় কঠিন; সুতরাং ভাষা যে একটুকু কঠিন হইয়াছে তাহা বিস্ময়ের নহে।

২। "সূদন-সঙ্গীত। অর্থাৎ প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতা ৺ গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি সুগায়কদিগের কতিপয় গীতি সংবলিত মধুসূদন দাসের গীতিপুস্তক। টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত সন্তোষ গ্রাম হইতে শ্রীশ্রীনাথ সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।"

আমরা মাঘ মাসের বান্ধবে মধুসূদনের ঢপ সংগীতের সমালোচনা করিয়াছি। যাঁহারা আমাদিগের সমালোচনা পড়েন নাই এবং কোন দিনও পড়িবেন না, তাঁহারাও জানেন যে, মধুসূদন এদেশে এক জন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন এবং গীত রচনায়ও তাঁহার প্রশংসা ও নৈপুণ্য ছিল। এই সূদন-সঙ্গীতও মধুসূদনেরই কতকগুলি গীতের বিশৃঙ্খল সংগ্রহ। সুতরাং ইহার নূতন সমালোচনা অনাবশ্যক। সংগ্রহকার এই পুস্তকে গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতিরও কয়েকটি গীত নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু কোন্ গুলি গোবিন্দের এবং কোন্ গুলি মধুসূদনের, পুস্তকে তাহার পরিচয় দেন নাই। আমরা নিম্নে এই পুস্তক হইতে ২টি গীত তুলিয়া দিলাম। আমাদের বোধ হয়, ইহার প্রথমটি গোবিন্দের এবং শেষোক্তটি মধুসূদনের। পাঠক এই চারিটি গীত মিলাইয়া পড়িলে বিশ ত্রিশ বছরের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালার বিভিন্নমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন।

১

স্পষ্ট নিরদয়, তোমায় দয়াময়, বলে হরি কোন্ গুণে। কেহ চন্দনদানে, বসে সিংহাসনে, আমরা প্রাণদানে স্থান পেলেম না চরণে। কুব্জা বিপিনে, হইল নবীনে, হেদে ও শ্যাম। তোমা বিনে, যেমন রাম বিনে জানকী অশোক বনে। রাজকন্যা বনবাসী, দাসী হয় রাজমহিষী, সকলই তোমার কৃপায়। যারে রাখ পায়, সে সকলি পায়, হরি যারে না রাখ পায় বিপদ ঘটাও পায় পায়, হাসি পায় হে পায় ধরার দিন পৈলে মনে।

২

জেনে আয় ধনি, হয় ও কি ধ্বনি, ও ধ্বনি বিপরীত ধ্বনি, যেন বজ্রাঘাত তুল্য ধনীর ঐ ধ্বনি। আমায় ধর ধনি, শুনে

* "ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবং॥
হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

প্রাণ যায় ধ্বনি! সখি! ইন্দ্র কি উপেন্দ্র করে ধ্বনি। যদি ইন্দ্রের বজ্রের ধ্বনি, তা হলে সজনি! সহিত থাকিত নীরদ, এ নীরদ বিহীনে হয় রদ, শুনে ঐ ধ্বনি, হৃৎ-কম্প হলো ধনি।

এই পুস্তকখানি অতি ভাল কাগজে, ভাল আখরে মুদ্রিত হইয়াছে। অথচ ইহার মূল্য।০আনা মাত্র। আয়তনের প্রতি দৃষ্টিতে মূল্য বড় কম হইয়াছে। যাঁহারা গোবিন্দ ও মধুসূদনের গীত ভাল বাসেন, তাঁহাদের ইহা আদরের সহিত ক্রয় করা উচিত।

৩। "আয়ুর্ব্বেদার্থ চন্দ্রিকা ভাজন-ঘাট নিবাসি ৺গঙ্গাপ্রসাদ বিদ্যারত্ন তথা শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ রায় কবিরাজস্য ছাত্রেণ শ্রীশ্যামচরণ গুপ্ত কবিরাজেন সঙ্কলিতা। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র তর্কালঙ্কারেণ তথা শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় গুপ্ত কবিরাজেন সংশোধিতা।"

এই পুস্তক খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছে এবং আমরা ইহার দুই খণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়া একান্ত অনুগৃহীত হইয়াছি। লুপ্ত-প্রায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এদেশে এইক্ষণ নূতন উৎসাহ ও নূতন উদ্যমের সহিত আলোচিত হইতেছে। এই সময়ে এইরূপ পুস্তকের সঙ্কলন যারপরনাই উপকার জনক। আমরা যতদূর দেখিতে পাইয়াছি, তাহাতে গ্রন্থকারের অনুসন্ধাননৈপুণ্য, শ্রমশীলতা ও বিদ্যাবত্তারই অশেষ নিদর্শন রহিয়াছে। নিম্নে আমরা দুইটি শব্দ ও তাহার অর্থ উদ্ধৃত করিতেছি। এইটুকু দেখিলেই পাঠক গ্রন্থের পরিচয় পাইবেন।

অষ্ঠিলা...স্ত্রীং, বাতরোগান্তর্গত বর্ত্তুল পাষাণ সদৃশ রোগ বিঃ। যথা। বাতাষ্ঠিলা মিতি বদেজ্জঠরে তির্য্যগুত্থিতাং। ও মূত্রাঘাত রোগ বিঃ। যথা। আধ্মাপয়ন্ বস্তিগুদং রুদ্ধাবায়ুশ্চলোন্নতাং কুর্য্যাত্তীব্রার্ত্তিমষ্ঠীলাং মূত্রবিন্ মার্গ রোধিনীং। ভা।

অসন...পুং, শালবৃক্ষ ভেদঃ। পেয়াশাল ইতি ভাষা। তৎপর্য্যায়ঃ। পরমায়ুধঃ। শ। মহাসর্জ্জঃ। সৌরিঃ। বধূকপুষ্পঃ প্রিয়কঃ। বীজবৃক্ষঃ। নীলকঃ। প্রিয়সালকঃ। অস্যগুণাঃ। কটু,উষ্ণ, তিক্ত, বাতার্ত্তিদোষ জল দোষ রক্তমণ্ডলনাশি সারকত্বঞ্চ। অন্যৎ পীতসালশব্দে দ্রষ্টব্যং। সালভেদঃ। আসন ইতি খ্যাতঃ। তৎপর্য্যায়ঃ। অজকর্ণঃ। বনে সর্জ্জঃ। মহাসর্জ্জঃ। র। অস্যগুণঃ। কফবাতনাশী। বা।

কিন্তু এই পুস্তকে নিম্নলিখিত প্রকারে শব্দ সকল কি উদ্দেশ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা আমাদের বুদ্ধিস্থ হইতেছে না।

অন্যপুষ্টঃ...পুং, কোকিলঃ। ইতি কুমারসম্ভবঃ।

অন্যপূর্ব্বা...স্ত্রীং, পৌনর্ভবা কন্যা। একস্মৈ বাগাদিনা দত্তা পুনরন্যেন বিবাহিতা কন্যা। যথা। বাচা দত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা। উদকস্পর্শিতা যাচ যাচ পাণিগৃহীতিকা। অগ্নিংপরিগতা যাতু পুনর্ভূ প্রভবা চ যা। ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তি কুলমগ্নিবৎ। ইতি উদ্বাহতত্ত্বে।

অন্যভৃৎ...পুং বায়সঃ। হে।
অন্যভৃতঃ...পুং কোকিলঃ। হ।
আকাশগঙ্গা...স্ত্রীং, স্বর্গগঙ্গা। ইতি শিবরাত্রিব্রতকথায়াং।
আকাশদীপ...পুং, আকাশপ্রদীপঃ।

পূর্ব্বোক্ত তালিকার মধ্যে অন্যপুষ্ট, অন্যভৃৎ, অন্যভৃতঃ এসকল শব্দ কাব্যসাহিত্যে নিত্য ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাদিগের সহিত আয়ুর্ব্বেদের কোনরূপ অনন্যসাধারণ বিশিষ্ট সম্পর্ক নাই। অন্যপূর্ব্বা শব্দ স্মৃতিশাস্ত্রের বিষয়ীভূত। স্থূলাঙ্গী ও কৃশাঙ্গী শব্দের সহিত আয়ুর্ব্বেদের সম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে। কেন না স্থূলতা ও কৃশতার সহিত মেদবাহুল্য ও মেদহীনতার কার্য্য কারণ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু অন্যপূর্ব্বার যেরূপ অর্থ করা হইয়াছে এবং আকাশপ্রদীপের সহিত কার্ত্তিক মাসের যে স্মৃতিবিহিত সম্পর্ক আছে, এই অভিধানে তাহার উল্লেখ হওয়ার কোনও প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে এইরূপ একখানি বৃহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় অভিধানে তরুলতা ও ধাতব পদার্থনিচয়ের যেরূপ সবিশেষ পরিচয় থাকা আবশ্যক, ইহাতে তাহারও অভাব আছে। এইক্ষণ পর্য্যন্ত এই পুস্তকের দুইখণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের অবশিষ্ট পোনে ষোলআনা অংশ এখনও গ্রন্থকারের হাতে। গ্রন্থকার সুযোগ্য লোক, সুপণ্ডিত, তিনি যদি সম্মুখবর্ত্তী সংখ্যাগুলির প্রকাশ সময়ে আমাদের এই কথা কয়টির ঔচিত্য ও অনৌচিত্য একবার আলোচনা করিয়া দেখেন, আমরা বাধিত হইব। ইংরেজিতে যেরূপ বড় বড় মেডিকেল ডিক্সেনারি আছে, এই পুস্তকখানি ঠিক্ তাহারই অনুকরণে সঙ্কলিত হইলে বোধ হয় লোকের অধিকতর সুবিধাজনক হইত। ইংরেজি মেডিকেল অভিধানে কুইনিন শব্দের অর্থে যে যে রোগে কুইনিন ব্যবহার্য্য, তাহারও উল্লেখ আছে। এই পুস্তকে সে রীতি রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। যথা,—অর্ক শব্দের পর্য্যায়ে চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, পাতাল, অনেক পদার্থেরই উল্লেখ হইয়াছে কিন্তু অর্কপত্র, অর্থাৎ আকন্দের পাতা যে আয়ুর্ব্বেদের বিধান অনুসারে কর্ণশূলের এক অসামান্য ঔষধ * তাহার কোনও উল্লেখ নাই। এইরূপ পুস্তক হইতে কাব্য, অলঙ্কার ও স্মৃতিশাস্ত্রের সমস্ত কথা উঠাইয়া দিয়া আয়ুর্ব্বেদের আরও বেশী কথা ভরিয়া দিলেই কি ভাল হয় না?

---

* "অর্কস্য পত্রং পরিণামপীতং
আজ্যেন লিপ্তং শিখিনাবতপ্তং
সম্পীড্য তোয়ং শ্রবণে নিষিক্তং
নিহন্তি শূলং বহুবেদনঞ্চ।"